সবটুকুই মুহাম্মদ

এফ. ডব্লিউ. বুরলেই



অনুবাদঃ

সাফিয়া বিনতে হুয়াই

মুফতি আবদুল্লাহ আল মাসুদ

সবটুকুই মুহাম্মদ

এফ. ডব্লিউ. বুরলেই

অনুবাদ

সাফিয়া বিনতে হুয়াই

মুফতি আবদুল্লাহ আল মাসুদ

MURTAD.NET মুক্তি আসুক যুক্তির পথ ধরে

একটি মুরতাদ.নেট প্রকাশনা

সবটুকুই মুহাম্মদ

এফ. ডব্লিউ. বুরলেই

অনুবাদ

সাফিয়া বিনতে হুয়াই

মুফতি আবদুল্লাহ আল মাসুদ

প্রথম ই-বুক প্রকাশ

১ লা জানুয়ারী, ২০২৩

একটি মুরতাদ.নেট প্রকাশনা

ভূমিকা

'সবটুকুই মুহাম্মদ' বইটি সম্পূর্ণভাবে ইসলামের মূল গ্রন্থসমূহের উপর ভিত্তি করে লেখা। ইবনে ইসহাকের জীবনী, আল তাবারি, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, এবং ওয়াকিদি ও তাঁর ছাত্র ইবনে সাদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা লিপিবদ্ধ আদি ধর্মীয় ধারাবাহিক উৎসসমূহের একত্রিত রূপ বলা যেতে পারে এটাকে। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ উৎস উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে চতুর্দশ শতাব্দীর ইসলামিক স্কলার ইবনে কাসিরের কোরানিক ভাষ্য এবং তাঁর লেখা নবী মোহাম্মদের জীবনীগ্রন্থ (সিরাহ)।

রেফারেন্সগুলো প্রতিটি অধ্যায়ের নোটে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে নবী মোহাম্মদের জীবনীগ্রন্থের সম্মিলিতভাবে প্রায় বিশ হাজার পৃষ্ঠার তথ্য-উপাত্ত, প্রতিটি বাক্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ বইটিতে। যদি বইটি পড়ে নবী মুহাম্মদের চরিত্রকে পাঠকদের কাছে ভয়ঙ্কর বলে মনে হয় তাহলে তার জন্য মূল গ্রন্থগুলোই দায়ী। সন্দেহাতীতভাবেই মুহাম্মদ ছিলেন একজন অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির মানুষ; প্রাচীন বই, পুঁথি, সাহিত্যের সবটা জুড়েই তাঁর সহিংসতার ঘটনাসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, এই ধর্মীয় জীবনীগ্রন্থগুলোর দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি জুড়ে রয়েছে তাঁর সহিংসতার ইতিহাস।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, মূল লেখকদের কেউই এতে বিব্রত বা বিচলিত হননি। যেহেতু তাঁরা বিশ্বাসী মুসলিম ছিলেন এবং ইসলামের প্রথম 'স্তম্ভ' হচ্ছে শপথ গ্রহণ করা যে, "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই আর মুহাম্মদ তাঁর প্রেরিত রাসূল" তাই তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন, মুহাম্মদ কোন অন্যায় করতে পারেন না। কারণ, তিনি যা কিছুই করেছেন তাঁর পেছনে নিশ্চয়ই "আল্লাহর মহৎ কোন উদ্দেশ্য" লুকিয়ে ছিল! তাঁরা সেই বিশ্বাস নিয়েই মোহাম্মদের সমস্ত হিংস্রতার বর্ণনাগুলো গৌরবের সাথে আত্মস্থ করেছেন। ঠিক সেভাবেই তাঁরা খুন, গণহত্যা, লুটপাট, দাসব্যবসা, নির্যাতন এবং আরো অনেক অপরাধের প্রচুর প্রমাণাদি তুলে ধরেন। **তাদের উল্লেখিত ঐতিহাসিক দলিলগুলো যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে মুহাম্মদ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে তালিকাভুক্ত মানবতাবিরোধী প্রতিটি অপরাধই সংঘটিত করে ফেলেছেন।**

মুসলিমদের জন্য কোরআনের নির্দেশ অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। যারা মুহাম্মদকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের বিরুদ্ধে কোরআনের অনেক আয়াতে সহিংসতা করার নির্দেশনা পাওয়া যায়। মুসলমানরাও সবকিছুতে মুহাম্মদের উদাহরণ অনুসরণ বা অনুকরণ করতে বাধ্য - এটিই সুন্নাত। যদিও অনেক কারণে মুহাম্মদের সহিংসতার কথা কোরআনে রয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে সেসব মানুষের প্রতি তাঁর নৃশংসতার নির্দয় বর্ণনাও আছে যারা তাঁকে এবং তাঁর ধর্মকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। স্পষ্টভাবে এবং সহজভাবে মুহাম্মদকে নিয়ে কেউ কিছু বললে মুসলমানরা হিংস্র হয়ে যায়, কারণ মুহাম্মদ নিজে হিংস্র ছিলেন। চৌদ্দশ বছর আগে তিনি যা সৃষ্টি করেছিলেন, যে হিংস্রতা তিনি শুরু করেছেন তা ততদিন অব্যাহত থাকবে যতদিন আমরা তা অব্যাহত থাকতে দেবো।

মুহাম্মদের সহিংসতার প্রতি টান ছিল অস্বাভাবিক এবং তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন। এটা আসলে নিরূপণ করা কঠিন কিছুও নয়। তিনি আক্রান্ত ছিলেন মৃগীরোগে, যা টেম্পোরাল লোব (মানব মস্তিষ্কের একটা বিশেষ জায়গা) থেকে উত্থিত। এই রোগের সাথে প্যাথলজিক্যাল এবং সাইকোলজিক্যাল বিষয় যুক্ত হয়ে তাঁকে একপ্রকার ঐশ্বরিক যোগাযোগের অনুভূতি প্রদান করতো। যার ফলে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তিনি যা-ই করেন না কেন, ঈশ্বরের সরাসরি নির্দেশ পেয়েই তিনি তা করছেন। তিনি তাঁর প্রভুর প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন।

তিনি যে মৃগীরোগে আক্রান্ত ছিলেন তাঁর প্রমাণ মূল জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যায়। যেমন: মাটিতে হঠাৎ পড়ে যেতেন, তাঁর সামনে আলোর মতো কিছু দেখতে পেতেন এবং তিনি যেদিকেই তাকাতেন সেটাকে দেখতে পেতেন, মুখ দিয়ে ফেনা বের হতো, খিঁচুনি উঠত ইত্যাদি। এইগুলো সবই আসলে মৃগী রোগেরই লক্ষণ। এমনকি সে সময়েও তাঁর আশপাশের মানুষরা মনে করতেন যে, তাঁর উপর শয়তান ভর করেছে - যেটা আসলে প্রাচীন মৃগীরোগের ধারণা (তারা যেহেতু সেই আমলে এই রোগের নাম জানত না)। মুহাম্মদের স্নায়ুবিক জটিল অভিজ্ঞতা তাঁকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করত যে, ঈশ্বর তাঁর সাথে কথা বলেছেন। তিনি মানসিকভাবে মোটেই স্বাভাবিক ছিলেন না। আর এটা হয়েছিল তাঁর শৈশব তথা জীবনের শুরুর দিকে ঘটে যাওয়া নানান দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার ফল হিসেবে, যা তিনি বেছে নেননি; বরং তাঁর উপর আরোপিত হয়ে গিয়েছিল।

তাঁর শৈশবের শুরুর দিকটা এ বইয়ে উম্মোচন করা হয়েছে। এটা সহজেই বোধগম্য যে, তিনি মানসিক সমস্যা ও স্নায়বিক বৈকল্যের শিকার ছিলেন, আর পরবর্তীতে নিজেই একজন নিপীড়ক হয়ে ওঠেন। যদিও তাঁর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পরিভাষা আছে; তবে ‘মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত’ এই অভিধায় সবটা ব্যাখ্যা করা যায়। তাঁর ব্যক্তিত্ব বিপজ্জনকভাবেই ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তাঁকে নবী হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় যিনি প্রতি মিনিটে একজন একজন করে একাধারে প্রায় ৯০০ জন পুরুষ এবং বালকের শিরশ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং এই হত্যাযজ্ঞ একটানা পনেরো ঘন্টা ধরে চলতে থাকে। এমন একজনকে ‘মানসিক বিকারগ্রস্ত’ বলা ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি?

তাদের (সেই ৯০০ লোকের) হাতগুলি পিঠের পেছনদিকে বেঁধে একটি খাদের কিনারায় টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। মুহাম্মদের প্রথম দুই চাচাতো ভাই একের পর এক মাথাগুলো কেটে ফেলছিল এবং মুহাম্মদ বসে বসে তা দেখছিলেন। যারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের জন্য তিনি ছিলেন একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনি, একজন নিষ্ঠুর এবং হৃদয়হীন মানুষ, সংক্ষেপে সাইকোপ্যাথ তথা বিকৃত মানসিকতার মানুষ! তাঁর শারীরিক (মৃগীরোগ) এবং মানসিক বিকারগ্রস্ততা (সাইকোপ্যাথ) পরস্পরের সাথে মিশে গিয়ে যমজ ভাইদের মতো অবস্থা হয়েছে, যাদের কখনোই আলাদা করা যায় না। তাঁর মৃগীরোগের অভিজ্ঞতা তাঁকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে, ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁর সাইকোপ্যাথিক আচরণ তাঁকে প্রভাবিত করেছে এমন লোকদের হত্যা করতে, যারা তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছে। তিনি যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন তা ছিল তাঁর ধর্মের প্রতিষ্ঠার পেছনে সাফল্যের চাবিকাঠি, আবার এই ধর্ম ছিল তাঁর মৃগীরোগের বিভ্রমেরও ফসল। এ বইটিতে পঁচিশটি নৃশংসতার উদাহরণ আছে, যা ইসলামের মৌলিক আদিগ্রন্থ থেকে নেয়া। এদের অর্ধেকটায় মুহাম্মদের নৃশংসতার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে।

মুসলমানদের উপর তাদের নবীকে ‘চিত্রিত’ করার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এবং এটা সহজেই বোঝা যায় কেন এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে যেসব সত্য তথ্য পাওয়া যায় বস্তুত তা ভয়াবহ, এবং তাঁকে যদি “চিত্রিত” করা হয় তাহলে সেটা অনেকটা প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দেয়ার মতোই হবে; অসংখ্য মস্তকবিহীন মানুষের মৃতদেহ দিয়ে যে বাক্সটা ভরপুর। যদি কারো আগে থেকে কিছু জানা নাও থাকে, সেই চিত্রায়ণ ও তাঁর নিচের দেয়া বর্ণনা পড়েও সঠিক ইতিহাস অনুধাবন করা যায়। তারপরও, পুরো বইটির সব অধ্যায় আর সেগুলোতে দেয়া পাদটিকাসমূহ পড়া থাকলে বুঝতে আরো সুবিধা হবে।

ইসলামের আদি গ্রন্থে উল্লিখিত শব্দাবলী সম্পর্কে কিছু পর্যবেক্ষণ :

অনেক শব্দ, যা সাধারণত মুহাম্মদ সম্পর্কে ওই বইগুলোতে আছে তা বাদ দেয়া হয়েছে এ বইটায়, উদাহরণস্বরূপ – ‘নাজিল’ শব্দটি। এ শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয় - আল্লাহ মুহাম্মদের কাছে কোরআন আয়াত ‘নাজিল’ করেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর কাছে আয়াত ‘প্রেরণ করতেন’। এই শব্দের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সেই বইয়ের লেখক বিশ্বাস করেন আল্লাহ মুহাম্মদের

কাছে আয়াত পাঠাতেন, মুহাম্মদ ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এটা অবশ্যই বোগাস! সত্যিই যদি কোন ঈশ্বর কোরআনের মতো গ্রন্থ মুহাম্মদের মতো একজন দুর্ধর্ষ খুনির কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হতেন, তাহলে তাঁর সকল সৃষ্টিরা বিদ্রোহে জেগে উঠত। তাই আমি মুহাম্মদকে কোরআনের 'রচয়িতা' বলাটাকেই বেশি উপযুক্ত মনে করি। তিনি আয়াত 'রচনা' করেছেন, সুতরাং তিনিই এর 'রচয়িতা'। কোরআন ছিল তাঁর হাতের কাজ, তাঁর নিজেরই রচনা।

আরও কিছু শব্দ আছে যা বাদ দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটো শব্দ হচ্ছে 'ইসলাম' এবং 'মুসলিম'। ভূমিকা, উদ্ধৃতি, মূল বই এবং অধ্যায়সমূহের নোটে বইয়ের শিরোনাম ছাড়াও, অন্য সব জায়গায় এই শব্দগুলিকে সতর্কতার সাথে এড়িয়ে চলা হয়েছে। কারণ এই শব্দগুলো একটা মিথ্যা ধারণা দেয়। ইসলাম মানে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। যেটি মিথ্যা তা হলো, মুসলিমরা কখনো ঈশ্বরের উপাসনা করে না। আপাতদৃষ্টিতে সেটা বোঝা যায় না। তারা উপাসনা করে ঈশ্বর নামের ধারণাটির, আর সেই ধারণাটি মুহাম্মদেরই সৃষ্টি ছাড়া কিছুই নয়।

আর মুহাম্মদ কে ছিলেন?

একজন মৃগীরোগী, একজন মানসিক বিকারগ্রস্ত, একজন মানুষ যিনি ঠাণ্ডা মাথায় নয়শত পুরুষ এবং ছেলেকে হত্যা করেছেন। তিনি মানবতাবিরোধী অপরাধী বলে গণ্য। **তাঁর আনীত ঈশ্বরের ধারণাটা ছিল মূলত মুহাম্মদ নিজেই, যার সকল কর্মকাণ্ড ছিল তারই প্রতিফলন**। তিনি হিংস্র এবং অসহিষ্ণু ছিলেন; তাঁর আল্লাহও ছিলেন হিংস্র এবং অসহিষ্ণু। **তাঁর ভেতরে ঘৃণার একটা গলিত লাভার কুন্ডলী জ্বলছিল; তাঁর আল্লাহ তা'আলা তা দিয়ে অগ্ন্যুৎপাত করাতেন।** তিনি নিজেকে মহাজাগতিক পর্দায় প্রদর্শন করতেন এবং প্রতিবিম্বর ছবিটিকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

'মুসলিম' শব্দটির সাথেও একই সমস্যার উদ্ভব হয়। অর্থাৎ মুসলিম সেই ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ করে। এই দৃশ্য সর্বত্র দেখা যায় যে, মানুষ মাথানত করছে এবং মাটিতে মাথা ঠুকছে। তারা মনে করে যেন তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে, কিন্তু তারা প্রতারিত হচ্ছে। তারা যেই আল্লাহর প্রার্থনা করে তা একজন মৃগীরোগী, একজন গণহত্যাকারী দ্বারা প্রণীত একটি 'ঈশ্বর ধারণার' প্রবর্তক মাত্র।

এ বইটিতে এই ধরনের শব্দগুলো লেখক যথেষ্ট সতর্কতার সাথে এড়িয়ে গিয়েছেন, তাতে এসবের ব্যবহার যতই অজ্ঞাতসারে হোক না কেন, কারণ এই শব্দগুলো ব্যবহার করা মানে তাদের মিথ্যা ধারণাগুলোকেই সমর্থন করা। যদিও মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদতন্ত্র (Muhammadanism) পুরাতন শব্দ হয়ে গেছে এবং কেউ ব্যবহার করে না। কিন্তু এগুলোই আসলে সঠিক শব্দ, যেমন যীশু যা সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে সম্পর্কিত খ্রিস্টান ও খ্রিস্টধর্ম বলা, অথবা বুদ্ধ যা অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাঁর জন্য বৌদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি। পরিশেষে, এ বইটিতে 'মুহাম্মদ যা সৃষ্টি করেছে' তার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উৎস এবং ঘটনার ক্রম তুলে ধরা হয়েছে।

'সবটুকুই মুহাম্মদ' - এ বইটি মূলত একটি অভিযোগপত্র, বিশেষ করে মুহাম্মদ যে মানবতাবিরোধী অপরাধসমূহ সংঘটিত করেছেন তার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগপত্র এবং এই অভিযোগুলোর সবই ইসলামের আদি উৎস দ্বারা সমর্থিত। এ বই ইতিহাসের সকল ডটগুলোকে একত্রিত করবে। এটা দেখায় কেন মুহাম্মদ যা সৃষ্টি করেছেন তাঁর অনুসারীরাও তাই করে। কেন আপনি এই বইটা পড়বেন? রক্ত, আপনার অথবা পরবর্তী বংশধরের ঝরতে পারে, এই কারণে। সারা পৃথিবী জুড়ে যারা তাদের প্রভুকে অনুসরণ করে, যারা তা করে না, তাদেরকে ওরা হত্যা করতেই থাকবে।

সিরিয়া এবং ইরাকে খৃষ্টান, ইয়াজিদি ও অন্যদের হত্যা শুরুর আগের সময়ের কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি তিরিশ মিনিটে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও একজন মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছে। যারা হত্যা করছে তারা মগজধোলাইয়ের ফলে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ মুহাম্মদকে নির্দেশ দিয়েছেন সেসব মানুষকে হত্যা করতে যারা ইসলামের প্রথম স্তম্ভ "ঈশ্বর একজনই এবং মুহাম্মদ হচ্ছেন তাঁর বার্তাবাহক" এটি উচ্চারণ করতে অস্বীকার করে।

মধ্যপ্রাচ্যের চিত্র পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, সেখানকার হত্যালীলা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে, এবং আগের চেয়েও এটি দিনকে দিন বাড়তেই থাকবে। ওরা আপনাকে এবং আপনি যা কিছু বিশ্বাস করেন তাঁর সবকিছুকেই হুমকি দেবে যতক্ষণ না আপনি এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

এ বইটি আপনার জন্য দিকনির্দেশনামূলক। বইটি লেখার উদ্দেশ্য এই নয় যে, পাঠক মাথা নাড়িয়ে "কী ভয়ানক, কী জঘন্য!" বলবে আর তারপর পাশ কেটে চলে যাবে। বরং এটি আপনাকে প্রতিকারের উপায় বলে দেবে। এটি আপনাকে কিছু করার জন্য সাহায্য করবে। হয়তো মুহাম্মদ যা সৃষ্টি করেছেন তা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে। এটা খুবই অন্যায় যে, যা কিছু অন্যায্য তাকেই ন্যায্য বলে দাবি করে তাকেই গর্বের সাথে স্মরণ করা। (মুহাম্মদের) এই ধর্মটি সহিংসতার দ্বারা ছড়িয়েছে, কারণ এটি ছাড়া তার সফল হওয়ার আর কোন উপায় ছিল না; এবং এটি সহিংসতার মাধ্যমেই চলতে থাকে, কারণ এছাড়া একে টিকিয়ে রাখার আর কোনও উপায় নেই। তবে হ্যাঁ, আপনাকে সহিংসতা সহ্য করতে হবে না। আপনাকে এর শিকারও হতে হবে না (যদি আপনি সঠিক পদক্ষেপ নেন)।

মুহাম্মদ ইতিহাসের আলোকপ্রাপ্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করেননি, যেমনটা মুসলিমরাা দাবি করে। তিনি পৌরাণিক কুয়াশার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের অধ্যায়গুলি মিথ্যার কুয়াশায় ঢাকা। আপনি যদি এই কুয়াশাকে উড়িয়ে দিতে পারেন তাহলে আপনি যুক্তি ও জ্ঞানের আলোক উন্মোচন করতে পারবেন, আর তাঁর সৃষ্টি করা ধর্মেরও বিনাশ হবে। ইতোমধ্যেই এটি কিছুটা হলেও শুরু হয়েছে, কিন্তু তা ত্বরান্বিত করার প্রয়োজন। বইয়ের শেষাংশে এর পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা আছে। মুহাম্মদের আসল চরিত্র সেখানে উন্মোচন করা হবে। এ বইটি ইতিহাসের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক চরিত্র ও একজন অশুভ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এমন সত্য উন্মেচন করবে এবং এমন একটা পন্থা বাতলে দেবে যা স্পষ্ট করবে, তিনি কি সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁর ব্যাপারে আমাদের কি পদক্ষেপ করা উচিত।

অনুবাদকের অনুভূতি

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত এবং একইসাথে সবচেয়ে বেশি নিন্দনীয় মানুষ সম্ভবত মোহাম্মদ - ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ। এ বইটি তাঁরই জীবনের সকল ঘটনাবলী দিয়ে সাজানো। এ বইটি পড়ে "কী ভয়ানক! কী জঘন্য!" বলে আপনি পাশ কাটিয়ে যাবেন সে সুযোগ হয়তো নেই, যে কথাটা লেখক নিজেও তাঁর ভূমিকায় বলেছেন। আমাদের জানামতে শুধু বাংলায় কেন, ইংরেজিতেও মোহাম্মদের জীবন নিয়ে এমন প্রাঞ্জল ভাষায়, এত পুঙ্খানুপুঙ্খ এত রেফারেন্স দিয়ে এবং এত নিরপেক্ষভাবে আর কেউ লেখেনি। সে হিসেবে এ বইটিকে শুধুমাত্র 'মাস্টারপিস' বললেও বোধকরি কম বলা হবে। আমরা চেয়েছিলাম বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে এ বইটি পৌঁছে দিতে এবং দীর্ঘদিনের চেষ্টার পর অবশেষে বইটি আলোর মুখ দেখছে আজ ।

২০২৩ সালের প্রথম দিনই পাঠকের হাতে এমন উপহার তুলে দিতে পেরে সত্যিই ভীষণ আনন্দবোধ করছি। আমরা অনুবাদক দুজনই ভীষণভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদের অতি প্রিয় এম. বিশ্বাসকে। তিনি না থাকলে বইটিকে এত সুন্দর কলেবরে তৈরি করা, বলা চলে প্রায় দুঃসাধ্যই ছিল। বইটিতে মুহাম্মদের জীবনকাহিনীর সাথে মিলিয়ে প্রচুর চিত্র দেয়া রয়েছে, এসব চিত্রের কোনটা মোহাম্মদের কোন কর্মকে ইঙ্গিত করছে, আবার কোনটা তৎকালীন আরবের মানচিত্র সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছে, সে সম্পর্কে ছবিগুলিকে যথাস্থানে বসানো, সূচিপত্র ঠিক করা, যথাযথভাবে সম্পাদনা করা সোজা কথায় এটিকে বই আকারে তৈরি করার কৃতিত্ব এম. বিশ্বাসকে দিতেই হবে।

আবারো ফিরে আসি মূল প্রসঙ্গে। একটু ভাবুন তো, সারা দুনিয়া জুড়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে আত্মঘাতী হামলাকারী মানুষ খুন করছে যারা, কিংবা হঠাৎ ব্যস্ত রাস্তায় অচেনা কাউকে ছুরিকাঘাত করে খুন করছে যারা, কিংবা যে হাজার হাজার উন্মত্ত জনতা আল্লাহু আকবার বলে কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ঘরবাড়িতে বা নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাদের এসব করার কি কোন উৎস আছে? এসব কি কোন অনুপ্রেরণা থেকে উঠে আসছে? তাই যদি না হবে তবে আফগানিস্তানের মসজিদে হামলাকারী, শ্রীলংকার গির্জায় হামলাকারী, লন্ডনের পাতালরেলের হামলাকারী, বার্লিনে ট্রাক নিয়ে হামলাকারী এবং কেনিয়ার নাইরোবির মার্কিন দূতাবাসে হামলাকারী কিংবা ভারতের ২৬/১১ হামলাকারী এদের সবার মধ্যে এত মিল কেন খুঁজে পাওয়া যায়? কেন হামলার সময়ে তাদের সবার মুখে একই রকমের বাণী উচ্চারিত হয়? কেন সবার হামলার ধরনটা একই রকমের বীভৎস হয়? কিসে তাদের একত্র করছে? কিসে তাদেরকে উন্মত্ত বানাচ্ছে? কিসে তাদেরকে অন্যের জীবন হরণ করার জন্য প্রয়োজনে নিজেদের জীবনকেও বিলিয়ে দিতে উৎসাহিত করছে?

আমাদের সন্ধান করতে হবে সেই উৎসটা কোথায়, সেই অনুপ্রেরণাটা কোথায়। কেন বাংলাদেশে, ভারতে, পাকিস্তানে, ইংল্যান্ডে, সোমালিয়ায়, স্পেনে, অস্ট্রেলিয়ায় একদল মানুষ একইরকম আচরণ করছে, একইরকম ভাবে তারা ক্ষিপ্ত হচ্ছে। কেন একদল মানুষ যেখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে ওটা আমার চয়েস, এটা আমার চয়েস এমন বলছে? কেন সেই 'আমার চয়েসটিই' শেষমেষ আর আমার চয়েস না থেকে 'তোমার জন্য আমার চয়েস' হয়ে যাচ্ছে? যে পোশাক ফ্রান্সের মুসলিম নারীদের জন্য তথাকথিত চয়েস হয় সেটি কেন ইরানের মুসলিম নারীদের জন্য আর চয়েস থাকে না? সেটি কেন আফগানিস্তানের, সৌদি আরবের, কাতারের, কুয়েতের এবং তথাকথিত মুসলিম বিশ্বের নারীদের জন্য আর চয়েস থাকছে না?

ঠিক কীসের কারণে ধনকুবের ওসামা বিন লাদেন বিলাসবহুল জীবন পরিত্যাগ করে তাঁর তিনজন স্ত্রীকে নিয়ে আফগানিস্তানের দুর্গম পাহাড়ে সন্ন্যাসীদের মতো কিন্তু সন্ত্রাসকে সাথে নিয়ে আত্মগোপন করে থাকলেন? কেন তিনি কেবলমাত্র মানুষ খুন

করার মিশন নিয়েই নিজের জীবনের সমস্ত চেষ্টা, সাধনা ও মেধা ব্যয় করলেন? আপনি “অমুক দেশ এর পেছনে দায়ী, তমুক দেশ বিন লাদেনকে সৃষ্টি করেছে” এসব কথা বললে সমস্যার কোনদিনই সমাধান হবে না। বিন লাদেন কোনো দেশের সংবিধান পড়ে সন্ত্রাসবাদী হননি। বিন লাদেন সিআইএ, মোসাদ কিংবা কেজিবির হাতে পড়ে সন্ত্রাসবাদী হননি। আপনার বরং খুঁজতে হবে যে, বিন লাদেন কোন বইকে তার প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন? তিনি কোন পুস্তক আত্মস্থ করেছিলেন? তিনি কাকে অনুকরণ করে জীবনযাপন করেছিলেন? তিনি কার মতো পোশাক পরিধান করেছিলেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে এই বইটি আপনার পড়তে হবে। বইটি পড়ার আগে কিংবা পরে আপনার মনে হতেই পারে বইটি ইসলামবিদ্বেষ থেকে লেখা, কিন্তু আপনার ধারণাটি ভুল প্রমাণিত হবে যখন আপনি রেফারেন্সগুলো মিলিয়ে দেখবেন। এখানে যত রেফারেন্স আছে তার সবই প্রায় ইসলামিক বইসমূহ থেকে নেয়া, ইসলামের নবীর অনুসারীদের বই থেকেই নেয়া। ইসলামের অনুসারীদের লেখা সবকিছু তুলে ধরা যদি ইসলামবিদ্বেষ হয় তাহলে ইসলাম-প্রেম কোনটি? যদিও একথা সত্যি যে এ বইটি মুসলিম কিংবা অমুসলিম সকলকে ভালবাসা তথা বিশ্বমানবতার প্রতি ভালোবাসার জায়গা থেকেই লেখক এই বইটি লিখেছেন । আবার একইভাবে আমরা অনুবাদকেরাও সেই জায়গা থেকেই বইটি অনুবাদ করেছি।

ওয়াফা সুলতান তার ‘এ গড হু হেটস’ বইতে বলেছিলেন ইসলামের প্রধান ভিকটিম মুসলিমরাই। আমরা অবশ্য মনে করি ইসলামের প্রধান ভিকটিম মৌলবাদীরা, মাদ্রাসার হুজুররা। ইসলামের প্রধান ভিকটিম সেই মানুষেরাও যারা আল্লাহু আকবার বলে অন্যদেরকে হত্যা করার মধ্যে বেহেস্ত খোঁজে, জীবনের কামিয়াবি বা সফলতা খোঁজে। আর তাই অনুবাদক হিসেবে আমরা দুজন এটিকে উৎসর্গ করছি পৃথিবীর সকল বিশ্বাসী মুসলিমদের জন্য যারা নিজেরাই ইসলামের ভিকটিম।

ঘৃণা বহনের একটি সমস্যা আছে। ঘৃণার বহনকারীকে অন্যেরা ব্যবহার করার সুযোগ পায়। ঘৃণার বহনকারীকে খুব সহজেই পণ্য বানিয়ে ফেলা যায়। ঘৃণার বাহককে খুব সহজে ক্ষিপ্ত করে তোলা যায় এবং বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে খাটানো যায়। আর এজন্যই ঘৃণামুক্ত একটি পৃথিবী আমরা চাই। আর ঘৃণামুক্ত একটি পৃথিবী পাওয়ার জন্যেই পৃথিবীর সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত ব্যক্তি মুহাম্মদের জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে আমাদের জানার প্রয়োজন। যারা বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম কিন্তু মুসলিমরা সন্ত্রাসী তাঁরা এবং যারা বলেন বর্তমান সময়ের মুসলিমরা শ্রেষ্ঠ ধর্মের নিকৃষ্ট অনুসারী তাঁরা দয়া করে এই বইটি পড়ুন। এই বইটি পড়লে হয়তো আপনি সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হবেন তখন হয়তো আপনি বলবেন বর্তমান সময়ে মুসলিমরা নিকৃষ্ট নবীর উৎকৃষ্ট উম্মত। কারণ এখনকার সময়ের বিশ্বাসী মুসলিমরা ইসলামের মধ্যে থেকেও বহুবিবাহ, জিহাদ, ভিন্ন ধর্মের মানুষকে গণহত্যা করে মেরে ফেলা কিংবা খুবই ছোট ছোট শিশুদের বিয়ে করা ও ধর্ষণ করা থেকে বিরত থাকছে । অর্থাৎ ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদের সময়ে যা ছিল তার কৃতকর্মের তুলনায় অনেক কম। উন্মাদনার শুরু কোথা থেকে হয়েছিল বা উন্মাদনার গুরু কে সে বিষয়টি আমাদের জানার প্রয়োজন, ঠিক যেমন চিকিৎসা করতে গেলে চিকিৎসকের জানার প্রয়োজন হয় রোগের উৎস কোথায়।

এ বইটিতে ব্যবহৃত কিছু শব্দ ও পরিভাষা সম্পর্কে আলোকপাত করা জরুরি। মুহাম্মদের নামের কয়েকটি বানান হয়, আমরা এখানে মুহাম্মদ বানানটাকে ব্যবহার করেছি। কোরান/কোরআন দুটো বানানই চলে। বইটিতে ঈমানদারগণ, মুমিন, বিশ্বাসী, মুসলিম, সাহাবি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ এবং পার্থক্য জেনে নেয়া জরুরি। ঈমানদার এবং মুমিন মূলত একই অর্থ প্রকাশ করে; অর্থাৎ বিশ্বাসী। আর মুসলিম বলতে এখনকার সময়ের মুসলিম বা যেকোন সময়ের মুসলিম তথা ইসলামের অনুসারীকে বোঝায়। সাহাবি শব্দের অর্থ সঙ্গী। ইসলামিক পরিভাষা অনুযায়ী, মোহাম্মদের এমন অনুসারীদের সাহাবী বলা হয় যারা তাঁকে জীবদ্দশায় দেখেছে, তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মুসলিম অবস্থায়ই মারা গেছে। মক্কার নাগরিকদেরকে কোথাও মক্কান আবার কোথাও মক্কাবাসী বলা হয়েছে। এই বইয়ে ইব্রাহিম এবং আবরাহাম দুটো শব্দকেই

আমরা ব্যবহার করেছি, যদিও ইংরেজিতে আব্রাহাম শব্দটাই আছে। জেনে নেয়া ভালো, আব্রাহাম এবং ইব্রাহিম একই ব্যক্তি; পার্থক্য কেবল ইংরেজি এবং কোরানিক আরবিতে।

পরিশেষে বলি, এই বইটির অপরিসীম গুরুত্বের কথা ভেবে আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও বইটিকে সম্পূর্ন বিনামূল্যে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই বইটি সম্পর্কে আপনাদের আগ্রহ এর কৌতুহলই পারে আমাদের পরিশ্রমকে সার্থক করতে।

মুহাম্মদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ

৫৭০ খৃস্টাব্দ : জন্ম

৫৭৬ : এতিম হন, তার দাদার কাছে বড় হন, এবং তিনি মারা যাবার পর তার চাচা তাকে দেখাশুনা করেন।

৫৯৫ : তাঁর চেয়ে পনের বছরের বড়, একজন ডিভোর্সী নারী খাদিজাকে তিনি বিয়ে করেন।

৬০৫ : তিনি মক্কাবাসীদের চাঁদ মন্দিরকে কাবার আকৃতি দেন, তার ছাদ পুনর্নির্মাণ করতে সাহায্য করেন, তখন থেকে কাবাকে কাবা ডাকা হয় যার অর্থ ‘চতুর্মাত্রিক’।

৬১০ : মৃগীরোগের কারণে এবং তিনি বিশ্বাস করা শুরু করেন আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বলছে।

৬১৩ : সালে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে প্রেরিত আয়াত নিয়ে জনসমক্ষে আসেন।

৬১৫ : মক্কাবাসীদের সাথে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব, ফলে তাঁর কিছু অনুসারী আবিসিনিয়ায় চলে যেতে বাধ্য হয়।

৬১৬ : সালে মক্কাবাসীরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কট আরোপ করে.

৬১৯ : খাদিজা মারা যান। তিনি ছয় বছর বয়সী আয়েশাকে বিয়ে করেন, তিনি প্রচার করা শুরু করেন তাঁকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং আল্লাহর সাথে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। সেখান থেকে তিনি তাঁর অনুসারীদের জন্য দিনে পাঁচবার প্রার্থনা করার নির্দেশ নিয়ে আসেন।

৬২২ : সালে যারা তাঁকে ‘আল্লাহর মনোনীত’ হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। মক্কায় পরিস্তিতি খারাপ হওয়ায় তিনি ইয়াছরিব (মদিনা) পালিয়ে যান, সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বাহিনী গঠন করেন; এরপর আয়েশাকে ঘরে তুলে নেন।

৬২৩ : সালে তিনি মক্কার বিভিন্ন কাফেলার উপর আক্রমণ শুরু করেন।

৬২৪ : বদরের যুদ্ধ; কবি-সমালোচকদের হত্যা শুরু করেন। ইয়াছরিবের ইহুদিদের গণহত্যা শুরু করেন, কায়নুকা থেকে ইহুদিদের বহিষ্কার এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।

৬২৫ : উহুদের যুদ্ধ; নাদির (বা নযীর) গোত্রের ইহুদিদের বহিষ্কার এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন ।

৬২৭ : খন্দকের যুদ্ধ; বনু কুরাইজার ইহুদিদের গণহত্যা করেন ।

৬২৮ : হুদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হয়; খাইবার বিজয়।

৬২৯ : মক্কায় পলিথিয়েস্ট আচার-অনুষ্ঠানকে অব্রাহামের চর্চা বলে রিব্রান্ড করেন।

৬৩০ : মক্কার বিজয়; হুনাইনের যুদ্ধ; তায়েফ বিজয়; তাবুকে অভিযান।

৬৩১ : তায়েফবাসীর আত্মসমর্পণ।

৬৩২ : মক্কায় শেষ হজ্ব পালন, পলিথিয়েস্টদের আরাফাত, মুজদালিফা ও মিনায় পলিথিয়েস্টদের সূর্যদেবতার পূজাকে আব্রাহামিক ধর্মের রীতি বলে ইসলামে সংযোজন করেন।

৬৩২ : মুহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেন।


ARABIAN PENINSULA in A.D. 600
N
BYZANTIUM
PERSIA
MEDITERRANEAN SEA
DAMASCUS
BOSRA
JERUSALEM
GAZA
DEAD SEA
HIRA
MUTAH
DUMA
NAFUD
(SAND DUNES)
TABUK
NAJD
DESERT
FADAK
KHAYBAR
HIJAZ
YATHRIB (Medina)
PERSIAN GULF
YAMAMA
YANBU
BADR
MECCA
JEDDA
TAIF
RED SEA
EMPTY QUARTER
(SAND DUNES)
NAJRAN
YEMEN
MARIB
SANA
HADRAMAUT
AKSUM
ABYSSINIA
ARABIAN SEA


TRIBES OF ARABIA in A.D. 600
N
BYZANTIUM
PERSIA
MEDITERRANEAN SEA
The Ghassanids
The Lakhmids
Kalb
Judham
NAFUD
(SAND DUNES)
Tai
Bakr
NAJD
DESERT
Udhra
HIJAZ
Ghatafan
Hanifa
PERSIAN GULF
Aws and Khazraj
(YATHRIB)
Tamim
Juhayna
Sulaym
Kilab
Khuza
Quraysh
(MECCA)
Hawazin
Lihyan
Hudhayl
Kinana
Daws
Azd
EMPTY QUARTER
(SAND DUNES)
RED SEA
Khatham
YEMEN
Kinda
HADRAMAUT
ABYSSINIA
ARABIAN SEA

সূচিপত্র

পর্ব – ১

গুহা

অধ্যায় - ১
পবিত্র স্থান

হিজাজের আকাশ ছিল ধবধবে সাদা, আকাশের দিকে তাকালে মনে হচ্ছিল রাতের আকাশে আগুন জ্বলছে। হঠাৎ মরুবাসীরা দেখল, তলোয়ারের মতো ঝকঝকে একগুচ্ছ আলো যেন আকাশ থেকে নিচে পড়ছে এবং মুহূর্তের মধ্যে সেই আলো পাহাড়ের পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। মরুবাসী সেটি বিস্ময় নিয়ে দেখলো। দিনের বেলায় মরুবাসীরা সবসময় তাদের উট ও ছাগলের জন্য খাদ্য এবং জলের খোঁজে বের হয়, কিন্তু রাতে তাঁরা গোলাকৃতি হয়ে আগুন জ্বালিয়ে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত। বিভিন্ন গল্প থাকলেও তাদের গল্পের প্রধান বিষয়বস্তু থাকত দেবতা/সৃষ্টিকর্তা। তাদের দেবতাদের অস্তিত্ব ছিল সর্বত্রই - পাথরের গায়ে, গাছের বাকলে; এমনকি পাহাড়ের গায়েও দেবতারা থাকত। কিন্তু তাদের কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল রাতের আকাশের চাঁদ - সাতটি উজ্জ্বল বস্তু জ্বলজ্বলে নিস্তব্ধতার চারপাশে ঘুরপাক করছিল। চাঁদ ও তারাকে তাঁরা তাদের শাসক মানতো। যদিও মরুবাসী এর আগেও বিচ্ছুরিত আলো দেখেছেন, কিন্তু এবারের আলোটা ছিল অনেক বেশি উজ্জ্বল!

মরুবাসীরা বিশ্বাস করত, দেবতারা প্রায়ই জিনদের তাড়া করতে এই ধরনের জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড ছুঁড়ে মারে যাতে মরুভূমিতে বসবাসরত মানুষদের উপর জিনরা কেউ প্রভাব ফেলতে না পারে, কিন্তু এবারের আলোর উজ্জ্বলতা দেখে তারা বিশ্বাস করতে থাকে, এটি নিশ্চয়ই ভালো কোন কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে!

ভোরের আলো ফোটার আগেই যাযাবররা পেছনে পশুপাল নিয়ে উটের পিঠে চড়ে ঐ পাহাড়ের দিকে রওনা দেয় যার পেছনে আলো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। যেতে যেতে এক উপত্যকার সামনে তাঁরা পৌঁছে যায়, যেখানে ছিল অনেক কন্টকযুক্ত গাছ। জলের অভাবে গাছগুলো বড় হয়নি। ঝোপঝাড়ের মতো অবস্থা হয়েছে। সেখানে তাদের ছাগল থামিয়ে নারী এবং শিশুরা বেরি ফল সংগ্রহ করা শুরু করে।

পুরুষেরা তাদের উটগুলোকে আরো একটু দূরে নিয়ে যায়, যেখানে আকস্মিক বন্যার কারণে একটা মৃতপ্রায় নদীর মতো তৈরি হয়েছে। হঠাৎ এক যুবক উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠল এবং তাঁর চিৎকার শুনে লোকেরা ছুটে এলো। তারা দেখতে পেল নদীর পাড় থেকে মাত্র বিশ কদম দূরে কালো রঙের একটা পাথর অর্ধেক মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে। তাদের মধ্যে কেউই এই পাথরকে স্পর্শ করার সাহস পেল না। তাদের মধ্যে থেকে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোক কাঁপতে কাঁপতে পাথরটিকে স্পর্শ করেন। লোকটি দেখতে ছিলেন ধূসর দাড়িওয়ালা, মাথায় কালো পাগড়ি পরিহিত, আর শরীরের পোশাক ছিল কোমর পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর কোমরে গোজা ছিল একটা ছুরি। পাথরটি তিনি হাতে তুলে নিয়ে বাকিদের আদেশ দিলেন তাঁরা যেন তাদের নিজেদের সমান উঁচু একটা স্তম্ভ তৈরি করেন। অতপর পাথরটিকে তার উপরে রাখা হলো। এবার তিনি তাঁর সহযাত্রীদের একত্রিত করলেন এবং নির্দেশ দিলেন স্তম্ভটিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করতে। সাধারণত আরবরা যদি কোন জিনিস আকাশ (বেহেশত) থেকে প্রাপ্ত মনে করতেন তাহলে তাঁরা এভাবেই প্রদক্ষিণ করতেন। প্রতিটি প্রদক্ষিণের পরই সবাই চিৎকার করে বললেন, '"হে প্রভু আমরা আপনার সেবায় নিয়োজিত! আমরা আপনার সেবায় নিয়োজিত!"

নবী মোহাম্মদের জন্ম হয়েছিল মক্কায়, এই মক্কা নামটি আসলে কোথা হতে এলো এটা যদিও নিশ্চিত কোথাও উল্লেখ নেই, তবে কারো কারো ধারণা এটি ইয়েমেনি ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ 'পবিত্র স্থান' (১)। এই কালো পাথরের কারণে মক্কা পবিত্র স্থান বলে গণ্য হয়, তাই এখানে সহিংসতা নিষিদ্ধ ছিল। আরবের পশ্চিমে গোত্রে-গোত্রে যেই অন্তঃকলহ বিদ্যমান ছিল তা থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য এই ধরণের পবিত্র স্থানের খুবই দরকার ছিল। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, যদি এই পবিত্র স্থানে তাঁরা সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ে তাহলে দেবতারা তাদের উপর প্রতিশোধ নেবে। তাই কোন গোত্রের কেউ যদি আরেকজনের

প্রতিহিংসার শিকার হয় এবং তা থেকে বাঁচার জন্য মক্কায় আশ্রয় নেয়, তাহলে আর তাঁর উপর কোন প্রতিশোধ নেয়া হতো না, উল্টো আশ্রিত ব্যক্তি তাদের বুড়ো আঙুল দেখাতে পারতেন। তবে পবিত্র স্থানের বাইরে যদি তাঁকে পাওয়া যেত তাহলে আর রক্ষা ছিল না! এই সুরক্ষিত এলাকায় বছরের চারটি মাস ছিল পবিত্র মাস - একটি ছিল বসন্তে এবং শরৎকালের পরপর তিনটি মাস - যখন মানুষ প্রতিশোধমূলক সহিংসতার ভয় ছাড়াই এ জায়গা দিয়ে ভ্রমণ করতে পারতেন। আরবে রক্তের বদলে রক্তের যেই প্রচলন ছিল, সে সময়ে এই পবিত্র চারমাস দূরবর্তী ভূমির মানুষগুলোকে আরবের এই এলাকায় বাণিজ্য পরিচালনা, সাংস্কৃতিক মেলায় অংশগ্রহণ করা এবং মন্দিরে (কাবা) তীর্থযাত্রা করার সুযোগ প্রদান করত। তারা তাদের প্রিয় দেবতাকে পূজা করার জন্য আসতেন, এরমধ্যে ছিল মক্কার এই কালো পাথরও যাকে আবার তাঁরা বিশ্বাস করত সকল দেবতাদের রক্ষক হিসেবে। এটা যদিও অস্পষ্ট যে, পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত মক্কা উপত্যকা কবে থেকে সংকীর্ণ করে হতে শুরু করে এবং কবে থেকে মানুষ সেখানে বসতি স্থাপন করে। পৌরাণিক কাহিনীতে আছে, এই কালো পাথরটি আসলে একটি রত্ন যেটা আল্লাহ সৃষ্টির সময় বেহেশত থেকে আরব উপত্যকায় ফেলেন এজন্য যে, আদমকে বেহেশত থেকে বিতাড়িত করার পর তিনি যেন এই কালো পাথর ঘিরে একটা মন্দির নির্মাণ করতে পারেন। এই কালো পাথর তাঁর জন্য হবে পথের দিশা। মুহাম্মদ কল্পনা করেছিলেন যে, আদম এত লম্বা ছিল যে তাঁর মাথা জান্নাত পর্যন্ত প্রবেশ করে আল্লাহর সিংহাসন দেখতে পেতেন, কিন্তু তিনি যখন এই বেহেশতী পাথর দিয়ে মন্দির নির্মাণ করলেন, তারপর তাঁর আকৃতি হ্রাস পেয়ে ষাট হাতে গিয়ে ঠেকে। সুতরাং এই উপত্যকায় বসবাসকারী সকলেই ছিলেন আব্রাহাম এবং ইসমাইলের বংশধর, অথবা পরবর্তী কিংবদন্তির কারো বংশধর। (২)

ইতিহাসের সংরক্ষিত তথ্য থেকে জানা যায়, আরব উপত্যকার এই অঞ্চলটি যীশুর জন্মের অন্তত দুই শতাব্দী আগ পর্যন্ত জনবসতিহীন, বসবাসের অনুপযোগী অরণ্যই ছিল (৩)। তবে ধারণা করা হয় বেহেশতী পাথরের সন্ধানের পর এই এলাকাটি পবিত্র বলে গণ্য হতে থাকে, আস্তে আস্তে সেখানে বসতি গড়ে ওঠে। কালো পাথরটিকে রাখার জন্য পাথরের স্তূপীকৃত আয়তাকার মন্দির নির্মাণ করা হয়, আর মূল স্তম্ভের একটি কোনায় এই পাথরটিকে রাখা হয়। উপত্যকার বেশ কাছের একটি জায়গায় জলের সন্ধান পাওয়ার পর ছোট কিছু ভ্রাম্যমাণ গোত্রদের দল ধীরে ধীরে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এবং এই পবিত্র পাথরের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে অন্যান্য এলাকা থেকেও পূজারিরা এই পবিত্র স্থানে আসতে থাকেন। তীর্থযাত্রা করতে আসা মানুষগুলো সাতবার এই মন্দিরের কক্ষপথে ঘুরতেন, পাথরে চুম্বন করতেন এবং পশু উৎসর্গ করতেন। যেহেতু প্রতিনিয়ত দূরদুরান্ত থেকে মানুষ আসতে থাকত এই উপাসনা করতে সেহেতু ক্রমশ মক্কা একটি উদীয়মান তারকা হয়ে ওঠে যা আশপাশের অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ঈর্ষার জন্ম দেয়। এক জায়গায় উল্লেখ পাওয়া যায়, ইয়েমেন থেকে আগত একটি দল এই পাথর এবং পবিত্র স্তম্ভকে তাদের এলাকায় নিয়ে স্থাপন করার জন্য আক্রমণ করেন, যাতে তীর্থযাত্রীরা তাদের অঞ্চলে গিয়ে জড়ো হয়। কিন্তু স্থানীয় গোত্রদের একটি জোট তাদের মক্কার উপকণ্ঠে অবরুদ্ধ করে রাখে এবং একটি ভয়াবহ যুদ্ধের পর তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়। (৪)

মক্কার সুনাম যতই বাড়তে থাকে ততই যেন এক গোষ্ঠী জোর করে আরেক গোষ্ঠীর উপর শোষণ করতে চাইতে থাকে। তারপর আরো বৃহৎ গোত্ররা এলো, এবং হয় তারা আগের গোষ্ঠীকে এলাকা থেকে বিতাড়িত করেছে অথবা পূর্ববর্তী সকল গোত্রকে একত্রিত করে শোষণ করেছে। বিভিন্ন গোত্রের যে নাম পাওয়া যায় যেমন – আজদ, (azd), কুদাহ (Qudah), খুজাইমা, কিনানা, ফিহর, মুদার, খুজা, বকর, আসাদ, মাদ, লাখম, দিল এবং আরও অনেক। তাদের সবার মধ্যে একটি জায়গায় মিল ছিল আর তা হচ্ছে, তারা সবাই ইয়েমেন থেকে আগত মানুষদেরই বংশধর। কৃষি এবং বাণিজ্যিক সাফল্যের কারণে যখন তারা জনবহুল হয়ে পড়ে তখন তারা ইয়েমেন থেকে এই অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করে। তবে এদের মধ্যে ব্যতিক্রম মনে হচ্ছে জুরহুম গোত্র। তাদেরকে রহস্যময় গোত্র বলা হতো, যারা খ্রিস্টান ছিল এবং পারস্যের নিপীড়ন থেকে বাঁচতে হিজাজে চলে এসেছিল। মক্কায় থাকাকালীন সময়ে জুরহুম জাতি এই কালো পাথরের উপাসনা করত না। তারা মনে

করত এটা পৌত্তলিকদের উপাসনার জন্য, কিন্তু অবশেষে উদীয়মান খুজা গোত্র এই জুরহুম জাতিকে তাড়িয়ে দেয়। জুরহুমরা মক্কা থেকে চারশত মাইল দক্ষিণে ইয়েমেনের শহর নাজরানের আরেকটি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দেয়। (৫)

খুজা গোত্রই প্রকৃতপক্ষে মক্কার চেহারা পাল্টে দিয়েছিল। কথিত আছে যে, এই গোত্রের কিংবদন্তী নেতা আমর ইবনে লুহাই (Amr Ibn Luhayy) আনুষ্ঠানিকভাবে নাবাতাইন (যা বতর্মানে দক্ষিণ জর্ডান অঞ্চল) থেকে মানবসদৃশ চন্দ্রদেবতা হুবালের মূর্তি নিয়ে আসেন এবং মক্কার এই পাথরের মন্দিরকে চাঁদের মন্দির হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেন।

লাল রঙে রাঙিয়ে এক ধরনের রাজকীয় চেহারা প্রদান করা হুবালকে গণ্য করা হতো যুদ্ধে বীরত্ব এবং বিজয়ের প্রতীক হিসেবে। হুবাল দেবতাকে মনে করা হতো সময় নিয়ন্ত্রক এবং ভবিষ্যদ্রষ্টা হিসেবে। হুবালের এক হাতে একধরণের ঐশ্বরিক তীর ধরা থাকত। প্রতি বছরই একজন পুরোহিত এই তীরটি মাটিতে নিক্ষেপ করতেন এবং তীরটি যেভাবে মাটিতে পড়ত তার উপর ভিত্তি করে পুরোহিত ভবিষৎ বাখ্যা করতেন। আমরের হুবালকে মন্দিরের দেয়ালের আয়তাকার স্তম্ভমূল তৈরি করে তার ভেতরে বসানো হয় এবং এই মূর্তিটি মুহাম্মদের সময়ের আগ পর্যন্ত ধাপে ধাপে উন্নতির মধ্য দিয়ে গিয়ে এটিই মন্দিরের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। আগে কখনও বিশ্বাস করা না হলেও, এরপর থেকে তারা বিশ্বাস করতে থাকে যে, চাঁদ থেকে খসে এখানে এসে পড়া গোলাকার কালো পাথরটি চাঁদ দেবতা হুবালেরই উপহার।

মক্কা উপত্যকার চেহারা আরেকজন পরিবর্তন করেন, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদের দাদার দাদা দাদা কুসাই (QUSAY)। কুসাই একটি ছোট শহরের বাসিন্দা ছিলেন এবং উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান এবং একই সাথে নিষ্ঠুর। তিনিই আবার খুজা গোত্রকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং মক্কার এই মন্দিরকে অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিণত করেন। কুসাই আসলে মক্কাকে নগর প্রশাসনের রূপ দেন এবং মন্দির-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক স্তম্ভ গড়ে তোলেন। কথিত আছে, কুসাই জন্মগ্রহণ করেন মক্কা উপত্যকায়, কিন্তু বেড়ে ওঠেন সিরিয়ার কাছে থাকা উত্তরের একটি জনজাতির মধ্যে।

কুসাইর পিতা ছিলেন কিলাব যিনি তাঁর জন্মের আগেই মারা গিয়েছিলেন, এবং কুসাইর জন্মের পর তাঁর মা পুনরায় বিয়ে করেছিলেন। নতুন বর তাঁকে এবং তাঁর নবজাতককে তাঁর জন্মভূমি উত্তর আরবে নিয়ে যান। এই এলাকাটি ছিল কুদাহ গোত্রের (qudahs) যাদের পূর্বপুরুষগণ মক্কা উপত্যকার বাসিন্দাদের মতোই ইয়েমেন থেকে এসেছিল।

কুসাইর মা দৃশ্যত কুসাইর পূর্বেকার পরিচয় তাঁর (কুসাইর) কাছে গোপন রেখেছিলেন, সম্ভবত এই ভেবে যে তিনি যেন সৎ পিতা এবং সৎ ভাইদের গোত্রের সাথে মানিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু তা আর বেশিদিন গোপন থাকে না। একদিন কুসাই তার কিশোর বয়সে পাড়ার ছেলেদের সাথে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে এবং সে-ই জয়লাভ করে। তখন পরাজিত ব্যক্তিরা চিৎকার করে বলল, "তুমি আমাদের কেউ না; তুমি তোমার জায়গায় ফিরে যাও। (৬)

কুসাই এই কথা শোনার পর তাঁর মায়ের মুখোমুখি হয়, এবং মায়ের তখন তার পারিবারিক ইতিহাস প্রকাশ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। কুসাই জানতে পারল যে তাঁর আসল পিতা ছিলেন কিলাব, কিলাবের বাবা ছিলেন মুররা (murra), মুররার বাবা ছিলেন কাব, কাব ছিলেন লুয়াইয়ের পুত্র যার বাবা ছিলেন গালিব এবং গালিব ছিলেন ফিহরের পুত্র! এইভাবে কুসাইর মা তার পূর্বপুরুষদের নাম বর্ণনা করতে থাকেন এবং শেষজন পর্যন্ত পৌঁছেন যিনি ইয়েমেনের উপচে পড়া ভিড় ছেড়ে যাযাবরদের জীবনযাপন করতে ইয়েমেন ছেড়ে হিজাজে আসেন।

মা তাকে বলেন যে, তোমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের। সেখানে তোমার সৎ বাবার বংশপুরুষরা ছিলেন সাধারণ গোত্রের এবং দাসদের থেকে এক স্তর উপরে ছিল তাদের মর্যাদা। একথা শুনে কুসাই মক্কায় যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন,

কিন্তু মা তাকে পবিত্র মাস আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন এবং তীর্থযাত্রীদের সাথে ভ্রমণ করতে বলেন। কারণ যুদ্ধবিরতির এই তিনমাসে তার যথেষ্ট সময় থাকবে - যেহেতু এটা তীর্থযাত্রার মাস এবং নিষিদ্ধ মাস, তাই এই তিন মাস দক্ষিণ আরব থেকে তার অঞ্চলে ফিরে আসার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু কুসাই সেখানে যায় ঠিকই কিন্তু সে কখনও আর ফিরে আসেনি। মক্কায় পৌঁছানোর পর, কুসাই এই কালো পাথরের মন্দিরের হুবাল দেবতাকে শ্রদ্ধা জানানোর পরই মক্কার খুজা গোত্রের নেতা হুলায়লের (hulayl) কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করে।

কুসাই ছিলেন শারীরিকভাবে চিত্তাকর্ষক, বুদ্ধিমান এবং উচ্চাভিলাষী। যেহেতু তিনি জন্মগতভাবেই একজন নেতৃত্বগুণ সম্পন্ন মানুষ, তাই এই উপত্যকায় ঢুকেই তিনি তাদের অভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর এই চিত্তাকর্ষক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সকল বিষয়ে তাঁর মতামতকে হিজাজবাসী গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতেন এবং দ্রুতই তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন। কুসাইর শ্বশুর মারা যান, এবং মৃত্যুর পর কুসাই তাঁর গোত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে ইসলামের আদি গ্রন্থে তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের ব্যাপারে দুই ধরণের তথ্য পাওয়া যায়। যাতে লেখা, প্রথমে কুসাইর শ্বশুর তাঁর মদ্যপ পুত্র আবু গুবশান (abu Gubshan) এর উপর মনক্ষুণ্ণ হয়ে কুসাইর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। তবে সম্ভবত কুসাই নিজে ক্ষমতার জন্য তাঁর মদপ্রেমী শ্যালকের বিরুদ্ধে একটি সেনা অভ্যুত্থান মঞ্চস্থ করেন। অতিরিক্ত মদ্যপানই তাঁর একমাত্র সমস্যা ছিল না, বরং নেতৃত্বদানেও তিনি ছিলেন অপারদর্শী। তাই তাঁকে কেউ গোনায় ধরত না। হুলায়লের সময়কালে স্থানীয় গোত্র এবং তীর্থযাত্রীরা মন্দিরে উপাসনা করে কোন অনুদান প্রদান না করে ফিরে যেতে পারতেন না, কিন্তু এখন তারা অনুদান না দিয়ে চলে যাচ্ছেন। এজন্য কুসাই তীর্থযাত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি একরাতে তাঁর শ্যালককে মাতাল করে নৃত্য, মদ, বাদ্যযন্ত্র (LUTE) এবং কয়েকটি উটের বিনিময়ে ক্ষমতা ক্রয় করে এই মন্দিরের নিয়ন্ত্রণ তাঁর শ্যালকের কাছ থেকে নিয়ে নেন। পরদিন দুজনই এই ভাবনা নিয়ে জেগে ওঠে যে, কে নেবে ক্ষমতা। আবু গুবশানের দায়িত্ব পড়ে খুজা জাতির কাছে নিজেকে ব্যাখ্যা করার, এবং কুসাইর দায়িত্ব হলো খুজাদের মধ্যে কেউ যদি তাঁর ক্ষমতা মেনে না নিয়ে বিদ্রোহ করে ওঠে তাঁকে দমন করার। কুসাই যেকোনো ধরনের ষড়যন্ত্র গুড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। আরবের কিছু কিছু গোত্রের সমর্থন তিনি পান। তিনি তাঁর সৎ ভাইদেরকে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে নিজের কাছে ডেকে পাঠান, যাতে তাঁর দিকেও সংখ্যা বাড়তে থাকে।

যুদ্ধ প্রস্তুতি চলতে থাকে এবং খুজারা ছিলেন সংখ্যায় বেশি। কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, কুসাইর সৎ ভাইয়েরা তিনশত যোদ্ধা নিয়ে মক্কার দক্ষিণ দিকে রওনা দেয়, আবার কোথাও পাওয়া যায় সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। কুদাহ গোত্রের এই লোকেরা (কুসাইয়ের সৎ ভাইয়েরা) অবশ্য ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও তীর্থযাত্রীদের বেশ ধরে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। উল্লেখ আছে, কুসাই প্রথমে সূর্য-পুজারি তীর্থযাত্রীদের মাঝে মিশে যাবার পরিকল্পনা করেন, তারপর সেখান থেকে প্রতিরোধ সংগঠিত করে খুজাদের উপর হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন।

সেই সময়ে মূলত দুটি স্বতন্ত্র তীর্থস্থান ছিল, একটি ছিল মক্কার মন্দিরে চাঁদের পূজা, অন্যটি সূর্য দেবতার পূজার স্থান। সূর্যপূজারিদের যাত্রা শুরু হতো মক্কা উপত্যকা থেকে বারো মাইল পূর্বে আরাফাতে। বিস্তৃত উপত্যকার মাঝখানে ছোট একটি পাহাড়ে আরোহণ করে তীর্থযাত্রীরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে এই রহস্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। আস্তে আস্তে যখন সূর্য ডুবতে থাকত তীর্থ দলপতিরা সূর্যকে অনুসরণ করার জন্য তীর্থযাত্রীদের আদেশ দিতেন।

তারা প্রায় দুই ঘন্টার পথ এই সূর্যের পেছনে হেঁটে বা উটের পেছনে উঠে ছুটতেন আরাফাত থেকে পশ্চিমে মুজদালিফার দিকে! এরকম করতে করতে তারা মুজদালিফায় রাতে অবস্থান নিতেন এবং তাঁর পরেরদিন যখন সূর্যোদয় হতো তখন তারা আনন্দ উদযাপন করতেন! অতঃপর সেখান থেকে আরও পশ্চিমে মিনার দিকে রওনা দিতেন, যা মক্কা উপত্যকার সংলগ্ন আরেকটা উপত্যকা। পাথরের স্তম্ভ যেটাকে গণ্য করা হতো দুষ্ট জিনদের আটকানো খুঁটি, তাঁকে লক্ষ্য করে তারা পাথর ছুঁড়ে

মারতেন! পাথর নিক্ষেপ খুব সম্ভবত শয়তানকে উদ্দেশ্য করে পাথর ছোঁড়া বোঝাত। পাথর ছুঁড়ে মারার পর তিনদিন ব্যাপী উৎসব শুরু হতো। সেখানে তাদের প্রিয় সূর্য, চাঁদ বা যেকোন দেবতাদের উৎসর্গ করে পশু কোরবানির আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে সূর্যের তীর্থযাত্রা শেষ হতো। কিছু তীর্থযাত্রীরা চাঁদের পূজা করতে মক্কায় যেতেন, কেউ কেউ আবার উটে চড়ে বাড়ির দিকে রওনা দিতেন। মক্কায় অবস্থিত চাঁদ মন্দিরের কিছু ভক্ত ছিল, আর তারা সবাই সূর্য দেবতার উপাসনালয়ে অংশগ্রহণ করত না। কিন্তু সম্ভবত সেখানে অনেক মানুষ ছিল যারা আনন্দের সাথে উভয় তীর্থযাত্রায়ই অংশগ্রহণ করতেন ।

কুসাইর অভ্যুত্থান শুরু হয় ঐতিহ্যগতভাবে সূর্য দেবতার উপাসক তীর্থযাত্রীদের উপর কর্তৃত্বকারী গোত্রের আধিপত্য ছিন্ন করার মধ্য দিয়ে। সূর্য দেবতার তীর্থযাত্রীদের দেখভাল করতেন ঐতিহ্যগতভাবে সুফা নামের ছোট বেদুইন গোত্র, যাদের অবস্থান ছিল মক্কার পূর্বে।

তীর্থযাত্রীদের মতো সাদা আলখাল্লা পরে, কুসাইর সৎভাই আর তাদের তিনশো অথবা হাজারখানেক যোদ্ধা মিনা উপত্যকা পর্যন্ত সূর্য তীর্থযাত্রায় অংশ নেয়। আকাবা নামক গিরিপথ দিয়ে উপত্যকায় ঢোকার আগ মুহূর্তে, কুসাইর মক্কাস্থ অনুসারী আর আত্মীয়-যোদ্ধারা তাদের পোশাকের ভেতরে লুকিয়ে রাখা তরবারি বের করে। সুফার নেতাদের উদ্দেশ্যে কুসাই ঘোষণা দেন যে, তিনিই এখন থেকে এটির (তীর্থযাত্রার) দেখভাল করবেন এবং ঘোষণা করেন : "তোমাদের চেয়ে ভালো (তীর্থযাত্রা পালন) করার সুনাম ও দক্ষতা আমাদের আছে" (৭)। সুফারা যখন তাদের দাবি মেনে নিতে নারাজ হয়, তখন যুদ্ধ বেধে যায়। কুসাইয়ের বাহিনী বিজয়ী হয়। বিজয়ী হয়ে সেখান থেকে কুসাই মক্কায় চলে যান যেখানে তিনি খুজা গোত্র এবং এর মিত্রদের সাথে যুদ্ধ করেন। তারাও কুসাইয়ের কাছে পরাজিত হয়।

কুসাই মক্কায় পবিত্র মাসে যে যুদ্ধবিরতির নীতি ছিল তা পুরোপুরি লঙ্ঘন করেছেন, কিন্তু তাঁর সমর্থকরা ভেবে নিয়েছিলেন, তাদের দেবতার আক্রোশ তাদের শত্রুদের উপরেই পড়েছে। তিনি খুজা ও তাদের মিত্রদের লোহিত সাগরের উপকূলীয় এলাকায় চলে যেতে বাধ্য করেন, এবং যেই গোত্রগুলো তাঁকে সমর্থন করেছে তাদের জন্য আশপাশের এলাকা বরাদ্দ করেন। তাঁরা তখন তাদের গোত্রের নাম দেন কুরাইশ! এই কুরাইশ শব্দের উৎপত্তি অস্পষ্ট, তবে কেউ কেউ মনে করেন এর অর্থ 'যোগদান', কেননা কুসাই অনেক দূরের সম্পর্ককে একত্রিত করেছিলেন, একই গোত্রের মাঝে (একই গোত্রে রূপান্তর করে)। অন্যরা বিশ্বাস করে যে, এটা হাঙ্গরের থেকে এসেছে, কারণ কুসাই চৌর্যবৃত্তির মতো কূট-রণকৌশল অবলম্বন করতেন।

প্রথমদিকে মক্কাবাসীরা তাঁবু টানিয়ে থাকত। খুজা এবং অন্যান্য পূর্ববর্তী অধিবাসীরা ছিল যাযাবর, যারা পরে একটা স্থায়ী আবাসস্থল গড়ে তুলেছিল। বেশিরভাগই চামড়ার তাঁবুতে বাস করতে সন্তুষ্ট ছিল, কিন্তু তারা তাঁবুর চারপাশে বুক-উঁচু দেয়াল নির্মাণ করত যাতে বালি উড়ে তাঁবুর ভেতরে না ঢোকে। নদীতীরের দুই পাশে মন্দিরের কাছাকাছি অল্প কয়েকটি কাদামাটির স্থায়ী ভবন ছিল। কুসাই প্রথমে রাস্তা নির্মাণ করেন এবং রাস্তা নির্মাণ করতে যা সমানে পান তাই কেটে ফেলেন বা ভেঙ্গে ফেলেন। তিনি তা করতে গিয়ে কাঁটাযুক্ত গাছ কেটে ফেলেছিলেন এবং সবাইকে বললেন, এই গাছগুলোকে নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে ভাল ব্যবহার করলে ভালো হবে, বিশেষ করে ছাদের জন্য ব্যবহার করা যাবে। লোকজন এই কাঁটা গাছগুলোকে পবিত্র বলে বিবেচনা করত, এবং বিশ্বাস করত এদের কাটলে দেবতারা অখুশি হবেন। কিন্তু কুসাই যখন মন্দিরের দেয়ালের সাথে লেগে থাকা গাছও কেটে ফেলেন কিন্তু আকাশ থেকে বজ্রপাত বা অন্য কোনো ঐশ্বরিক শাস্তি তাঁর উপর নেমে আসেনি, তখন লোকেরা তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করা শুরু করে, ওগুলো দিয়ে আস্তে আস্তে ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে থাকে।

কুসাই তাঁর নিজের জন্য মন্দিরের বরাবর একটা বড় ঘর নির্মাণ করেন এবং ঐ অঞ্চলের বিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য একটা বড় সভাকক্ষ তৈরি করেন যার প্রধান দরজাটা মন্দিরের দিকে খোলা থাকত। কালো পাথরের এই মন্দিরের কোন ছাদ ছিল না। মন্দিরের চারপাশে বেশ অনেকটা জায়গা ছিল শুধু একজন মানুষের উপাসনার জন্য। কুসাই তখনকার নির্মাণ

সামগ্রীর ব্যবহার করে দেয়ালটির ঘনত্ব বাড়ান এবং দেয়ালকে আরেকটু উঁচু করেন। তিনি মন্দিরে একটা দরজা লাগান এবং সেখানে একটি তালা লাগিয়ে দেন যার একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকে শুধুমাত্র কুসাইর উপর। যারাই এই মন্দিরের ভেতরে ঢুকে হুবাল দেবতার উপাসনা করবে তাদেরকেই অর্থ দিয়ে ঢুকতে হবে, কারণ এটিই ছিল তাঁর অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি। বাকি যারা ছিলেন তারা সবাই বাইরে প্রার্থনা করতেন, দেয়ালের বাইরে পশু উৎসর্গ করতেন।

তিনি আরো একটি পরিবর্তন করেছিলেন। সূর্য-দেবতার তীর্থযাত্রীদের জন্য মুজদালিফার (পাহাড়ের) উপরে একটি আলোকবর্তিকা জ্বালানোর আদেশ দিয়েছিলেন, যাতে এই আলোতে তীর্থযাত্রীরা চলাচল করতে পারে, যারা মাঝেমাঝে আরাফাতে অন্ধকারে হারিয়ে যেত। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করেন, আর তা হচ্ছে, সূর্য উপাসকদের মক্কায় কালো পাথরকে চুম্বনের মাধ্যমে তাদের তীর্থযাত্রা শেষ করতে বলেন।

তিনি বিভিন্ন গোত্রকে আমন্ত্রণ করেন তারা যেন তাদের প্রিয় দেবতাদের জন্য এই মন্দিরের পাশেই মন্দির স্থাপন করেন, যাতে করে তারা তাদের বার্ষিক তীর্থযাত্রা এই অঞ্চলেই করেন। তিনি তীর্থযাত্রীদের খাদ্য ও জল সরবরাহ অব্যাহত রাখেন। এটিকে তিনি পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন, কিন্তু এর সঙ্গত কারণও ছিল। তীর্থযাত্রীরা যদি ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত না থাকেন, তবেই তো তাঁরা বারবার উপাসনার জন্য আসবেন!

হুবালকে যেহেতু ভাগ্যদেবতা মনে করা হতো তাই অনেকেই আসতেন হুবাল দেবতার কাছ থেকে টাকা দিয়ে মন্দিরে ঢুকে পরামর্শ নেয়ার জন্য। জলের জন্য বিভিন্ন কূপ থেকে জল তুলে রাখা হতো। কুসাই গবাদিপশুর উপর করারোপ করেন, যার মানে হচ্ছে গবাদি পশুর একটি অংশ তীর্থযাত্রা মৌসুমের শুরুতে প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

কুসাইকে একজন ভালো শাসক বলা হতো । তিনি যদিও শক্ত হাতে রাজ্য পরিচালনা করতেন, তবে তাঁর চল্লিশ বছরের শাসনকাল বেশ ভালোই ছিল। শুধুমাত্র ক্ষমতাচ্যুত ব্যক্তিরা বাদে বাকি সবাই তাঁকে ভালোবাসতেন। কুসাই জানতেন কিভাবে শাসন করতে হয়।

চাঁদ মন্দিরের রাজস্বের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ তিনি তাঁর হাতে রাখেন, তীর্থযাত্রীদের জন্য খাদ্য ও জল সরবরাহ করেন, এবং যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতেন। তিনি দক্ষতার সাথে স্থানীয় গোত্রসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোকে ভাগ করে দেন। একটি গোত্র অস্ত্রশস্ত্র এবং সামরিক প্রশিক্ষণের রক্ষণাবেক্ষন করত এবং দূরবর্তী গোত্রগুলির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করত, আর অন্য গোত্রের উপর দায়িত্ব ছিল তীর্থযাত্রীদের দেখভাল করা ও তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। একেবারে বৃদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত কুসাই সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের উপর সভা ও সেখানে সভাপতিত্ব করেন, এবং সমস্যা হলে সমাধান করতেন। যদিও জানা যায় না কিভাবে তিনি কাফেলা ব্যবসা শুরু করেন, তবে এটা সত্য এই কাফেলা ব্যবসার মাধ্যমেই তাঁর বংশধরেরা বিশাল সম্পদের মালিক হয়।

কুসাইর সময়ের লোকেরা উট এবং উটের চালক ভাড়া করতো তাদের যাতায়াতের জন্য, এবং যাতায়াতের পথেই স্থানীয় মানুষেরা এই উট-কাফেলাকে সেবা প্রদান করতেন। মক্কায় কৃষিকাজের জন্য পর্যাপ্ত জল ছিল না, সুতরাং তাদের খাদ্যশস্য অন্য অঞ্চল হতে রপ্তানি করতে হতো। খেজুর আসত ইহুদিদের কৃষিভূমি ইয়াছরিব এবং খাইবার থেকে, শাকসবজি এবং ফলমূল আসত মক্কা থেকে সত্তর মাইল পূর্বের একটি অঞ্চল - তায়েফ থেকে। খাদ্য রপ্তানি করতে যেহেতু টাকার দরকার ছিল, তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের কাছে চামড়ার পণ্য এবং উপহার সামগ্রী বিক্রি করা ছাড়া তাদের অর্থ উপার্জনের আর কোন উপায় ছিল না। তাই জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় ছিল কাফেলায় নিম্নস্তরের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে। পরবর্তীতে কুসাইর বংশধরদের মাধ্যমে মক্কার চিত্র বদলে গিয়েছিল।

অধ্যায় ২
পূর্বপুরুষেরা

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে মক্কার বাণিজ্যের জন্য ভালো একটা সময়ই ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই অঞ্চলটি অনেকটাই পরিত্যক্ত থাকার পর আরবের পশ্চিম সীমান্ত হিজাজে কাফেলা বাণিজ্যের মাধ্যমে আবার নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হয়। এই কাফেলার কারণে ইয়েমেন ব্যবসায় অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ছিল এবং আরবের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি উন্নত ছিল। এর ফলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীরা এই অঞ্চলে এসে বসতি গড়ে তোলে যার ফলে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটে! নতুন সহস্রাব্দের প্রথম শতাব্দীতে ইয়েমেনে অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা ধ্বস নামে, যার ফলে এই অঞ্চলের দারিদ্রপীড়িত বাসিন্দারা আরবের দক্ষিণ অঞ্চলে সরে যেতে থাকে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে লোহিত সাগরের জলদস্যুদের হাতে নিয়ন্ত্রণ চলে যায় আর সাগরপথে বাণিজ্য চালুর পর থেকে আরবের কাফেলা বাণিজ্যের পতন শুরু হয়।

এই পতনের কারণ ছিল মৌসুমী বায়ু ও আবহাওয়া সম্পর্কে নাবিকদের সম্যক জ্ঞান না থাকা। তারা লোহিত সাগরের উপর দিয়ে ভারতে যেতে পারতেন, এতে পথিমধ্যে তাদের আর কোথাও থামারও দরকার হতো না। ফলস্বরূপ, আরবের এই ট্রানজিট রুটটি পরিত্যক্ত হয়ে উঠল এবং মরুভূমিতে বালিচাপা পড়ে গেল। আরবের এক সময়ের এই বাণিজ্য-গমন পথটি পড়ে ইতিহাসে স্থান করে নেয়।

দক্ষিণ আরবের অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের আরও একটি কারণ ছিল খ্রিস্টধর্মের উত্থান। মিশরীয়, রোমান, গ্রিক এবং পার্সিয়ান এই বিখ্যাত সভ্যতাসমূহের ব্যবসায়ীরা নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনার বিনিময়ে পৌত্তলিক পূজা-অর্চনার উপকরণ হিসেবে ইয়েমেন থেকে বিশেষ এক ধরণের সুগন্ধি ক্রয় করতেন, এগুলির সবই উটের পিঠে করে (ইয়েমেনের) উত্তর দিকে পাঠানো হতো। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের বিস্তারের সাথে সাথে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে সুগন্ধীর ব্যবহারকে নিষিধ করা হলো, যার ফলে খ্রিস্টান ধর্মালম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো ঠিকই কিন্তু সুগন্ধির বাজার হ্রাস পেতে থাকলো।

একই সময়ে রোমানরা সমুদ্রের পথকে উন্মুক্ত করে এবং সমুদ্রপথের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যর উপর নিয়ন্ত্রণ নিতে থাকে, যার ফলে ভূ-রাজনীতি এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের রীতিনীতি উভয় ক্ষেত্রেই নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে।

পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে রোমান শক্তি তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছিল, জলদস্যুরা সমুদ্রের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করেছিল। সমুদ্রপথে জাহাজ চালানো বিপজ্জনক এবং ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছিল। একই সময়ে খ্রিস্টানরা আবার ধর্মীয় উপাসনায় ধুপের ব্যবহার শুরু করে এবং ধুপের জন্য সুগন্ধীর বাজারে আবারো বিশাল চাহিদা তৈরি হয়। এবং সেই সাথে রেশমি কাপড় এবং অন্যান্য বিলাসবহুল সামগ্রীর চাহিদা আগের তুলনায় বাড়তে থাকে, তবে বাজারে বিক্রি করতে গেলে পণ্য পরিবহনের জন্য তাদের উটের দরকার ছিল। মক্কাবাসীরা এই পরিবহনের ভবিষৎ দেখতে পেরে এই ব্যবসায় এগিয়ে আসেন। ব্যবসার ভালো ভবিষৎ দেখে পরিবহন ব্যবসার সাথে কুসাইর সন্তানরা যুক্ত হন। তাঁর অসংখ্য নাতি-নাতনিদের অনেকেই এই ব্যবসাকে সাফল্যের সাথে পরিচালিত করেন। সেই সময়ের আরবে অন্যান্য শাসকের মত কুসাই অনেকগুলো বিয়ে করেননি। তাঁর একজনমাত্র স্ত্রী ছিল এবং তাঁদের চার পুত্র ও দুই কন্যা ছিল।

মক্কাবাসী বণিক পরিবারগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভালো করেছিলেন কুসাইর বড় পুত্র মুগিরা আবদ আল মানাফ ইবনে কুসাই (Mughira Abd al-Manaf ibn Qusay)। মুগিরা মানাফ দেবতাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তাঁর চেহারা গোলাকৃতির ছিল এবং সবসময় প্রফুল্ল থাকতেন, এজন্য তাঁর ডাকনাম হয়েছিলেন চন্দ্রমুখী (Moonface)। মুগিরার চার পুত্র সন্তান ছিল :

হাশিম, নওফাল, মুত্তালিব এবং আবদ শামস (সূর্যের দাস)। এই চারজন ভাই-ই মূলত মক্কার কাফেলা বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ছিলেন।

বাণিজ্য পথের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য মুগিরার পুত্রদেরই মক্কাবাসীরা বিশ্বাস করতেন। বাণিজ্য পরিচালনার সকল কর্তৃত্ব তাদের উপর ন্যস্ত ছিল। অন্যান্য অঞ্চলের সাথে বাণিজ্য চুক্তি এবং বাণিজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও তাদের দায়িত্বে ছিল! হাশিমকে পাঠানো হয় সিরিয়ার বাইজেন্টাইন শাসক এবং খ্রিস্টান আরবদের কাছে। নওফাল যান ইয়েমেনের শাসকের কাছে বাণিজ্য চুক্তির জন্য। মুত্তালিব যান আবিসিনিয়ানদের সাথে বাণিজ্য চুক্তি করতে। চুক্তি সম্পাদনের সুসংবাদ নিয়ে মক্কায় ফিরে আবদুল শামস যান আরবের পূর্বের দিকের লোকেদের চুক্তি করতে। এর ফলে মক্কাবাসীদের ইরাক এবং পারস্যের বাণিজ্যিক অঞ্চলে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করে হয়ে যায়। (১)

প্রথমদিকে মক্কাবাসীরা অন্যদের পরিবহনের জন্য পরিবহন সেবা দিয়ে আসছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা যখন অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠল তখন তারা নিজেরাই পণ্যদ্রব্য কেনাবেচা শুরু করল। তারা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিদেশি পণ্য কিনে লাভের জন্য পুনরায় বিক্রয় করা শুরু করে। হাশিম ছিল মুহাম্মদের দাদার নাম, তিনি এত বিখ্যাত ছিলেন যে তাঁর নামেই একটি বংশের নামকরণ করা হয়!

হাশিম নামের অর্থ ‘রুটি সরবরাহকারী’। হাশিমের প্রকৃত নাম আম (Amr), কিন্তু তাঁকে ডাকনামেই ডাকা হতো, যখন থেকে তিনি মক্কাবাসী অনাহারিদের রুটি সরবরাহ করতেন। প্রচন্ড খরায় এই অঞ্চলটি পুড়ে গিয়েছিল। খাবারের অভাব দেখা দিয়েছিল, লোকেরা ক্ষুধার্ত হয়ে মারাও যাচ্ছিল। খাবারের জন্য হাশিম নিজে টাকার নিয়ে বস্তা নিয়ে সিরিয়ায় দিকে রওনা দেন এবং সেখান থেকে উটের তৈরি পরিবহনের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে গম মক্কায় নিয়ে আসেন। মক্কায় ফিরে এসে তিনি গমগুলো অনাহারী মানুষের মধ্যে বিতরণ করেন, এবং মক্কাবাসীরা অনেকদিন পর টাটকা রুটি ভাপে সেদ্ধ উটের মাংসে ডুবিয়ে তৃপ্তি সহকারে আহার করে।

তাঁর এই মহানুভবতা মক্কাবাসীদের যথেষ্ট নাড়া দেয় যার ফলশ্রুতিতে তারা একটা গোত্রের নামই দেন হাশিমী, যার অর্থ রুটি সরবরাহকারী বা ব্রেডমান! তারপর থেকে হাশিমকে তাঁকে সেই নামেই ডাকা হতো। পর্বতীতে তিনি মক্কার নেতা হয়েছিলেন, যদিও তাঁকে ক্ষমতাঁর জন্য নিজের চাচাতো ভাইয়ের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হতে হয়েছিল। সে সংঘাতের জন্য মূলত দায়ী ছিলেন কুসাই নিজে । কুসাই তাঁর চার সন্তানদের মধ্যে শুধু এক সন্তানের কাছেই সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করে, যার নাম ছিল আবদ আল-দার (Abd al-Dar) যিনি মূলত কুসাইর দেখভাল করতেন! কুসাইর অন্য পুত্ররা তাদের বাবার ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখাতে তাঁর সিদ্ধান্তকে মেনে নিলেও তাঁর নাতি-নাতনিরা তাঁর ভাগ চাওয়া শুরু করেন।

যতই সময় গড়াতে থাকে তারা দুটো পক্ষে ভাগ হয়ে যেতে থাকেন - একদল আবদ আল দার বংশের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অধিকারের পক্ষে, আরেকদল বিভিন্ন গোত্রের সদস্য যারা মনে করতেন তারাও ক্ষমতাঁর ন্যায্য ভাগিদার। তারা দাবি করতেন “আমাদেরও নায্য অধিকার আছে”। ঝামেলা নিরসনে এক ভদ্রমহিলা মন্দিরের সামনে একটি সুগন্ধির বাটি এবং একটি রক্তের বাটি রেখে দেন এবং লোকজনকে বলেন, তারা যদি এই সুগন্ধির বাটিতে হাত ডুবান তাঁর মানে তারা হাশিমের নেতৃত্ব স্বীকার করে নিলেন, আর যদি রক্তের বাটিতে হাত ডুবান তাহলে অপর পক্ষের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। যারা এই রক্তের পাত্রে হাত ডুবিয়েছিলেন তাদের সবাইকে পরবর্তীতে রক্তচোষা বলে ব্যঙ্গ করা হতো।

এরপর উভয়পক্ষই ক্ষমতাঁর জন্য পবিত্র সীমানার বাইরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। যখন মাথা কিছুটা ঠান্ডা হলো তারা বুঝতে পারলেন ভাই-ভাইদের মধ্যে একে অন্যকে হত্যা করে কোনো ফায়দাই তারা অর্জন করবেন না। তখন তাদের

মধ্যস্থতা করার জন্য এলাকার একজন খ্যাতিমান লোককে ডেকে আনা হয়। তিনি তাদের মধ্যে দায়িত্ত ভাগ করে দেন। হাশিমকে তীর্থযাত্রীদের খাবার ও জল সরবরাহের দায়িত্ব দেয়া হয়, যার ফলে তিনি পশুপালকদের কাছ করে শুল্ক আদায় করতে পারতেন। আবদ আল দার বংশের উপর পড়ে পৌরবিষয়ের দেখভাল করার ভার এবং বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব; মন্দিরের দ্বাররক্ষীর নিয়ন্ত্রণও ছিল তাদের হাতে, অর্থাৎ তারা মন্দিরের রাজস্ব দেখাশুনা করতেন (২)।

আব্দুল মানাফের পুত্র এবং পরিবারের নেতা হিসেবে হাশিম তাঁর তীর্থযাত্রার দেখভালের দায়িত্ব খুবই আনুষ্ঠানিকতাঁর সাথে পালন করতেন। শরতের পবিত্র মাস আসলেই হাশিম পশুপালকের কাছ থেকে পশুপাল সংগ্রহ করতেন এবং মন্দিরের জন্য বার্ষিক চাঁদা আদায় করতেন। তীর্থযাত্রীরা যখন আসতে শুরু করতেন তিনি হাজার হাজার লোককে খাবার সরবরাহের জন্য পশু জবাই ও রান্নার তদারকি করতেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল বাবুর্চি জোগাড় করা, হাঁড়ি জোগাড় করা এবং আগুনের জন্য কাঠের ব্যবস্থা করা যাতে এই কাজ তিনি কোন রকম বিশৃঙ্খলা ছাড়াই সম্পাদনা করতে পারেন। সবচেয়ে চ্যালেঞ্জপূর্ণ কাজ ছিল জলর সরবরাহ নিশ্চিত করা। তিনি তাঁর গোত্র থেকে কর্মীদের নিযুক্ত করতেন, যারা গভীর কূপগুলি থেকে জল তুলে চামড়ার পাত্র ভর্তি করে রাখতেন যাতে করে সবাই জল পেতে পারেন। এসব কিছুর সবই তিনি তদারকি করতেন। নেতৃত্ব এবং দক্ষতাঁর গুণের কারণে হাশিম দ্রুতই তাঁর অবস্থান শক্ত করে ফেলেন এবং পৌরবিষয়ক অনেক দিকও তিনি দেখাশুনার দায়িত্ব পান।

হাশিমের এক ভাইপো তাঁর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি মনে করতেন তিনি হাসিমের চেয়ে বেশি যোগ্য। এর ফলে আবার বিরোধের সৃষ্টি হয়। তাঁর নাম ছিল উমাইয়া, যার নামেই মুহাম্মদ-পরবর্তী শাসকদের একটি বংশের নামকরণ করা হয়। উমাইয়া ছিলেন হাশিমের যমজ ভাই আবদ শামসের (Abd Shams) পালক পুত্র। হাশিম ও আবদ শামস যমজ ভাই ছিলেন, জন্মের সময় আবদুল শামসের ডান হাতের আঙ্গুলগুলি হাশিমের মাথার সাথে সংযুক্ত ছিল। কথিত আছে যে তাদের পিতা তাঁর তলোয়ার ব্যবহার করে তাদের পৃথক করেছিলেন। যার ফলে লোকজন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে ওদের দুইজনের মধ্যে খারাপ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে!
উমাইয়া সাদা কেশের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর চোখ ছিল নীল। ছোটবেলায় আবদ শামস তাঁকে যখন পালকপুত্র হিসেবে নিয়ে আসেন, তখন তিনি আসলে বাইজেন্টাইনে দাস হিসেবে ছিলেন। কথিত আছে, একদিন দাস ব্যবসায়ীরা মক্কার উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক এমন সময় উমাইয়াকে দেখে মুগ্ধ হয়ে আবদ শামসের পিতা দাস ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাঁকে কিনেছিলেন। যদিও তিনি প্রথমে তাঁকে ইয়েমেনে বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছিলেন, তবে পরে উমাইয়াকে তাঁর পুত্র আবদুল শামসের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং নিঃসন্তান আবদ শামস তাঁকে পুত্রের স্নেহে বড় করে তোলেন। পরিবারের সহায়তায় উমাইয়া বণিক হিসেবে সফল হয়েছিল, তবে মক্কার কালো চুলওয়ালা এবং বাদামী চোখের অধিকারী লোকেদের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সমস্যা হচ্ছিল ।

সম্ভবত বহেরাগত চেহারার জন্য এবং পার্থক্য ঘোচাতে, তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন অন্য গোত্রকে সাহায্য করতে। যার ফলশ্রুতিতে মক্কার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি উদারতার সাথে হাশিমকে অর্থ সাহায্য করেছিলেন, এবং হাশিমের এই উদারতাই হাশিমকে সর্বাধিক পরিচিতি দিয়েছিল। উমাইয়া দানের দিক থেকে তাঁর চাচাকেও ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যে তাঁর চাচার চেয়ে বেশি যোগ্য তা প্রমাণ করতে তাঁর চাচাকে একটি প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ জানান (৩)। হাশিম তাতে রাজি হন, তবে এই শর্তে যে, যিনি হেরে যাবেন তাঁকে দশ বছরের জন্য নির্বাসনে যেতে হবে এবং পঞ্চাশটি উট দান করতে হবে। এক জায়গায় (বইয়ে) পাওয়া যায়, মধ্যস্থতার জন্য একজন গণ্য ব্যক্তিকে আনা হয়। আরেক জায়গায় পাওয়া যায় বিচারকের জন্য একটি প্যানেল নির্বাচিত করা হয়েছিল।

এই জাতীয় প্রতিযোগিতার নিয়ম ছিল: প্রত্যেক প্রতিযোগী তাঁর অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত গুণাবলী, সাফল্য এবং তাঁর পরিবারের যোগ্যতা এবং তাদের অর্জনগুলি সম্পর্কে সভায় সবার সামনে বলবেন। প্রতিপক্ষ চাইলে তা প্রত্যাখ্যানের সুযোগও দেয়া হবে সাক্ষীদের। বিচারকরা প্রতিযোগীদের চারিত্রিক সনদ দিয়ে তাদের কথার সত্যতার প্রমাণ দিবেন। এটি অনেকটা রাজনৈতিক প্রচারের মতোই, পার্থক্য যেমন ভোট গণনা হতো হাতের সংখ্যা দিয়ে। বিচারকরা হাশিমের পক্ষে রায় দেয়। শর্ত অনুযায়ী উমাইয়াকে সিরিয়ায় নির্বাসনে চলে যেতে হয়েছিল। তাঁর চলে যাওয়ার পরে হাশিম একটি বিশাল ভোজের আয়োজন করেন এবং হেরে যাওয়ার শর্ত অনুযায়ী প্রাপ্ত উট জবাই করে মাংস মক্কার দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করলেন।

মক্কায় হাশিমের সবচাইতে বড় অবদান মক্কাকে কেবল একটি ট্রানজিট রুট থেকে রফতানির জায়গা হিসেবে পরিণত করা। এর আগ পর্যন্ত মক্কার স্থানীয়ভাবে ছোট ছোট কাফেলা ছিল, তারা স্থানীয়ভাবে ব্যবসা করত। কিন্তু হাসেম ছিলেন কুসাইর মতই স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনি এবং তাঁর ভাইয়েরা বিভিন্ন সাম্রাজ্যের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি করার পরে তিনি সমগ্র সম্প্রদায়কে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সকল পণ্য সংগ্রহ করার জন্য সংগঠিত করেন যাতে বেশি লাভে সেইসব পণ্য অন্য অঞ্চলে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে পারে।

পণ্যদ্রব্যের মধ্যে ছিল আকরি (silver ore), ধূপ, আতর, গুল্ম, অস্ত্রশস্ত্র, পশু ইত্যাদি। তিনি সমবায় প্রতিষ্ঠা করেন, অথবা তাঁর ধারণাগুলি পরে রূপান্তরিত হয়ে একটি রফতানি সমবায় সংগঠনে রূপ নেয়, যেখান থেকে বাণিজ্য কাফেলার অর্থায়নের সংস্থান করা হয়েছিল এবং প্রতিটি বিনিয়োগকারী তাঁর অংশের অনুপাতে বিনিয়োগের লভ্যাংশ পেতেন।

মক্কা থেকে দূরবর্তী গোত্রদের মূর্তিগুলিকে মক্কার মন্দিরের অভ্যন্তরে অথবা তাঁর আশপাশে স্থাপন করার মাধ্যমে সবার প্রতিমাকে স্বাগত জানানোর যে ঐতিহ্য তাঁর বাবা কুসাই শুরু করেছিলেন, হাশিম তা চালু রাখেন। এর ফলে ভিন্ন ভিন্ন এলাকার লোকেদের সাথে তিনি খুব ভালো সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, যা চুক্তি সম্পাদন করতে তাঁকে সুবিধাজনক অবস্থান দেয়।

মক্কায় নিয়ে আসা প্রতিটি প্রতিমাকে একটি কূটনৈতিক বিজয় বলে গণ্য করা হতো। প্রতিটি প্রতিমা একটি চুক্তিতে স্বাক্ষরের মতোই বিষয় ছিল, যা দূরবর্তী গোত্রদেরকে আধ্যাত্মিক এবং বাণিজ্যিকভাবে মক্কার সাথে আবদ্ধ করে। উপাসনার মাস শেষ হলে হাশিম তখন কাফেলা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকতেন। ঠিক এমনই এক ভ্রমণের সময় তিনি মুহাম্মদের দাদা আবদুল মুত্তালিবের জন্ম দেন (Abdul Muttalib)। মক্কা থেকে প্রায় দু'শো ত্রিশ মাইল উত্তরে উর্বর কৃষি এলাকার ইয়াছরিব নামক এক জায়গায় হাশিম তাঁর কাফেলা থামান, যেখানে তিনি সালমা নামক এক বর পরিত্যক্তা রূপবতী নারীর রূপে মুগ্ধ হন। কথিত আছে যে, সালমাকে তিনি বাজারে দেখতে পান, তিনি তাঁর ভৃত্যকে কিছু ক্রয়ের বিষয়ে নির্দেশনা দিচ্ছিলেন তখন। এরপরই হাশিম তাঁর সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে লেগে পড়েন।

সালমা খাজরাজ (Khazraj) গোত্রের নাজ্জার (Najjar) বংশের মেয়ে ছিলেন। দুটি সন্তানসহ তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয়। সালমা জানিয়েছিলেন যে, তিনি পুনরায় কাউকে বিয়ে করতে রাজি হবেন কেবল এই শর্তে যে, তিনি যদি তাঁকে পছন্দ না করেন তবে বিবাহবিচ্ছেদ করার অধিকার পাবেন। যেহেতু হাশিম মক্কাবাসীদের মধ্যে একজন খ্যাতনামা শেখ ছিলেন সেহেতু সালমার শর্ত বিয়ের আয়োজন করাটা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না। কাফেলায় সাথে থাকা হাশিমের আত্মীয়-স্বজনরা বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। কনের পক্ষে নাজ্জার (Najjar) গোত্রের লোকেরা উপস্থিত ছিল।

কথিত আছে, কাফেলা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার আগেই সালমা গর্ভবতী হয়েছিলেন। গল্পে পাওয়া যায়, ব্যবসার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার সফরে হাশিম তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীকে ফিরিয়ে সঙ্গে নেন, কিন্তু পরে তিনি আরেকটি কাফেলাকে দিয়ে

তাঁর স্ত্রীকে ফেরত পাঠান যাতে বাচ্চা জন্মের সময় তিনি পরিবারের সাথেই থাকতে পারেন। তিনি তাদেরকে বলেন বাণিজ্য থেকে ফেরার পথে মা এবং বাচ্চাকে মক্কার উদেশ্যে তুলে নিয়ে যাবেন। তবে তা আর সম্ভব হয়নি। গাজা নামক জায়গায় কাফেলা থামার পরই তিনি মারা যান। বাল্যকালে মুহাম্মদের দাদা দেখতে হাশিমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন, এবং এটিও জানা ছিল যে তিনি তাঁর মতো সুঠামদেহী ও নেতৃত্বগুণের অধিকারী হবেন। তাঁর মা তাঁকে শাইবা (Shayba) বলে ডাকতেন যার অর্থঃ বুড়ো, কারণ তিনি জন্ম নিয়েছিলেন কিছু সাদা চুল নিয়ে। তিনি জীবনের প্রথম দশবছর তিনি ইয়াছরিবে কাটিয়েছেন। তাঁরপরে মুত্তালিব নামে হাশিমের একভাই তাঁকে দেখতে আসেন এবং তাঁকে কুরাইশ গোত্রের ছেলে হিসেবে দাবি করেন।

তিনি সালমাকে চাপ দেন যেন শাইবাকে মক্কায় নিয়ে যান, যাতে করে এই বাচ্চার চরিত্রটি কুরাইশ বংশের আর সবার মতই হয়। সালমা রাজি হলে মুত্তালিব উটের পেছনে বসিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে মক্কায় আসেন। কুরাইশরা যখন তাদের দেখল, তারা ভেবেছিল মুত্তালিব হয়ত তাঁকে ক্রয় করেছে দাস হিসেবে। তারা তাঁর নাম দিয়েছে আবদুল মুত্তালিব, মানে মুত্তালিবের দাস। এই কথা শুনে তিনি তাদেরকে বলেন, “তোমরা বাজে বলছো, ও আমার ভাতিজা, নাম শাইবা। ও হাশিমের পুত্র, আমি ইয়াছরিব থেকে ওকে নিয়ে এসেছি” (৪) ।

তবে ‘মুত্তালিবের দাস’ নামটিই শেষমেশ থেকে যায়, কারণ মুত্তালিব তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন এবং সর্বদা তাঁকে সাথে রাখতেন। হাশিমের ভাই হিসেবে মুত্তালিবও তীর্থযাত্রীদের খাবার ও জল সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বেশ সফল হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর ভাতিজাকেও উত্তরসূরি হিসেবে প্রস্তুত করছিলেন। আব্দুল মুত্তালিবের চাচা মুত্তালিব ইয়েমেনে বাণিজ্য করতে যাওয়ার পথে মারা যান। তখন আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন খুবই ছোট এবং প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তিনি চাচার পদ ও দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম ছিলেন না।

চাচা মুত্তালিবের মৃত্যুর পরে আব্দুল মুত্তালিবের আরেক চাচা নওফাল আব্দুল মুত্তালিব প্রাপ্তবয়ঙ্ক না হওয়া পর্যন্ত তাঁর ভাই হাশিম ও মুত্তালিবের এই তীর্থস্থান দেখভালের পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু মুত্তালিব প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর তিনি দায়িত্ব ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান। চাচা মুত্তালিব তাঁর ভাতিজা আব্দুল মুত্তালিবের জন্য কিছু সম্পত্তি রেখে যান, সেখান থেকে নওফাল কিছু সম্পত্তি দখলও করে নেন।

আবদুল মুত্তালিব প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরও তাঁর উত্তরাধিকারিসূত্রে পাওয়া ক্ষমতা হাতে পেলেন না এবং কুরাইশের সমর্থন পেতেও ব্যর্থ হলেন, তাই তিনি সামরিক সহায়তার জন্য ইয়াছরিবে তাঁর মামাদের সাহায্যর জন্য ডেকে পাঠান, ঠিক যেমন কুসাই ক্ষমতা পেতে তাঁর সৎ ভাইদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। মামাদের নেতৃত্বে প্রায় আশিজনের সশস্ত্র ঘোড়সওয়ারের একটি দল মক্কায় পৌঁছেছিল। তাঁরা মন্দিরের সামনে নওফালকে কোণঠাসা করে পরিষ্কার বলে সালমার পুত্রকে তাঁর ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে না দিলে রক্তের বন্যা বইয়ে দিবে। সম্ভবত এটি ফাঁকা হুমকি ছিল, কারণ তারাও জানতেন, পবিত্র ভূখণ্ডের ভেতরে নওফালকে হত্যা করলে এটি অবশ্যই গোত্রে গোত্রে গৃহযুদ্ধের সূচনা করবে। কিন্তু নওফালের পিঠ দেয়ালে ঠেকেছিল, তাই তাঁর ক্ষমতা হস্তান্তর করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। ফলে, আবদুল মুত্তালিব তাঁর সম্পত্তি ও তীর্থযাত্রার নিয়ন্ত্রণ হাতে পেলেন, যা বরাবরই হাশিমের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল (৫)।

ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর তিনি দ্রুতই মক্কাবাসীদের নেতা হয়ে ওঠেন। আবদুল মুত্তালিব জন্মগ্রহণ করেন ৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে, সময়টা ছিল ভূরাজনীতির সংঘাতের সময়, যে কারণে মক্কা ছিল অশান্ত। এই অস্থিরতা ছিল মূলত ইয়েমেনকে কেন্দ্র করে। ইয়েমেনে বারবার বিদেশি শক্তির এবং সামরিক শক্তির অভ্যুত্থান ঘটছিল। এই সংঘাতের সূচনা হয় একজন শাসকের

উত্থানের মাধ্য দিয়ে, তাঁর নাম দু নুওয়াস (Dhu Nuwas), যিনি ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি নাজরান এলাকায় যে বৃহত্তর খৃস্টান সম্প্রদায় শিকড় গেড়ে বসেছিল তাতে খুশি ছিলেন না। কথিত আছে, দু নুওয়াস ইহুদিধর্ম গ্রহণ করার পর বিশ হাজার নাজরান খ্রিস্টানকে জবাই করেছিলেন, যারা ধর্ম পরিবর্তন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। যদিও সংখ্যাটি সম্ভবত অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়, তবে এই নৃশংসতাই পরবর্তীতে ইয়েমেনে খ্রিস্টান শক্তির হস্তক্ষেপের কারণ হয়েছিল। দূরত্বের কারণে বাইজেন্টাইনরা সরাসরি এই সংঘাতে অংশগ্রহণ করতে অসমর্থ ছিল, তবে দূর থেকে আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান শাসককে ইয়েমেন দখল করতে সবধরণের সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল। এ কারণে আবিসিনিয়ানদের সত্তর হাজার সেনা লোহিত সাগর পেরিয়ে ইয়েমেনে আক্রমণ করে বসে। কথিত আছে, (যুদ্ধে পরাজিত) দু নুওয়াস হয় খুন হয়েছেন বা আত্মহত্যা করেছেন, এবং আবিসিনীয় বাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করে। কিন্তু এরপর শুরু হয় নতুন ঝামেলা - আবিসিনীয় বাহিনীর দুজন সেনাপতির মধ্যে ক্ষমতার জন্য দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এর সমাধান হয়েছিল হয়েছিল কেবল তখনই যখন সেনাপতি দুজন সম্মুখ সমরে নামে, একে অন্যের সাথে তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করে যতক্ষণ না একজন নিহত হয়। এই লড়াইয়ে আব্রাহা (Abraha) নামে একজন জেনারেল বিজয়ী হয়েছিলেন, তবে তলোয়ারের আঘাতে আব্রাহার গালে গভীর ক্ষত তৈরি হয়, যার ফলশ্রতিতে তাঁকে 'দ্বিখণ্ডিতমুখ' নাম ডাকা হতো (৬)।

আব্রাহা রাজত্বকালে তিনি একজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে ওঠেন, যিনি খ্রিস্টধর্ম এবং আবিসিনিয়ার সামাজ্য প্রসারিত করার জন্য নিবেদিত হন। তিনি স্পষ্টতই পশ্চিম আরবের গোত্রদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার ছক কষেন, যার ফলে সানায় একটি বিশাল গির্জা নির্মাণ করেছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এই গির্জা পবিত্র মাসে মক্কার ঐতিহ্যবাহী পৌত্তলিক মন্দিরে তীর্থযাত্রার অব্যাহতি ঘটাবে। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন, আরবরা এই মন্দিরের সাথে এতই নিবেদিতপ্রাণ যে তিনি ওদের পৌত্তলিক বিশ্বাসের ফাটল ধরাতে ব্যর্থ। শুধুই তাই-ই না, মন্দিরের অনুরাগী কোনো একজন রাতে তাঁর সেই গির্জাটিতে গোপনে ঢুকে বেদীটির ঠিক সামনে মলত্যাগ করে রেখে যায়। এই ঘটনায় আব্রাহা অপমানিত বোধ করেন এবং খুবই রাগান্বিত হন। আব্রাহা মক্কা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। এই আক্রমণের জন্য তিনি হাত মিলান প্রভাবশালী আরব শেখের সাথে যিনি ছিলেন খুজা গোত্রের লোক। কুসাই তাঁকে মক্কা থেকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন।

অতঃপর আব্রাহা সশস্ত্র হস্তিবাহিনী নিয়ে বিধর্মী মন্দির ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা দেন (৭)। এই হামলার আগাম সংবাদ আবদুল মুত্তালিব জানার পর তিনি তাঁর লোকদের পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আব্রাহার বাহিনী মক্কার দক্ষিণে পৌঁছানোর পরই ছোট ছোট গোত্রদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিরোধের সামনে পড়েন!

তবে মন্দিরকে আব্রাহার বাহিনীর হাত থেকে এবং মক্কাকে দখল করা থেকে বাঁচানো সম্ভব হয় কেবলমাত্র গুটি বসন্তের প্রাদুর্ভাবের কারণে। যুদ্ধচলাকালীন সময়ে এই রোগটির বিস্তার হঠাৎ দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে যা আব্রাহার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে আব্রাহা তাঁর সেনাবাহিনীর বাকী সবাইকে নিয়ে সানার প্রাসাদে ফিরে আসেন, কিন্তু তারপর খুব শীঘ্রই গুটি বসন্তে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তিনি মারা গিয়েছিলেন (৮)। আব্রাহার এই পরাজয়কে মক্কাবাসীরা দেবতার আশীর্বাদ হিসেবে দেখেন এবং জনমুখে বলতে থাকে যে আবিসিনিয়ানদের পরাজিত হবার কারণ হচ্ছে পাখিদের একটি বিশাল ঝাঁক তাদের উপর পাথর মেরেছিল, যার ফলে ক্ষতের কারণে জীবানু সংক্রমণ হয়ে তাঁরা মারা যান। মুহাম্মদ পরবর্তীকালে এই ঘটনাকে আল্লাহর শক্তির প্রমাণের উদহারণ হিসেবে ব্যবহার করতেন। এমনকি কোরানে এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে সূরার অবতারণাও করেন।

পৌরাণিক কাহিনীগুলোকে তিনি সত্য হিসেবে উপস্থাপন করার প্রবণতা ছিল মুহাম্মদের। এর উদাহরণ হচ্ছে নিচের এই সূরাটি : "তুমি কি দেখনি তোমার রব হাতীওয়ালাদের সাথে কী করেছিলেন? তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত

করেননি? আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন। তারা তাদের ওপর নিক্ষেপ করে পোড়ামাটির কঙ্কর। অতঃপর তিনি তাদেরকে করলেন ভক্ষিত শস্যপাতার ন্যায়"। (৯)

আবদুল মুত্তালিবের পাঁচ স্ত্রী ছিল। আর তিনি দশ ছেলে ও ছয় কন্যা সন্তানের বাবা ছিলেন। এর মাঝে মুহাম্মদের পিতা আব্দুল্লাহ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ এবং স্বভাবতই তাঁর প্রিয়। সত্তরের মাঝামাঝি বয়সে মুত্তালিব তাঁর চব্বিশ বছর বয়সী ছেলে আব্দুল্লাহর বিয়ে ঠিক করেন আমিনার সাথে। আমিনা ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে এবং তিনি নিজেও একই গোত্রে শেষ বিয়ে করেন।
কিছু সূত্র দাবি করেছে যে, একই সময়ে দুটো বিবাহ সম্পন্ন হয়। আব্দুল্লাহর ঘরে জন্ম নেয় মুহাম্মদ, আবদুল মুত্তালিবের ঘরে জন্ম নেয় হামজা এবং সাফিয়া। তারা তিনজন একই সময়ে জন্ম এবং বেড়ে ওঠার কারণে হামজা এবং সাফিয়া শেষ পর্যন্ত মোহাম্মদের গুরুত্বপূর্ণ সমর্থক হয়ে ওঠেন। মুহাম্মদের পিতা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। শুধু এটুকু জানা যায় যে, তিনি পঁচিশ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন, ঠিক যে বছর আমিনা মুহাম্মদকে জন্ম দিয়েছিলেন। বলা হয় অন্যান্য মক্কাবাসীদের মতোই তিনি দীর্ঘ দূরত্বে কাফেলা ভ্রমণের সময় মারা গিয়েছিলেন। ফলে, আমিনা বিধবা হন এবং মুহাম্মদ এতিম হন। মুহাম্মদের জন্মের সূত্র ধরে আবদুল্লাহকে নবীর পিতার উপযোগী করে তুলতে সাহিত্যের মধ্যে কিংবদন্তী সব গল্প জুড়ে দেয়া হয় পরবর্তীতে। তন্মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল বাইবেলের বিবরণ, আব্রাহাম যে তাঁর ছেলেকে ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতে উদ্যত হন, সেই কাহিনী।

এই গল্পের সাথে মিল রেখে বর্ণিত আছে, আবদুল মুত্তালিবও ঈশ্বরকে খুশি করতে আবদুল্লাহর গলা কাটতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বর আব্রাহামকে বিশ্বাসের পরীক্ষা করতে তাঁর পুত্রকে হত্যা করতে বলেছিলেন, অন্যদিক আবদুল মুত্তালিব তীর্থযাত্রীদের জন্য জল সরবরাহ করার জন্য কূপ খনন করতে এই প্রতিশ্রুতি করেন যে, যদি তিনি দশ পুত্রের জনক হন তবে সেখান থেকে এক পুত্রকে ঈশ্বরের উদেশ্যে উৎসর্গ করবেন। সে সময় তাঁর একটামাত্র ছেলে ছিল, তাই হজ্বযাত্রীদের জন্য জল সরবরাহ করা খুবই কষ্টকর ছিল। যেহেতু এই কাজের জন্য হাজীদের থেকে প্রাপ্ত সকল অর্থ তাঁর পকেটে ঢুকত তাই মক্কাবাসীরা তাঁকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। একটা সময় ঘাম মুছতে মুছতে আকাশের দিকে তাকিয়ে মনের দুঃখে তিনি এই প্রতিজ্ঞা করেন। শেষমেশ তিনি সত্যিই দশ সন্তানের জনক হন। কথিত আছে, সন্তানরা বড় হবার পর তিনি তাঁর এই প্রতিশ্রুতির কথা তাদেরকে বলেন। বাবার এই সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান জানাতে তাঁর সকল সন্তানরা হুবাল দেবতার সামনে উপস্থিত হন। সেখানে একজন ভবিষৎদ্রষ্টা ধর্মযাজক ছিলেন। তিনি দশটি তীর হুবাল দেবতাকে ছুঁড়ে মারেন এবং বারবার সেই তীর তাঁর একজন ছেলের দিকেই এসে পরে। আর সেই একজনই হচ্ছেন মোহাম্মদের বাবা আব্দুল্লাহ (১০)।

আব্রাহাম যেমন তাঁর পুত্রকে মারওয়া পাহাড়ে নিয়ে যায় হত্যা করতে, আবদুল মুত্তালিবও অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর একটি ছুরি বের করেছিলেন, কিন্তু তবে এইবার বাইবেলের গল্পের মতো ঈশ্বরের তরফ থেকে ঐশ্বরিক উট পাঠানো হয় না। এক্ষেত্রে মুত্তালিবের কন্যারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের বাবার হাতকে নিবৃত্ত করেছিলেন এবং অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি আব্দুল্লাহকে হত্যা না করেন। অবশেষে দেবতাদের সাথে তাদের একটি সমঝোতা হয়েছিল যে, আব্দুল মুত্তালিব তাঁর পুত্রের বদলায় একশো উট বলি দেবেন। তিনি তাই করেছিলেন। (১১)
আরেক গল্প আছে এমনঃ আবদুল্লাহকে এক মহিলা প্রস্তাব করেছিলেন তাঁর সাথে শোবার জন্য, যার বিনিময়ে এই নারী তাঁকে একশো উট উপহার দেবেন। ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন গল্পেরই উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে একটি গল্প প্রায় সবখানে পাওয়া যায়, যা এরকম - আব্দুল্লাহ এবং তাঁর পিতা যখন আব্দুল্লাহর হবু বৌয়ের গোত্রের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন বিয়ে করার জন্য (উল্লেখ্য, বাবা এবং ছেলে দুই চাচাতো বোনকে বিয়ে করেছিলেন) পথিমধ্যে এই নারীরই (উট প্রস্তাবকারিনী) প্রস্তাবে আবদুল্লাহ আগ্রহী হলেও পরক্ষণেই তিনি ভদ্রমহিলাকে বলেন "আমি আমার বাবার সাথে আছি, এবং আমি তাঁকে ছেড়ে আসতে পারি না"। এরপর তিনি আমিনাকে বিয়ে করেন। আমিনা গর্ভবতী হন, ঠিক তারপরেই আব্দুল্লাহ সেই নারীর

কাছে যেতে আগ্রহী হন। কিন্তু এবার তিনি আব্দুল্লাহর উপর ঠান্ডা জল ছুঁড়ে মারেন আর প্রতিবাদ করে বলেন "আমি খারাপ মহিলা নই"। তিনি শুধু আব্দুল্লাহর সাথে শুতে চেয়েছিলেন সেদিনই, কারণ তিনি তাঁর চোখে জ্বলজ্বলে সাদা আলো দেখতে পেয়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন তিনি হয়তো ভবিষৎ নবীর বাবা হবেন, তাই তিনি সেই ভবিষ্যৎ নবীর মা হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন আর সে আলো নেই, সেটা চলে গেছে অন্যের কাছে (১২)। এর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, আবদুল্লাহ সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য একদল কাফেলার সাথে একটি চুক্তি সই করেছিলেন। তবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় কাফেলা তাঁকে ইয়াছরিবে রেখেই রওনা দেন যাতে তাঁর নাজ্জার (Najjar) গোত্রীয় আত্মীয়রা তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতে পারে।
আব্দুল মুত্তালিব যখন জানতে পারলেন তাঁর ছোট ছেলে অসুস্থ, তিনি তাঁর খোঁজ খবর নেয়ার জন্য তাঁর বড় পুত্র আল-হারিছকে ইয়াছরিবে পাঠান। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে আব্দুল্লাহ তাঁর ভাই পৌঁছার একমাস আগেই মারা যান। তাঁকে তাঁর আত্মীয়দের উঠানেই কবর দেয়া হয়।

মৃত্যুকালে আবদুল্লাহ আমিনার জন্য রেখে গিয়েছিলেন : একটি আবিসিনীয় দাসী, পাঁচটি উট এবং একটি ভেড়ার পাল। বাবার মৃত্যুর বেশ কয়েক মাস পর মুহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। ছেলের জন্মের পর আমিনা আবদুল মুত্তালিবের কাছে সুসংবাদ পাঠান, মুত্তালিব মুহাম্মদকে দেখতে আসেন। তিনি শিশুটিকে তুলে নিয়ে মন্দিরে যান এবং হুবাল দেবতাকে ধন্যবাদ জানান।

মোহাম্মদের জন্ম ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে, হাতির বছর। যে বছর খ্রিস্টান যোদ্ধারা পৌত্তলিক মন্দিরটি ধ্বংস করার জন্য মক্কায় যাত্রা করেছিলেন কিন্তু পাখিদের ঝাঁক দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়ে ফিরে যান।

অধ্যায় - ৩
খিঁচুনি

দু'জন মুহাম্মদ রয়েছে - একজন বাস্তবের মুহাম্মদ আর অন্যজন কল্পনা তথা পৌরাণিক কাহিনী-সর্বস্ব মুহাম্মদ। কল্পকাহিনীর মুহাম্মদ ছাড়া প্রকৃত মুহাম্মদের স্থায়িত্ব নেই।

সময় ও স্থানের বিবরণ ব্যতীত, পৃথিবীতে মুহাম্মদের আগমন অন্য যেকোনো মানুষের চেয়েই আলাদা ছিল না। কুঁড়েঘরের নোংরা মেঝেতে, কাঁচা চামড়ার মাদুরের ওপর আমিনা মুহাম্মদকে প্রসব করেন। আর এই কঠিন পরীক্ষায় তাঁকে তাঁর গোত্রের অন্যান্য মহিলারা সাহায্য করেছিল। নাভিরজ্জুটি কেটে দেয়া হলো। তারপর সদ্যোজাত শিশুটিকে পরিষ্কার করে একটি নরম তোয়ালেতে জড়িয়ে নিয়ে মায়ের অপেক্ষমান বাহুতে তুলে দেয়া হলো।

গল্পে (মিথ) আছে যে, মুহাম্মদের জন্মের সাথে তার ভবিষ্যতে নবী হওয়ার আলামত হিসেবে এক উজ্জ্বল আলো উপস্থিত হয়েছিল। গর্ভবতী আমিনা স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর দেহ থেকে একটি আলো বেরিয়ে এসেছে যা তাঁকে "সিরিয়ার ভূমিতে বসরার দুর্গ" দেখার সুযোগ দেয় যাকে ধরা হয় মুহাম্মদের ভবিষ্যৎ বিজয়ের আলামত হিসেবে।

জন্মের পরে, আমিনা বিশ্বকে আলোকময় হতে দেখেন এবং বলেন "তারাগুলি আমার এতোটাই কাছে এসে পৌঁছেছিল যে, আমার মনে হচ্ছিল সেগুলো যেন আমার উপরেই পড়ছে।" (১) মুহাম্মদ এমনভাবে জন্ম নিলেন, যেন এইমাত্র গোসল করা, যার নাভিরজ্জুটি ইতিমধ্যেই কাটা হয়েছে। দুনিয়াতে প্রবেশের পরে অন্যান্য বাচ্চাদের মত কোন অনুনয় বা কান্নাকাটি না করে বরং তিনি জন্ম নিয়েছিলেন আল্লাহর কাছে সিজদারত অবস্থায়। (২)
মোহাম্মদীয় যুগে রচিত, মুহাম্মদ সম্পর্কিত বিশেষ লেখাসমূহে, মুহাম্মদের জন্ম নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, যেখানে মোটাদাগে সত্য প্রকাশ পেয়েছে। সে সমস্ত লেখায় আরো উঠে এসেছে কিভাবে একেবারে জন্মের পরে থেকেই মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত, অবজ্ঞার মধ্য দিয়ে মুহাম্মদকে যেতে হয়েছে। মুহাম্মদের জন্মের কিছুদিন পরেই তাকে একজন সেবিকার মাধ্যমে অনেক দূরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তী চার-পাঁচ বছর মায়ের সাথে আর তার যোগাযোগ হয়নি। সে যুগে প্লেগ রোগে মৃত্যুহার অনেক বেশি ছিল; তাই এই রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা পেতে, বিশেষ করে মরুভূমিতে জন্ম নেয়া শিশুদের খুব দ্রুত অনেক দূরে সরিয়ে রাখার রেওয়াজ ছিল। বেশ কয়েক বছর পর, শারীরিক ও মানসিকভাবে পুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিজ মা ও পরিবারের সাথে থাকতে দেয়া হতো না। যেকোন পরিস্থিতিতে এমন রেওয়াজ মোটেও স্বাভাবিক হতে পারে না। দীর্ঘ বিরতির পর প্রকৃত মায়ের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হলেও, এতে শিশুদের মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হতো; স্বাভাবিক মনোবিকাশ যথেষ্ট বাধাগ্রস্ত হতো।

এটা ধরে নেয়া যায় যে, মূলত সন্তান প্রতিপালনে অক্ষম কিংবা অনিচ্ছুক দম্পতির ক্ষেত্রে এই চলটা বেশি ছিল। আব্দুল মুত্তালিবের সর্বশেষ স্ত্রীর সন্তান হামজা ও সাফিয়ার বেলায় এমনটা হয়েছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া না। এরা বয়সে মুহাম্মদের সমসাময়িক ছিল। এটা বলাই যায় যে, আমিনা তাঁর নিজ সন্তানকে লালনপালনে সক্ষম ছিলেন না, বা সম্ভবত ইচ্ছুক ছিলেন না। এমনটা হওয়ার পেছনে মা আমিনার সেই একই রোগ, তথা মৃগীরোগ থাকাকেই কারণ মনে করা যেতে পারে, যেই স্নায়বিক জটিলতা পরবর্তীতে মুহাম্মদের জীবনের গন্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল। (৩)

পুরনো ইতিহাস ঘেঁটে আরো জানা যায়, মুহাম্মদের দাদা আবদুল মুত্তালিব মুহাম্মদের জন্মের পরপরই একজন পালক মাতার খোঁজে বেরিয়ে পরেন। মুহাম্মদের চাচা আবু লাহাবের (যে পরবর্তীতে তাঁর চরম শত্রুতে পরিণত হন) একজন দাসীকে এই

দায়িত্ব পালনের জন্য সাময়িকভাবে নিয়োগ দেয়া হয়, যতক্ষণ না পাকাপোক্ত আরেকজন কাউকে পাওয়া গেছে। অবশেষে, মক্কার দক্ষিণ-পূর্বে তিনদিনের দূরত্বে, এক যাযাবর গোত্রের বাসভূমি তায়েফ নিবাসী এক বেদুইন মহিলা হালিমা পালক মাতার দায়িত্ব নেন। (৪) কথিত আছে, হালিমা ছাড়াও ঐ গোত্রের আরো কিছু মহিলা জীবিকার তাগিদে শহরের অন্যান্য জায়গায় এই পালক মাতার কাজ করে গেছেন।

দুধমাতা হিসেবে হালিমা একেবারেই আদর্শ ছিলেন না। তিনি ছিলেন শুকনো, এমনকি নিজের সন্তানকেও ঠিকমতো দেখভালে অক্ষম। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনানুসারে জানা যায়, হালিমা বলেছেন, দুর্ভিক্ষের সময় একই এলাকার আরো দশজন মহিলা সহ তাঁরা মক্কায় আসেন; পালকমাতা হয়ে দীর্ঘমেয়াদে জীবিকার তাগিদে। হালিমা একটা ধুসর-সাদা গাধার পিঠে চড়ে আসছিলেন। তাঁর কোলে ছিল দুধের শিশু; আর তাঁর বর আরেকটা শুকনো উটের সওয়ারী হয়েছিলেন। তাঁর সাথে আরো চলে একপাল ছাগল। হালিমা ঠিকমতো খেতে পারতেন না, তাই তাঁর বুকের দুধ পর্যাপ্ত ছিল না। পর্যাপ্ত খাবারের অভাবে সাথে আনা উট, গাধা আর ছাগলগুলোও পর্যাপ্ত দুধ দিতে পারত না।

আমিনা এই সকল মহিলার কাছেই মুহাম্মদকে প্রতিপালন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তাঁকে নিরাশ করেছিল। তাদের আশঙ্কা ছিল, বিধবা আমিনা ঠিকমতো ওদের পারিশ্রমিক দিতে পারবে না। কারণ, তাঁর নিজের আর্থিক অবস্থা অন্যদের চেয়ে খুব একটা ভালো ছিল না। কোনও বাচ্চাকে খুঁজে না পেয়ে, আর নিজের গোত্রের কাছে অপমানিত হওয়া থেকে বাঁচতে হালিমা মুহাম্মদকে দেখভাল করার দায়িত্ব নেন।

পৌরাণিক কাহিনী তথা কল্পবিশেষজ্ঞরা এখানে অতিরঞ্জিত করে বলে : মক্কা যাওয়ার পথে হালিমা ও তাঁর ভ্রমণসঙ্গী বর, দুর্বল উট, ছাগল সহ অন্যান্য মহিলারা বেশ পেছনে পড়ে যায়! এতে বেশ হট্টগোল দেখা দেয়। তবে মুহাম্মদকে নিয়ে ফিরে আসার পথে দেখা যায় হালিমার গাধাটি সহ সব পশু বেশ প্রানচঞ্চল, হৃষ্টপুষ্ট ও বিস্ময়করভাবে দুধেল হয়ে উঠে। এমনকি হালিমার বক্ষ স্ফীত হয়ে তিনি নিজেই এতটাই দুগ্ধবতী হয়ে ওঠেন যে, মুহাম্মদ ছাড়াও নিজের সন্তানকে দুগ্ধদানে আর কোন সমস্যাই তাঁর হয়নি। এসব দেখে মহিলাদের সবাই বেশ ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। হালিমার বর তখন বলে বসেনঃ "হালিমা, তুমি কি জানো তোমার সাথে এক ঐশ্বরিক সৃষ্টি নিয়ে যাচ্ছ?" হালিমা প্রত্যুত্তরে বলেনঃ "ঈশ্বরের কৃপায়, আমিও তাই আশা করি"। (৫) কাফেলার অন্য নারীরা বলে ওঠে: “হালিমা ঝামেলা করো না, আমাদের জন্য দাঁড়াও”।

ইতিহাসবিদদের মতানুসারে ঐ সৌভাগ্যবান শিশু মুহাম্মদ পরবর্তী আরো দু’বছর তাদের ভাগ্য খুলে দিয়েছিল। একই গোত্রের অন্যান্য পশুদের চেয়ে হালিমার পশুগুলো বেশ পুষ্ট ছিল। এসব দেখে আশাপাশের সবাই তাদের পশুগুলোকে হালিমার পশুদের সাথে একই জায়গায় চড়াতে নিয়ে যাওয়া শুরু করলো। কিন্তু তাতে কিছুই হলো না! হালিমা দু’বছর পর মুহাম্মদকে দুগ্ধপান থেকে বিরত করেন এবং মক্কায় নিয়ে যান। যদিও, হালিমা দম্পতি মুহাম্মাদকে ফেরত নিয়ে যেতে চাইছিল না পাছে তাদের সৌভাগ্য ফুরিয়ে আসে। একটি মত অনুযায়ী বলা হয়ে থাকে যে, হালিমা আমিনার কাছে মুহাম্মদকে ফিরিয়ে নিতে দেরি করেন, কারণ আমিনাকে তিনি এই বলে বোঝাতে সক্ষম হন যে, মুহাম্মদ ফিরে আসলে মক্কায় আবারো প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেবে। আরেকটি সূত্র বলছে, আমিনা নিজেই প্লেগের কথা চিন্তা করে মুহাম্মদকে আবারও তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন।

যাযাবর শিবিরে ফিরে আসার কিছুদিন পরেই মুহাম্মদ প্রথম খিঁচুনির শিকার হয়, যা তার শরীরে ও দৃষ্টির মাঝে গভীর যন্ত্রণা নিয়ে আসে। এই ঘটনা সে বুঝে উঠতে পারেনি, কখনো ভুলতেও পারেনি! (৬) পরবর্তীতে সে তার অনুসারীদের বলেছিল যে, বাচ্চাদের সাথে খেলা করার সময় তিনজন ফেরেশতা তাকে দেখা দেয়। এদের মাঝে একজন তাকে মাটিতে শুইয়ে দেয়। তারপর তার পেট চিড়ে এর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কিছু একটা খুজঁতে থাকে। শেষে হাত বের করে নিয়ে আসে, সবকিছু ধুয়ে পরিষ্কার করে আবার তার পেতের ভেতর রাখে। এই গল্পটি বারবার বলার একপর্যায়ে সে সবাইকে বোঝাতে

সক্ষম হয় যে, ফেরেশতা তাকে দশজন লোকের বিপরীতে ওজন করে, কিন্তু এতে মুহাম্মদের ওজনই বেশি ছিল। পরে একশত, এমনকি একহাজার লোকের ওজনের চেয়েও মুহাম্মদের ওজন বেশি বলে ফেরেশতা দাবি করে। সে আরও বলে, ফেরেশতা নাকি সবাইকে এটাও বলে যে, পুরো সম্প্রদায়ের ওজন এক করলেও মুহাম্মদের চেয়ে কম হবে। (৭)

খিঁচুনি উঠলে, মুহাম্মদের খেলার সাথীরা তাঁবুতে গিয়ে হালিমাকে খবর দিয়ে সতর্ক করত, বলত মুহাম্মদ অস্বাভাবিক আচরণ করছে। খবর শুনে যখন পালক মা-বাবা কাছে যেত, তখন দেখতে পেত সে দাঁড়িয়ে আছে, তবে মুখটা ফ্যাকাশে। হালিমার বর বুঝে নিতেন, মুহাম্মদের এইমাত্র একটা খিঁচুনি হয়ে গেছে, আর সে ভয় পেয়েছে। প্রাচীনকালে খিঁচুনিকে শয়তানের আছর বলে ভাবা হতো। খিঁচুনি, মুখ দিয়ে ফেনা বের হওয়া, অদ্ভুত কথাবার্তা ইত্যাদির আর কি কারণ থাকতে পারে? "সম্ভবত শয়তান তাকে অল্পতে ছেড়ে দিয়েছে; আরো খারাপ কিছু ঘটার আগেই বরং তার মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া যাক" - হালিমার বর হালিমাকে এভাবেই বোঝাচ্ছিলেন।

মুহাম্মদকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে হালিমা দম্পতি মক্কা চলে আসেন। কিন্তু, তাদের দেখে আমিনা অবাক হয়ে তাদের এভাবে মক্কা চলে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন! জানতে চাওয়ার জোরাজুরিতে হালিমা দম্পতি মুহাম্মদের উপর অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। তারা ভয় পাচ্ছিলেন, এই কারণে মুহাম্মদের উপর খারাপ কিছু না ঘটে যায়। আমিনা জানতে চাইলেন, মুহাম্মদের উপর কোনো দৈত্য/জীন ভর করেছিল কি না। (৮) আমিনার অভিব্যক্তিতে বোঝা গেল, এমন ঘটনার সাথে আমিনা পরিচিতই ছিলেন। তিনি হালিমা এবং তাঁর বরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মুহাম্মাদকে তাদের সাথে মরুভূমিতে আবারও ফেরত পাঠালেন। (৯)

মুহাম্মদের উপর ঘটে যাওয়া সকল ঘটনাকে অলৌকিক ব্যাপার হিসেবে ইসলামের অনুসারীরা মনে করে; সেটা মুহাম্মদের সাথে স্বর্গীয় কারো বা কিছুর সাক্ষাতের মতো বাহ্যিক ঘটনা অথবা তার নিজের একেবারে গভীরের ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতা, যা-ই হোক না কেন।
যদিও, সকল প্রকার সাক্ষ্যপ্রমাণ, উপস্থিত অন্যান্যদের প্রতিক্রিয়া আর চিকিৎসাবিজ্ঞান দিয়ে এটা ব্যাখ্যা করা যেতেই পারে যে, স্নায়বিক এই রোগ দুর্ভাগ্যবশত মুহাম্মদ বয়ে বেড়াচ্ছিল এবং এটা সম্ভবত মা আমিনা থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।

মুহাম্মদের ব্যক্তিগত ইতিহাস থেকে জানা যায়, পালকমাতা হালিমা তাকে সারিয়ে তুলতে এক দৈবজ্ঞের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। আর এখানেই আরেকধাপ কল্পকাহিনীর অবতারণা ঘটে, যাতে বলা হয় সেই দৈবজ্ঞ হঠাৎ তাঁর বাহু প্রসারিত করে মুহাম্মাদকে জড়িতে বলতে থাকে "ওহে আরববাসী, এসো, এদিকে এগিয়ে এসো। আল লাত, আল উজ্জার উদ্দেশ্যে এই বালককে হত্যা করো, সেই সাথে আমাকেও! সে যদি বেচেঁ থাকে, সে যদি বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্ত হয়, সুনিশ্চিতভাবেই তোমাদের ধর্মকে পরাভূত করবে; তোমাদের আর তোমাদের পূর্বপুরুষের মতামতের তোয়াক্কা না করে এমন একটি ধর্ম সে আনতে যাচ্ছে, যা তোমরা এখনও শোনোনি, জানতেও পারোনি"। (১০)

মুহাম্মদ পাঁচ বছর বয়স অব্দি হালিমার সাথে ছিল; বিশেষ করে রোগব্যাধিতে ভোগায় হালিমা তাকে খুব কাছাকাছি রাখতেন। এভাবেই চলছিল, কোনো একদিন হালিমা দেখতে পেলেন, আকাশে কালো একটা মেঘের আচ্ছাদন মুহাম্মদকে ঘিরে রেখেছে, "মুহাম্মদ হাঁটলে ওটাও এগুতে থাকে, সে থেমে গেলে মেঘটাও থেমে যায়"। এতে হালিমা ও তাঁর বর এতটাই ভয় পেয়েছিল যে, তারা মুহাম্মাদকে তাঁর জন্মদাত্রী মা আমিনার কাছে তুলে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো। (১১)

মুহাম্মদকে ফিরিয়ে দেয়ার কাজটি সহজেই সম্পন্ন হয়নি। একটা সময় তাকে তার প্রকৃত মা আমিনার কাছে ফিরিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু, একেবারে জন্মের পর থেকেই সে জেনে আসছিল হালিমাই তার জন্মদাত্রী মা। তাই, বেশ কয়েক বছর

পর যখন পালকমাতা হালিমা দম্পতি মুহাম্মাদকে তার প্রকৃত জন্মদাত্রী আমিনার কাছে ফিরিয়ে দিতে চাইল তখন তার মাঝে তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়া হলো। সে একজন অপরিচিত কাউকে মা বলে ভাবতে পারল না, বরং তায়েফে হালিমার গোত্রের সাথে থেকে যেতে চাইল। এমনকি মুহাম্মদ মক্কার কাছাকাছি পৌঁছলে সুযোগ পেয়ে তার পালক মা-বাবা থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেল। সবাই তার খোঁজ করতে লাগল। অবশেষে মক্কার এক উচুঁ জায়গায়, মক্কা থেকে তায়েফে যাওয়ার সংযোগপথে, ওয়ারাকা তাকে খুজেঁ নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে ওয়ারাকা একটা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন, এবং নিউ টেস্টামেন্টের একটা অংশ আরবিতে অনুবাদ করেন। তবে, মক্কা থেকে তায়েফে যাওয়ার পথে মুহাম্মাদ কান্না করেছিল কিনা, কিংবা সে কি উদ্ভ্রান্তের মতো তায়েফের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল কিনা, তাঁকে ওখান থেকে ধরে আনতে জোরাজুরি করতে হয়েছিল কিনা, নাকি তাকে তার মতোই যেতে দেয়া হয়েছিল তা আর জানা যায়নি!

ওয়ারাকা মুহাম্মাদকে মন্দিরে তার দাদার কাছে নিয়ে আসলেন। সেখানে আব্দুল মুত্তালিব তাকে কাঁধে নিয়ে মন্দিরের চারপাশে ঘুরলেন, তার জন্য প্রার্থনা করলেন। অবশেষে তাকে আমিনার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো।

মায়ের কাছে আসার একবছর পর মা আমিনার মৃত্যু হলে মুহাম্মদ আবারও মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়। মুহাম্মদের মা মুহাম্মদকে সাথে নিয়ে মক্কার উত্তরে দশদিনের ভ্রমণ-দূরত্বের শহর ইয়াছরিবে মুহাম্মদের মামার সাথে সাক্ষাত করতে যান। এরপর আবিসিনিয়ার দাসী বারাকা সহ মুহাম্মদ ও তার মা দুটি উটের পিঠে চড়ে ওই স্থান ছেড়ে চলে যান। তারা একমাস আত্মীয়ের বাসায় থাকেন। মুহাম্মদ পরে বলেছিল, এই আত্মীয়ের বাসায় কিভাবে সে ওখানের একটা পুকুরে সাঁতার কেটেছিল, বাচ্চাদের সাথে খেলেছিল, পায়রা উড়িয়েছিল। সেখানেই মুহম্মদকে তার বাবা আব্দুল্লাহর কবর দেখানো হয়। ফিরতি যাত্রাপথে মুহাম্মদের মা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইয়াছরিবের দক্ষিণে আল আবওয়া শহরে মৃত্যবরণ করেন। আমিনাকে ওখানে কবর দেয়ার কথা ছাড়া আমরা আর তেমন কিছু জানা যায়নি। পরবর্তীতে দাসী বারাকা মা-হারা এতিম মুহাম্মাদকে মক্কায় নিয়ে আসে। সেখানে সে তার দাদা মুত্তালিবের প্রহরী হয়। আমরা জানিনা, মৃত্যুর সময় মুহাম্মদ তার মায়ের কাছে ছিল কিনা। তবে মৃতদেহকে কাপড়ে জড়িয়ে, মাটির গভীরে কবর দিয়ে পুনরায় মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে সে নিশ্চয়ই দেখেছে। আমরা কেবলমাত্র তার ভেতরের তীব্র শোক, আবেগ, দুমড়ে মুচড়ে যাওয়াটাই উপলব্ধি করতে পারি। ফিরে পাওয়া আর পুনরায় হারিয়ে ফেলার দোলাচলে শিশু মুহাম্মদ যেন দুলতে থাকে।

দাদার আশি বছর বয়সে মুহাম্মাদ তাঁর কাছে আসে। দাদা আর মাত্র দুই বছর বেঁচেছিলেন। সম্ভবত জন্মের প্রথম ছয়টি বছর কাছে না পাওয়ায়, তিনি মুহাম্মদকে খুবই স্নেহ করতেন, তাঁর নিজের সন্তানদের চেয়েও বেশি। মুহাম্মদের দাদা তাকে "আমার ছেলে" বলতেন। বয়স বাড়তে থাকলে ছেলেরা তাকে মন্দিরের মেঝেতে দিনের বেলায় বিশ্রাম নিতে মাদুর বিছিয়ে দিত। আব্দুল মুত্তালিবের ছেলেরা তাঁর বিছানার কাছাকাছি বসে থাকত, যতক্ষণ না তিনি ওখানে আসতেন। মুহাম্মদ ছাড়া আর কেউ বিছানার উপর বসার সাহস করত না। আর মুহাম্মদ নিজেকে সৌভাগ্যবান ভেবে, দাদা এসে না থামানো পর্যন্ত এক পা তুলে বিছানার উপর লাফাতে থাকত, যাতে তার চাচারা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। লাফানো শেষে মুত্তালিব তাকে পাশে বসিয়ে আদর করে পিঠ চাপড়ে দিতেন।

মন্দিরের হর্তাকর্তা আর জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে মুত্তালিব মন্দিরের ইতিহাস, শৌর্যবীর্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি মুহাম্মদকে মন্দিরের গুরুত্বের কথা বলে গেছেন। মন্দিরের অভ্যন্তরে ও বাইরে প্রার্থনার উদ্দেশ্যে বেদিতে স্থাপন করা দেবতাদের পাথর আর কাঠের প্রতিমূর্তিগুলো সম্পর্কেও অবহিত করেছেন। মন্দিরের প্রাত্যহিক কাজেও দাদা মুত্তালিব মুহাম্মদকে সাথে নিয়ে যেতেন। বয়স ও অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ মুত্তালিব একটা সময় কেবল প্রশাসনিক কর্মকর্তার মতো মন্দিরে অন্যান্যদের নিয়োগ প্রক্রিয়ার দায়িত্বে থাকতেন। এছাড়াও, তীর্থযাত্রার মৌসুমে পুন্যার্থীদের খাবার, পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদির দিকেও নজর রাখতেন। পুরোহিতের মতো প্রার্থনাকালীন সময়ে মন্দিরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করার নেতৃত্বেও তিনি থাকতেন। এটা নিশ্চিত

করেই বলা যায় যে, মুত্তালিব যতদিন বেচেঁ ছিলেন, বাৎসরিক ধর্মীয় রেওয়াজ, আচার-অনুষ্ঠান ঘিরে আয়োজিত বিশাল কর্মযজ্ঞের কেন্দ্রব্যক্তি ছিল এই মুহাম্মদ; মন্দিরের প্রাত্যহিক কাজের কথা তো বলাই বাহুল্য। যা পরবর্তীতে তার উপর গভীর প্রভাব ফেলে।

মুহাম্মদের বয়স যখন আট বছর তখন তার দাদা মুত্তালিব মারা যান। ধর্মীয় নেতার মতো গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায়, মৃত্যুর পর যথাযথ মর্যাদার সাথে তাঁর শেষকৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে শহরের গন্যমান্য নেতাদের সমাবেশ ঘটে। মুত্তালিবের ছয় মেয়ের প্রত্যেকেই মৃত্যুর আগে তাঁর জন্য প্রশস্তিসূচক কবিতা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে পাঠ করেছিল, এতে আব্দুল মুত্তালিবের চোখে জল চলে এলো। সেই একই কবিতা তাঁরা কবরের পাশে দাঁড়িয়েও পাঠ করল। মুহাম্মদ তার দাদার কফিনের পেছনে দাঁড়িয়ে কান্না করতে লাগল। এই অল্পবয়সে আরও একবার জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব ও ভোগান্তিতে সে শোকাভিভূত হয়ে পড়ল।

যদিও মুত্তালিবের প্রভূত ক্ষমতা ও সম্মান ছিল, তা সত্ত্বেও মৃত্যুর পর অসংখ্য বংশধরদের জন্য তেমন কিছুই রেখে যেতে পারেননি। মুহাম্মদ সেই অভাবগ্রস্তই রয়ে গেল। মক্কার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো কুসাইর সময়ের চেয়ে পাল্টে গেল, যখন ধর্মীয় ও প্রগতিশীলতার সকল ক্ষমতা এক ব্যক্তির মাঝে অর্থাৎ কুসাইর হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। কয়েক প্রজন্মের ধারাবাহিকতায়, কুসাইর পৌত্র আবদ শামস ও তাঁর পুত্র উমাইয়ার উত্তরসূরী ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক সাফল্য তাদের ক্ষমতা ও সম্পদের মালিক করে তোলে। অপরদিকে মন্দিরের দেখভাল, প্রার্থনা ইত্যাদি করতে থাকা হাশিমের বংশধরদের আয়-রোজগার ও প্রভাব ক্রমেই কমতে থাকে। নগরীর প্রশাসনিক ও সামরিক নেতৃত্বসহ গুরুত্বপূর্ণ পদসমুহ ব্যবসায়ী পরিবারের হাতে ছিল। বিদেশ হতে বাণিজ্য কাফেলায় নিয়ে আসা মুদ্রার বস্তা আর মূল্যবান দ্রব্যাদির তুলনায়, তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করা টাকা একেবারেই নগন্য ছিল। মন্দির থেকে শুরু করে কুরাইশ পরিষদের সভাকক্ষ পর্যন্ত আব্দুল মুত্তালিবের উল্লেখযোগ্য অবস্থান ছিল। কিন্তু সম্পদশালী অন্যান্য সভাসদের ভিড়ে তিনি ছিলেন বড়ই একা।

আব্দুল মুত্তালিব মারা যাওয়ার আগে, মুহাম্মদের দেখভাল করার দায়িত্ব তার বড় ছেলেদের একজন আবু তালিবের কাছে তুলে দেন। ছোট ভাই আব্বাসের কাছে হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত, আবু তালিব ছোট করে মন্দিরের দেখাশোনা করত। আদি গ্রন্থে আবু তালিব ও তাঁর স্ত্রী ফাতেমাকে ভালো মনের মানুষ বলে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়ে থাকে, তারা বেশ উদারহস্তেই মুহাম্মদের দেখাশোনা করত। সম্ভবত তারা অন্যদের চেয়ে বেশ ভালো করেই জানত যে, মুহাম্মদ ছোটবেলা থেকেই অবহেলা, বঞ্চনার শিকার। ইতিমধ্যে তাঁরা তার খিঁচুনি তথা মৃগীরোগ সম্পর্কে জেনে গেছে। তাই দয়াপরবশ হয়ে তারা দুহাত দিয়ে মুহাম্মদকে আগলে রাখত শয়তানের আছর থেকে বাঁচাতে। চাচী ফাতিমা পরবর্তীতে তাঁর মা হয়ে ওঠেন। মুহাম্মদ ফাতিমার এই উষ্ণ স্নেহ-মমতার কথা মনে রেখেছিল।

বালক মুহাম্মদের উপর বয়ে যাওয়া নানান মানসিক আঘাত আর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া স্নায়ুরোগের ফলশ্রুতিতে, সে অনেকটাই অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের এবং সেই সাথে অতিশয় লাজুক, ভদ্র ও শালীন আচরণের অধিকারী হয়ে উঠে। দিনের অধিকাংশ সময় সে পাহাড়ের ঢালে চাচাদের ও পরে ভাড়ায় ছাগলের পাল চড়িয়ে কাটাত। পশু চড়ানো ছিল একেবারেই নিরীহ একটা পেশা, মক্কার একেবারে প্রান্তিক হতদরিদ্র লোকদের মাঝে এটার প্রচলন ছিল। তাকে খুব সামান্যই বেতন দেয়া হতো। কখনো বা ঝাউগাছের বীজ, বা কখনো মরুর ঝোপঝাড় থেকে তুলে আনা কালো ফল দিয়েই তার খাবাবের চাহিদা মিটত। পাহাড়ের উপরে উঠে সে যখন নিচে শহরের কেন্দ্রে ছাদবিহীন মন্দির, সকলের ব্যস্ততা, ছুটোছুটি, নদীর দু'পাশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে শহরের স্বচ্ছল অধিবাসীদের পাথর আর মাটির তৈরি কয়েকতলা বাড়িগুলো দেখত। কিংবা অন্যদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে তৈরি করা দরিদ্রদের কাদামাটির কুঁড়েঘর দেখতে পেত, তখন সে ভাবত যদি কখনো নিজের

ভাগ্য ফেরানো যায়, নিজের অবস্থা উঁচুতে তোলা যায়! পরবর্তীতে সে তার অনুসারীদের কাছে এই বলে মুখরক্ষা করেছিল যে, এ যাবৎ আসা সকল নবীই ছাগল চড়িয়েছে। (১২)

আদিগ্রন্থে মুহাম্মদের তরুণ বয়সে আরো দুটি খিঁচুনির বিবরণ পাওয়া যায়। এর একটিতে দেখা যায়, কোন এক রাতে সে তার ছাগলগুলো আরেকজন পশুপালকের জিম্মায় রেখে ফুর্তি করার জন্য শহরের একটা বাজে জায়গায় মদের সরাইখানায় যায়। কিন্তু, শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছাতেই দূর থেকে গানবাজনার শব্দ তার কানে আসে। তখন সে গান শুনতে ওখানেই বসে পড়লো। একপর্যায়ে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। পরদিন সকালে যখন তার জ্ঞান ফিরে, সূর্যের আলো এসে ততক্ষণে তার মুখ ঝলসে দিচ্ছিল। আরো একবার এধরনের ঘটনা ঘটল, সেবারও একই গান সে শুনতে পেল। (১৩) মুহাম্মদ তার এই মূর্ছা যাওয়াকে ঐশ্বরিক ইচ্ছে হিসেবেই প্রচার করেছে, যেখানে অসভ্যতার নিকৃষ্টতম স্তরে পতিত হওয়া থেকে সে দৈবশক্তির ইচ্ছায় বেঁচে গিয়েছিল। (১৪) তুর্কি বংশোদ্ভূত নিউরো সাইকিয়াট্রিস্ট দ্যদে কারকুট (Dede Korkut) এর ভাষ্যমতে, মুহাম্মদের এই সমস্ত ঘটনাবলী ছিল মূলত মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোব নামক একটা বিশেষ অংশের বিচ্যুতি হতে সৃষ্ট শ্রবণজনিত ভ্রম। (১৫)

তরুণ অবস্থায়ও মুহাম্মদ অন্তত একটি বড় কাফেলায় সফর করেছিল। কয়েকটি সূত্র থেকে জানা যায়, বারো বছর বয়সেই মুহাম্মদ তাঁর চাচার সাথে, বিশাল সংখ্যক ব্যবসায়ী নিয়ে দক্ষিণ সিরিয়ার বসরা নগরীর উদ্দেশ্যে বাণিজ্য অভিযানে বের হয়। শুরুতেই এই যাত্রায় মুহাম্মদকে নেয়া হয়নি। কিন্তু আবু তালেব কাফেলা নিয়ে চলা শুরু করতেই মুহাম্মদ তাঁর পা ধরে রাখে ও তাঁকে নিতে আকুতি জানায়। সফরে যাওয়ার জন্য মুহাম্মদের যে খুব ইচ্ছে ছিল তা নয়, আসলে সে তাঁর চাচা আবু তালেবের কাছ থেকে আরো তিনমাস দূরে থাকতে চাইছিল না। এদিকে আবু তালেবের মন গলল, আর মুহাম্মদ সুউচ্চ উটে তার চাচার পেছনে গিয়ে বসলো। এরপর উত্তরের পথে যাত্রা শুরু হলো।

আল্লাহর নবী হিসেবে মুহাম্মদের ভবিষ্যত মহানুভবতার ধারণা দিতে, পরবর্তী লেখকেরা এই সফরকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নেয়। বিদগ্ধ খ্রিস্টধর্মযাজক বাহেরা (Bahira) এটা উল্লেখ করেছেন। যাত্রাপথে একটা সন্ন্যাসী মঠের সামনে মুহম্মদের কাফেলা এসে পৌঁছলে, সফরসঙ্গীদের ভীড়ের মাঝে মুহাম্মদকে খুঁজে পেতে বাহেরা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। কথিত আছে, এই বাহেরার হাতে পূর্বসূরিদের কাছ থেকে পাওয়া একটা পবিত্র গ্রন্থে, একজন নবীর আগমনের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছিল। আর মুহাম্মদই সেই নবী, যে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত! "এই সে বিশ্বের অধীশ্বর, বিশ্বের বুকে প্রেরিত পুরুষ, যাকে ঈশ্বর আমাদের প্রতি দয়া করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন"--বাহেরা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগল। "পর্বতের চূড়া পার হয়ে আসার সময় আমি টের পেলাম যে, এই কাফেলার মাঝেই নবী মুহাম্মদ আছে"-- হতচকিত হয়ে পড়া সফরসঙ্গীদের বাহেরা বলতে লাগল। এমন কোন পাথর বা বৃক্ষরাজি ছিল না, যারা মুহাম্মদের উদ্দেশ্যে সেজদা করেনি। এরপর বাহেরা আবু তালেব সহ সবাইকে ইহুদিদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিল। বাহেরা বলল, ইহুদিরা মুহাম্মদের খবর জানতে পারলে ওর অনেক ক্ষতি করবে। ঠিক এই মুহূর্তে, বিপুল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এক ঘোড়সওয়ারী তাদের দিকে আসতে লাগল। তবে, বাহেরা তাঁকে পটিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন। (১৬) এই কাহিনীর আরেকটি জায়গায় উল্লেখ আছে, সেই ধর্মযাজক পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করেন।

পৌরাণিক কল্পকাহিনীর বাইরে চিন্তা করলে দেখা যায়, এই সফর মুহাম্মদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যলাভের উৎস ছিল বলা যায়। উত্তর দিকে চলতে থাকা এই সফর তাঁকে মৃত সাগরের দিকে নিয়ে থাকতে পারে। যাত্রাপথে সে দেখতে পেয়েছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত রোমান শাসন, পরিত্যক্ত কাফেলার অনেক নগরী, মানুষের গৌরবহীন ক্ষণস্থায়ী জীবনের বাস্তবতা। এই সফরের প্রতি পদে পদে ছিল শিক্ষার উপকরণ। মক্কার ব্যবসায়ীদের রাতের বেলায় গোলাকার চক্রের মতো তাদের উটকে ঢেকে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করা, পেট্রা নগরীর পথে যেতে যেতে পাথরের দেয়ালে প্রাচীন শ্মশানগুলো কিংবা জেরুজালেমে

রোমানদের পরিত্যক্ত মুক্তমঞ্চ, সেইসাথে এসমস্ত স্থানের ইতিহাস নিয়ে, বহু বৃদ্ধ আর অভিজ্ঞ বণিকদের নানান রকম গল্প বলা ---- সবটাই ছিল শিক্ষার উর্বর ক্ষেত্র। রাতের বেলায় তাবু খাটিয়ে চামড়ার বালিশে মাথা রেখে শুয়ে, আর আগুন জ্বেলে সবাই মিলে বসে আড্ডায় এইসব জায়গা নিয়ে নানারকম আলাপ ছাড়া আর কিইবা তাঁর করার ছিল। যখন তারা সফর শেষে বসরায় পৌছালো, সেখানকার প্রাচীন গির্জা আর আরব খ্রিস্টানদের দেখতে পেয়ে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছিল। নয়নাভিরাম গির্জা, ঘণ্টার ধ্বনি, সাথে কালো লম্বা পোষাকে আবৃত যাজক পাদ্রিদের সমবেত প্রার্থনা সে দেখেছিল। সেখানে কি সে ধর্মীয় বাণী শুনেছিল? খ্রিস্টীয় কোন নবীর আগমন-বার্তা পেয়েছিল? বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুইর (William Muir) এর ভাষ্যমতে, মুহাম্মাদের কাছে সবচেয়ে মনে দাগ কাটার বিষয় ছিল: "তাঁরই মত দেখতে, আরবের সকল গোত্র, সম্প্রদায়ের সবাই একই ধর্মীয় রেওয়াজ ও রীতিনীতি পালন করছে "। (১৭)

মুহাম্মদের মক্কায় ফিরে আসার সময়কালে, আঞ্চলিক গোত্রসমূহের মধ্যকার খন্ডযুদ্ধ দানা বেঁধে উঠে, যা দক্ষিণ-পশ্চিম আরবের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করেছিল। এই বিরোধের সূত্রপাত ঘটে মক্কা থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার পূর্বে, ওকায নামক মেলায়। প্রতি বছরের শরতে, এই মেলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক আয়োজনে সমগ্র আরববাসীর সমাগম হতো এখানে।

নিষিদ্ধ মাসের প্রথম তিন সপ্তাহে, মক্কা ও তায়েফের আল-লাত সহ অন্যান্য পবিত্র স্থানসমূহে তীর্থযাত্রার আগে আগে এই মেলা অনুষ্ঠিত হতো। ঘোড়া, উটের দৌড় প্রতিযোগিতা সহ কবিতা পাঠের আসর এই মেলার অংশ ছিল। এটা সংগীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, বাজিকর, শারিরীক কসরতকারী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের মিলনমেলা ছিল। দাসদাসী সহ যেকোনো প্রাণী বা জিনিসও এখানে বেচাকেনা হতো। খ্রিস্টধর্মের প্রচারকরা এখানে সবার সাথে মিশে যেত, আর আগ্রহীদের যিশুখ্রিস্টের বাণী প্রচার করত। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, এই আসরে মুহাম্মদ নাজরান থেকে আগত এক বিখ্যাত খ্রিস্টীয় বিশপের ধর্মপোদেশমূলক বক্তৃতা শুনতে পেয়েছিল। একদিন মেলায় ঋণগ্রস্ত উগ্র স্বভাবের বদমেজাজি এক লোকের আগমন ঘটল। তাঁর কাছে অন্য গোত্রের একজন ধার নিয়ে ফেরত দেয়নি। পরে লোকটা মেলায় একটা বানর বিক্রি করতে এসেও ঠকেছে, ক্রেতা তাঁর টাকা দিয়ে যায়নি! তাই সে ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল: "আমি যার কাছে যে টাকা পাই, তাঁর বানরের সাথে আমার বানর কে অদলবদল করবে "? অথবা বলা হয়, কোন এক পরিস্থিতিতে সে দেনাদার আর তাঁর দশ পূর্বপুরুষদের অভিশাপ দিতে লাগল। একপর্যায়ে অন্য একজন ব্যক্তি তরবারি বের করে তাঁর বানরটির মাথা কেটে ফেলল। এরপর সেখানে তরবারির ঝনঝনানি ও রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার শুরু হয়। (১৮)
যদিও বিবাদের প্রকোপ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু পরে আবারও সে বছরই এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের আরেক সংঘাত দানা বেঁধে উঠে। এর প্রতিটাই ছিল পবিত্র মাসের পবিত্রতা মেনে চলার রেওয়াজের সুস্পষ্ট লংঘন। আরেকটা সংঘাতের শুরু হয়েছিল এভাবে - কোন এক বাচাল, আর সম্ভবত মাতাল কবি অন্যান্য গোত্রের লোকদের পরিহাস করে বলছিল যে, সারা আরবে তাঁর গোত্রটিই সেরা। তখন অপমানিত গোত্রের একজন এসে তাঁর উপর তলোয়ার চালিয়ে দেয়। এর ফলশ্রুতিতে আরেকটি রক্তক্ষয়ী সংঘাতের সৃষ্টি হয়। অন্য আরেকটি অসন্তোষের ঘটনা ঘটে, যখন এক লাবণ্যময়ী যুবতীকে অন্য গোত্রের ছেলেরা অপমান করে। ঘটনাটির সূত্রপাত হয়েছিল এভাবে যে, যুবতী মেয়েটি ঐ ছেলেদের আপত্তিকর আহবান সাড়া দেয়নি, আর তাদের কথামতো মুখের সামনের আবরণ খুলে চেহারা দেখাতে অসম্মতি জানায়। এর বদলা নিতে ছেলেগুলো মেয়েটার অজান্তেই তাঁর জামার পেছনের অংশ মাটির সাথে আটকে দেয়। ফলে মেয়েটি বসা অবস্থা থেকে দাঁড়াতে গেলে শরীরের নিম্নাংশ অনাবৃত হয়ে পড়ে। ছেলেরা জোরে হেসে বলতে থাকে তুমি তোমার মুখ আমাদের দেখতে দাওনি, আর এখন তোমার শরীরের পেছনটা আমরা দেখে নিলাম। (১৯) তলোয়ার বের করে ঐ মেয়েটার গোত্রের লোকজন তখন বখাটে ছেলেগুলোকে শায়েস্তা করতে আসে। এরকম প্রতিটি সংঘাতে গোত্রের অধিপতিদের হস্তক্ষেপে রক্তপাত বন্ধ করা হতো। ব্লাড মানির বিনিময়ে মৃতের বা অঙ্গহানির ক্ষতিপূরণ নেয়া হতো। এগুলো ছিল পবিত্র মাসের নিয়মনীতির মারাত্মক লংঘন। তা সত্ত্বেও, সেসব মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে রাখা যেতো, কারণ মেলায় পূর্বপরিকল্পিত না হয়ে সংঘাতগুলো স্বতস্ফুর্ত বিবাদ থেকেই হতো। ওকায মেলায় (Ukaz) সবারই আর্থিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ জড়িত ছিল, কিন্তু সেটা রক্ষার

জন্য নিয়মকানুন মেনে চলারও দরকার। নেতৃবৃন্দ পরে সিদ্ধান্ত নেয় যে, ভবিষ্যতে ওকাযে অংশ নিতে আসা সবাইকে মেলায় প্রবেশের পুর্বে তাদের অস্ত্র, মেলা কমিটির কাছে জমা দিতে হবে।

অবশ্য এই নতুন নিয়মও পবিত্র মাসে সংঘটিত চতুর্থ আর সবচেয়ে মারাত্মক সংঘাতকে আটকাতে পারেনি। শুরুটা হয়েছিল একটা পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে, যেখানে দুটি প্রধান গোত্রের সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়, আর তরুণ মুহাম্মদও তাতে জড়িয়ে পড়ে। একটা প্রতিশোধ নিতেই এই হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছিল। কুরাইশ গোত্রের সহযোগী কিনানা গোত্রের কোনো এক লোক যার সাথে আবার কুরাইশ নেতাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল সে অন্য এক বেদুঈন নেতাকে হত্যা করে, কারণ ঐ বেদুঈন নেতা হেরার রাজার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কিছু পণ্য ওকাযের মেলায় পরিবহনের এক লোভনীয় প্রস্তাবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। এ কারণে কাজটি কিনানা গোত্রের হাতছাড়া এবং তাতে কিনানা গোত্রের লোকটি অপমানিত বোধ করে এবং তাঁর সম্মানে লাগে। সম্ভবত, একদল সহযোগী নিয়ে সে তাঁর হতভাগা শত্রু হাওয়াজিন গোত্রের (Hawzin) এক বংশধরের উপর চড়াও হয়। সে তাঁকে হত্যা করে, আর যে বাধা দিতে আসে তাকেও হত্যা করে। সে নিহতের সব পণ্য চুরি করে ও পালিয়ে খাইবারে চলে যায়। কিন্তু, ওকায থেকে বের হয়ে যা যা হয়েছিল তা জানিয়ে সে কিনানা আর কুরাইশ নেতাদের কাছে বার্তা পাঠায়। কুরাইশ নেতারা ততক্ষণাৎ এসবের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরে মিটিং ডাকল। তাদের গোত্রীয় নীতি ছিল এমন : "আমরা সবাই একজনের জন্য (লড়ব) আর একজন সবার জন্য (লড়ব)"। যদিও এতে তাদের কোন হাত ছিল না, তবুও পবিত্র মাসে এই নিকৃষ্ট হত্যাকান্ডের কারণে তারা শক্তিশালী হাওয়াজিনদের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। হত্যাকারী ছিল কিনানা গোত্রের, কিন্তু কুরাইশরাও কিনানা গোত্রের সহযোগী ছিল। তাই তাঁরা কিনানাদের সমর্থন দিয়েছিল। অপ্রস্তুত অবস্থায় উভয় গোত্র দ্রুত তাদের পণ্যসামগ্রী, তাঁবু আর পরিবারকে উটের পিঠে তুলে নিল। শেষমেশ ধাওয়া খেয়ে উভয় গোত্রই মক্কার পবিত্রভূমির দিকে দৌড়ে পালায়।

পবিত্র ভূমিতে আসার পর কিনানা ও এর সহযোগী কুরাইশরা পলায়নকারীদের উপহাস করতে লাগল। তারা জানত, ধাওয়াকারীদের এতটা সাহস নেই যে পবিত্রভূমির সীমানা লঙ্ঘন করে তাদের আক্রমণ করবে। দু'পক্ষই পরবর্তী বছরে একটা নিরপেক্ষ জায়গায় যুদ্ধ করতে সংকল্প ব্যক্ত করল। তাদের যুদ্ধের কারণে ওকায মেলা বাতিল হয়ে গেল। দুই বৃহৎ শক্তির অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর মধ্যকার চুড়ান্ত যুদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত, পরবর্তী চার-পাঁচ বছর ধরে বিচ্ছিন্ন লড়াই ও খন্ডযুদ্ধ চলতে লাগল। মুহাম্মদ তীরন্দাজ হিসেবে দক্ষতার সাথে প্রতিপক্ষের উপর তীর নিক্ষেপ করত। যুদ্ধক্ষেত্রে দু'পক্ষের বিরাট সংখ্যক সৈন্যদের মৃতদেহ পড়ে থাকায় নেতারা যুদ্ধ বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল। যুদ্ধশেষে উভয় পক্ষের মৃতদেহ গননা করে দেখা গেল কুরাইশদের নামমাত্র সৈন্য নিহত হলো। তাদের অপেক্ষা অতিরিক্ত মৃত সৈন্যদের সংখ্যা হিসেব করে তারা বিপক্ষ দলের ক্ষতিপূরণ দিল (২০)।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে, মুহাম্মদ যুদ্ধক্ষেত্রে চৌকষ সামরিক দক্ষতা অর্জন করেছিল। বিভিন্ন যুদ্ধ শেষে, অভিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধ সেনাপতিদের সাথে আলাপ করে মুহাম্মদের সামরিক জ্ঞান বেশ সমৃদ্ধ হয়েছিল, যা যুদ্ধের মাধ্যমে পরবর্তীতে তাঁর শাসন বিস্তৃত করার কাজে ভূমিকা রেখেছিল।

যখন আব্রাহা ও তাঁর আবিসিনীয় সৈন্যরা মক্কাভিমুখে যাত্রা করেছিল বিখ্যাত সেই "হস্তি যুদ্ধের" বিশ বছর পর চূড়ান্ত এক ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। আব্দুল মুত্তালিবের কয়েক ডজন নাতি-নাতনিদের মধ্য অন্যতম মুহাম্মদের বয়স ছিল তখন বিশ। কিন্তু মুহাম্মদ ছিল এতিম, দরিদ্র হাশিমী বংশের একজন ধারক মাত্র। এছাড়া মক্কাবাসীর কোন কর্মকাণ্ডে সে আসলে গোনায় ধরার মতো কেউ ছিল না।

বিয়ের পর সবকিছুই পাল্টে যায় ।

অধ্যায় - ৪
সুরক্ষাদাত্রী

ইসলামের আদি গ্রন্থে পাওয়া যায়, আবু তালিব ছিলেন একজন সাধারণ বৃদ্ধ, ঘর ভর্তি তাঁর বাচ্চাকাচ্চা ছিল, যাদেরকে তিনি ঠিকমত খাওয়াতে পারতেন না। তবে এটা সম্ভবত হয়েছিল অতিরিক্ত খরার কারণে। যেহেতু ফসল হতো না, তাই খাদ্যের অভাব প্রকটভাবে দেখা দিয়েছিল। হালিমা উল্লেখ করেন, মুহাম্মদকে পালক নেয়ার পর অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। যখনই মুহাম্মদ খাবারের সময় অনুপস্থিত থাকতেন, খাবারে কোন বরকত থাকত না, ফলে সকলেই ক্ষুধার্তই থেকে যেতেন। আর মুহাম্মদ উপস্থিত থাকলে তখনি খাবারের এত বরকত হতো যে ভরপেটে খেয়ে সবাই মাদুর থেকে পেট ঘষতে ঘষতে তৃপ্তির ঢেঁকুর দিতে দিতে উঠতেন। এমনকি সবাই খেয়েও খাবার বেঁচে যেত!

আবু তালিব ধনী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর মানে এই নয় যে, তাঁর পরিবারের সবাইকে খাওয়ানোর জন্য তাঁর ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছিল। আবদুল মুত্তালিবের বেঁচে থাকা পুত্রদের মধ্যে তিনিই ছিলেন বড় এবং বিশিষ্ট, যার ফলে তিনিই হাশিমি বংশের প্রধান ছিলেন এবং মন্দিরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কর্তা ছিলেন। কোন একসময় তিনি মন্দিরের দেখভালের দায়িত্ব তাঁর ছোটভাইকে দিয়ে দেন, আর তিনি নিজে ব্যবসায় মনোযোগ দেন। হাশিমি গোত্রের প্রধান হবার কারণে সবাই তাঁকে বিশ্বাস করতেন যে, তিনি ব্যবসায় ভালো করতে পারবেন। তিনি ছিলেন বিনয়ী স্বভাবের, যার ফলে তিনি চুক্তি সম্পাদনের বেলায় অত তীক্ষ্ণ স্বভাবের ছিলেন না, তাই তিনি অপরপক্ষকে অনেক বেশি ছাড় দিতেন। এককথায় তিনি ছিলেন দোদুল্যমান স্বভাবের। তবুও এটা সন্দেহ করার কোন কারণ নেই যে, ঐ সময়ে তিনি তাঁর নিজের সন্তান এবং 'বাড়তি ঝামেলা' মুহাম্মদকে নিয়ে তাঁর বড় পরিবারের খাবার জোগাতে অক্ষম ছিলেন।

মুহাম্মদ আবু তালিবের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সাথে মন্দিরের কাছে ছোট একটি ঘরে থাকতেন। বড় ছেলে তালিব (Talib) ছিল মোহাম্মদের সমসাময়িক। আকিল (Aqil) এবং জাফর (Jafar) ছিলেন ছোট। আলী, যিনি পরে মুহাম্মদের ধর্মের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং ভবিষ্যতের খলিফা হয়ে উঠবেন, তিনি তখনো জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর বেশ কয়েকটি মেয়ে ছিল জুমানা (Jumana), তাইতা (Tayta) এবং ফখিতা (Fakhita)। তৃতীয়জনকে সবাই তাঁর মায়ের নামে ফাতিমা বলে ডাকতেন, পরে তাঁর নাম হয়ে যায় উম্মে হানি তথা হানির মা। মুহাম্মদ যখন কিশোর বয়সে, তখন তিনি উম্মে হানির প্রেমে পড়েন। তিনি তাঁর চাচার কাছে উম্মে হানিকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দেন। যদিও আরবে রক্তের সম্পর্কের ভেতর বিয়ে বৈধ ছিল, কিন্তু চাচা তাঁকে নাকচ করে দেন। এটা সম্ভবত মুহাম্মদ যেহেতু আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ছিলেন না সেজন্য। অধিকন্তু, তিনি মাখজুম গোত্রের (Makhzums) এক সফল ব্যবসায়ীর সাথে হানির বিয়ে ঠিক করেন। এই মাখজুম গোত্র কুসাইর বংশ থেকেই আগত। আবু তালিবের মা ছিলেন সেই গোত্রের মেয়ে, এবং ছিলেন আবু তালিবের প্রথম চাচাতো বোন। ফখিতার বিয়ে শেষমেশ মাখজুম গোত্রেই হয়, যার ফলে মুহাম্মদের হৃদয় ভেঙে যায়।

ইসলামিক উৎসসমূহে, সেই সময়ে আমরা মুহাম্মদের তেমন কোন কর্মসংস্থানের উল্লেখ পাই না। শুধু দেখতে পাওয়া যায় যে, তিনি কাফেলা বাণিজ্যে সক্রিয় ভূমিকা রাখতেন। তাও শুধুমাত্র একটা কাফেলা অভিযানের কথা পাওয়া যায়, মূলত এই কাফেলা যাত্রায়ই মুহাম্মদকে খাদিজার সাথে মিলিত হবার এবং পরবর্তীতে পঁচিশ বছর বয়সে তাঁকে বিয়ের পথকে সুগম করেছিল। ইবনে সাদ লেখেনঃ মুহাম্মদ সক্রিয়ভাবে কর্মসংস্থানের সন্ধান করেননি, এজন্য তাঁর চাচা তাঁকে তীব্র নিন্দা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন মুহাম্মদের এখন কাজের সন্ধান করা উচিত। তিনি তাঁকে একটি ব্যবসার সন্ধান দেন এবং তাতে লেগে থাকার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, "আমি গরিব মানুষ, আমরা কঠিন দিন পার করছি, খাদিজা বিনতে খুওয়ালিদ (Khadijah bint Khuwaylid) তাঁর পণ্য নিয়ে সিরিয়ায় লোক পাঠায়, তুমি যদি তাঁর কাছে গিয়ে বলো যে তুমি এই

কাফেলায় যেতে চাও, সে তোমাকে গ্রহণ করবে”(১)। আবু তালিব ইতিমধ্যে কাজের জন্য সবকিছু প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। যখনই তিনি জানতে পারলেন যে, খাদিজা কাফেলার জন্য লোক খুঁজছে তিনি পাহাড়ের পথ ধরে খাদিজার বাড়িতে গিয়ে তাঁর ভাতিজাকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন।
সমস্ত গ্রন্থের বিবরণ অনুসারে খাদিজা ছিলেন এক ব্যতিক্রমী নারী। ছিলেন বুদ্ধিমতি, সুন্দরী এবং ধনী। তিনি মক্কার বণিক খুওয়ালিদের (Khuwaylid) কন্যা ছিলেন। কিছু কিছু বিবরণ অনুসারে, খুওয়ালিদকে পবিত্র যুদ্ধের সময় হত্যা করা হয়েছিল। আবার অনেকেই দাবি করেন, খাদিজা-মুহাম্মদের বিবাহের সময় খুওয়ালিদ বেঁচে ছিলেন। খাদিজা মূলত এই বাণিজ্য তাঁর বাবার কাছ থেকে শিখেছিলেন। তিনি সিরিয়া এবং ইয়েমেনের প্রধান বাণিজ্যিক কাফেলার অর্থের জোগান দিতেন। তিনি সম্ভবত পশ্চিম আরবের ছোট ছোট অঞ্চলগুলো যেমন তায়েফ, নাজরান এবং ইয়াছরিবেও বাণিজ্য করতেন (২)। যদিও এটা কোথাও পাওয়া যায় না তিনি কি ধরনের ব্যবসায় জড়িত ছিলেন। মক্কায় তখন অন্যান্য ব্যবসার মধ্যে কেউ চামড়ার তৈরি জিনিস, আবার কেউ কেউ খনিজ পণ্য, কেউ আবার উট ও গাধা বিক্রি করতেন। জুদান (Judan) নামের একজন ছিলেন যিনি দাসদাসী বিক্রি করতেন। তারা বাণিজ্য থেকে ফিরে আসার সময় বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য যেমন কাঠ, সুগন্ধি, শুকনো খাবার ইত্যাদি নিয়ে আসতেন, যা আবার মক্কাবাসীদের কাছে বিক্রি করে লাভবান হতেন। যা বিক্রি হতো না তা গুদামজাত করে রাখতেন পরবর্তী কাফেলার জন্য। উল্লেখ আছে, খাদিজার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তিনি পূর্বের বরর সাথে দুই বা তিন সন্তানের জন্ম দেন। তন্মধ্যে প্রথম সন্তান তাঁর বরর মৃত্যুর সময়ই মারা যান, আরেকজন তাঁর তালাকের পর মারা যান। তাঁকে অনেক ধনী মক্কাবাসী বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠান, তিনি তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন।

পঁচিশ বছর বয়সে মুহাম্মদ দেখতে মোটামুটি ছিলেন। লম্বায় ছিলেন মধ্যম আকারের, প্রশস্ত কাঁধ, মাথাটা ছিল বড়, মুখ ছিল গোলাকৃতির এবং মুখ ছিল দাড়ি ভর্তি। সেই সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিনি কালো বা সাদা পাগড়ি পড়তেন, অবশিষ্ট কাপড় একটু লেজের মতো ঝুলিয়ে রাখতেন, যাতে মরুভূমির বালুর ঝড়ের সময় তিনি টেনে মুখ ঢাকতে পারেন। তবে সাধারণত তিনি এই কাপড়টুকু তাঁর কাঁধের উপর রাখতেন অথবা তাঁর পিঠের পেছনে ঝুলতে থাকত। তাঁর চোখ সবসময় রক্তাক্ত থাকত, তবে সেটা নেশার কারণে নয়। তিনি খুবই দ্রতগতিতে হাঁটতেন। তিনি বাস্তব চিন্তার চেয়ে অনেক বেশি স্বপ্নবাজ, কম কথা বলার মানুষ ছিলেন। তিনি নিজে কম কথা বলতেন তবে মনযোগ নিয়ে অন্যদের কথোপকথন শুনতেন। তিনি কথা শোনার সময় অন্যের চোখে খুব কমই তাকাতেন, বরঞ্চ তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতেন। তিনি বেশিরভাগ সময় বিষাদগ্রস্ত থাকতেন, এটা সম্ভবত তাঁর স্নায়বিক সমস্যার কারণেই হতো, যা তাঁর সারাটা জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। তাঁর চরিত্রের আকর্ষণীয় বিষয় ছিল তাঁর শিষ্টাচার এবং সততা, যা তাঁকে সুপরিচিতি দান করে। হালিমার কাছে থাকার সময়কালে তিনি ভালো আরবি শিখেছিলেন, যার ফলে তিনি খুব ভালো আরবি বলতে এবং মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা দিতে পারতেন (৩)।

এটা নিশ্চিত যে, মুহাম্মদ এবং খাদিজার মধ্যে বেশ জানাশোনা ছিল। মুহাম্মদের ফুপু সাফিয়া তখন খাদিজার ভাইদের মধ্যে একজন যার নাম আওয়াম (Awwam) তাঁকে বিয়ে করেছিলেন, এদের একটা সন্তানও হয়। এর ফলে খাদিজা ও মুহাম্মদের মধ্যে একটা আত্মীয়তার সম্পর্কও তৈরি হয়। আবু তালিবের সুপারিশের পর খাদিজা মুহাম্মদকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর একজন কর্মী হিসেবে নিযুক্ত করলেন। মুহাম্মদ তাঁর উটের পিঠে চড়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য একজন দাস তাঁর সঙ্গে দেয়া হলো। ইসলামের ইতিহাসে শুধুমাত্র নবী মুহাম্মদ সিরিয়ায় গিয়ে বিচক্ষণতার সাথে দর কষাকষির মাধ্যমে খাদিজার বিনিয়োগ দ্বিগুণ করা ছাড়া তেমন কোনো প্রশংসাপূর্ণ কাজের বিবরণ পাওয়া যায় না এবং সাহিত্যে এই যাত্রাপথ সম্পর্কে তেমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য বিবরণও নেই। মুর (Muir) অনুমান করেন যে, মুহাম্মদ সম্ভবত গাজার তীরবর্তী ভূমধ্যসাগর বন্দর পর্যন্ত পৌঁছে ছিলেন। এই বন্দরটিতে মক্কাবাসীরা ঘনঘন যাতায়াত করতেন, এমনকি কোরানে জাহাজ নিয়ে একটি আয়াত পর্যন্ত আছে: “like Mountains Riding Furious seas,”। নিজ চোখে ঝড়ো ভূমধ্যসাগর এবং সমুদ্রের অস্থিরতা দেখেই তাঁর পক্ষে এমন কাহিনী রচনা সম্ভব হয়েছিল (৪)।

তাঁর সফরের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণের পরিবর্তে আমরা বরং ভবিষ্যতে মুহাম্মদের নবী হয়ে উঠার বর্ণনাই দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ, মুহাম্মদের কাফেলা যখন সিরিয়ার এক খ্রিস্টান সন্ন্যাসীর ঘরের কাছে থামল, নাস্তুর (Nastur) নামের এক প্রবীণ প্রজ্ঞাবান লোক তাঁর সান্নিধ্যে আসলেন। নাস্তুরের কাছে বেশকিছু প্রাচীন খ্রিস্টধর্মের আকর গ্রন্থ ছিল, যেখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা একজন নবীর আগমনের বিবরণ মোহাম্মদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সেখানে উল্লেখ ছিল, খ্রিস্ট ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্যতের একজন নবী আসবেন যিনি একটি গাছের নিচে বসবেন। যখন মুহাম্মদ তাঁর উট থেকে নেমে সেই গাছের ছায়ায় বসলেন, তখন তাঁর দিকে এই সন্ন্যাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। তাঁকে দেখার পর সন্ন্যাসী উত্তেজিত হয়ে খাদিজার দাসকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। দাস তাঁকে জানান, "তিনি পবিত্র কুরাইশ গোত্রের বংশধর। নাস্তুর (Nastur) তাঁকে বলেন, "একমাত্র নবী ছাড়া কেউ এই গাছের নিচে বসেনি"। এই সন্ন্যাসী আবার জিজ্ঞেস করেন, "তাঁর চোখ লালচে কী না? দাস উত্তর দেন, "হ্যা! সবসময়ই লালচে থাকে''। আরেক সংস্করণে পাওয়া যায়, এই সন্ন্যাসী ঘোষণা করেছিলেন যে, মুহাম্মদ কেবল একজন নবীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন নবীদের মধ্যে ''সর্বশেষ'' এবং তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদকে সর্বশেষ নবী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল। ইসলামিক ইতিহাসে এ-ও লেখা আছে, মুহাম্মদের সাথে থাকা দাস দেখতে পেলেন, মরুভূমির উত্তাপ থেকে বাঁচাতে দুইজন স্বর্গদূত মুহাম্মদকে ডানা দিয়ে ছায়া দিচ্ছিলেন (৫)।

মোহাম্মদের জীবনী লেখকগণ মুহাম্মদ আর খাদিজার বিবাহটিকে একটা ঐশ্বরিক রূপ দিতেই বিভিন্ন দেবদূতের অবতারণা করেছেন। একজন প্রহরী ইতোমধ্যেই সিরিয়া থেকে কাফেলার আগমনের খবর নিয়ে আসেন। পুরো শহরের সবাই তাদেরকে সম্ভাষণের জন্য জড়ো হন। খাদিজা আর বেশ কয়েকজন মহিলাসহ তাঁর পাহাড়ের বাড়ির ছাদে অপেক্ষা করতে থাকেন, যেখান থেকে তিনি পরিষ্কার টাউন হল দেখতে পেতেন। সেই বিকেলে ক্লান্ত কাফেলার বহর, সশস্ত্র প্রহরী, অগুনিত পণ্যবাহী উটের বহর শহরে ঢুকে টাউন হলের সামনে থামে, যেখানে মানুষ স্বাগত জানানোর জড়ো হয়েছিল। উটের বহর থেকে বের হয়ে মুহাম্মদকে খাদিজার বাড়ির দিকে যেতে দেখা গিয়েছিল। মুহাম্মদ যখনই খাদিজার বাড়ির নিকট পৌঁছলেন, তখনই খাদিজা দেখলেন, দুজন স্বর্গদূত মুহাম্মদকে ছায়া দিচ্ছেন। তিনি তাঁর সঙ্গে থাকা মহিলাদের এই দৃশ্য দেখালেন, তারাও এটা দেখে আশ্চর্যান্বিত হলো (৬)।

মুহাম্মদের সাথে আসা ভৃত্যটি সুসংবাদ দিতে সবার আগে খাদিজার ঘরের অভিমুখে রওয়ানা দিয়েছিলেন। সেই দাস খ্রিস্টান সন্ন্যাসীর বলা সব কথা, আর তাঁর ফিরতি পথে নিজের চোখে দেখা মুহাম্মদের উপর ফেরেশতাদের ছায়া ফেলার ঘটনা খাদিজাকে বলেছিল। খাদিজা এসব শুনে নিশ্চয়ই আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে একজন নবী আসবেন; প্রকৃতপক্ষে, সমগ্র আরবেই এমন একজন নির্বাচিত নবীর কথা সবাই শুনে আসছিল, যিনি নতুন ধর্ম নিয়ে আসবেন। জীবনীগ্রন্থে এমনটাই লেখা। আর এই সেই নির্বাচিত লোক, যে সফর শেষে দ্বিগুণ মুনাফা নিয়ে তাঁর বাসায় হাজির হলেন। খাদিজার মনে এই ভাবনাই কাজ করছিল যে, ইনিই সেই ব্যক্তি যাকে তিনি বাণিজ্য মিশনে পাঠিয়েছিলেন এবং যিনি অধিকতর লভ্যাংশ নিয়ে ফিরে এসেছেন! খাদিজা খুশি হয়ে চুক্তির চেয়েও দ্বিগুণ মূল্য পরিশোধ করেছিলেন। চারটির পরিবর্তে আটটি উট প্রদান করেন এবং বিব্রতকর অবস্থা এড়ানোর জন্য মুহাম্মদের কাছে তাঁর বান্ধবী নাফিসাকে (Nafisa) পাঠান। নাফিসা নানান গল্প করতে করতে মুহাম্মদকে বলেন, তাঁর যেহেতু পঁচিশ বছর হয়েছে এটা তাঁর বিয়ের বয়স। মুহাম্মদ তাঁকে উত্তর দেন, "আমার বিবাহ করার কোনো উপায় নাই"। নাফিসা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "যদি দেখতে সুন্দর, পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জন করে, ধন সম্পদের মালিক, মর্যাদাপূর্ণ কোন নারীর কাছ থেকে বিবাহের প্রস্তাব পান, আপনি কি তবে তা গ্রহণ করবেন?" মুহাম্মদ তখন বুঝতে পারেন নাফিসা আসলে খাদিজার কথা বলছেন। মুহাম্মদ জবাবে বলেন, "কিভাবে সম্ভব!" নাফিসা উত্তর দেন, "চিন্তা করবেন না, সব ব্যবস্থা করব" (৭)। অতঃপর মুহাম্মদ তাঁর চাচাকে তাঁর বিয়ের প্রস্তাবের ব্যাপারে জানান। বিয়ে ছিল তখন গোত্রীয় বিষয়; রীতিনীতি অনুসরণ করার চল ছিল। ইসলামিক ইতিহাসের এক জায়গায় পাওয়া যায়, খাদিজার বাবা তখন জীবিত ছিলেন না। আবু তালিব তাঁর ভাই হামজা এবং আব্বাসকে নিয়ে খাদিজার চাচা আমর

(Amr) এর ঘরে যান বিয়ের কথাবার্তা বলতে। যৌতুক হিসেবে তারা পঁচিশটি নারী উট ধার্য করেন যা ছিল পাঁচশো দিরহামের সমতুল্য এবং অর্ধেক অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। এই অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ পাওয়াস যায় না, তবে সম্ভবত মুহাম্মদের হাশেমী গোত্র এবং খাদিজার আসাদ গোত্রের বিপুল সংখ্যক লোক উপস্থিত ছিল। খাদিজার চাচা উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়ে তাদের বিয়ে পড়ান। একটা উট এবং এক বা দুটো ছাগল জবাই করে অতিথিদের খাওয়ানো হয়। আবার আরেক সংস্করণে দেখতে পাওয়া যায়, তাদের বিবাহ এত সহজে সংঘটিত হয়নি। খাদিজার বাবা খুওয়ালিদ (Khuwaylid) তখনও বেঁচে ছিলেন। মুহাম্মদের মক্কায় স্থায়ী কোন ব্যবস্থা না থাকায় খাদিজার বাবা এই বিবাহের পুরোপুরি বিরোধিতা করেছিলেন। মোহাম্মদের অর্থ ছিল খুব সামান্য পরিমাণের এবং তাঁর নিকটাত্মীয়রাও অর্থবান ছিলেন না। মক্কায় তাঁর চেয়ে অনেক ভালো অর্থবান এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের প্রস্তাব আসত খাদিজার জন্য। তবে সত্য হচ্ছে, খুওয়ালিদ এ সমস্ত প্রস্তাবকে না করে দিতেন। ইসলামিক ইতিহাসে আরো পাওয়া যায় যে, খাদিজা তাঁর বাবাকে মদ্যপান করিয়ে তাঁকে মাতাল করলে তিনি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তখন খাদিজা তাঁকে সুন্দর ডোরাকাটা একটা পোষাক পরিয়ে, গায়ে সুগন্ধি মাখিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে নিয়ে আসেন। অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে বাকি অনুষ্ঠান তিনি নাক ডেকে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেন। হুঁশ ফিরলে গায়ের পোষাক ও সুগন্ধি, এত খাবারের আয়োজন দেখে তিনি উপলক্ষ জানতে চান। খাদিজা জবাব দেন, "আপনি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদের সাথে আমার বিবাহ দিয়েছেন"। তিনি জবাব দেন, "না, আমি এই কাজ করিনি। মক্কার সম্ভ্রান্ত পুরুষেরা তোমাকে চেয়েছে, আমি না করে দিয়েছি" (৮)। অন্য আরেক জায়গায় পাওয়া যায়, খাদিজা ও মুহাম্মদ দু'জনেই খুওয়ালিদকে মাতাল করার ষড়যন্ত্র করেছিল। তারপর তাঁকে একটি সুন্দর পোশাক পরিয়ে এবং তাঁর মাধ্যমে বিয়ের ঘোষণা দেন। পিতা বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সাথে কি করা হয়েছে। তিনি রাগান্বিত হয়ে তলোয়ার হাতে নিয়ে মারতে উদ্যত হন। তবে মুহাম্মদের আত্মীয়স্বজনেরা এসে তাঁকে থামান এবং শেষপর্যন্ত বুঝিয়ে তাঁর মেয়ের বিয়ের অনুমোদনের ব্যবস্থা করেন (৯)। মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের বিবাহটি এইভাবে ব্যাখা করা যায়ঃ মুহাম্মদের জীবনের পূর্বকালীন ঘটনা, যেমন তাঁর মায়ের কাছ থেকে বঞ্চিত হওয়া, তারপর তাঁর পালক মায়ের কাছ থেকে প্রত্যাখান এবং আকস্মিক মায়ের মৃত্যু তাঁর ভেতর শুন্যতার তৈরি করেছিল যা পূরণ করতে খাদিজার মতো কোন একজন চরিত্র তাঁর জীবনে দরকার ছিল। খাদিজা তাঁর মা এবং স্ত্রীর ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া ফেরেশতাদের কল্পকাহিনী ছাড়া আর কিভাবে এই আকর্ষণের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? এ জাতীয় আবেগময় অনুভূতির আদানপ্রদান অবশ্যই মনের অবচেতন স্তরে ঘটে থাকে। সচেতন অবস্থায় মুহাম্মদ অবশ্যই এই সম্পর্কের হিসেব-নিকেশ করেছিলেন এবং এটি তাঁর জন্য একটা ভালো ফলাফল বয়ে আনবে, নিশ্চিতভাবেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। খাদিজা সম্পদশালীর হবার কারণে এটা নিশ্চিত ছিল যে, মুহাম্মদকে তাঁর চাচার উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভর করতে হবে না। এরপর থেকে তিনি জানতেন যে, তিনি সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যেই থাকবেন। খাদিজার সামাজিক খ্যাতিও তিনি ব্যবহার করতে পারবেন, যেটা তাঁর ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

খাদিজা-মুহাম্মদের বিয়ে হয় ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে। সংসার করেন পঁচিশ বছর। খাদিজা-মোহাম্মদের চার কন্যাসন্তান, দুই বা তিন পুত্রসন্তান ছিল। ছেলেদের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে এই ব্যাপারে একমত যে, তাঁর ছেলেসন্তান খুব অল্প বয়সে মারা যায়। তাঁর বড় পুত্রের নাম ছিল কাসিম। মুহাম্মদকে সবাই আবুল-কাসিম (Abu al-Qasim) নামে ডাকতেন, যার অর্থ কাসিমের পিতা। কিন্তু কাসিম তাঁর দ্বিতীয় জন্মদিনে পৌঁছানোর আগেই মৃত্যুবরণ করেন। এই নিষ্ঠুর ঘটনা মুহাম্মদের জীবনকে আবার অবসাদে ঢেকে দেয়। মুহাম্মদের জীবনী লেখকরা সহ পরবর্তীতে পশ্চিমা লেখকদের সবাই, তাঁর জীবনের সাথে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক ঘটনারগুলোর প্রতি তেমন কোন নজর দেননি! অথচ বারবার মুহাম্মদের জীবনে ঘটে যাওয়া এই ঘটনার দ্বারা তিনি আসলে ভেতরে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। বিষাদগ্রস্ত স্বভাবের মুহাম্মদের জীবনে একের পর এক মর্মান্তিক ঘটনা, বিশেষ করে কাসিমের মৃত্যু তাঁকে জীবনের মৌলিক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে ভাবিত করে এবং তাঁর সময়কালের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর তাঁর সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে। তাঁর শেষ ছেলেও মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু চার মেয়ে জীবিত ছিলেন।

তারা ছিলেন জয়নাব (Zaynab), রুকায়াইয়া (Ruqaya), উম্মে কুলছুম (Umm Kulthum) এবং ফাতিমা (Fatima) (১০)।

খাদিজা নিয়মিতই গর্ভধারণ করেছিলেন এবং একের পর এক সন্তানের জন্ম দিয়ে গেছেন। মোহাম্মদের ফুফুর একজন দাসী সর্বদাই ধাত্রীর কাজটি করতেন। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি ছেলের জন্য দুটো ছাগল এবং মেয়ে হলে একটি করে ছাগল কোরবানি করতেন। বাচ্চা জন্মের আগে আগে খাদিজা দুধমাতা নিযুক্ত করতেন। তবে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তারা হালিমার মতো মাতা ছিলেন না যারা বাচ্চাকে মায়ের কাছ থেকে নিয়ে দূরে কোথাও বসবাস করতেন। সম্ভবত এই দুধমাতারা তাদের পরিবারের নিকটবর্তী বাসিন্দা বা খাদিজা-মুহাম্মদ পরিবারের কর্মচারী, দাসীদের মধ্যে ছিলেন। দাসদাসী, ঘরের ধরণ আর আসবাবের মধ্যে পার্থক্য ছাড়া, তাঁর বাড়ির ভেতরকার পরিবেশের সাথে অন্যান্য পরিবারের তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। বাচ্চারা উঠোনে আর সিঁড়িতে একে অন্যকে তাড়া করে ফিরত খেলার ছলে। গালিচার ইঁদুরগুলি কার্পেট মোড়ানো মেঝেতে লুকাত আর তাদের অভিভাবকরা তাদের শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করত। সম্পদশালী খাদিজার বাড়িতে সর্বদাই শ্বশুরবাড়ির লোকজন অথবা বন্ধুবান্ধবদের আসা-যাওয়া থাকত। বাড়িটি খাদিজার ব্যবসায়িক অফিস হিসেবেও ব্যবহার করা হতো। এখানে বসেই বিনিয়োগের পরিকল্পনা করা হতো এবং চুক্তি সম্পাদন হতো। মুহম্মদ এরপর আর কোন কাফেলা ভ্রমণে অংশ নিয়েছিলেন কি না জানা না গেলেও, ব্যবসায়িকভাবে তিনি জড়িত ছিলেন তা জানা যায়। খাদিজাকে বিয়ের মাধ্যমে মুহাম্মদ মক্কাবাসী নানান বিষয়ে প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন, এবং অনেকেই তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইতেন। এটা আরো পরিষ্কার হয়ে যায়, যখন তাঁর পালক মাতা হালিমা যিনি তাঁকে পথিমধ্যে রেখে চলে গিয়েছিল, তিনিও তাঁকে দেখতে চলে আসেন। হালিমা যে অঞ্চলটিতে থাকতেন, খরার কারণে পশুপালন বা ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে দুর্ভোগ নেমে এসেছিল। হালিমার অনেক পশু মারা যায়, তাই হালিমা তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য এসেছিলেন। মুহম্মদ খাদিজার সাথে এ বিষয়ে তাঁর মতামত চাইলে খাজিদা তাঁকে চল্লিশটি মেষ দেন এবং একটি উট ভর্তি করে জিনিসপত্র দেন। এ থেকে বোঝা যায়, মুহামদ যদি নিজে এই গবাদিপশুর মালিক হতেন, তাহলে হয়তো খাদিজার মতামত ছাড়াই তাঁকে সাহায্য করতেন (১১)।

খাদিজার পূর্ববর্তী বিবাহের সন্তান এবং মুহাম্মদ-খদিজার নিজেদের বাচ্চাদের পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি ছেলের দায়িত্ব মুহাম্মদ নিয়েছিলেন; যারা পরবর্তীতে তাঁর ধর্মের প্রসারে মূল খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিলেন। তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন আবু তালিবের কনিষ্ঠ পুত্র আলী। ভবিষ্যতের খলিফা এই আলীর জন্ম হয়েছিল মুহাম্মদ ও খাদিজার বিবাহের কয়েক বছর পরে। জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যায়, আলীর জন্ম হয়েছিল ছাদবিহীন মন্দিরের অভ্যন্তরে ৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে। উল্লেখ আছে, মুহাম্মদ-খাদিজা আলীকে দেখতে আসার পরই নবজাতক আলী চোখ খুলে তাকান। আলীর পিতা-মাতা তাঁর নাম জায়েদ বা আসাদ রাখতে চেয়েছিলেন, মুহাম্মদ তাকে আলী নামে অভিহিত করেন। আলী নামটি এসেছিল আল্লাহ নাম থেকে। মক্কার এই আল্লাহ দেবতা ছিলেন সকল দেবতাদের মধ্যে উপরের মর্যাদার, যার কাছে সমস্ত দেবতারা পরাধীন ছিলেন। এই নামটি ধারণ করার আরেকটি কারণ ছিল এই যে, আলীর মা আলীকে মন্দিরের ভেতর জন্ম দিয়েছিলেন। আলী তার পিতামাতার সাথে পাঁচ কি ছয় বছর পর্যন্ত ছিল, তারপরই সে নবী মুহাম্মদের দেহরক্ষীতে পরিণত হয়। খরা ও দুর্ভিক্ষের সময়কালে হালিমা ঠিক যেই কারণে মুহাম্মদের কাছে সাহায্যের জন্য আসেছিলেন, ঠিক একই কারণে আলীকে সম্ভবত মুহাম্মদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার বাবা । আবু তালিবের পক্ষে তাঁর বড় পরিবারকে খাবার জোগাড় প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তাই তিনি মুহাম্মদকে অনুরোধ করেন আলীকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে। আবু তালিবের আরেক ভাইয়ের অবস্থা একটু ভালো থাকায়, তিনি তাঁর আরেক ছেলে, ১৫ বছর বয়সী জাফরকে ঐ ভাইয়ের কাছে দিয়ে দেন (১২)।

মুহাম্মদের ঘরে আরেক সদস্য ছিল, যে ছিল ক্রীতদাস। নাম জায়েদ। জায়েদ ছিল ইয়েমেনের খ্রিস্টান গোত্রের। ডাকাত দল যখন জায়েদ যে কাফেলায় ছিল সে কাফেলা আক্রমণ করে, তখন তারা আটবছর বয়সী জায়েদকে বন্দি করে। বলা হয়

জায়েদ ছিলেন মিশ্র জাতির সন্তান, অর্ধেক আবিসিনিয়ান, অর্ধেক আরব, এবং আফ্রিকান বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছিলেন। জায়েদকে ওকাযের (Ukaz) মেলায় উঠানো হয় দাস হিসেবে বিক্রি করার জন্য, এবং জায়েদকে খাদিজার ভাগ্নে হাকিম দেখতে পায়। হাকিম ছেলেটি কিনে খাদিজাকে উপহার হিসেবে দেয়। মুহাম্মদও বালকের প্রতি বেশ আগ্রহী হয়েছিলেন, কারণ তিনি যে কাজগুলি দিয়েছিলেন তা খুবই মনোযোগের সাথে সম্পাদন করত জায়েদ। তাঁর স্বভাব ছিল খুবই মায়াবী, এবং আরও একটি কারণ ছিল এই যে, জায়েদ ছিল আবিসিনিয়ার-খ্রিস্টান বংশোদ্ভূত। সে তার ধর্ম সম্পর্কে অল্প কিছু জানত এবং মুহাম্মদের সাথে এই নিয়ে কথা বলত। খাদিজা তাকে মুহাম্মদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, যিনি তাকে ছেলের মতো বড় করেছিলেন। তাদের মধ্যে যে সত্যিকারের ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল যখন জায়েদের পিতা হারিছা (Haritha) সাত বছর পর খোঁজ পেয়ে ছেলেকে কিনে ফেরত নেয়ার জন্য অর্থ নিয়ে মক্কায় হাজির হন। কিন্তু মুহাম্মাদ মুক্তিপণের অর্থ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। জায়েদকে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয়েছিলেন, তবে সিদ্ধান্তটি ছেড়ে দিয়েছিলেন জায়েদের উপর। ততদিনে মুহাম্মদের সাথে জায়েদের একটা গভীর বন্ধন গড়ে উঠেছিল, যে তাঁর দাস হওয়া সত্ত্বেও ভাল ব্যবহার পেয়েছিল, আর তাই তার কাছে নিজের বাবাই এখন প্রায় অপরিচিত। ফলশ্রুতিতে, জায়েদ মুহাম্মদের সাথেই থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। এর জবাবে মুহাম্মদ জায়েদকে নিয়ে কাবাঘরে নিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, তিনি জায়েদকে তাঁর পুত্র হিসেবে গ্রহণ করছেন। এরপর তিনি জায়েদ ইবনে মুহাম্মদ বা 'মুহাম্মদের পুত্র জায়েদ' নামে পরিচিত হয়েছিলেন (১৩)।

তারপর আরেক সদস্য ছিলেন জুবায়ের। জুবায়ের মুহাম্মদের ফুফু সাফিয়া এবং খাদিজার ভাই আউওয়ামের (Awwam) পুত্র ছিলেন, যিনি মুহাম্মদ-খাদিজা বিবাহের আগের বছর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু অল্প বয়সে তার বাবা মারা গিয়েছিলেন, জুবায়ের প্রায়শই খাদিজার বাড়িতে আসতেন এবং দীর্ঘমেয়াদে থাকতেন। আরও একটা কারণ ছিল, তার মা তার উপর গুরুতর নির্যাতন করতেন। সাফিয়া একজন বদমেজাজি মহিলা ছিলেন। তিনি শৃঙ্খলা পছন্দ করতেন, তাই প্রায়শই ছেলেকে বীভৎস মারধর করতেন। নওফাল নামের এক চাচা একবার তাঁর এই বীভৎসতার সাক্ষী হয়েছিলেন এবং তাদের বংশের মুরুব্বিদের কাছে এ সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন। সাফিয়া জোর গলায় বলেছিলেন, উনি যা করছেন তা তাঁর ছেলের ভালোর জন্য করছেন। তিনি বলেন: "যে বা যারা মনে করে যে আমি জুবায়েরকে খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে মারছি, তারা আসলে ভুল করছেন, তাঁকে আমি মারধর করি এজন্য যাতে সে জ্ঞানী ও সাহসী হয়ে বড় হয় এবং শত্রুদের পরাভূত করে সম্পদের মালিক হয়" (১৪)। এর ফলস্বরূপ, জুবায়ের অনেকটা সহিংস চরিত্রের হয়। উল্লেখ পাওয়া যায়, সে এক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সাথে লড়াইয়ের জড়িয়েছিল। জুবায়ের লোকটিকে এত শক্তভাবে ঘুষি দিয়েছিল যে, লোকটির হাত ভেঙে যায়। সম্ভবত লড়াইটি সেই শুরু করেছিল। লোকজন যখন সাফিয়ার কাছে বিচার নিয়ে আসে, মনে হতে থাকে সাফিয়া বরং ছেলের এই আচরণে গর্বিতই! সাফিয়া তাদেরকে উল্টো জিজ্ঞেস করেছিলেন, ''আপনারা জুবায়েরকে কেমন দেখলেন, সাহসী নাকি কাপুরুষ?''

পরবর্তীতে তিন যুবক - আলী, জায়েদ এবং জুবায়ের শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদের অভ্যন্তরীণ বৃত্তের মূল সদস্য হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর যোদ্ধাদের মধ্যে এই তিনজনই সবচেয়ে বেশি উগ্র বলে গণ্য হয়েছিল। এছাড়াও পরিবারের আরেকজন সদস্য ছিলেন বারাকা (Baraka), তিনি ছিলেন আবিসিনিয়ার ক্রীতদাসী এবং মুহাম্মদের বাবার দাসী। তিনি ছয় বছর বয়সী মুহাম্মদের সাথে ছিলেন। যখন মায়ের মৃত্যু হলো তখন মুহাম্মদকে তিনি দেখাশুনা করতেন। যার ফলে তিনি গুরুত্বপূর্ণ একজন হয়ে উঠেছিলেন এবং পুরো সময়টা তিনি আবু তালিবের সাথে কাটিয়েছিলেন। মুহম্মদ তাঁকে খুব পছন্দ করতেন, প্রায়শই তাঁকে মা বলে ডাকতেন।

খাদিজার সাথে বিয়ের পর তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং এরপর বারাকা ইয়াছরিবের এক লোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সেখানেই চলে যান। তিনি এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন, যার নাম ছিল আইমান (Ayman)। বাচ্চার জন্মের পরপরই তাঁর বর মারা যান এবং এরপরই তিনি মক্কায় তাঁর সন্তানকে নিয়ে তাঁর প্রাক্তন প্রভুর কাছে আবার ফিরে আসেন। পরে মুহাম্মদ জায়েদকে বারাকার সাথে বিয়ে করার জন্য রাজি করিয়েছিলেন, যদিও তখন তাঁর বয়স জায়েদের বয়সের

দ্বিগুণ ছিল। তাদের ঘরে একটা পুত্রসন্তান জন্ম হয়, যার নাম ছিল ওসামা। এই ওসামাই পরবর্তীতে মুহাম্মদের অনুসারীদের মধ্যে অন্যতম ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিলেন।

৬০৫ খ্রিস্টাব্দে, মুহাম্মদ যখন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী ছিলেন, বন্যার জলের কারণে চাঁদের মন্দির অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হবার ফলে এই মন্দিরটির সংস্কার করা অতি জরুরি হয়ে পড়ে। সাধারণত মক্কায় ভারি বৃষ্টিপাত ছিল বিরল ঘটনা। কিন্তু মাঝেমধ্যে প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের কারণে আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হতো, যার ফলে জল উপত্যকা দিয়ে নদীর তলদেশে যেত। যেহেতু মন্দিরটি নদীর তীরেই ছিল, সুতরাং এই ধরণের বন্যায় মন্দিরটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। কুসাইর (Qusay) পর এই মন্দিরটির আর সংস্কার করা হয়নি, কিন্তু মন্দিরটি ছাদহীনই ছিল, আয়তক্ষেত্রাকার প্রাচীরগুলো একতলা বিল্ডিংয়ের উচ্চতার সমান ছিল। সে বছর হঠাৎ বন্যায় দেয়ালগুলির একটি ভেঙে গেলে, মক্কার শক্তিমানেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে এটিকে মাটি থেকে পুনর্নির্মাণ করা দরকার, এবং মন্দিরটি যেহতু শহরের বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল তাই এটির সংস্কার করা জরুরি। তার মানে, মন্দির এবার ছাদবিশিষ্ট হবে (১৫)।

পুনর্গঠন প্রকল্পটি ছিল একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোগ। মক্কার প্রায় চল্লিশ মাইল পশ্চিমে লোহিত সাগরের কাছে একটি মাছের পল্লী এবং ছোট্ট একটি বন্দর ছিল। সেখানে জেদ্দার নিকটবর্তী বাইজেন্টাইন বণিক জাহাজের ধ্বংসাবশেষ ছিল, এই মন্দিরের সংস্কারে তা ব্যবহৃত হয়েছিল। মক্কাবাসীরা এই ধ্বংসাবশেষ ক্রয় করে, তা খণ্ড খণ্ড করে মক্কায় নিয়ে আসে। মক্কায় নির্মাণের জন্য কাঠের সরবরাহ কম ছিল এবং এর সাথে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং সরঞ্জামও ছিল না। সুতরাং মন্দিরের সংস্কার কাজের জন্য তারা ওই জাহাজের ক্যাপ্টেন বাউকামকে (Baqum) নিয়োগ দিয়েছিল, কারণ তিনি ছিলেন একজন রাজমিস্ত্রি। তবে মক্কাবাসীদের নির্মাণ সামগ্রী জোগাড় করা ছাড়াও মন্দির পুনর্নিমাণের দ্বারা যদি তারা দেবতাদেরকে অসন্তুষ্ট করেন, সেই ভয়ও ছিল বিদ্যমান। তাই তারা প্রার্থনার আয়োজন করেছিলেন। মখজুম (Makhzum) গোত্রের প্রধান এবং শীর্ষস্থানীয় মক্কাবাসীদের একজন তাদের হাতে কুড়াল তুলে নিলেন এবং দেবতাদের আশ্বস্ত করে একটি প্রার্থনা করেছিলেন যে, ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই তারা এই কাজ করছেন। তারপরই দেয়ালের এক অংশ তারা ভেঙে ফেললেন। তারা দেখতে পেলেন, আকাশ থেকে একগুচ্ছ আলো পড়ল। ভাবলেন, হুবাল দেবতা তার ক্রোধ এইভাবেই প্রকাশ করেছেন। মক্কার অধিবাসীদের কেউই ভয়ে পরদিন সকাল অবধি ওয়ালিদের (প্রথম ভাঙ্গার কাজ তিনিই করেছিলেন) সাথে কাজে যোগ দিতে সাহস করেনি, কিন্তু তারা এর পরেরদিন তাঁকে জীবিত এবং সুস্থই দেখতে পেলেন, আর সকলে তখন তাঁর সাথে কাজে যোগ দিলেন (১৬)।

কুরাইশ গোষ্ঠীর সকলেই সাধ্যমত অর্থ এবং জনবল সরবরাহ করে প্রকল্পে অংশ নিয়েছিল। মুহাম্মদ পাশের পাহাড় থেকে পাথর নিয়ে এসে কাজে অংশ নিয়েছিলেন। বাউকামের (Baqum) নির্দেশ অনুযায়ী, বড় পাথরগুলিকে ছাঁটাই করে ব্লক আকারের তৈরি করা হয়েছিল দৃঢ়ভাবে আটকে রাখার জন্য। ভবিষ্যতে বন্যায় যাতে আবার নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য মাটি থেকে আট ফুট উচ্চতায় পাথরের পাটাতন তৈরি করা হয়েছিল। দেয়ালগুলি গোড়ার দিকে একগজের চেয়েও বেশি পুরু করা হয়েছিল এবং সম্পূর্ণ কাঠামোটি প্রায় চল্লিশ ফুটের মত উঁচু করা হয়েছিল। মেঝেটি তৈরি করার সময় মক্কাবাসীরা কালো পাথরটি স্থাপনের বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ল। পবিত্র পাথরটিকে খুব সাবধানে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল, নতুন প্রাচীরের কোণে। এটি পুনরায় স্থাপন করা দরকার। মাটি থেকে পাঁচফুট উঁচুতে পাথরটিকে রাখার জন্য একটি কুলুঙ্গি প্রস্তুত করা হয়েছিল। মক্কাবাসীরা একমত হতে পারছিলেন না কোন গোত্র এই কালো পাথরটিকে স্থাপনের দায়িত্ব পালন করবেন। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, কেননা মক্কাবাসী প্রায়ই মতভেদের একপর্যায়ে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ত। শেষপর্যন্ত সালিশে বসে সবাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, হাশিমী প্রতিবেশী থেকে বেরিয়ে আসা প্রথম ব্যক্তিটি সিদ্ধান্ত নিবে বিষয়টি কীভাবে নিস্পত্তি করা হবে। সেই ব্যাক্তিটিই ছিলেন মুহাম্মদ এবং তিনিই ন্যায়সঙ্গত সমাধান দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর আচ্ছাদনটি মাটিতে রেখে তাদেরকে কালো পাথরটি ওটার মাঝখানে রাখার জন্য বলেছিলেন। তাঁরপরে প্রতিটি দল আচ্ছাদনটির একটি

কোণ ধরেছিল। তারা একসাথে পাথরটি তুলেছিল যাতে এটি কুলুঙ্গিতে বসানো যায়। মুহম্মদকে পাথরটি ঠেলে জায়গমতো বসানোর সম্মান দেয়া হয়েছিল। ছাদের জন্য তারা উদ্ধারকৃত কাঠগুলি ব্যবহার করেছিলেন। ছাদটিকে ধরে রাখতে জাহাজের মাস্তুল থেকে থেকে ছয়টি স্তম্ভ কাটা হয়েছিল (১৭)। শেষ কাজ হিসেবে, মোটা দরজা অব্দি একটি পাথরের সরু সিঁড়ি তৈরি করা হলো। সমাপ্ত হওয়ার পরে, মন্দিরটি প্রায় ঘনকের আকার ধারণ করে। যার ফলে মক্কাবাসীরা এটি "কাবা" নামে অভিহিত করেছিল। কাবা মানে ঘণাকার। এই প্রথম মক্কার মন্দিরের সাথে এই কাবা শব্দটির ব্যবহার করা হয়। নতুন মন্দিরে উত্তর-পশ্চিম দেয়ালের পাশে নির্মিত একটি অর্ধবৃত্তাকার পাথরের মেঝে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই মন্দিরটির মেঝেও একই উচ্চতায় নির্মিত হয়েছিল। মক্কাবাসীরা প্রথমে এটি দালানের সাথে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করেছিল, যা দেখতে কিছুটা প্রথম দিকের খ্রিস্টীয় চার্চের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে উঠত। মুহাম্মদ পরে মন্তব্য করেছিলেন যে, অর্থ ও নির্মাণ সামগ্রী শেষ হয়ে যাওয়ায় এই বিভাগটি বাদ দেয়া হয়েছিল ((১৮)। এর পরিবর্তে মেঝের উপরে অল্প উচ্চতায় পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ লোকদের জন্য বৈঠকের স্থান হয়ে উঠেছিল। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মাসগুলিতে ছায়ার জন্য শামিয়ানা টানানো হতো।

এই কাবা নির্মাণকালে মুহাম্মদ আরও একবার মৃগীরোগের শিকার হয়েছিলেন। এটি ঘটেছিল যখন তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে নগ্ন হওয়ার জন্য চাপ দেয়। তৎকালীন সময়ে নির্মাণকর্মীদের মধ্যে এই অনুশীলনটি প্রচলিত ছিল। ভারি পাথর বহন করার সময় তাদের কাঁধ রক্ষা করার জন্য শ্রমিকরা তাদের কোমরের কাপড়টি খুলে একটা ঘন বালিশের মতো বানিয়ে কাঁধে রাখতেন যাতে পাথর বহনের সময় এটি কুশন হিসেবে কাজ করে। অত্যন্ত লাজুক মুহাম্মদ তাঁর কাপড় খুলতে নারাজ ছিলেন, তবে তাঁর চাচা আবু তালিব এবং আব্বাস উভয়ই তাঁকে অন্য সবার মতো করতে বলেছিল। মানসিক চাপের কারণে তিনি কাপড় খোলার সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান, যা আসলে ঘটেছিল মৃগীরোগের কারণে। তিনি কতক্ষণ অচেতন ছিলেন তা জানা যায়নি কিন্তু যখন তিনি হুঁশ ফিরে পান তখন চিৎকার করেছিলেন, “আমার কোমরের চাদর! আমার কোমরের চাদর!” এবং খুব দ্রুত কাপড়টি আবার পরে নেন। জীবনীকারকরা এটি একটি ঐশ্বরিক ঘটনা হিসেবে প্রমাণ করেছেন, যেখানে মুহাম্মদের এই কাজ দ্বারা শালীনতার একটি শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। তিনি কোথাও থেকে এমন একটি আওয়াজ শুনতে পান, যেখানে তাঁকে আদেশ দেয়া হয়ঃ "তোমার নগ্নতা থেকে সাবধান থেকো!" (১৯) তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি একটি কণ্ঠস্বর শুনেছেন, এটা যদি সত্য হয় — আর এটা প্রথমবার শুনেছেন বলে দাবি করেছেন — এটা আসলে তাঁর শ্রবণাঙ্গীয় ভ্রম (auditory hallucination) যা মৃগীরোগের আরেকটি লক্ষণের প্রমাণ বহন করে। মুখ বাঁচাতে মুহাম্মদ দাবি করেছিলেন যে তিনি পিছলে পড়ে গেছেন, কিন্তু অচেতন অবস্থায় যে লোকেরা তাঁর মুখ দেখেছিল তারা জানতেন এটি নিছক পিছলে যাওয়ার দুর্ঘটনা না। মুহাম্মদ আর কখনও নিজের শরীর কাউকে দেখাননি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর পরবর্তী স্ত্রীগুলির মধ্যে একজন উল্লেখ করেছিলেন, তাঁর সাথে বসবাসের দীর্ঘ সময়কালে তিনি একবারও তাঁর গোপনাঙ্গ দেখেননি (২০)।

মুহাম্মদ তাঁর শরীর এবং কর্মের জন্য অত্যন্ত লজ্জা পেয়েছিলেন, বিশেষ করে মলত্যাগ সম্পর্কে বহু উপাখ্যান পাওয়া যায়। ধনী বা দরিদ্র মক্কার কারো বাড়িতে স্যানিটারি সুবিধা ছিল না এবং বেশিরভাগ লোকেরা ঝোপঝাড়ে প্রাকৃতিক কাজ সারতেন। সম্ভবত তারা গণশৌচাগার ব্যবস্থা চালু করেছিলেন, কিন্তু তাতে কোন গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হতো না। আদি গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়, মুহাম্মদ প্রাকৃতিক কাজ সারতে অনেক সময় নিতেন, যদিও মক্কার বাইরে যেতে খুব বেশি সময় লাগার কথা না। আসলে তিনি এই কাজের জন্য বহুদূরে চলে যেতেন যাতে কেউ দেখতে না পায়। মুহাম্মদের এই ঘটনার সাথে শালীনতার বিষয়টিকে যুক্ত করে এমন গল্প তৈরি হয়েছে, যা অনেক সময় এইরকম হাস্যরসাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। যেমন একদিন সবার দৃষ্টির আড়ালে যেতে একটা জায়গা খোঁজার সময়, মুহাম্মদ শুনতে পেলেনঃ “হে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক”। এটা শুনে মুহাম্মদ বিচলিত হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলেন খোঁজার জন্য তাঁকে এই কথা কে বলেছে। (২১)

তারচেয়েও হাস্যকর বিষয় ছিল, জীবনী বর্ণনাকারীরা বলেছেন, মুহাম্মদ মলত্যাগের সময় গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য প্রকৃতির সাহায্য নিয়েছিলেন। একটি উদাহরণে পাওয়া যায়, একবার যখন তিনি কোন গোপন স্থান খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তখন তিনি তাঁর সাথে আসা একজন রাখাল বালক, ইবনে মাসুদকে কয়েকটি গাছের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "যাও এবং তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বল যে, আল্লাহর রাসূল আমাকে আপনাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। আপনারা একত্রিত হোন যতক্ষণ না তিনি আপনাদের পেছনে প্রাকৃতিক কাজ শেষ করেন"। ইবনে মাসুদের নির্দেশনানুসারে গাছগুলো ঠিক তাই অনুসরণ করেছিল, রক্ষাকারী হিসেবে একত্রিত হয়ে মুহাম্মদের গোপনীয়তা রক্ষা করেছিল। গল্পে দেখা যায় যে, যখন তাঁর কাজ শেষ হয়েছিল, গাছগুলি আবার আগের অবস্থানে ফিরে গেল (২২)।

মুহাম্মদের জীবনের প্রথম বছরগুলির ইতিহাস খুব বেশী পৌরাণিক কাহিনী দ্বারা মিশ্রিত এবং যার ফলে তাঁর শৈশব ও মাঝবয়সের একটা সামগ্রিক জীবনচরিত অঙ্কন করা কঠিন। অন্যান্য অনেক বিষয়ের সাথে সাথে আমরা তাঁর কর্মসংস্থানের বিষয়ে জানতে পারি না। তিনি কি শুধু বৈবাহিক পরিমন্ডলেই অবদান রেখেছিলেন, নাকি তিনি স্ত্রীর সম্পদের উপর বেঁচে ছিলেন? ইসলামিক ইতিহাসবিদরা একজন সহনশীল ব্যক্তির চিত্র উপস্থাপন করেছেন, তবে এই চিত্রটি পরবর্তী মুহাম্মদের তুলনার সাথে মেলে না। কেননা, পরবর্তীতে এমন একজন ব্যক্তির গল্প আমরা পাই, যারাই তাঁকে নবী হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে বা বিশ্বাসের বিরোধিতা করেছে তাঁর উপরই তিনি বর্বর নির্যাতন করেছেন এবং তাদের জন্য এক নিষ্ঠুর অত্যাচারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। একটি শিশু যদি একজন মানুষের পিতা হয়, তাহলে পিতাকে নিয়ে লিখনিসমূহে সেই শিশুর বর্ণনা উপেক্ষিত হতে পারে না।

সম্মিলিত ধর্মীয় আকর গ্রন্থগুলো থেকে অন্তত এটা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে উপসংহারে আসা যায় যে, খাদিজা মোহাম্মদের সাথে থাকার সময় এবং তাঁর জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত মুহাম্মদের বন্ধু, সমর্থক ছিলেন। ছিলেন সকল কাজের উৎসাহদাতা, অর্থের জোগানদাতা এবং সুরক্ষক। মানসিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে নড়বড়ে অবস্থানের কারণে খাদিজার মত একজন শক্তিশালী, সংবেদনশীল নারী মুহাম্মদের খুব প্রয়োজন ছিল। খাদিজার সাহায্য ছাড়া হয়ত তাঁর ধর্ম কখনোই মক্কার উপত্যকার সংকীর্ণ সীমার বাইরে যেতে পারত না।

অধ্যায় – ৫

গুহামানব

মুহাম্মদ তৎকালীন মক্কার বহুশ্বরবাদী সমাজে বেড়ে উঠেছিলেন। জীবনের চল্লিশ বছর অব্দি এসেও সবধরনের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। এমনকি তিনি দেবতার উদ্দেশ্যে পশুবলিও মেনে নিয়েছিলেন। এ এমন এক জীবনধারা, যা পরবর্তী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বয়ে চলেছিল, অন্তত দেড় হাজার বছর ধরে। মুহাম্মদের বহু আগেই, উত্তর ও দক্ষিণ আরবের প্যাগান রাজ্যসমূহের উত্থানপতনের সাথে খুব সামান্যই এর ব্যত্যয় ঘটেছিল। কাবা মন্দিরকে ঘিরে এই সংস্কৃতি এখন বেশ পাকাপোক্ত অবস্থানে এসেছে, পশ্চিম আরবে তীর্থযাত্রীদের আচার-অনুষ্ঠানে অগ্রগতির সূচনা করেছে। অন্যান্য আরবদের মতো আচার-অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত হলেও মুহাম্মদ এসবের সত্যতা নিয়ে ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু করেন।

হাত ও হাঁটু অবনত করে প্রার্থনারত ভঙিতে মুহাম্মদের জন্ম হয়েছিল বলা হয় যে ইসলামিক সাহিত্যে, পরবর্তীতে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিরূপণ কঠিন হয়ে যায়। এটার নেপথ্যে আবেগ ও যুক্তির প্রভাব রয়েছে। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল, তার প্রথম ছেলে কাসিমের মৃত্যু। ইসলামিক ইতিহাসে এই মৃত্যুর কারণ উল্লেখ না থাকলেও, দ্বিতীয় জন্মদিনের আগেই তার মৃত্যুর বর্ণনা আছে। আকস্মিক হারানোর বেদনায় প্রচন্ড এই মানসিক আঘাত, মুহাম্মদের বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অসুস্থ বাচ্চাটি বাঁচার জন্য ছটফট করছিল, তা দেখতে থাকা মুহাম্মদ ও খাদিজার কষ্ট সহজেই অনুমান করা যায়। তাদের হাতের মাঝে এই শিশুর বাঁচার তীব্র আকুতি ছিল, আর মাত্র একদিনের ব্যবধানেই সে লাশ হয়ে গেল। এরপর তাঁকে মাটিচাপা দেয়া হলো, শোকার্ত মানুষের ভীড়ে। কবরে সমাহিত করার পর পুত্র হারানোর শোকে কাতর মা-বাবা বাসায় ফিরে এলো। ছেলেকে হারিয়ে তারা কাঁদছিল। এই দৃশ্যটা কল্পনা করলে দেখা যাচ্ছে, ঘরের এককোণে একটা পাথরের দেবতা আছে, যার আছে নাক, দুটো আয়তাকার বা গোল পাথরের চোখ, আর মুখে স্বস্তির হাসি। বেদির উপর এটা উপবিষ্ট, যাতে মনে হচ্ছে নিচে সবার দিকে তাকিয়ে আছে। অশ্রুসজল চোখে মুহাম্মদ কি ঐ দেবতার দিকে ফিরে তাকিয়েছে? তাঁর কণ্ঠ বেয়ে কি অভিশাপ দানা বেঁধে উঠেছে?

মক্কাবাসীরা যতই দরিদ্র হোক, অধিকাংশের ঘরেই দেবদেবীর নানা মূর্তি থাকত। সেগুলোর একটি থাকত প্রধান দেবতার, আর বাকিগুলো বিভিন্ন গোত্র বা ব্যক্তিগত। খাদিজার ঘরটিও ব্যতিক্রম ছিল না। তিনি আল উজ্জা (al Uzza) দেবীর উপাসক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এমনকি, এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, তিনি তাঁর সন্তানের নাম রেখেছিলেন আবদ আল উজ্জা (Abd al-Uzza) তথা উজ্জার ভৃত্য। (1) কাসিম ছিল ডাকনাম, যার মানে "যে সবার সাথে মিলেমিশে থাকে"। তার জন্মের পর তিনি ও মুহাম্মদ দেবীর উদ্দেশ্যে দুটি পশু উৎসর্গ করেন, খুব সম্ভবত মক্কা মন্দিরের বাইরের মাঠের বেদীতে। আল উজ্জা দেবী ছিলেন প্রধান দেবী। তাঁর উপাসনা করার অর্থ ছিল জীবনের সকল শক্তির উপাসনা করা। যীশুর মাতার জন্য খ্রিস্টানদের যেরকম ভক্তি, উজ্জার প্রতিও সবার তেমনই ভক্তি ছিল। মক্কা হতে পূর্বে কয়েকদিনের দূরত্বে, পাহাড়ের পাদদেশ সংলগ্ন বাবলা গাছের মাঝে নাখলায় (Nakhla) একটা সাদামাটা মন্দিরে তাঁর উপাসনা হতো। প্যাগান রীতি অনুযায়ী, রক্ত উৎসর্গের মাধ্যমে মিনতি করাই ছিল দেবতাদের তুষ্ট করার উপায়। কিছু পাওয়ার জন্য কিছু দেয়া। খাদিজা যখন তাঁর নবজাতক শিশুকে কাপড়ে মুড়ে রেখেছিলেন, মুহাম্মদ তখন পশুদের গলা কেটে কোরবানি দিয়েছিলেন, দেবতার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। পশু কোরবানির পর, তাদের রক্ত যখন বেদী গড়িয়ে মাটিতে এসে পড়ত, খাদিজা ও মুহাম্মদ তখন নবজাতক শিশুকে উপহার হিসেবে পাওয়ায় কাতর হয়ে মিনতি করে কৃতজ্ঞতা জানালেন, প্রার্থনার মাধ্যমে। সন্তানের নিরাপত্তার জন্য, তারা তাদের সন্তানকে মক্কার সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পরম করুণাময় আল্লাহর মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আল উজ্জা দেবীর কাছে সমর্পণ করেছিলেন। প্রচলিত রেওয়াজ মেনে, মুহাম্মদকে নাক দিয়ে দেবীর পাথরের প্রতিকৃতির গায়ে লেগে থাকা রক্তের গন্ধ শুঁকে নিতে হতো, দেবীর শক্তির সান্নিধ্য পেতে।

[ছবি ছবির বর্ণনা: মক্কার মন্দিরটার নাম ছিল কাবা; এর অর্থ 'ঘনক' (Cube)। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর 605 খ্রিস্টাব্দে এটি পুনর্নির্মাণ করা হলে এই নাম দেয়া হয়। 35 বছর বয়সী মুহাম্মদ এটির নির্মাণকাজে নতুন শ্রমিক হিসেবে অংশ নেন। মেরামতের আগে এটি ছিল পাথরের স্তুপ করে বানানো নিচু দেয়ালে ঘেরা, ছাদবিহীন আয়তাকার একতলা দালান। মূল মন্দিরটি কয়েকশত বছর আগে চন্দ্রপূজায় নিবেদিত ছিল, যার এক কোণে কালো উল্কা পাথরটা বসানো ছিল।]

কিন্তু এখন আল উজ্জা দেবীর সদ্যোজাত মানব শিশুটি মাটির নিচে। তাঁরা তার নিরাপত্তা কামনা করেছিল, অথচ সে মারা গেল। কেন? তাদের এই সন্তান যদি মারাই যাবে, তবে এই দেবীর শক্তিটা কোথায়? তারা কি প্রতারিত হয়েছে? যে কেউ মুহাম্মদের ভেতরকার উস্কে উঠা ক্রোধ বুঝতে পারবে, যেখানে তিনি আল উজ্জাকে জিজ্ঞেস করছেন, কেন সে তাঁর প্রিয় ছেলেকে রক্ষা করল না। কিন্তু দেবীমা তাঁকে উত্তর দেয়নি, আর মুহাম্মদ ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। তাঁর বারবার মনে পড়তে লাগল মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর বুক কিভাবে খালি হয়ে গিয়েছিল। সে তাকিয়ে দেখেছিল, মক্কায় তাঁর দাদা আর আল আবওয়ায় (al-Abwa) তাঁর মাকে কিভাবে কবরে মাটি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছিলেন। এতিম বলে তাঁকে কিভাবে পরিত্যাগ করা হয়েছে, তাঁর দুর্ভাগ্যের কারণে দারিদ্র্য ও নিচু সামাজিক অবস্থান তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। সে চিৎকার করে আরো জানতে চাইলো: "তুমি আর অন্য দেবতারা তখন কোথায় ছিলে? সবাই কেন কষ্ট পাচ্ছে? এসবের অর্থ কি? বলো আমাকে"।

কিন্তু, উত্তর মিলল না, কেবলই নীরবতা!

তাঁর মাঝে চিন্তার উদ্রেক হয়েছিল, সম্ভবত যখন যে আবু তালিবের সাথে সিরিয়া ভ্রমণে গিয়ে বিদেশি সংস্কৃতি ও বিভিন্ন ধর্মের সংস্পর্শে এসেছিল। ঐ সফরের প্রভাব তাঁর মনে দাগ কেটেছিল, অন্যান্য আরো সূত্র আর সম্পর্কের গুরুত্ব অনুধাবন করার আগ পর্যন্ত। ধারণা করা হয়, খাদিজার পক্ষ থেকে সিরিয়া সফরে মুহাম্মদ দ্বিতীয়বারের মতো বিদেশি ধর্মের সংস্পর্শে আসে; এতোটা উত্তরে তাঁর আর যাওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে যা কিছু তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, তা বোঝার মতো প্রস্তুতি তাঁর হয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধিমান আর অনুসন্ধিৎসু মুহাম্মদ তাঁর সান্নিধ্যে আসা সবাইকেই নানা প্রশ্ন করত। তারা কেন এটা বলে? ওরা কেন এরকম ভাবে? মক্কায় ফিরে এসেও বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী মুহাম্মদ তাঁর আর অন্যান্য ছেলেদের জন্মের পর দেবতাদের উদ্দেশ্যে কোরবানি দিতে দেখে।

সম্ভবত খাদিজার সাথে বিয়ে তাঁর ভেতরে এসব নিয়ে সবচেয়ে বড় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁর মাধ্যমে প্যাগান সহ বেশ কিছু ধর্মভ্রষ্ট, ছোট দলের সংস্পর্শে মুহাম্মদ এসেছিল। তাঁরা সবাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, সমাজের এসব বিশ্বাস, রীতিনীতি অর্থহীন। এদের মধ্যে ছিলেন মুহাম্মদের বয়োবৃদ্ধ চাচা ওয়ারাকা (Waraqa), যিনি তাঁকে পাঁচবছর বয়সে যখন তিনি পালক বাবা-মাকে ছেড়ে তায়েফে (Taif) পালিয়ে যান ঐ পথে মুহাম্মদকে খুঁজে পেয়েছিলেন। ওয়ারাকা ছিলেন শিক্ষিত ও জ্ঞানী। তিনি জুদাইজম (Judaism) এবং খ্রিস্টধর্মের একটা ধারা নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের মতো করে খ্রিস্টধর্মকে ব্যবহার করতেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনিই নতুন টেস্টামেন্টের (New testament) আরবি অনুবাদ করেছিলেন। এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে, ওয়ারাকা এসব ব্যাপারে মুহাম্মদ আর খাদিজার সাথে আলোচনা করেননি, যখন তারা সবাই তাদের ঘরের প্রধান কক্ষে, দাস দাসীর উপস্থিতিতে চামড়ার বালিশে হেলান দিয়ে আরাম করতেন তখন। খাদিজা একপর্যায়ে খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাস আনেন, যদিও মুহাম্মদ এতটা আশ্বস্ত ছিলেন না। প্রথম দিককার কোরআনের রচনাসমূহে মুহাম্মদকে যীশুর প্রশস্তি করতে দেখা যায়। মুহাম্মদের চাচাত ভাইদের একজনও এই ছোট দলে ছিলেন। একজন ছাড়া সবাইই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। সবার এভাবে প্যাগান ধর্ম ত্যাগ করার ঘটনা, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে মুহাম্মদকে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হতে সাহায্য করেছিল।

মুহাম্মদের উপর যিনি সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তিনি হলেন জায়েদ ইবনে আমর (Zayed ibn Amr)। কর্কশ স্বভাবের ইবনে আমর কারো তোয়াক্কা না করে, সবার মতামতের একেবারে বিরুদ্ধে নিজের সোজাসাপটা মত জানাতেন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে অবজ্ঞা করায়, তিনি মক্কাবাসীদের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। জায়েদ ছিলেন ওয়ারাকার সমবয়সী, মানে মুহাম্মদের চেয়ে ত্রিশ বছরের বড়। অন্যান্য অন্বেষকদের মতোই, জায়েদ প্যাগান ধর্মের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন, আর নতুন কোন ধর্মের খোঁজ করেছিলেন। ওয়াকার মতো তিনিও খ্রিস্টান ও ইহুদিদের বিশ্বাস নিয়ে পড়াশোনার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য উৎসুকদের মাঝে একমাত্র তিনিই সেগুলোকে পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি বলতেন, "আমি খ্রিস্ট আর জুদাইজম (Judaisam) এর ঘ্রাণ নিয়েছি, কিন্তু তাদের আমি পছন্দ করিনি"। (2) জায়েদ সত্যিকার ধর্মের সন্ধানে খ্রিস্টধর্মে রূপান্তরিত সিরিয়া ভ্রমণ করেছিলেন। সাধু, সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক, যাদুকর - কাউকেই তিনি বাদ দেননি। সবাইকে জিজ্ঞেস করতেন, "তোমরা কি বিশ্বাস করো? কেন করো? তোমরা যা বিশ্বাস করো তা কেন করো?"

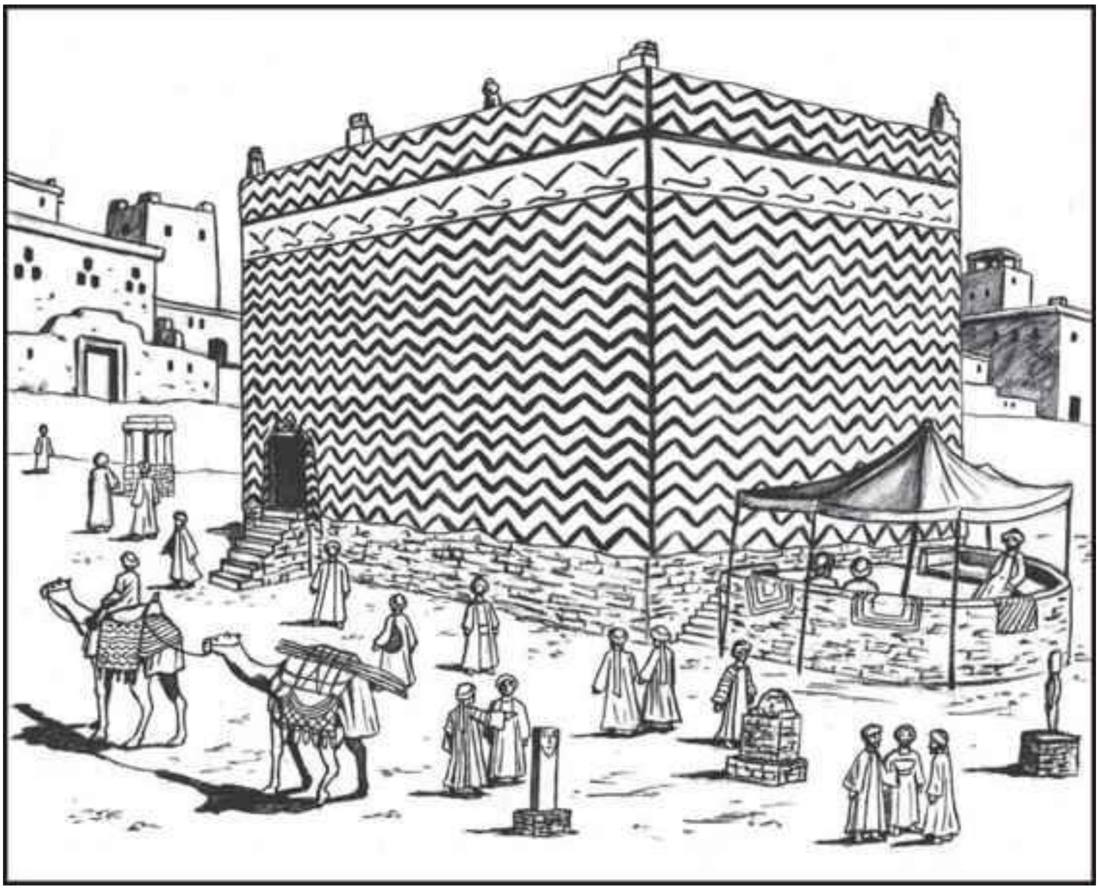
সেই সফরে উনি কি শিখেছিলেন তা অনুমান করা না গেলেও, তিনি নিশ্চিতভাবেই যীশু ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বৈচিত্র্য সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। এসব অভিজ্ঞতাই পরবর্তীতে থাকে খ্রিস্টীয় মতবাদের প্রতি বিতৃষ্ণা এনে দিয়েছিল; আর তাদের বিশ্বাসীরা বেশ বিভক্ত আর ঝগড়াটেও ছিল। তাদের ছিল পবিত্র গ্রন্থ তোরাব (Torah), যাতে তাদের জীবনযাত্রার সব নিয়মনীতি ছিল। ইহুদিরা আব্রাহামের উত্তরসূরী দাবি করার ব্যাপারটা জায়েদকে সবচেয়ে বেশি উৎসুক করে তুলেছিল। আব্রাহাম ছিল মূর্তিভঙ্গকারী, যে তাঁর পিতার তৈরি সব মূর্তি ধ্বংস করে ফেলেছিল, আর এক ঈশ্বরের উপাসনা শুরু করেছিল। উত্তরে সফরের আগ পর্যন্ত, জায়েদ এই ধারণায় দৃঢ় ছিলেন যে, ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের আগে থেকেই একেশ্বরবাদের একটা বিশুদ্ধ রূপ আছে, যাকে তিনি আব্রাহামের ধর্ম বলে অভিহিত করতেন। এটা এমন এক ব্যক্তির ধর্ম, যে দৃঢ়ভাবে এক ঈশ্বরেই বিশ্বাস করতো; আর তা প্রমাণের জন্য সে নিজের ছেলেকে পর্যন্ত কোরবানি দিতে প্রস্তুত ছিল।

পশ্চিমা বোদ্ধারা মোটামুটি ধরে নেন যে, মুহাম্মদের জন্মের বহু আগে থেকেই আব্রাহাম আর অন্যান্য ইহুদিদের কাহিনীসমূহ আরবে প্রচলিত ছিল। যদিও তাঁরা সেই বিষয়ের পরিধি ও গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। পশ্চিম আরবের মরূদ্যানে ইহুদি উপনিবেশ সমূহ হাজার বছর ধরেই গড়ে উঠেছিল, কাজেই সেখানকার প্যাগান প্রতিবেশীর পক্ষে ইহুদিদের নানান গল্প জেনে থাকাটাই স্বাভাবিক।

খ্রিস্টধর্ম প্রচারকেরা ইয়েমেনে প্রচার করে আসছিল যে, আরবরা ছিল আব্রাহামের পরিবারের অংশ, কারণ তাঁর অন্যতম পুত্রের হাত ধরেই তাদের আগমন। মক্কা ও অন্যান্য প্যাগান শহরে আর গ্রামে এরকম গল্পের ভাসাভাসা প্রচলন ছিল, যদিও তারা তা নিশ্চিতভাবেই জানত। জায়েদের সবচেয়ে আকর্ষণের বিষয় ছিল বাইবেলে বর্ণিত দুটো বংশপরম্পরার কাহিনী: একটি সারার (Sarah) পুত্র ইসাক বা আইজ্যাকের (Isaac) মাধ্যমে, অপরটি হাগারের (Hagar) পুত্র ইসমাইলের (Ishmael) পথ ধরে। প্রত্যেকেরই বারোজন করে ছেলে ছিল, যাদের বংশধরেরা বিশাল গোত্রের গোড়াপত্তন করেছিল। জায়েদের ইহুদি ধর্ম বাতিল করার অন্যতম কারণ ছিল, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইসাকের বংশধরেরা আব্রাহামের মূল ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। ইসমাইলের বংশধরেরা আলাদাভাবে গড়ে উঠেছিল, আর সেকারণেই তাঁরা মূল ও বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী আব্রাহামের ধর্মের অনুশীলন করতে পেরেছিল; অথবা জায়েদ সেরকমই বিশ্বাস করতেন। তিনি যদি আব্রাহামের বিশুদ্ধ ধারার অনুসারীদের খোঁজে বের হতেন, তাঁকে মক্কায় খালি হাতে ফিরতে হতো। এটা শুধুমাত্র বিলুপ্তই হয়নি, বরং ইসমাইলের একেশ্বরবাদের বিশুদ্ধতা শুরুতেই বিনষ্ট হয়েছিল।

ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে, উত্তর মরুভূমির নিকটবর্তী পূর্ব-পশ্চিম কাফেলার পথটিতে যাযাবর হিসেবে ইসমাইলী উত্তরসূরিদের বসবাস ছিল। তারা প্রতিবেশী গোত্রদের কাছ থেকে প্যাগান রেওয়াজ, রীতিনীতি আয়ত্ত করেছিল। (৩) পরবর্তীতে তারা কাফেলা বাণিজ্যে অভ্যস্ত হয়ে যায়; প্রথমে অস্ত্রবাহী যোদ্ধা ও দারোয়ান, আর পরে ব্যবসায়ী। একটি

শক্তিশালী প্যাগান ইসমাইলী জোটের বিকাশ ঘটে, কিন্তু অ্যাসিরীয় (Assyrians) আর ব্যবিলনীদের হাতে এই দলবদ্ধতার অবসান ঘটে। প্যাগান সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত ইসমাইলীদের অবশিষ্ট অংশ নাবাতিয়ান (Nabatean) রাজ্যে একীভূত হয়ে যায়। ইয়েমেন হতে সিরিয়া অভিমুখী বাণিজ্য কাফেলার উপর নিয়ন্ত্রণ, আর রাজধানী পেট্রা (Petra) শহরের বাইরে বালিপাথরের তৈরি বাঁধের বাঁকে কবর খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমে এই সভ্যতা নজরে আসে।



কিন্তু ১০৫ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্যের উপরে নাবাতিয়ান নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটল যখন রোম সাম্রাজ্য তার একটি প্রদেশ একে হিসেবে অধিগ্রহণ করে নেয়। চতুর্থ শতাব্দীতে একটি ভূমিকম্পের ফলে নাবাতিয়ানদের মন্দিরগুলি ভেঙে গিয়েছিল, যার মধ্যে মক্কাবাসীদের দ্বারা উপাসনা করা একই দেবদেবীদের জন্য উৎসর্গীকৃত মন্দিরগুলিও ছিল। জায়েদের সময়ে, পেট্রা একটি বিধ্বস্ত ভূতের শহর ছিল এবং নাবাতিয়ান বংশধররা খ্রিস্টধর্মে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এরপরে, ইসমাইলীরা কেবলমাত্র তায়মা (Tayma) ও ডুমার (Duma) মতো জায়গাতেই বাস করত। জায়েদ যে ভিক্ষুদের মুখোমুখি হয়েছিল তাদের একজন তাঁকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছিল যে, তিনি যা খুঁজছেন তা আর নেই (৪)। সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ইসমাইলী গোত্র থাকতে পারে, যারা তাদের আব্রাহামিক বিশ্বাস বজায় রেখেছিল। তবে পঞ্চম শতাব্দীর ধর্মতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিক যাজক সোজোমেন (Sozomen) মনে করেন, ইসমাইলীরা অবশেষে তাদের বহু আগে হারিয়ে ফেলা ইহুদি ভাইদের সাথে চুক্তিতে এসেছিল এবং ইহুদিদের আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি গ্রহণ করেছিল। **জায়েদের সময়কালে এরাও এদের ইসমাইলী পরিচয় হারিয়ে ফেলেছিল** (৫)।

মক্কায় ফিরে আসার পরে জায়েদ আব্রাহামের পৌরাণিক ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। যদিও এই ধরণের বিশ্বাস কি ধারন করে, তা তিনি জানতেন না। জায়েদিজম হল ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা এবং একাকীত্বের প্রতি বিশ্বাস এবং ইব্রাহিমের

উদাহরণ অনুসরণ করে ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ। তিনি এতে আরও কিছু যুক্ত করতে অক্ষম ছিলেন যার জন্য হতাশ হয়েছিলেন এবং চিৎকার করে বলেছিলেন: "হে ঈশ্বর, আমি যদি জানতাম যে আর কি উপায়ে তোমাকে সন্তুষ্ট করা যাবে, তবে আমি সেই অনুযায়ী তোমার উপাসনা করব; তবে আমি তা জানি না" (৬)।

বাইবেলের নবীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জায়েদও মূর্তিপূজা করার জন্য মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন এবং তাদের অবিচারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি বিশেষভাবে কন্যাশিশুদের জীবিত কবর দেয়ার একটি রেওয়াজের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন। ইসলামিক ইতিহাস গ্রন্থে কখনোই এই নির্দিষ্ট ঘটনাসমূহ উদ্ধৃত করা হয়নি, তাই এটি প্রকৃত ঘটনা হলেও সম্ভবত খুব কমই ঘটেছিল। মুহাম্মদ পরে তাঁর কোরানের একটি আয়াতে কন্যাশিশু হত্যার নিন্দা করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভিক্ষ থেকে উদ্ভূত হতাশার কারণে হয়তো তারা এই নিষ্ঠুর কাজটি করত (৭)। বলা হয় যে, জায়েদ যদি এমন কোন ঘটনার কথা শুনতে পেতেন, তবে তিনি পিতামাতার কাছে গিয়ে সেই সন্তানকে নিজেই ভরনপোষণের প্রস্তাব দিতেন। একমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ছাড়া, মক্কাবাসীদের অন্যান্য দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে পশু কোরবানি দেয়াকে তিনি জঘন্য মনে করতেন। আব্রাহামের ঈশ্বর কেবল পশুই সৃষ্টি করেননি, তিনি বৃষ্টিও সৃষ্টি করেছেন যা পেয়ে মাটিতে ঘাসসমূহ বৃদ্ধি পায়, পশুরা সেগুলো খায়। "আর তোমরা তাঁর আল্লাহ ছাড়া অন্যদের নামে তাদের জবাই কর" (৮)। **তিনি কালো প্রস্তরকে চুমু দেয়ার অভ্যাসকেও উপহাস করেছিলেন।** এটা ছিল অর্থহীন। কালো পাথরটি একটি পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়। হতে পারে, তাদের বিশ্বাসমতে এটি বেহেশত থেকে ছিটকে এখানে এসে পড়েছে, তা সত্ত্বেও এটি নিছক পাথরই, এবং কোনোভাবেই এটির আর অন্য কোন প্রভাব নেই। মক্কাবাসীদের পাথর ও কাঠের মূর্তি উপাসনার চেয়ে বেশি কিছু নয়। মক্কা তখনও জায়েদের জন্য নিরাপদ ছিল, তাঁকে মন্দিরের বিরুদ্ধে মক্কাবাসীকে বলতে দেখা গেছে: "হে কুরাইশের লোকেরা! আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে আমি ব্যতীত ইব্রাহিমের ধর্মের কেউ নেই" (৯)।

খোলামেলা স্বভাব এবং উদ্যোগের কারণে জায়েদ এমনকি তাঁর নিজের পরিবারের মধ্যেও শত্রু হয়েছিলেন। তাঁর সৎ ভাই খাত্তাব (Khattab) তাঁর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। খাত্তাব তাঁর বদমেজাজের জন্য পরিচিত ছিলেন। মুহাম্মদের চাচী সাফিয়ার মতো, যিনি তাঁর ছেলে জুবায়েরকে মারতেন, খাত্তাবও তেমনই তাঁর পুত্র উমরের উপর নির্দয় ছিলেন। উমর ছিলেন মুহাম্মদের কাছের একজন, যিনি পরে খলিফা হয়েছিলেন (১০)। একপর্যায়ে খাত্তাব তাঁকে পৌত্তলিক ধর্মত্যাগী সাব্যস্ত করে ঘুষি মেরেছিলেন। এই বৈরিতার পেছনে পারিবারিক সমস্যাও থাকতে পারে, যেহেতু আকর গ্রন্থে এই দিকটায় খুব একটা আলোকপাত করা হয় নাই। জায়েদ ও খাত্তাবের মা একই, কিন্ত জায়েদের বাবা ছিলেন খাত্তাবের ছেলে। ফলে, খাত্তাব একাধারে জায়েদের চাচা ও ভাই ছিলেন (১১)। খাত্তাব ঘটনাক্রমে জায়েদকে মক্কা থেকে বের করে দেন, আর জায়েদ হেরা পর্বতের একটা গুহায় বাস করতে থাকেন। হেরা শহরের একটু উত্তর দিকে পাথরে গড়া আলাদা একটা পর্বত।

তিনি কেবল রাতেই মক্কায় প্রবেশ করতেন। অনুমান করা যায়, তিনি মুহাম্মদ, খাদিজা, ওয়ারাকা এবং এই ধর্ম-অনুসন্ধানকারীদের ছোট দলটির অন্যদের সাথে গোপন বৈঠকের জন্য অন্ধকারের আড়ালে খাদিজার বাড়িতে যেতেন। একপর্যায়ে এই সফরগুলিও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ খাত্তাব জানতে পেরেছিলেন যে জায়েদ রাতে মক্কায় প্রবেশ করছেন। আর তাই তিনি জায়েদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে মক্কাবাসীদের বলে রেখেছিলেন। তিনি নির্বাসিত ছিলেন, তবে সহানুভূতি দেখিয়ে মুহাম্মদ তাঁকে খাবার দিতেন এবং পৌত্তলিক ধর্মের বিপরীতে আব্রাহামের ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে বয়ান শুনতেন।

জায়েদের সমর্থকদের মধ্যে যে মুহাম্মদ ছিলেন তা পরিষ্কার হয়ে যায়, যখন মুহাম্মদ জায়েদের জন্য রান্না করা মাংস নিয়ে গেছিলেন, কিন্তু তাঁকে তাড়া করা হয়েছিল। জায়েদ সে মাংস স্পর্শ করতে অস্বীকার করেছিলেন, যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে এটি এমন একটি পশু থেকে আনা হয়েছিল, যা সম্ভবত পৌত্তলিক দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ উৎসর্গ

করেছিলেন। জায়েদ বলেছিলেন, "তোমার প্রতিমাগুলির সামনে তুমি যা কোরবানি দাও, তা আমি কখনও খাই না। আমি কেবল ঈশ্বরের নামে যা বলা হয়েছে তা খাই" (১২)।

জায়েদ তাঁর মতামত প্রকাশের জন্য কবিতা রচনা করতেন। জায়েদের সংগ্রহে থাকা স্বরচিত কবিতাগুলির মধ্যে একটি এমন কিছু ধারণা প্রকাশ করেছিল, যেগুলো মুহাম্মদ পরবর্তীতে ভিন্ন কাব্যিক আঙ্গিকে বিশদ বর্ণনা করেছিলেনঃ

আমি কি এক ঈশ্বরের উপাসনা করব নাকি হাজার?
যদি আপনি দাবি করেন এমন অনেকগুলি থাকে,
আমি আল-লাত এবং আল-উজ্জা উভয়কেই ত্যাগ করি
কোনও দৃঢ় মনের মানুষ হিসেবে সেটাই করবে।
আমি আল-উজ্জা এবং তাঁর দুই মেয়েকে উপাসনা করব না, (১৩)
আমি বনু আমরের দুটি ছবিও দেখতে যাব না।
আমি হুবালকে উপাসনা করব না যদিও তিনি আমাদের ঈশ্বর ছিলেন
যে দিনগুলিতে আমার বুদ্ধি কম ছিল।
আমি ভাবলাম (রাতে অনেককিছুই অদ্ভুত,
দিবালোকের মধ্যে যা সহজেই বোধ্য),
ঈশ্বর বহু মানুষকে ধ্বংস করেছিলেন
যার আমল সম্পূর্ণ মন্দ ছিল
এবং জনগণের তাকওয়া দ্বারা অন্যকে রক্ষা করেছিল
যাতে একটি ছোট্ট শিশুটি পুরুষত্ব নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে।
একজন মানুষ কিছু সময়ের জন্য শিথিল হয়ে যায় আর পুনরুদ্ধার করতে পারে
বৃষ্টির পরে যেমন গাছের ডাল আবার সঞ্জীবিত হয়।
আমি আমার পালনকর্তার করুণাময়ের সেবা করি
যাতে ক্ষমাশীল প্রভু আমার পাপ ক্ষমা করেন,
সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর।
আপনি যখন ধরে রাখেন তবে আপনি বিনষ্ট হবেন না।
আপনি পূণ্যবানদের উদ্যানগুলিতে বাস করতে দেখবেন,
কাফেরদের জন্য জাহান্নাম আগুন জ্বলছে।
যখন তারা মারা যায়
লজ্জায় তাদের স্তনগুলি যন্ত্রণায় সঙ্কুচিত হবে (১৪)।

জায়েদ মারা যাওয়ার পর তাঁর বয়স সম্পর্কে কিছু জানা যায় না, তবে জানা গেছে যে মন্দিরটি পুনর্নির্মাণের কিছু পরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। একটি সংস্করণে জানা যায়, সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় দক্ষিণ ইরাকে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। হত্যার সন্দেহভাজন বা হত্যার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি। আরেকটা সূত্র তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে না বললেও, ইঙ্গিত দেয় যে তাঁকে হেরা পর্বতে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। ওয়ারাকা তাঁর স্মরণে একটি স্মৃতিগাঁথা রচনা করেছিলেন এবং মুহাম্মদ পরে তাঁর গুণকীর্তন করেছিলেন।

এটা সম্ভব যে মুহাম্মদ তাঁর পুত্রদের মৃত্যুতে, বিশেষত তাঁর প্রথম পুত্রের জন্মের সময়ে যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন, সেটাই প্রথমে তাঁকে জায়েদবাদের (Zaydism) প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তাঁকে হারানোর ফলে যে তীব্র বেদনা মুহাম্মদ পেয়েছিলেন, তারই ধারাবাহিকতায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন প্রিয় পুত্রকে ঈশ্বরের নামে জবাই করার সময় আব্রাহামের কেমন লেগেছিল, যদি না শেষমুহূর্তে ফেরেশতা এসে তাঁকে নিবৃত্ত করতেন। ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রতিদান দিতে আব্রাহাম যে আদেশ পালন করেছিলেন, তা নিজের পুত্রের প্রাণ নেওয়ার মতো ভয়াবহতাকে কমাবে না, পুত্রশোকের গভীরতাও কমাবে না। নিজের জীবনের মূল্যের চেয়েও, ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর আব্রাহামের সমর্পণ ছিল সম্পূর্ণ এবং অবিচল।

জায়েদের মৃত্যুতে, মুহাম্মদ বৌদ্ধিক এবং মানসিক অস্থিরতার সময়কালে প্রবেশ করেছিলেন। জায়েদ ও অন্যান্য উৎস থেকে আসা বিকল্প ধর্মীয় ধারণাগুলি ছিল তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির উপর হাতুড়ি মারার মতো, যা এখন সম্পূর্ণ ধ্বংসের কাছাকাছি। একই সময়ে, তিনি ছিলেন স্নায়বিক এবং মানসিক সমস্যায় ভোগা একজন মানুষ যার মিশ্রণ ঘটছিল, আর সেই সাথে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। মন্দিরটি পুনর্নির্মাণের সময়, তাঁর মৃগীরোগজনিত খিঁচুনির কারণে হেনস্তা তাঁকে প্রচন্ড আঘাত দিয়েছিল, বিশেষত তা যদি জনসম্মুখে প্রথমবার তাঁর এই অসুস্থতার প্রদর্শন হয়ে থাকে। অনেক মক্কাবাসী সেই মুহূর্তে তাঁকে শান্ত করত। তারা মনে করত, মৃগীরোগ আর শয়তানের আছর হাত ধরে চলে। কমপক্ষে, তারা সেই থেকে তাঁকে এক অদ্ভুত সহযোগী হিসেবে দেখবে। অতি সংবেদনশীল মুহাম্মদ, তখন তাদের তিরস্কারকারী দৃষ্টি থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। তাঁর অসুস্থতার প্রকাশ্য প্রদর্শন তাঁর আত্মমর্যাদার ক্ষতি করে, তাই দেখতে পাওয়া যায় তাঁর মধ্যে থাকা আহত ছোট্ট বালকটিকে বারবার আশ্বস্ত করতে হচ্ছিল এই বলে তাঁর ওজন কেবল দশ বা একশো বা এক হাজার লোকের নয়, বরং সম্মিলিত সবার চেয়েই বেশি।

মৃগীরোগ ছাড়াও, তিনি তীব্র মানসিক দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন বলে মনে হয় যা মৃগীর সাথে যুক্ত ছিল, তবে সম্ভবত প্রাথমিক জীবনের ট্রমা থেকে উদ্ভূত একটি পৃথক মানসিক অসুস্থতাও ছিল। তাঁকে ওষুধ খাওয়ানোর দরকার ছিল, তবে এ জাতীয় ব্যাধি মোকাবেলার জন্য কোনও ওষুধ ছিল না, কারণ অনুসন্ধানের জন্য চিকিৎসক এবং সেবাদানকারীও কেউ ছিল না তখন। বারবার ও নিখুঁতভাবে করা শারীরিক কসরত সহকারে জটিল প্রার্থনার রীতিনীতি বর্ণনা ও অনুশীলন করে তিনি শেষপর্যন্ত দুশ্চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন।

জায়েদ এবং অন্যান্য মতবিরোধীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি ধর্মীয় প্রশ্নে মগ্ন হয়েছিলেন। মুহাম্মদের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা সঠিক হওয়া উচিত ছিল, যেহেতু সেটা তাঁর পৌত্তলিক ঐতিহ্য সম্পর্কে বৈধ সন্দেহের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল। তবে সেটা তাঁর স্নায়বিক ব্যাধির কারণে আবেশের স্তরে উন্নীত হয়েছিল। স্নায়বিক শক্তি তাঁর বৈধ পূর্ব ধারণাকে বড় করে তুলে উদ্বেগকে আরও খারাপ করে দিচ্ছিল, কারণ সে তাঁর পুরনো বিশ্বাসগুলি প্রতিস্থাপন না করেই সরিয়ে দিচ্ছিল। তা সত্ত্বেও, নতুন কিছুর নিরাপত্তা তাঁকে আবদ্ধ করে রেখেছিল প্রতিনয়ত, যাকে আজকের দিনে 'অস্তিত্ব সংকট' হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় (১৫)।
সর্বদা অসামাজিক হয়ে মুহাম্মদ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করলেন। কথিত আছে, তিনি হেরা পর্বতের চূড়ার নিকটে একটি গুহায় ধ্যান করে একাকী দিন কাটিয়েছিলেন, সম্ভবত একই গুহায় জায়েদও বাস করতেন। গুহার প্রবেশপথ থেকে নিচে মক্কার একটি উঁচু দৃশ্য এবং এর বাইরে বাদামি পর্বত এবং শুকনো উপত্যকা দৃশ্যমান ছিল। কিছু ইসলামিক সাহিত্যে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রমজান মাসে রোজা রাখার অনুশীলন শুরু করতে হেরা পাহাড়ে গিয়েছিলেন। তবে এটি অসম্ভব ছিল, কেননা রমজানের রোজা পরবর্তী সময়কার আবিষ্কার ছিল। অন্যান্য সূত্রসমুহে বলা হয় যে, তিনি কয়েকদিন পরপর খাবার মজুদের উদ্দেশ্যে বাসায় ফিরে আসতেন, যাতে ধরে নেয়া যায় যে তিনি উপবাসে নিয়োজিত ছিলেন না, তবে তিনি একাকী সময় কাটানোতে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। এটি তাঁর জন্য মানসিকভাবে যন্ত্রণাদায়ক সময় ছিল। নিজের কাছে উত্থাপিত প্রতিটি প্রশ্নই তাঁকে আরও প্রশ্নের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর মনে প্রশ্নের উদয় হতে থাকে - অস্তিত্বের বাস্তবতা

এবং এর মধ্যে থাকা সমস্ত অভিজ্ঞতা, ভালো-মন্দ কীভাবে তুমি ব্যাখ্যা করবে? চাঁদ বা সূর্য কীভাবে এটির ব্যাখ্যা করতে পারে যার উপাসনা মক্কাবাসী করে? চাঁদ, সূর্য কি তোমাকে সাহায্য করতে পারে? উত্তর যদি পূর্বপুরুষদের দেবদেবী এবং অন্যান্য উপাসনার উপাদানসমূহে পাওয়া না যায়, তবে কি ইব্রাহিমের ঈশ্বরের মধ্যে পাওয়া যাবে, যিনি চাঁদ ও সূর্য সহ সবকিছুর স্রষ্টা? এই ঈশ্বরের প্রকৃতি কি ছিল? মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক কী ছিল? এটি নিরর্থকতার একটি অনুশীলন ছিল, শক্ত কিছু নিয়ে আসার আশায় বাতাস দখল করার মতো। তিনি কিছু প্রশ্ন চিন্তা করে যাচ্ছিলেন, যেগুলোর নিশ্চিত কোন উত্তর নেই বিশ্বাস করা ছাড়া, কিন্তু কিসের উপর বিশ্বাস? পুরষ্কার ও শাস্তির ঈশ্বর, স্বর্গ আর নরকের ঈশ্বর? পরলোক বলে কি কিছু আছে, এবং সেটা কি জায়েদের কবিতার সেই বাগান? একটি বস্তু-সর্বস্ব বেহেশত? তাইলে বস্তু-সর্বস্ব নরকও থাকবে, আগুন আর জলন্ত মাংসের স্থানও? এই দুনিয়ার দুঃখকষ্ট কি যথেষ্ট না? না জানার কারণে তিনি যত বেশি যন্ত্রণা পাচ্ছিলেন, ততই তিনি বোঝার দিকে নিজেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি যতই বুঝতে পারছিলেন যে উত্তরগুলি তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না, উত্তরগুলির জন্য তিনি ততই মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। তিনি এ্যাডভার্ড মঞ্চের (Advard Munch) আঁকা ছবির বেদনাময় চরিত্র হয়ে উঠলেন। **তাঁকে নিশ্চয়তার স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছতে হবে, অথবা তিনি পাগল হয়ে যাবেন, যা অনেকেই ইতিমধ্যে তাঁকে নিয়ে মনে করে।**

আবেগময় ও বৌদ্ধিক উত্থানের এই সময়কালে, সন্দেহ ও যন্ত্রণায় আবদ্ধ মুহাম্মদের অতি সচল মস্তিষ্ক-উদ্ভূত আকর্ষণীয় কিন্তু ভ্রমজনিত অভিজ্ঞতা যেন মুক্তির স্বাদ নিয়ে এলো; যা তাঁকে প্রবোধ দিয়েছিল এই বলে যে, তিনি মহান সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রেরিত বিশেষ অতুলনীয় একজন। এটি হয়েছিল ৬১০ খ্রিস্টাব্দে, মুহাম্মদের চল্লিশ বছর বয়সে। এগুলি আলোর ঝলকপূর্ণ স্বপ্ন হিসেবে শুরু হয়েছিল যা, 'ভোরের উজ্জ্বল আলোর মতো এসেছিল'। তিনি হেরা পর্বতের গুহায় নির্জনে নিজেকে রেখে দিন পার করে দিতে লাগলেন, মাঝেমাঝে সেখানে খাবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত টানা কয়েকদিন কাটিয়ে দিতেন। একসময় তিনি স্বপ্নে স্পষ্ট দেখতে পেলেন, ভোরের আলোতে এক ফেরেশতা আসলেন, আর তাঁকে কারুকার্য খচিত পোষাক দেখালেন যার উপর কিছু লেখা ছিল। ফেরেশতা তাঁকে সেই লেখাগুলো দেখিয়ে আদেশ দিলেন, "পড়"; কিন্তু মুহাম্মদ বললেন "আমি পড়তে পারিনা", তাঁর মানে তিনি লেখাপড়া জানেন না। স্বর্গদূত তাঁকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেলেন যে, তিনি আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারলেন না। তারপর তাঁকে ছেড়ে দিলেন এবং তাঁকে আবার বললেন, কাপড়ে যা আছে তা পড়ে শোনাতে। যখন তিনি প্রতিবাদ করলেন যে তিনি পড়তে পারবেন না, তখন স্বর্গদূত তাঁকে এত জোরে চেপে ধরলেন, তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি মারা যাবেন। নিজেকে মুক্ত করার জন্য মুহাম্মদ শেষপর্যন্ত বলেছিলেন, "আমি কি পড়ব?" ফেরেশতা কিছু আয়াত তেলাওয়াত করলেন এবং মুহাম্মদ সেগুলি পুনরাবৃত্তি করলেন। এতে ফেরেশতা অদৃশ্য হয়ে গেল এবং মুহাম্মদ আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। এরপর তিনি চেতনা ফিরে পেলেন। তিনি বিশ্বাস করতে লাগলেন যে, তিনি পাগল হয়ে গেছেন বা তাঁকে শয়তান আছর করেছে। তিনি নিজেকে উপর থেকে থেকে ফেলে দেয়ার ইচ্ছে করে গুহা থেকে ছুটে বের হয়ে গেলেন। সে সময়ে পাগল হওয়ার চেয়ে খারাপ আর কিছুই ছিল না। এভাবে মারা গেলে মক্কাবাসীরা তাঁকে তেমন পাগলই ভাববে। যখন তিনি দূরারোহ পাহাড়টির সুবিধাজনক জায়গায় উঠছিলেন, তখন তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন: "হে মুহাম্মদ, আমি জিব্রাইল (Gabriel) এবং আপনি এবং আল্লাহর নবী"। দিগন্তে একটি বিশাল অবয়ব দেখতে পেলেন মুহাম্মদ, যা পুরো আকাশকে ছেয়ে ফেলেছিল। মুহাম্মদ আটকে গেলেন। মনে হচ্ছিল যেন তাঁকে সেই জায়গায় আঠা দিয়ে লাগিয়ে রাখা হয়েছে, তবুও তিনি ঘাড় ফেরাতে পারলেন। তিনি যেদিকেই তাকালেন সেদিকেই দেখতে পেলেন, ফেরেশতাটি তাঁর ছয়শ ডানা মেলে পুরো আকাশ ঢেকে রেখেছেন। একটি সংস্করণে বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাম্মদ প্রথমে মানবরূপে ফেরেশতাঁকে খুব কাছাকাছি দেখেছিলেন, যেন তাঁকে স্পর্শ করা যায়। মুহাম্মদের অনুরোধে ফেরেশতা কেবল তাঁর মহিমাপূর্ণ আকারটি ধারণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি যখন তাঁকে তার আসল রূপে পুরো দিগন্তের ওপরে উঠতে দেখেন, মুহাম্মদ তখন অজ্ঞান হয়ে যান (১৬)। জিব্রাইল (Gabriel) তখন মানব আকারে নেমে আসে, মুহম্মদকে জাগিয়ে তোলেন এবং "মুখ থেকে ঝরা লালা মুছে ফেলেন" (১৭)।

ইসলামিক ইতিহাসে দেখা যায়, মুহাম্মদ আতঙ্কিত হয়ে বাড়িতে ছুটে আসেন। মারলির ভূত দেখার মতো তিনি বিছানার চাদরের নিচে লুকালেন, আর স্ত্রীকে কেঁদে বলতে লাগলেন, "আমাকে জড়িয়ে রাখো! আমাকে জড়িয়ে রাখো!" ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনি তাঁকে ঘটনার কথা জানিয়েছিলেন, তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি কোনও ভূত বা জিন দেখেছেন। "খাদিজা, আমার মনে হয় আমি পাগল হয়ে গেছি!" এবং, "আমার জীবন সঙ্কটাপন্ন"। ইতিমধ্যে তাঁর এরকম বেশ কয়েকটি অভিজ্ঞতা হয়ে থাকতে পারে, কারণ খাদিজা তাঁকে একবার বলেছিলেন, "তোমার এই বন্ধু" আবার কখন আসবে? পরেরবার যখন এটি ঘটল, তিনি মুহাম্মদের সাথে ছিলেন এবং নিচের পরীক্ষাটি চালিয়েছিলেন : খাদিজা তাঁকে তাঁর বাম উরুতে বসিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি এখনও ভূত বা জিনকে দেখতে পাচ্ছেন কিনা। তিনি যখন বলেছিলেন যে দেখতে পাচ্ছেন, খাদিজা তাঁকে তাঁর অন্য উরুতে বসিয়েছিলেন — যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তা দেখতে পারেন।

তারপর খাদিজা তাঁর শরীরের উপরের পোশাকটি খুলে ফেলে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি যেন তা দেখেন। এবার দেখা গেল যে, তিনি আর কাউকে দেখছেন না। খাদিজা তখন বুঝে নিলেন যে, এটি কোন দৈত্য নয় বরং ফেরেশতা; কেননা, ফেরেশতা মহিলার শালীনতার প্রতি শ্রদ্ধা রাখবেন, যা ভূত কখনো করবে না। "আনন্দ কর, ভাই বোনেরা, উঠে দাঁড়াও" - তিনি বললেন। "ঈশ্বরের কৃপায় যার হাতে খাদিজার প্রাণ, আমি আশা করি আপনি এই সম্প্রদায়ের নবী"। সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত না হলেও, তিনি তাঁর চাচা ওয়ারাকার কাছ থেকে আরেকটা মতামত চেয়েছিলেন। বয়স্ক ও অন্ধ ওয়ারাকা নিশ্চিত করেন যে, মুহাম্মদ সত্যই একজন নবী ছিলেন, কারণ যদি মুহাম্মদ যা বলেছিলেন তা সত্য হয়, তবে মুসার (Moses) সামনে যে ফেরেশতা উপস্থিত হয়েছিল, তাঁকেও সে-ই দেখা দিয়েছিল।

স্ত্রীর উৎসাহ দেখে মুহাম্মদ বিশ্বাস করেছিলেন যে, গুহার অবস্থানের মধ্য দিয়ে তিনি একক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নবী হিসেবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর স্নায়বিক অভিজ্ঞতার শক্তি এমন ছিল যে, তিনি সত্যই বিশ্বাস করেছিলেন, ফেরেশতারা তাঁকে দেখা দিয়েছেন। তাঁর এই বিশ্বাস অবিচল হয়, তাঁর অনুগামীদেরও, কোরানের অধিকাংশ বিষয়বস্তু বিরক্তিকর হওয়া সত্ত্বেও। "ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ" হিসেবে হত্যাযজ্ঞ, খুন, নির্যাতন, দস্যুতা, ধর্ষণ, পুরুষ-মহিলা এবং শিশুদের দাসত্ব এবং অন্যান্য নৃশংসতা, তাঁর এই বিশ্বাসকে চরম হাস্যকর করে তোলে।

আধ্যাত্মিকের চেয়ে কম নাটকীয় হলেও, মুহাম্মদের গুহা-অভিজ্ঞতার স্নায়বিক ব্যাখ্যা ভালো গ্রহণযোগ্যতা পায়। তিনি যে মৃগীরোগে ভুগছিলেন তা অষ্টম শতাব্দীতেই পশ্চিমা সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে, যখন বাইজেন্টাইন ঐতিহাসিক থিওফেনিস (Theophanes) এক সুদৃঢ় দাবি করেছিলেন যে, একজন মৃগীরোগীর সাথে বিয়ে দেয়ায় খাদিজা ঘ্যানঘ্যান করত (১৮)। এরপর থেকে পশ্চিমা ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় পণ্ডিতরা বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক করেছেন। আজ, মুহাম্মদের মৃগীরোগের প্রশ্নটি উচ্চ শিক্ষার স্তর থেকে স্নায়ুবিজ্ঞানে (Neuroscience) স্থানান্তরিত হয়েছে। মৃগীরোগ সম্পর্কিত বইগুলি তাঁকে এই রোগে আক্রান্ত বিখ্যাত ব্যক্তিদের কেস স্টাডির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ইসলামিক গ্রন্থে বর্ণিত তাঁর লক্ষণগুলি ক্লিনিকাল বিচার-বিশ্লেষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 1976 সালে, নিউরোলজিস্ট এফ আর ফ্রিম্যান (F R Freeman) একটি সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন যে, "সবচেয়ে সম্ভাব্য নির্ণীত রোগ" হলো, মুহাম্মদ টেম্পরাল লোব উদ্ভূত মৃগীরোগের শিকার হয়েছিলেন (১৯)।

সাম্প্রতিককালে, নিউরোসাইকোলজিস্ট ডেদে কোরকুট (Dede Korkut) মুহম্মদের স্নায়বিক রোগের একটি বই লিখেছেন। তিনি এই খিঁচুনিগুলিকে মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোব হতে উদ্ভূত মৃগীরোগের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন; যা মুহাম্মদ তাঁর মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে তিনি মনে করেন। টেম্পোরাল লোবের মাঝে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের বিচ্ছুরণের ফলে এই খিঁচুনির শুরু, যা বজ্র-বিদ্যুৎস্পৃষ্টে বিদ্যুতের ঝলকের মতো অনিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ দ্বারা ঐ লোব সংলগ্ন মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশে ক্রমেই বিস্তার লাভ করে। টেম্পোরাল লোব দৃষ্টি ও শ্রবণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করে। এই ধরনের খিঁচুনি দৃষ্টি, শ্রুতি এমনকি ঘ্রাণেরও ভ্রম ঘটাতে পারে, যার বিষয়বস্তু স্বপ্নের মতোই আক্রান্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কোরকুট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, মুহাম্মাদের "ধর্মীয় এবং ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর অসুস্থতা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, যা তাঁর মাঝে আত্মপ্রবঞ্চনামূলক এই ধারণা দেয় যে তিনি নবী" (২১)।

গুহাটি প্রতীকী হিসেবে দেখা যায়। গুহাটি একটি সুতিকাগার ছিল এবং সেখান থেকে নতুন মুহাম্মদের জন্ম হয়েছিল। তিনি তাঁর পুরনো স্বত্ত্বাকে আমূল পরিবর্তন করেছেন, এবং এখন তিনি কোন দুঃখবোধ ছাড়াই কুঁকড়ে যাওয়া অতীতের দিকে তাকাচ্ছেন। হারিয়ে গেছে দরিদ্র এতিম, ছাগল পালক, বিয়ে হওয়া ধনী মহিলার উপর যার মর্যাদা নির্ভর করত সেই মুহাম্মদ। দশজন ব্যক্তির ওজনের তুলনায় ঈশ্বর তাঁকে ভারি করেছিলেন, সে তাঁর মতো আরো একশজনের ওজনের চেয়েও ভারি। তেমনিভাবে দেখতে পেলেন, একাই তিনি সহস্র লোকের ওজনের চেয়ে ভারি। নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ তাদের সবাইকে পরাভূত করেছিলেন। তিনি আকারে আর উচ্চতায় বেড়ে উঠলেন; তিনি এখন সবচেয়ে উঁচু পর্বতমালার চেয়েও লম্বা, (Adam) আদমের মতো লম্বা যার মাথাটি স্বর্গে প্রবেশ করল এবং তিনি শুনতে পেলেন স্বর্গদূতদের মধ্যে কথা। অবলোকন করলেন ঈশ্বরের সিংহাসন।

তাঁর অর্ধনগ্ন স্ত্রী গদগদ করে বলেছেন: "মুহাম্মদ, তুমি একজন নবী"।

অধ্যায় – ৬
মক্কার একীভূত একেশ্বরবাদ

যদি তুমি নবী হতে চাও, তোমাকে কিছু বলতে হবে।

মুহাম্মদের শক্তিশালী স্নায়বিক অভিজ্ঞতা আর পরবর্তীতে ঈশ্বর কর্তৃক নবী মনোনীত হবার বিশ্বাস, তাঁকে ধর্ম বিষয়ে আরো বেশি না জানার সংকটে ফেলে দেয়, যার ফলে ধর্মের সাধারণ কথাগুলো জানতে তাঁর বেশ কয়েকবছর সময় লেগে যায়। ধর্মীয় জ্ঞান সংগ্রহের শুরুটা হয়েছিল আগে থেকেই, যখন ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মানুসারী বিদেশি বণিকদের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে, আর মক্কায় সেইসব ধর্ম পাঠ করা বন্ধু, বিশেষ করে জায়েদ ও ওয়ারাকারের সান্নিধ্য তাঁকে সাহায্য করেছিল। পরবর্তীতে সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে তাঁর নিজেকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা অব্যাহত থাকে, যারা তাঁকে বৃহত্তর অর্থে একেশ্বরবাদের ধারণা পেতে সাহায্য করেছে। তাঁর মাঝে কিছু কিছু বিষয় কোরানের মতবিরোধী হয়ে উঠে। এই সবকিছুই মুহাম্মদকে মিশ্র ধারণা দেয়। ইতিমধ্যে তিনি জায়েদিজমে (Zaydism) বিশ্বাসী ছিলেন। আর এখন, নবী হিসেবে ঈশ্বর তাঁকে বিশেষ কাজে পাঠিয়েছেন---এই বিশ্বাস তাঁকে নতুন ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠায় আরো গুছিয়ে উঠতে উজ্জীবিত করেছিল।

জায়েদের একেশ্বরবাদ বিষয়ক চিন্তাভাবনা মুহাম্মদের কাজকে সহজ করে একটা কাঠামো হিসেবে কাজ করেছিল, যেখানে জায়েদ দেখিয়েছিল, আব্রাহামের মূল একেশ্বরবাদী ধর্মের বাণী থেকে সরে গিয়ে ইহুদি ও খ্রিস্টীয় ধর্ম কিভাবে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করেছিল। আব্রাহামের উপাস্য এক ঈশ্বর ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর ছিল না, তিনি ছিলেন সমস্ত সৃষ্টির সূচনাকারী এবং নিয়ন্ত্রণকারী। তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে, কঠিনতম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে, আব্রাহামের ঈশ্বরে অবিচল বিশ্বাস রাখতে হয়।

জায়েদ ইহুদি ও খ্রিস্টান বিশ্বাসের সংমিশ্রণে যেই কবিতা লিখতেন, মুহাম্মদ প্রথম দিকে সেগুলো তাঁর ধর্মে ব্যবহার করেছিলেন। এটির মূলত দুটো ভিত্তি ছিল: সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ স্রষ্টার বিরুদ্ধে অপরাধকে পাপ বলে বিবেচিত হওয়া, এবং পরকালের বিশ্বাস, যেখানে পুরস্কার হিসেবে রয়েছে স্বর্গপ্রাপ্তি বা শাস্তিস্বরূপ জাহান্নাম। মুহাম্মদ মৃতদেহের পুনরুত্থান এবং সৃষ্টিকর্তার সামনে পাপ-পুণ্যের হিসেবের জন্য দাঁড় হবার মতবাদের ধারণাগুলি গ্রহণ করেছিলেন। এবং তিনি বিশ্বাস করতেন, সৃষ্টিকর্তা তাঁর প্রতি বাধ্যতা বা অবাধ্যতার ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তির সিদ্ধান্ত নেবেন। মুহাম্মদের এই মতবাদে, সবচাইতে গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হতো, যখন কেউ আসল ইশ্বরের জায়গায় মিথ্যা দেবতাদের পূজা করত। মুহাম্মদ এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছিলেন যে, পুনরুত্থিত দেহটি শারীরিক হতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে কীভাবে জাহান্নামের শাস্তি দেয়া হবে কিংবা স্বর্গের পুরস্কারগুলি মৃতব্যক্তি কীভাবেই বা উপভোগ করবে? যেহেতু মুহাম্মদের কল্পনার ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টিতে সক্ষম, মৃত্যুর পরেও তিনি অবশ্যই মানুষকে শারীরিক আকারে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। এই ধারণাগুলির মধ্যে মূল কথাটি হচ্ছে, মুহাম্মদ মনে করতেন তাঁর দাবিটিই একমাত্র সত্য দাবি এবং তাঁর সৃষ্টিকর্তা স্পষ্ট আরবি ভাষাতেই বাণী পাঠাচ্ছেন।

আরব পৌত্তলিকদের কাছে পাপ ও পরলোক নিয়ে ধারণা ছিল ভিন্ন। তাদের কাছে পাপ বলতে গোত্রের রীতিনীতি লঙ্ঘন করাকে বোঝাত। তাদের সেই রীতিনীতি লঙ্ঘন করলেই তার পরিণতি সাথে সাথেই ভোগ করবে, এমনটাই তারা মনে করত। একজন অবশ্যই দেবতাকে ক্রুদ্ধ করতে পারে, তবে পরিণতিগুলিও অস্থায়ী ছিল। তাদের দেবতারা অদৃশ্য রাজ্যে বাস করতেন, মানুষের কর্মকাণ্ডের উপর তারা একটি রহস্যময় প্রভাব ফেলতেন। তারা যেমন ভালোবাসার সত্ত্বা ছিলেন, ঠিক তেমনি ছিলেন ভয়ংকর হস্তক্ষেপকারী। যদি কেউ দেবতাদের ক্রোধান্বিত করে, তাহলে তাকে অবশ্যই জাহান্নামের শাস্তি

ভোগ করতে হবে, তবে তা ভোগ করবে এই জীবনেই। পৌত্তলিকরা দেবতাদের আশীর্বাদ প্রাপ্তির জন্য উপাসনা করত এবং প্রায়শ্চিত করে শুদ্ধ হবার জন্য রক্ত (কোরবানি) ত্যাগ করত। পৌত্তলিকরা পরকালীন বিশ্বাস বলতে তাদের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে বুঝত, পরকালীন পুরষ্কার বা শাস্তিতে নয়। এটি ছিল একটি অনির্ধারিত অবস্থা। তাদের পরকালীন বিশ্বাসের নমুনা দেখতে পাওয়া যেত যখন কেউ মারা যেতেন, ওই মালিকের প্রিয় উটকে তার কবরের উপর বেঁধে রাখতেন। এটি ছিল তাদের পুরনো প্রথা। প্রচন্ড রোদে যখন উটটি তৃষ্ণায় মারা যেত, তখন মনে করা হতো মৃত লোকটি স্বর্গে যাবে। পৌত্তলিক আরবরা তাদের কবিতার মধ্য দিয়ে বংশধরদের হৃদয়ে বাস করতে চাইতেন, এভাবে তারা স্থায়ী খ্যাতির মাধ্যমে অমরত্ব চাইতেন।

অলীক বার্তা শোনার পর মোহাম্মদের ভেতর যে গুরুতর উদ্বেগের তৈরি হতো, তা থেকে স্বস্তি পেতে তিনি ক্লান্তিকর পরিশুদ্ধি এবং প্রার্থনার নিয়ম তৈরি করেছিলেন, যা পরবর্তীতে তাঁর ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। তিনি বলেছেন, তিনি যখন হেরা পর্বতের পাদদেশে ছিলেন তখন ফেরেশতা জিব্রাইল তাঁর কাছে মানুষের রূপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে এই কাজ শিখিয়েছিলেন। ইসলামিক ইতিহাসে পাওয়া যায়, ফেরেশতা জিব্রাইল তাঁর পায়ের গোড়ালি মাটিতে পুঁতে দেন, যেখান থেকে একটি ঝর্ণার সৃষ্টি হয়। ওখান থেকে জল ব্যবহার করে ফেরেশতা তাঁকে পবিত্রতা শেখান যে, এইভাবে করলে তাঁর উপাসনা সর্বশক্তিমানের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। অতঃপর জিব্রাইল তাঁর সামনে নামাজ আদায় করেন, ঠিক যেভাবে করলে তাঁর নামাজ কবুল হবে (১)। ওযুর মাধ্যমে পুতপবিত্র করার নিয়ম শুরু হয় হাত এবং মুখে ধোয়া দিয়ে; নাকে জল ঢুকিয়ে শ্বাস নেয়ার মাধ্যমে নাসিকা পরিষ্কার করা এবং প্রশ্বাসের মাধ্যমে বের করা, এরপর মুখ ধোয়া, ডান হাতটি কনুই পর্যন্ত, বাঁ হাতও একইভাবে তিনবার ধৌত করা, তারপর ভেজা হাত দিয়ে মাথা, কান এবং ঘাড় মাসাহ করা (মোছা) তাঁরপরে বাঁ হাত একই নিয়মে এবং প্রতিটি পদক্ষেপ তিনবার সম্পাদন করা হয় ওযুতে। এরপর ভেজা হাতে দিয়ে মাথা, কান এবং ঘাড় মোছা, এই রীতিতেই চলতে থাকে। ডান পা দিয়ে শুরু করে তিনবার এবং পরে বাঁ পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত উভয় পা ধুয়ে পরিষ্কারের মাধ্যমে এই পবিত্রতার কাজ শেষ হয়। নামাজের নিয়মও সমভাবেই বিস্তারিত বলা হলো; শরীর সামনের দিকে নেয়ার সময় বাহুগুলো আর শরীরের নড়াচড়া একেবারে সুনির্দিষ্ট হতে হবে, এবং কপাল মাটিতে স্পর্শ করার সময় হাত এবং পায়ের আঙ্গুলগুলিকে যথার্থভাবে রাখতে হবে, নামাজের সিজদায় যাওয়ার আগে প্রথমে হাঁটুতে হাত দিয়ে নিচু হতে হয়, তারপর একই গতিতে উটের মত হাঁটুতে ভর করে বসে থাকতে হয়। মুহাম্মদ খুব শীঘ্রই দিনে পাঁচবার করে সপ্তাহে সাতদিন এইভাবে পবিত্র হয়ে প্রার্থনা করতেন। প্রায়শই তিনি স্বেচ্ছায় রাতের অনেকটা সময় দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর পায়ের গোড়ালি ফুলে যেত। মুহাম্মদ বলতেন, যদি তাঁর অনুসারীরা ঠিকমত এই পবিত্রতার মাধ্যমে প্রার্থনা না করেন তাহলে আল্লাহর দৃষ্টিতে তাঁর ইবাদত অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হবে (২)। আধ্যাত্মিক পরিশোধন ও প্রার্থনায় মুহাম্মদ যে পরিমাণ সময় ব্যয় করতেন, তা এটাই ইঙ্গিত করে যে, তাঁর এই প্রার্থনা শুধু সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করার জন্যই ছিল না, বরঞ্চ তারচেয়ে বেশি কিছু। এই আচরণগুলো এটাই ইঙ্গিত করে, তিনি একটি মারাত্মক সন্দেহবাতিকগ্রস্ততার (Obsessive Compulsive Disorder) রোগে ভুগছিলেন, যার শেকড় ছিল তাঁর উদ্বেগজনিত (anxiety) রোগের মধ্যে। তাঁর এই ধরনের আচার-আচরণ এতটাই তাঁকে গ্রাস করত যে, তাঁকে এ রোগের চূড়ান্ত উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। Obsessive Compulsive Disorder কে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়ঃ '"anxiety disorder characterized by intrusive thoughts that produce uneasiness, apprehension, fear, or worry, and by repetitive behaviors aimed at reducing the associated anxiety, or by a combination of such obsessions and compulsion" (৩)। একই কাজ বারবার করার মধ্য দিয়ে রোগী এক ধরনের স্বস্তিলাভ করে, যার ফলে উদ্বেগ কিছুটা প্রশমিত হয়। সম্ভবত এটা বলা যায়, মুহাম্মদের উদ্বেগজনিত রোগের কারণে তিনি হীনমন্যতা, অপরাধবোধ এবং লজ্জাজনক অনুভূতিতে ভুগতেন। তাঁর কারণ হয়ত নিহিত ছিল তাঁর জীবনের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা, যেই স্মৃতিগুলি তাঁকে তাড়া করে ফিরত। তাঁর নিজের ভেতরকার চিন্তাগুলোই আবার অভ্যন্তরীণ কণ্ঠের মাধ্যমে তিনি শুনতে পেতেন। যেহেতু তিনি প্রতিনিয়ত নেতিবাচক আত্মপোলব্ধিতে ভুগতেন, যার ফলে ক্রমাগত সৃষ্টিকর্তার কাছে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা

করতেন, মূলত তাঁর মধ্যকার 'মানসিক ভূত' থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে যেতেন (৪)। নিউরোলজির জার্নালে দেখা যায়, মৃগী রোগীদের অনেক লক্ষণের মধ্যে স্ব-পুনঃসংশোধনের দিকে ঝোঁক থাকে। অতিরিক্ত ধর্মভীরু, অতিরিক্ত নৈতিকতার দিকে এরা ঝুঁকে যায়। এর মাধ্যমে, ইহুদি-খ্রিস্টানে ঈশ্বরের ধারণার প্রতি মুহাম্মদের আকর্ষণ ব্যাখ্যা করা যায়। যিনি মুহাম্মদের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত চিৎকার করতেন, সেটাই ঈশ্বর। ইশ্বরকে সন্তুষ্ট করার যেকোনো একটা উপায় তার খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু তাঁর এই ঐশ্বরিক ইচ্ছে পূরণের বিধানগুলো কী?

এখন যেহেতু তিনি আল্লাহর নবী, আর তাড়াতাড়ি উনি একজন আজ্ঞাবাহক প্রেরিত পুরুষে উন্নীত হবেন, তিনি তাই নিজেকে এবং বিশ্ববাসীকে ব্যাখ্যা করতে থাকেন, তাঁর ভেতরকার এই চিৎকারকারী ইশ্বর আসলে কি চান? পরবর্তী তেইশ বছর ধরে প্রথমে সংক্ষিপ্ত কবিতার আকারে, পরে দীর্ঘ ছড়া-গদ্য রচনার মাধ্যমে তাঁর ধারণাগুলোকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, এইগুলো তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছেন। শ্রোতারা বিশ্বাস করেছিলেন, আল্লাহই মূল কোরানের রচয়িতা, আল্লাহই কয়েক বছর ধরে ফেরেশতা জিব্রাইলের মাধ্যমে বিভিন্ন আয়াত মুহাম্মদের কাছে হয় ব্যক্তিগতভাবে নিয়ে আসতেন, অথবা অলৌকিক উপায়ে "হস্তান্তর" করতেন। মুহাম্মদের কাছে অনেক আয়াত আসত যখন তিনি মৃগীরোগে ভুগতেন। কখনও সেগুলো তাঁর সত্যিকার খিঁচুনির সময়ে আসত, আর কখনওবা তিনি খিঁচুনির ভান করার সময় এসব আসত, যখন তিনি নিজেকে কম্বলে জড়িয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর এই কাঁপুনি থামত। কিছু সময় যেকোনো একটা বিষয় নিয়ে ভাবতেন, আর সেই ভাবনাটাই নতুন আয়াত হিসেবে নাজিল হতো, সত্যিকার অথবা ভান ধরা খিঁচুনিরত অবস্থায়। সামগ্রিকভাবে কোরানের সূরার ধরণ দেখলে বোঝা যায়, এটা এমন একজনের কাজ, যিনি জানতেন তিনি কী করছেন।

তাঁর প্রথম দিককার রচনাগুলোর একটিতে, যাকে মূল কোরআন তথা আবৃত্তির মুখবন্ধ বা প্রস্তাবনা বলা হয়, তাঁর ভেতরকার প্রখর উপলব্ধি ফুটে এভাবেঃ –
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু। বিচার দিনের মালিক। আপনারই আমরা ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট আমরা সাহায্য চাই। আমাদেরকে সরল পথ দেখান। পথের হিদায়াত দিন। তাদের পথ, যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। যাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন।যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয় (৫), (৬)।

এটা সাধারণত বোঝা যায়, সর্বক্ষমতাবান সৃষ্টিকর্তা তাঁর ঐশ্বরিক ইচ্ছাগুলোকে হস্তান্তর করতে শুধুমাত্র আবৃত্তিকেই একমাত্র মাধ্যম মনে করবেন না। কিন্তু এটি বুঝতে হবে যে, সর্বময় সৃষ্টিকর্তার ধারণাকে ছড়িয়ে দিতে মুহাম্মদের মতো একজন আরবের কাছে একমাত্র এটিই ছিল মাধ্যম। যেহেতু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কবিতা ছিল আরবদের সাংস্কৃতিক আবেগের জায়গা যার মাধ্যমে তারা তাদের ভাব প্রকাশ করতেন। বিখ্যাত কবিরা ছিলেন সেই যুগের মঞ্চ তারকা, মানুষ তাদেরকে সেলেব্রিটি হিসেবে দেখত, আর কম প্রতিভাবনরা তাদের নকল করত। কাব্যিক প্রতিভাকে উদযাপনের মাধ্যমে তারা তাদের গোত্রীয় মূল্যবোধগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতেন। কবিতাকে তখন ব্যবহার করা হতো বংশের প্রশংসা করতে, অন্য বংশের নিন্দা করতে, সাহসী কাজের ও মৃতদের প্রশংসা করতে, সর্বোপরি তাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে।

জায়েদের মতো মুহাম্মদও তাঁর ধারণাগুলিকে কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন, তবে মুহাম্মদের আয়াতগুলো থাকত বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে। যার ফলে তিনি আরবের ঐতিহ্যবাহী যে কাব্যিক রূপ, তাঁকে ভেঙে দিয়েছিলেন। কিছু কাব্যিক রচনা ছিল জ্ঞানসম্পন্ন এবং পরীক্ষামূলক, কেনইবা তা হবে না, কারণ এটা ছিল একজন সর্বোচ্চ 'দয়ালু' সৃষ্টিকর্তার বাণী (৭), যার মূল বিষয় ছিল ঐশ্বরিক পুরস্কার এবং শাস্তি। এই রচনাতে মুহাম্মদ শ্রোতাদের কানে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে শ্রোতাদের অনেক কিছু থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছেন। এই বিরত করার প্রক্রিয়া চলতে থাকে

কবিতার প্রতিটি ছত্রে, এভাবে শ্রোতার উত্তেজনা চরমে তুলে শেষে রাগমোচনের মতো করে আয়াতের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দিতেন, যেমনঃ বিশ্বাসীরা বেহেস্তে কালো চোখের কুমারীদের সাথে অনন্তকাল সঙ্গমে লিপ্ত থাকতে পারবে। জায়েদের চেয়ে ভাষাশৈলীতে তিনি শুধু চালাক ছিলেন তাই নয়, বরঞ্চ ছিলেন ভালো কৌশলীও। তিনি জানতেন যে, তাঁর বর্ণিত কথায় একজন ঐশ্বরিক কর্তৃপক্ষের দরকার ছিল যেটা জায়েদের অভাব ছিল। জায়েদ শুধু নশ্বরতার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে তাঁর মতামত দিতেন। মুহাম্মদ তাঁর সৃষ্টিকে দেখতেন একজন সৃষ্টিকর্তার বাণী হিসেবে যা ফেরেশতা জিব্রাইলের মাধ্যমে তাঁর কাছে পাঠানো হতো। তাই তাঁর কথার মূল্য ছিল অনেক উঁচুতে, কারণ এটি মুহাম্মদের কথা ছিল না। তিনি আল্লাহর কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে "আমরা" বা "আমাদের" এই শব্দগুলোর মাধ্যমে নিজেকে পটভূমিতে নিয়ে এসেছিলেন (৮)। মুহাম্মদের কণ্ঠস্বর কেবল তখনই শোনা যেত, যখন তিনি নিজেই জিব্রাইলের মাধ্যমে আল্লাহকে বলতে নির্দেশ দিতেন, যা তাঁর মনুষ্য কণ্ঠে শুনতে পাওয়া যেত। এই হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপটি শুরু হতো 'বলুন' শব্দের দ্বারা। **শ্রোতারা যখনি "বলুন" শব্দটি শুনতে পেত তখনই বুঝত হবে, আল্লাহ তাঁকেই যেন মাইক্রোফোনটি দিচ্ছেন!** এই (হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার) যন্ত্রের মাধ্যমে কোরআন সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের বাণীর মর্যাদা অর্জন করেছিল। **সেই যুগের সহজ সরল মানুষের অন্তর থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের মানুষেরা বিশ্বাস করতেন/করেন, আকাশ থেকে তাদের জন্য পৃথিবীতে গলার আওয়াজ নেমে এসেছে।**

যদিও মুহাম্মদের উল্লেখযোগ্য একটি প্রতিভা ছিল মৌখিক প্রতিভা, তবে এই প্রতিভা তাঁর প্রথম দিককার জীবনে ছিল কি না তা অন্তত ইসলামিক আদিগ্রন্থ থেকে জানা যায় না। ইতিহাসবিদ মুর (Muir) অনুমান করেছেন, মুহাম্মদ তাঁর বৌদ্ধিক জীবন শুরু করেছিলেন হয়ত তাঁর গুহায় হ্যালুসিনেসনের অভিজ্ঞতার আগেই। যেখানে তিনি 'বন্য ও অনুভূতিযুক্ত কবিতা' আর 'মানবজাতির এবং রাষ্ট্রের জন্য ছন্দময় আত্নকথন' চিন্তা করেছেন। তাঁর এই কাব্যিক প্রতিভা নিশ্চয়ই তাঁর পরিবারের সাথে ভাগ করে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেই সময়কার রচনাগুলোর বেশিরভাগ অংশই আল্লাহর ভয়েসের ছাঁচে হয়তো খাপ খায়নি, তাই হয়ত তা হারিয়ে গেছে। মুর মনে করতেন, যা কিছু টিকেছিল তা হয় মুহাম্মদ অথবা তাঁর অনুসারীরা পরবর্তীতে অন্তর্ভুক্ত করেছিল (৯)।

মুহাম্মদের ধর্মের প্রথম নিয়োগ ছিল তাঁর স্ত্রী খাদিজা। ইসলামিক ইতিহাসে লেখা আছে, ফেরেশতা জিব্রাইলের যখন মুহাম্মদের কাছে এসে তাঁকে পবিত্র করার এবং প্রার্থনা করার কৌশল শিখিয়ে দিয়ে গেলেন, তিনি তখন খাদিজার কাছে ছুটে এসেছিলেন এবং তাঁকেও তা শিখিয়েছিলেন। তারপরে তিনি তাঁর রচিত কয়েকটি আয়াত পুনরাবৃত্তি করে তাঁর সাথে সালাত আদায় করলেন। শীঘ্রই পরিবারের আরো দু'জন সদস্য তাদের সাথে যুক্ত হলেন, প্রথমজন হচ্ছেন আবু তালিবের পুত্র আলী, যাকে মুহাম্মাদ চার বছর আগে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখন দশ বছর বয়সী স্বাস্থ্যবান আলী মুহাম্মদ ও খাদিজা নামাজ পড়ার সময় তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে লাগল তারা কী করছে? মুহাম্মদ যখন তাঁকে ব্যাখ্যা করলেন এবং তাঁকে তাঁর সাথে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করেন। আলী জানায়, সে তার বাবার সাথে আগে কথা বলবে।

মুহাম্মদ তাঁকে আবু তালিব বা অন্য কারও কাছে প্রকাশ না করার জন্য সতর্ক করেছিলেন, কারণ তিনি জায়েদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। তা ছাড়াও তিনি প্রকাশ্যে যাওয়ার জন্য তখনও প্রস্তুত ছিলেন না। মোহাম্মদ জায়েদের মতো পৌত্তলিকতার চর্চাকে শুধু নিন্দা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে চাননি, বরঞ্চ তাঁর পরিকল্পনা ছিল মূলত আরো সুদূরপ্রসারী। মক্কাবাসীদের ধর্মের বিপরীতে একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রস্তাব দেয়ার জন্য তাঁর আরো চিন্তাভাবনা, আরও আয়াতের দরকার ছিল। এর একদিন বা একমাস পরে, যদিও সময়সীমাটা পরিষ্কার পাওয়া যায় না, আলী মুহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করলেন যে নতুন ধর্মে যোগদানের জন্য তার কী করতে হবে? তিনি বলেন- "তোমরা সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই; আল-লাত এবং আল-উজ্জাকে বাতিল কর এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের ত্যাগ কর"। আলীর ধর্মান্তরের কিছু পরে, জায়েদ, প্রাক্তন খ্রিস্টান দাস যাকে মুহাম্মদ ছেলে হিসেবে দত্তক নিয়েছিলেন, তিনিও তাঁর বিশ্বাসের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। কথিত আছে, জায়েদ ধর্ম গ্রহণ করার আগে মুহাম্মদ এবং আলী দুজনেই বিকেলে শহরের বাইরে এমন জায়গায় চলে যেতেন যেখানে তাদেরকে কেউ দেখবে না এবং সেখানে তারা লুকিয়ে তাদের প্রার্থনা আদায় করতেন। তবে একদিন

আবু তালিব তাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা যে ধর্ম পালন করছ দেখি সেটা কোন ধর্ম?" মুহাম্মদ তাঁকে বলেন, "আল্লাহ আমাকে মানবজাতির জন্য একজন রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আপনি আমার চাচা, আপনার সত্যটা জানার অধিকার সর্বাগ্রে, আমি আপনাকে সত্যের পথে ডাকছি, এবং আপনাকে হেদায়েতের দিকে আহবান করছি"। আবু তালিব মুহাম্মদকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর পিতামাতার ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। তবে তিনি তাঁর ছেলের আনুগত্যের বিষয়ে কোনো আপত্তি করেননি এবং তাদেরকে হাশিমীয় বংশের সুরক্ষার প্রস্তাব দিয়েছিলেন (১০)।

প্রাথমিক দিকে সাফল্য পেলেও, মুহাম্মদ পরে তার নিকটাত্মীয়দের থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তবে ইসলামিক সাহিত্যে তাঁর চার মেয়ে - ফাতেমা, জয়নব, রুকাইয়া এবং উম্মে কুলসুমকে ধর্মান্ধরিত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ইতিহাসে পাওয়া যায়, বেশ কয়েক বছর গোপন রাখার পর যখন তিনি তাঁর ধর্ম নিয়ে প্রকাশ্যে আসেন, তখন মুহাম্মদ ফাতিমাকে সবার সামনে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। মুহাম্মদের পরিবারের বাইরে প্রথম ধর্মান্তরিত ছিলেন তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু বকর। তিনি কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন, যিনি মুহাম্মদের মৃত্যুর পরে মুমিনদের (বিশ্বাসী) জন্য প্রথম শাসক হয়ে উঠেন। তাঁরা দুজন সম্ভবত কয়েক দশক ধরে পরিচিত ছিলেন। ইসলামিক সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুহাম্মদ যখন আবু তালিবের সাথে সিরিয়ায় বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে গিয়েছিলেন, আবু বকরও সেই কাফেলার সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে উভয় ব্যক্তিই পবিত্র ধর্মযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য মক্কার বিভিন্ন গোষ্ঠী মিলে একটি সমিতিও গঠন করেছিলেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে মুহাম্মদ বহেরাগতদের সাথে সৎভাবে বাণিজ্য করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। ধারণা করা হয়, আবু বকরও সেথায় উপস্থিত ছিলেন, কারণ তাঁর তাইম (Taym) গোত্রটি ছিল এই সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক। শারীরিকভাবে আবু বকর দেখতে অনেক সুদর্শন ছিলেন। তাঁর গায়ের রং ফর্সা ছিল, শরীরের গড়ন ছিল মধ্যম আকৃতির, খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছিল, দেখতে একটু কুঁজো ছিলেন। তাঁর চোখ দুটো ছিল ভাসা ভাসা, কপালটি চওড়া গণিতবিদের মতো। বংশপরিচয় সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল অনেক, তাই গুরুত্বপূর্ণ মক্কাবাসীদের প্রায় সবার বংশপরিচয়, এমনকি কুসাইর সময়কাল এবং তাঁরও আগে পর্যন্ত জানতেন। এই ধরণের জ্ঞানের সাথে সাথে তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যাও দিতে পারতেন, যেটা ছিল একধরণের বাড়তি পাওনা। ইতিহাসবিদ অ্যালোজ স্প্রেঞ্জারের (Aloys Sprenger) মতে, যদিও আবু বকরের মৌলিক ধারণাগুলো ত্রূটিযুক্ত ছিল, তবুও তিনি ছিলেন মুহাম্মদের আদর্শ মিত্র, কারণ বন্ধু হিসেবে তিনি ছিলেন আদর্শ চরিত্রের (১১)। খাদিজার শহরেই আবু বকরের একটি ঘর ছিল, মক্কার মানদণ্ডে সেটা অনেকটা ভালোই ছিল। তাই মুহাম্মদ যখন বিয়ের পর খাদিজার কাছে থাকা শুরু করলেন, তখন তারা দুজনই আবার প্রতিবেশী হয়ে গেলেন।

আরো একটা বিষয়ে তাদের ঘনিষ্ঠতা বেশ দৃঢ় হয়েছিল, সেটা হচ্ছে কবিতার প্রতি আগ্রহ। জানা যায়, বার্ষিক যে ওকায মেলা হতো, আবু বকর সেখানে সাহিত্য প্রতিযোগিতার নিয়মিত প্রতিযোগী ছিলেন। তিনি একবার আবৃত্তি শোনার পরই পুরো কবিতা স্মরণ রাখতে পারতেন, মুহাম্মাদেরও এমন দক্ষতা ছিল বলে ধারণা করা হয়। সখ্যতা আরো বাড়তে থাকে, যখন আবু বকর বুঝতে পারলেন মূর্তির প্রতি তিনি যেই প্রার্থনাই করছেন তা আর পূরণ হচ্ছে না। তাদের দুজনেরই আলোচনার বিষয় ছিল ধর্ম, তারা দুজনেই ক্রমশ মক্কার প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন, আস্তে আস্তে পৌত্তলিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন।

হেরা পর্বতের গুহায় অবস্থানকালে মুহাম্মদ যখন স্নায়বিক প্রভাবে জর্জরিত হচ্ছিলেন, আবু বকর সেই সময়ে সিরিয়াতে ব্যবসার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। পরে মক্কা চলে আসার সময় লোকমুখে জানতে পারেন, মুহাম্মদ নতুন একটা ধর্ম নিয়ে আসতে যাচ্ছেন। সেই কৌতুহল থেকে বকর মুহাম্মদের সাথে দেখা করতে গেলেন। স্বভাবতই মুহাম্মদ আয়াত নাজিল হওয়ার অভিজ্ঞতা, আর সেই অভিজ্ঞতা ঘিরে তাঁর বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। হয়তো সমালোচনার ভয়ে মুহাম্মদ তাঁর

কাব্য প্রতিভার কথা পরিবারের নিকটবর্তী লোকজন ছাড়া আর কাউকে বলেননি। এখন ঐশ্বরিক আদেশ আর ক্ষমতার কথা ভেবে, কবিতার নির্ভুলতা নিয়ে সচেতন হওয়ায়, তাঁর সাম্প্রতিক সময়ে রচিত কয়েকটি কবিতা বকরকে আবৃত্তি করে শোনান। তারপর প্রার্থনার নিয়মসমূহ তাঁকে দেখান। তিনি এখন থেকে হয়ে ওঠেন আল্লাহর অনুসারীদের সংগ্রাহক, অন্যান্য সকলকে আবু বকরের মতোই আল্লাহর উপাসনার পথে নিয়ে আসাই তাঁর কাজ।

ব্যক্তিত্বের বিচারে আবু বকর ছিলেন এমন একজন, যার কাছে সহজেই পৌঁছে যাওয়া যেত। তিনি মুহাম্মদের মতোই ছিলেন নীতিবান, মক্কার অন্যান্যদের মতো মদ্যপান, জুয়াখেলা, কিংবা নারী নিয়ে ফুর্তি ইত্যাদিতেও তাঁর আগ্রহ ছিল না। তিনি ছিলেন বেশ সমুন্নত ব্যক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য সহ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সৎ, স্পষ্টবাদী। তিনি বেশ আবেগীও ছিলেন; আঘাত পেলে কাঁদতেন, আনন্দে হাসতেন, ক্রোধে ফেটে পড়তেন। কুটিলতা ও মেকী স্বভাবের বিপরীতে সহজেই তিনি মানুষকে বিশ্বাস করতেন। যার কারণে মুহাম্মদের চমৎকার কথায় তিনি সহজেই পটে গিয়েছিলেন। তাছাড়া মুহাম্মদের আবৃত্তি করা ছড়াগুলোর এমনই গুণ ছিল যে, এরকম গুণযুক্ত কবিতা এর আগে তিনি শোনেননি। ছড়াগুলো শুনে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদে দিয়েছিলেন। বলা হয়, আবু বকর খুব সহসাই ধর্মান্তরিত হয়ে যান; মুহাম্মদের দৃঢ় বিশ্বাস যেন বকরেরই বিশ্বাসে পরিণত হয়।

আবু বকর একাই নতুন এই ধর্মের অনুসারী খুঁজতে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মুহাম্মদের অনেক নিকটতর আত্মীয়-স্বজন, যেমন সাফিয়ার পুত্র জুবায়ের, যিনি প্রথমে সংশয় দেখিয়ে দুরত্ব তৈরি করেছিলেন, তাঁকে সহ প্রায় একডজন লোককে নতুন ধর্মের প্রতি প্রভাবিত করেছিলেন। মুহাম্মদ বিষয়টি এত তাড়াতড়ি প্রকাশ্যে আনতে চাননি, কিন্তু আবু বকর মুহাম্মদের কথা তাঁর নিকটাত্মীয়দের কাছে এবং যাদের সাথে তিনি ব্যবসা করতেন, তাদের কাছে বলা শুরু করেন এবং প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। তারাও অবশ্যই অন্যের সাথে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিল। মক্কার মতো ছোট্ট একটি শহরে গোপনীয়তা রক্ষা করা খুব কঠিন ছিল।
ইসলামিক ইতিহাস গ্রন্থে দেখা যায়, ধর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী, অলৌকিক ঘটনাবলী ও স্বপ্ন এসব কিছুও ভূমিকা রেখেছে। যেমন, আবু বকরের এক চাচাত ভাই তালহার সাথে ঘটেছিল, যিনি পরবর্তীতে লুণ্ঠনের মাধ্যমে ধনী ব্যক্তিদের একজন হয়ে ওঠেন এবং আব্দুল্লাহ মাসুদ যিনি ছিলেন একজন রাখাল বালক, তিনিও পরবর্তীতে কোরআন তেলাওয়াতকারী ও ফিকাহবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রায় বিশ বছর বয়সী তালহা ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সিরিয়ার একটি কাফেলা যাত্রা থেকে ফেরার সময় তিনি বসরার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর কাছে একজন খ্রিস্টান সন্ন্যাসী ছুটে এসে একজন নবীর আগমনের কথাই বলেননি, তিনি তাঁকে বলেন যে, "নবী ইতিমধ্যেই চলে এসেছে!" চরম উদ্দীপনা নিয়ে সন্ন্যাসী তখন তালহাকে দ্রুত মক্কায় ফিরে আহমদ নামের লোকের কথা শুনতে বলেন। এই আহমদ হচ্ছে আব্দুল মুত্তালিবের নাতি আর আব্দুল্লাহর পুত্র যিনি তাঁর নবুয়্যত (নবীগিরি) ঘোষণা করবেন। তিনি আরো বলেন: "এ মাসেই তিনি হাজির হবেন, তিনি নবীদের মধ্যে শেষ নবী" (১২)। কাহিনীটি এভাবে আছেঃ তালহা আবু বকরের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, মুহাম্মদই সেই ভবিষ্যদ্বাণীটির লোক যার কথা সন্ন্যাসী তাঁকে বলেছেন। তিনি তাঁকে নতুন ধর্মের মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়ে মুহাম্মদের কাছে নিয়ে গেলেন। তালহা সাথে সাথে ধর্ম গ্রহণ করলেন। এই সেই তালহা যিনি পরবর্তীতে মুহাম্মদের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মাসুদের ধর্ম গ্রহণের পেছনে ছিল অলৌকিক ঘটনা। ইতিহাসে পাওয়া যায়ঃ মুহাম্মদ এবং আবু বকর মক্কার পাদদেশে হাঁটছিলেন, তখন এই কিশোর মাসুদ ছাগল চরাচ্ছিল। তৃষ্ণার্ত হয়ে মুহাম্মদ কিশোরকে বলেন তাঁকে একটা ছাগল থেকে দুধ এনে দিতে। মাসুদ জানায় সে মালিকের অনুমতি ছাড়া দুধ দিতে পারবে না। মুহাম্মদ তাঁকে তখন ছোট একটি ছাগল তাঁর কাছে আনতে বলেন, যেটার তখনও দুধ দেয়ার মতো বয়স হয়নি। মুহাম্মদ ছাগলটির স্তনে হাত ছোঁয়ানোর পরই স্তন দুধে ফুলে উঠল। সেই দুধ দিয়ে তৃষ্ণা মিটানোর পর মুহাম্মদ বললেন, "সঙ্কুচিত হও" এবং ছাগলের স্তন আগের জায়গায় চলে গেলো। এই দৃশ্য দেখে মাসুদ এত চমকিত হয়ে যায় যে, তাঁর কিছুদিন পরই সে ধর্ম গ্রহণ করে (১৩)।

খলিফা উসমান ইবনে আফফান (Usthman ibn Affan) ধর্মান্তরিত হবার পেছনে ছিল স্বপ্নের ভূমিকা। ইসলামি সাহিত্যে চৌত্রিশ বছর বয়সী উসমানকে পাওয়া যায় একজন ধনী ও সুদর্শন কিন্তু বিনয়ী একজন হিসেবে। যখন তিনি সিরিয়ায় একটি বাণিজ্যিক সফর থেকে ফিরছিলেন তখন তিনি স্বপ্নে একটি কণ্ঠ শুনতে পান, যেখানে তাঁকে কেউ বলছে, "ওহে, যারা ঘুমিয়ে পড়েছ তারা জেগে উঠো! মক্কায় আহমদ নামের একজন নবী হাজির হয়েছেন!" (১৪)। তালহার মতো উসমানেরও আবু বকরের সাথে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ছিল, তাই মক্কায় ফিরে এসে তিনি তাঁকে স্বপ্নের কথাটি জানান। এটির অর্থ আবু বকরের জন্য একটি কেকের টুকরোর মতো ছিল। যিনি ওসমানকে তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবেঃ এই 'আহমদ' হচ্ছেন বাস্তবে মুহাম্মদ, 'সত্যের প্রেরিত' হিসেবে আল্লাহ তাঁকে সম্মানিত করেছেন, ফেরেশতার মাধ্যমে সত্যের বাণী দিয়ে প্রেরণ করেন। আবু বকর উসমানকে ধর্মান্তরিত করেন। তারপর তাঁকে মুহাম্মদের কাছে নিয়ে যান চুক্তির বাকিটা সম্পাদন করার জন্য। আবু বকরের মতো একজন মিত্র যার অনেকের সাথে সংযুক্তি ছিল, মানুষকে ধর্মান্তরিত করতে বিশাল সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। ইতিহাসবিদ স্প্রেঞ্জারের (Sprenger) মতে, মুহাম্মদের নিয়োগের সাফল্যের পেছনে আরেকটি কারণ ছিল, সেই সময়ে অলরেডি একেশ্বরবাদী ধারণা বিদ্যমান ছিল এবং তাই ধর্মপ্রচার করার সময়টা একটু অনুকূল ছিল (১৫)। তিনি যদি এক শতাব্দী আগে তাঁর বার্তা নিয়ে আসতেন, তিনি হয়ত কোথাও পৌঁছতে পারতেন না। এক শতাব্দী আগে এলে তাঁর মতবাদ অপ্রাসঙ্গিক রয়ে যেত। সেই সময়ে বিশ্বের সর্বত্র একেশ্বরবাদ দ্রুত অগ্রসর হয়েছিল। চারপাশের একেশ্বরবাদী চর্চার সমুদ্রে মক্কা ছিল বহু-ইশ্বর উপাসনার জন্য একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ।

ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মে একেশ্বরবাদী ধারণাগুলি হিজাজের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিমের অনেকাংশে উপস্থিত ছিল। ইয়েমেনকে ইহুদি, খ্রিস্টান এবং জোরোস্ট্রিয়ানরা ক্রমান্বয়ে শাসন করেছেন। মক্কার দক্ষিণে দশদিনের দুরত্বের বড় শহর নাজরানে গুরুত্বপূর্ণ খ্রিস্টান উপস্থিতি ছিল। পশ্চিমা আরবে ইয়াছরিব, খাইবার এবং ফাদাকে কমপক্ষে সহস্রাব্দ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বা পুরোপুরি ইহুদিদের বাস ছিল। লোহিত সাগরের ওপারে আবিসিনিয়ানদের খ্রিস্টান সাম্রাজ্য ছিল। উত্তরে, সিরিয়া এবং মিশর সহ ভূমধ্যসাগরের পুরো প্রান্তটি খ্রিস্টানদের ছিল। গাসসানীয় (Ghassanids) এবং লখমিডের (Lakhmids) আরব রাজ্যগুলি – বাইজেন্টাইন এবং পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল এবং তারা উত্তর আরব পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। বহু দেবতায় বিশ্বাসের পাশাপাশি, জ্যোতিষীদিদের প্রতি বিশ্বাস এবং দেবদেবী ও শক্তির প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিমাগুলির উপর বিশ্বাস সর্বত্রই হ্রাস পাচ্ছিল। মক্কাবাসীরা বেশ কয়েকটি প্রজন্মকে স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তিত হতে দেখেছেন। সুতরং তারা হয়ত বেশ কয়েকটি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটাকে গ্রহণ করে নিতেন, হয়তোবা ঘনকাকৃতি মন্দিরটি একটি গির্জায় রূপান্তরিত হয়ে যেত।

প্রথমদিকে ধর্মান্তরিতদের মাঝে বুদ্ধিমান কিছু মক্কান তরুণ ছিলেন, যারা বিভিন্ন সময়ে বিদেশ ভ্রমণের মাধ্যমে একেশ্বরবাদী তত্ত্বের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তারা ইতিমধ্যেই তাদের নিজেদের নতুন ধর্মের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করা শুরু করেছিলেন এবং নতুন আরও ধারণা গ্রহণ করতে উম্মুখ হয়ে ছিলেন। অন্যান্য প্রাথমিক ধর্মান্তরিতদের মধ্যে ছিল খ্রিস্টান দাসরা। মুহম্মদের ধর্মের সাথে তাদের আপাতদৃষ্টিতে তেমন বেশি পার্থক্য ছিল না এবং তারা আরো বেশি আগ্রহী (নতুন কিছু জানতে) ছিলেন। মুহাম্মদের অনুসারীরা ধর্ম গ্রহণের শর্তে তাদেরকে দাসজীবন থেকে মুক্তি দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই সময়কালে মুহাম্মদ খুব কম তাঁর কাব্যিক রচনা করেছেন, সব মিলিয়ে হয়ত একডজন হবে। কয়েকটা বাদে সেগুলোর বেশিরভাগই দশ লাইনের কম ছিল। স্কলাররা এই সময়টিকে 'অন্তর্বর্তীকাল' বলে আখ্যায়িত করেছেন, যা তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল। আকারে ছোট বা মাঝারি যাই থাক না কেন, এই রচনাগুলোতে ইসলামের মূল যে বিশ্বাস তা ফুটে উঠেছে। যেমন কেয়ামতের দিন দৈহিক পুনরুত্থান ঘটবে আল্লাহর সামনে, যিনি বিচার করে পুরষ্কার হিসেবে জান্নাত বা শাস্তির জন্য জাহান্নাম প্রদান করবেন এবং আল্লাহর প্রতি অনুগত্য প্রকাশের পুরস্কার হিসেবে জান্নাতবাস এবং আনুগত্যহীনতার শাস্তি হিসেবে দোজখবাস দেবেন।
কিয়ামত (মহাপ্রলয়) নিয়ে মুহাম্মদের ধারণা ছিল একেবারেই তৎক্ষণাৎ। এই বিষয়টিতে তিনি সময় নিয়ে কাজ করেননি, এখানে একটি আয়াত এবং সেখানে একটি আয়াত। তিনি একলাফে কিয়ামতের ধারণাটি প্রচার করেছেন। তিনি বলতেন,

কেয়ামত সন্নিকটে, তিনি বলতেন সেদিন শীঘ্রই আসবে যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা কাঁপবে এবং পর্বতমালা বালির স্তূপে পরিণত হবে (১৬)।

He has God rubbing his hands in anticipation of squeezing divine fingers around the necks of resurrected disbelievers, particularly the necks belonging to the rich folk of Mecca: “And let me alone with the gainsayers, rich in the pleasures of this life; and bear thou with them a little while; for with Us are strong fetters, and a flaming fire, and food that choketh, and a sore torment.”17 Muhammad has God grabbing people by the hair—by “the lying sinful forelock!”(18) —and summoning the guards to Hell to come for them.

শুরু থেকেই তাঁর জাহান্নামের রূপটি ছিল করুণ। ইসলামিক ইতিহাসের এক জায়গায় পাওয়া যায়, একবার তাঁর ভয়ঙ্কর হেলুসিনেশনের পর তিনি তাঁর স্ত্রী খাদিজার কাছে দৌড়ে যান। তিনি তারপর কম্বলের নিচ থেকে বের হয়ে মানুষজনকে সতর্ক করেন এই বলে, “লোকেরা যদি আল্লাহকে রাগন্বিত করে, তাহলে তাদের জন্য ভয়ঙ্কর কিছু অপেক্ষা করছে”। ঈশ্বরের কণ্ঠে মুহাম্মদ ঘোষণা করেছেন: “আর কে তোমাকে জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে বলবে? (১৯)। সর্বোপরি, এই জাতীয় আয়াতগুলি দ্বারা এটাই প্রকাশ করে যে, তাঁর ভেতর রাগী একটা মানুষ বাস করত, যে অভ্যন্তরে বসে অগ্ন্যুৎপাতের জন্ম দিচ্ছিল। নিঃসন্দেহে, তাঁর রাগের অনেক কারণ ছিল। তিনি জীবনে অনেক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সম্ভবত তাঁর এই নির্যাতনের কথাও হয়তো ইসলামিক সাহিত্যে সেভাবে ফুটে ওঠেনি, অধিকন্তু তাঁর জীবনের সাথে ঘটে যাওয়া অনেক কিছুই ছিল দুর্ভাগ্যজনক, যা তাঁর প্রাপ্য ছিল না। তাই হয়তো তাঁর ভেতর সবসময়ই এক রাগান্বিত সত্ত্বা বাস করত। এখন যেহেতু এই রোগটি ঐশ্বরিকভাবে একটা নাম পেয়ে গেছে, তাই তাঁর রাগের একটা বৈধতা পেয়ে গিয়েছিল। এই সময়কালে তিনি সীমিত কাব্যিক রচনা করতে পেরেছিলেন, যেটাকে আসলে “রাইটার্স ব্লক” বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। যার ফলে তিনি হতাশায় ভুগতেন। তাঁর বাড়িতে একটি ছোট ঘর ছিল, যা তিনি প্রার্থনা ও ধ্যানের জন্য ব্যবহার করতেন। মূলত একটিই ছিল অফিস কক্ষ, যেখানে তিনি প্রাথমিক কোরানের অনেক আয়াত রচনা করেছিলেন। তাঁর যখন খিঁচুনি হতো, তখন আয়াত রচনা করতে পারতেন না। যেহেতু তাঁর মৃগীরোগের সাথে নিজের আধ্যাত্মিকতার একটা সম্পর্ক খুঁজে পেতেন, তিনি আসলে সেই অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বারবার সেই কক্ষের ভেতর যেতেন। কিন্তু তা আর তাঁর কাছে আসত না। তিনি যখন কিছুতেই রচনা করতে পারছিলেন না, তখন গভীর হতাশায় পড়ে গেছেন। ইসলামিক সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়, তিনি সেই সময়ে পাহাড়ে উঠতেন আত্মহত্যা করার জন্য। রাশিয়ার ঔপন্যাসিক দস্তয়েভস্কি (Fydor Dostoevsky), যিনি নিজেও মৃগীরোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং একবার মুহাম্মদকে নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, মুহম্মদের এই রোগের অভিজ্ঞতা যদি তাঁর নিজের রোগের মতো কিছু হয় তাহলে সেই সময় তিনি “সত্যিই জান্নাতেই ছিলেন!” (২০)। দস্তয়েভস্কি তাঁর এই রোগের অভিজ্ঞতাকে একটি ‘সুখের অনুভূত’ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন, যা তিনি কখনো তাঁর স্বাভাবিক অবস্থায় অনুভব করেনি, এবং যা কল্পনায়ও আনতে পারতেন না। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তিনি নিজের সাথে বিশ্বের সম্প্রীতি অনুভব করতেন, অসাধারণ সূখানুভুতি পেতেন। তিনি বলেন, সেই এক সেকেন্ডের অনুভূতির জন্য মানুষ হয়ত তাঁর জীবনের দশ বছর দিতে রাজি হবে (২১)।

আত্মহত্যা করা থেকে মুহাম্মদকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র তাঁর বন্ধু, শত্রু বা তাঁর স্ত্রীর প্রতি ব্যাঙ্গাত্মক মন্তব্যের জন্য। তিনি ভাবতেন, তিনি এভাবে মারা গেলে তাদেরকে বিদ্রূপ মন্তব্য শুনতে হবে। যদি সেই সময়ের লিপিবদ্ধ ঘটনা সব সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমরা দেখি ইহুদিরা যেহেতু দেখল তাঁর কাছে মাসের পর মাস কোন আয়াত আসছে না, তখন তাঁকে নিয়ে হাস্যরসাত্মক কথা বলত। তারা বলত, “আপনার আত্মা নিশ্চয়ই আপনাকে দ্রুত ত্যাগ করেছে!” (২২)। এইটুকুই মুহাম্মদের দরকার ছিল। আল্লাহ তাঁর কৃপণতা থেকে বের হয়ে আসলেন, মুহাম্মদের টেম্পোরাল লোবে বৈদ্যুতিক ঝড় শুরু

হলো। অন্যদের এই ব্যঙ্গাত্মক দাবিকে ভুল প্রমাণ করতে রচনা হয়ে গেল এই লাইনগুলোঃ "আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং তিনি অসন্তুষ্টও হননি। ভবিষ্যতে আপনার সবকিছু অতীতের চেয়ে ভালো হবে, শেষপর্যন্ত আপনার পালনকর্তা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং আপনি সন্তুষ্ট হবেন" (২৩)।

এই সূরাগুলোতে আল্লাহ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কিভাবে তাঁকে পেয়েছেন এতিম হিসেবে, তাঁকে একটি বাড়ি দিয়েছেন এবং শেষপর্যন্ত তাঁকে ধনী মহিলার সাথে বিবাহের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছিলেন যার জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। এই স্নায়বিক মহৌষধ শেষ হবার সাথে সাথে তাঁর আয়াত রচনাও শেষ হয়ে যায়। মুহাম্মদও তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন যে, প্রভু তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি শীঘ্রই আরও আয়াত রচনা করতে শুরু করলেন, যেগুলো তাঁর কাছে জিব্রাইলের মাধ্যমে আসত। তিনি প্রচার করতে শুরু করলেন, তিনি হচ্ছেন আব্রাহামিক ঈশ্বরের সর্বশেষ নবী, যাকে আল্লাহ সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরিত করেছেন।

অধ্যায় - ৭
আগুন ও গন্ধক

মুহাম্মদের প্রকাশ্যে আসাটা ছিল আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। মুহাম্মদের সাথে যে ফেরেশতারা কথা বলেন, এমন গুজব ইতোমধ্যেই মক্কায় প্রচার হয়ে গেছে। নেতৃস্থানীয় মক্কাবাসীরা তাঁকে অস্বাভাবিক ভাবতে শুরু করে এবং তাঁকে নিয়ে কটু মন্তব্য করতেও ছাড়ে না। তারা রীতিমত তাঁকে তাড়া করে ফিরতেন। মুহাম্মদ তাঁর পূর্বপুরুষের মন্দির প্রদক্ষিণ করার অভ্যাসটি ধরে রেখেছিলেন। তবে তাঁর জন্য এটি আর মন্দির না, এটি এখন আল্লাহর ঘর। মন্দিরটিতে অর্ধবৃত্তাকার পাথরের তৈরি পাটাতন ছিল, যেখানে শহরের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা জড়ো হতেন। প্রতিবার প্রদক্ষিণের সময় যখনই তিনি সেই জায়গায় এসে পৌঁছতেন, তখনই লোকেরা তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে মন্তব্য করত এই বলে, "দেখো দেখো, হাশিমী বংশের লোক যিনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলেন!"। অথবা তাঁকে উপহাস করে বলত, "তো মুহাম্মদ, ঈশ্বর এইবার কী বললো?"

পরিবারের কাছেও তাঁর দাবি আর গোপন থাকল না। খাদিজা, আলী, জায়েদ এবং জুবায়ের বাদে তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বহুশ্বরবাদের ভক্ত ছিল, এবং মুহাম্মদের বিরোধী ছিল। একদিন আবু তালিবের বাড়িতে যাবার পর তিনি যখন জানতে পারেন যে, তারা মক্কার কোন এক দেবতার উপাসনার জন্য তৈরি হচ্ছেন তখন তাদের সাথে মুহাম্মদ তুমুল বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। আবু তালিব এই তীর্থযাত্রার আয়োজন করছিলেন, যার জন্য তাদেরকে বেশ কয়েকদিন ধরে রাস্তায় থাকতে হবে। এরপর তাদের কোরবানির উট ও অন্যান্য পশু আনতে হবে, তাঁবু ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে উট বোঝাই করতে হবে এবং নিজেদের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে যাতে তারা সবাই একত্রে যাত্রা শুরু করেত পারে। পূর্বে মুহাম্মদ, তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানরা তাদের সাথে যেতেন, কিন্তু এবার তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন, ফলে এক বিরাট গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি তাদের জানিয়ে দিলেন যে, তিনি বহুশ্বরবাদিতা থেকে বের হয়ে এসেছেন, আর সেখানে ফিরে যাবেন না। সম্ভবত তিনি প্রতিমা পূজার নিন্দা করার জন্য এবং এক ঈশ্বরের ধারণাটিকে তাদের মাঝে প্রচার করার জন্য এই পরিস্থিতিকে ব্যবহার করেছিলেন। সেখানে থাকা তাঁর চাচা, চাচী, চাচাত ভাই সহ সবাই যারা আবু তালিবকে সহযোগিতা করছিলেন, তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁকে নিয়ে যেতে তাঁর আবিসিনীয় মুক্ত দাসী বারাকাকে ডেকেছিলেন (১)।

তবে মুহাম্মদ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন, কারণ এখন তাঁর সমর্থক পুরুষ এবং মহিলা মিলে দুই ডজনের মতো অনুসারী তৈরি হয়েছে। আর সেজন্য তিনি তাঁর ধর্মপ্রচার প্রকাশ্যে করা শুরু করেছিলেন। ইসলামিক ইতিহাসের অনেক সূত্রে তাঁর প্রকাশ্যে ধর্মপ্রচার শুরু করার বিবরণ দেয়া আছে। সেখানে উল্লেখ আছে যে, তেরো বছরের উঁচু বুকওয়ালা এবং সরু পায়ের অধিকারী আলীকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর বংশধরদের জন্য একটি নৈশভোজের ব্যবস্থা করতে। তিনি আলীকে বলেন যে, ফেরেশতা জিব্রাইল তাঁকে বলেছেন, তিনি যদি তাঁর বার্তা নিয়ে জনসম্মুখে না যান তাহলে "প্রভু আমাকে শাস্তি দেবেন"। (২) আবদুল মুত্তালিবের বেঁচে থাকা সকল পুত্রদয় এবং মুহাম্মদের প্রথম চাচাত ভাইদের সহ চল্লিশজন লোক যথাযথভাবে তাঁর বাসায় আসেন। আলী কেবল সামান্য খাসির মাংসের টুকরো এবং কিছু দুধ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা শুধু একজন মানুষের জন্য পর্যাপ্ত ছিল। অতিথিদের চোখের সামনেই খাবারগুলো বহুগুণ বেড়ে গেল। অলৌকিকতার এই দৃশ্যটি সবাইকে অভিভূত করেছিল। কিন্তু ঠিক তখনই মুহাম্মদের অন্যতম পিতৃতুল্য চাচা আবু লাহাব মুহাম্মদের দিকে আঙ্গুল তুলে বলেন, তারা যা দেখছেন তা এই জাদুকরের কাজ। আবু লাহাবের মন্তব্যের পর সবাই মুহাম্মদকে ছেড়ে চলে যায়, আর মুহাম্মদ তাদের কাছে নিজের নবী হবার দাবি ও তাদেরকে তাঁর ধর্মগ্রহণের আহ্বান করার সুযোগ এভাবেই হাতছাড়া করেন।

জানা যায়, মুহাম্মদ আরও একটি নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন, তবে এইবার খাবার বহুগুণ হবার মতো অলৌকিক কিছু ঘটেনি। মোহাম্মদ অভ্যাগতদের উদেশ্য করে বললেন, "হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্রসন্তানরা, আমি আরবদের মধ্যে

এমন কোন যুবককে চিনি না যিনি আপনাদের জন্য আমার চেয়ে ভালো কিছু নিয়ে এসেছিল"। তিনি বলেন, "আমি আপনাদের জন্য দুনিয়ার ও পরকালের শ্রেষ্ঠ উপহার নিয়ে এসেছি, আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাদের কাছে তাঁর প্রতি আনুগত্যের জন্য। এখন বলুন আপনাদের মধ্যে কে কে আমাকে সাহায্য করবেন?" চাচাত ভাইয়েরা হাঁটু ভাঁজ করে চামড়ার মাদুরের সামনে বসেছিলেন, যেটাকে অনেকটা কাপড় দিয়ে ঢাকা টেবিল বলা যেতে পারে। তারা আড়চোখে একে অন্যের দিকে তাকচ্ছিলেন কিন্তু সবাই শান্ত ছিলেন। আলী অবশেষে মুহাম্মদের পায়ে পড়লেন এবং বললেন, "হে আল্লাহর নবী, আমি আপনার সাহায্যকারী হব"। মুহাম্মদ তাঁর হাত আলীর কাঁধের উপর রাখলেন, "সে আমার ভাই, তাই তাঁর কথা শোনো এবং তাঁর অনুগামী হও"। মুহম্মদ কর্তৃক তাঁর অতি উৎসাহী ভাইকে সমর্থন করার দৃশ্য দেখে সবাই হেসে ওঠে এবং চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। অনেকেই মাথা নাড়তে নাড়তে চলে যায়। অনেকেই আবু তালিবকে কনুই দিয়ে একটু ধাক্কা দিয়ে বলে, "আপনি বিশ্বাস করতে পারেন এটা? ও আপনাকে আপনার নিজের পুত্রের আনুগত্য করার আদেশ দিচ্ছেন!" (৩)

প্রকাশ্যে তাঁর নবুয়াতের ঘোষণা দেয়ার গল্পের মধ্যে সবচাইতে বিশ্বাসযোগ্য একটি হচ্ছেঃ তিনি কুরাইশদের অনেককেই সাফা পর্বতে আসতে বলেন, তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা শোনার জন্য। দুটো অল্প উচ্চতার গ্রানাইট পাথরের পর্বতের মধ্যে সাফা ছিল একটি, যার উচ্চতা পঞ্চাশ ফুটের কাছাকাছি। এটি মন্দিরের নিকটে ছিল। অপরটি ছিল নদীতীরের অপর পাড়ে, মারওয়া পর্বত। দুটোই ছিল পবিত্র জায়গা। দুর্যোগের আভাস পেলে লোকে সাফা পর্বতের চূড়ায় উঠে "দুর্যোগ! বিপর্যয়!" বলে চিৎকার করে মানুষকে সাবধান করতেন। এই চিৎকার সবদিকে শোনা যেত। মুহাম্মদ সাফার চূড়ায় আরোহন করেছিলেন, তাঁর সতর্কবাণী চিৎকার করে ঘোষণা দেয়ার জন্য। তিনি আলীকে পাঠান হাশিমি পাড়ায় গিয়ে লোকজনকে ডেকে সাফা পর্বতে জড়ো করতে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ সেখানে জড়ো হন, তবে তাদের মধ্যে উদ্বেগের চেয়ে কৌতূহল বেশি ছিল। যখন পর্যাপ্তসংখ্যক লোক একত্রিত হয়েছিল, মুহাম্মদ বলেছিলেন: "হে আবদুল মুত্তালিবের গোত্র, হে ফিহর (Fihr), গোত্র, হে কাব (Kab) গোত্র!" তিনি জাতি এবং গোত্রদের নাম ধরে ধরে সম্বোধন করতে থাকেন এবং বলেন – "আমি যদি আপনাদের বলি যে, পাহাড়ের উঁচুতে ঘোড়সওয়ারী আছেন, যিনি আপনাদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছেন, আপনারা কি তা বিশ্বাস করবেন?" কেউ একজন চিৎকার করে বললেন, "হ্যাঁ, আমরা আপনাকে সত্যবাদী মানুষ বলে জানি, হে মুহাম্মদ!" তারপর মুহম্মদ বলেন, "ঠিক আছে, আমি আপনাদের ভয়াবহ শাস্তির বিষয়ে সতর্ক করতে এসেছি"। তিনি কিয়ামতের দিন এবং জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা চালিয়ে যাওয়ার আগে আবু লাহাব তাঁর পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে বললেন, "ধিক্কার! ধিক্কার! সারাদিন যেন তোমার ধ্বংস হয়! তুমি আমাদের এইজন্য এখানে ডেকেছ?" মুহাম্মদ আরো দ্ব্যর্থ কণ্ঠে সতর্ক করে বলতে থাকেন, "যারা আল্লাহর নবীর নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান করবে, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন"। তিনি জানেন কবরের আজাব সম্পর্কে, আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছেন, এবং তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি যেন সেই সত্যকে তাঁর লোকদের কাছে পৌঁছে দেন। "হে কুরাইশ, জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে বাঁচাও! হে বনু কালব (Banu Kalb) গোত্র, জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে বাঁচাও"। তারপর তাঁর পরিবারের মধ্যে ধর্মে দীক্ষিত হতে নারাজদের মধ্যে ফাতিমা এবং তাঁর ফুফু সাফিয়ার নাম ধরে ডাকেন। "হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমা, নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো", অথবা "আমি আল্লাহর নামে কসম করছি, আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ব্যতীত তোমাকে আল্লাহর কাছ থেকে রক্ষা করার কিছুই থাকবে না"। (৫)

আবু লাহাবের ঠাট্টাবিদ্রূপ ছাড়াও অনুমান করা যায় যে, এর পরে সেথায় কি ঘটেছিল। সম্ভবত এই ঘটনাটি মুহাম্মদ এবং তাঁর প্রতিবাদকারীদের মধ্যে হট্টগোলের খেলায় পরিণত হয়েছিল। জে সি ভি বডলির (J.C.V Bodley) মতে, মুহাম্মদের **"highly developed ideals about turning the other cheek"** (৬)।

তিনি হয়তো আবু লাহাবকে আরো বিক্ষুব্ধ করে তোলেন এই বলে যে, তাঁর জন্য অনন্ত শাস্তি অপেক্ষা করছে। মক্কায় তাঁর শত্রুদের তালিকা শীঘ্রই দীর্ঘতর হতে থাকে। এর শীর্ষে ছিল তাঁর এই চাচা আবু লাহাব এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে জামিল, যারা

খাদিজার বাড়ির অপর পাশের গলিতে বাস করতেন। প্রথমদিকের দিনগুলিতে তাদের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, তাই মুহাম্মদ তাঁর দুই কন্যাকে আবু লাহাবের ছেলের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। আবু লাহাবের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের শিকড় ছিল অনেক পুরাতন। পালকমাতা হালিমা তাঁকে নিয়ে যাওয়ার আগে আবু লাহাবের দাসী ছুয়াইবা (Thuwaiba) ছিলেন মুহাম্মদের প্রথম দুধমাতা। কিন্তু তাদের সম্পর্কের মধ্যে ভাটা পরে তাঁর গুহার অভিজ্ঞতা এবং তাঁর সাথে আল্লাহর সাক্ষাতের বিষয়ে জনসম্মুখে বলার কারণে। যৌবনকালে আবু লাহাব দেখতে একজন সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আবদুল উজ্জা (Abd al-Uzza), যার অর্থঃ আল-উজ্জার সেবক। কিন্তু আকর্ষণীয় চেহারার কারণে তিনি ডাকনাম পেয়েছিলেন আবু লাহাব, যার অর্থ 'উজ্জ্বলতার জনক' (father Of radiance)। গুটিবসন্তের কারণে তাঁর মুখে গভীর ক্ষত ছিল, বয়সের কারণে চামড়া কিছুটা কুঁকড়ে গিয়েছিল এবং তাঁর মুখমন্ডল শুকিয়ে গিয়েছিল। চাচার সাথে সম্পর্কের ফাটল ধরা এবং তাঁকে অস্বীকার করার পর ক্ষুব্ধ হয়ে মুহাম্মদ তাঁর চাচাকে নিয়ে কয়েক লাইন আয়াত রচনা করেছিলেন। এই রচনাগুলো কোরানের শুরুর দিকের এবং কোরানের সব চাইতে ছোট সূরাদের মধ্যে একটা- "ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দু'হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ এবং যা সে অর্জন করেছে তা তার কাজে আসবে না। অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে। আর তার স্ত্রী লাকড়ি বহনকারী, তার গলদেশে খেজুর বাকলের রজ্জু রয়েছে" (৭)।

আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলের নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবে শেষের দু'লাইনে আবু লাহাবের সাথে তাঁকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করার কথা বলা আছে। এই আয়াতগুলো দ্রুতই শহরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যখন উম্মে জামিল এবং আবু লাহাব এগুলি জানতে পারলেন তখন আবু লাহাব তাঁর বাড়ির সীমানা থেকে মুহাম্মদকে লক্ষ্য করে ক্রোধ প্রকাশ করেন। উম্মে জামিল একটি পাথরখন্ড হাতে নিয়ে মুহাম্মদকে খুঁজতে থাকেন, এবং ঠিক সে সময়ে মুহাম্মদ আবু বকরের সাথে মন্দিরে অবস্থান করছিলেন। ইসলামিক আকর গ্রন্থে পাওয়া যায়, আল্লাহ অদৃশ্য চাদরে মুহাম্মদকে জড়িয়ে রেখে তাঁকে উম্মে জামিলের ক্রোধ থেকে বাঁচিয়েছিলেন তিনি যাতে মুহাম্মদকে দেখতে না পারেন। কিন্তু মুহাম্মদ তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করে গালাগালিও শুনতে পারছিলেন। সম্ভবত যেটি হয়েছিল সেটি হচ্ছে, চাচীকে আসতে দেখে মুহাম্মদ নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছিলেন, এবং তাঁর বন্ধুকে ব্যাপারটা মোকাবেলা করার জন্য বলেন। উম্মে জামিলের রাগ কিছুটা প্রশমিত হলে তিনি শেষে কালো পাথরটি চুমো দেন, এবং হুবাল, আল উজ্জা এবং আল-লাত দেবতার প্রতি তাঁর বিশ্বাসের প্রমাণ হিসেবে সাতবার মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করে কক্ষপথে এসেই মুহম্মদকে অভিশাপ দিতে থাকেন (৮)।

মুহম্মদ ও খাদিজা উমাইয়াদের পাড়ায় ঠিক ওপর অংশে বাস করতেন, সেখানকার ঘরগুলোই তখনকার মক্কাবাসীদের মানদণ্ড অনুসারে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত বলে বিবেচিত হতো। এই পাড়াটির নামকরণ করা হয়েছিল ধনী ব্যবসায়ীর নামে, যারা উমাইয়াদের বংশ থেকে এসেছিল, যিনি মক্কার নিয়ন্ত্রণের জন্য মুহাম্মদের দাদা হাশিমকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। আবু বকরের একই পাড়ায় একটি বাড়ি ছিল, যিনি কাপড় ব্যবসায়ী হিসেবে, চল্লিশ হাজার রৌপ্যমুদ্রার মালিক হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন। খাদিজার বাড়িটি মন্দির থেকে দু'শ গজ দূরে অবস্থিত ছিল। পাড়ার একপ্রান্তে খাদিজার পাশের বাড়িতে ছিলেন আবু সুফিয়ান নামে এক উমাইয়া ব্যবসায়ী (৯)। তিনি ছিলেন উমাইয়ার নাতি এবং মক্কার বাণিজ্যিক ও নাগরিক বিষয়ের একজন উদীয়মান নেতা। যদিও হাশিমী ছিলেন, আবু লাহাব এই পাড়ায় আসতে পারতেন কারণ উম্মে জামিল ছিলেন আবু সুফিয়ানের বোন।

এটি একটি শান্তিপূর্ণ পাড়া ছিল, কিন্তু মুহাম্মদ যখনই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে নতুন ধর্ম নিয়ে আসলেন, ঠিক তখন থেকেই এটি শত্রুভাবাপন্ন অঞ্চল হয়ে উঠল। একাধিকবার তাঁর দরজার সামনে দুষ্ট লোকেরা মলমূত্র নিক্ষেপ করে রেখে যেতেন, বা উঠোনে রান্নার পাত্রে মৃত প্রাণী রেখে যেতেন। মাঝেমাঝে আক্রান্ত করার জন্য তাঁকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করা হতো। আঘাত এড়াতে তিনি বাড়িতে ঢুকে যেতেন, তিনি প্রচন্ড চিৎকার করে জোরে জোরে বলতেন, "প্রতিবেশীর সাথে

এই হচ্ছে তোমাদের সৌজন্যবোধ?" (১০)। তিনি খুব জোরে চিৎকার করতে পারতেন যার আওয়াজ গলির সকলে শুনতে পেত। এই অপমানের সাথে আরও যোগ হয় -আবু লাহাব মুহাম্মদের মেয়েদের সাথে তাঁর ছেলেদের যে বিয়ের কথা হচ্ছিল, তা তাঁর ছেলেদের প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য করেন।

মুহাম্মদ অনেকটাই নিজের উপর এই বৈরিতা ডেকে এনেছিলেন। ইসলামিক ইতিহাস ভিন্নভাবে এই ঘটনাগুলোর যৌক্তিক ব্যাখা দাঁড় করিয়ে এর সত্যতা স্বীকার করে নেয় (১১)। মুহাম্মদের আগে, জায়েদ প্রকাশ্যে মক্কাবাসীদের ধর্মকে গালি দিয়েছিলেন। তিনি তাদের মূর্তি ও ভাস্কর্য নিয়ে উপহাস করতেন। তিনি বলতেন, প্রত্যেক মুশরিক জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। তিনি এটাও বলতেন যে, তাদের পূর্বপুরুষরাও মিথ্যা বিশ্বাসে থাকা অবস্থায় মারা যাওয়ার জন্য চিরকাল আযাবে (শাস্তিতে) থাকবেন। তাঁর জন্য এটি ছিল সহজ, অনম্য যুক্তি। তিনি বলতেন, "মুশরিকরা এক সত্য ইশ্বরের জায়গায় মিথ্যা দেবতাদের পূজা করেছে, সুতরাং এটি ক্ষমার অযোগ্য পাপ; হয় তারা এক ইশ্বরের উপাসনা করবে, নয়তো জাহান্নামে আগুনে জ্বলবে"। ঐতিহ্যগতভাবে অন্যদের নিজস্ব ঈশ্বর ধারণার উপর সহনশীল মক্কাবাসীদের কাছে, জায়েদের এই সংকীর্ণ মতবাদ আপত্তিকর ছিল। তারা অসহিষ্ণুতা ছাড়া বাকি সবকিছু সহ্য করেছিল। এটিই মক্কাবাসীদের সাথে জায়েদকে সমস্যায় ফেলেছিল এবং এখন মুহাম্মদও জায়েদের মতো অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, মুহাম্মদ এখন আরেক জায়েদ হয়ে উঠেছে। অনমনীয় একই বার্তা নিয়ে মুহাম্মদ গোত্রসমূহের সবাবেশ ছাড়াও, মন্দিরের অপরপাশে প্রশাসনিক ভবনে বয়োজ্যেষ্ঠদের সমন্বয়ে গঠিত যে গোত্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিষদ ছিল, তাতেও তিনি যোগদান শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর একই বার্তা নিয়ে ব্যক্তিগত মজলিশেও যেতেন (১২)।

মুহাম্মদ যত বেশি প্রতিরোধের মুখোমুখি হতেন, তত বেশি তাঁর কোরআনের আয়াত আক্রমণাত্মক হয়ে উঠত। সেই রচনা জাহান্নামে অত্যাচারের বর্ণনায় পরিপূর্ণ থাকত, যেমন এই আয়াতগুলো : "নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওঁৎ পেতে রয়েছে। সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রত্যাবর্তন স্থল। সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। সেখানে তারা কোন শীতলতা আস্বাদন করবে না এবং না কোন পানীয়" (১৩)। তিনি তাঁর প্রথম বর্ণনায় জান্নাতকে কাম চরিতার্থ করার স্থান হিসেবেও অভিহিত করেছিলেন, যদিও তিনি তখনও এই রচনাগুলোকে তাঁর পক্ষে লড়াইয়ের এবং এর ফলে মৃত্যুবরণের পুরষ্কার হিসেবে যুক্ত করেননি : "নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সফলতা। উদ্যানসমূহ ও আঙ্গুরসমূহ। আর সমবয়স্কা উদ্‌ভিন্ন যৌবনা তরুণী" (১৪)।

মক্কাবাসীরা তাদের কবিতাঁর মধ্য দিয়ে তাদের বংশমর্যাদা ধরে রাখত, কবিতা নিয়ে তারা গর্ব করত। মুহাম্মদের অপমান ছিল তাদের কাছে বিরক্তির। মুহাম্মদের ধর্মপ্রচার শুরু করার এক বছরের মধ্যে মক্কাবাসীরা সিদ্ধান্ত নেন যে, হয় তাঁর মুখ বন্ধ করতে হবে, না পারলে তাঁকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু গোত্রের মধ্যে কাউকে হত্যা করা ছিল খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। যদিও তাঁর উপর তারা বিরক্ত ছিল, গোত্রের রীতি অনুযায়ী মুহাম্মদকে রক্ষা করতে তাঁরা বাধ্য ছিল। বেশিরভাগ লোক তাঁর বিপক্ষে ছিল, তবুও তারা দাঁতে দাঁত চেপে গোত্রের রীতি অনুযায়ী তাদের সম্মান রক্ষার্থে প্রস্তুত ছিল। শুধুমাত্র একটি উপায়ে এই ঝামেলা শেষ করা যেত, সেটি হচ্ছে হাশিমী গোত্রের নেতা, মোহাম্মদের চাচা আবু তালিবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিলে। তিনি যদি মুহাম্মদের উপর থেকে গোত্রের প্রতিরক্ষা সরিয়ে ফেলতে রাজি হন, মক্কাবাসীরা তবে তাঁর কাছ থেকে মুক্তি পেতে পারে।

মক্কার নেতারা আবু তালিবের কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠান এটা বলার জন্য যে, মুহাম্মদ ঝামেলার সৃষ্টি করছে, একে অন্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, যা এই সম্প্রদায়ের একাত্মতা বিনষ্ট করছে। আবু তালিবের সাথে দেখা করতে আসা লোকেরা ছিলেন সেই সময়ের মক্কার নেতা। উতবা (Utba), শাইবা রাবিয়া (Shayba Rabia), উভয় ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী; তারা তায়েফে বাগান এবং কূপের মালিক ছিলেন; আবু সুফিয়ান (Abu Sufyan), মুহাম্মদের প্রতিবেশী যিনি উতবার কন্যা

হিন্দকে বিবাহ করেছিলেন; আমর ইবনে হিশাম, যাকে মক্কাবাসীরা আবুল হাকাম তথা জ্ঞানী পরামর্শদাতা হিসেবে অভিহিত করতেন, যাকে মুহাম্মদ অভিহিত করেছিলেন আবু-জাহেল বা মূর্খতার বাপ The Spawner Of Madness হিসেবে; ওয়ালিদ বিন মুগীরা (Walid Mughira), আবুল হাক্কামের চাচা যিনি মন্দির পুনর্নির্মাণের নেতৃত্বদানকারী ছিলেন এবং আরো কিছু মক্কার অধিবাসী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা আসেন। এটা জানা যায় না, তাদের মধ্যে কে আবু তালিবকে সম্বোধন করেছিলেন, তবে কি বলেছিলেন সেটা জানা যায়। বলা হয়েছিলঃ "হে আবু তালিব, আপনার ভাতিজা আমাদের দেবতাদের অভিশাপ দিয়েছে, আমাদের ধর্মকে অপমান করেছে, আমাদের পূর্বপুরুষের জীবনযাত্রা নিয়ে ঠাট্টা করেছে। হয় আপনি তাঁকে থামান অথবা তাঁকে আমাদের কাছে দিয়ে দেন, আমরা তাঁর তাঁকে নির্মূল করবো"। (১৫)

মুহাম্মাদের চাচা তাদের কথা চালিয়ে যেতে দিলেন, তিনি তাদের ক্ষোভ বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি নিজেও মুহাম্মদ যে ঝামেলা করছে তা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর নিজের পুত্র আলী মুহাম্মদের ধর্মে যোগ দিয়েছিলেন। আবু তালিব মক্কার বিশ্বাসকে সমর্থন না করে মুহাম্মদকে সমর্থন করেছিলেন, তবে ভাতিজা মুহাম্মদের প্রতি তাঁর স্নেহের জালেও তিনি আটকা পড়েছিলেন। তিনি তাদের সাথে একমত হয়ে বলেছিলেন যে, ব্যাপারটা দেখবেন যে মুহাম্মদের ব্যাপারে কি করা যায়। কিন্তু হতাশাজনকভাবে কিছুই আসলে পরিবর্তন হয়নি, মুহাম্মদ পূর্বের মতই তাঁর কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছিলেন, এবং যতই মাস যেতে থাকে মুহাম্মদ মক্কার যুবকদের ধর্মান্তরিত করতে থাকেন। মক্কাবাসীরা আবারও আবু তালিবের কাছে তাদের নেতাদের প্রেরণ করেছিল, তবে এবার তারা যুদ্ধের হুমকি দিয়েছিল যদি না তিনি মুহাম্মদ-সমস্যার সমাধানা করেন। "ঈশ্বরের কসম, আমরা আর সহ্য করতে পারবো না, পিতৃপুরুষদের যেভাবে নিন্দা করছে, আমাদের রীতিনীতি নিয়ে উপহাস করছে, আমাদের দেবতাদের অপমান করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি তাঁকে নির্মূল করবেন, আমরা আপনাদের দুইজনের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবো, যতক্ষণ না এক পক্ষের ক্ষতি হয়" – বলছিলেন নেতৃস্থানীয়রা (১৬)।

ইসলামিক ইতিহাস থেকে জানা যায়, আবু তালিব অসন্তুষ্ট হয়ে মুহাম্মদকে ডেকে পাঠান এবং অনুরোধ করেন তাঁর উপর যেন তাঁর সাধ্যের চেয়ে বেশি বোঝা চাপিয়ে না দেয়া হয়। মুহাম্মদ ভেবেছেন যে তাঁর চাচা তাঁর উপর থেকে হাশিমী গোত্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তুলে নেয়ার ইঙ্গিত করছেন, যেটা তাঁর জন্য একটি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু মুহাম্মদ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর তাঁর সাথে কথা বলেন, তাই পরিণতি যাই হোক তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যাবেন। তিনি বলেন, "ওহে চাচা, তাঁরা যদি এমন পরিস্তিতি সৃষ্টি করে আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাঁ হাতে চন্দ্র তুলে দেয়, তবুও আমি এই পথ ত্যাগ করতে পারব না"। হয় তিনি এইভাবে ধর্ম প্রচার করে বিজয়ী হবেন, নয়তো বিনষ্ট হয়ে যাবেন। এই সময়ে তিনি হাঁটু ভেঙ্গে আবু তালিবের মুখোমুখি বসে ছিলেন। তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং চাচার পা জড়িয়ে ধরলেন। আবু তালিব কান্না দেখতে পারতেন না। মুহাম্মদ যখন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন তখন চাচা তাঁকে আবার ডেকে বলেন, "তোমার ঈশ্বরের জন্য তুমি যা খুশি তাই বল, আমি তোমাকে কখনই ছেড়ে দেব না" (১৭)।

ইসলামিক ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়, মক্কাবাসীরা আবু তালিবের কাছে তৃতীয়বারের মত প্রতিনিধি পাঠান। এইবার আবু তালিবের কাছে তাঁরা ঘুষের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। তারা ওয়ালীদের (Walid) পুত্র ওমারাকে (Umara) নিয়ে আসেন এবং বলেন, মুহাম্মদের পরিবর্তে একে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন, তবুও মুহাম্মদকে তাদের হাতে ছেড়ে দেন। যদিও ওয়ালীদের জন্য ওমারার মতো পুত্রকে বিসর্জন করা কঠিন ছিল। মক্কাবাসী যে কেউ তাঁকে তাদের পুত্র বলে গ্রহণ করতে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তিনি দেখতে লম্বা, সুদর্শন, মল্লবিদ এবং দারুণ কাব্যিক প্রতিভার ছিলেন। এই ছেলে নিশ্চিত তাঁর বৃদ্ধকালে পিতার সাহায্যকারী হবে। আবু তালিব এই প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ হন এবং তাদের প্রস্তাবকে 'শয়তানী' বলেন। তিনি বলেন, "আমি আপনার ছেলেকে নেব, তাঁকে খাইয়ে বড় করব, যার বিনিময়ে আপনি আমার একজনকে হত্যা করবেন। ঈশ্বরের কসম, তা হবে না!"(১৮)।

তাদের এই ঝগড়া সভাকক্ষ পেরিয়ে শহরের মূল আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। আবু তালিব মক্কার প্রস্তাবকে উপহাস করে কবিতা রচনা করেছিলেন এবং গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর হাশিমী গোত্রকে দৃঢ়ভাবে মুহাম্মদের সমর্থনে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানান। পুরো গোত্রটি এখন অন্য গোত্রদের সাথে মুহাম্মদকে কেন্দ্র করে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। উপহাসের বিষয় হচ্ছে, হাশিমী গোত্রের উপর তীর্থযাত্রীদের জন্য খাবার ও জল সরবরাহের অফিশিয়াল দায়িত্ব ছিল, অথচ মুহাম্মদ তাদের দেবদেবীকে নিয়েই বঙ্গ বিদ্রুপ করছে। বেশিরভাগ হাশিমীরা বিভিন্ন দেবতাদের উপাসনা অব্যাহত রেখেছিল, কিন্তু বংশের সম্মান রক্ষার্থে মুহাম্মদের পেছনে তাদের না দাঁড়িয়ে উপায় ছিল না।

ওয়ালিদের ছেলের প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যাওয়ায় মক্কার নেতারা বিকল্প নিয়ে আলোচনা করছিলেন। পবিত্র মাসের বার্ষিক মেলা শুরু হয়ে গেছে, হাজার হাজার তীর্থযাত্রীরা মক্কায় আসা শুরু করেছে। তারা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছে যে, মুহাম্মদ তাঁর ধর্মের বাণী নিয়ে তীর্থযাত্রীদের সাথে রাস্তায় দেখা করছেন। তিনি এতটাই আক্রমণাত্মক হয়েছেন যে, অনেকের পেছন অনুসরণ করতে করতে তাদের তাঁবু পর্যন্ত চলে যাচ্ছেন। সম্ববত যারা তাঁকে শুনতে চায়নি তারা তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে। নেতারা আবার ভাবতে বসলেন, মুহাম্মদকে কিভাবে থামানো যায়। ওয়ালিদ পরামর্শ দিলেন, সবচাইতে ভালো প্রতিরক্ষা হচ্ছে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে বাজে কথা রটিয়ে দেয়া। তাতে করে তীর্থযাত্রীরা তাঁর কথা শুনবে ঠিকই, কিন্তু তাঁকে গুরুত্বের সাথে নেবে না। ওয়ালিদ প্রস্তাব করেছিলেন, তাঁকে কবি, জাদুকর বা জ্যোতিষী বলে তকমা লাগিয়ে দিতে। মক্কাবাসী নেতারা প্রতিটি উপায় নিয়ে আলোচনা করে পরে জ্যোতিষী এবং কবি উপাধিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। মুহাম্মদ যা করছিলেন তাতে তিনি একজনকে আরেকজনের পেছনে দাঁড় করে দিচ্ছিলেন, সুতরাং জাদুকর নামটি তাঁর জন্য সবচাইতে বেশি যুক্তিযুক্ত বলে তাঁরা মনে করলেন। তীর্থযাত্রা শুরু হওয়ার পরে, মক্কার নেতারা মক্কায় তীর্থযাত্রা শেষ হবার পর তাদের পোশাক পরিবর্তন করে মেলায় ঢোকার আগে তাদের জন্য বিভিন্ন রুটে পাহারা চৌকি বসিয়েছিলেন। সেখান দিয়ে পার হওয়ার সময়ে তাঁরা লোকদেরকে মুহাম্মদ সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন যে, মুহাম্মদ তাদেরকে ছলনা করে মিথ্যা ধর্মে ডাকবে, তাদেরকে ফাঁসানোর চেষ্টা করবে, তিনি আসলে একজন জাদুকর। মুহাম্মদ এ বিষয়টি জানতে পেরে আল্লাহকে বেহেশত থেকে নামিয়ে নিয়ে আসেন এবং আল্লাহ প্রচন্ড রাগে বিস্ফোরিত হন। বিরলভাবে এই আয়াতে আল্লাহকে দেখা যায় এককভাবে কথা বলতে, যদিও ওয়ালিদ বিন মুগীরা, যার পুত্রকে সমর্পন করা হয়েছিল আবু তালিবের কাছে, তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে এই লাইনগুলো তাঁকে উদ্দেশ্য করেই রচিত :
"আমাকে এবং যাকে আমি সৃষ্টি করেছি তাকে একাকী ছেড়ে দাও। আর আমি তাকে দিয়েছি অঢেল সম্পদ, আর উপস্থিত অনেক পুত্র। আর তার জন্য (জীবনকে) সুগম স্বাচ্ছন্দ্যময় করেছি। এসবের পরেও সে আকাংখা করে যে, আমি আরো বাড়িয়ে দেই!" (১৯)

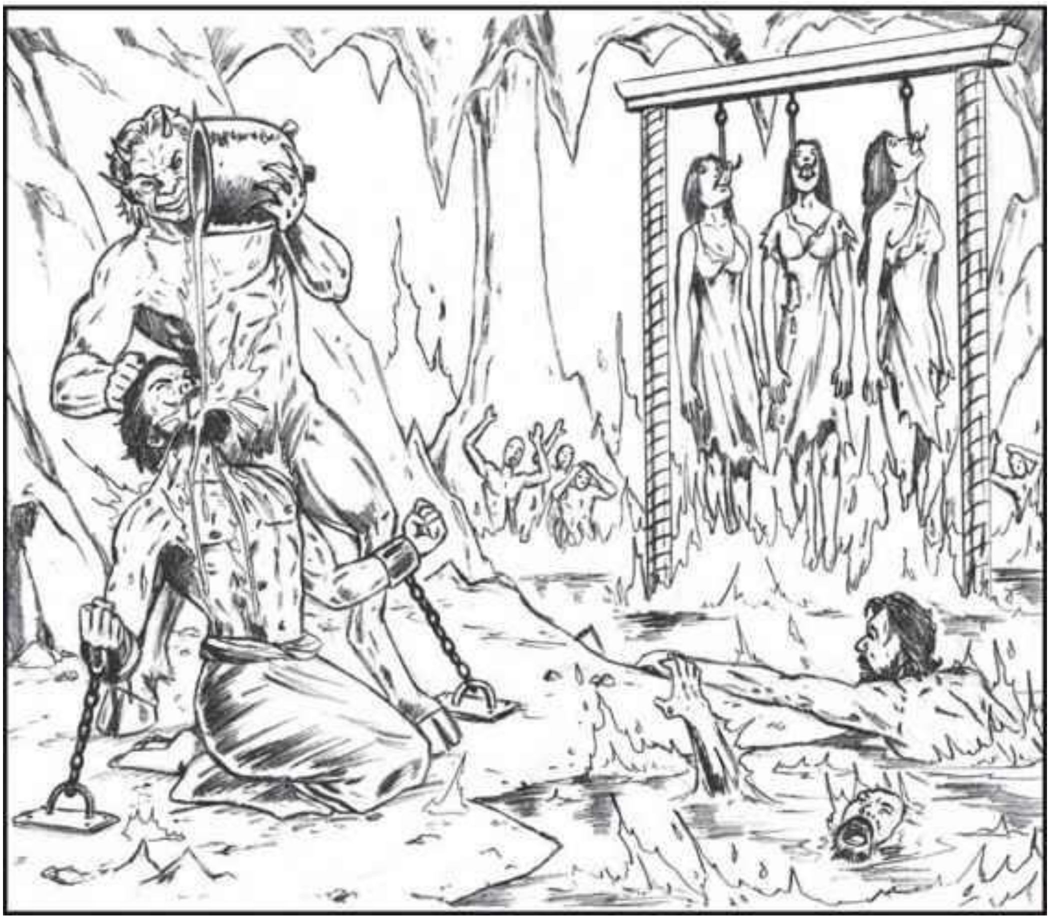
মুহাম্মদ ওয়ালিদকে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হবার কারণে এবং নবীর বিরুদ্ধে আগ্রাসনের জন্য আল্লাহর মাধ্যমে তাঁর উপর 'মর্মান্তিক বিপর্যয়' নেমে আসবে বলে হুঁশিয়ার করেন। এই রচনাগুলো শিহরিত কণ্ঠে আবৃত্তি করার উদ্দেশ্যে তিনি চালিয়ে যান:
"নিশ্চয় সে চিন্তা ভাবনা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। অতঃপর সে ধ্বংস হোক! কীভাবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল? তারপর সে ধ্বংস হোক! কীভাবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল? তারপর সে তাকাল। তারপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করল এবং মুখ বিকৃত করল। তারপর সে পিছনে ফিরল এবং অহংকার করল। অতঃপর সে বলল, 'এ তো লোক পরম্পরায়প্রাপ্ত যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়" (২০)।

ক্রমশই মুহাম্মদ কোরআনকে বিতর্কের মাধ্যমে পরিণত করলেন। মক্কাবাসীরা নিঃসন্দেহে তাদের নিজস্ব কবিতার মাধ্যমে তাঁর ক্রোধের প্রতিউত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই সময়কালের কবিতা টিকে থাকেনি। তবে তাঁর রচনাবলী থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে করা অভিযোগগুলির গভীরতা পরিষ্কার বোঝা যায়। মুহাম্মদের আচরণের জন্য মানুষের মধ্যে তাঁর প্রতি যে ঘৃণার

আগ্নেয়গিরি জ্বলছিল তা বোঝা যায় তাঁরই করা সাধারণ রচনাগুলোর কিছু ছত্র দিয়ে, যেমনঃ ... তোমাদের সঙ্গী (মুহাম্মাদ) পাগল নয়। সেতো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে অবলোকন করেছে। আর সে তো গায়েব সম্পর্কে কৃপণ নয়। আর তা কোন অভিশপ্ত শয়তানের উক্তি নয় (21), এবং এই আয়াতটিও "নিশ্চয় যারা অপরাধ করেছে তারা মুমিনদেরকে নিয়ে হাসত। আর যখন তারা মুমিনদের পাশ দিয়ে যেত তখন তারা তাদেরকে নিয়ে চোখ টিপে বিদ্রূপ করত।আর যখন তারা পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসত তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে ফিরে আসত" (২২)।

মক্কাবাসীরা যেই সময় তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে ব্যস্ত, মুহাম্মদ সেই সময়টিকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন মানুষকে ধর্মান্তরিত করছিলেন। প্রায় কয়েক বছর ধরে প্রতিমাসে একজন করে মানুষকে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করেছেন, তবে বেশিরভাগ সময়ই এই রূপান্তর আবু বকরের প্রচেষ্টাতেই হয়েছে বলা যেতে পারে। তাঁর প্রতি বৈরিতা যখন বাড়তে থাকে, তিনি গোপনে তাঁর ধর্মান্তরিত যুবকের বাড়িতে চলে যান, যার নাম ছিল আরকাম (Arqam)। সেখানেই তিনি বিশ্বাসীদের নিয়ে গোপন বৈঠক করতেন। তাঁর বাড়িটি ছিল হাশিমী পাড়ার কাছে সাফা পর্বতের পাদদেশে। তাঁকে যাতে সনাক্ত করতে না পারে সেজন্য বিশ্বাসীরা রাতের অন্ধকারে আসতেন। দরজায় তাদের বিশেষ সংকেতে টোকা দিলে প্রবেশের জন্য দরজা খুলে দেয়া হতো। আবু বকর প্রতিশ্রুতিশীল লোকদেরকে সেখানে নিয়ে আসতেন মুহাম্মদের বয়ান শোনানোর জন্য। প্রথমদিকে ধর্মান্তরিতদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কৈশোর বয়সের। এদের পরিবার প্রায়শই তাদের ধর্মান্তরিত সন্তানদের বিচার দিতে মুহাম্মদের কাছে আসতেন। আবু বকর খালিদ সাঈদ (Khalid Said) নামে এক যুবককে নিয়ে আসেন যিনি ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। খালিদ সম্ভবত দুঃস্বপ্ন দেখেছিল, তাঁকে কে যেন জ্বলন্ত আগুনে ঠেলে দিচ্ছে, কিন্তু পেছন থেকে কেউ তাঁকে ধরে ফেলে, শেষমেশ সে বেঁচে যায়। খালিদ আবু বকরের কাছে আসে তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইতে। আবু বকরের খ্যাতি ছিল স্বপ্ন-বাখ্যাকারী হিসেবে। তিনি খুব সহজেই তাঁর বাখ্যা দেন, যিনি খালিদকে ওই আগুন থেকে রক্ষা করেছিলেন তিনি আসলে ছিলেন মুহাম্মদ, আল্লাহ তাঁকে স্বপ্নের মাধ্যমে ধর্মের পথে ডাকছেন। আরকামের বাড়িতে মুহাম্মদের কথা শোনার পর তিনি ধর্মে বিশ্বাস এনেছিলেন এবং ওযু, সালাত এবং আয়াত মুখস্থ করেন। তিনি যদিও তাঁর ধর্মান্তরিত হবার ঘটনা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটি আর রাখতে পারেননি। যখন খালিদের বাবা এটি জেনে যায়, তাঁর মাথায় একটি লাঠি দিয়ে আঘাত করেন। আর সাবধান করেন, তিনি যদি তাঁর পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরে না আসেন, তাহলে তাঁকে হত্যা করবে। এ কথা শুনে খালিদ দৌড়ে পালান এবং মুহাম্মদের সাথে অবস্থান করেন (২৩)।

আরেকজনের ধর্মান্তরিত হবার কারণে পরিবারে দুঃখ নেমে এসেছিল, তিনি ছিলেন উমাইরের (Umayr) পুত্র মুসআব (Musab)। মুসআব উচ্চবিত্ত পরিবাবের ছেলে ছিল, তাঁকে সবসময়ই সর্বশেষ কেতাদুরস্ত পোশাকে দেখা যেত। তাঁর মা ব্যতীত বিশ্বে আর কারো জন্য তাঁর ভাববার দরকার ছিল না, কারণ তাঁর মা ছিলেন মক্কাবাসী সমাজে খুবই প্রভাবশালী এবং রক্ষণশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি আবু বকরের কাছ থেকে মুহাম্মদের ধর্ম সম্পর্কে জানতে পেরে একদিন তাঁর সাথে আরকামের বাড়িতে যান মুহাম্মদের কথা শুনতে। মুহাম্মদের কথা শুনে দ্রুতই তিনি মোহাম্মদের প্রতি বিশ্বাসের ঘোষণা করলেন। খালিদের মতো মুসআবও এটিকে গোপন রাখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাঁর মায়ের কাছে ধরা পরে যায়। সে যখন মুহাম্মদের মতো করে প্রার্থনা করে, তাঁর মা জানতে পারেন। মা তাঁর চাকরকে নির্দেশ দেন তাঁকে বেঁধে একটি ঘরের কোণে রেখে দিতে এবং পাহারা দিতে। খালিদ নিজের বাড়িতে বন্দি হয়েছিল। অবশেষে সে অন্যান্য ধর্মান্তরিতদের সাথে পালিয়ে লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে আবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছিল, আর সেখান থেকে ফিরে এসেছিল বেশ কয়েক বছর পর। তাঁর মা তাঁকে আবার বন্দি করার হুমকি দিলে, সে শপথ করেছিল যে-ই তার মাকে সহায়তা করবে তাকেই সে মেরে ফেলবে। সে বরঞ্চ তার ধর্মে যোগদানের জন্য তার মাকেই প্ররোচিত করে। তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ছেলেকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর মস্তিষ্ক শিহরিত হতে পারে তবে বুদ্ধি এখনো লোপ পায়নি যে তিনি মুহাম্মদের ধর্মে ধর্মান্তরিত হবেন। এবার তিনি মুসআবকে তাড়িয়ে দেন এবং তাকে ত্যাজ্য করেন। মুসআব শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদের যুদ্ধে জড়িত হয় এবং যুদ্ধেক্ষেত্রেই মারা যায় (২৫)।



মুহাম্মদ কল্পনা করতেন, তাঁকে যারা স্বীকার বা তাঁর আনুগত্য করছে না, তাদের জন্য আছে দোজখের আগুন। কোরআন ভয়াবহ সব নির্যাতনের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। যেমনঃ মানুষ আগুনের হ্রদে জ্বলছে, ফুটন্ত জল বা গলিত ধাতব গলা দিয়ে ঢালছে, মহিলাদের জিহ্বা হুক লাগিয়ে আগুনে ঝলসানো হচ্ছে। তাঁর এই কল্পিত নির্যাতনের চিত্রগুলো দান্তের (Dante) মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মে প্রবেশ করেছিল, যিনি মুহাম্মদের এই নিষ্ঠুর কল্পনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন (২৪)।

এই নতুন ধর্মের কারণে সাদের (Sad) পরিবারও ছিন্ন হয়েছিল। সেটি ছিল জুহরা গোত্রের আবু ওয়াক্কাসের পরিবার। এটি ছিল মুহাম্মদের মায়ের গোত্র, যারা আসলে কুসাইর এক ভাইয়ের বংশধর ছিলেন। যদিও সাদ মুহাম্মদের চেয়ে ছোট ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন মুহাম্মদের দুরসম্পর্কীয় মামা। তাঁর মা যখন তাঁর ধর্মান্তরের বিষয়টি জানতে পেরেছিলেন তখন তিনি তাঁর সাথে আলাদা থাকার পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে অনাহারে রেখে মেরে ফেলার হুমকিও দিয়েছিলেন, এবং দুর্বল না হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কিছু খাবেন না বলেছিলেন। সাদ তাঁকে উত্তর দেন এভাবে যে, তিনি যদি হাজারবারও মরতে রাজি কিন্তু মোহাম্মদের ধর্ম ছাড়তে রাজি নন। সাদই প্রথম মুহাম্মদের কাজের কারণে অন্যের রক্ত ঝরিয়েছিল।
ঘটনাটি ছিল এরকমঃ বিশ্বাসীদের মধ্যে ছোট্ট একদল মক্কার বাইরের উপত্যকায় গিয়ে ওযু ও নামাজ আদায় করছিল। তাঁরা ভেবেছিল যে, তাঁরা দৃষ্টিসীমার বাইরে রয়েছে, কিন্তু একদল মক্কাবাসী সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের তিরস্কার ও বিদ্রূপ করতে শুরু করেছিল। সাদ তখন তাঁর দল নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করে বসে। কারো হাতেই তলোয়ার ছিল না, কারণ তাঁরা তখনও মক্কার অভয়ারণ্যের সীমানার মধ্যেই ছিলেন যেখানে রক্তপাত বা সহিংসতা নিষিদ্ধ ছিল। এটি শুরুতে শুধু ঝগড়াতেই সীমিত ছিল। এটি রক্তাক্ত হয়ে ওঠে যখন সাদ একটি উটের চোয়াল তুলে নিয়ে মক্কাবাসীদের একজনের মাথায় আঘাত করে রক্তাক্ত করে ফেলেন (২৬)।

সাদ শেষ পর্যন্ত অসংখ্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি গর্বের সাথে সারাজীবন তাঁর এই রক্তক্ষরণের বর্ণনা দিতেন। যা শুরু হয়েছিল সামান্য ফিনকি দিয়ে রক্তের মাধ্যমে, তা-ই একদিন রক্তের নদীতে পরিণত হয়েছিল।

অধ্যায় ৮

আমি তোমাকে হত্যা করব!

যদিও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, এ সময়ের কাছাকাছি ঠিক কোন পর্যায়ে গিয়ে মুহাম্মদ নিজেকে 'আল্লাহর রাসূল' পদে উন্নীত করেন। গুহার অভিজ্ঞতার পর তিনি প্রথমে নিজেকে একজন নবী হিসেবে দেখেছিলেন, যার একমাত্র কাজ ছিল মন্দ কাজ থেকে লোকেদের সতর্ক করা এবং পরকালের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা। তাঁর তখনকার সীমিত ভূমিকার উপমা এই আয়াতটিঃ "অতএব সতর্ক করুন; কারণ আপনি কেবল একজন সতর্ককারী" (১)।

তবে খুব দ্রুত তাঁর এই নবীর পদবি বা মর্তবা তাঁর কাছে হালকা হয়ে যাচ্ছিল। ইহুদি, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মের লোকদের সাথে তাঁর যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি অন্যান্য নবীদের সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানছিলেন। এটা ছিল তাঁর একটি চলমান শিক্ষার অংশ, যা তাঁর কল্পনাশক্তি সমৃদ্ধ করত। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন, নবী হিসেবে তিনি অতি সাধারণ, একেবারে পিছিয়ে পড়া। সে সময়ের মধ্যে বিশ্বের সমস্ত মানুষদের জন্যই কোন না কোন নবীর আনাগোনা ছিল, এবং যুগে যুগে সব মিলিয়ে হাজার হাজার নবীতো হবেই। তবে তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বার্তাবাহক বা রাসূলের ভূমিকায় ছিলেন কেবল কয়েকজন, যাদেরকে ঈশ্বর বাছাই করেছিলেন। নোয়া বা নূহ (Noah) ছিলেন রাসূলগণের মধ্যে সর্বপ্রথম। এরপর আব্রাহাম, তারপর মূসা ও যীশু। মুহাম্মদ বিশ্বাস করতেন এটি ঈশ্বরের কাছ থেকে একজন মরণশীল মানুষকে দেয়া সর্বোচ্চ সম্মান, কেননা একজন রাসূলের ভূমিকা সতর্ক বার্তাবাহকেরও চেয়েও বেশি; ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণাটি কেবলমাত্র মরুর বুকে বালি ঝড়ে উড়ে যাওয়া বিভিন্ন গোত্রের কাছে নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির কাছেই, কেয়ামত পর্যন্ত। বার্তাবাহকগণ ছিলেন ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রেরণকারী; তাদের মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষের জন্য পথনির্দেশ দেন, যা অনুসরণ করলে ইহকাল এবং পরকালে ভালো থাকা যাবে।

তাঁর বিশ্বাস সত্য হয়ে ওঠার জন্য তাঁর কাছে এই চিন্তাটুকুই যথেষ্ট ছিল। তিনি ভেবেই নিতেন, যা কিছুই তাঁর মাথায় আসে তা মূলত আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে। সুতরাং যখন তাঁর মনে দৃঢ়ভাবে এই ঈশ্বরের ধারণা একটা স্থায়ী রূপ পেল, তখনই তিনি প্রচার করতে থাকলেন, ঈশ্বর তাঁকে অন্যান্য নবীদের চাইতেও উঁচু ও সম্মানজনক স্থানে বসিয়েছেন। তিনি বলেন, তাঁকে দ্বিগুণ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। তাঁকে পাঠানো হয়েছে সর্বশেষ নবী এবং চূড়ান্ত বার্তাবাহক হিসেবে। এই দাবির যুক্তিটি ছিল সোজাসাপ্টা। তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, পৃথিবীর শেষ সময় সন্নিকটে; কেয়ামত এবং বিচার দিবস আসন্ন ছিল, সুতরাং ঈশ্বরের আর কোনো বার্তাবাহককে নিযুক্ত করার দরকার নেই। তিনি হচ্ছেন এই মতবাদের ইমারতের শেষ এবং চূড়ান্ত ইষ্টক স্বরূপ (২)।

একপর্যায়ে তিনি তাঁকে "ঈশ্বরের প্রেরিত রাসূল" হিসেবে প্রচার করা শুরু করেন। যথাযথভাবে তাঁর অনুগামীরা তাঁকে সেভাবেই সম্বোধন করছিলেন। যখন তারা তাঁর সাথে কথা বলতেন, তাঁকে সম্বোধন করতেন ইয়া রাসূলাল্লাহ বা "ও আল্লাহর রাসূল" বলে। এটা অনেকটা রাজাদের উপাধির মতো, যেমন তাদেরকে ডাকা হয় "মহামান্য" বলে, ঠিক সেরকম। পরবর্তীতে এটি তাঁর প্রতি বিশ্বাস ঘোষণার অংশ হয়ে যায়, এবং ইসলামের প্রথম স্তম্ভ হয়ে যায়; তাঁর উপর বিশ্বাস আনা, যার মাধ্যমে ইশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সমর্থন করা হয়, যাতে বলা হয় তিনি এবং একমাত্র তিনি একাই এই সর্বশেষ নবীর সম্মান পেয়েছেন। সর্বশেষ নবীর উপাধি পাওয়ার আগে বা প্রাথমিক যুগে যে কাউকে ধর্মগ্রহণ করতে হলে শুধুমাত্র মুহাম্মদের ধর্মের সদস্য হতে হতো, শুধু মোহাম্মদের হাতকে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে একটি সহজ বক্তব্য বারবার বলতে হত যে, "আমি ঘোষণা করছি, ঈশ্বর ব্যতীত কোন উপাস্য নেই"। কিন্তু মুহাম্মদের মর্যাদায় উন্নতি ঘটবার পর বিবৃতিতে এখন তাঁর বিশেষ ভূমিকাটিও যুক্ত

করা হয়েছে। এরপর থেকে ধর্মান্তরিত হতে গেলে ব্যক্তিকে বলতে হতো, “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মদ তাঁর রাসূল” (৩)।
মক্কাবাসীরা তাঁকে নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন ছিল। এই সতর্ককারী-নবী ছিল তাদের জন্য বিপজ্জনক এবং ধ্বংসাত্মক। তাদের এই উদ্বিগ্নতার কারণ ছিল, তিনি অনেক যুবকদের মোহিত করছেন এমনভাবে যে, তাঁরা নিজেদের পরিবারের প্রতিই বৈরী হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ধর্মান্তরিত হওয়ার পর বাবা-মাকে বলছে যে, সে এখন থেকে তাদের সাথে আর কোন সম্পর্ক রাখতে পারবে না, কারণ তাঁরা মূর্তিপূজা করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য যেকোন উপাসনা করাই হচ্ছে মস্তবড় পাপ!

মুহাম্মদ তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এটি আসলে ঈশ্বরের আদেশ; যারা মূর্তিপূজা করে তাদের সাথে মেলামেশা করা উচিত নয়। এমনকি, তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও রাখা যাবে না। মক্কাবাসীরা মুহাম্মদকে যেহেতু হত্যা করতে পারছিল না তাই তারা তাঁর অনুসারীদের মধ্যে যারা কোনো গোত্র থেকে নিরাপত্তা পেত না, কোন গোত্রের সাথে যোগাযোগও ছিল না, তাদের উপরেই আক্রমণ করে মনের ঝাল মেটাত।

রাখাল বালক আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ মন্দিরের বাইরে সাহস করে কিছু কোরআন আয়াত শোনানোর পরে তাঁকে প্রকাশ্যে মারধর করা হয়েছিল। সেই সময়ে তিনি আরও কয়েকজন তরুণ ধর্মান্তরিতদের সাথে আরকামের বাড়িতে থাকতেন। তাদের মধ্যে একজন একটি পরামর্শ নিয়ে এসেছিল, যদি কোরানের একটি অধ্যায় মন্দিরে গিয়ে কেউ পড়েন, তাহলে হয়ত মক্কাবাসীরা তাদের মতো বিমোহিত হবে এবং বুঝতে পারবে এটা নিশ্চয় আল্লাহর বাণী যা জিব্রাইলের মাধ্যমে মুহাম্মদের কাছে আসে। তবে এমন একজনকে এই কাজটি করতে হবে যার গোত্রগত সুরক্ষা আছে এবং যিনি মক্কার উল্লেখযোগ্য পরিবারের সদস্য। কেউ যখন চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করেনি, তখন মাসুদ স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এগিয়ে আসেন। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে বিরত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি একজন দাসীর পুত্র ছিলেন, তাঁর কেউ ছিল না এবং সম্ভবত তাঁর উপর আক্রমণ করা কোনো ব্যাপারই না। এক্ষেত্রেও তাই হল। এটা প্রমাণিত ছিল যে, চারণ কবিরা প্রায়শই টাকার জন্য মক্কায় জনসমাগম করতেন। সুতরাং মন্দিরের সামনে কবিতা আবৃত্তি করার দৃশ্য অস্বাভাবিক ছিল না। যাইহোক, যেই মুহূর্তে মক্কাবাসীরা বুঝতে পারল যে মাসুদ মুহাম্মদের লোক এবং তিনি তাঁর আয়াত তেলাওয়াত করছেন, তখন তাঁর চারপাশে জনতা জড়ো হতে থাকল। মাসুদকে মারধর করে তাঁর নাক দিয়ে রক্ত বের করে দিল। মাসুদ তাঁর রক্তাক্ত নাক নিয়ে গর্বিত হয়ে আরকামের বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন (৪)।

এমনকি কিছু সম্ভ্রান্ত পরিবারের ধর্মান্তরকারীরাও জনসাধারণের বিক্ষোভ থেকে রেহাই পায়নি। আবু বকর ও তাঁর চাচাত ভাই বণিক তালহা উবায়দুল্লাহ (Talha Ubaydullah) উভয়কেই একসাথে রাস্তায় বেঁধে পেটানো হয় (৫)। তালহার মা মুহাম্মদকে ত্যাগ করার জন্য তাঁর ছেলেকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ব্যর্থ হলেন তখন তিনি মক্কাবাসীদের তাঁকে একটি শিক্ষা দেয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, নাওফাল খুয়ালিদ (Nawfal Khuwaylid) (৬) নামে খাদিজার এক ভাই ছিলেন, যিনি মুহাম্মদের ঘোর শত্রু ছিলেন। তিনি তালহা ও আবু বকরকে একসাথে বাঁধেন এবং তাদের ধাক্কা দিয়ে মক্কার রাস্তায় নিয়ে যান। সেখানে বিক্ষুব্ধ জনতা তাদের দাড়ি ধরে পিটিয়েছিল। তালহার মা ছেলেকে ক্রমাগত বেত্রাঘাত এবং অভিশাপ দিতে থাকেন ‘হাশিমি বংশের লোক’ এর অনুসারী হওয়ার জন্য (৭)। যুদ্ধবন্দিদের মতো তাদেরকে দিয়ে শহরে প্রদক্ষিণ করানো হয়, তারপর শহরের বাইরের একটি রাস্তায় তাদের ফেলে রেখে চলে যায়।

অন্যদেরকে পারিবারিক সম্পর্কের কারণে শারীরিকভাবে শাস্তি না দিতে পারলেও জনসাধারণের অবজ্ঞার কারণে তাঁরা গোত্রছাড়াই ছিলেন। মক্কাবাসী নেতাদের মধ্যে একজন আবুল হাকাম মুহাম্মদকে হত্যা করার জন্য আবু তালিবের অনুমতি চেয়েছিলেন। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, উচ্চবংশের কেউ একজন মুহাম্মদের ধর্মকে গ্রহণ করেছে, তখন তিনি প্রকাশ্যে

তাঁর মুখোমুখি হলেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করার জন্য তাঁকে নিন্দা করলেন। তিনি বললেন, "আমরা আপনাকে একটি মোটা মাথার লোক হিসেবে ঘোষণা করব এবং আপনাকে বোকা হিসেবে পরিচিত করব এবং আপনার খ্যাতি নষ্ট করব"। কোনো ধর্মান্ধরিত বেঈমান ব্যক্তি যদি বণিক হতেন, তাহলে আবুল হাকাম তাঁকে সর্বশান্ত করে রাস্তায় ভিক্ষা করতে বাধ্য করতেন। আর যদি নিচু শ্রেণীর মানুষ অথবা দাস শ্রেণীর কেউ হতো, তাহলে তাঁকে তিনি পরাস্ত করে ছাড়তেন (৮)।

প্রতিটি নতুন দলত্যাগের সাথে সাথে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি মক্কার ঐক্যকে খর্ব করছিলেন। আবুল হাকাম, যিনি তাঁর উদারতা, যুদ্ধে সাহসিকতা এবং একজন ব্যবসায়ী হিসেবে সাফল্যের জন্য তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি মনে করতেন মুহাম্মদ তাদের 'সংস্কৃতি ধ্বংস' করেও পার পেয়ে যাচ্ছে! তিনি এতটাই পাগল হয়ে উঠেছিলেন যে, মুহাম্মদকে যদি মন্দিরের সামনে আবারও প্রার্থনা করতে দেখেন, তাহলে তাঁর মাথায় লাথি দিয়ে বের করে দেয়ার হুমকি দেন। গল্পের একটি সংস্করণে পাওয়া যায়, তিনি পাথর দিয়ে মুহাম্মদের মাথা ফাটিয়ে ফেলার হুমকি দিয়েছিলেন। মুহাম্মদ যখন এই হুমকির কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং মন্দিরের দিকে ছুটে আসেন। ক্রোধে মুহাম্মদ এতটাই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে, যাওয়ার পথে তিনি বারবার ধাক্কা খাচ্ছিলেন। তবে মন্দিরে পৌঁছে তিনি একবারে ঠান্ডা হয়ে গেলেন। তিনি আর সহিংসতায় জড়াতে চাইছিলেন না যতটা না তাঁর বিরোধিরা চেয়েছিল, কারণ তিনি জানতেন তিনি সহিংসতায় জড়ালে তাঁর উপর থেকে হাশিমি গোত্র সমর্থন তুলে নিতে পারে এবং শত্রুদের প্রতিশোধকে সমর্থন করতে পারে। তিনি কেবল মন্দিরে গিয়ে উচ্চস্বরে কোরানের আয়াত তেলাওয়াতের (পাঠের) মধ্যেই নিজের কর্মকাণ্ড সীমিত রেখেছিলেন, যদিও এটাও আবুল হাকাম এবং মন্দিরের অর্ধবৃত্তাকার পাটাতনের উপর বসে থাকা অন্যান্য নেতাদের ক্ষুব্ধ করছিল (৯)। মুহাম্মদ এভাবে তাদের গায়ের সাথে একেবারে লেগে থাকতেন এবং তাদের বিরক্ত করাটাকে উপভোগ করতেন। যেহেতু তিনি অতিরিক্ত আগ্রাসন এবং অস্বাভাবিক সহিংসতায় জড়াতে পারতেন (যা পরে আসবে) তাই একটি নিষ্ক্রিয়-আক্রমণাত্মক উপায় বেছে নিয়েছিলেন, যদ্দারা তাদেরকে ক্ষুব্ধ করে তিনি তাঁর ক্রোধ প্রশমন করতেন। এ পরিস্থিতির মধ্যে তিনি তাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ম মেনে ওযু করেন এবং মনোযোগ দিয়ে সালাদ আদায় করেন। এটি ছিল তাঁর মতো করে তাদের প্রতি চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করা বা জ্বালাতন করা, কারণ তিনি জানতেন যে তারা তাঁকে দেখছে। তিনি সকালে মাসুদকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে আসতেন, যে ছিলেন তাঁর খুবই অনুগত। আবহাওয়া ভালো থাকলে এই সময়টিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মক্কাবাসীরা এই জায়গায় একত্রিত হতো এবং নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করত ও বিশ্রাম নিত। সাবেক রাখাল বালক মাসুদ এক জগ জল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন যাতে মুহাম্মদের প্রতিটি প্রদেক্ষপ মেনে ওযু সম্পন্ন হয়। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে কিছু আয়াত আবৃত্তি করে প্রার্থনা শুরু করতেন, অবশেষে রুকু এবং সেজদার মধ্য দিয়ে শেষ করতেন।

সেখান বসে থাকা মক্কাবাসীরা ক্ষোভ ও ক্রোধের মিশ্রণ নিয়ে তাঁর এই প্রার্থনা অবলোকন করত। তাদের ক্ষোভ আরো অতিমাত্রায় বেড়ে যেত এটা ভেবে যে, মুহাম্মদ তাদের জীবনযাত্রার সবচেয়ে বড় প্রতীকের সামনে এসব অপমানজনক কাজ করছেন। মন্দিরটি শুধুমাত্র তাদের বিশ্বাসের সাক্ষ্যই ছিল না, বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছিল। দশকের পর দশক, প্রজন্মের পর প্রজন্ম, তীর্থযাত্রীরা তাদের অনেক দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে এই পবিত্রভূমিতে আসতেন এবং তারা দেবতার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে নালিশ করতেন। পবিত্র প্রাঙ্গনে সবসময় শতশত মূর্তি ছিল এবং এটি ছিল তাদের সহিষ্ণুতারই নিদর্শন। মুহাম্মদ পবিত্র ভবনের সামনে তাঁর নতুন ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করছে যা তাদের জন্য অপমানজনক। একদিন আবুল হাকামের ক্ষোভ আর ঘৃণা বেড়ে গেল। তিনি মন্দিরের পাটাতনে পাথরের বেদীতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মক্কাবাসীদের সাথে বসেছিলেন। তাঁর সাথে বসে ছিলেন মুহাম্মদের অন্যতম প্রতিবেশী উমাইয়া বংশীয় উকবাহ মুয়াইত (Uqbah Muayt), এবং সম্ভবত তিনি মুহাম্মদের দরজায় মলত্যাগকারীদের মধ্যে একজন। সে মুহাম্মদের উপর পাথর নিক্ষেপে অংশ নিয়েছিল, যার ফলে মুহাম্মদ আরকামের বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। উমাইয়া খালাফ গুরুত্বপূর্ণ বনেদি ব্যবসায়ী ছিলেন। তাদের সাথে আরও ছিলেন রাবিয়ার

ভাই উতবা, শায়বা এবং কয়েকজন উল্লেখযোগ্য মক্কাবাসী। মুহাম্মদ সেদিন সকালে তাঁর দাস মাসুদ ও তাঁর মেয়ে ফাতিমাকে নিয়ে মন্দিরে এসেছিলেন, যার বয়স তখন প্রায় দশ বছর। মুহাম্মদ পবিত্র হবার জন্য ওযু করছিলেন। আবুল হাকাম উকবাকে পাঠান সম্প্রতি জবাই করা উটের নাড়িভুঁড়ি আনতে। মুহাম্মদ যেই তাঁর প্রার্থনা শুরু করলেন লোকেরা মন্দিরের পাটাতন থেকে নেমে আসে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, উকবাহ উটের এই নাড়িভুঁড়ি মুহাম্মদের পেছনে ছুঁড়ে মারছে। এই দৃশ্য দেখে সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল, এমনকি একে অন্যের উপর ঢলে পড়ল। প্রাক্তন রাখাল ছেলে মাসুদের পক্ষে কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। তিনি যুবক ছিলেন এবং দেখতে অনেকটা হালকা গড়নের ছিলেন। তিনি উকবাহ মুয়াইতের পশুর পাল দেখাশোনা করতেন, তাই তাঁকে ভয় পেতেন।

মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমা এটি দেখে রেগে গেল। সে তাঁর বাবার পিঠ থেকে উটের নাড়িভুঁড়িগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং তাদের নিষ্ঠুর কৌতুকের জন্য লোকগুলিকে অভিশাপ দিল। কিন্তু মুহাম্মদ তাঁর প্রার্থনা চালিয়ে গেলেন। নিখুঁতভাবে করাটাই ছিল সবকিছু, এবং তিনি তাঁর প্রার্থনা শুরু করেছিলেন তা সম্পন্ন করতে হবে যাতে আল্লাহর চোখে মূল্য থাকে। তারচেয়েও বড় কথা, তিনি রাগ দেখিয়ে তাদেরকে সন্তুষ্টি দিতে চাননি। তবে এটাও সত্য, তাঁর ভেতরকার ক্রোধ ক্রমশ উদগীরণের অপেক্ষায় ছিল। ইসলামিক সাহিত্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, তাঁর চাপা মেজাজ ছিল। যখনই তিনি অত্যন্ত রেগে যেতেন তখনই তাঁর কপালের মাঝখানে একটা শিরা ফুলে উঠত। মুহাম্মদ তাঁর প্রার্থনা শেষ করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি মন্দিরের দিকে তাকিয়ে আকাশের দিকে হাত তুলে চিৎকার করে বললেন, "হে আল্লাহ, কুরাইশদের ধ্বংস কর"। তিনি প্রত্যেক লোকের জন্য একই দোয়া করতে লাগলেনঃ "হে আল্লাহ, আবু জাহলকে (আবুল হাকাম) ধ্বংস কর! হে আল্লাহ, উকবাহ মুয়াইতকে ধ্বংস কর। হে আল্লাহ, উমাইয়া খালাফকে (Umayya Khalaf) ধ্বংস কর। হে আল্লাহ, উতবা রাবিয়াকে (Utba Rabia) ধ্বংস কর!" এভাবে বলতেই থাকলেন যতক্ষণ না তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ঘোষণা করেন (১০)। তিনি বলেন, "মহান আল্লাহর ক্রোধ সেই লোকদের উপর, যারা তাঁর রসূলের উপর এই কাজ করেছে"।

মক্কার নেতারা হাল ছাড়েননি। এর কিছুক্ষণ পরেই মুহাম্মদ আবার মন্দিরে উপস্থিত হন, এবার কালো পাথরের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করেন, চুম্বন করেন। প্রতিবার প্রদক্ষিণ করার সময় তাঁকে মক্কাবাসী গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অতিক্রম করতে হচ্ছিল যারা ওখানে একত্রিত হয়েছিলেন। যখনই তিনি পাটাতনের কাছে আসতেন, তাদের মধ্যে থেকে একজন লোক জোরে তাঁর সম্পর্কে অপমানজনক মন্তব্য করত যাতে তিনি শুনতে পান। একবার ঘোরা শেষ করে মুহাম্মদ তাদের সামনে থামলেন এবং তাদের উদেশ্য করে বললেন, "আপনারা কি আমার কথা শুনছেন, হে কুরাইশ? আমার জীবন যার হাতে, তোমাকে জবাই করতে আমি তাঁকেই আনবো!" তিনি এত শীতলভাবে সেই হুমকি দিয়েছিলেন যে, সবাই চুপ করে রইল। অবশেষে তাদের মধ্যে একজন সমঝোতার সুরে বলে উঠলেন, "তুমি বুদ্ধিমান হও না কেন, আবুল কাসিম? তুমিতো কখনো বোকার মতো আচরণ করনি!" (১১)। তিনি চলে যাওয়ার পর মক্কাবাসীরা তাঁর দেয়া হুমকি নিয়ে আলোচনা করে এবং তাঁর উপর আগের চেয়ে অধিক ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

তাঁর কোনো কারণ ছিল না তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার। মুহাম্মদের প্রতি তাদের আচরণও আসলে কোন সমস্যা ছিল না, বরং সমস্যা করছিলেন তিনি নিজে। মুহাম্মদই বরং মন্দিরের দেবতাদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; তিনিই তাদের জীবনযাত্রাকে উপহাস করেছিলেন; তিনিই তাদের বুদ্ধিমত্তাকে নিয়ে বিদ্রুপ মন্তব্য করেছেন এবং জাহান্নামের হুমকি দিয়ে অপমান করেছিলেন। আর এখন তিনি আবার তাদের মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছেন, কারণ তিনি যা প্রচার করেছেন তা তাঁরা পছন্দ করে না। তিনি ইতোমধ্যেই তাদের সমাজিক বন্ধনের অনেক ক্ষতি করেছেন, উপরন্তু তিনি এখন আবার হুমকিও দিচ্ছেন! পরদিন মুহাম্মদ যখন স্বাভাবিকভাবে নামায আদায় করতে আসেন তখন মক্কার নেতারা তাঁকে ঘিরে ধরেন। তাদের মধ্যে একজন তাঁর কলার ধরে শ্বাসরোধ করার উপক্রম করে, এবং সম্ভবত অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেত যদি আবু বকর তাদের মাঝখানে না চলে আসতেন। তাঁকে সতর্ক করা হয়েছিল যে, মুহাম্মদ বিপদের মধ্যে আছেন। তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং বললেন, "আল্লাহ আমার প্রভু, একথা বলার জন্য কি তোমরা একজনকে মেরে ফেলবে?" তিনি পরে স্বীকার করেন, মক্কাবাসীদের কাছ থেকে পাওয়া সবচেয়ে খারাপ আচরণ ছিল এটি (১২)।
মুহাম্মদের উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণাত্নক আচরণ অনেকটা তাঁর পক্ষেই কাজ করেছে। আরেকট ঘটনার পর তাঁর এক চাচা তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেন। গল্পটিতে দেখা যায় যে, আবুল হাকাম সাফা পর্বতের পাদদেশে হেঁটে যাচ্ছিলেন। মুহাম্মদ সম্ভবত সেখানে একটি পাথরের উপর বসেছিলেন অথবা ওপর দিক থেকে আসছিলেন। আবুল হাকাম তাঁর উপর রেগে গেলেন এবং এত উচ্চস্বরে তাঁকে অভিশাপ দিচ্ছিলেন যে, আশপাশের লোকজন তাদের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন। তারপর যখন ক্রোধ কমে এলো, আবুল হাকাম মন্দিরে পাটাতনে গিয়ে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে বসলেন। এর অল্পক্ষণ পরেই মুহাম্মদের চাচা হামজা শিকার থেকে ফিরে আসেন। তাঁর ধনুকটি তাঁর কাধের উপরই ছিল। তিনি একজন খ্যাতনামা শিকারি ছিলেন, যিনি তাঁর দিনের অর্ধেক শিকার করে আর বাকি অর্ধেক মক্কায় মদের দোকানে ফুর্তি করে কাটাতেন। তিনি খুব শক্তিশালী এবং বদমেজাজি ছিলেন। সাধারণত যখন তিনি তাঁর সর্বশেষ শিকার থেকে শহরে ফিরে আসতেন, তখন তিনি তাঁর ঘোড়া আর উটটিকে মন্দিরের বাইরে বাঁধতেন। শিকারের জন্য দেবদেবীদের ধন্যবাদ দিয়ে সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করে কালো পাথরে চুম্বন করতেন। তবে এবার তিনি মন্দিরে যাওয়ার আগেই এক দাসী তাঁকে থামায়, আর মুহাম্মদকে আবুল হাকাম কি বলেছিল তা বলে দেয়। একথা শুনে তিনি প্রচন্ড রেগে গেলেন। তিনি দ্রুতগতিতে মন্দিরের দিকে এগিয়ে এক লাফ দিয়ে আবুল হাকামের মাথায় তাঁর হাত থাকা ধনুকটি দিয়ে আঘাত করলেন। আর চিৎকার করে বললেন, "তুমি কি আমাকেও আঘাত করবে যদি আমি তাঁর ধর্ম অনুসরণ করি? এবং সে যা বলে তা বলি? পারলে আমাকে আঘাত করো!" আবুল হাকামের সাথে মাখজুম গোত্রের বেশ কয়েকজন লোক বসেছিলেন। তাঁরা হামজার পায়ের কাছে লাফ দিয়ে পড়লেন, কিন্তু আবুল হাকাম দূরেই বসে রইলেন। তিনি তাদের উদেশ্যে বললেন, "তাঁকে একা থাকতে দাও, কারণ ঈশ্বরের কসম, আমি তাঁর ভাতিজাকে অনেক অপমান করেছি"। হামজা, যিনি পূর্বে মুহাম্মদের ধর্ম সম্পর্কে বেশ উদাসীন ছিলেন, তিনি তাঁর কাছে গিয়ে বিশ্বাস ঘোষণা করলেন। এই ধর্মান্তকরণের মাধ্যমে মুহাম্মদ একজন ভয়ঙ্কর মিত্র লাভ করলেন (১৩)।

এই ঘটনার পর মক্কার নেতারা মুহাম্মদের সাথে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে নরমপন্থা অবলম্বন করে। এর কিছুদিন পরেই উতবা ইবনে রাবিয়া শান্ত এবং যুক্তিবাদী কণ্ঠে তাঁর সাথে কথোপকথন শুরু করেন, যাতে তিনি তাঁর বিভেদমূলক আচরণগুলো পরিবর্তন করতে রাজি করাতে পারেন। এর জন্য তাঁর রাগকে প্রশমিত করে ফেলতে হয়েছিল, কারণ তাঁর এক পুত্র আবু হুযাইফা মুহাম্মদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন, তিনি তাঁর পিতার বিশ্বাসকে নিন্দা জানিয়েছিলেন এবং সাফ জানিয়েছিলেন যে, বাবার সাথে আর কোন সম্পর্ক নেই। মুহাম্মদকে মন্দিরের দিকে পিঠ দিয়ে একা বসে থাকতে দেখে উতবা (Utba) সেই পাটাতন থেকে নেমে আসেন যেখানে তিনি অন্যান্য নেতাদের সাথে বসে ছিলেন এবং এরপর মুহাম্মদের পাশে বসলেন। তিনি কথোপকথন শুরু করলেন মুহাম্মদের প্রশংসা করে যে, তাঁর জন্ম সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে এবং এরপর তাঁর পূর্বপুরুষদের নানান ভালো দিক তুলে ধরেন। কিন্তু তিনি তারপর বললেন যে, মুহাম্মদ শেষ পর্যন্ত তাঁর সম্প্রদায়কে বিভক্ত করছেন। উতবা বলেন, তাঁর এহেন কর্ম তাঁর সহকর্মী বা সহযোদ্ধা মক্কাবাসীদের উদ্বিগ্ন এবং বিষণ্ণ করে তুলছে। ইসলামিক সাহিত্যে বলা হয়েছে যে, উতবা একটি চুক্তির প্রস্তাব করেছিলেন। প্রস্তাবটি হচ্ছে, মুহাম্মদ যদি চান এবং মক্কাবাসীর দেবতাদের অভিশাপ দেয়া বন্ধ করেন তবে মক্কার নেতারা তাঁর জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে প্রস্তুত। এভাবে তিনি লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ পেতে পারেন। যদি তিনি নেতৃত্ব চান তাহলে তারা তাঁকে মক্কাবাসীর রাজপুত্র বানাতে প্রস্তুত, এমনকি তাঁকে মক্কাবাসীদের সবার উপর রাজা হিসেবে স্থাপন করতেও তাঁরা রাজি।

তবে বেশিরভাগ পশ্চিমা পণ্ডিতরা এই প্রস্তাবগুলোকে সঠিক নয় বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। সে সময় মুহাম্মদ তাদের অস্তিত্বের হুমকির চেয়ে তাদের কাছে বিরক্তিকর বেশি ছিলেন। উতবা সম্ভাব্য আরেকটি প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন, এবং তা হচ্ছে, মক্কাবাসী তাঁর বিভ্রম দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত চিকিৎসা খরচ বহন করতে রাজি আছেন। মক্কাবাসীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, মুহাম্মদ যা করছে তা আসলে তাঁর উপর ভর করে থাকা খারাপ জ্বিনের প্রভাবেই করছে। মন্দির

পুনর্নির্মাণের সময় তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় এবং মুখে ফেনা দেখে তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই ধারণা সত্য বলে বিশ্বাস করতেন। জিন ছিল অদৃশ্য সত্ত্বা যা মানবজাতির সাথে সহাবস্থান করত। তারা মানুষের জন্য সহায়কও হতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা বিদ্বেষপূর্ণ। তাঁরা মানুষের জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষ করে যদি তাঁরা কারো মন দখল করতে সক্ষম হতো। আর মুহাম্মদের সাথে থাকা জিন তাঁর মনের দখলে নিয়েছিলেন, এটা অনেকটা নিশ্চিত বলেই মনে হচ্ছিল। উতবার পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছিল এভাবেঃ "যদি এই ভূত যা আপনার সাথে আছে বা যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আপনি তাঁর থেকে মুক্তি পেতে না পারেন। আমরা আপনার জন্য একজন চিকিৎসক খুঁজে বের করব এবং আপনাকে সুস্থ করার জন্য আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করবো, কারণ প্রায়ই একটি পরিচিত আত্মা একজন মানুষের উপর দখলদারিত্ব কায়েম করে যতক্ষণ না সে সুস্থ না হয়"। মক্কাবাসীরা মুহাম্মদের থেকে জিনকে তাড়ানোর জন্য সেরা তান্ত্রিকদের খুঁজে বের করতে সারাদেশ চষে ফেলল। এমনকি তাঁকে সুস্থ করার জন্য যদি সিরিয়া, ইয়েমেন, আবিসিনিয়া গিয়ে কাউকে খুঁজে বের করার প্রয়োজন হয়, তাতেও তাঁরা রাজি! (১৪)।

মুহাম্মদ ধৈর্য ধরে উতবার কথা শুনলেন। কথা শেষ হলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি এখন আমার কথা শুনবেন?" এটা বলেই তিনি তাঁর সাম্প্রতিক একটি রচনা আবৃত্তি করেন, যা তাঁর পূর্ববর্তী রচনার প্রশংসা দিয়ে শুরু হলো "পরম করুণাময় অসীম দয়ালুর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। এমন এক কিতাব, যার আয়াতগুলো জ্ঞানী কওমের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কুরআনরূপে আরবী ভাষায়। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী" (১৫)।

মুহাম্মদ এরপর নিজেকে একটা অবনমিত অবস্থানে নিয়ে গেলেন যা তাঁকে নিজের কণ্ঠে কিছু কথা বলার সুযোগ করে দেয়। তিনি উতবার দিকে ফিরে তাকিয়ে আবার বললেন, "বল, 'আমি কেবল তোমাদের মত একজন মানুষ। আমার কাছে ওহী পাঠানো হয় যে, তোমাদের ইলাহ কেবলমাত্র এক ইলাহ। অতএব তোমরা তাঁর পথে দৃঢ়ভাবে অটল থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও" (১৬। তারপর আবার তিনি ঈশ্বরের কণ্ঠের অবস্থানে চলেন গেলেন এবং তিনি যেই কথাটি বারবার বলে আসছিলেন তা আবৃতি করলেন যে, মক্কাবাসীরা মূলত ঈশ্বরকে নয়, বরং ঈশ্বরের সৃষ্টির উপাসনা করে। "তোমরা না সূর্যকে সিজদা করবে, না চাঁদকে। আর তোমরা আল্লাহকে সিজদা কর যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন" (১৭)।

উতবা অবাক হয়ে গেলেন। তিনি মুহাম্মদের পাশে এসে বসেছিলেন, তিনি যে মক্কাবাসী সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন সেই বিষয়ে নম্রভাবে আলোচনা করতে। কিন্তু আলোচনার পরিবর্তে তিনি তাঁকে কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিলেন, যার ফলে তিনি আর কথা বাড়াতে পারেননি। ইসলামিক সাহিত্যে এই ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় এবং দাবি করা হয়, উতবা এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে জোর করে সেখান থেকে বের করে নিয়ে যায় এবং বলেঃ "তাঁর জিহ্বার মধু দিয়ে সে তোমাকে মুগ্ধ করেছে!" (১৮)

মুহাম্মদের ধর্মতত্ত্বের প্রভাব থেকে মক্কাবাসীরা মুক্তই থেকে গেল। একবারের জন্যও কেউ তাদের সর্বোচ্চ দেবতার অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক করেনি। তারা জানতেন মহান পালনকর্তা আছেন, কিন্তু তিনি থাকেন দূরবর্তী এবং অজানা জায়গায়। শুধুমাত্র তাঁর কন্যা বা হুবাল এবং অন্যান্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করার মাধ্যমেই তাঁর কাছে যাওয়া যায়। "আল্লাহ" শব্দটি তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতির অংশ ছিল। প্রকৃতপক্ষে, বহুশ্বরবাদীরা তাদের সন্তানদের নাম রাখতেন আবদুল্লাহ, যার অর্থ দাস বা আল্লাহর দাস। মুহাম্মদের সাথে তাদের পার্থক্য ছিল এক জায়গায়, আর তা হলো, আল্লাহ ছাড়াও মক্কাবাসীরা যেসব দেবতাদের পূজা করতেন, মুহাম্মদ সেসব দেবতাদের স্বীকার করতেন না। তারা মুহাম্মদের দ্বারা তাদের দেবদেবীদের এই 'ভুল চরিত্রকরণে' ক্ষুব্ধ ছিল। তিনি তাদের 'মূর্তিপূজক' বলে অভিহিত করেছেন, যেন তাঁরা বিশ্বাস করত যে এই মূর্তির মাঝে ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে। অবশ্যই এমন ধারণা করার মতো লোক মক্কায় ছিল, তবে মক্কার বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত মানুষ যারা ছিলেন তাঁরা মনে করতেন, এই পাথর অথবা কাঠের মূর্তি শুধুমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করছে, তাদের নিজেদের কোন ক্ষমতা

নেই। আল-উজ্জার পাথরের মূর্তির সামনে তাঁরা যখন প্রার্থনা করছেন বা কোন কিছু উৎসর্গ করছেন তখন তারা সেই পাথরের না বরং এই মূর্তিগুলো যে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করছে তারই উপাসনা করছেন। আল্লাহ কিভাবে আল-উজ্জার কাছে প্রার্থনা করাতে কোন অপরাধ খুঁজে পাবেন, যাকে তিনি জীবনশক্তির আধার হিসেবে সৃষ্টি করেছেন? আল উজ্জাকে দেখতে, অনুভব করতে এবং তাঁকে নিয়ে চিন্তা করতেই বা কেন তা দোষের হবে? আল্লাহ কিভাবে রেগে যাবেন আল-লাত দেবতাঁকে উপাসনা করলে যিনি ছিলেন ভালোবাসার দেবী, গাছপালা, পশু থেকে শুরু করে মানুষ যাদের বংশবৃদ্ধি তাঁর কৃপায় হয়? অথবা আল্লাহ কিভাবে রেগে যাবেন পবিত্র হুবাল দেবতাকে পূজা করলে, যিনি তাদের যুদ্ধে শক্তি ও সাহস জুগিয়েছেন, যিনি তাদেরকে পথনির্দেশ দিয়েছেন? হুবাল কি আল্লাহর পুত্র ছিল না? যদি কেউ পিতার সামনে তাঁর ছেলের প্রশংসা করে তবে কি পিতা অপমানিত হবেন বা রেগে যাবেন? মক্কার নেতারা মুহাম্মদকে এটি মক্কায় শান্তি ফিরিয়ে আনার স্বার্থে তাঁর যেন বোধের উদয় হয় সে ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন এবং উতবার প্রস্তাবটিও তাঁর সামনে বারবার তুলে ধরতে থাকলেন। মক্কার এক ডজনেরও বেশি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মুহাম্মদের কাছে বার্তা পাঠালেন যে, তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে তাঁর সাথে কথা বলতে আগ্রহী। তিনি তাদের সামনে দেখা দিলেন এবং মন্দিরের পাশের পাটাতনে এসে বসলেন। নেতারা শান্তভাবে কথাগুলো আবার বলতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, ইতিপূর্বে কোন আরব তাঁর নিজের আত্মীয়দের সাথে এমন আচরণ করেনি যা তাঁরা মুহাম্মদের সাথে করছে, এবং তাঁরা মুহাম্মদকে টাকা ও ক্ষমতা প্রদান করবেন যদি তিনি তাঁর ধর্মপ্রচার করা থেকে বিরত থাকতে সম্মত হন। একইসাথে তাঁরা তাঁকে প্রেত্মাতাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য চিকিৎসা সেবা প্রদান করারও প্রস্তাব করেন।
মুহাম্মদ আবার তাদের প্রস্তাব খারিজ করে দেন এবং তাদেরকে 'বিপথগামী' বলে অভিহিত করেন। তিনি তাদের বলেন, তাঁর উপর কোন প্রেতাত্মা ভর করেনি। আল্লাহ তাঁকে এমন সব আয়াত পাঠিয়েছিলেন, যা তাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্যই দরকার। যদি তাঁরা আল্লাহর কথা শোনে, তাহলে পরবর্তী জীবনে তাদের জন্য ভালো ফলাফল নিশ্চিত করা হবে। এমনকি এই জীবনেও তাঁরা সুবিধাভোগী হবে। তাদের শুধু শুনতে হবে এবং আল্লাহর প্রেরিত রসূলকে অনুসরণ করতে হবে।

মক্কাবাসীরা তাঁর এই দাবির প্রমাণ করতে বলেন। কারণ তিনি দাবি করছেন, আল্লাহ তাঁর সাথে ফেরেশতাদের মাধ্যমে কথা বলেছেন। এছাড়া এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ তাঁরা খুঁজে পেলেন না। তাই আবুল হাকাম বলে বসলেন, "আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না, কিন্তু তুমি যা প্রচার করছ তা মিথ্যা বলে বিবেচনা করছি" (১৯)। তাদের মধ্যে একজন প্রস্তাব করেন যে, মুহাম্মদ যেন তাঁর দাবির প্রমাণস্বরূপ তাঁর ঈশ্বরকে দিয়ে মক্কার পাহাড় সরিয়ে নদী সৃষ্টি করে দেয় যাতে তাঁরা কৃষিকাজে নিয়োজিত হতে পারেন। অথবা যেহেতু মুহাম্মদ জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, মৃতদের পুনরুত্থানের ঘটনা ঘটবে তাহলে তাঁর উচিত আল্লাহকে বলে তাদের সবার পূর্বপুরুষ কুসাইকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং তাঁকে মক্কার নেতা হিসেবে ফিরিয়ে আনা। আল্লাহ নিশ্চয়ই মুহাম্মদের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ এবং তা বাগান ও সোনা দিয়ে পূর্ণ করে দেয়ার অনুরোধেও আপত্তি করবেন না? যদি এগুলো সব সৃষ্টিকর্তার পক্ষে বেশি চাহিদা বলে মনে হয়, তাহলে অন্তত তাঁর স্বর্গদূতকে তাদের সামনে তিনি পাঠাতে পারেন, এতেও তাঁরা বিশ্বাস করবেন। তাও যদি করতে ব্যর্থ হন, তাহলে "আকাশকে আমাদের উপর টুকরো টুকরো করে ফেলা হোক, যেমনটা তুমি দাবি কর যে, তোমার প্রভু চাইলে তা করতে পারেন" তাঁরা বললেন (২০)।

মুহাম্মদ মাফ চাইলেন। তিনি বললেন, আল্লাহকে অলৌকিক কাজের আহ্বান জানানোর জন্য তাঁকে পাঠানো হয়নি, বরং তাঁকে পাঠানো হয়েছে ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য। তাঁরা হয় তা "গ্রহণ করে সুবিধা গ্রহণ করতে পারে, অথবা তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে এবং আল্লাহর বিচারের অপেক্ষায় থাকতে পারে" (২১)। যদি তাঁরা যদি সত্যিই কোন অলৌকিক কিছু দেখতে চায় তবে যেন তাঁরা কোরআন শোনে, পরামর্শ দেন মুহাম্মদ। কেননা, কোরআন হচ্ছে সেই মুজিযা বা মিরাকল যা তাঁরা দেখতে চেয়েছিল।

মুহাম্মদের প্রথম চাচাত ভাইদের মাঝে একজন, আবদুল্লাহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আব্দুল্লাহ ছিলেন মুহাম্মদের ফুপু আতিকার ছেলে। তিনি মতামত ব্যক্ত করেন এই বলে যে, "ঈশ্বরের কসম, আমি কখনোই বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমি তাকিয়ে থাকা অবস্থায় তুমি মই দিয়ে আকাশে আরোহণ করো, আর যতক্ষণ না চারজন ফেরেশতা তোমার সাথে এসে বলে যে তুমি সত্য কথা বলছ। আর ঈশ্বরের কসম, এমনকি যদি তুমি করোও, তবুও আমার মনে হয় না আমি তোমাকে বিশ্বাস করব" (২২)।

মুহাম্মদের অনমনীয়তায় হতাশ হয়ে মক্কাবাসীরা তাঁর বদনাম করতে এবং নবীত্বের দাবির সত্যতা সম্পর্কে জানতে ইহুদি যাজকদের সাথে পরামর্শ করেন। মক্কাবাসীরা নবীদের সম্পর্কে কিছুই জানত না, কিন্তু ইহুদিরা জানতেন। তাঁরা নাদের আল-হারিছ (Nader al-Harith) এবং মুহাম্মদের দুষ্টু প্রতিবেশী উকবাহ মুয়াইতকে ইয়াছরিবে পাঠান তাদের নবীদের সম্পর্কে ইহুদি ধর্মীয় যাজকদের (রাব্বি) জিজ্ঞাসা করতে এবং মুহাম্মদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করতে। মক্কা থেকে দুইশ ত্রিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত ইয়াছরিব কৃষির মরুদ্যান ছিল, যেখানে প্রায় একহাজার বছর ধরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইহুদি কেন্দ্রভূমি ছিল এবং তিনটি প্রধান ইহুদি গোত্রের বাসস্থান ছিল, যাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব পন্ডিত বা যাজক ছিল। মক্কাবাসীরা মুহাম্মদের নবী হওয়ার দাবি সম্পর্কে যাজকদের বলেন যে, তিনি ইহুদি নবীদের কথা বলছেন। তিনি দাবি করেছেন যে, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন, কিন্তু তিনি ইহুদি নন। তাঁকে পরীক্ষা করার কোন উপায় আছে কি? উত্তরে যাজকরা জানান, তিনি যদি নিজেকে তাদের অন্যতম নবী বলে দাবি করে, তাহলে তিনি আসলে প্রতারণা করেছেন। যাজকদের কাছে তিনটি প্রশ্ন রেডি ছিল যেগুলো ইহুদি নবীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল না এবং এটি ছিল একটি কৌশল। তাঁরা যেহেতু ইহুদি যাজকদের কাছ থেকে এসেছে এবং এসব প্রশ্ন করছে সুতরাং মুহাম্মদ নিশ্চিতভাবেই, এই প্রশ্ন শুনে উত্তর আবিষ্কার করার চেষ্টা করবেন। যাজকরা মক্কাবাসীদেরকে নির্দেশ দেন এই বলে যে, প্রথমে তাঁকে জিজ্ঞেস করুনঃ "প্রাচীনকালে নিখোঁজ যুবকদের কি হয়েছিল?" এই প্রশ্নটি খ্রিস্টান কিংবদন্তি সেভেন স্লিপারসের (Seven Sleepers) সাথে সম্পৃক্ত ছিল।



বহুশ্বরবাদী বিশ্বাসের প্রতি অসহিষ্ণুতা, মানুষকে ধর্মান্তরিত করা এবং কোরআনকে আল্লাহর বাণী আর তাঁকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেই জাহান্নামের হুমকি দেয়া ইত্যাদি সব কারণে মক্কাবাসীরা মুহাম্মদকে ঘৃণা করতেন। এখানে একজন নেতৃস্থানীয় মক্কাবাসী ব্যবসায়ী মুহাম্মদের পিঠে উটের নাড়িভুঁড়ি নিক্ষেপ করছে, যা দেখে আবার অন্যরা মজা নিচ্ছে!

সাতজন ইফেসীয় খ্রিস্টান (Ephesians Christian) যুবক রোমান সম্রাট ডেসিয়াসের (Decius) অত্যাচার থেকে বাঁচতে একটি গুহায় লুকিয়ে ছিলেন। তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েন এবং দুই শতাব্দী পরে জেগে দেখেন রাজা থিওডোসিয়াসের (Theodocius) রাজত্বকাল চলছে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে, "একজন শক্তিশালী ভ্রমণকারীর পরিচয় নিয়ে, যিনি পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় সীমানায় পৌঁছেছিলেন"। তিনি হচ্ছেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, যিনি আরবে যুল কারনাইন (Dhul Qarnayn) নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি পশ্চিমে মিশর থেকে পূর্বে ভারত পর্যন্ত বিশ্বের অধিকাংশ রাজ্য জয় করেছিলেন। শেষ প্রশ্নটি ছিল আত্মার প্রকৃতি নিয়ে, "তাঁকে জিজ্ঞেস করুন, আত্মা কি জিনিস? যদি তিনি উত্তর দিতে পারেন, তবে তাঁকে অনুসরণ করুন"- বললেন যাজকগণ (২৩)। মক্কাবাসীরা মুহাম্মদের কাছে এই সবগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করে, উত্তর দেয়ার জন্য তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে এবং এ-ও বলে যে, প্রশ্নগুলো ইহুদিদের কাছ থেকে এসেছে, যারা বলেছে যে যদি সত্যিই নবী হয় তাহলে সে এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে পারবে। এই মুহূর্তে সাড়া দিতে না পেরে মুহাম্মদ তাদের বলেন যে তিনি পরেরদিন তাদের কাছে ফিরে আসবেন, কিন্তু দিনের পর দিন চলে গেছে এবং তারপরেও তারপরেও মুহাম্মদের পক্ষ থেকে কোন উত্তর এলো না। মুহাম্মদের শত্রুরা গর্ব করতে লাগল যে, অবশেষে তাঁর প্রতারণা উন্মোচন করতে পেরেছে। কিন্তু এর পনের দিন পর মুহাম্মদ কোরানের একটি দীর্ঘ সূরা (অধ্যায়) নিয়ে আসেন যার শিরোনাম 'গুহা', যেখানে সেভেন স্লিপার এবং যুল কারনাইন উভয় সম্পর্কেই তাঁর জ্ঞান প্রদর্শন করতে দেখা যায় (২৪)।

তিনি সম্ভবত উত্তর খোঁজার জন্য মক্কার খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের কাছে গিয়েছিলেন, অথবা তিনি হয়তো ইয়াছরিবের যাজকদের কাছে কাউকে পাঠিয়েছেন, যাতে উত্তরগুলো বলে দেয়। সম্ভবত যেটা হয়েছে সেটা হলো, মুহাম্মদের প্রতি সহানুভূতিশীল একজন অনুপ্রবেশকারী উত্তরগুলো শিখে এসে তাঁকে অবগত করেছিল। আত্মা সম্পর্কে প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল হিসেবে তিনি এর উত্তর না দিয়ে বলেনঃ "তাঁরা আপনাকে আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। বলুন, আত্মা আমার পালনকর্তার বিষয়, এবং এ বিষয়ে আপনার জ্ঞান খুবই সামান্য" (২৫)।

এভাবে লোকদের প্রশ্নকে তিনি পাশ কাটিয়ে যান। ইহুদি যাজকরাও এ ব্যাপারে আর কোন ব্যাখ্যা দেননি। মুহাম্মদকে অসম্মান করার প্রয়াসে ব্যর্থ হয়ে মক্কাবাসীরা তাঁর অনুসারীদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল। এ সময়ের মধ্যে, তিনি প্রায় পঞ্চাশজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অনুসারী অর্জন করেছিলেন যাদের এক তৃতীয়াংশই ছিল ক্রীতদাস বা দাসত্ব থেকে মুক্তিপ্রাপ্তরা যাদের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে নিচুস্তরের মানুষ মনে করা হতো। ইসলামিক সাহিত্যে দাবি করা হয়েছে, মুহাম্মদের প্রতি যেসব ক্রীতদাসেরা সুহানুভূতিশীল ছিল তাদেরকে মক্কাবাসীরা মারধর করেছে, বন্দি করেছে এবং খাদ্য ও জল থেকে বঞ্চিত করেছে। কাউকে কাউকে গরম রোদে মাটিতে উপুড় করে শুইয়ে রাখা হতো, অথবা রাস্তায় তাদের মুখ ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো। অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে অনেকে মুহাম্মদের নিন্দা করত এবং তাঁকে অস্বীকার করত। আম্মার (Ammar) একজন মুক্ত দাস ছিলেন, যার মা সুমাইয়া (Somaya) ভয়ঙ্কর নির্যাতনের কারণে মারা গেছেন বলে জানা যায়, এবং তাঁকে পুনরায় তাঁর পূর্বের ধর্মে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু পরে মুহাম্মদের কাছে এসে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং তাঁর প্রতি তাঁর বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "যতক্ষণ না আমি আপনাকে গালিগালাজ করেছি এবং তাদের দেবতাদের সম্পর্কে ভালো কথা বলেছি ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আমাকে ছাড়েনি"। এ ধরণের জোরপূর্বক ধর্মান্ধরকরণের প্রেক্ষিতে মুহাম্মদ একটি পরিস্থিতিগত ও আত্মরক্ষামূলক আয়াত নিয়ে আসেন, যার ফলে এই ধরনের পরিস্থিতিতে বিশ্বাসীরা

উপরে উপরে (মন থেকে না) তাদের পূর্বের ধর্মে ফিরে যেতে পারেন এবং তাতে তাঁরা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হবেন না (২৬)।

ইসলামিক সাহিত্যে বলা হয়েছে যে, আবু বকরের পর্যাপ্ত রৌপ্যমুদ্রা ছিল যা মুহাম্মদ এবং ধর্মান্তরিত নওমুসলিমদের আরকামের বাড়িতে অবস্থান করার জন্য ব্যয় করা হয়েছিল। যদি তিনি জানতে পারতেন যে, কোন নওমুসলিম ক্রীতদাসের সাথে দুর্ব্যবহার বা তাকে নির্যাতন করা হচ্ছে তাহলে তিনি তাকে তাঁর মালিকের কাছ থেকে কিনে নিতেন। তিনি যেসব ক্রীতদাসকে মুক্ত করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন বিলাল (Bilal), যিনি মক্কায় আবিসিনীয় বংশোদ্ভূত ক্রীতদাসদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি উমাইয়া খালাফের সম্পত্তি (ক্রীতদাস) ছিলেন। বিলাল তাঁর ধর্মান্তরের ব্যাপারে কোনরকম আপোষ করেননি, যদিও খালাফ (Khalaf) তাকে অনেক মারধর করে। খালাফ একদিন বিলালকে প্রখর রোদে ফেলে রাখেন। তিনি তাঁর বুকে একটি ভারি পাথর রাখেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাকে সেখানে রেখে যাওয়ার হুমকি দেন। ঠিক এমন সময় আবু বকর সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বিলালকে তাঁর নিজের একজন ক্রীতদাসের বিনিময়ে ছাড়িয়ে নেয়ার প্রস্তাব দিলেন যে ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করছিল। তাঁর সেই দাস খুবই বিশ্বস্ত ছিলেন, সুতরাং খালাফ মেনে নিলেন। মুক্তি পেয়ে বিলাল আরকামের বাড়িতে থাকা অন্য ধর্মান্তরিতদের সাথে যোগ দিলেন। তবে এ ধরনের চাপ তাদের উপর বেড়েই চলছিল এবং এ বিষয়ে মুহাম্মদের কাছে তাঁরা অভিযোগ করত। একদিন মুহাম্মদ দেয়ালের সামনে তাঁর পিঠ ঠেকিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে একজন তাঁর কাছে গিয়ে বলেন, তিনি যেন আল্লাহর কাছে অনুরোধ জানান শত্রুদের বিরুদ্ধে কিছু একটা করার যাতে তারা এই দুর্ব্যবহার থেকে অব্যাহতি পায়। মুহাম্মদ রেগে গিয়ে বলেন, পূর্ব যুগেও মানুষের চামড়া হাড়ের সাথে লেগেছিল অথবা তাদের মাথা কেটে দুই ভাগ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তাদের বিশ্বাসে অনড় ছিল। তিনি তাদের ধৈর্য ধরতে বলেন, কারণ সেই দিন অচিরেই আসবে যখন আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি সকলেই আত্মসমর্পণ করবে, এই ধর্ম সর্বত্র থাকবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করতে হবে না (২৭)।

তবে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের স্থিতিশীলতা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে অবশেষে তাদেরকে আবিসিনিয়ায় চলে যাওয়ার (হিজরত করার) অনুমতি দেন। সেখানকার খ্রিস্টান শাসক সহনশীল ছিলেন বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। রাখাল বালক মাসুদ, মুহাম্মদের মেয়ে রুকাইয়া এবং তাঁর বর উসমান (Uthman), মুহাম্মদের ফুপাত (পিসতুতো) ভাই জুবায়ের এবং আরও ডজনখানেক ধর্মান্তরিত যারা তখন আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তাঁরা খুব গোপনে এই পরিকল্পনা করে দলবেঁধে দেশত্যাগ করেন, কারণ মক্কাবাসীরা জানতে পারলে হয়তো আটকে ফেলবে এই আশঙ্কা ছিল। তাঁরা আজকের সময়ের জেদ্দার কাছের একটি বন্দরের দিকে যাত্রা করেন এবং সেখানে গিয়ে অর্ধেক দিনার দিয়ে লোহিত সাগর পার হয়ে আফ্রিকার একটি বন্দর আকজুম (Akzum) পৌঁছেন যা ছিল আবিসিনিয়ার রাজধানী। এত সতর্কতা সত্ত্বেও, মক্কাবাসীরা তাদের এই পালিয়ে যাওয়ার খবর ঠিকই পেয়ে যায় এবং লোহিত সাগরের দিকে ছুটে যায়, কিন্তু ইতোমধ্যেই তাদের বহনকারী বাণিজ্যিক জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে গেছে।

অধ্যায় ৯

আমাকে মান্য কর

নবী, নবী এবং আরও অনেক নবী, পুরো দুনিয়া যেন নবীতে ছেয়ে গিয়েছিল! এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সংখ্যাটি নিয়ে মুহাম্মদ এসেছিল। তাদেরকে মানব সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহর ক্রোধের সতর্কতাসহ প্রেরণ করা হয়েছিল, যাতে তারা পথভ্রষ্ট না হয়; কিন্তু লোকেরা তাদের কথায় কান দেয়নি যেমন মক্কাবাসীরা মুহাম্মদের কথা শুনছিল না। তারা আল্লাহর মুখপাত্রের বার্তা মানেনি; সুতরাং তারা ধ্বংস হয়েছিল। মুহাম্মদ তাদের মধ্যে এসব শোচনীয় কাহিনী সম্পর্কে কিছু বলার জন্য আল্লাহকে নিয়ে এসেছিলেনঃ "মূসার গল্পটি কি এখনও তোমার কাছে পৌঁছেনি?" (১)। এবং নূহ (Noah), জন (Jonah), ইব্রাহিম (Abraham), লুত (Lot) এবং জোসেফ (Joseph) প্রমুখদেরও।

মুহাম্মদ তাঁর প্রথমদিকের কোরআন রচনায় মুহাম্মদ বাইবেলের চরিত্রগুলো উল্লেখ করেছিলেন, তবে অতিরিক্ত বিশদ বিবরণ দিয়েছিলেন। তাঁর অনুসারীরা যখন আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে শুরু করল তখন তিনি আরও বিশদ সংস্করণের সূচনা করেছিলেন। ইহুদি ধর্মগ্রন্থের প্রধান নায়কদের কিংবদন্তিগুলিকে পরিশুদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের কাহিনীগুলো পুনরায় এমনভাবে পুনরুল্লেখ করেছিলেন যেন তাঁরা স্বর্গ থেকে মুহাম্মদের কাছে একেবারে নতুনভাবে হস্তান্তরিত হয়েছিল।

কোরানের নবী-কাহিনীর বেশিরভাগ গল্পেই দেখায় যে, মুহাম্মদ বাইবেলের বিবরণীর চেয়ে ইহুদি কিংবদন্তির নবীদের সাথে বেশি পরিচিত ছিলেন। এই কিংবদন্তিগুলির গল্প মুহাম্মদের সময়কালে ইহুদিদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচারিত ছিল, যা পরবর্তীতে বাইবেলের লৌকিক ইহুদি সংস্করণ হিসেবে ইহুদি যাজকদের ধর্মোপদেশের অনুপ্রেরণা হয়েছিল। আব্রাহামের গল্পের মাধ্যমেই বোঝা যায় যে, মুহাম্মদের উপর সেগুলোর প্রভাব স্পষ্টতই ছিল । ইহুদি কিংবদন্তিতে তাঁকে পৌত্তলিক-বিরোধী সংগ্রামী হিসেবে চিত্রিত করা হয়। যৌবনে তিনি ঈশ্বর-রাজা নমরুদের (Nimrod) মূর্তিগুলি ধ্বংস করে দেন এবং তাঁর শাস্তি হিসেবে তাঁকে জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়; কিন্তু তিনি অদৃশ্যভাবে বেঁচে যান। আব্রাহামের মূর্তিবিরোধী কর্মকাণ্ড তুলে ধরার জন্য মুহাম্মদের আল্লাহ এই কথাগুলো বর্ণনা করেছেন এভাবে :
"অতঃপর সে মূর্তিগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল তাদের বড়টি ছাড়া, যাতে তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে। তারা বলল, 'আমাদের দেবদেবীদের সাথে কে এমনটি করল? নিশ্চয় সে জালেম'। তাদের কেউ কেউ বলল, 'আমরা শুনেছি এক যুবক এই মূর্তিগুলোর সমালোচনা করে। তাকে বলা হয় ইবরাহীম'। তারা বলল, 'তাহলে তাকে লোকজনের সামনে নিয়ে এসো, যাতে তারা দেখতে পারে"। (২)

অতঃপর সে মূর্তিগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল তাদের বড়টি ছাড়া, যাতে তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে। তারা বলল, 'আমাদের দেবদেবীগুলোর সাথে কে এমনটি করল? নিশ্চয় সে যালিম'। তাদের কেউ কেউ বলল, 'আমরা শুনেছি এক যুবক এই মূর্তিগুলোর সমালোচনা করে। তাকে বলা হয় ইবরাহীম'। তারা বলল, 'তাহলে তাকে লোকজনের সামনে নিয়ে এসো, যাতে তারা দেখতে পারে'। (২)
ইহুদি কিংবদন্তির ইব্রাহিমের মতো মুহাম্মদের ইব্রাহিমকেও পুড়িয়ে মারার চেষ্টার নিন্দা করা হয়েছে - "তারা বলেছিল, 'তাঁকে একটি চুল্লি তৈরি কর, এবং তাঁকে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দাও!" (৩)। জেনেসিসে (Genesis) এ ঘটনার উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র ইহুদি কিংবদন্তিতে এটির উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং মুহাম্মদের এই কিংবদন্তির গল্প ব্যবহারের এটি একটি উদাহরণ মাত্র। এ থেকে বোঝা যায় যে, মুহাম্মদের উৎসগুলো বাইবেল অপেক্ষা ইহুদি নবীদের কিংবদন্তীর সাথে বেশি সাযুজ্যপূর্ণ।

কোরানের উপর এই ইহুদি রূপকথার প্রভাব এতই বিস্তৃত যে, ইতিহাসবিদ ডব্লু সেন্ট ক্লেয়ার টিসডাল (W. St. Clair Tisdall) এই মন্তব্য করেছিলেন – "মুহাম্মদ মনে হয় ওল্ড টেস্টামেন্টের (Old Testament) নীতিগত গ্রন্থগুলিতে নবীদের সম্পর্কিত সত্য ইতিহাস জানত না"(৪)। তবুও পরে যখন তাঁকে এই বিভ্রান্তগুলির সাথে মোকাবিলা করতে হয়েছিল, মুহাম্মদ সাহসের সাথে দৃঢ়ভাবে জোর দিয়েছিলেন যে, তাঁর সংস্করণগুলিই সঠিক ছিল, কারণ সেগুলি স্বয়ং ঈশ্বর ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁকে নির্দেশ করেছিলেন। অন্যদেরগুলো ছিল ঈশ্বরের কথার বরখেলাপ।

ধর্মগুলি সর্বদা একে অপরকে প্রভাবিত করে, তবে ভিনদেশী ধর্মীয় ধারণা এবং অনুশীলনগুলি আত্তীকরণের প্রক্রিয়াটি সাধারণত সময়ের সাথে সাথে ঘটে এবং তা সমগ্র সংস্কৃতিকেই গ্রাস করে নেয়। মুহাম্মদের ক্ষেত্রে 'ধার করার' কাজটি এতটাই দ্রুত আর নির্লজ্জভাবে ঘটেছে যে, ঐতিহাসিকগণ একে রীতিমতো জোচ্চুরি বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইহুদিদের কাছে মূল্যবান কিছু ছিল। তিনি এটি চেয়েছিলেন, এবং নিয়েছিলেন। নিজেকে নবী হিসেবে দেখার নিজস্ব ধারণাকে আঁকড়ে রাখার জন্য তাঁর ইহুদি গল্পগুলির প্রয়োজন ছিল। তাঁর গল্পের পুনর্নির্মিত সংস্করণগুলিতে তাই দেখা যায়, নবীগণ তাঁর লোকদের কাছ থেকে যেমন প্রত্যাখানের শিকার হয়েছিলেন তেমনি মক্কাবাসীদের দ্বারা তাঁর প্রত্যাখানের ঘটনাকে মুহাম্মদ প্রমাণ হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন যে, তিনি নিজেকে যা বলে দাবি করেছেন তিনি আসলে তাই-ই।

মুহাম্মদ এবং মক্কাবাসীদের মধ্যকার ধর্মীয় বিতর্ক অব্যাহত ছিল, কিন্তু এর তীব্রতা অন্তত সাময়িকভাবে হলেও কমে গিয়েছিল। এটি ঘটেছিল যখন মুহম্মদ শত্রুতা দ্বারা জর্জরিত হয়ে তাঁর প্রথম দিককার ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের দেশত্যাগের দিকে পরিচালিত করেছিলেন এবং সমঝোতার উপায় গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মক্কার দেবদেবীদের উপর সরাসরি আক্রমণ করা থামিয়ে দিলেন, এবং এর পরিবর্তে তিনি তাঁর মতবাদের ব্যাখ্যা ও তা রক্ষা করার দিকে মনোনিবেশ করলেন। মক্কাবাসীদের কাছে মুহাম্মদ তখনও এক বিভ্রান্ত ধর্মচ্যুত হাশিমী, যিনি চাচাত ভাইয়ের বিরুদ্ধে আরেক ভাই এবং ছেলের বিরুদ্ধে বাবাকে দাঁড় করিয়েছিলেন, কিন্তু নতুন করে ধৈর্যশীল সাধুর বেশ তাঁর জন্য স্বস্তি নিয়ে এসেছিল।

মন্দিরের ছাউনির নিচের অর্ধবৃত্তাকার মেঝেতে, কিংবা মন্দিরের মুখোমুখি নগর ভবনে জড়ো হয়ে সভা করার সময় এবার মুহাম্মদকে মক্কার নেতা এবং মতামত প্রদানকারীদের মাঝে বসতে দেয়া হয়েছিল; এবং তিনি শহরের চারপাশে অনুষ্ঠিত ছোট গোত্রসমূহের সভায় অংশ নিয়েছিলেন। এই জাতীয় সমাবেশে বক্তৃতা না দিলে সবাই হাঁটু ভাঁজ করে বসে থাকত; কারো কিছু বলার থাকলে সে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করত। মুহাম্মদকে যখন কথা বলার সুযোগ দেয়া হতো, তিনি তাঁর কথা বলতেন; মক্কাবাসীরা শুনত এবং বিনম্রভাবে সাথে বিতর্ক করত।

এখন ধৈর্যশীল ধর্মপ্রচারক মুহাম্মদ নবী কাহিনী চালু করলেন। নবীদের সতর্কবার্তা সহ প্রেরণ করা হয়েছিল কিন্তু তারা সেই কথায় কান দেয়নি, সে কথাটাই বারবার বলে যাচ্ছিলেন । অস্বীকারকারীদের কি পরিণতি হয়েছিল, তাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হতো। মুহাম্মদ তাঁর উদ্ভাবিত নবীদের গল্পের একটিতে বলেছেন, "সামুদ সম্প্রদায়কে (Thamudites) দেখো, যাদের প্রতি আরবের নবী সালেহকে প্রেরণ করা হয়েছিল"। সামুদ সম্প্রদায় তাদের নবী সালেহকে মানেনি, যখন তিনি তাদের বলেছিলেন যে, তারা যদি পরিত্রাণ কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। যদি তারা তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ না করে, তবে তারা পরের জীবনে আগুনের শাস্তির মুখোমুখি হবে; এবং তারা এই ইহজীবনেও ঈশ্বরের ক্রোধের শিকার হবে। মুহাম্মদ ধ্বংস হয়ে যাওয়া পাথরের শহর মাদাইন সালেহের (Madain Saleh) চিত্রগুলি একসাথে করেছিলেন। মুহাম্মদ যুক্তি দিয়েছিলেন যে, ঈশ্বরের নবীকে না মানার জন্যই তাদের শাস্তি পেতে হয়েছিল।

মক্কাবাসীরা শুনছিল, কিন্তু তারা মুগ্ধ হল না। তাদের মধ্যে অনেকেই সফরের সময়, বালি-পাথরের পর্বতমালায় খোদাই করা পেট্রার (Petra) নাবাতাইনদের একটি শাখা, সামুদীয়দের পরিত্যক্ত সমাধিসৌধ এবং মন্দিরগুলি পরিদর্শন করত। তারা

সেই ইতিহাস জানত। বহু শতাব্দী আগে, পশ্চিম আরব জুড়ে যখন কাফেলা বাণিজ্যের প্রসার হচ্ছিল। তখন মাদাইন সালেহ (Madain Saleh) একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল, কিন্তু রোমানরা আরব ব্যবসার বেশিরভাগই ছিনিয়ে নিয়েছিল, যখন তারা লোহিত সাগর থেকে সরাসরি ভারতে আসা যাওয়া করতে শিখেছে। ঈশ্বর নয়, বরং বাণিজ্যের প্রতিযোগিতাই মাদাইন সালেহের মতো কাফেলা শহরগুলিকে ধ্বংস করেছিল। এরপর কাফেলা বাণিজ্য মক্কায় ধন-সম্পদ বৃদ্ধিতে আবারো গুরুত্ব ফিরে পেল। মক্কা যদি কখনও সামুদ জাতির পরিণতি ভোগ করে, তবে তা হবে অন্য কারও দ্বারা তাদের ব্যবসার দখল নেয়ার ফল, মুহাম্মদের আল্লাহ্‌র অগ্নিশ্বাসের কারণে নয়।

নাদের নামের একজন ছিলেন যিনি ইয়াছরিবের ইহুদি পন্ডিতদের কাছ থেকে কৌতূহলমূলক নানা প্রশ্ন নিয়ে আসতেন। তিনি প্রায়ই এই সভাগুলিতে মুহাম্মদকে অনুসরণ করে আসতেন। শুধুমাত্র গোত্রীয় নেতাদের তাঁর জায়গায় বসতে দেয়ার জন্য তিনি মুহাম্মদকে বাধা দিতেন, অথবা অপেক্ষা করতেন যতক্ষণ না মুহাম্মদ ঘোষণা দিতেন যে, তাঁর কাছে পারস্যের রাজা ও বীরদের নিয়ে খাঁটি ও উত্তম গল্প আছে। তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে, মুহাম্মদের নবী বিষয়ক গল্পগুলি প্রাচীন লোকদের কল্পকাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তিনি বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে জেনেছেন। নাদের ছিলেন একজন শিক্ষিত, ভালো ভ্রমণকারী এবং মেধাবী 'গল্পবলিয়ে'। তিনি পার্সিয়ান উপসাগরের উপরের দিকে, পার্সিয়ানদের অধীনস্থ রাজ্য লখমিদদের (Lakhmids) দরবারে সময় কাটিয়েছিলেন যেখানে তিনি এই গল্পগুলি শুনেছিলেন। তিনি ফার্সি বই এবং পাণ্ডুলিপিগুলি নিয়ে এসেছিলেন এবং সেগুলি কীভাবে পড়তে হয় সম্ভবত তা তাঁর জানা ছিল। লোকেরা অধীর আগ্রহে নাদেরের কথা শুনত, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিতে মুহাম্মদ কোরআনে আয়াত নিয়ে আসলেন : "তারা বলে, 'এটি প্রাচীনকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তার কাছে পাঠ করা হয়। বল, যিনি আসমান ও যমীনের রহস্য জানেন তিনি এটি নাযিল করেছেন; নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (৫)।

নাদের ক্রমেই মুহাম্মদের সার্বক্ষনিক পীড়ার কারণ হয়ে ওঠেন, এবং মন্দিরের ছায়াঘেরা পাটাতনে ওয়ালিদ বিন মুগিরা, আবুল হাকাম এবং মক্কার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের সাথে কথা বলার সময় মুহাম্মদ একবার তাঁর মেজাজ হারিয়ে ফেলেন। মুহাম্মদ নবীদের বিষয়ে কথা বলার সময়ে নাদের এসেছিলেন এবং তিনি যথারীতি পারস্য গল্প বলার প্রস্তাব দিয়ে মুহাম্মদকে বাধাদান করেন। নাদের চুপ না হওয়া পর্যন্ত মুহাম্মদ উচ্চবাচ্য করে যেতে থাকেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার একটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন, যাতে জাহান্নামের আগুনের হুমকির কথা বলা হয়েছিল: "**নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের পূজা কর, সেগুলো তো জাহান্নামের জ্বালানী। তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে।**" (৬)।

জাহান্নামের এই ধারণাটি মক্কাবাসীদের কাছে অর্থবহ হয়নি এবং আবুল হাকাম রসিকতা করে বলেছিলেন, 'মুহাম্মদ পরকালের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির বর্ণনা দিয়ে ভয় দেখিয়ে তাঁর আনুগত্য করাতে চাইছে; যেমন, সে জাক্কুম গাছের কথা বলছে যা নাকি অভিশপ্তদের জন্য জলন্ত খাবার জাহান্নামে দেয়া হবে'। মুহাম্মদ তাদেরকে যাক্কুম গাছের ফল সম্পর্কে আয়াত তেলাওয়াত করেছিলেন: "গলিত তামার মতো, উদরসমূহে ফুটতে থাকবে। ফুটন্ত জলের মতো" (৭)।
আবুল হাকাম দাবি করেছিলেন, মুহাম্মদ ইহুদিদের কাছ থেকে দোজখের এই গাছটির ধারণা পেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, "তুমি কি জানো এই আল-যাক্কুম (al-zaqqum) কি? এটি মাখন মাখানো খেজুর। এটিকে সাথে আনো, আমরা এটি উপভোগ করব!" (৮)।

মক্কাবাসীদের কাছে দেহের পুনরুত্থান সম্পর্কে মুহাম্মদের কথাবার্তা, জাহান্নাম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের মতোই অবান্তর ছিল । একবার মরে যাওয়ার পরে দেহ পচে যায় এবং সময়ের ব্যবধানে ধুলো ছাড়া আর কিছুই তাঁর অবশিষ্ট থাকেনা। তবুও মুহাম্মদ ঘোষণা করে বলে যেতেন যে, শেষ বিচারের দিন সেই মৃতদেহটি পুনরুত্থিত হবে। মুহম্মদের দাবি যে হাস্যকর তা প্রমাণ করার জন্য মক্কার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী উমাইয়া ইবনে খালাফের ভাই উবাই ইবনে খালাফ একবার তাঁর কাছে ক্ষয়প্রাপ্ত

একটি হাড় নিয়ে আসেন এবং বলেন, "মুহম্মদ, আপনি কি দাবি করছেন যে, ক্ষয় হওয়ার পরেও ঈশ্বর এটিকে পুনরুত্থিত করতে পারবেন?" এরপর উবাই হাড়টিকে গুড়িয়ে ধুলায় মিশিয়ে দিলেন আর মুহাম্মদের মুখে ধুলাগুলো উড়িয়ে দিলেন। মুহাম্মদের জবাব ছিল আযাবের সতর্কবাণী: "হ্যাঁ, আমি এটি বলি। ঈশ্বর আপনাকে আর এটিকে উত্থাপন করবেন, যখন আপনি এটার মত হয়ে যাবেন। অতঃপর তিনি আপনাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন"(৯)।

একপর্যায়ে মুহাম্মদ এবং মক্কাবাসীদের মধ্যেকার তর্কটি খ্রিস্টধর্মের দিকে ঝুঁকল, তবে এই বিষয়ে এক অন্ধ যেন আরেক অন্ধকে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। মক্কাবাসীরা একটি অস্পষ্ট ধারণা পোষণ করত যে, ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে যীশুকে এবং ঈশ্বরের পুত্রের মা হিসেবে মরিয়মকে স্থান দিয়ে প্রকারান্তরে খ্রিস্টানরা একপ্রকার বহু ঈশ্বরের চর্চাই করেছিল। খ্রিস্টানরা উভয়েরই উপাসনা করত, যেমন মক্কাবাসীরা আল-উজ্জা, আল-লাত, মানাত, হুবাল এবং তাদের সর্বদেবতার মন্দিরের অন্যান্যদের কাছে প্রার্থনা করত। তাদের কাছে মরিয়ম (Mary) ছিলেন মক্কাবাসীদের প্রিয় মাতৃদেবী আল-উজ্জার মতোই। মরিয়মের প্রতি খ্রিস্টানদের ভক্তিমূলক ভালবাসা তাঁরা বুঝতে পারে। অতএব, একটা সময়ে মুহাম্মদ যখন যীশুকে নবী হিসেবে উপরে তুলে ধরলেন, মক্কাবাসীরা চরম হাসিতে ফেটে পড়েছিল। যীশুর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি কি তাদের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন বহুশ্বরবাদী ধর্মের বিশ্বাসকেই সমর্থন করলেন না?

যীশু সম্পর্কে মুহাম্মদের ধারণা নিজের সম্পর্কে তাঁর ধারণা দ্বারা আবর্তিত হয়েছিল। যদিও তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যীশু ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন এবং খ্রিস্টীয় বিশ্বাস অনুসারে রক্ত-মাংসের-ঈশ্বর হিসেবে নয়, তিনি বরং যীশুকে নশ্বর একজন মানুষ হিসেবেই দেখেছেন (১০)। প্রয়োজনের খাতিরেই মুহাম্মদ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেছিলেন। সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবী হিসেবে তাঁর আত্মম্ভরী ধারণার কারণেই, তিনি নিজেকে অন্য কারো চেয়ে কম বলে সমর্থন করতে পারতেন না। যীশু যদি প্রকৃতই ঐশ্বরিক হয়ে থাকেন, মুহাম্মদের গুরুত্ব তবে তাতে বেশ কমে যায়। তিনি মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে সরাসরি বলেন, "খ্রিস্টানরা যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে উন্নীত করে যীশুর ধর্মকে বিকৃত করেছিল। খ্রিস্টানরাই যীশুর ধর্মকে মুশরিক ধর্ম হিসেবে পরিণত করেছিল, যীশু তা করেননি – দাবি করেন মুহাম্মদ। সত্য এক ঈশ্বরের পরিবর্তে তাঁরা নাকি যীশু এবং মরিয়মের উপাসনা করেছিল" (১১)।

মুহম্মদের সাথে মক্কার নাগরিকদের সংলাপের এই সময় তাঁকে আরও একটি প্রস্তাব দিতে মক্কাবাসীদের উদ্বুদ্ধ করে। একদিন মুহাম্মদ মন্দিরের পাশে হেঁটে যাওয়ার সময়, ওয়ালিদ মুগীরা, উমাইয়া খালাফ এবং অন্য আরেকজন ব্যক্তি তাঁকে থামিয়ে বললেন, "মুহাম্মদ আসুন, আপনি যা উপাসনা করেন আমরাও তাঁর উপাসনা করি এবং আমরা যার উপাসনা করি আপনিও তাঁর উপাসনা করেন। আপনি এবং আমরা বিষয়টি একসাথে করব। আপনার উপাসনা যদি আমাদের উপাসনার চেয়ে ভালো হয়, তবে আমরা তার অংশ নেব, আর আমাদের উপাসনা যদি আপনার করা উপাসনার চেয়ে ভালো হয় তবে আপনিও তার অংশ পাবেন"(১২)।

কন্টকময় সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ছিল যুক্তিসঙ্গত মানুষদের একটি যুক্তিসঙ্গত পন্থা, যারা তাদের জীবনযাত্রার সাথে অন্যান্য ধর্মীয় অভিব্যক্তিগুলির সমন্বয় করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁরা মুহাম্মদের দ্বারা সৃষ্ট জটিলতার অবসান ঘটাতে এবং তাদের সম্প্রদায়কে স্বস্তি দিতে চেয়েছিলেন। প্রথমে মুহাম্মদ এই বলে যেকোনো সহাবস্থান অস্বীকার করলেন যে, তাদের কাছে তাদের ধর্ম এবং তাঁর ধর্ম তাঁর কাছে; দুইদিকে যোগ দেয়ার উপায় নেই। যাই হোক, মক্কাবাসীদের প্রস্তাবের খুব অল্প সময়ের পর তিনি আবৃত্তি করে শুনালেন তাই যা শয়তানের আয়াতসমূহ (Satanic Verses) হিসেবে পরিচিত। মন্দিরের পাটাতনে তিনি মক্কার নেতাদের সাথে বক্তৃতা দেয়ার সময় এ ঘটনাটি ঘটেছিল। তিনি একটি নতুন সূরার কিছু অংশ পাঠ করেছিলেন, তবে এর পরের লাইনগুলিতে যে বাক্য যুক্ত করেছিলেন তাতে মক্কাবাসীদের তিনটি দেবদেবীকে আল্লাহর সাথে

মধ্যস্থতাকারী হিসেবে স্বীকার করার কথা বলা হয়েছিলঃ “তোমরা কি লাত ও উযযা সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? আর তৃতীয় আরেকটি মানাৎ সম্পর্কে? তাঁরা তো মহৎ পাখি, আর তাদের সুপারিশ আসলেই কাম্য!” (১৩)

মক্কাবাসীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। মুহাম্মদের কি অবশেষে হুঁশ এলো? সাম্প্রতিক বছরগুলির সমস্ত সমস্যা কি এখন শেষ হতে যাচ্ছে? তিনি কেবল তাদের তিনটি দেবীর বৈধতা এবং আল্লাহ্‌র মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ঐ দেবদেবীর উপাসনা করার চর্চাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তারা এতটাই আনন্দিত হয়েছিল যে, মুহাম্মদ যখন তাদেরকে প্রার্থনার জন্য তাঁকে অনুসরণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন, তারা পাটাতন থেকে নেমে মন্দিরের প্রবেশদ্বারের নিকটবর্তী একটি জায়গায় আসলো। তারা তাঁর প্রার্থনার রীতিগুলো উদ্ভটভাবে অনুকরণ করছিল, এবং কপাল মাটিতে স্পর্শ করার মাধ্যমে এর শেষ হয়েছিল। এই ধরনের উপাসনার জন্য সেই সাদা দাড়িওয়ালা ওয়ালিদ (Walid) যার শরীরের হাড়সমূহ একেবারেই নড়বড়ে, এই দলের মধ্যে হাঁটু ভাঁজ করে বসেছিলেন এবং এক মুঠো মাটি নিয়ে কপালে স্পর্শ করে নিজেকে সন্তুষ্ট করেছিলেন।

মুহাম্মদের মতো এমন অনমনীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা এ ধরনের ছাড় কি করে দেয়া হলো, তা অনুমান করার বিষয়। নিজের বলয়ে তাদের নিয়ে আসতে সম্ভবত এটি ছিল মুহাম্মদের এক ধরণের কৌশলগত ছাড়। এটাও সম্ভব যে, তিনি মক্কাবাসীদের মতোই এই সংঘাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অন্য একটা সময়ে, এত ঝামেলা সৃষ্টি করেছিলেন বলে মুহাম্মদ দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, “আমার ইচ্ছা, আল্লাহ যেন তাদের প্রতি বিরক্তিজনক কোন কিছু আমার কাছে প্রকাশ না করেন” (১৪)। সাম্প্রতিক সময়ে তাদের আপোস করার প্রস্তাবটি শ্রদ্ধার ও হৃদয় থেকে ছিল। তিনি কি তাতে সাড়া দেবেন না?

মক্কাবাসীদের শিহরিত হতে দেখে মুহাম্মদের অনুসারীরা হতবাক হয়ে গেল। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কোনও উপাস্য নাই, আর ঈশ্বরের সাথে তাদের দেবতাদের শরীক করা ছিল সবচেয়ে বড় পাপ, তাদের নিজেদের আধ্যাত্মিক নেতা (মুহাম্মদ) তাঁর ধর্মের এরকম মৌলিক শিক্ষাগুলো পরিত্যাগ করার মাধ্যমে নিজের ধর্ম থেকে সরে এলেন! বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর কিছু অনুসারী তাঁকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছিল, আবার কেউ কেউ তাঁকে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার ও তাঁর বিশ্বাস পুনর্বিবেচনার জন্য চাপ দিয়েছিল। গ্রন্থে রয়েছে যে, ফেরেশতা জিব্রাইল তাঁকে তীব্রভাবে তিরস্কার করেছিল। কিছুদিনের মধ্যে মুহাম্মদ তাঁর রচনাটি সংশোধন করলেন এবং তাঁর অনুগামীদের মধ্যে এই কথা ছড়িয়ে দিলেন যে, এটি দুষ্টু ও ছলনাকারী শয়তানের কাজ। শয়তান এই নিকৃষ্ট কথাগুলি তাঁর মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, এবং তিনি ফেরেশতা জিব্রাইলের ঐশ্বরিক প্ররোচনার সাথে এটি গুলিয়ে ফেলেছিলেন (১৫)।

দু’পক্ষের মধ্যকার উত্তেজনার পর্ব শেষ হয়ে গেল। মক্কাবাসীরা যখন এই সংশোধনটির ব্যাপারে জানতে পারে, তারা ক্ষুব্ধ হয় । তারা মুহাম্মদের প্রতি তাদের শত্রুতা আবার নতুন করে শুরু করেছিল এবং তাঁর অনুসারীদের হয়রানি করা শুরু করে। অন্যদিকে মুহাম্মদও পুনরায় তাদের বিশ্বাসের উপর আক্রমণ শুরু করেছিলেন এবং তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের হুমকি দিয়েছিলেন। “যদি মুক্তি চাও তবে আমার আনুগত্য করো!” এটি ছিল তাঁর বার্তা।

প্রায় চার মাস ধরে আবিসিনিয়ায় থাকা, লোহিত সাগরের ওপারে মুহাম্মদের অনুসারীরা সংবাদ শুনেছিল যে, মক্কাবাসীরা মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছে, কিন্তু শেষটা জানতে পারেনি। আগ্রহের সাথে তারা তাদের জিনিসপত্রগুলি গুটিয়ে নিয়ে আরবে ফিরে গেলেন, কিন্তু মক্কায় পৌঁছার আগে পথে মক্কা থেকে আগত এক ঘোড়সওয়ার তাদের নতুন করে সংঘাতের কথা জানিয়েছিল। বাহু প্রসারিত করে স্বাগত হওয়ার প্রত্যাশায় প্রবাসীরা মক্কায় বিজয়ী হয়ে পদযাত্রার পরিকল্পনা করেছিলেন, তবে তারা এখন চুপিসারে অন্ধকারের আড়ালে শহরে ঢুকে পড়েছিল, এবং জনসমক্ষে তাদের মুখ দেখানোর আগে সুরক্ষার

নিশ্চয়তা চেয়েছিল। তারা দেখতে পেল যে, তাদের চলে যাওয়ার আগে পরিস্থিতি যেমন ছিল, ঠিক তেমনই রয়ে গেছে। তাদের পরিবারগুলি তাদের প্রতি বৈরী ছিল তবে দাস ও নিচু শ্রেণির মধ্যে ধর্মান্তরিত হওয়া অব্যাহত ছিল।

প্রত্যাবর্তনকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন ওয়ালিদের ভাগ্নে উসমান ইবনে মাজউন (Uthman ibn Mazun)। তিনি সুরক্ষার জন্য তাঁর চাচাকে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি যখন কিছু অরক্ষিত ধর্মান্তরিত লোকদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে দেখেন, তখন তিনি সেই অনুরোধ থেকে সরে আসেন। অন্যান্য সকলের প্রতি তাঁর সংহতি জানাতে তিনি তাঁর মুশরিক চাচার সুরক্ষা ছাড়াই থাকার সিদ্ধান্ত নেন এবং তখন থেকেই আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন। সমর্থন প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে তাঁর চাচা মন্দিরে একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন। দেখা গেল, ওয়ালিদের চেয়ে আল্লাহ নিজেকে কম নির্ভরযোগ্য প্রমাণ করলেন। এর খুব অল্প সময়ের পরে, উসমান একটি কবিতা পাঠে অংশ নিয়েছিলেন, যা বিখ্যাত আরব কবি লাবিদের (Labid) আয়োজন ছিল । আবৃত্তি চলাকালীন সময়ে, লাবিদের কয়েকটি শ্লোকের পৌত্তলিক দর্শনের দ্বারা উসমানের মুসলিম সংবেদনশীলতা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। লাবিদের প্রতি মিথ্যাচারের অভিযোগে তিনি তাঁকে বাধা প্রদান করেন এবং মুহাম্মদের অনুপ্রেরণা থেকেই তিনি চেঁচামেচি হয়ে শুরু করেন। বিখ্যাত কবি আঘস্ত (Aghast) বললেন যে, “এর আগে কেউ তাঁর (লাবিদের) কবিতায় অপমানিত বোধ করেনি, তাহলে আজ কীভাবে এটি হলো?” সেখানে থাকা এক ব্যক্তি বললেন, “মুহম্মদের সাথে জোটবদ্ধ এমন বোকাদের মধ্যে সেও একজন; তারা আমাদের বিশ্বাস ত্যাগ করেছে। সে কী বলে তাতে মনে কিছু করবেন না”। অন্য আরেক শ্রোতা মুখে ঘুষি মেরে চোখের নিচে কালো করে না দেয়া পর্যন্ত উসমান এমন বাধা দেয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ওয়ালিদ সেখানে উপস্থিত হয়ে ঠাট্টা করে বলল, “ভাগ্নে, তোমার চোখের এমন ক্ষতি কিভাবে হলো। আগে তো তুমি সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত ছিলে!” (১৬)।

খুব বেশিদিন হয়নি মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের আবারো আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দেন, এবং এবার প্রায় একশত পুরুষ, নারী এবং শিশুরা চলে গিয়েছিলেন যাদের বেশিরভাগই আগেরবারের হিজরত থেকে ফিরে এসেছিল। তারা রাতে ছোট ছোট দলে চলে যায় এবং আবিসিনিয়ায় একটি ছোট্ট সম্প্রদায় শুরু করে। মুহাম্মদের কাছ থেকে তারা তাদের সাথে পুনরায় যোগদান নিয়ে কথা শুনার অপেক্ষায় ছিল। তিনি তাদের বিদায় দেয়ার সময় বলেছিলেন যে, তাঁকেও দেশত্যাগ করতে হতে পারে, তবে তা করার আগে তিনি ঈশ্বরের আদেশের অপেক্ষায় থাকবেন।

মুহাম্মদের উৎসাহী বিনিয়োগকারী আবু বকরও হিজরত করতে চেয়েছিলেন। অন্যান্য বিশ্বাসীদের মতো তিনিও প্রথমে মুহাম্মদের অনুমতি লাভ করেছিলেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাথে মুহাম্মদ যোগাযোগ রাখছেন এই অন্ধবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। যদি মুহাম্মদ তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দেন, সেটা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হবে। কিন্তু মুহাম্মদের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও আবু বকরের ক্ষেত্রে আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম। লোহিত সাগরের বন্দরে পৌঁছার একটু আগে স্বল্প পরিচিত গোত্রপতি ইবনে দাগিনার (Ibn Daghina) সাথে আবু বকরের সাক্ষাৎ হলো। মক্কাবাসীদের থেকে তিনি যে খারাপ ব্যবহার পেয়েছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি শাইখের কাছে অভিযোগ করেছিলেন। দাগিনা তাঁকে সুরক্ষার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কুরাইশ না হলেও, একটি বহেরাগত গোত্রের সাথে তাঁর ক্ষমতার নিজস্ব একটা ঘাঁটি ছিল, এবং তাঁর দেয়া সুরক্ষার নিশ্চয়তাটিকে মক্কাবাসী নিশ্চয়ই সম্মান করবে। তিনি আবু বকরকে সাথে নিয়ে মক্কায় গেলেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করার জন্য মন্দিরে প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়ার আগে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শাইখকে ডেকে সৌজন্য সাক্ষাত করলেন। মন্দিরে তিনি বলেছিলেন, “হে কুরাইশ, আমি আবু কুহাফার (Abu Quhafa) পুত্রকে আমার সুরক্ষার অধীনে রেখেছি। কেউ যেন তাঁর মঙ্গল ছাড়া আর কিছু না করে”(১৭)। তবে, শীঘ্রই দাগিনা তাঁর সুরক্ষা প্রত্যাহার করার প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পেয়েছিলেন। আবু বকর তাঁর বাড়ির উঠোনে একটি প্রার্থনা করার জায়গা স্থাপন করার পরে এবং তাঁর বাড়িতে জনসাধারণের উপদ্রব বেড়ে গেলে তাঁর উপর থেকে সুরক্ষা তুলে নেন দাগিনা। দিনে পাঁচবার তাঁর উচ্চকণ্ঠে আয়াত তেলাওয়াত প্রতিবেশীদের বিরক্ত করত, বিশেষত ভোরবেলা। নির্দিষ্ট কিছু আয়াত তেলাওয়াত করার সময় তাঁর কান্নার প্রবণতাও মানুষকে রাগান্বিত করত। তিনি নিজেকে দর্শনীয় করে তুলেছিলেন, এবং তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁকে মুহাম্মদের নিয়োগকৃত লোক জেনে, তাদের মহিলা, শিশু এবং দাসেদের উপর এর খারাপ প্রভাব পরবে ভেবে ভয়ে থাকতেন। আবু বকর সম্পর্কে তারা শহর জুড়ে অভিযোগ করেছিল

এবং শীঘ্রই এ কথাটি তাঁর রক্ষকের কাছেও পৌঁছে গেছিল। ইবনে দাগিনা তাঁর সাথে দেখা করলেন এবং তাঁকে তাঁর বাড়ির ভেতরে নামায পড়তে বললেন, সেখানে তিনি যা খুশি তাই করতে পারবেন। কিন্তু আবু বকর যখন তা মানতে অস্বীকার করলেন, দাগিনা মন্দিরে গিয়ে ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করেছেন। কথা শোনার জন্য জড়ো হওয়া লোকদের তিনি বললেন, "আপনারা তাঁর সাথে যা ইচ্ছে হয় করুন" (১৮)। সুরক্ষা হারিয়ে ফেলার পর আবু বকরের সাথে সবচেয়ে খারাপ যা ঘটল তা হলো, একদিন মন্দিরের দিকে যাওয়ার পথে কেউ একজন তাঁর মাথায় ময়লা ছুঁড়ে মেরেছিল। চুল থেকে ময়লা পরিষ্কার করে তিনি অপরাধীর বিরুদ্ধে ওয়ালিদের কাছে অভিযোগ করেছিলেন। বর্ষীয়ান নেতা তাঁকে কোনও সহানুভূতি দেখালেনই না, বরং তিনি বললেন: "আপনি নিজেই এটি আপনার উপর নিয়ে এসেছেন"(১৯)।

অনেক নওমুসলিম যুবক মক্কাবাসীদের নাগালের বাইরে গিয়ে মক্কাবাসীদের বিরক্ত করা শুরু করল। মক্কাবাসী চেয়েছিল যে, ওদেরকে মক্কায় ফিরিয়ে এনে তাদের উপর মুহাম্মদকে ত্যাগ করার জন্য চাপ অব্যাহত রাখবে। শয়তানের আয়াত উচ্চারণ করার পরে মুহাম্মদের অনুসারীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে অস্বীকারও করেছিল এবং তাঁরা বিশ্বাস করেছিল যে, তাদের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ আরও কমে যেতে পারে। আবিসিনীয় সাম্রাজ্যে পৌঁছানোর ঐতিহাসিক তাগিদ থেকেও তারা তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল। পারস্যদের দ্বারা বিতাড়িত হওয়ার আগ পর্যন্ত পূর্ববর্তী শতাব্দীর বেশিরভাগ সময় ধরে আবিসিনিয়ানরা ইয়েমেনকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। মক্কায় এখনো বেঁচে থাকা বহু লোকের স্মৃতিতে রয়েছে পাঁচ দশকেরও কম সময় আগের আব্রাহার (Abraha) নেতৃত্বে আবিসিনিয়ার সেনাবাহিনী কর্তৃক মক্কা অভিযানের ঘটনা। সম্ভবত মন্দিরটি নিশ্চিহ্ন করার জন্যই, তবে সাম্রাজ্যকে প্রসারিত করার সম্ভাবনাই এতে বেশি দায়ী ছিল। এখন মক্কাবাসীদের নিজেদেরই অনেকে দলচ্যুত হয়ে আবিসিনিয়ায় চলে যাওয়ার ব্যাপারটা মক্কাকে দুর্বল এবং বিভক্ত করে দেয়। মক্কাবাসীদের ইচ্ছে ছিল তাঁরা নিজেরাই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করবে।

তাঁরা (মক্কার নেতারা) মুহাম্মদের অনুগামীদের বহিষ্কারের জন্য দুজন দূতকে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন। দূতরা খ্রিস্টান রাজা এবং তাঁর পরামর্শদাতাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে সূক্ষ্ম লাল চামড়া উপহার হিসেবে এনেছিলেন – আজ যাকে মরোক্কান চামড়া বলা হয়। প্রচলিত বিবরণীতে, তারা প্রথমে মুরতাদদের প্রত্যাবাসনের পক্ষে সমর্থন পেতে পরামর্শদাতাদের ঘুষ দিয়েছিল। দূতদের তাদের বক্তব্য পেশ করার জন্য রাজার সামনে আনা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আমর আল-আস (Amr al-As), যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে উঁচু অবস্থান সম্পন্ন একজন স্পষ্টবাদী এবং সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, দলত্যাগীরা তাদের সাথে একটি নতুন আবিষ্কারকৃত ধর্ম নিয়ে এসেছে যা আবিসিনীয়দের ধর্মের সাথে বা মক্কাবাসীদের ধর্মের সাথেও কোনভাবে খাপ খায় না। তিনি বলেছিলেন, "তাঁরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে এবং তাঁরা আপনাদেরটাও গ্রহণ করবেন" (২০)। তিনি তাদের ফেরত পাঠানোর জন্য বাদশাহ নেগাসকে (Negus) অনুরোধ করলেন, যাতে তারা তাদের পরিবারের সাথে আবার মিলতে পারে।

ঘুষগ্রহণকারী পরামর্শদাতাদের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও যারা রাজাকে তাদের অনুরোধের প্রতি সম্মানের জন্য মিনতি করেছিলেন, নেগাস প্রথম শুনানি ছাড়াই মক্কাবাসীদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। মুহাম্মাদের দুজন লোককে তাঁর সামনে আনা হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন ছিল আবু তালিবের ছেলে জাফর (Jafar)। তিনি তাদের মতবাদের একটা সারাংশ বর্ণনা করেছিলেন, এবং কিছু আয়াত আবৃতি করেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদের কাছে আয়াত হিসেবে এই ঐশ্বরিক বাণী এসেছে। যখন নেগাস জানতে চাইলেন, "আপনি মরিয়মের পুত্র যীশু এবং তাঁর মায়ের বিষয়ে কী বলছেন?" জাফর সেই আয়াতগুলো আবৃত্তি করে শুনিয়ে খ্রিস্টান কার্ডটি খেলল, যেখানে নিষ্কলুষ গর্ভধারণের গল্পটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তবে চালাকি করে তিনি যীশু সম্পর্কে মুহাম্মদের যেকোন তাত্ত্বিক বিশ্বাস প্রকাশ করার আগেই থেমে গিয়েছিলেন।
"আমরাও ঈশ্বরের মতোই বলি: তিনি তাঁর বাক্য এবং তাঁর আত্মা যা তিনি কুমারীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন যাকে কোন মানুষ স্পর্শ করেনি এবং কোন শিশুও ভেতরে ছিল না" (২১,২২)।

মক্কার দূতরা মোটেও ধর্মতত্ত্ববিদ ছিল না, তাই এই আয়াতের বিরুদ্ধে একটি বিশ্বাসযোগ্য যুক্তিখণ্ডন প্রদান করতে অক্ষম ছিল। মুহম্মদের অনুগামীরা তাদের হাতের খেলাটি ভালভাবে কাজে লাগিয়েছিল যে কারণে নেগাস তাদেরকে এমন একটি খ্রিস্টান সম্প্রদায় মনে করেছিল, যারা পৌত্তলিকদের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তিনি মুহম্মদের লোকদের আবিসিনিয়ায় রাজকীয় সুরক্ষার অধীনে থাকতে দিয়েছিলেন। তিনি মক্কাবাসীদের চামড়ার উপহার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের রাজ্য ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এভাবে লজ্জা পেয়ে, দূতেরা তাদের ব্যর্থতার কথা জানাতে মক্কায় ফিরে গেলেন।

অধ্যায় - ১০

আপনাকে মান্য করবো, আপনাকে?

যদিও মুহাম্মদের এক বিশাল সংখ্যক অনুসারী আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেছিল, কিন্তু মুহাম্মদের চাচা হামজা সহ প্রায় চল্লিশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশ্বাসী তখনও মক্কায় রয়ে গেছে। তাঁরা আরকামের বাড়িতে জমায়েত হয়েছিল এবং খুব কমই বের হতো। আক্রমণের ভয়ে তারা দরজা তালাবদ্ধ করে রাখত, এবং কেবল গোপন সংকেতটি জানে এমন লোকদেরই ঢুকতে দেয়া হতো। তবে মুহাম্মদের শক্তিশালী শত্রুদের মধ্যে অন্যতম উমর ইবনে খাত্তাবের (Umar ibn Khattab) ধর্মান্তরের সাথে সাথে তাদের ভয় শীঘ্রই কেটে যায়।

আবুল হাকামের ভাগ্নে উমর পারস্য আর পূর্বাঞ্চলীয় রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। উৎকট লম্বা গড়নের এবং সুঠাম দেহের অধিকারী উমর তাঁর বদমেজাজের জন্য পরিচিত ছিলেন। তরুণ বয়সে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হওয়া উমরকে, ইসলামিক গ্রন্থে এক জটিল মানুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বাবার হাতে মারধরের শিকার হবার কারণে তাঁর মাঝে অন্যদের হেয় করা ও মারামারিতে জড়িয়ে পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। আবুল হাকামের উৎসাহে তিনি প্রায়শই মুহাম্মদের কিছু অরক্ষিত অনুসারীদের সাথে মারধরে অংশ নিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, একবার এক ধর্মান্তরিত দাসীকে তিনি ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত চাবুক মেরে গিয়েছিলেন। এমনকি মুশরিক মক্কাবাসীরাও তাঁকে ভয় করত। একই সাথে তিনি বুদ্ধিমান, শিক্ষিত এবং বাকপটু ছিলেন। মক্কাবাসীদের মাঝে ঝগড়ায় মধ্যস্থতা করতে তাঁকে ডাকা হতো এবং বাইরের গোত্রের সাথে বিরোধে তিনি মক্কাবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করতেন।

ইসলামিক ইতিহাস গ্রন্থে যেমনটা বলা হয়েছে, উমর তাঁর মামা (আবুল হাকাম) ও মক্কার অন্যান্য নেতাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মক্কাকে বিভক্ত করার মূলে যে মুহাম্মদ দায়ী তাঁকে হত্যার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তাতে পরিণতি যত ভয়াবহই হোক না কেন! কেউ একজন তাঁকে খবর দিল যে, মুহাম্মদ আরকামের বাড়িতে অবস্থান করছেন। তলোয়ার কোমরে বেঁধে মুহাম্মদকে হত্যার জন্য উজ্জীবিত হয়ে উমর সেই বাড়ীর দিকে যেতে লাগলেন। ওখানে পৌঁছার আগে মুহাম্মদের এক সহানুভূতিশীল অনুসারীর সাথে পথিমধ্যে দেখা হয়ে গেল। সে উমরকে তলোয়ার বেঁধে কোথায় যাচ্ছেন জানতে চাইল। সত্যবাদিতার জন্য পরিচিত উমর তাঁকে বললেন যে, তিনি মুহাম্মাদকে হত্যা করার জন্য আরকামের বাড়িতে যাচ্ছেন। গুপ্তচর অনুসারীটি সতর্কঘন্টা বাজিয়ে দিল আর হত্যা করার আগে তাঁকে দুইবার ভাবতে বলল, কারণ মুহাম্মদকে মেরে ফেলে ফিরে যেতে তিনি আর বেশি সময় পাবেন না। মুহাম্মদের হাশিমী বংশ অবশ্যই দ্রুত প্রতিশোধ নেবে। উমরকে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রথমে তাঁর নিজের ঘর ঠিক করা উচিত, কারণ তাঁর বোন এবং ভগ্নিপতিসহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা মুহাম্মদের ধর্মের দিকে চলে গিয়েছে।

মুহাম্মদের অনুগত লোকটির সতর্ক করার পরেই মাঝ পথ থেকে উমর তাঁর পথ দ্রুত পাল্টে বোন ফাতিমার বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। ফাতিমা অব্রাহাম-ধর্মের সন্ধানকারী জায়েদের পুত্র সাইদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, জায়েদ মুলত মুহাম্মদকে তাঁর খাঁটি আব্রাহামিক একেশ্বরবাদের আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত করেছিলেন। ফাতেমা ও সাইদ সম্প্রতি ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, তবে উমরের কাছ থেকে তা গোপন রেখেছিলেন। তিনি যখন দরজার কাছে পৌঁছেছিলেন, উমর শুনতে পেলেন যে, কেউ উচ্চস্বরে কিছু একটা পড়ছে। তাঁর বোন এবং ভগ্নিপতি তখন খাব্বাবের (Khabbab) সাথে ছিলেন। খাব্বাব একজন শিক্ষিত দাস এবং প্রথমদিকের ধর্মান্তরিতদের একজন, যিনি বেশ শব্দ করে নবী মুসাকে নিয়ে মুহাম্মদের রচিত আয়াতগুলো পড়ছিলেন। ওমর দরজায় ধাক্কা দিলে ফাতেমা পাণ্ডুলিপিটি লুকিয়ে ফেলেন। ভেতরে যাওয়ার পরে উমর তাদের মুহাম্মদের ধর্মে যোগদানের জন্য দোষারোপ করলেন। তাঁরা যখন তা অস্বীকার করল, তখন তিনি তাঁর ভগ্নিপতির গলা চেপে

ধরলেন এবং তাঁর বোন তাঁকে বাধা দিতে এলে তাঁর মুখেও ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়ে দিলেন। রক্ত দেখে উমর শান্ত হলেন, আর ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তারা কি পড়ছিল তিনি তা দেখতে চাইলেন, আর এরপর প্রথম দুই ডজন আয়াত পাঠ করলেন। নিজে কবি বলেই, আয়াতগুলোর সুচতুর প্রকাশভঙ্গি দেখে তিনি বিমোহিত হয়ে যান, আর ঈশ্বরের মহান কণ্ঠ অনুভব করে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। এর আগে তিনি আর কখনও এমনটা অনুভব করেননি। তিনি তাদের বললেন যে, এই রচনা পড়ে কেউও যে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে পারে এর কোন কারণ তিনি খুঁজে পাননি।

ইসলামিক সাহিত্যে বলা হয়ে থাকে, তিনি তাৎক্ষণিক ধর্মান্তরিত হয়ে যান আর মুহাম্মদদের উপর তাঁর বিশ্বাস স্থাপনের কথা জানাতে আরকামের বাড়িতে যাত্রা করেন। তবে তাঁর পূর্বের অভিপ্রায় সম্পর্কে জেনে আগে থেকেই মুহাম্মদ এবং তাঁর অনুসারীরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। মুহাম্মদের চাচা হামজা (Hamza) বললেন, “যদি তাঁর খারাপ উদ্দেশ্য থাকে, তবে আমরা তাঁকে নিরস্ত্র করব এবং তাঁকে তাঁর নিজের তলোয়ার দিয়ে হত্যা করব”। তারা একটি ফাঁদ পাতল। প্রবেশের পরে মুহাম্মদ উমরের হাত বেঁধে টেনেহিঁচড়ে ঘরের মাঝখানে নিয়ে যান, সম্ভবত যাতে হামজা ও অন্যরা তাঁকে পেছন থেকে ধরে রাখতে পারে। মুহাম্মদ উমরকে সাবধান করে বললেন যে, তিনি যদি ঝামেলা করেন তবে তিনি তা তাঁর ফল ভোগ করবেন এখনই। কিন্তু সবাইকে অবাক করে উমর বলে উঠলেন: “হে ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ, ঈশ্বর আর আপনি তাঁর নিকট হতে যা নিয়ে এসেছেন, তাঁর উপর আমি বিশ্বাস রাখতে আপনার কাছে এসেছি” (১)। মুহাম্মদ এতটাই শিহরিত হয়েছিলেন যে, তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলেন, “আল্লাহু আকবার!”

সারাজীবন উমর ধর্মান্ধ শক্তির দ্বারা চালিত হয়েছিলেন; দিক ঠিক করার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল কেবল কারণ। এর আগে তিনি মক্কাবাসীদের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য তাঁর হিংস্র উদ্দীপনাকে কাজে লাগিয়েছিলেন, আর এখন তিনি মুহাম্মদের ধর্মের প্রয়োজনে তা ব্যবহার করছেন। আরকামের বাড়িতে অনুপ্রেরণা ও প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর তিনি ঘোষণা করলেন যে, মুহাম্মদের ধর্মকে আর অন্ধকার ঘরে লুকিয়ে না রেখে প্রকাশ্যে প্রচার করার দরকার, কিন্তু মুহাম্মদ তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এই বলে : “আমরা কয়েকজনই আছি, আর আমাদের প্রতি কি করা হয়েছিল তা তুমি জানো”। উমরের ছিল তাঁর নিজস্ব ধারণা। তাঁর প্রথম পদক্ষেপটি ছিল তাঁর চাচা আবুল হাকাম সহ মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়িতে গিয়ে তাঁর নতুন বিশ্বাসের কথা সবাইকে জানানো। প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এরপরে ওমর তাঁর ধর্মান্তরের কথা ঘোষণা করতে মন্দিরে গেলেন, কিন্তু তিনি তা করার আগেই মক্কাবাসীদের একজন দৌড়ে গিয়ে মন্দিরের সিঁড়ির শীর্ষে উঠে চিৎকার করলেন, “হে কুরাইশ, উমর সাবিয়ান (Sabian) তথা মুসলমান হয়ে গেছে!” (২) জনতার জটলা তাঁকে ঘিরে রাখল। কেউ কেউ ঘুষি মারল, কিন্তু উমর একজন বৃদ্ধকে ধরে তাঁকে সামনে এনে মানবঢাল হিসেবে নিজের সামনে ধরে রাখলেন, যে তাঁর কাছে আসছিল বৃদ্ধকে সেইদিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন। সহিংসতায় অতিষ্ঠ হয়ে তিনি তাঁর নতুন বিশ্বাস ঘোষণা করতে গোত্র ও গোত্রদের সভায় গেলেন এবং চ্যালেঞ্জ করলেন, কে তাঁকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে (আসুক)! বেশ কয়েক দফা কিলঘুষি, হাতাহাতির পর মক্কাবাসীরা তাঁকে একা ছেড়ে দেয়।

উমরের উগ্রতা অন্য বিশ্বাসীদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিল, এবং শীঘ্রই লোকেরা মক্কাবাসীর সবকিছুর কেন্দ্রস্থল সেই মন্দিরের সামনে কয়েকটি দলে এসে নিয়মিত লোকদেখানো প্রার্থনা আর কোরআন শরীফ পাঠ করা শুরু করল। তাঁর ধর্মান্তরিত হওয়ার পরে কিছু নিরপেক্ষ লোক তাদের বিশ্বাস ঘোষণা করে এবং সর্বসাধারণের প্রার্থনায় অংশ নেয়। যদিও মক্কার জনসংখ্যার তুলনায় ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা তখনো অল্প ছিল, মক্কাবাসীরাও নতুন ধর্মান্তরকে একটি বিরক্তিকর প্রবণতা হিসেবে দেখতে লাগল। তাদের উদ্বেগের আরো কারণ ছিল, মুহাম্মদের ধর্মের কথা উপত্যকা ছাড়িয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে, এবং বহেরাগতরাও এখন তাঁর ধর্মে আসার ইচ্ছে ব্যক্ত করছে। মুহাম্মদ তাদের স্বাগত জানালেন এবং আনন্দের সাথে তাঁর এই ‘আত্মসমর্পনের ধর্ম’ ও এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করলেন। কেউ কেউ ধর্মে যোগ দিয়ে শীঘ্রই কোরআনের আয়াত মুখস্থ করে ওযু ও নামাজের নিয়মাবলী শেখা শুরু করল। মুহাম্মদ নতুন এসব ধর্মান্তরিতদেরকে তাদের নিজ গোত্রে পাঠিয়ে

দিলেন গোত্রবাসীদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য। এ ঘটনাগুলি দেখে ভীত হয়ে মক্কাবাসীরা পুরো হাশিমী বংশকে শাস্তি দেয়ার চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করল আর মুহাম্মদকে বাঁচানোর দায়িত্ব দিল হাশিমী গোত্রের লোকদের। বেশিরভাগ হাশিমীরা মুহাম্মদের ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করলেও তাঁরা বংশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে আবু তালিবের সাথে ছিলেন। মক্কাবাসীরা যুক্তি দেখিয়েছিল যে, তাঁরা যদি হাশিমীদের মনোবল ভাঙতে পারে এবং মুহাম্মদ থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করাতে পারে, তবে তারা মুহাম্মদকে গৃহযুদ্ধের ভয় ছাড়াই মোকাবেলা করতে পারবে। তাঁর ধর্ম এবং তাদের জীবনযাত্রায় যে সমস্যাগুলি সৃষ্টি করেছিল, তাঁর মৃত্যুই সেসবের অবসান ঘটাবে। এটি বাস্তবায়ন করতে নেতারা হাশিমীদের শহরব্যাপী সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করার বিষয়ে একমত হয়েছেন। মুহাম্মদ এবং তাঁর গোত্রের লোকজনদের অবাঞ্ছিত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং অন্য মক্কাবাসীদেরও তাদের সাথে কিছু করা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তাদের সাথে কুরাইশের বিবাহ-শাদি নিষেধ করা হয়েছিল। তাদের সাথে ব্যবসা করা নিষিদ্ধ ছিল, সেটা কেনা বা বেচা যাই হোক। মক্কার নেতারা একটি নিষেধাজ্ঞা আদেশ লিখেছিলেন এবং বিভিন্ন কুরাইশ বংশের প্রতিনিধিরা এবং তাদের সহযোগীরা এটিতে স্বাক্ষর করে বা তাঁর উপর তাদের চিহ্ন চাপিয়ে দেয়ার পরে এটি মন্দিরের ভেতরে লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। সেই হুকুমনামায় মুহম্মদের বিরুদ্ধে অভিযোগের একটি তালিকা ছিল যা এমনঃ মুহাম্মদ বহু মক্কান পরিবারের আত্মীয়তার বন্ধন ভেঙে ফেলছিলেন, তিনি মক্কার বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে অপমান করেছিলেন এবং তিনি তাদের যুবকদের একটি মনগড়া ধর্মের দ্বারা কলুষিত করছিলেন।

হাশিমীরা হতবাক হয়ে গেল! কথাবার্তা বলার সময় লোকজন তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল। এমনকি পুরনো হাশিমী বন্ধুদেরকেও তাদের বাড়িতে আসতে দিচ্ছিল না। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা যখনই মন্দিরের সামনে প্রার্থনা করত, লোকজন কানে আঙ্গুল চেপে রাখত আর ওখান থেকে সরে যেত। অবশেষে, শত্রুতার ফলে আরও বড় ক্ষতি হতে পারে এই আশঙ্কায় হাশিমীরা নিজেদেরকে শহরটির একটা জায়গায় বন্দি করে ফেলল। জায়গাটি ছিল একটি খালের মুখ। তাদের বাড়িগুলি পাহাড়ের তীরে নির্মিত হয়েছিল এবং সরু এবং অনেকটাই খাড়া গলির ভেতর দিয়ে চলাচল করতে হতো। সবাই ওখানে গেলেও মুহাম্মদের চাচা আবু লাহাব ছিলেন একমাত্র হাশিমী, যিনি তাদের সাথে যোগ দেননি।

মুহাম্মদ তাঁর পরিবারকে উমাইয়ার প্রতিকূল পাড়া থেকে হাশিমী অংশে স্থানান্তরিত করেছিলেন। মুহাম্মদের কিছু অ-হাশিমী অনুসারীরাও তাদের নিজেদের সুরক্ষার জন্য সেই উপত্যকায় বসবাস শুরু করেছিল। উমরের বর্বরতা সত্ত্বেও, মন্দিরের সামনে দলবেঁধে প্রার্থনাগুলি কমে আসছিল এবং শেষ পর্যন্ত তা আর তাঁরা করতেই পারেনি। কেবলমাত্র পবিত্র মাসগুলিতে হাশিমীরা তাদের পাড়া থেকে বেরিয়ে আসত, তবে তারপরেও তাদেরকে মানুষ এড়িয়ে যেত। নিষেধাজ্ঞা দুই বছরেরও বেশি সময় স্থায়ী হয়েছিল এবং মুহাম্মদের বংশধরদের উপর মারাত্মক পরিণতি নেমে এলো। তাদের খাদ্য সরবরাহ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং লোকেরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল। মক্কার কিছু লোক তাদের দুর্দশার জন্য দুঃখপ্রকাশ করছিল, বিশেষত সেসব শিশুদের জন্য যারা ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদত, এবং তারা তাদের জন্য খাবার পাচার করত। সহানুভূতিশীলরা একটা উট বোঝাই জিনিসপত্র নিয়ে গভীর রাতে ওদের এলাকার প্রবেশপথ দিয়ে যেত, তারপরে উটটির গায়ে চড় মারত যাতে এটি হাশিমীদের ঐ অংশে চলে যায়। উটগুলিও তাদের খাওয়ার জন্য দেয়া হয়েছিল। উপত্যকাগুলির পেছনের সরুপথের মধ্য দিয়েও সরবরাহের চোরাচালান ঘটত এবং এটি সেই জীবনপথ ছিল যা হাশিমীদের অনাহার থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তবে চোরাচালানকারীরা তাদের পণ্য ও পরিষেবার জন্য অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করত, এবং হাশিমীরা যারা কাফেলার বাণিজ্যে জড়িত ছিল তারা নিজেদের ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্থ ফেরতের সম্ভাবনা ছাড়াই চোরাচালানের জন্য তাদের মূলধন খরচ করে ফেলত। খাদিজা ইতিমধ্যে তাঁর সম্পদের বেশিরভাগ অর্থ মুহাম্মদের সমর্থনে ব্যয় করেছিলেন; যা বাকি ছিল এই নিষেধাজ্ঞায় খরচ হয়ে গেছিল। শেষে তিনি নিঃশেষ হয়ে যান এবং তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কষ্ট সত্ত্বেও, হাশিমীরা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মক্কাবাসীদের মধ্যে এই নিষেধাজ্ঞাকে কিছুটা শিথিল করার তাড়না দেখা যাচ্ছিল। সময়ের সাথে সাথে নেতারা দুইভাগে বিভক্ত হন - একদল রক্ষণশীল এবং আরেক দল উদার ঘরনার। আবুল হাকামের নেতৃত্বে রক্ষণশীলরা জোর দিয়েছিলেন যে, মুহাম্মদ তাদের জন্য বিপজ্জনক, এবং যতক্ষণ না মুহাম্মদ তাদের কাছে ফেরত আসে এই নিষেধাজ্ঞা চালিয়ে যাওয়ার দরকার। চার বা পাঁচজনের প্রভাবশালী বণিকের নেতৃত্বে একটি উদারপন্থীরা বয়কটের প্রভাব সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলন। তারা বুঝতে পারলেন যে, মুহাম্মদ একটি সমস্যা এটা সত্য, তবে তারা মনে করেন তাঁর কারণে তাঁর বংশধরদের আরও শাস্তি দেয়াটা অনুচিত হচ্ছে। এছাড়া নিষেধাজ্ঞাটিও আর কাজ করছে না, কারণ লোকেরা ক্রমশ তা অমান্য করছে আর হাশিমীদের তৈজসপত্রও সরবরাহ করছে। যখনই নিষেধাজ্ঞা বন্ধের প্রস্তাবনাটি সামনে এলো তখন বিক্ষুব্ধ আবুল হাকাম দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, “এই বিষয়টি প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয়!” (৩) মক্কা অবশ্য ঐক্যমতের ভিত্তিতে শাসিত হচ্ছিল এবং বেশিরভাগ নেতাদের মাঝে উদারপন্থী মনোভাবের অনুসারীরাই জয়লাভ করেছিল। নেতাগণ নিষেধাজ্ঞার আদেশটি ছিঁড়ে ফেললেন, হাশিমীরা আবার স্বাভাবিক জীবন শুরু করল এবং মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা আগের মতোই চলাফেরা শুরু করল। মুহাম্মদের পক্ষে এটি ছিল একটি স্বল্পকালীন বিজয় এবং তিনি নিজেকে তখন ‘বিপজ্জনকভাবে উন্মুক্ত’ ভাবতেন। এরই মধ্যে খাদিজা ও আবু তালিব উভয়েই মারা যান। আবু তালিব প্রথমে মারা যান। নিষেধজ্ঞার কারণে সম্ভবত তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। যখন নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হল তিনি আর সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। যখন তাদের হাতে সুযোগ ছিল মক্কার নেতারা মুহাম্মদের ব্যাপারে সুরেহা করতে তাঁর কাছে এসেছিলেন। সমাধানের জন্য আগ্রহী হয়ে তারা মৃত্যুপথযাত্রী আবু তালিবকে অনুরোধ করতে আসেন, যাতে তিনি মুহাম্মদকে বুঝিয়ে নিজে বাঁচেন আর অন্যদেরও বাঁচতে দেয়ার ব্যবস্থা করে দেন। “আপনি কি এখন তাঁকে ডেকে এমন সমঝোতায় আসতে পারবেন, যাতে তিনি আমাদের ক্ষতি না করেন, আমরাও তাঁর ক্ষতি করব না; তিনি আমাদের ধর্ম সহ্য করুক এবং আমরাও তাঁকে সহ্য করব” – বলছিলেন নেতারা (৪)। আবু তালিব মুহাম্মদকে ডেকে পাঠালেন এবং তিনি যখন সমাবেশে যোগ দিলেন, আবু তালিব সেখানে উপস্থিত লোকদের দিকে ইঙ্গিত করে মুহাম্মদকে তাদের সমঝোতার ইচ্ছের কথা জানালেন, কিন্তু মুহাম্মদ তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি তাদের কাছ থেকে এই মর্মে একটি ঘোষণা চাইলেন যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, আর তাদের পৌত্তলিক দেবতাদের বাতিল করতে হবে। তাঁর অনমনীয়তা দেখে মক্কাবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে যায়। তিনি যা চেয়েছিলেন তা ছিল তাঁর প্রতি আনুগত্য, কিন্তু তিনি এমন কোনও ব্যক্তি ছিলেন না যাকে তাদের মান্য করতে হবে। মক্কার এক নেতা বলেছিলেন, “আমরা যা চাই এই ব্যক্তি তাঁর কোনও অংশ আমাদের দিতে চাচ্ছেন না। আমাদের চলে যাওয়া উচিত এবং সিদ্ধান্ত না নেয়া পর্যন্ত আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম পালন করা উচিত” (৫)।

মুহাম্মদ চাচাকে ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আবু তালিব তাঁর পূর্বপুরুষদের বিশ্বাসকে ধারণ করে মারা যান। মুহাম্মদ নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর চাচা জাহান্নামবাসী হবেন যেহেতু তিনি ঈমানের (বিশ্বাসের) পথে আসেননি। কিন্ত আবু তালিব রাজি হননি। তিনি বলেছিলেন এই ঘোষণা দিলে তা শুধু মুহাম্মদকেই খুশি করা হত, মন থেকে তা আসত না। কিছু ইতিহাস অনুসারে, মুহাম্মদ চাচার জানাজায় অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানান। অন্যান্য বিবরণে বলা হয়েছে যে, তিনি উপস্থিত ছিলেন, তবে বেশ দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন; তাঁর জন্য যেহেতু জাহান্নামের আগুন ধার্য করা ছিল তা যেন মুহাম্মদের উপস্তিতির দ্বারা কলুষিত না হয় (অর্থাৎ, চাচার নরকগমন যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয়) (৬)।

খাদিজা প্রায় তাঁর প্রায় একমাস পর মারা যান। তাঁর বয়স হয়েছিল পয়ষট্টি বছর। তাঁর মৃত্যুও সম্ভবত আবু তালিবের মতোই নিষেধাজ্ঞার ফলে সৃষ্ট কষ্টে হয়েছিল। তাঁর অর্থের যা অবশিষ্ট ছিল তা নিষেধাজ্ঞার সময় ব্যবহার করা হয়েছিল, যে কারণে তাঁর দাফন হয়েছিল সাদামাটাভাবে। তাঁর দেহটি সাধারণ সাদা কাফনের পরিবর্তে মুহাম্মদের চাদরে জড়িয়ে দেয়া হয়েছিল এবং তাঁকে মক্কার উঁচু কবরস্থানে একটি সাধারণ কবরে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। তিনি মারা যাওয়ার আগে মুহাম্মদ তাঁকে বলেছিলেন যে, তাঁর জন্য ফেরেশতা জিব্রাইল শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন এবং এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তিনি জান্নাতে একটা, “মুক্তার খোলের তৈরি ঘরে বাস করবেন এবং সেখানে কোথাও গোলমাল বা ঝামেলা নেই”(৭)।

এখন যেহেতু মুহাম্মদ আর আবু তালিবের দেয়া সুরক্ষার অধীনে নেই, তিনি তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এটা তাঁর মনে আরও বেশি করে প্রগাঢ় হয় যখন তিনি মন্দিরে প্রার্থনা করার সময় কেউ একজন তাঁর মাথায় ময়লা ঢেলে দিয়েছিল। আবু লাহাব মুহাম্মদের বাড়িতে হঠাৎ হাজির হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ধরণের হেনস্তা চলছিল। আবু লাহাব এখন হাশিমীদের গোত্রপতি। তিনি এই হেনস্তা সম্পর্কে অবগত হন, আর মুহাম্মদকে বলেন যে গোত্রের সুরক্ষা নবায়ন করা তাঁর অবশ্যকর্তব্য। "আবু তালিব জীবিত থাকাকালীন তুমি যা যা করতে তেমনটাই করে যাও। আল-লাতের নামে শপথ করছি, আমার মৃত্যুর আগে তোমার কোন ক্ষতি হবে না" – বলেন আবু লাহাব। যদিও এর আগে তিনি ছিলেন মুহাম্মদের চিরশত্রুদের একজন, কিন্তু আবু লাহাব মুহাম্মদের সুরক্ষার একটি প্রকাশ্য ঘোষণা করেছিলেন এবং তিনি যা বলেছিলেন তা করে দেখিয়েছেন। যখন মুহাম্মদকে এক লোক অপমান করেছিল আবু লাহাব সেই লোককের উপর চড়াও হয়েছিলেন। লোকটি চিৎকার করে আবু লাহাবকে উদ্দেশ্য করে তখন বলে, তুমিও "একজন সাবিয়ান (ধর্মীয় বিশ্বাসঘাতক)"। তবে আবু লাহাব মক্কাবাসীদের আস্বস্ত করেছিলেন যে, তিনি তা নন। আবু লাহাব বলেন - "আমি আব্দুল মুত্তালিবের বিশ্বাস ছেড়ে যাইনি। তবে আমি আমার ভাতিজাকে বিপদ থেকে রক্ষা করব এবং তাঁর নিজের কর্মের স্বাধীনতাও নিশ্চিত করব" (৮)।

তবে আবু লাহাবের সুরক্ষা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মুহাম্মদের দুই শত্রু আবুল হাকাম ও উকবা মুয়াইত (Uqbah Muayt), আবু লাহাবের কাছে একটা গুজব নিয়ে আসেন। তাঁরা আবু লাহাবের দেয়া সুরক্ষা দূর্বল করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন এই বলে যে, আবু লাহাবের পিতা এবং মুহাম্মদের দাদু আব্দুল মুত্তালিবকে নাকি জাহান্নামের আগুনে পোড়ানো হবে এমন কথা তাঁরা মুহাম্মদকে বলে বলতে শুনেছেন। আবু লাহাব যখন এই গুজব নিয়ে মুখোমুখি হন, মুহাম্মদ প্রথমে মূল বিষয়টিতে না গিয়ে তাঁর আশেপাশে কথা ঘোরানোর চেষ্টা করছিলেন এই বলে যে, আব্দুল মুত্তালিব "তাঁর লোকদের সাথে" ছিলেন। কিন্তু যখন চাচা তাঁকে এই বিষয়ে ক্রমাগত প্রশ্ন করেই যাচ্ছিলেন, মুহাম্মদ তখন অমোঘ বাণীটি দিলেন: "যে ব্যক্তি আব্দুল মুত্তালিবের মতো মারা গেছে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে"। আবু লাহাব তাঁর দিকে তেড়ে আসলেন আর বললেন "আল্লাহর কসম, আব্দুল মুত্তালিব আগুনের মধ্যে আছেন বলে দাবি করার জন্য আমি তোমার চিরশত্রু হয়ে থাকব!" মন্দিরের বাইরে এসে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে আবু লাহাব মুহাম্মদের উপর তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন (৯)।

মক্কায় থেকে গেলে তাঁকে হত্যা করা হবে, এই ভয়ে মুহাম্মদ তাঁর ধর্মের সুরক্ষা এবং সেটাকে আরো এগিয়ে নেয়ার জন্য মক্কা থেকে পূর্বে তিনদিনের দূরত্বে পাহাড় ঘেরা শহর তায়েফের দিকে পালিয়ে গিয়েছিলেন (১০)। তায়েফ একটা কৃষিপ্রধান এলাকা ছিল, যেখানে অন্যান্য জায়গার চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হতো। ছাকিফ ছিল সেখানকার প্রধান গোত্র যারা আঙ্গুরক্ষেত, ফলের বাগান এবং চারণভূমি সমৃদ্ধ অঞ্চলটি শাসন করতো। তারা মক্কাবাসীদের সাথে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রেখেছিল, এবং অনেক ধনী মক্কাবাসীরা সেখানে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক ছিল। ওখানের প্রধান দেবতা হলেন উর্বরতার দেবী আল-লাত, যার মন্দিরটি শহরের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে ছিল এবং পবিত্র মাসগুলিতে তা তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল।

মুহাম্মদ তাদের সুরক্ষা পাওয়ার আশা করেছিলেন, তবে প্রকৃতির উদারতার উপাসনাকারী লোকদের তাঁর প্রতি আগ্রহ জন্মানোর মতো এমন কিছু তাঁর কাছে ছিল না। তায়েফ ছিল তিন ভাইয়ের অধীনে, যে ভাইয়েরা তাঁকে তাদের সভাস্থলে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যেখানে তারা আমদানি করা কুশন এবং কার্পেটের উপরে হাঁটু ভাঁজ করে বসে দাসদের পরিবেশন করা বাটি ভর্তি ফলাহার সহযোগে আলাপ করছিলেন। তায়েফ মক্কার কাছাকাছি হওয়ায় সম্ভবত মুহাম্মদ সম্পর্কে তারা আগেই শুনেছিলেন। তবে তারা ছিলেন খোলামনের মানুষ, আর তাই মুহাম্মদের মুখ থেকেই তারা কথা শুনতে ইচ্ছুক ছিলেন। মুহাম্মদ তাঁর উপস্থিতি ব্যাখ্যা করেছিলেন এই বলে যে, তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের কাছে থেকেই অন্যায় আচরণের শিকার হচ্ছেন, কারণ তিনি তাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী নিয়ে এসেছেন। তাদের মুক্তির বার্তা নিয়ে ঈশ্বর তাঁকে প্রেরণ করেছেন। তিনি কোরআন থেকে আয়াতসমূহ তেলওয়াত করলেন, আর তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা করলেন। তিনি তাদেরকে তাঁর

ধর্মে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন এবং মক্কার অত্যাচারীদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করলেন। প্রথমদিকে ভাইয়েরা বিনম্রভাবে সাথে তাঁর কথা শোনেন, কিন্তু এরপর শীঘ্রই তারা সমালোচনা করা শুরু করলেন। একজন ভাই বলেছিলেন, "ঈশ্বর কি আপনার চেয়ে ভালো কাউকে পাঠাতে পারতেন না?" অন্য একজন বলেছিলেন, "ঈশ্বরের কসম, আমাকে কখনও আপনার সাথে কথা বলতে দিবেন না। আপনি যদি বলেন যে, আপনি ইশ্বরের কাছ থেকে আসা একজন প্রেরিত নবী, তবে আপনার জবাব দেয়া আমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, আর আপনি যদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেন, তবে আমার সাথে কথা বলা ঠিক নয়"(১১)।

বহেরাগত কারো জন্য গোত্রীয় সুরক্ষা প্রদানের বিষয়টি কখনও হালকাভাবে নেয়ার বিষয় ছিল না। তাদের কিছু লাভও হতে হবে, কিন্তু ভাইদের দিক থেকে মুহাম্মদকে সুরক্ষা দেয়া হলে তাতে তাঁরা লাভের কিছু দেখতে পেল না। মুহাম্মদ একজন গোত্রচ্যুত, নিশ্চিতভাবেই ঝামেলা সৃষ্টিকারী লোক, আর খুব সম্ভবত উন্মাদ। তাঁরা যদি তাঁকে তাদের বলয়ে নিয়ে আসে, তবে বন্ধু ও ব্যবসায়িক অংশীদার কুরাইশের বিরুদ্ধে তাদের যেতে হবে। দু'দিন আগে বা পরে এটা নিয়ে সংঘাত হয়ে যেতে পারে।

মুহম্মদ তাদের বিদ্রুপে বেশ ধাক্কা খেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন না, যে বাণীগুলো তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে বলে বিশ্বাস করছেন, কেন তারা সেগুলো গ্রহণ করল না! তারা বিমোহিত হওয়া তো দূরের কথা, বরং হিংস্র হয়ে উঠলো। তিনি যখন তাদের এই সভার বিষয়টি গোপন রাখতে বললেন, তারা তাঁকে বাইরে বের করে দেয়। তারা তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মারতে রাস্তার বখাটেদের প্ররোচিত করে। জনতা তাঁকে প্রধান ফটক দিয়ে তাড়া করে গ্রামের দিকে নিয়ে গেল। একটি ফলের বাগানের মাঝে লুকিয়ে তাদের হাত থেকে তিনি রক্ষা পান (১২)।

সেই ফলের বাগানটির মালিক ছিল মুহাম্মদ এর দু'জন কট্টর সমালোচক উতবা (Utba) এবং শায়বা রাবিয়ার (Shayba Rabia), যারা মুহাম্মদকে এক সময় হত্যার হুমকি দেয়া সেই লোকেদের অন্যতম। তাঁরা বাগানের গাছগুলি দেখাশুনা করার সময় কি হচ্ছে তা দেখছিলেন। তাঁকে দেখে তাদের মায়া হলো এবং আডাস (Addas) নামে তাদের এক খ্রিস্টান দাসকে মুহাম্মদের জন্য এক প্লেট আঙ্গুর দিতে বললেন। ভাগ্য তাড়া করে ফিরলেও, মুহাম্মদ নিজেকে ধর্মপ্রচার থেকে বিরত রাখতে পারলেন না। তিনি দাসের সাথে তাঁর নবীদের সম্পর্কে আলাপ করছিলেন এবং তাঁকে জোনাহর (ইউনুস) কথা বলে মুগ্ধ করেছিলেন। দাস এই জোনাহ নবী সম্পকে তাঁর নিজ শহর নিনেভায় (Ninevah) অনেক কথা শুনেছেন । মুহাম্মদ অবশেষে তাঁর কথা শুনার মতো একজনকে পেয়ে খুশি হলেন, আর বললেন, "তিনি (জোনাহ) একজন নবী ছিলেন এবং আমিও একজন নবী।" উতবা ও শায়বা তাদের এই আলাপ শুনে দাসকে বললেন, "তাঁকে তোমার ধর্ম ভোলাতে দিয়ো না, তোমার ধর্ম তাঁরটার চাইতে উত্তম" (১৩)। যদিও ভাইদ্বয়ের মুহম্মদকে অবজ্ঞা করার মতো কারণ ছিল, তবুও তাঁরা তাঁর বাহকটি ফেরত দেন এবং তাঁকে পথের খরচ দেন।

অবমাননাকর বহিষ্কারের ফলে মুহাম্মদ মনমরা হয়ে পড়েছিলেন। সফর শেষে ফিরে আসার পথে তিনি ভবিষ্যত নিয়ে হতাশা, ভীতসন্ত্রস্ত আর হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তায়েফে তাঁর সফরের কথা অবশ্যই মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছেছিল। তাঁরা এটাকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে দেখবে, যা তাঁকে হত্যার করার জন্য আরও একটি কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তায়েফ থেকে একদিনের পথ আল-উজ্জার পবিত্র জায়গা নাখলা (Nakhla) নামে নারকেলের উপত্যকায় তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় যে, সেই অবমাননা গভীরভাবে তাঁকে আঘাত করেছিল। ইসলামিক সাহিত্যেও বলা হয়েছে, বিভ্রান্তিকর মানসিক অবস্থা মোকাবেলার চেষ্টা করতে তিনি গভীর রাতে প্রার্থনায় নিমগ্ন থাকতেন, এবং সেই সময়ে একটি মৃগীরোগজনিত খিঁচুনির শিকার হয়েছিলেন। কারণ ফেরেশতা জিব্রাইল তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, অদৃশ্য জ্বিনের একটি দল আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর প্রার্থনা শোনার জন্য তাঁর চারপাশে জড়ো হয়েছিল। তিনি রাতের বাকি সময়টা এক সংক্ষিপ্ত অধ্যায় রচনা করে কাটিয়েছিলেন

যা সূরা ‘জিন (The Jinn)’ নামে পরিচিত ছিল। এতে তিনি কল্পনা করেছেন যে, তিনি জিনদের ধর্মান্তর করেছেন এবং তাঁর ধর্মের কিছু রীতিনীতি করতে তিনি তাদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। এই রচনাটি (সূরা জিন) একথা ঘোষণার দ্বারা শেষ হয় যেঃ তিনি নিজের লোকদের জন্য ঝামেলা সৃষ্টি করা এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তায়েফের লোকদের কাছ থেকে প্রত্যাখিত হননি, বরং তিনি ঈশ্বরের নির্দেশনার বাহক ছিলেন বলেই তারা তাঁকে প্রত্যাখান করেছে। এটা করে তাঁরা মুলত ঈশ্বরের দিকনির্দেশনাকেই প্রত্যাখ্যান করেছে, আর সেজন্য তাঁরা ঈশ্বরের আযাবের মুখোমুখি হবে। কোরআনে আছে, “আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে” (১৪)।



[তায়েফ হতে তাড়া খাওয়া। মক্কায় থাকা তাঁর পক্ষে অনিরাপদ হয়ে পড়ায়, মুহাম্মদ পার্শ্ববর্তী তায়েফে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি লোকদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁর আসার কারণ অনুধাবন করার জন্য তাদেরকে রাজি করিয়েছিলেন। নেতারা প্রথমে তাঁর কথা বিনয়ের সাথে শোনেন, কিন্তু তারা যখন বুঝতে পারল যে তিনি তাদেরকে মক্কাবাসীদের সাথে তাঁর বিরোধে জড়াতে চাচ্ছেন, তখন তারা তাঁকে শহরের বাইরে তাড়িয়ে দেয়।]

তায়েফের লোকেরা চিরকাল জাহান্নামে জ্বলবে, এমন কল্পনা করে মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেয়ে মুহাম্মদ মক্কায় চলে যান। জীবনের জন্য এখনও ভীত হয়ে তিনি হেরা পাহাড়ের ভেতর লুকিয়ে ছিলেন, সম্ভবত তিনি যে গুহায় প্রথমে বিভ্রমজনিত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের সংস্পর্শে এসেছিলেন সেই গুহায়ই আশ্রয় নিয়েছিলেন। সুরক্ষার ব্যবস্থা না করে তিনি আরও দূরে যাত্রা করার সাহস করেননি। মক্কায় পৌঁছার আগে, তিনি খুজা গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলেন, যিনি মক্কার বিভিন্ন নেতাদের কাছে সাহায্য চেয়ে তাঁর পক্ষে থেকে একটি বার্তা নিতে রাজি হন, কিন্তু তাঁর অনুরোধগুলিও প্রত্যাখ্যান করা হয়। তবে মুহাম্মদের ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছিল যখন তিনি মুতইম আদি (Mutim Adi) নামে উদারপন্থী এক মক্কানের কাছে তাবু তৈরি করেছিলেন, যিনি মুহাম্মদের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পবিত্র ধর্মযুদ্ধ সমূহে সামরিক নেতৃত্বদানকারী হিসেবে সর্বত্র সম্মান করা হতো বৃদ্ধ মুতইমকে। তিনি তাঁর ছেলেদের বর্ম এবং অস্ত্রধারণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যুদ্ধের ঘোড়ায় চড়ে তাঁরা মুহাম্মদকে সাথে নিয়ে মন্দিরে গেলেন, যেখানে মুতইম ঘোড়ার উপর থেকে ঘোষণা দিয়েছিলেন, "হে কুরাইশ! আমি মুহাম্মদকে আমার সুরক্ষায় নিয়ে এসেছি, সুতরাং কেউ যেন তাঁকে আক্রমণ না করে"। মুহাম্মদ এরপরে এগিয়ে গেলেন, কালো পাথরটিকে চুম্বন করলেন, দুই রাকাত নামায আদায় করলেন, আর মন্দিরের চারপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ শুরু করলেন (১৫)। শেষ হয়ে গেলে তিনি মুতইমের গোত্রের লোকদেরকে সাথে নিয়ে খাদিজার বাড়িতে ফিরে এলেন।

মুহাম্মদ এই নতুন নিরাপত্তার সুযোগে পুনর্বিবাহ করেন। খাদিজার মৃত্যুর দু'মাসের মধ্যেই সাওদাকে (Sauda) তিনি বিয়ে করেন, যিনি ছিলেন আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মোহাম্মদের এক অনুসারীর স্ত্রী, যিনি হিজরতের ভূমিতেই মারা যান। সাওদা দেখতে লম্বা, স্বাস্থ্যবান ও ভালো স্বভাবের ছিলেন। মুহাম্মদের সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রায় একই সময়ে তিনি আবু বকরের ছয় বছরের কন্যা আয়েশার সাথেও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, মুহাম্মদ বিবাহের আয়োজন করতে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। মুহাম্মদের প্রাথমিক অনুসারীদের মাঝে একজনের স্ত্রী তাঁকে উভয়য়ের সাথেই বন্ধনে আবদ্ধ হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন - সাওদাকে, কারণ তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং আয়েশাকে, কেননা তিনি কুমারী ছিলেন। মুহাম্মদ যখন আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, তখন এই মহিলা দুই পরিবারের মাঝে সম্পর্ক তৈরিতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা রেখেছিলেন। সাওদা এই প্রস্তাবে খুশি হন, কারন তিনি তাঁর সন্তান নিয়ে বৃদ্ধ বাবার সাথে থাকতেন, এবং মুহাম্মদকে কথা দিয়েছিলেন তাঁর সন্তানরা তাঁকে কখনওই বিরক্ত করবে না। যদিও তাঁর ভাই এই বিয়ের বিরোধিতা করেছিলেন এবং প্রতিবাদ হিসেবে নিজের শরীর ময়লা দিয়ে ঢেকে ফেলেছিল। তবে সাওদার বাবা সাওদাকে মুহাম্মদের সাথে বিয়ে করিয়ে দেন। তিনি খাদিজার বাড়িতে চলে এসে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সাওদার সাথে বিয়ের প্রস্তাবের বিষয়ে মুহাম্মদের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা বিশ্বাসযোগ্য, তবে আবু বকরের কন্যার বেলায় তেমনটা নয়। আবু বকরের বাড়িতে ঘনঘন যাওয়া আসা করার সুবাদে, আয়েশার জন্মের পর থেকেই তাঁর সাথে চাচা-ভাতিজার সম্পর্ক ছিল মুহাম্মদের। তিনি আয়েশাকে ছোট্ট বাচ্চা অবস্থা থেকে বালিকা হয়ে বেড়ে ওঠা পর্যন্ত দেখেছিলেন, যার সংগ্রহে বেশ কিছু কাপড়ের পুতুল ছিল। তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি তাঁকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন এমনঃ আল্লাহ মুহাম্মদকে রেশমী পোশাক পরা বা রেশমের কাপড় জড়িয়ে মুখ ঢাকা অবস্থায় থাকা আয়েশাকে দু'বার স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন। তিনি একটি কণ্ঠ শুনতে পেলেন, যাতে বলা হল, "এটি আপনার স্ত্রী, সুতরাং তাকে অবমুক্ত করুন"। তিনি রেশমী ওড়নাটি সরিয়ে ফেললেন, এবং ছোট্ট আয়েশার মিষ্টি মুখ এবং উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকালেন (১৬)। সুতরাং আয়েশাকে বিবাহ করার ধারণাটি মুহাম্মদের, এবং মুহাম্মাদ-সাওদা বিবাহের ব্যবস্থা করতে যে মহিলা ছিলেন তিনিও আবু বকররকে সাথে এই বিয়ে নিয়েও ঘটকালি করেছিলেন। মুহাম্মদের আগ্রহ জানতে পেরে আবু বকর আপত্তি করেননি, তবে একটি জটিলতা ছিল। তিনি ইতিমধ্যে মুহাম্মদের রক্ষক, মুতইম আদির ছেলের সাথে আয়েশাকে বিয়ে দিতে রাজি হয়েছিলেন। মুতইম মুহাম্মদকে যে সুরক্ষা দিয়েছিলেন তা যেন ক্ষতি না হয়, সেজন্য আবু বকর একজন দক্ষ কূটনীতিকের মতোই বিষয়টির ডিল করেন।

ইসলামিক ইতিহাসে পাওয়া যায়, তিন বছর পরে যখন মুহাম্মদ তাদের বিবাহকে 'পরিপূর্ণতা' দিয়েছিলেন, ততদিন পর্যন্ত আয়েশা পিতৃগৃহে থেকে গিয়েছিলেন। এটি বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে, আবু বকর এই বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন কারণ তিনি মুহাম্মদের কাছ থেকে অদল-বদলের আশা করেছিলেন। তিনি প্রায় চৌদ্দ বছর বয়সী মুহাম্মদের কনিষ্ঠ কন্যা ফাতিমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদ তাঁকে অপেক্ষায় রাখতেন এই বলে যে, তিনি এই বিষয়ে আল্লাহর কাছ থেকে 'ওহীর অপেক্ষায়' রয়েছেন (১৭)।

এর মাঝে আল্লাহ কখনোই আসেননি, এবং শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ ফাতিমাকে তাঁর চাচাত ভাই আলীর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন।

অধ্যায় – ১১
এটাকে পেতেই হবে

এক রাতে মুহাম্মদের মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোব হতে মৃগীরোগ সৃষ্টিকারী স্নায়বিক উত্তেজনা বিস্ফোরিত হয়। সে সময়ে তিনি আবু তালিবের মেয়ে উম্মে হানির (Umm Hani) বাড়িতে ছিলেন, যার ফলে মৃগীরোগের কারণে হেলুসিনেশনে চলে যান এবং স্পষ্ট স্বপ্নে দেখেন যে, ফেরেশতা জিব্রাইল তাঁকে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছেন। মুহাম্মদ এটির নামকরণ করেছিলেন 'রাতের যাত্রা' (The Night Journey), এবং এই অভিজ্ঞতার সময় তিনি বিশ্বাস করতেন জিব্রাইল তাঁকে ইহুদি কিংবদন্তিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে হাজির করেছিলেন।

মুহাম্মদের কল্পনার এই স্নায়বিক ঘটনাটি 'এক হাজার এক আরব্য রজনী' (A Thousand and One Arabian Nights) গল্পের মতো বিনোদনমূলক গল্পে রূপান্তরিত করে। মৌলিক গল্পটি ছিল একটি ভিনগ্রহী প্রাণীর হাতে অপহরণের দৃশ্যের মতো। তাঁকে ছাদ দিয়ে ঢুকে উম্মে হানির ঘর থেকে বের করে আনা হয় এবং মন্দিরের পাশের একটি কুয়োর (জমজম কূপ) কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ফেরেশতা জিব্রাইলের হাতে তুলে দেয়া হয়। ফেরেশতা তাঁকে গলা থেকে কোমর পর্যন্ত কেটে তাঁর অন্ত্র, হৃৎপিণ্ড জল দিয়ে পরিষ্কার করে আবার সেলাই করে দেয়। একই অভিজ্ঞতা হালিমার কাছে থাকাকালীনও পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। এবারের পরিশুদ্ধতা বিশেষ শুদ্ধি, চূড়ান্ত পরিশুদ্ধি, কারণ তাঁকে জেরুজালেমের মধ্য দিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে নেয়া হয়েছিল। তাঁকে একটা ডানাওয়ালা পশুর পেছনে বসিয়ে পাহাড়, উপত্যকা এবং বাতাসে চাবুক মেরে মেরে মরুভূমির উপর দিয়ে হাজার মাইল দূরে উড়িয়ে নিয়ে জেরুজালেমের মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তিনি জিব্রাইলের সাথে স্বর্গের বিভিন্ন স্তরে আরোহণ করেন, সেখানে প্রতিটি স্তরে একজন করে নবীর বাসস্থান ছিল। অবশেষে তাঁকে ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে নেয়া হয়। স্বর্গ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শেষে, মুহাম্মদকে উম্মে হানির বাড়ির বিছানায় ফিরিয়ে আনা হয় (১)।

যখন তিনি উম্মে হানিকে তাঁর সাথে কি ঘটেছে তা বললেন উম্মে হানি তখন তাঁকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন এ বিষয়ে কাউকে কিছু না বলেন, কিন্তু মুহাম্মদ নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি আসলেই জেরুজালেমে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে ঈশ্বরের সামনে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা গোপন রাখতে পারলেন না। উম্মে হানি তাঁর পোশাক ধরে দরজা থেকে বের হতে বাধা দেয়, কিন্তু মুহাম্মদ তাঁকে দূরে সরিয়ে দেন। বলাই যায়, মক্কাবাসীরা তাঁর এই গল্প শুনে তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। এমনকি কয়েকজন অনুসারী তাঁকে ছেড়েও চলে গেলেন। তবে অধিকাংশই তাঁর খুব বিশ্বস্ত ছিলেন এবং আবু বকর ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, "যদি তিনি (মুহাম্মদ) এই কথা বলে থাকেন, তাহলে তিনি সত্য কথাই বলছেন"। আবু বকরের এই কথার সাথে অন্যরাও একমত পোষন করলেন (২)।

যখনই মুহাম্মদকে আল্লাহর সিংহাসনের সামনে নেয়ার এই গল্পটি ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন প্রকৃত বিশ্বাসীরা অনেক উল্লসিত হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তা শোনার জন্য অস্থির ছিলেন। মুহাম্মদ তাদেরকে আরকামের বাড়িতে জড়ো হতে বললেন। তাঁর শ্রোতারা ঘোড়া এবং উটের অনুরাগী ছিল, এবং তারা প্রথমে চমৎকার ডানাওয়ালা ঘোড়ার গল্প, যার উপর সওয়ার হয়ে জেরুজালেমে নেয়া হয়েছিল, সেই বর্ণনা শুনতে চাইলেন। মুহাম্মদ ছিলেন জাদুকরী গল্পকে বাস্তবতার রূপ দিতে ওস্তাদ। তিনি শুরু করলেন এভাবে : তার নাম ছিল বোরাক (Buraq), দেখতে সাদা রঙের একটি চমৎকার প্রাণী! আকারে এটি একটি খচ্চর ও গাধার মাঝামাঝি আকৃতির ছিল এবং বিশাল ডানাওয়ালা ছিল। মুখ ছিল দেখতে মানুষের মতো; তাঁর কান ছিল হাতির কানের মতো; এটা ততদূর ভ্রমণ করতে পারে যতদূর কারো চোখ যায়। এটা ছিল নবীদের বাহক। কেননা, যে কোন সময় এই বাহকটিকে তাঁর পূর্বসূরিরা তাদের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করেছেন, সেখান থেকে পরিবহন সেবা নিয়েছেন।

আব্রাহাম মরুভূমির দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ইসমাইলকে দেখতে উড়ে গিয়েছিলেন মক্কায়, এবং পরিবহনটি দ্রুত চলার কারণে ইসমাইলও উত্তর সূর্যের দেশে তাঁর বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত হতে পেরেছিলেন। এখন ছিল মুহাম্মদের বোরাকে রওনা হওয়ার পালা। স্বর্গীয় এই পরিবহন এখন তাঁর সামনে হাজির হয়েছিল এবং তাঁকে নেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, কিন্তু বাহনটি ছিল অত্যন্ত উত্তেজিত এবং বিদ্রোহী মেজাজে। কারণ যীশুর পর তাঁকে আর কাউকে সেবা দেবার প্রয়োজন পড়েনি, এবং মুহাম্মদ যখন বাহনটির দিকে এগিয়ে এলেন জিব্রাইল তখন বোরাকের লাগাম ধরে ছিলেন এবং কঠোর তিরস্কার করে বলেন: “এখন বোরাক, আপনি কি লজ্জা পাচ্ছেন না? আমি শপথ করে বলছি, মুহাম্মদের চেয়ে মহান কোন বান্দা আপনার উপর কখনো চড়েনি” (৩)। মুহাম্মদ এটির উপর আরোহণ করেন এবং তারা বিখ্যাত মন্দির মাউন্টের (Temple mount) দিকে রওনা হয়ে সেখানে পৌঁছলেন যেখানে নবীদের বাহন বেঁধে রাখার জন্য সংরক্ষিত জায়গা ছিল। সেখানে তাঁর বসার জন্য একটি ব্যবস্থা রাখা ছিল (৪)। সেখানে তিনি দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন এবং জিব্রাইল তাঁর জন্য নানারকম খাবার নিয়ে আসেন যার মধ্যে ছিল মদ, মধু এবং দুধ। সেখান থেকে খাবার বেছে নেয়ার জন্য মুহাম্মদকে বলা হলো। মুহাম্মদ দুধ বেছে নিলেন। জিব্রাইল এর জন্য প্রশংসা করলেন। মূলত এটি ছিল একটা পরীক্ষা। যদি তিনি মদ বেছে নিতেন, তার মানে তিনি তাঁর অনুসারীদের পথভ্রষ্ট করতেন; যদি তিনি মধু বেছে নিতেন, তাহলে তারা জগতের সুখ দ্বারা প্রলুব্ধ হতো। বাস্তবতা হচ্ছে যে তিনি দুধ বেছে নিয়েছিলেন, তা থেকে বোঝা যায় যে নবী হিসেবে তাঁর অনুসারীরা সঠিকভাবে পরিচালিত হবে এবং নিশ্চিত জান্নাতের পথে থাকবে।

যে কোন প্রতিভাবান গল্পকারের মতোই, মুহাম্মদ তাঁর শ্রোতাদের পড়তে পারতেন, এবং তিনি তাদের পড়ছিলেন। তাঁর সামনে পূর্ণ দাড়িওয়ালা, প্রাপ্তবয়স্ক এবং শক্তভাবে মোড়ানো পাগড়ি পরিহিত শান্ত পুরুষেরা বসা ছিলেন। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানেই এই ধর্ম ছড়িয়ে দিতে এরাই হয়ে উঠবেন আততায়ী, গণহত্যাকারী, লুণ্ঠনকারী, ডাকাত, ধর্ষক, দাস-দাসীর মালিক এবং সভ্যতার ধ্বংসকারী এক একজন ভয়ঙ্কর চরিত্র! এরাই তখন মুহাম্মদের সামনে রূপকথা শুনতে বড় উৎসুক চোখে শিশুর মতো বসে ছিল। তাঁরা যেহেতু দৃঢ়ভাবে মুহাম্মদকে বিশ্বাস করত, তাই যা তা গল্প বলেও পার পেয়ে যেত মুহাম্মদ। তারা এতোটাই বিস্মিত হয়েছিল শুনে যে, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিই সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে দর্শন করার পর মক্কায় ফিরে এসেছেন! তারা তাঁর কাহিনী বিশ্বাস করত, কারণ তিনি নিজেই এই গল্প বিশ্বাস করতেন। শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া দেখে স্বর্গে আরোহণের বর্ণনাটি অব্যাহত রেখেছিলেন। এক সংস্করণে পাওয়া যায়, তিনি একটি সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন; আরেকটিতে জিব্রাইল তাঁকে হাত ধরে প্রথম এবং সর্বশেষ বেহেশতে আরোহণ করিয়েছিলেন, যেখানে ভেতরে ঢুকতে জিব্রাইলকে অনুমতি চাইতে হয়েছিল (৫)।

ফটকের পেছন থেকে একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল,

- “কে আপনি?”
- “জিব্রাইল”।
- “আপনার সাথে কে আছে?”
- “মুহাম্মদ”
- “তাঁর সফর কি শুরু হয়েছে?”
- “তাঁর সফর শুরু হয়েছে”(৬)।

মুহাম্মদ জিব্রাইলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বর্গে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন একজন লোক তাঁর ডান এবং বাঁ দিকে অনেক লোক নিয়ে বসে আছেন। লোকটি যখন তাঁর ডান দিকে তাকালেন তখন তিনি হাসলেন এবং বাঁ দিকে তাকিয়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তিনি মুহাম্মদকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন: “প্রেরিত রাসূল, ধর্মপ্রাণ পুত্র, আপনাকে স্বাগতম!” মুহাম্মদ জিব্রাইলকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কে উনি?”, তিনি উত্তর দিলেন “তিনি হচ্ছেন আদম (Adam) এবং তাঁর ডান ও বাঁ দিকে

এই লোকগুলো তাঁরই বংশধরদের আত্মা। তাদের মধ্যে যারা ডান দিকে রয়েছে তারা জান্নাতের বাসিন্দা আর বামপাশে থাকা লোকগুলো জাহান্নামের বাসিন্দা।

মুহাম্মদ ফেরেশতাদের সৈন্যদল চারপাশে দেখতে পেলেন। তিনি তাদের সেনাপতির পরিচয় জানতে চাইলেন। বলা হল, তাঁর নাম ইসমাইল, যার অধীনে বারো হাজার ফেরেশতা ছিলেন, যাদের প্রত্যেকের অধীনে আবার আরও বারো হাজার ফেরেশতা আছে। তিনি যেসব ফেরেশতাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তারা সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসেছিলেন, একজন বাদে। তিনি জাহান্নামের রক্ষক - মালিক। যখন মুহাম্মদ মালিকের ভূমিকা জানতে পারেন তখন তিনি জাহান্নমের শাস্তির স্থান দেখার অনুমতি চাইলেন। জিব্রাইল অনিচ্ছাসত্ত্বেও মালিককে সেই ভয়ানক জাহান্নাম দেখাতে নির্দেশ দিলেন, এরপর মালিক জাহান্নামের আবরণ সরিয়ে নিলেন এবং বাতাসে আগুন জ্বলে উঠল। মুহাম্মদ একটু দম নিয়ে কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাঁর সামনে বসে থাকা লোকদের জাহান্নাম দেখার কথা বললেন। ঈশ্বর তাঁকে নিজের চোখে জাহান্নাম দেখতে দিয়েছিলেন, যাতে তারা যদি ঈশ্বর ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করে, তবে তাদের জন্য যা আছে সে সম্পর্কে তিনি তাদের সতর্ক করতে পারেন। এ পর্যায়ে মুহাম্মদ তাঁর শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করলেন, তারা সত্য জানার জন্য প্রস্তুত কী না? অনুসারীরা ভীতি সহযোগে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। মুহাম্মদ বর্ণনা করলেন তিনি কি ভয়াবহতার সাক্ষী ছিলেন যা পাপীদের জন্য অপেক্ষা করছে! আর শাস্তি নির্ভর করবে পাপের পরিমাণের উপর। তিনি বর্ণনা করেছেন কিভাবে পেছনে কথা বলা এবং নিন্দাকারীদের নখ তামায় রূপান্তরিত হয়েছে, যা দিয়ে তাদের মুখ এবং বুক কাটা হচ্ছিল। এইভাবে তাদের কষ্ট দেয়া হয়, কারণ তারা অন্যদের কষ্ট দিয়েছে। "আমি উটের মত ঠোঁটওয়ালা মানুষকে দেখেছি। তাদের হাতে ছিল পাথরের আগুনের টুকরো, যা তাদের মুখে ঢুকিয়ে দিত এবং তা তাদের পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে আসত। আমাকে বলা হয়েছিল যে এরাই এতিমদের সম্পদ আত্মসাৎ করেছে" (৭)। তিনি সকল সুদখোর এবং ব্যভিচারীর ভাগ্য দেখেছেন এবং তাদের নির্যাতনের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি সেখানে এত কিছুর সাক্ষী হয়েছেন যে পুরোটা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে, তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন তাদের যথেষ্ট সময় আছে কি না?

মুহাম্মদ একজন দক্ষ বক্তা ছিলেন, তিনি জানতেন কখন তাঁর কণ্ঠস্বরকে বজ্রপাতের মতো উন্নীত করতে হবে, আর কখন ফিসফিস করে বলতে হবে। কখন চোখ ক্রোধে ঝলসে উঠবে, অথবা কখন চোখে দয়ার নহর দেখা যাবে। অনুসারীদেকে নারকীয় বর্ণনাগুলো উপলব্ধি করিয়ে তাদের আবার স্বর্গীয় আরোহণে ফিরিয়ে আনলেন। তিনি জানালেন তারা যদি নবীর দেখানো সঠিক পথ অনুসরণ করে তাহলে তাদের জন্য ভালো কিছু রয়েছে। তারা স্বর্গে যাবেন, শুধু তাঁর কথামতো সব মেনে চলতে হবে!

মুহাম্মদ বর্ণনা করেছেন, কিভাবে প্রতিটি আকাশে প্রবেশের জন্য জিব্রাইলকে অনুমতি নিতে হয়েছিল। দ্বিতীয় আকাশে তিনি যীশু (ঈসা) ও জন বাপ্তাইজের (ইয়াহিয়া) সাথে দেখা করলেন। তৃতীয় আকাশে তাঁকে জোসেফের (ইউসুফ) সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। চতুর্থ আকাশে ছিল ইদ্রিসের (Enoch) বাসস্থান। পঞ্চম আকাশে ছিলেন হারুন (Aaron) এবং ষষ্ঠ আকাশে মুসা (Moses) ছিলেন। তাদের বাসস্থানে গিয়েই মুহাম্মদ তাদের শুভেচ্ছা জানালেন এবং উত্তরে তাঁরা বলেছেন, "স্বাগতম, হে ধর্মভীরু ভাই ও প্ররিত নবী!" মুহাম্মদ নবীদের বর্ণনাও দিয়েছেন : যীশু ছিলেন মাঝারি আকারের যার গায়ের রং কিছুটা লালচে ছিল, দেখে মনে হয়েছে তিনি কেবল গোসল করে নিজেকে শুকিয়ে নিয়েছেন। জোসেফের মুখ পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল ছিল। হারুন দেখতে সাদা দাড়িওয়ালা ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ লোক ছিলেন। মুসারও সাদা দাড়ি ছিল, কিন্তু তিনি দেখতে তরুণ খেলোয়াড়ের মতো সুঠামদেহের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর চুল ছিল কোঁকড়ানো আর লম্বা নাক ছিল। হাসতে হাসতে এবং মাথা নাড়িয়ে প্রশংসা করতে করতে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের একজনের চেহারার সাথে যীশুকে তুলনা করেছিলেন। আব্রাহামকে বর্ণনা করা সবচেয়ে সহজ ছিল, নিজেকে আয়নায় দেখার মতই। মুহাম্মদ বলেন: "তাঁর সন্তানদের মধ্যে তাঁর সাথেই আমার সবচেয়ে বেশি মিল আছে"।

তিনি সপ্তম স্বর্গে তাঁর নায়ক অব্রাহামের মুখোমুখি হলেন। মুহাম্মদের পিতৃপুরুষ আল্লাহর মন্দিরের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। আবারও সম্ভাষণ : "স্বাগতম, হে ধার্মিক ভাই ও ধার্মিক নবী!" সেখান থেকে জিব্রাইল তাঁকে স্বর্গীয় মন্দিরের দিকে নিয়ে যান যেটা ছিল জান্নাতের একপ্রান্তে (কোনে), সেখানে একটি বিশাল গাছ ছিল। একপর্যায়ে তিনি কলমের শব্দ শুনতে পেলেন, এবং যখন তিনি এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তাঁকে বলা হল যে ফেরেশতা লেখকেরা আল্লাহের হুকুম লিখছে। এরপর মুহাম্মদ স্রষ্টার উপস্থিতি খুঁজে পেলেন। মুহাম্মদের জন্য ঈশ্বরের নির্দেশ এলো : মুহাম্মদ ও অনুসারীদের দিনে পঞ্চাশবার সালাত আদায় করতে হবে।

মুহাম্মদের শ্রোতারা স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে বলে উঠলেন, পঞ্চাশবার? কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব? তাদের তো দিনরাত প্রার্থনা করেই কাটাতে হবে! মুহাম্মদ আসলে উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য এই কথাটি বললেন। তিনি তাঁর শ্রোতাদের বললেন, তিনি ঈশ্বরের আদেশ নিয়ে তাঁর সাথে বিতর্ক করতে পারলেন না। স্রষ্টার সাথে কে তর্ক করতে পারে? ঈশ্বর যদি পঞ্চাশবার বলেন, তিনি পঞ্চাশবারই বুঝিয়েছেন। ঈশ্বরের সংগে তর্ক না করে তিনি বিনীতভাবে যেখানে থেকে এসেছিলেন সেখানেই ফিরে গেলেন, কিন্তু তিনি পথে মুসাকে অতিক্রম করলেন। মুসা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাকে কি আদেশ দেয়া হয়েছে?"

তিনি উত্তর দিলেন "আমাকে প্রতিদিন পঞ্চাশবার প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে"

তিনি ঠাট্টা করে উঠলেন, "আপনার অনুসারীরা দিনে পঞ্চাশবার প্রার্থনা করতে পারবে না। কসম, আমি মানুষকে আপনার আগেই পরীক্ষা করেছি। আমি ইস্রায়েলের লোকদের জন্য কিছু কঠোর নিয়মকানুন তৈরি করেছিলাম, কিন্তু তারা তা সামলাতে পারেনি। আপনার পালনকর্তার কাছে ফিরে যান এবং তাঁর কাছে গিয়ে আপনার জাতির জন্য প্রার্থনা কিছুটা কমিয়ে আনুন"। মুসার কথা শুনে মুহাম্মদ আল্লাহর কাছে ফিরে গেলেন। প্রার্থনা কমানোর জন্য উনি বারবার আল্লাহর কাছে যেতে থাকলেন। মুহাম্মদ ও আল্লাহ অবশেষে একটি চুক্তিতে আসলেন - দিনে মাত্র পাঁচবার সালাত আদায় বাধ্যতামূলক করা হলো। এখন থেকে বিশ্বাসীদের দুই রাকাত নামাজ আদায় করতে হবে খুব ভোরে সূর্যোদয়ের আগেই, আর চার রাকাত নামাজ পড়তে হবে অপরাহ্নে এবং বিকেলেও। আর রাতেও পড়তে হবে চার রাকাত নামাজ, এবং তিন রাকাত নামাজ পড়তে হবে সূর্যাস্তের সাথে সাথে। কিন্তু এই বাধ্যতামূলক প্রার্থনার সময় যেসব চিরন্তন রচনাগুলো জিব্রাইলের মাধ্যমে মুহাম্মদের কাছে পাঠানো হয়েছে, এগুলো জোরে জোরে আবৃতি করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মুহাম্মদের বিশ্বস্ত শ্রোতাদের মধ্যে স্বস্তির ছাপ দেখা গেল। আল্লাহ তাদের জন্য মুক্তির খরচ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদ তাঁর চমৎকার সমঝোতার দক্ষতার মাধ্যমে তা কমিয়ে এনেছিলেন।

এরপর শ্রোতারা জানতে পারেন যে, মুহাম্মদকে সম্মানিত এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা দিতে আল্লাহ তাঁকে অন্যান্য নবীদের নিয়ে নামাজের নেতৃত্ব দেয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। এই সম্মান তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল, কারণ তিনি শুধু নবীদের মধ্যে শেষজন ছিলেন তাই-ই না বরং তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সেরা। মুহাম্মদ তাঁর আঙ্গুলের ইশারায় দেখিয়ে দিলেন কিভাবে তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে মাউন্ট মন্দিরে (Temple Mount) ফেরত আনা হয়েছিল। অন্যন্য নবীরাও সেখানে হাজির হন এবং প্রার্থনার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যান। মুহাম্মদ সেখানে নেতৃত্বের আসনে ছিলেন। যীশু, ইয়াহিয়া, মুসা, হারুন, ইদ্রিস, জোসেফ ও আব্রাহাম তাঁর পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান। নবীদের তাদের স্থান নির্বাচন করা ছাড়া অন্য কিছু শেখানোর প্রয়োজন ছিল না, কারণ মুহাম্মদ মাত্র এক দশকআগে ফেরেশতা জিব্রাইলের কাছ থেকে যে একই প্রার্থনা নিখুঁতভাবে শিখেছিলেন। তাই অন্যন্য নবীদের হাতে পর্যাপ্ত সময় ছিল এ বিষয়ে শিখে নিতে। যীশু ছয়শত বছর ধরে সেখানে ছিলেন, অন্যদিকে আব্রাহাম দু'হাজার বছরেরও বেশি সময় পেয়েছিলেন প্রার্থনার নিয়ম শিখে নিতে। তা সত্ত্বেও তাদের কেউই

মুহাম্মদের সাথে নিখুঁতভাবে প্রার্থনা করতে পারেনি। কেউ তাঁর মতো কানের কাছে হাত উঠিয়ে উটের মত হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর উরুর উপর হাত রাখার নিয়ম অনুসরণ করতে পারল না। কেউ তাঁর কনুই রাখার নিখুঁত নৈপুন্যের সাথে তাল মেলাতে পারেনি বা পারেনি মাটিতে হাত স্পর্শ করে সেজদা করতে। মুহাম্মদ ছিলেন অনবদ্য। তিনি ছিলেন অননুকরণীয়, প্রার্থনার আদি বিশুদ্ধ রূপ তিনিই শুধু মান্য করলেন এবং ঈশ্বরের প্রতি তিনি ছিলেন অসামান্য আত্মসমর্পণকারী। মুহাম্মদকে নেতৃত্ব দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নিশ্চিত করেন যে, সকলেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং তাঁকে সকলের অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে স্থাপন করেন।
নামাজ শেষ, মুহাম্মদের বাড়ি যাওয়ার সময় হয়েছে। মক্কায় তাঁর স্থান ছিল তাঁর লোকদের মধ্যে, যারা এখন আরকামের ঘরে বসে বা হাঁটু গেড়ে তাঁর গল্প শুনছে। ডানা ঝাপটিয়ে, বোরাক তাঁকে ভোরের নামাজের সময় হবার আগে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু ফেরার পথে, তিনি তৃষ্ণার্ত হয়ে আরো একটি দু:সাহসিক কাজ করেন। যখন তাঁরা বাতাসে ভেসে যাচ্ছিলেন, মুহাম্মদ বোরাকে সওয়ার ছিলেন এবং ফেরেশতা জিব্রাইল তাঁর পাশাপাশি উড়ছিল, মুহাম্মদ একটি কাফেলা দেখতে পেলেন। যা মক্কা থেকে রওনা দিয়েছিল একদিনেরও কম হবে। কাফেলার লোকেরা রাতের জন্য বিছানা করে ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু একটা জলের পাত্র বাইরে রেখে গিয়েছিল। বোরাকটি দ্রুত অবতরণ করল; মুহাম্মদ লাফ দিয়ে নেমে জল পান করলেন, তারপর ঝাঁপিয়ে বোরাকে উঠে পড়ে তাঁর শেষ গন্তব্য মক্কায় এসে পৌঁছালেন।

মুহাম্মদের শ্রোতারা হতবাক এবং বিস্মিত হয়ে গেল। তিনি তাদের কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সভাটি শেষ করলেন। সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নটি এসেছিল আবু যরের (Abu Dharr) কাছ থেকে। তিনি দাউস (Daws) গোত্রের নেতা ছিলেন ওটা উপকূলীয় এক গোত্র ছিল, যাদের ডাকাতির খ্যাতি রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আল্লাহকে দেখেছেন?" মুহামদ উত্তর দেন, "আমি একটি আলো দেখেছি"। তিনি আরও বলেন যে, তিনি ঈশ্বরকে সরাসরি দেখতে পাননি। কারণ সর্বশক্তিমান প্রভু আলো দ্বারা আবৃত ছিলেন, তাই তাঁর কাছ থেকে তিনি কেবল আলো নিঃসৃত হয়েছে তাই দেখেছেন (৮)।

সেদিন মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের মন্দিরে নিয়ে যান, যেখানে তারা দলবদ্ধ হয়ে প্রার্থনা করেন এবং মক্কাবাসীদের অভিশাপ দেয়া হয়। নামাজের নেতৃত্ব মুহাম্মদ দিয়েছেন তাই তিনি সবার সামনে ছিলেন এবং বিশ্বাসীরা তাঁর পেছনে বেশ কয়েকটি সারিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তাঁর মাথা পর্যন্ত হাত উঠালেন, হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং সেজদায় গেলেন। মুহাম্মদের নেতৃত্ব অনুসরণ করে বিশ্বাসীরা চারবার সিজদা করেন, তিনি যে কোরআন তেলাওয়াত করলেন তারাও তা পুনরাবৃত্তি করলেন। যখন প্রার্থনা শেষ হল তখন বিশ্বাসীরা বিস্মিত হল এই কথা শুনে যে, মুহাম্মদ আসলে নামাজের নেতৃত্বে ছিলেন না। তিনি তাদের জানালেন যে, ফেরেশতা জিব্রাইল সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তিনি এই প্রার্থনার নেতৃত্ব দিয়েছেন। যদি তাদের ঐশ্বরিক চোখ থাকত তাহলে তারা এই ফেরেশতাঁকে দেখতে পেতেন।

কিন্তু আফসোস, তাদের দেখার জন্য সেই চোখ ছিল না! ঈশ্বর শুধু তাঁর রাসূলকে একচেটিয়াভাবে সমস্ত ক্ষমতা দিয়েছিলেন

অধ্যায় - ১২
বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

মুতইমের (Mutim) নিরাপত্তা সত্ত্বেও, মুহাম্মদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। মুতইম বৃদ্ধ ছিলেন; তিনি যেকোন সময় মারা যেতে পারেন। তাঁর কিছু ছেলে ও নাতিরা মুহাম্মদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন, এবং গোত্র থেকে তিনি অব্যাহতভাবে সুরক্ষা পাবেন সেটাও অনিশ্চিত ছিল। এদিকে মক্কাবাসীরা মুতইমের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিল না, বরং মুতইমকেই মুহাম্মদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর জন্য বিভিন্ন অভিযোগের একটি ফর্দ তৈরি করছিল। সম্প্রদায়ের ভেতরের ঐক্য খর্ব করা এবং তাদের তরুণদের ধর্মের মাধ্যমে কলুষিত করার মত গতানুগতিক অভিযোগ ছাড়াও, এবার যোগ করা হচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মত অপরাধ। রাবিয়ার ভাইয়েরা এবং অন্যান্যরা মুহাম্মদের তায়েফ ভ্রমণের সংবাদ নিয়ে আসেন এবং বলেন তাদের কাছে সংবাদ আছে যে, মুহাম্মদ তায়েফের জনগণকে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছিলেন। একটি ডানাওয়ালা খচ্চরে চড়ে জেরুজালেমে (Jerusalem) উড়ে যাওয়া এবং স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার মুহাম্মদের দাবির পর, মক্কাবাসীরা এখন তাঁর অনুসারীদের বলতে পারবে যে, তিনি আসলেই পাগল হয়ে গেছেন।

মুহাম্মদ আবুল হাকামকে ছাড়া আর কাউকে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানাননি। স্বর্গীয় উচ্চ আসনে পরিভ্রমণের সম্মান নিয়ে উম্মে হানির বাড়ি থেকে বের হয়ে তিনি মন্দিরে চলে যান, কিন্তু ততক্ষণে তিনি বিষণ্ণতায় ভুগছিলেন। আবুল হাকাম মুহাম্মদের কি হয়েছে জানতে চান, এবং মুহাম্মদ তাঁকে জেরুজালেমের অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। সবসময় মুহাম্মদকে অপমান করার উপায় খুঁজতে থাকা আবুল হাকাম ঠান্ডা মাথায় জিজ্ঞেস করলেন, "আমি যদি তোমার লোকজনকে তোমার কাছে ডেকে আনি, তাহলে তুমি আমাকে যা বলেছ তা কি তাদেরকেও বলবে?" উত্তরে মুহাম্মদ বললেন "হ্যাঁ, আমি বলব'"। সম্ভবত মুতইম সহ সকল গুরুত্বপূর্ণ মক্কাবাসীকে মন্দিরের মঞ্চে ডেকে পাঠানো হয় এবং মুহাম্মদ আবুল হাকামকে যা বলেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করেন (১)।

মুতইম মুহাম্মদের সমর্থনে অনড় ছিলেন, কিন্তু তাঁর সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে মুহাম্মদ একটি নতুন বাড়ির খোঁজ করতে থাকেন। যখন পবিত্র মাস শুরু হল, তিনিও ধর্মপ্রচারের জন্য রাস্তায় বের হলেন এবং বেদুইন গোত্রদের মধ্যে থেকে একজন রক্ষক খুঁজতে লাগলেন। আবু বকর, আলী, উমর এবং তাঁর অন্যন্য ঘনিষ্ঠদের সাথে নিয়ে তিনি বিভিন্ন মেলায় গোত্রের শিবির পরিদর্শন করতে লাগলেন। মক্কা ছাড়ার আগে তিনি আবুল হাকাম এবং অন্যান্য মক্কাবাসী শত্রুদের সতর্ক করে দেন "শীঘ্রই তাদের উপর গজব পড়বে", আর তখন তাঁরা "হাসবে কম কিন্তু কাঁদবে বেশি" (২)।

মুহাম্মদ মক্কা থেকে দুই দিনের দুরত্বে থাকা প্রধান বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক মেলা উকাজে গিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন এবং তাঁর শেষ করেন মক্কার কাছাকাছি দুটি ছোট মেলা, মাজানা (Majanna) এবং দু আল-মাজাজ (Dhu al-Majaz) যুল মাজাজের মেলা ঘুরে। আশেপাশের তীর্থযাত্রীদের শিবিরের সামনে মুহাম্মদের লোকজন নানান পসরা সাজিয়ে বসতো, যাতে শিবিরগুলোতে মুহাম্মদের প্রবেশ সহজ হয়ে যায়। তার মধ্যে অগ্রগামী লোকটি তাঁর উট নিয়ে তীর্থ শিবিরে চক্কর দেবে, তারা কোথা থেকে এসেছে এবং তাদের নেতাদের নাম জিজ্ঞাসা করবে, তারপর তারা একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেবে: "আপনি কি ভালো কিছু অর্জন করতে চান?" তাঁরা প্রত্যুত্তরে বলত "সেটা কিভাবে সম্ভব?" জবাব আস্ত – "আপনারা সাক্ষ্য দেবেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এরপর প্রার্থনায় যোগ দেবেন এবং ঈশ্বরের বাণীতে বিশ্বাস করবেন" (৩)।

যদি তাদের মধ্যে আগ্রহ দেখতে পেতেন তবেই মুহাম্মদ ঘটনাস্থলে আসতেন এবং তাদের প্রধানদের সাথে তাঁবুতে বসতেন, অথবা সেখানে জ্বালানো আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে আড্ডা দিতে থাকা লোকজনের সাথে বসতেন। এই দলগুলোর

অনেকেরই খুব সামান্য জিনিসপত্র এবং মোটামুটি রকমের তাঁবু ছিল। অন্যান্য যেসব আঞ্চলিক গোত্রের লোকেরা একটু ভালো অবস্থার ছিলেন তাঁরা অনেক বড় তাবু খাটাতেন, সঙ্গে করে কার্পেট এবং কুশন নিয়ে আসতেন। তাদের শেখ'রা ভালো পোশাক পরতেন এবং দর্শনার্থীদের প্রচুর খাবার ও পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। যে গোত্রের নেতারা অন্য গোত্রের চেয়ে বেশি ক্ষমতার বা ভালো অবস্থার ছিলেন মুহাম্মদ অধীর আগ্রহে তাদের মনোযোগ পেতে চাইতেন। যখনই এই ধরনের নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হতো, তখন মুহাম্মদও তাঁর সবচাইতে ভালো পোশাকটি পরে তাদের মধ্যে বসতেন। সাধারণত ধর্মপ্রচারকের প্রথম কাজটি শুরু করতেন আবু বকর, তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়ে মুহাম্মদকে সবার মাঝে পরিচয় করিয়ে দিতেন।

প্রথমে মুহাম্মদ আদিবাসী নেতা এবং তাদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে চাটুকারিতাপূর্ণ মন্তব্য দিয়ে শুরু করতেন, তারপর তিনি মূল লক্ষ্যে চলে যেতেন। শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে তিনি ধর্মতত্ত্ব এড়িয়ে যেতেন, বরঞ্চ তাঁর বিপরীতে প্রথমে সমাজের নানা অবিচারের কথা তুলে ধরতেন। আরবরা অন্যায়, অবিচারকে ঘৃণা করত, তিনি তাদের তা মনে করিয়ে দিতেন। হাতে তলোয়ার নিয়ে তারাই প্রথম প্রতিরক্ষাহীনদের রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ত। তারা নির্যাতিতের সাহায্যেও সবার আগে এগিয়ে আসতেন। এটি আরব্য সংস্কৃতি ছিল, এবং সেরা কবিতার মাধ্যমে এই ধরনের কাজের প্রশংসা করা হতো। তিনি তাদের জানান, তিনি অবিচারের শিকার হয়েছেন। তিনি কেবলমাত্র তাঁর লোকদের উপকার চেয়েছিলেন, একমাত্র সত্য ঈশ্বরের বাণী তাদের কাছে নিয়ে আসার মাধ্যমে, আর এর জন্য তাঁকে তারা বিতাড়িত করেছে। এটি কি ন্যায়? তাঁর কথা শেষ করে তিনি তাদেরকে প্রতিরক্ষা শাখার অধীনে আসার জন্য আবেদন করতেন। তিনি বলেন, "আমি আপনাদের কাউকে কিছু করতে বাধ্য করতে চাই না। আপনাদের মধ্যে যার ইচ্ছে আমার সাথে একত্রিত হবেন, কিন্তু আমি কাউকে আমার সাথে সম্মত হতে বাধ্য করব না। আমি শুধু যারা আমাকে হত্যা করতে চায় তাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাই, যাতে আমি আমার উপর অর্পিত প্রভুর দায়িত্ব পালন করতে পারি এবং তিনি (ঈশ্বর) আমার নিজের বা যারা আমাকে সমর্থন করবে তাদের ব্যাপারে যাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা যেন মেনে চলতে পারি"(৪)।

বরাবরের মতই তিনি তাঁর শ্রোতাদের পড়তে দক্ষ ছিলেন। তিনি যদি দেখতেন মানুষ আগ্রহ সহকারে তাঁর কথা শুনছেন, তাহলে কোরআন থেকে কিছু আয়াত আবৃত্তি করে এবং ধর্মের সারসংক্ষেপ তুলে ধরতেন। কোরআন দেখিয়ে তিনি তাদের ব্যাখ্যা করতেন যে, এই 'বিস্ময়কর বইটির' শব্দের পেছনের কর্তৃত্ব সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের, যিনি তাঁর শাশ্বত বাণী এক ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁর রাসূলের কাছে প্রচার করার জন্য পাঠিয়েছেন। "আমি আপনাদের আল্লাহর রাসূল। আমি আপনাদের এক ঈশ্বরের এবাদত করতে বলছি এবং তাঁর সাথে যেন অন্য কাউকে শরীক না করেন এবং তিনি ছাড়া অন্যদেরকে পরিত্যাগ করেন; আর আমার প্রতি আপনাদের বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং আমাকে সুরক্ষা দেন যাতে ঈশ্বর আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা আমি দৃশ্যমান করতে পারি" (৫)।

আরবদের জন্য মুহাম্মদের ধর্মতত্ত্ব ছিল এক জিনিস, আর বাস্তবতা ছিল ভিন্ন জিনিস। তাঁর সুরক্ষার অনুরোধটি রাখতে গেলে এটির স্পষ্ট প্রভাব তারা দেখতে পাচ্ছেন। এর দ্বারা অন্যান্য গোত্রগুলোর সাথে সংঘাতের সৃষ্টি হবে, বিশেষ করে কুরাইশদের সাথে যারা পবিত্র এলাকা এবং সকলের প্রার্থনার কেন্দ্রবিন্দু মন্দিরের অভিভাবক ছিলেন। ফলাফল কি হতে পারে তা ভেবে তারা আগ্রহ হারাচ্ছিল, কিন্তু তারা খুব নম্র ভাষায় কেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পারবেন না তা জানিয়ে দেন। তবে কিছু গোত্র মুহাম্মদকে বলেছিল যে, তারা সেই মুহূর্তে জবাব দিতে পারবে না, কারণ বিষয়টি নিয়ে গোত্রীয় বৈঠকে আলোচনা করতে হবে। তারপর মুহাম্মদ আর তাদের কাছ থেকে কিছু শোনেননি। অন্যরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, তাঁকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে হলে নিজেদের গর্দান দিতে হবে, এবং তিনি তাদেরকে রেখে পালাবেন। আরেকজন জিজ্ঞেস করেন তাদের জন্য কি আছে? তিনি বলেন, "জান্নাত!" বস্তুত, এই প্রস্তাব তাদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল না।

কখনও কখনও এই প্রস্তাবের প্রত্যাখান ছিল সোজাসাপ্টা। ইয়েমেনের এক গোত্র তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, "আপনি আমাদেরকে আমাদের দেবতাদের থেকে দূরে রাখতে এসেছেন, আর আপনি আমাদেরকে নিয়ে আরবদের সাথে যুদ্ধে যেতে চান? আপনি আপনার লোকদের সঙ্গে থাকেন, আপনাকে আমাদের প্রয়োজন নেই" (৬)। কখনও কখনও তীর্থ শিবিরে প্রবেশের সময় লোকে তাঁর দিকে আঙুল তুলে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের বলত : "সাবধান কুরাইশের এই লোকটা যেন তোমাদের নষ্ট না করে" (৭)।

পরিশেষে তাঁর প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতে দেখা গেল যখন উত্তর দিকের আমির গোত্রের (Amir tribe) একটি গোষ্ঠী তাঁর ধর্মের প্রতি অপ্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকেও মেলা এবং তীর্থযাত্রা শেষ হওয়ার পর তাঁকে তাদের এলাকায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। তাদের নেতা বলেন, "যতক্ষণ না আপনি আপনার উপর প্রভুর অর্পিত দায়িত্ব সম্পূর্ণ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপনাকে সুরক্ষা দেবো"। এটি সম্ভব হয়েছিল কারণ, সেই গোত্রের এক নারী মক্কায় তাঁর ধর্মে যোগ দিয়েছিল। অন্যদের ধর্মান্তরিত করতে আগ্রহী মুহাম্মদ তখন গোত্রীয় মেলার মাঠে চলে আসেন এবং ধর্মপ্রচারে শ্রম দিতে লাগলেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে সেটা পন্ডশ্রমই হয়ে যায়। যখন একজন উর্ধ্বতন আদিবাসী নেতা জানতে পারলেন যে, মুহাম্মদ সেই গোত্রের একটি পরিবারের সাথে থাকছেন তখন তিনি সেই পরিবারের উপর ক্ষিপ্ত হন এবং সেখানে গিয়ে মুহাম্মদকে চলে যাওয়ার আদেশ দেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "ওনার লোকেরা ওনাকে খুব ভালো করে চেনে। যদি তারা ওনার মাঝে ভালো কিছু পেত, তাহলে তারা ওনাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি উচ্ছ্বসিত হত। আপনারা কি করে এমন একজন মানুষকে সমর্থন করবেন যাকে ওনার নিজের লোকেরাই অস্বীকার করছে আর গোত্রছাড়া করেছে? আর আপনারা ওনাকে কেনই বা আশ্রয় দেবেন ও সাহায্য করবেন?" তিনি গর্জন দিয়ে মুহাম্মদকে বললেন, "উঠুন, নিজের লোকদের কাছে যান। আমি কসম খেয়ে বলছি, আপনি যদি এই মুহূর্তে আমার আত্মীয়দের মধ্যে না থাকতেন, তাহলে আমি আপনাকে আঘাত করতাম"!

এই ঘটনাটি মুহাম্মদকে একটু বিচলিত করে তোলে। তিনি যখন উটের পিঠে আরোহণ করে স্থান ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ঐ শেখ তাঁর সাথে থাকা বর্শাটি দিয়ে উটটির পেছনে আঘাত করেন, যার ফলে উটটি অস্থির হয়ে যায় এবং মুহাম্মদকে পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এই দৃশ্য দেখে ধর্মান্তরিত মহিলা যিনি তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন, রেগে গিয়ে বলে উঠলেন, "সত্যিই কি আল্লাহর রাসূলের সাথে এমন ঘটনা ঘটতে পারে, এখানে তোমাদের মধ্যে কেউ ওনাকে সুরক্ষা দিচ্ছে না?" এই মহিলার এই কথা শুনে শেখের সাথে বসে থাকা লোকদের সাথে অন্যান্যদের হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। তারা শেখকে মাটিতে ফেলে ধরে রাখেন, আর মহিলার এক আত্মীয় তাঁর বুকে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর মুখে চড় মারেন। অনুকূলে থাকা লোকজনের শক্তি দেখে মুহাম্মদ আনন্দিত হয়ে বলেন, "আল্লাহ এদের মঙ্গল করুন এবং অন্যদের বিনষ্ট করুন" (৮)!

এই ধরনের ধারাবাহিক প্রত্যাখ্যান ও বিপর্যয়ের মুখেও মুহাম্মদ তাঁর বিশ্বাসে অনড় ছিলেন। তাঁর দৃঢ় অবস্থা শেষমেশ সফলতার মুখ দেখল যখন তিনি উত্তরে কৃষি উপনগরী ইয়াছরিবের দুটি আরব গোত্রের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হলেন। এরা ছিল খাজরাজ (Khazraj) এবং আউস (Aws) গোত্র। এই দুটো গোত্র বহুশ্বরবাদীদের একটি অংশ, যারা প্রায়ই একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত অথবা ইহুদি গোত্রদের সাথে যুদ্ধ করত, যাদের সাথে তারা কৃষি জমির জল ভাগাভাগি করতেন। কয়েক বছর আগে মুহাম্মদ তাঁর ধর্মের বাণী নিয়ে আউস গোত্রের নেতাদের সাথে মক্কায় দেখা করে কুরাইশদের সাথে জোট বেঁধে খাজরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে লড়তে আহ্বান করেছিলেন। তবে তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে একজন বলেছিলেন, "আমরা এইজন্য এখানে আসিনি"। এবার উভয় গোত্রের লোকেরা হজ্ব চূড়ান্ত করার পর মক্কার বাইরে মিনায় তীর্থশিবিরে অবস্থান করেন এবং তাঁরা যখন উপাসনার শেষ নিয়ম অনুযায়ী মাথা কামাচ্ছিলেন, মুহাম্মদ তাদের নিকট আসেন। মুহাম্মদ তাঁর পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে তাঁর কথোপকথন শুরু করেন।

মুহাম্মদের পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের মা সালমা খাজরাজ গোত্রের ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা ছিল স্বাভাবিকভাবেই একই বিষয়ে। 'তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত রাসূল, তাঁকে সত্য ধর্মের বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু এর জন্য তাঁকে নির্যাতন করা হচ্ছে এবং তাঁর মিশন সম্পন্ন করার জন্য সুরক্ষার প্রয়োজন'। নবুয়তের দাবির সাথে তারা পরিচিত ছিল। তারা ইয়াছরিবে ইহুদিদের কাছ থেকে একজন নবী আসার ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছিলেন, যিনি আসলে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে দাঁড়াবেন। আউস এবং খাজরাজরা প্রতিবেশী হিসেবে ছিল প্রায় ঝগড়াটে প্রকৃতির। তাঁরা ইয়েমেন থেকে এক শতাব্দীরও বেশি সময় আগে ইয়াছরিবে চলে আসেন, এবং তাদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকায় তারা আউস ও খাজরাজ, দুটো গোত্রে বিভক্ত হয়ে যায়। যদিও ইয়াছরিব একটি বিশাল মরুদ্যান ছিল, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমি এবং জল নিয়ে তারা ইহুদি এবং অন্যদের সাথে প্রায়ই সংঘাতে জড়িয়ে পড়তেন। অবশেষে ইহুদিদেরকে পূর্বদিকের উচ্চভূমিতে যেতে বাধ্য করা হয়। ইহুদিরা প্রায়ই ইয়াছরিবের দুই গোত্রকে হুমকি দিতেন যে, তাদের জন্য একজন দূত পাঠানো হবে যিনি রাজনৈতিক নেতা হবেন, তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে। "শীঘ্রই একজন নবীকে পাঠানো হবে। তাঁর দিন গণনা শুরু হয়েছে, আমরা তাঁকে অনুসরণ করব, তাঁর সাহায্য নিয়ে তোমাদের হত্যা করব" এই বলে তাঁরা সতর্ক করেন (৯)।

মুহাম্মদ ততদিনে ইহুদি নবীদের সম্পর্কে যা জানার তা জেনে গিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে, ইহুদিরা এখনো ত্রাণকর্তা মেসিয়াহর (Messiah) আগমনে বিশ্বাস করে এবং তিনি তাঁর সুবিধার জন্য এই বিষয়টিকে ব্যবহার করেছেন। তিনি ইয়াছরিব তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ছোট একটি দলকে বলেন, তিনিই সেই নবী যার কথা তাদেরকে বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে ইহুদিদের নেতৃত্ব দিয়ে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য পাঠানো হয়নি, বরং তাঁকে পাঠানো হয়েছে ঈশ্বরের সত্য বার্তাকে সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। এটি ইহুদিদের মিশন ছিল, কিন্তু তারা তা নষ্ট করে ফেলেছে। তাই মিশনটি এখন নাজ্জারে (Najjar) অবস্থিত, খাজরাজ গোত্রে জন্মগ্রহণকারী সালমার পুত্র তথা আব্দুল মুত্তালিবের নাতি, একজন আরব নবী মুহাম্মদ গ্রহণ করেছেন!

মুহাম্মদের সাথে বৈঠকে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে ছয়জন ছিল খাজরাজের, এবং কিছু কিছু সূত্র লিখেছে সেখানে আউসের দুজন লোকও ছিল। মুহাম্মদ যা বলেছিলেন তা তারা আগ্রহ নিয়ে শুনছিলেন, কিন্তু তিনি যে সুরক্ষা চেয়েছিলেন তা তাঁরা দিতে সক্ষম ছিলেন না। তাদের সেই কর্তৃত্ব ছিল না, এবং যদি তাঁকে তাদের সাথে এই সুরক্ষা ছাড়া ইয়াছরিব যেতে হয়, তাহলে আন্তঃগোত্রীয় লড়াইয়ের ফলে তাদের দুই গোত্রের মধ্যে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল, মুহাম্মদ হয়তো সেই কলহের মাঝখানে পড়ে যেতেন, এবং তিনি অরক্ষিত থাকতেন। কয়েক বছর আগে খাজরাজ এবং আউস গোত্র একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ লিপ্ত হয়, এই যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ববর্তী দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটে এবং এতে তাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ লোকজন মারা যায়। বহুঈশ্বরবাদীদের সাথে এক ধরণের জোটের কারণে ইহুদিরা অনেক সময়ই যুদ্ধে জড়িয়ে যেত। উপত্যকার সমস্ত গোত্র, বহুঈশ্বরবাদী ও ইহুদিদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ইয়াছরিবে বসবাসকারীরা একজন নেতা খুঁজছিলেন, কিন্তু তাঁকে তারা এখনো খুঁজে পাননি। ইয়াছরিবের সাথে মুহাম্মদের পারিবারিক সম্পর্ক দেখে মুগ্ধ হয়ে এই স্বঘোষিত নবীকে তাদের মধ্যে পেতে তাঁরা আগ্রহী ছিল। তারা প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তাদের গোত্রের লোকদের কাছে তাঁর এবং তাঁর ধর্ম নিয়ে কথা বলবে এবং পরবর্তী তীর্থযাত্রার সময় এসে তাঁর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে।

পরের বছর ১২ জনের একটি দল - তাদের মধ্যে দশজন খাজরাজ এবং দুইজন আউসের - মুহাম্মদের কাছে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করে। এই সভাটি আকাবার (Aqaba) একটি খাঁড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। ঘটনাটি ঘটেছিল পাহাড়ের পাশ ঘিরে মিনায় যাওয়ার পথে, যেখানে পশু উৎসর্গ করা হতো এবং পাথর মারার স্তম্ভ ছিল। ধর্মগ্রহণকারীদের মধ্যে কিছু লোক ছিল যাদের সাথে মুহাম্মদ আগের বছরও আলোচনা করেছেন, তবে তারা তাঁর ধর্মগ্রহণ, নিয়ম-কানুন মেনে চলার অঙ্গীকার করলেও তাঁকে সুরক্ষা দেয়ার মত অবস্থায় ছিলেন না। কিন্তু সংখ্যায় খুব কম হলেও, তাদের ধর্মান্তরিত

হওয়া মুহাম্মদকে ইয়াছরিবে পায়ের নিচে শক্ত ভীত গড়ে দিল, যা শীঘ্রই এক নিরাপদ স্বর্গে পরিণত হবে। নতুন নিয়োগকারীরা চলে যাওয়ার পর নতুনদের কোরআন, ওযু এবং নামাজের নিয়ম শেখাতে মুহাম্মদ মুসআব বিন উমায়েরকে (Musab bin Umayr) সেখানে পাঠান। এই সেই ব্যাক্তি যিনি হুমকি দিয়েছিলেন যে, যদি কেউ তাঁকে মুহাম্মদের ধর্ম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে তবে তিনি তাঁকে হত্যা করবেন।
এদিকে মক্কায় মুহাম্মদের অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। মুতইমের স্বাস্থ্যেরও অবনতি হচ্ছিল, আর মুহাম্মদ নিশ্চিত ছিলেন তিনি মারা গেলে মক্কাবাসীরা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করবে না। মক্কাবাসীরা তাঁকে ও তাঁর লোকদের ক্রমাগত নজরদারিতে রেখেছিল। মুহাম্মদের নিজস্ব সংবাদদাতা, সহানুভূতিশীল বা গোপন অনুসারী ছিল, যারা শহরে তাঁকে নিয়ে মানুষ কি বলছে এবং তাঁকে নিয়ে গোত্রীয় সভায় কি আলোচিত হয়েছিল তা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ তথ্য দিতেন। এর ফলে তিনি জানতেন সামনে বিপজ্জনক অবস্থা তৈরি হবে, কিন্তু পালানোর আগে তাঁকে একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল তৈরি করতে হবে।

ইয়াছরিবে বেশ উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা ঘটতে লাগলো। স্বভাবে আক্রমণাত্মক এবং একইসাথে ভালো গল্প বলিয়ে মুসআব (Musab), স্বল্প সময়ের মধ্যে মুহাম্মদের বারো বছরে করা ধর্মান্তরিত মানুষের চেয়েও বেশি মানুষকে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর ধর্মান্তরিতদের মধ্যে ছিলেন আউস গোত্রের দুইজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা, যারা অন্যদের এই ধর্মে যোগদান করতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সাফল্যের পেছনে বেশকিছু কারণও ছিল। প্রথমত, মক্কার তুলনায় ইয়াছরিবে বহুত্ববাদের চর্চা অনেকটা দুর্বল ছিল। মক্কার মতো পবিত্র মন্দিরকে কেন্দ্র করে ইয়াছরিবে কোন ঐক্যবদ্ধ মন্দির বা সাম্প্রদায়িক আচার-অনুষ্ঠানের জায়গা ছিল না। ইয়াছরিবের বহুঈশ্বরবাদীরা ছিলেন ভাগ্যের দেবী মানাতের ভক্ত, যিনি ছিলেন আল্লাহর তিন কন্যার মধ্যে তৃতীয়। কিন্তু তার অবস্থান ছিল বেশ কিছুটা দূরে, লোহিত সাগরের পশ্চিমে, যেখানে যেতে দু'দিনের মত সময় লাগত। তাদের প্রার্থনার নিয়মে, বহুঈশ্বরবাদীরা মানাত সহ আদিবাসী ও পারিবারিক দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করতেন, যাদের মূর্তিগুলো তাদের বাড়িতেই রাখা হতো। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, ইহুদিদের একেশ্বরবাদী ধর্মের খুব নিকটে তারা বাস করত, কারণ তারা ছিলেন প্রতিবেশী এবং ব্যবসায়িক সহযোগী। সুতরাং তারা ইহুদি ধর্মবিশ্বাস সমন্ধে কিছু না কিছু জানত। বেশিরভাগ সময় তারা তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখত, কারণ তারা মনে করত এই মতবাদটি ভিনদেশ থেকে আনা, কিন্তু মুহাম্মদ যে আরব্য একেশ্বরবাদ প্রচার করছিলেন তা তারা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল।

মুসআবের মতো লোককে ব্যবহার করে মুহাম্মদ তাঁর ক্রমবর্ধমান ইয়াছরিব সমর্থকদের সাথে সমঝোতা করেছিলেন, যাদের তিনি- "সাহায্যকারী" বলে অভিহিত করতেন; যাদের মাধ্যমে তিনি তাঁর ভবিষ্যতের সুরক্ষার বাবস্থা নিশ্চিত করবেন। তিনি দ্রুত কাজ শুরু করতে উদগ্রীব ছিলেন, কিন্তু এটা হতে হবে তাঁর দেয়া শর্ত মতে। তাঁর নিরাপত্তার জন্য লোহার মতো শক্ত নিশ্চয়তার দরকার ছিল, কিন্তু তাঁর চেয়েও বড় কথা, তাদেরকে এমন একটা চুক্তিতে অঙ্গীকার করতে হবে যে, তারা তাঁকে যুদ্ধেও সাহায্য করবে। তাঁর শত্রুদের প্রতি তাঁর ঘৃণা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাঁর ধর্ম গ্রহণ করতে যারা অস্বীকার করেছিল, তিনি তাদেরকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিলেন এবং যারা তাঁর উপর অত্যাচার করেছিলেন, তাদের সাথে যুদ্ধ করার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি যা বলেছিলেন সেটাই করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সময় তিনি শুধু হুমকি দিয়েছিলেন, কারণ তা করার মত সক্ষমতা তখন তাঁর ছিল না। তাঁর জন্য লোকবল দরকার ছিল। তিনি যদিও সেই সময় স্পষ্টভাবে কাউকে তাঁর পক্ষে লড়াই করতে বলেননি। তাঁকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য তিনি যে জোট খুঁজছিলেন, সেটা বেশ স্পষ্ট ছিল; সেই ইঙ্গিত গোত্র এবং গোত্ররা বুঝতে পেরেছিল বলেই তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু এখন তিনি প্রকাশ্যে যুদ্ধাভাবাপন্ন মনোভাব প্রকাশ করছেন। তিনি মুসআবকে নতুন ধর্মান্তরিতদের মধ্যে যুদ্ধের ধারণাটি ঢুকিয়ে দিতে নির্দেশ দেন, এবং যখন মুসআব দেখলেন অনুসারীরা যুদ্ধ করতে সম্মতি দিলেন, তিনি মুহাম্মদের কাছে এই খবর পাঠালেন। এই খবর শুনে মুহাম্মদ আবু বকরকে ঘোষণা করলেন যে, তিনি এইমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে একটি নতুন নির্দেশিকা পেয়েছেন: "আমাকে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে!" এটিকে ঐশ্বরিক ছাপ দিতে, তাড়াতাড়ি কোরআনে রচিত হয়ে গেল **"যুদ্ধের**

অনুমতি দেয়া হল তাদের, যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। কারণ তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দানে সক্ষম" (১০)।

মুহাম্মদ একটি আনুষ্ঠানিক ও বাধ্যতামূলক অঙ্গীকার চেয়েছিলেন। পরবর্তী তীর্থ মৌসুমে ৭৩ জন পুরুষ এবং দুইজন নারীসহ মোট ৭৫ জন ব্যক্তিগতভাবে তাদের আনুগত্যের অঙ্গীকার করতে মক্কায় গিয়েছিলেন। সন্দেহ এড়াতে তারা ইয়াছরিবের বহুঈশ্বরবাদীদের সাথে তীর্থযাত্রার অনুষ্ঠানে অংশ নেয়, যারা তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। মুসআবের সাথে আগেই সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কোরবানির পশু বলির আগের রাতেই তারা মুহাম্মদের সাথে যোগ দেয়। এটি এক আদর্শ সময়, কারণ বলিদানের পর তীর্থযাত্রীরা তিনদিন পর্যন্ত খাওয়াদাওয়া, মদ্যপান, ঘুম এবং যৌনমিলনে ব্যস্ত থাকত। আর তাই তারা সম্পূর্ণ ক্লান্ত অবস্থায় রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যেত। এইভাবে মধ্যরাতে যখন বাকি সবাই গভীর ঘুমের মধ্যে ছিল, তখন ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের শিবির থেকে উঠে ছোট ছোট দলে আকাবার (Aqaba) খাঁড়িতে চলে যায়, যেখানে মুহাম্মদ এক বছর আগে বারোজন ইয়াছরিবীকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন।

মুহাম্মদের সাথে ছিলেন তাঁর এক চাচা আব্বাস। যদিও তখনও তিনি ধর্মান্তরিত হননি, তবে আব্বাস মুহাম্মদের সাথে অনেকটা সময় অতিবাহিত করেন এবং তাঁর বিশ্বস্ত উপদেষ্টা হয়ে ওঠেন। মুহাম্মদের শত্রুদের সাথে আব্বাসের ব্যবসায়িক সম্পর্কের কারণে তিনি মুহাম্মদের সেরা সংবাদদাতা ছিলেন, যিনি তাঁকে তাদেরই একজন হিসেবে গণ্য করতেন। ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে অথবা তাঁর লোকজনকে অনুসরণ করার ভয়ে মুহাম্মদ অন্য কারো কাছে এই সাক্ষাতের কথা প্রকাশ করেননি, এমনকি আবু বকর বা আলীর কাছেও নয়। ইয়াছরিবের ধর্মান্তরিতরা একত্রিত হওয়ার পর আব্বাস একটি পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন, যেখানে তাদের সমাবেশের কারণ বর্ণনা করেন। প্রয়োজনে মুহাম্মদের পক্ষে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য মুহাম্মদের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকারের কথা বলেন এই বলে যে, "আপনারা যদি মনে করেন যে, তাঁকে বিরোধীদের হাত থেকে রক্ষা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাহলে ধরে নিন আপনি সেই বোঝা ইতিমধ্যেই বহন করছেন। কিন্তু যদি আপনি মনে করেন, আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন এবং আপনাদের কাছ থেকে চলে যাওয়ার পর তাঁকে পরিত্যাগ করবেন, তাহলে তাঁকে এখনই ছেড়ে যান। কারণ তিনি যেখানে আছেন, সেখানেই নিরাপদে আছেন" (১১)।

তাদের মধ্যে একজন মুহাম্মদকে কিছু কথা বলার জন্য চিৎকার করে উঠলেন। মুহাম্মদ এগিয়ে এলেন, কিছু সূচনা বক্তব্য রাখলেন, কোরআনের আয়াত আবৃত্তি করে বললেন, "আমি আপনাদের আনুগত্যের আহ্বান জানাচ্ছি; আপনারা আমাকে ঠিক সেই রকমভাবে সুরক্ষা দেবেন, ঠিক যেইভাবে আপনারা নারী ও সন্তানদের রক্ষা করেন"।

খাজরাজের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন যে, তাঁর গোত্রের ধর্মান্তরিতরা মুহাম্মদের শর্ত মেনে নিয়েছে। "আমরা আমাদের আনুগত্য প্রকাশ করছি, এবং আমরা সেই অস্ত্রধারী যোদ্ধা, যাদের অস্ত্র ঐতিহ্যগতভাবে পিতা থেকে পুত্রের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে" বললেন তিনি। তবে আউসের একজন নেতা সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে মনে করিয়ে দিলেন : মনে রাখতে হবে, জলাধারের (oasis) পাশে বসবাসরত তিনটি ইহুদি গোত্রের সাথে আমাদের দীর্ঘদিনের জোট ছিল। যদি আমরা মুহাম্মদকে অনুসরণ করি, তাহলে আমাদের পূর্ববর্তী বন্ধন ছিন্ন করতে হবে, সাবেক মিত্রদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে এবং তাঁর ফলে হয়তো অপ্রত্যাশিত পরিণাম ভোগ করতে হতে পারে। তিনি মূলত মুহাম্মদের কাছ থেকে একটি নিশ্চয়তা চেয়েছিলেন যে, মুহাম্মদ যদি আল্লাহ'র সাহায্য নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে যান, তাহলে যেন তাদের পরিত্যাগ না করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি আপনার লোকদের কাছে ফিরে যাবেন এবং আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন?"

তাদের আশ্বস্ত করে মৃদু হেসে মুহাম্মদ বললেন, "আমি আপনাদের এবং আপনারা আমার একজন। আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যারা আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং যারা আপনাদের সাথে শান্তিতে থাকবে, আমিও তাদের সাথে শান্তিতে থাকব" (১২)।

আরেকজন ব্যক্তি দলটিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, তাদের যেন ভ্রম ভাঙ্গে যে তারা কিসের সাথে জড়াচ্ছে, এবং তিনি বললেন : "হে খাজরাজের লোকেরা, আপনারা কি বুঝতে পারছেন যে, এই লোকটির প্রতি আপনার সমর্থনের অঙ্গীকার করার জন্য আপনাদের কি কি অঙ্গীকার করতে হচ্ছে? এটা হচ্ছে সকলের বিরুদ্ধে আলাদাভাবে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার"। যার মানে হচ্ছে অনন্তকালের যুদ্ধ, সমগ্র মানবজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যতদিন না পুরো বিশ্ব অধীনে আসে (১৩)।

মুহাম্মদ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য জান্নাতে একটি স্থান দেয়া হবে। এই কথা শুনে একজন ধর্মান্তরিত ব্যক্তি এতটাই উৎসাহী হয়ে ওঠেন যে, তিনি পরামর্শ দেন যে তাঁরা সকালেই মিনার নিকটবর্তী তীর্থ শিবিরে তীর্থযাত্রীদের জবাই করবে। মুহাম্মদ অবশ্য তাঁর উত্তেজনা প্রশমিত করেন এই বলে যে, আল্লাহ এখনও তাদের তা করতে নির্দেশ দেননি। জান্নাতের প্রতিশ্রুতিই এই চুক্তিতে সিলমোহর দিয়েছিল। একের পর এক তাঁরা এগিয়ে এসে মুহাম্মদের হাত ধরে এবং তাঁকে রক্ষা করার, তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করে তাঁর ধর্ম প্রতিষ্টা করার এবং তাঁর ধর্মের নির্দেশ মেনে চলবে বলে অঙ্গীকার করেন। তিনি প্রতিজ্ঞারত প্রত্যেক পুরুষকে তাঁর হাত ধরতে দিলেন, কিন্তু তিনি দুই নারীকে তাঁকে স্পর্শ করা থেকে বিরত রাখলেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে মুহাম্মদ তাঁর প্রথম আদেশ জারি করলেন যে, অঙ্গিকারকারীরা বারোজন নেতা নির্বাচন করবে। এই নেতারা হবেন অনেকটা 'যীশুর বারো জন শিষ্য' (হাওয়ারী) বা ইহুদিদের বারো গোত্রের মতই। যেমন বারোজন শিষ্য যীশুর কাছে ও বারোটি গোত্র মুসার কাছে জবাবদিহি করতেন, তেমনি এই বারোজন নেতাও মুহাম্মদের কাছে জবাবদিহি করবেন। নির্বাচিত হওয়ার পর মুহাম্মদ অঙ্গিকারকারীদের ইয়াছরিবে ফিরে যেতে বলেন এবং পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করার নির্দেশ দেন।

এত সতর্কতা সত্ত্বেও, মক্কাবাসীরা এই বৈঠকের কথা জানতে পারে এবং পরেরদিন সকালে তাদের একদল নেতা যুদ্ধের ঘোড়ায় চড়ে খাজরাজ শিবিরে ঢুকে ব্যাখ্যা দাবি করে। "হে আল-খাজরাজের জনগণ, আমাদের কাছে তথ্য এসেছে যে, আপনারা গতরাতে আমাদের লোকের সাথে দেখা করেছেন এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শপথ নিয়েছেন" অভিযোগ ছুঁড়ে দেয়া হল (১৪)। খাজরাজের তীর্থযাত্রীদের অধিকাংশই এ ব্যাপারে কিছুই জানত না, তাই এই অভিযোগে শুনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। যারা জানত তাঁরা মুখ বন্ধ করে রেখেছিল। মক্কাবাসীরা পিছিয়ে যায়, কিন্তু তাঁরা নিশ্চিত ছিল যে একটি ষড়যন্ত্র চলছে। আর তাই তাঁরা অন্যান্য গোত্র এবং গোত্রের লোকেদের সাথে এই বিষয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছিল। সাধারণ হলেও একটি চুক্তি যে হয়েছিল সে বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন।

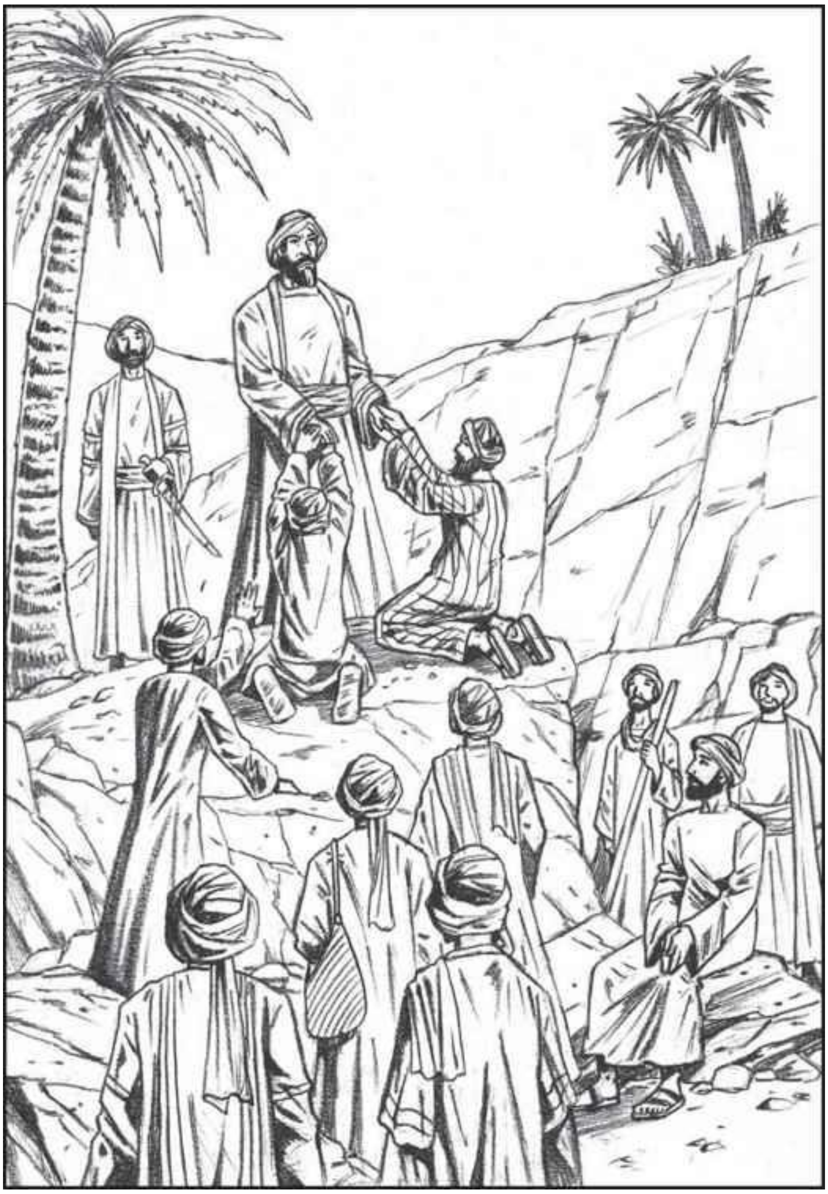
ইয়াছরিব তীর্থযাত্রীদের প্রধান যারা ছিলেন তারা তখন মিনায় (mina) একটি শিবিরে অবস্থান করেছিলেন, কিন্তু খাজরাজ এবং আউস গোত্রের ভেতর যারা ষড়যন্ত্র করে তীর্থযাত্রায় প্রবেশ করেছিল তাঁরা ইতোমধ্যেই শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এই কথা জানতে পেরে মক্কাবাসীরা তাদের পিছু নেয়। তাঁরা ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে দুজনকে আটক করে। একজন হচ্ছে সাদ বিন উবাদা, ইয়াছরিবের একজন ব্যবসায়ী এবং খাজরাজের গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং অন্যজন মুনযির বিন আমর, তবে তিনি পরে পালাতে সক্ষম হন। মক্কাবাসীরা সাদকে তাঁর ঘাড়ের পেছনে হাত বেঁধে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু তিনি দাবি করেন তাঁকে এভাবে আটক করা অনুচিত, কারণ তিনি মুহাম্মদের রক্ষক মুতইম বিন আদির অন্যতম পুত্র জুবায়ের ইবনে মুতইমের সাথে সুরক্ষার চুক্তি করেছেন। এদিকে তিনি আবার তিনি ছিলেন আবু সুফিয়ানের এক ঘনিষ্ঠজন হারিছের (Harith) আত্মীয়। তিনি তাদের কাছে নিরাপত্তার প্রাপ্য, কারণ সাদ তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন যখনই তাঁরা ব্যবসার জন্য ইয়াছরিবে যেতেন। দু'জন মক্কাবাসী সাদের দাবির সত্যতা নিশ্চিত করেছে এবং সাদকে ঠিক

সময়মতই মুক্তি দেয়া হয়, যখন তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে মুক্ত করার জন্য মক্কায় হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সাদের সঙ্গীরা পালিয়ে বেঁচে যাওয়া মুনযিরের কাছ থেকে সাদের আটক হবার কথা জানতে পেরেছিলেন এবং তাঁকে উদ্ধারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন (১৫)।

ইয়াছরিবে ধর্মান্তরিতদের আনুগত্যে উৎসাহিত হয়ে মুহাম্মদ তাঁর মক্কাবাসী অনুসারীদের হিজরত করার আদেশ দিয়েছেন। অলৌকিকতার প্রমাণ হিসেবে তিনি তাদের বলেন: "আমাকে হিজরতের স্থানটি দেখানো হয়েছে; আমাকে দুই পাথরের মাঝখানের একটি লবণাক্ত সমভূমি দেখানো হয়েছে, যার দুই পাশে খেজুর গাছ দিয়ে ভরা"। তিনি আসলে প্রাচীন লাভার বিছানার কথা বলেছেন, যা ইয়াছরিবকে পূর্ব এবং পশ্চিমে ঘিরে রেখেছিল (১৬)। এইভাবে মক্কা থেকে দ্বিতীয়বার নির্বাসন শুরু হয় এবং বিশ্বাসীরা আগের অভিবাসীদের মতই একই কৌশল ব্যবহার করেন - তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে যাত্রা করেন। ইয়াছরিবে ঢুকেই তাঁরা 'সাহায্যকারীদের' সাথে যোগ দেন। মুহাম্মদ এখন তাঁর নতুন মিত্র এবং ধর্মান্তরিতদের নাম দিয়েছেন সাহায্যকারী (আনসার)। এই নির্বাসিতদের মধ্যে অনেকেরই মুহাম্মদের রচিত কোরানের কিছু অংশ বা পুরোটা মুখস্থ ছিল, তাই তারা নতুনদের সাথে যোগ হয়েই তাদেরকে কোরআন শেখাতে থাকেন। পরবর্তী দুই মাসে সত্তর থেকে একশজনের মতো অনুসারী উত্তরে স্থানান্তরিত হয়েছেন। মুহাম্মদও আবিসিনিয়াতে অবস্থানরত অনুসারীদের বার্তা পাঠান যে, তাদের এখন ইয়াছরিবে আসার জন্য 'আল্লাহর অনুমতি' আছে। কিছুদিনের মধ্যেই আবিসিনিয়ায় থাকাদের কেউ কেউ ইয়াছরিবে আসতে শুরু করেন। মুহাম্মদ তাঁর মক্কাবাসী অনুসারীদেরকে ইয়াছরিবী সাহায্যকারীদের থেকে পার্থক্য করার জন্য একটি নাম দিয়েছিলেন। যাদের নাম হয়েছে মুহাজির বা 'হিজরতকারি'।

এই হিজরত সবার জন্য মসৃণভাবে হয়নি। যখন মক্কাবাসীরা আবিষ্কার করে যে সোহাইব (Sohayb) নামের ধর্মান্তরিত মুক্ত ক্রীতদাস, যার ডাকনাম ছিল 'রোমান', হিজরতের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন তারা তাঁকে অকৃতজ্ঞ বলে। তাঁর জন্য তাদের অবদান ভুলে যাওয়ার জন্য তাঁকে তিরস্কার করে, এবং বন্দি করে। বাইজান্টিয়ামের (Byzantium) কোথাও তিনি শিশু হিসেবে ধরা পড়েন, তাঁকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করার জন্য মক্কায় আনা হয়, কিন্তু পরে তাঁকে স্বাধীন করে দেয়া হয় এবং তাঁর প্রাক্তন মালিকের সুরক্ষার অধীনে থেকে তিনি উন্নতি লাভ করেন। মক্কাবাসীরা শুধু তখনই তাঁকে চলে যাওয়ার (হিজরতের) অনুমতি দেয়, যখন তিনি তাঁর কাছে জমা রাখা টাকা ফিরিয়ে দিতে সম্মত হন (১৭)। প্রথমদিকের ধর্মান্তরিতদের একজন এবং আবুল হাকামের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আয়াশ (Ayyash) উমরের সাথে গোপনে ইয়াছরিবের পথে যাত্রা করেন, কিন্তু আবুল হাকামের সহযোগীরা তাঁকে অপহরণ করে মক্কায় ফিরিয়ে আনে, এবং তাঁকে বন্দি করে রাখা হয় যতক্ষণ না তিনি মুহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ করেন। আবুল হাকাম মক্কাবাসীদের উপদেশ দেন, "আপনারা আপনাদের মূর্খদের সাথে মোকাবেলা করুন, যেমনটা আমরা আমাদের এই নির্বোধদের মোকাবেলা করেছি" (১৮)। আয়াশ পরে ইয়াছরিবে পালিয়ে যান, কিন্তু তিনি ভয় পেয়েছিলেন এই ভেবে যে, তিনি মুহাম্মদের নিন্দা করার জন্য হয়ত জাহান্নামের আগুনে জায়গা করে নিয়েছিলেন, যদিও তা জোরপূর্বক করানো হয়েছিল। মুহাম্মদ তাঁকে এটা নিয়ে চিন্তা না করতে বলেন; কারণ চাপের মুখে ধর্মত্যাগী হওয়ার ভান করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তা জানতেন এবং অনুমোদন দিয়েছিলেন।

আকাবার বৈঠকের পর মুহাম্মদ তিন মাসের মতো মক্কায় অবস্থান করেন, ব্যক্তিগত বিষয়যদি গুছিয়ে নিতে, বিশেষত থেকেছেন বিশ্বাসীদের হিজরতের তত্ত্বাবধান করার জন্য। তিনি তাঁর অনুসারীদের বললেন যে, ঈশ্বর এখনও তাঁকে চলে যাওয়ার আদেশ দেননি। তিন মাসের শেষে মক্কায় আর কোনো অনুসারী ছিল না। শুধুমাত্র তিনি, আবু বকর, আলী এবং তাদের পরিবার, মুষ্টিমেয় কর্মচারীরা এবং অল্প কিছুসংখ্যক বিশ্বাসী রয়ে গেলেন, যারা হয় বন্দি হয়েছিলেন অথবা মক্কা ছেড়ে যাওয়ার কথা ভেবে অসহায় বোধ করছিলেন।



[আকাবার অঙ্গীকারঃ মুহাম্মদ ইয়াছরিবের সমর্থকদের কাছ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি লাভ করেন; এবং এই ইয়াছরিব পরে মদিনা নামে পরিচিতি পায়। ছয় ডজন লোক তীর্থযাত্রী হিসেবে ছদ্মবেশ ধরে তাঁর ধর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়, যারাই তাঁকে অস্বীকার করবে তাদের সকলের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এই শপথ করে। এই অঙ্গীকার মূলত মানবজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা, যা স্থায়ী হবে যতক্ষণ না বিশ্বের সকল মানুষ তাঁর ধর্ম গ্রহণ করবে এবং তাঁকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করবে। এ সময়ের মধ্যে মুহাম্মদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। মুতইম মারা যান এবং মুহাম্মদ যেমনটা ভেবেছিলেন, তাঁর ছেলেরা সুরক্ষা প্রত্যাহার করে নেয়। যদিও সে এখন উন্মোচিত হয়ে গেছে, সুরক্ষাহীন, তবুও মক্কাবাসীরা তাঁকে মেরে ফেলার জন্য গড়িমসি করছিলেন।]

সেই সময়ে মুহাম্মদের নিরাপত্তা ভেঙ্গে পড়েছিল। মুতইম মারা যান, আর মুহাম্মদের আনুমান মতোই তাঁর ছেলেরা তাদের প্রতিরক্ষা তুলে নেন। এমনকি যদিও তিনি এখন উন্মুক্ত হয়ে পড়েছেন, তবু মক্কাবাসীরা তাঁকে হত্যা করতে ইতস্তত করছিল। কিছু নেতারা তাঁকে হত্যা করার বিরোধিতাও করছিলেন গৃহযুদ্ধের ভয়ে এবং প্রতিহিংসার চক্রে হয়তো আটকে যাবেন, এই যুক্তিতে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তাদের পরিস্থিতি ডুবতে শুরু করেছিল। বছরের পর বছর ধরে তাদের নিষ্ক্রিয়তার ছাতার তলায়, মুহাম্মদ এখন ইয়াছরিবে তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতার একটি কেন্দ্রীভূত গোত্র তৈরি করেছেন, যাদের যুদ্ধবাজের খ্যাতি

ছিল, মক্কাবাসীরা এটাই ভয় পাচ্ছিলেন। যার ফলে তারা শেষ পর্যন্ত আক্রান্ত হতে পারে এবং তাদের বাণিজ্যও বিপন্ন হতে পারে। তাদের কাফেলারা হয় ইয়াছরিবের ভেতর দিয়ে, বা তাঁর আশেপাশে চলাফেরা করত। তারা যে পথেই থাকুক না কেন, তারা ইয়াছরিবের আওতার মধ্যেই থাকতেন। এই উপলব্ধি তাদের মেরুদণ্ডকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তাদের অস্তিত্ব বাণিজ্যের উপর নির্ভর করত। পশুপালকদের মাংস এবং দুধ ব্যতিরেকে তাদের সমস্ত খাদ্য আমদানি করতে হত। তার মানে পণ্য কেনার জন্য টাকা দরকার। মন্দির এবং তীর্থযাত্রার রাজস্ব ছাড়াও, তাদের অর্থ আসত বৃহত্তর সিরিয়ার সাথে বাণিজ্যের মাধ্যমে। যদি বাণিজ্যের সেই পথ হারিয়ে যায়, তাহলে শহরটি ধীর গতিতে মরে যাবে। তবে অনেক দেরি হওয়ার আগেই তাদের মুহাম্মদের বিহিত করতে হবে।

মক্কাবাসীরা একটি জরুরি মিটিংয়ের আহ্বান জানায়। তাতে রাবিয়া ভ্রাতৃদ্বয়, আবু সুফিয়ান, আবুল হাকাম, নাদের আল-হারিছ, উমাইয়া বিন খালাফ, উকবাহ ইবনে মুয়াইত এবং আরও ডজনখানেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে মুতইম আদির এক ছেলে এবং এক ভাইও ছিলেন। মুহাম্মদের প্রতি তাদের ক্ষোভ জোরালো হয়ে উঠল যখন তাঁরা বিগত দশকে তাঁর সৃষ্ট সকল বিঘ্ন এবং সংঘাতের কথা স্মরণ করলেন। তাঁরা জানত যে, তাদের একটা কিছু করতে হবে, কিন্তু কি করতে হবে তাতে তাঁরা একমত হতে পারছিল না। কেউ কেউ তাঁকে ঘরে বন্দি রেখে চাবি দূরে ফেলে দেয়ার পরামর্শ দিল। তারা অন্যান্য ঝামেলাকারীদের সাথে এমনটাই করছেন, কিন্তু এই ধারণাটি গ্রহণ করা হলো না, কারণ তাঁর অনুসারীরা সম্ভবত তাঁকে মুক্ত করার জন্য মক্কা আক্রমণ করবে। তারপর তাঁকে নির্বাসিত করবে। অন্য আরেকজন পরামর্শ দিল, “সে যদি চলে যায় তাহলে আমরা তাঁর থেকে মুক্তি পেয়ে যাব এবং আমরা আগের মতই আমাদের কাজে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হব” (১৯)। সেই পরামর্শটিও খারিজ হয়ে যায়। তাহলে এটি ইয়াছরিবের লোকজনকে দিয়ে মক্কার বিরুদ্ধে ঝামেলা সৃষ্টি করার জন্য সুযোগ করে দেবে, যেটা মুহাম্মদ চাচ্ছিলেন। আবুল হাকাম যুক্তি দেখান, একমাত্র উপায় হচ্ছে মুহাম্মদকে হত্যা করা, কিন্তু একজন এই কাজটি করতে পারবে না, তাদের দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া উচিত। তিনি প্রত্যেক গোত্রের একজন পুরুষ বেছে নিলেন - যারা বয়সে তরুণ, শারীরিকভাবে শক্তিশালী। তারা একসাথে তাঁকে তলোয়ার ঢুকিয়ে দেবে এবং একইভাবে হাশিমি গোত্র বাদে সকল মক্কাবাসী গোত্র মুহাম্মদের রক্তের জন্য দায়ী থাকবে। আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরদের কি সবার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সাহস হবে? তখন রক্তের টাকা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না, এবং অংশগ্রহণকারী সকল গোত্রই এই অর্থ প্রদানে অবদান রাখবে। এই কথামতেই আলোচনা শেষ হল। মক্কাবাসী আবুল হাকাম যেভাবে মুহাম্মদকে হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেইভাবে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করতে রাজি হয়েছিলেন। মক্কায় এই কথা গোপন রাখা কঠিন ছিল। খাদিজার বাড়িতে অবস্থান নেয়া মুহাম্মদ এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরেই পালানোর পরিকল্পনা করেন। তিনি মনে করেছিলেন আততায়ীরা সম্ভবত রাতে বাড়িতে ঢুকে সে যখন ঘুমিয়ে থাকবে তখন আক্রমণ করবে। তিনি আলীকে আদেশ দিলেন চামড়ার চাদরের নিচে বিছানায় শুয়ে থাকতে। হয় মুহাম্মদ তাঁর চাচাত ভাইকে তাঁর ধর্মের জন্য উৎসর্গ করতে চেয়েছে, অথবা তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, মক্কাবাসীরা তাদের তলোয়ার হঠাৎ কম্বলের নিচে ঢুকিয়ে দেবে না। তারা অবশ্যই কম্বলটা টেনে দেখবে, নিচে কে শুয়ে আছে। ইতোমধ্যে মুহাম্মদ, সম্ভবত মহিলাদের পোশাক পরে নেন এবং একটি পর্দা পরেন, যাতে তাঁর বাড়ির আশপাশের লোক চিনতে না পারে, সেখান থেকে লুকিয়ে তিনি আবু বকরের বাড়িতে চলে গেলেন।

সম্ভবত সরল মুখে মুহাম্মদ তাঁর বন্ধুকে জানান যে, ঈশ্বর তাঁকে ইয়াছরিবে হিজরত করার আদেশ দিয়েছেন এবং আবু বকরকে তাঁর সঙ্গী হতে হবে। যখন মুহাম্মদ তাঁকে বললেন যে, ঈশ্বর তাঁর নাম সঙ্গী হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তখন আবু বকর এতটাই অভিভূত হয়ে গেলেন যে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

তাদের নষ্ট করার এত সময় ছিল না। মক্কাবাসীরা এই প্রতারণা আবিষ্কার করার সাথে সাথে তল্লাশি শুরু করবে। মুহাম্মদ এটা ভেবেছিলেন, তাঁর শত্রুরা জানত যে তিনি ইয়াছরিবের দিকে যাচ্ছেন, তাই তারা প্রথমে উপত্যকার উত্তর অংশ এবং

ইয়াছরিবের দিকে যাওয়ার রাস্তায় তল্লাশি করবে। মুহাম্মদ ও আবু বকর তাই পায়ে হেঁটে প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণে চলে গেলেন এবং একটা গুহায় লুকিয়ে ছিলেন। শুধুমাত্র আবু বকরের কিশোরী কন্যা আসমা (Asma), তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ এবং তাঁর ব্যক্তিগত দাস আমির ফুহায়রা (Amir Fuhayra) তাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতেন। গোপন আস্তানায় যাওয়ার আগে আবু বকর একজন বেদুইন পথ প্রদর্শককে ভাড়া করেন, যিনি দুটি অশ্বারোহী উট নিয়ে তাদের কাছে সময়মত আসেন এবং এই বেদুইন পাহাড় ও উপত্যকার পেছনে দিয়ে তাদের ইয়াছরিবে পৌঁছে দিয়েছিলেন।



[মুহাম্মদ ইয়াছরিবে পালিয়ে গেলেন। মুহাম্মদের ধর্মপ্রচারের প্রচেষ্টায় উদ্বিগ্ন হয়ে মক্কাবাসী নেতারা তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন এবং তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু আবু বকরের সাথে মক্কা থেকে পালিয়ে যান। তাঁরা দুজন তিনদিন একটি গুহায় লুকিয়ে ছিলেন এবং উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে মরুভূমি দিয়ে রওনা দেন এবং রাতে রওনা দেয় সনাক্তকরণ এড়াতে। দুই সপ্তাহের যাত্রার পর ইয়াছরিবে পৌঁছে যান, যেখানে তিনি পরবর্তী দশ বছর থাকবেন।]

যখনই মক্কাবাসীরা বুঝতে পারল যে, তাদের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে, তখনই মুহাম্মদের মাথার দাম ধার্য করা হলো - যে কেউ তাঁকে ধরে নিয়ে আসবে, তাঁর জন্য থাকবে একশোটি উট। প্রচন্ড সূর্যের তাপের মধ্যেও তাঁরা মক্কার চারিপাশে প্রতি মাইল খুঁজতে থাকে। কিছু জানতে পারে এমন সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। মুহাম্মদ ও আবু বকর গুহার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পরেরদিন আবুল হাকাম আবু বকরের বাড়িতে এসে আসমার কাছ থেকে তাঁর অবস্থান জানতে চান। আসমা বলেন তিনি জানেন না। এই কথা শুনে আবুল হাকাম তাঁর মাথার একপাশে আঘাত করেন, কিন্তু কোন লাভ হয়নি, সে তবুও কথা বলেনি। মুহাম্মদ ও আবু বকর তিনদিন গুহায় ছিলেন। আসমা তাদের খাদ্য ও জল নিয়ে আসেন যা তাদের যাত্রাপথের জন্য দরকার ছিল। যাওয়া-আসার সময় তিনি একটি ছাগলের পালের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতেন, যাতে কেউ

তাঁর পদচিহ্ন খুঁজে না পায়। ছাগলগুলোর দেখাশুনা করা সেই মেষপালক নিজেও পালাচ্ছিলো। মক্কায় আবু বকরের ছেলে আবদুল্লাহ শহরবাসীর সাথে মিশে জানার চেষ্টা করতেন তাঁরা কি করতে চাচ্ছে এবং প্রতিরাতে মুহাম্মদের কাছে তথ্য দিতেন। একপর্যায়ে একটি অনুসন্ধানকারী দল গুহার কাছাকাছি চলে আসে, কিন্তু প্রবেশপথটি উপেক্ষা করে চলে যায়। তৃতীয়দিনে যখন অনুসন্ধানকারীরা সব জায়গা দেখা শেষ হয়েছে বলে ভেবে নেয়, তাঁরা হাল ছেড়ে দেয়। তখন বেদুইন পথপ্রদর্শক ও আবু বকরের দাস আমির ফুহায়রা তাদের উট নিয়ে হাজির হয় এবং এই চারজন ইয়াছরিবের দিকে যাত্রা শুরু করেন।

পথপ্রদর্শক তাদের প্রথমে আরো দক্ষিণে নিয়ে গেল, এবং পরে পশ্চিমে ফিরে যাত্রা শুরু করল। উত্তর দিকে মোড় নেয়ার আগে তারা লোহিত সাগরের দিকে অর্ধেকটা পথ পাড়ি দিলেন। সমস্ত পথ আঁকাবাঁকা চলতে থেকে তাঁরা প্রায় দুই সপ্তাহ সফর করলেন। তাদের যাতে কেউ খুঁজে না পায় এজন্য তাঁরা মূলত মানববসতিহীন এলাকা দিয়ে যাচ্চিলেন। অবশেষে তাঁরা ইয়াছরিব পৌঁছলেন; ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত কিন্ত বিপদমুক্ত। আবু বকর তাঁর সর্বশেষ সম্বলটুকু নিয়ে এসেছিলেন। বছরের পর বছর ধরে মুহাম্মদের ধর্মের জন্য মূল্য দিতে গিয়ে তাঁর সম্পদ চল্লিশ হাজার দিরহাম থেকে ছয় হাজার দিরহামে নেমে আসে। জল, চামড়ায় মোড়ানো জিনিসপত্রের মাঝে মোটামুটি পঞ্চাশ পাউন্ড রূপার মুদ্রা গুজে উটে বোঝাই করে নিয়ে আসেন। মুহাম্মদ পরবর্তীতে তাঁর রচিত কুরানে পালিয়ে আসার এই ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করেন। ওনার ঈশ্বরের কণ্ঠে উনি বললেনঃ "আর যখন কাফিররা তোমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছিল, তোমাকে বন্দি করতে অথবা তোমাকে হত্যা করতে কিংবা তোমাকে তাড়িয়ে দিতে। আর তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও ষড়যন্ত্র করেন। আল্লাহ হচ্ছেন ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে উত্তম" (২০)।

হেরা পর্বতের গুহার অভিজ্ঞতা লাভের পর তেরোটি বছর পার হয়ে গেছে। সেই সময়ে তিনি আরো বেশি উজ্জ্বল আলো ঝলমলে আকৃতি, এবং আরো অদ্ভুদ সব শব্দ শুনেছিলেন (২১), তিনি সেসবের অর্থ নিয়ে ভুল সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। সংঘাতের সময়কালীন রচিত আয়াতের অর্ধেকের বেশি পরে তাঁর কুরানে সন্নিবেশিত হয়েছিল, আর সেই আয়াতসমূহ আর সেগুলোর বিরোধিতাকারীদের প্রতি সংঘর্ষ উস্কে দেয়ার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর ধর্মের ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন। মুহাম্মদের মাঝে বিগলিত ঘৃণা দিয়ে পূর্ণ, উত্তপ্ত লাভার একটি প্রকোষ্ঠ তৈরি হয়েছিল। এটি ক্রমশ উপরদিকে বেরিয়ে আসতে চাপ দিচ্ছিল। এমনকি তেপ্পান্ন বছরের পুরোনো বাড়িঘর ফেলে আসার পরেও, স্বর্গ থেকে মক্কাবাসীদের উপর বর্ষিত অভিশাপের মাঝে তাঁর এই ঘৃণার লাভা টের পাওয়া যাচ্ছিল। হাতের তালুতে দুই কান ঢেকে, উটের মত হাঁটু গেড়ে বসে, দুই বাহু দুই পাশে মেলে দিয়ে শরীর সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে, কপাল মাটিতে স্পর্শ করার ভঙ্গিতে, তিনি মক্কাবাসী আর তাদের প্রথম সন্তানের মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করতেন; তিনি তাদের উপর প্লেগ, গুটিবসন্ত আর দুর্যোগের শাস্তির জন্য প্রার্থনা করতেন। "হে ঈশ্বর, তুমি তাদের উপর যোসেফের (Joseph) মতো আমার জন্য সাতটি বছর প্রদান করো" (২২)।

এটা ছিল খ্রিস্টীয় ৬২২ সাল, কিন্তু মুহাম্মদের অনুসারীরা ইয়াছরিবে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকেই তাদের বর্ষপঞ্জিকার গণনা শুরু করে। তারা এটাকে হিজরতের বছর বলে থাকে। এটাই হল মুহাম্মদের ঈশ্বরের ধারণার উপর নিজেকে সমর্পণের প্রথম বছর। এটিই ছিল সেই বছর, যখন মুহাম্মদ তাঁর ঈশ্বরের ধারণার কাছে মাথানত করতে অস্বীকার করা সবার উপর এবং বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এটি ছিল পুরো বিশ্বের উপর যুদ্ধের বছর।

পর্ব – ২

গোধূলিবেলা

অধ্যায় - ১৩
আল কায়েদা

দিনের বেলায় লুকিয়ে থেকে এবং রাতের বেলায় যাত্রা করে অবশেষে মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা একটি সংকীর্ণ পাহাড়ের পথ দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকের সবুজ ঘেরা মরুদ্যান ইয়াছরিবে পৌঁছলেন। সময়টি ছিল সেপ্টেম্বরের শেষের দিক। সেখানে বিশাল বাগান ছিল, দেখে মনে হবে প্রায় পঁচিশ বর্গমাইলের পুরো এলাকা যেন পাহাড় এবং প্রাচীন লাভা প্রবাহের কালো দেহাবশেষের মধ্যে চাপা পড়ে আছে।

মুহাম্মদ আগেও এ বিস্তৃত উপত্যকাটি দেখেছিলেন, যখন তাঁর মা তাঁকে নাজ্জার গোত্রের আত্মীয় এবং তাঁর পিতা আবদুল্লাহর কবর দেখাতে সেখানে নিয়ে এসেছিলেন। জানা যায়, সম্ভবত পরেও দুটি কাফেলা নিয়ে সিরিয়ায় সফরকালে ইয়াছরিব ভ্রমণ করেছিলেন মুহাম্মদ - প্রথমে তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে এবং পরে খাদিজার বাণিজ্যিক প্রতিনিধি হিসেবে। অবস্থানগত কারণে ইয়াছরিব উপত্যকাটি উত্তরের দিকে যাওয়া দুটি প্রধান কাফেলা রুটের একটি ছিল।

এ কারণে তিনি সেখানকার ভূ-বৈচিত্র্য এবং আদিবাসীদের জটিল সমাজব্যবস্থা সমন্ধে অবগত ছিলেন। ইয়াছরিবের উঁচু ভূমির এই গ্রাম্য জীবনের আড়ালে ছিল বিভক্ত মরূদ্যান, যাতে বিভক্ত এই জনপদের ছোট স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলসমূহে বিশ্বস্ততা, বিশ্বাসঘাতকতা ও আনুগত্যের দোলাচলের জটিল সম্পর্কে গোত্রগুলো বাঁধা পড়ে গেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব ইয়াছরিবের উচ্চভূমিতে প্রধান ইহুদি গোত্রসমূহ বাস করত, আর তাদের সাথে সাধারণভাবে অপেক্ষাকৃত ছোট বহুশ্বরবাদী গোত্রগুলোর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সেখানকার মাটি ছিল খুবই উর্বর, আর দূর্গগুলো বিশাল ছিল। পশ্চিম এবং উত্তরের নিম্নভূমিতে প্রধানত ইহুদি গোত্র আওস এবং খাজরাজ গোত্রের অধীনে ছিল। নিম্নাঞ্চল হওয়ার কারণে, মাঝেমাঝে বর্ষাকালে জল উঁচু ভূমির শুষ্ক খাঁড়ি বেয়ে নেমে ক্ষেত এবং বাগানে বন্যার সৃষ্টি করতো। ইয়াছরিব জুড়েই প্রধান গোত্রদের ছোট ছোট দুর্গ এবং খামারবাড়িতে উপগোষ্ঠীরা বাস করতেন, খেজুর গাছ এবং ফসলের মাঠ দ্বারা পরস্পর পরস্পরের থেকে আলাদা থাকত। বড় দূর্গের অনেকগুলোর চারপাশে অনেক গ্রাম ছিল (১)।

যদিও শহরটি বিকেন্দ্রীভূত ছিল, উপত্যকার মধ্যে নাজ্জার (Najjar) অঞ্চল ছিল সবচাইতে ঘনবসতিপূর্ণ, যেটা সেতুর কাছাকাছি উপত্যকার মাঝখানে অবস্থিত ছিল। যদি এটি ইয়াছরিবের কেন্দ্রস্থল হয়ে থাকে, তবে এটি ছিল মুহাম্মদের দাদির মায়ের (great grandmother) বাসস্থান।

একটা সময় মুহাম্মদ উঁচু পাহাড়ের ঢাল থেকে এই বিশাল উপত্যকার যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে থাকতেন, ইয়াছরিব রাজনৈতিকভাবে পরিবর্তনের একেবারে চূড়ান্ত শিখরে ছিল। দুই শতাব্দী আগেও এই মরুদ্যানে ব্যাপকভাবে ইহুদিদের বাস ছিল। উপত্যকায় তাদের উপস্থিতি ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের সময়কাল পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যেত, কিন্তু তাদের আধিপত্য কমতে শুরু করে পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে যখন মারিবের (Marib) বিখ্যাত বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে ইয়েমেন থেকে আরব শরণার্থীরা ইয়াছরিবে চলে আসেন। সেই সাথে আরবদের জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে, জমি ও জলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সেখানে বসবাসরত ইহুদিদের সাথে বিবাদও বাড়তে থাকে। আউস এবং খাজরাজের দুটি প্রধান গোত্রতে বিভক্ত আরবরা, নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে, কখনও কখনও জমি নিয়ে ঝগড়া করে, অথবা সামান্য একটু বিষয়ে মতের অমিল হলেও লড়াইয়ে জড়িয়ে যেত। একবার একটি ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য একটি যুদ্ধ শুরু হয়, যার ফলে খুনোখুনি পর্যন্ত ঘটে এবং যা রক্তের বদলে রক্ত নেয়ার চক্রের মধ্যে আবর্তিত হয়। আরবদের উপস্থিতি থেকে বেড়ে ওঠা জোটের ঝামেলার কারণে ইহুদি গোত্ররা কখনও কখনও একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে যেত। সময়ের সাথে সাথে তাদের অঞ্চলটি সংকুচিত হতে থাকে

এবং উচ্চভূমির সাথে যুক্ত হয়ে মিশে যায়। মুহাম্মদের আগমনের সময়, অর্ধশতাব্দী ধরে যুদ্ধযুদ্ধ খেলায় তাঁরা ছিল ক্লান্ত এবং আর কোন সংঘাতে জড়ানোর কোন আকাঙ্ক্ষা তাদের ছিল না। সেখানকার গোত্রপতিরা এমন একজন নেতাকে খুঁজছিলেন, যিনি সমগ্র উপত্যকাকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবে। এই ভূমিকার জন্য আবির্ভূত হন খাজরাজ শেখ আব্দুল্লাহ বিন উবাই। তিনি দেখতে লম্বা ধূসর দাড়িওয়ালা ছিলেন, খাজরাজের সবচাইতে আকর্ষণীয় দুর্গের এবং পার্শ্ববর্তী খেজুর বাগান এবং ফসলি জমির মালিক ছিলেন। তিনি উচ্চভূমির বুয়াথ (Buath) নামক এলাকায় শুরু হওয়া রক্তক্ষয়ী সংঘাতে জড়িত প্রতিদ্বন্দ্বিদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। গোত্রগুলি তাঁর ভূমিকায় এতটাই খুশি হয়েছিলেন যে, তাঁরা আবদুল্লাহ বিন উবাইকে রাজার মুকুট পরিয়ে দিতেও প্রস্তুত ছিল এবং তাঁর জন্য একটি রত্নখচিত মুকুট তৈরি করেছিল। সম্ভবত ইহুদিরাও তাঁর কর্তৃত্ব গ্রহণ করত, কারণ তিনি ইয়াছরিবের তিনটি প্রধান ইহুদি গোত্রের এক গোত্রের কায়নুকা (Qaynuqa) সাথে মিত্রতার সম্পর্ক করেছিলেন, এবং অন্যরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু মুহাম্মদ এসে ইয়াছরিবের রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিলেন, রাজার প্রতি সমর্থনও ভেঙ্গে দিলেন।

মুহাম্মদ ৬২২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের শেষের এক উত্তপ্ত দিনে উপত্যকায় অবতরণ করেন। তাঁর অনুসারীরা জানতে পেরেছিল, মুহাম্মদ আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে পালিয়েছেন, কিন্তু যতই দিন যেতে থাকে তাঁকে না দেখতে পেয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তারা যেহেতু জানত তিনি এই পাহাড়ি পথেই উচ্চুভূমির দিকে আসবেন, তাই বিশ্বাসীরা প্রতিদিন সকালে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর আশায় বাইরে বেরিয়ে পড়ত, কিন্তু যখন গরমে অসহ্য হয়ে যেত, তখন ঘরে ফিরে আসত। উঁচুভূমির অনেক দক্ষিণে কুবা (Quba) নামক এলাকায় এক ইহুদি তাঁর খামারবাড়ির ছাদ থেকে প্রথম মুহাম্মদকে দেখেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "হে আরব, এই যে তোমাদের মহান মানুষ তোমরা যার অপেক্ষা করছ" (২)!

তীব্র রোদে, উটের উপরে থাকা মুহাম্মদ ও আবু বকরকে ক্রমশই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। অবশেষে যখন অশ্বারোহেরা গ্রামে প্রবেশ করলেন, বিশ্বাসীরা চিৎকার করে বলে উঠল "আল্লাহু আকবর!" এবং তাদের শুভেচ্ছা বার্তায় ভাসিয়ে দিলেন। প্রত্যেকেই তাদের বাড়িতে আগতদের যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। তারা কেউই মুহাম্মদকে দেখেনি এবং তারা নির্ধারণ করতে পারছিলেন না উভয়ের মধ্যে কে মুহাম্মদ, তবে মুহাম্মদ যখন তাঁর উটের পিঠ থেকে নামছিলেন, আবু বকর তখন তড়িঘড়ি করে খুব দ্রুত রোদ থেকে বাঁচাতে মুহাম্মদের মাথায় একটা ছাতা মেলে ধরেন। মুহাম্মদ অবশেষে কুলছুম (Kulthum) নামের একজন বয়স্ক ধর্মান্তরিত ব্যক্তির বাড়িতে অবস্থান করেন, যিনি ছিলেন আউস গোত্রের একজন সদস্য। এদিকে আবু বকর একটি উচ্চভূমিতে অবস্থিত খাজরাজ পরিবারের কাছ থেকে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

এর আগে উমর (Umar) এবং অন্যান্য বিতাড়িত মক্কাবাসীদের আশ্রয় দেয়া কুলছুমের বাড়িটি অভিবাসীদের জন্য একটি অভ্যর্থনা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। কুলছুমের বাড়ি থেকে চার মাইল দূরত্বের খেজুর বাগান, শস্যক্ষেত এবং ফলের বাগান দিয়ে ঘেরা ইয়াছরিবের মরুদ্যানের প্রাণকেন্দ্রে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এটাই ছিল মুহাম্মদের প্রথম যাত্রাবিরতি। অল্প সময়ের জন্য কুবাতে (৩) থাকাকালীন সময়ে বিশ্বাসীদের নিয়ে মুহাম্মদ নামাজের নেতৃত্ব দিতেন, আয়াত পাঠ করতেন, সমর্থকদের কাছ থেকে পরিদর্শন গ্রহণ করতেন এবং নতুন ধর্মান্ধরিতদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করতেন। তিনি কুবায় একটি মসজিদের নির্মাণের জায়গাও খুঁজে বের করেন।

মুহাম্মদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর দাদীর দাদীর (great grandmother) এলাকায় নাজ্জার গোত্রের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এবং তিনি ও তাঁর অনুসারীরা আনুষ্ঠানিকভাবে সেখানে প্রবেশের একটা পরিকল্পনা করেন যা সেখানে যাওয়ার আগেই প্রচার করেন। নির্ধারিত দিনে মুহাম্মদ তাঁর উটের পিঠে আরোহণ করেন এবং বিশিষ্ট অনুসারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যাত্রা শুরু করেন। সেই যাত্রায় তাদের সঙ্গী হয়েছিলেন নাজ্জার অশ্বারোহীদের একজন সশস্ত্র প্রহরী।

তাঁরা তো প্রতিদিন এমন একজনকে দেখতে পেতেন না, যাকে ঈশ্বর স্বর্গে নিয়ে গিয়েছেন বলে দাবি করেন। ইয়াছরিবের সবাই তাঁর সম্পর্কে গল্প শুনেছিলেন যে, 'তিনি এমন কিছু দেখেছেন যা আর কেউ দেখেনি এবং যা আর কেউ শোনেনি। তাঁর কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রেরণ করা হয়; তিনি ছিলেন একজন বিনয়ী, অশিক্ষিত কিন্তু পবিত্র বান্দা, যাকে দিনে পাঁচবার প্রার্থনা করার নির্দেশনা দেয়ার জন্য প্রভুর সামনে ডেকে পাঠানো হয়েছিল এবং সংক্ষিপ্ত জীবন শেষেই তাঁকে জান্নাতে দাখিল করানো হবে। রাস্তায় জনতা ভিড় করল এবং অনেকে ছাদে উঠে পর্যন্ত তাঁকে দেখতে চাইল। কেউ কেউ চিৎকার করে বলল, "মুহাম্মদ এসেছেন!" অন্যেরা চিৎকার করে বলল, "আল্লাহু আকবর, আল্লাহর রাসূল এসেছেন!"

লোকজন তাঁর উটের পাশে, পেছনে দৌড়তে লাগল। কেউ কেউ তাঁকে তাদের সাথে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানায়, কিন্তু তিনি বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে, তাঁর উট ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত এবং কোথায় থামতে হবে ঈশ্বর সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি আবদুল্লাহ উবাইয়ের দুর্গের পাশ দিয়েই তাঁর গন্তব্যে পৌঁছুলেন, সম্ভবত মনে মনে ভাবছিলেন, তিনিই একদিন ইয়াছরিবের রাজা হবেন। কিন্তু খাজরাজের যুদ্ধবাজ নেতা তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "যারা আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, আপনি তাদের খোঁজেন এবং তাদের সাথেই থাকুন" (৪)।

ধর্মান্তরিতরা যখন আনন্দে মেতে ছিল, ইয়াছরিবের অনেকেই সমস্যার গন্ধ পাচ্ছিল। তাঁর অনুসারীরা তখনও একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ছিল এবং মূলত প্রায় সবাই ছিলেন তরুণ। ইয়াছরিবে বসবাসকারী বিশ হাজার মানুষের মধ্যে (৫) অর্ধেকই ছিল ইহুদি। মুহাম্মদ হিসেব কষে মক্কাবাসী অভিবাসীসহ তিনশত থেকে পাঁচশত জনের মতো বিশ্বাসী পেলেন। যদিও সংখ্যায় অনেক কম ছিল, তাঁরা স্বভাবে ছিল উগ্র এবং মুহাম্মদের আগমনের আগে তাঁরা প্রতিমা ভাংচুর করতে গিয়েছিল। তাঁরা বাড়িতে ঢুকে অবিশ্বাসীদের মূর্তি ধ্বংস বা চুরি করত যা তারা অব্যাহত রেখেছে মুহাম্মদের আগমনের পরও। এই ধরনের আক্রমনাত্মক আচরণ বেশি দেখা ওই সমস্ত তরুণদের ভেতর যাদের পিতামাতা পৌত্তলিকই রয়ে গিয়েছিলেন। ইসলামিক ইতিহাসে একজন শেখের ছেলের কথা বলা হয়েছে, যিনি তাঁর পিতার একটি মূর্তিকে বদল করে একটি মৃত কুকুর প্রতিস্থাপন করেছিলেন এবং মূর্তিটিকে ছুঁড়ে ফেলেন। এটি ছিল দেবী মানাতের মূর্তি, পরে তিনি মাটিতে সেটি পুঁতে ফেলেন (৬)। এই ধরনের আক্রমণাত্মক আচরণের কারণে, বয়োজ্যেষ্ঠদের অনেকেই মুহাম্মদের আগমনকে উদ্বেগের সাথে দেখেন।

নাজ্জার অঞ্চলে ঢুকে মুহাম্মদ দাদীর দাদির উত্তরসূরিদের (great-grandmother) গ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন, তবে সেখানে থাকার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর পরিবর্তে তিনি তাঁর উটকে ছেড়ে দিলেন, একসময়ে উটটি আকাবায় তাঁর এক অনুসারী আবু আইয়ুবের (Abu Ayyub) দোতলা খামারবাড়ির সামনে এসে থামে। সম্ভবত এটা ছিল পূর্বপরিকল্পিত, কারণ আবু আইয়ুব দ্রুতই বাড়ি থেকে বের হয়ে মুহাম্মদের উট থেকে মালপত্র নামিয়ে ভেতরে ঢোকাচ্ছিল। মুহাম্মদকে ঘিরে ধরা লোকজন তাদের সাথে থাকার জন্য চিৎকার করতে থাকেন, মুহাম্মদ হাত নেড়ে তাদেরকে বলেন, "একজন মানুষ সেখানেই যাবে বাহক উট যেখানে তাঁকে নিয়ে যায়"। কিন্তু তিনি এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, বাড়ির ভেতরে জিনিসপত্র সাজিয়ে তিনি জনতার সাথে কথা বলতে বেরিয়ে আসেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, "আপনারা কি আমাকে ভালোবাসেন?" যখন লোকেরা চিৎকার করে বলে উঠল "হ্যাঁ, ঈশ্বরের রাসূল", মুহাম্মদ তখন চোখের জল আটকাতে পারলেন না। তিনি বললেন, "আর আমি, ঈশ্বরের কসম, আপনাদের সবাইকে ভালোবাসি! ঈশ্বরের কসম, আমি আপনাদের সবাইকে ভালোবাসি"(৭)!

আবু আইয়ুবের বাড়িতে মুহাম্মদ একটু স্থির হবার পর তিনি একটি একটি স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণের স্বপ্ন দেখেন, যেখানে সমন্বিত বাসস্থান এবং মসজিদ থাকবে। এ লক্ষ্যে তিনি আবু আইয়ুবের বাড়ি বরাবর আবু বকরের দেয়া টাকা দিয়ে একটি খোলা জমি ক্রয় করেন। জায়গাটির এককোণে পৌত্তলিক সমাধিস্থান, কিছু খেজুরের গাছ এবং একটি ঝুপড়ি ছাড়া আর

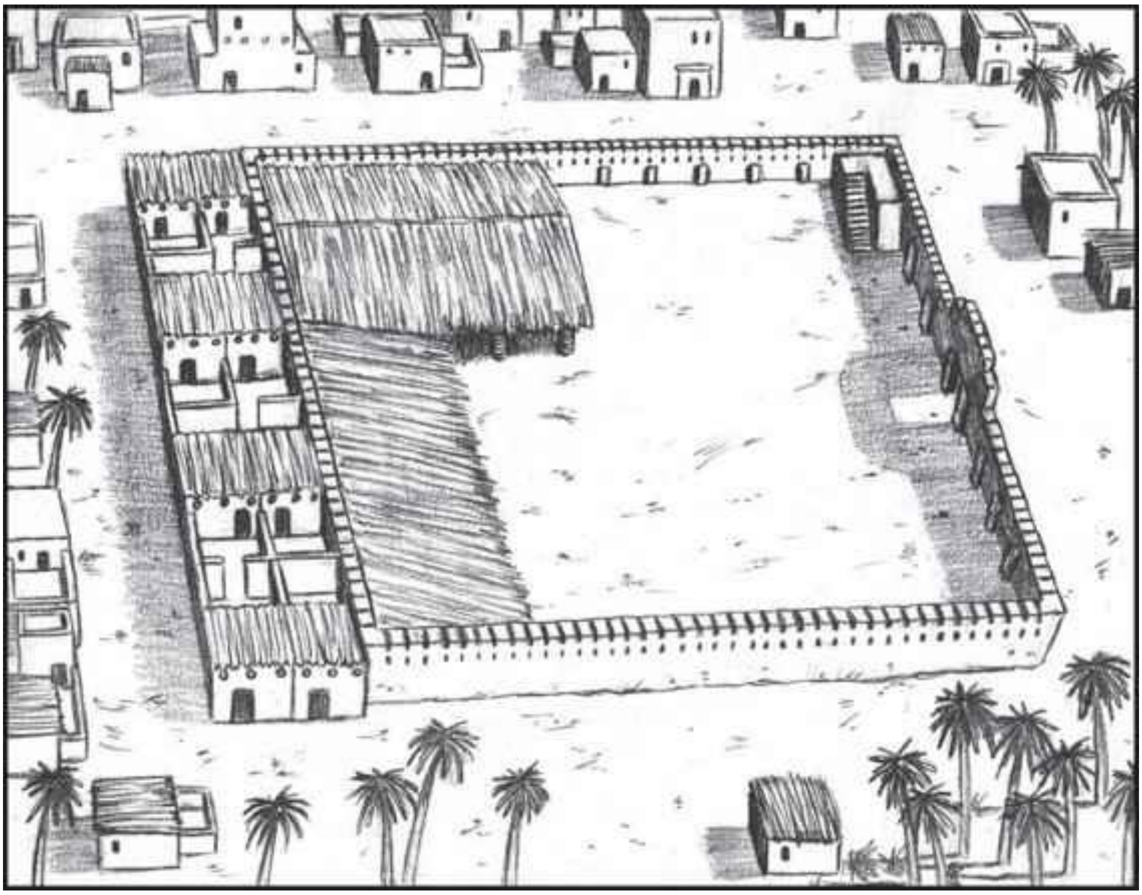
কিছু ছিল না। পরবর্তী সাতমাস ধরে, ইয়াছরিবের ধর্মান্তরিত এবং মক্কাবাসী হিজরতকারীরা মিলে পাথর এবং মাটি দিয়ে একটি বাড়ি তৈরি করেন। সম্পূর্ণ কাঠামোটি দশ ফুট উঁচু দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত এবং প্রাঙ্গণটি একশত পঞ্চাশ ফুটের মত দৈর্ঘ্য ছিল। উপরন্তু, এর এক পাশ ধরে, বাইরের দিকে মুখ করা বেশ কয়েকটি কামড়া তৈরি করা হল। প্রার্থনার জন্য কোণায় একটা জায়গা প্রস্তুত করা হয়েছিল, যার স্তম্ভ হিসেবে তাল গাছের গুড়ি ব্যবহার করা হয়েছে, যার ছাদটি তালগাছের ডালপালা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। একটি ধর্মপ্রচারকের পাটাতন নির্মিত হলো, এবং প্রার্থনাকারীদের নামাজের জন্য খেজুর পাতায় বোনা মাদুর বিছিয়ে দেয়া হলো। সম্পূর্ণ দালানটি একাধিক কাজ করার উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছিল। এটি ছিল মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারের জন্য একটি বাসস্থান, বিশ্বাসীদের জন্য একটি প্রার্থনার জায়গা, নতুনদের জন্য ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র এবং প্রশিক্ষণের জন্য একটি মক্তব। এটি শীঘ্রই মুহাম্মদের ঘাঁটি হবে, যেখানে তিনি আল-কায়েদা বাহিনী গঠন করবেন, তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য।

নির্মাণের এই সময়টাতে তিনি আবু আইয়ুবের বাড়ির নিচের তলার বসবাসের ঘরটি তাঁর সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহার করেন। অনেক মানুষ তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছে, এর মধ্যে একদল লোক তাঁর কাছে এসেছিল, তাঁর সাথে শহরের বিভিন্ন ব্যক্তির পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য এবং ইয়াছরিবের গোত্রীয় জোটের জটিলতা সম্পর্কে অবগত করতে। মুমিনগণ এসেছিলেন তাঁর কাছ থেকে নির্দেশনার জন্য এবং তাদের মধ্যে বিবাদের মধ্যস্থতা করার জন্য তাঁরা মুহাম্মদকে অনুরোধ করেন। মুহাম্মদের আগমনের কয়েকমাসের মধ্যে ওই অঞ্চলের প্রধানের মৃত্যু হয়, যিনি ছিলেন তাঁর দাদীমহের বংশধর এবং তারপরই তিনি নাজ্জার গোত্রের আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। নাজ্জার গোত্রের নেতারা মুহাম্মদের কাছে এসে তাঁকে নতুন শেখ নিয়োগ দিতে বলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেকেই নিয়োগ দেন। এই ভূমিকা তাঁকে বিভিন্ন খাজরাজ গোত্রের আদিবাসী পরিষদে একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন দেয়।

এই প্রারম্ভিক মাসগুলোতে তাঁকে অনেক সমস্যার সমাধান করতে হয়। এসবের মধ্যে ছিল অনেক মক্কাবাসী অভিবাসীরা যারা ইয়াছরিবের বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এবং ইয়াছরিবীদের অধিকাংশই তাদেরকে বিদেশি হিসেবে বিবেচনা করত। অনেকেই যারা মক্কায় তাদের মালিকানাধীন সবকিছু রেখে ইয়াছরিবে চলে এসেছিল তাদের সুরক্ষা দিতে ও দারিদ্র্যতা কমাতে মুহাম্মদ ইয়াছরিবের ধর্মান্তরিতদের সাথে মক্কাবাসী অভিবাসীদের জুটি বেঁধে একটি কর্মসূচী শুরু করেন যার নাম দেন “ভ্রাতৃত্ব”। আবু বকর ইয়াছরিবে পৌঁছানোর পর উচ্চভূমির খাজরাজ পরিবারের প্রধানদের সাথে জুটি বেঁধেছিলেন। তিনি তাঁর নতুন ভাইদের সাথে এতটাই ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলেন যে, তিনি তাদের এই ভাইয়ের মধ্যে একজনের ছোট মেয়েকে বিয়ে করলেন। ইয়াছরিবী ধর্মান্তরিতদের মধ্যে একজন এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনকে এতটাই চরম পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, সে তাঁর এক স্ত্রীকে আনন্দের সাথে মক্কাবাসী এক নতুন ভাইয়ের কাছে উৎসর্গ পর্যন্ত করতে চাইল। “আমার দুই স্ত্রী আছে। দেখুন আর ভাবুন, আপনি যাকে পছন্দ করেন আমি তাঁকে তালাক দিয়ে দেবো!” – বলছিলেন তিনি (৮)

তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা ছাড়াও, একই সাথে মুহাম্মদ নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে একটি আদেশ জারি করেন যে, তাঁর ধর্মে বিশ্বাসীরা এখন থেকে বৈচিত্র্যময় ইয়াছরিবীদের মাঝে একটি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র সত্ত্বা হিসেবে থাকবে, আর তিনি হবেন তাদের নেতা। যদিও বিশ্বাসীরা ইয়াছরিব জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, কিন্তু এখন একচেটিয়াভাবে মুহাম্মদের কর্তৃত্বের অধীনে চলে এলো সবাই। অনুসারীদের মধ্যকার সকল দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য তাঁর কাছেই আসতে হবে, এমনকি সংঘাতের মাঝে যদি কোন একটি দল অবিশ্বাসী (কাফের) থাকে তবুও। তিনি এই নতুন বহুগোত্রীয় সম্প্রদায়কে এক ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠীর নীতির সাথে যুক্ত করেছেন যেখানে তাদের একজনের উপর হামলার মানে দাঁড়াবে তাদের সবার উপর হামলা। এই নতুন সম্প্রদায়কে ছেঁটেছুটে তৈরি করার পাশাপাশি মুহাম্মদ ইয়াছরিবের পৌত্তলিক গোত্রদের বিচ্ছিন্নকরণ এড়িয়ে যান। নতুন এই সমাজ গঠনের প্রাক্কালে মুহাম্মদ ইয়াছরিবের পৌত্তলিকদের বিরোধিতা করার নীতি সুচতুরভাবে এড়িয়ে যান, এমনকি তখন তিনি তাঁর নতুন অনুসারীদেরকে গোত্রগত প্রথাকে সম্মান করার নির্দেশনা জারি করেন। গোত্রে-গোত্রে চলমান রক্তপণ

(দিয়ত) প্রথা ও রাজনৈতিক মিত্রতামূলক চুক্তিসমূহ মেনে চলতেও তিনি নির্দেশ দেন, যতক্ষণ না তারা নতুন এই নীতির সাথে সাংঘর্ষিক কিছু করে। তিনি ইহুদিদের জন্যও দরজা খুলে দিলেন। তাঁর প্রবল ইচ্ছে ছিল যেন ইহুদিরা তাঁর ধর্মে যোগ দেয়। এবং প্রথমদিকে তিনি সহিষ্ণুতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের দলে আনার চেষ্টা করেন। সময়ের সাথে সাথে সাংগঠনিক আদেশগুলো সংশোধন এবং আধুনিকীকরণের মধ্য দিয়ে যায় এবং অবশেষে ৪৭টি ধারা যুক্ত করে একটা চূড়ান্ত রূপ দেয়। চূড়ান্ত সংস্করণ, যাকে সাধারণত “মদীনার সংবিধান/মদিনা সনদ” বলা হয়। এটির মাধ্যমে মূলত ধর্মতত্ত্বের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় (৯)।



[মুহাম্মদের মসজিদ ছিল তাঁর আল-কায়েদা, যার মানে তাঁর অভিযানের ভিত্তি। এটি ইয়াছরিবে পৌঁছানোর পর নির্মিত হয় এবং এটি ছিল প্রার্থনার জায়গা, তাঁর বাসস্থান, মতবাদ প্রচারের কেন্দ্র এবং তাঁর সদর দপ্তর যেখান থেকে যুদ্ধের সূচনা করেছেন। প্রথমে মক্কাবাসী শত্রুদের বিরুদ্ধে এবং পরে ইয়াছরিবের ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, যারা তাঁকে তাদের নবী হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল।]

মুহাম্মদ ইয়াছরিবে আসার সাতমাস পর মসজিদ প্রাঙ্গনটি খোলা হয়। তিনি সেখানে তাঁর পরিবারের জন্য জায়গা বরাদ্দ করেন, তাঁর চাচাত ভাই আলীকে একটি কক্ষ দেয়া হল এবং মুহাম্মদের মেয়েদের জন্য আলাদা কক্ষ রাখা হল। রক্ষণশীল সাওদার জন্য আরেকটা কক্ষ দেয়া হল।

এটি শেষ করার পর মুহাম্মদের প্রথম কাজ ছিল, নয় বছর বয়সী আয়েশাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা। তিন বছর আগে আবু বকরের আশীর্বাদে আয়েশাকে তিনি বিয়ে করেন। আবু বকর খাজরাজের উঁচু ভূমিতে তাঁর নতুন শশুরবাড়িতে আয়েশাকে নিয়ে বাস করছিলেন।

নির্ধারিত দিনে মুহাম্মদ সেই বাড়িতে গেলেন। আবু বকরের বাড়ির ভেতরে যখন তিনি বিবাহকে পরিপূর্ণতা দানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, আয়েশাকে তাঁর মা ডেকেছিল। সে তখন উঠোনে বন্ধুদের সাথে খেলছিল এবং দৌড়ে বাড়ি পৌঁছানোর কারণে ছোট্ট আয়েশা হাপিয়ে ওঠে। তার মা তাকে শান্ত করার জন্য দরজায় বসিয়েছিলেন। আয়েশা পরে এই ঘটনাটি স্মরণ করেছিল এভাবে : "মা একটু জল নিয়ে আমার মুখ এবং মাথা মুছে আমাকে ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমাদের ঘরের ভেতরে একটি বিছানায় ঈশ্বরের রাসূল (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) ছিলেন, পুরুষ ও মহিলা সহ আনসার (Ansar) তথা সাহায্যকারীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি বসে ছিলেন । তিনি আমাকে কোলে বসিয়ে বললেন, "এরা তোমার পরিবার; ঈশ্বর তোমাকে তাদের দ্বারা এবং তাদেরকে তোমার দ্বারা মঙ্গল করুন"। পুরুষ এবং মহিলারা তখন লাফ দিয়ে উঠে চলে গেল।

সাওদার মত, আয়েশারও মসজিদে তাঁর নিজস্ব কক্ষ ছিল। এটি ছিল মুহাম্মদের জন্য নির্মিত একটি কক্ষ, যা সরাসরি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে নির্মিত মঞ্চটির (আরবিতে বলা হয় মেহরাব) পেছনে তৈরি করা হয়েছিল। ঘরের ভেতর দিয়ে একটি দরজা এবং জানালা ছিল, যার মাধ্যমে তিনি সহজেই সেই মঞ্চে প্রবেশ করতে পারতেন। মঞ্চ আর রুমটি একটা পর্দা দ্বারা আলাদা করা হয়েছিল। আয়েশা তাঁর সঙ্গে সংগ্রহের পুতুল নিয়ে এসেছিল, এবং মুহাম্মদ কখনও কখনও তাঁর সাথে পুতুল খেলতেন, এবং খেলার সাথীদের তাঁর সাথে খেলার অনুমতি দিতেন। মসজিদ খোলার সাথে সাথে বিভিন্ন সাংগঠনিক সমস্যা দেখা দেয়, বিশেষ করে বাধ্যতামূলক নামাজের সময় মানুষকে সময়মত হাজির করা ছিল ঝামেলার। ভোরের প্রার্থনায় সময় যারা দেরি করে আসতেন তাদের নিয়ে মুহাম্মদ সমস্যায় ছিলেন। ততদিনে মুহাম্মদ মানুষকে নামাজের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো শুরু করেছেন অনুসারীদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা জাগিয়ে তোলার জন্য, কিন্তু একইসাথে তিনি জানিয়েছিলেন যে, যখন তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে তখন আসলে ফেরেশতারাও তাদের অনুকরণ করে। মসজিদের ভেতরে ঢুকে আঁটসাঁটভাবে দাঁড়িয়ে, সিজদার মাধ্যমে গাদাগাদি করে নামাজ শেষ করাটা অনেকটা কষ্টের বিষয় হয়ে গিয়েছিল। সমস্যার সমাধানের জন্য মুহাম্মদ উপরের ঐশ্বরিক আদেশের অপেক্ষা করেননি, অধিকন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। এই অস্থিরতার কারণ অনুমান করা অসম্ভব নয় - মানুষ নিজেরাই সময় অনুমান করে নামাজে আসত। এ সমস্যার সমাধান করতে কেউ একজন প্রার্থনার সময় ঘোষণা করার জন্য ঘণ্টা বাজানোর পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু মুহাম্মদ তা প্রত্যাখ্যান করেন। এটা অনেকটা খ্রিস্টানদের আচারের মত হতো, আর তিনি শব্দকে ঘৃণা করতেন। আরেকজন শিংগা বাজানোর পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু মুহাম্মদ সেই ধারণাকে অপছন্দ করেছিলেন, কারণ এটি তাঁকে ইহুদিদের কথা মনে করিয়ে দেয়। অন্যরা আগুন জ্বালানোর কথা বলেছিল। কেউ কেউ একসাথে হাততালি দেয়ার কথাও বলেছিল। অবশেষে একজন নামাজের জন্য ছাদের উপরে উঠে ডাক দেয়ার পরামর্শ দিলেন, মুহাম্মদ এ ধারণাটি পছন্দ করলেন।

নামাজের আহ্বানের ডাকের মূল কারণ পুনঃপুনঃ মনে করিয়ে দেয়া – "ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ, ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ঈশ্বর ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। নামাজে পড়তে আসো। মুক্তিতে আসো। ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর ছাড়া আর কোন উপাসক নেই''। এই কথাগুলো দুইবার নামাজের সময় ঘোষণা করতে হবে, এবং তারপর সবাই জড়ো হবার পর তৃতীয়বারের মতো আবার ঘোষনা করা হতো। বিলাল ছিলেন দৃঢ় কণ্ঠস্বরের অধিকারী। উমাইয়া বিন খালাফের প্রাক্তন কৃষ্ণাঙ্গ দাস বিলালকে (Bilal) এই প্রার্থনার ঘোষক হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। একটি শৃঙ্গ নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত, তিনি প্রতিদিন সকালে একটি পার্শ্ববর্তী ভবনের ছাদে উঠতেন এবং ঘোষণা করার জন্য ভোরের প্রথম আলো দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। অন্যান্য বাধ্যতামূলক প্রার্থনার সময়েও এটির পুনরাবৃত্তি করতেন।

প্রার্থনার জন্য এভাবে ডাক দেয়া দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান নিয়ে এলো। উপরন্তু, এটি মুহাম্মদকে বিনামূল্যে প্রচারের একটি নিরবিচ্ছিন্ন সুযোগ প্রদান করল। তাতে প্রতিটি নামাজের জন্য তিনবার বা দিনে পনেরবার তাঁর পরিচিতিমূলক নাম "আল্লাহর রাসূল" এর পুনরাবৃত্তি করা হবে। মসজিদ থেকে বেশ দূরত্বে থাকা লোকজন সবাই এই আওয়াজ শুনতে পেল,

তাঁরা চাক বা না চাক। এটা একজন প্রচারপ্রার্থীর জন্য স্বপ্নপূরণের মতো, যা বারবার নিরবিচ্ছিন্ন আর বিনামূল্যে প্রচার করছে।

যখনই তাঁর আল-কায়েদা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং ইয়াছরিবে নিরাপদে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান সৃষ্টি হয়ে গেল, মুহাম্মদ আনুষ্ঠানিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ অনুসারীদের নিয়ে তাঁকে অস্বীকার করা সবার বিরুদ্ধে সামগ্রিক ও বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ শুরু করলেন, যা মাত্র সাতমাস আগে আকাবাতে শুরু করেছিলেন। এ পর্যায়ে মক্কাবাসীরা তাঁর লক্ষ্যবস্তু, এবং তিনি তাদের কাফেলাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান শুরু করেন, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সফল হতে পারেননি। প্রথম ঘটনাটি ঘটে ৬২৩ সালের মার্চ মাসে, যখন তিনি জানতে পারেন যে, আবুল হাকামের নেতৃত্বে একটি বিশাল কাফেলা লোহিত সাগর বরাবর সিরিয়া থেকে ফিরছিল। এটা ছিল প্রধান বার্ষিক কাফেলা। তিনশত ব্যবসায়ী, প্রহরী এবং উটের চালকরা সোনা ও রূপার মুনাফা বহন করে এবং দুই হাজার উটের পিঠে শতশত টন পণ্য বহন করে আসছিল (১১)।

ত্রিশজন মক্কাবাসীকে নিয়ে মুহাম্মদ একটি দল তৈরি করেন এবং তিনি তাঁর চাচা হামজাকে এই দলটির পরিচালনার দায়িত্ব দেন, এবং হামজাকে আদেশ দেন কাফেলা আক্রমণ করতে। কেউ প্রতিরোধ করলেই তাকে হত্যা করতে বলেন এবং কাফেলা নিয়ে ইয়াছরিব ফিরতে বলেন। সফল হলে এটি মক্কাবাসীদের পঙ্গু করে দেবে, মুহাম্মদের কার্যকলাপকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল প্রদান করবে এবং মক্কাবাসী অভিবাসীদেরকে সমর্থনের যে বোঝা ইয়াছরিব ধর্মান্তরিতদের উপর চাপানো হয়েছে তা থেকে তাঁরা মুক্ত হবেন।

হামজা ও তাঁর যোদ্ধারা দ্রুতগামী উটের পিঠে সওয়ার হয়ে ইয়াছরিব থেকে দ্রুত বের হয়ে জুহাইনা (Juhayna) গোত্রের এলাকায় অবস্থান নেন। তাঁরা জানতেন, লোহিত সাগরের দিক থেকে একটি কাফেলা এই দিকেই আসছে। কিন্তু অভিযানটি ব্যর্থ হয়। মক্কাবাসীরা যথেষ্ট সময় পায় রক্ষণাত্মক অবস্থায় কাফেলা ঘিরে রাখার। কাফেলা ভ্রমণের সূত্রে মক্কাবাসীদের কাছ থেকে কর সংগ্রহকারী জুহাইনার গোত্রপ্রধান বিরোধী শক্তির মাঝখানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ না করতে দুই পক্ষকে রাজি করান, আর এভাবে এই অচলাবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটান। ফলে হামজা খালি হাতে ইয়াছরিবে ফিরে আসেন এবং আবুল হাকামের কাফেলা দক্ষিণে চলতে থাকে।

পরবর্তী কয়েকমাসে মুহাম্মদ মক্কাবাসী কাফেলার বিরুদ্ধে আরো অভিযানকারী দল প্রেরণ করেন, কিন্তু কোনটাই সফল হয়নি। এসবের মধ্যে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে নিয়ে যাওয়া একটি কাফেলা আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা দেন দক্ষ তীরন্দাজ মুহাম্মদের মামাতো ভাই সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, যিনি দশবছর আগে একটি উটের চোয়াল দিয়ে একজন মক্কাবাসীর মাথা ফাটিয়েছিলেন। কিন্তু কাফেলায় থাকা লোকেদের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় ওয়াক্কাস ও তাঁর সঙ্গীরা পিছিয়ে গেলেন। অন্যান্য অভিযানগুলোও ব্যর্থ হয়েছে, কারণ কাফেলাগুলো ইতোমধ্যেই বিপজ্জনক এলাকা অতিক্রম করে তাদের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল। সাফল্য না পাওয়ার হতাশায় মুহাম্মদ নিজে বেশ কয়েকটি অভিযানের নেতৃত্ব দেন, কিন্তু সেসবও ব্যর্থ হয়। ইয়াছরিবের দক্ষিণে অবস্থিত আল-আবওয়ার কাছে উমাইয়া বিন খালাফের নেতৃত্বে থাকা একটি কাফেলায় হামলা চালানোর জন্য একবার তিনি দুইশত লোককে নেতৃত্ব দেন যেখানে তাঁর মাকে সমাহিত করা হয়েছে, কিন্তু ততক্ষণে খালাফ সেই জায়গা ছেড়ে চলে গেছেন। যাইহোক, এই যাত্রা একেবারে অপচয় হয়নি। ফিরে আসার পথে মুহাম্মদ তাঁর যোদ্ধাদের সমর্থনে এতদঞ্চলের একটি বেদুইন গোত্রের সাথে একটি 'অনাক্রমণ চুক্তি' করেন।

একমাত্র আক্রমণ যা থেকে মুহাম্মদের কিছু গণিমতের মাল অর্জিত হয়েছে - আর মুহাম্মদের জন্য তা একটা ধাক্কাও ছিল – সেটি ছিল তায়েফ থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে যাওয়া একটা ছোট বাণিজ্য কাফেলায় আক্রমণ। সেই কাফেলায় চামড়াজাত পণ্য, আঙ্গুরের রস, মদ বোঝাই করা ছিল। মুহাম্মদ যখন কাফেলাটির প্রস্থানের তারিখ জানতে পারেন তখন তিনি তাঁর চাচাত

ভাই আবদুল্লাহ বিন জাহশকে প্রধান করে কিছু মক্কাবাসী যোদ্ধাকে একত্র করে আটজনের একটি দল নিযুক্ত করলেন ওই কাফেলা আক্রমণ করতে। কিন্তু মুহাম্মদ এই আক্রমণ ফাঁস হওয়া নিয়ে এতটাই ভীত ছিলেন যে, তিনি জাহশকে (Jahsh) সিল মেরে একটি আদেশপত্র হাতে দেন এবং তাদের চলে যাওয়ার দু'দিন পরেই সেটি খোলার আদেশ দেন। সিলমুক্ত করে চিঠিটি খোলার পরই কেবল জাহশ জানতে পারে যে, তাদের আল-উজ্জার অভয়ারণ্য নাখলার (Nakhla) দিকে এগিয়ে যেতে হবে, যেখানে রাস্তাটি দক্ষিণে তায়েফের দিকে নেমে গেছে এবং সেখানে কাফেলার উপর হামলার জন্য তাঁরা অপেক্ষা করবে। সেখানে পৌঁছানোর আগে জাহশ তাঁর দু'জন লোককে হারিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস। যে উটের উপর সাদ ছিল সেটি দৌড়ে চলে যায়, আর সেটাকে পুনরুদ্ধার করতে সাদ এবং অন্য একজনের পেছনে পড়ে থাকতে হয়েছে। কাফেলাটি ছিল সহজ বাছাই - চারজন তরুণ আরোহী একডজন মাল বোঝাই পশুর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। জাহশ তীর দিয়ে একজনকে হত্যা করে, আরও দু'জনকে ধরে ফেলে, আর চতুর্থজন পালিয়ে যায়। হামলাকারীরা পণ্যবোঝাই পশু এবং বন্দিদের নিয়ে ইয়াছরিব ফিরে আসেন (১২)।

পবিত্র রজব মাসের (যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাস) শেষদিনে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় যখন মক্কাবাসীদের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল না। যদিও মুহাম্মদের পৌত্তলিক বিশ্বাস চর্চার কোন কারণ ছিল না, কিন্তু তাঁর মক্কান শত্রু এবং ইয়াছরিবে থাকা বিরোধীরা এই লঙ্ঘনের (পবিত্র মাসের) উপলক্ষ ব্যবহার করে তাঁর বিরুদ্ধে লোকদের খেপিয়ে তোলে। ইয়াছরিবে ধর্মান্তরিতদের অনেকেই যারা বহুঈশ্বরবাদী শেকড় থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না, তারাও চিন্তিত হয়ে পড়ে, আর জাহশ (Jahsh) ও তাঁর লোকদের সমালোচনা করে। মুহাম্মদ অবশেষে এই বিতর্কের নিষ্পত্তি করেন - মক্কাবাসীদের উপর দোষারোপ করে তিনি কোরআনের আয়াত রচনা করেন এরূপ : They had refused to listen to the words of Allah that had been transmitted to them through his messenger, and they had offended Allah by driving him and his followers out of Mecca; therefore they were fair game for Allah's vengeance even during the sacred months (১৩)।

মক্কাবাসীরা বন্দিদের মুক্তিপণের জন্য অর্থ পাঠিয়েছিল, কিন্তু মুহাম্মদ প্রথমে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কারণ, ওয়াক্কাস ও তাঁর অশ্বারোহী সঙ্গী এখনো নিখোঁজ। তিনি মক্কাবাসীদের সতর্ক করে দেন যে, যদি দেখা যায় যে তাঁর সৈন্যদের বন্দি করা হয়েছে অথবা হত্যা করা হয়েছে, তাহলে তিনি প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাঁর হাতে অসহায় বন্দিদের হত্যা করবে। উমর সবসময় তলোয়ার হাতে অবিলম্বে (কাফেরদেরকে) জাহান্নামে পাঠানোর প্রস্তাব দিতেন। একজন বন্দী বারবার তাঁর মাথা কেটে ফেলার কথা শুনে এতই মর্মাহত ছিল যে, সে ভয়ে মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করে এবং বলে – "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইশ্বর নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর প্রেরিত রাসূল!" নিখোঁজ দুই ব্যক্তি অবশেষে ইয়াছরিবের দিকে ফিরে আসে, জলশূন্যতায় বিধ্বস্ত হয়ে। তাঁরা তাদের উট পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং পায়ে হেঁটে তাদের ইয়াছরিবে ফিরে আসতে হয়েছিল। অবশিষ্ট বন্দী যিনি ধর্মান্তরিত হননি তাঁকে মুক্তি দেয়া হয় এবং তিনি মক্কায় ফিরে যান।

এই পর্বের চূড়ান্ত ঘটনাটি ঘটে যখন মুহাম্মদ চুরি করা পণ্য আক্রমণকারীদের মধ্যে ভাগ করে দেন, আর নিজের জন্য এক পঞ্চমাংশ রাখেন। এটাই ছিল মোহাম্মদ কর্তৃক খুমুস (khumus) নেয়ার প্রথম উদাহরণ, অর্থাৎ মুহাম্মদ নিজে বিশ শতাংশ যুদ্ধলব্ধ সেই লুটের পণ্য গ্রহণ করেন। সময়ের সাথে সাথে, অভিযান এবং যুদ্ধ থেকে সম্মিলিত লুণ্ঠন একটি সম্রাটের ভাগ্য নির্মাণ করবে, মুহাম্মদ এবং তাঁর অনুসারীদের অনেকেই এত ধনী হয়ে যাবেন যা তাঁরা স্বপ্নেও কল্পনা করেননি।

অধ্যায় - ১৪
ইহুদিদের প্রশ্ন

ইয়াছরিব পৌঁছে মুহাম্মদ (সাঃ) ইহুদিদের সাথে মিলেমিশে থাকার আশা করতেন, যাদেরকে তিনি আহলে কিতাব তথা আসমানি “কিতাবওয়ালা” ভাবতেন। তিনি মনে করতেন তাঁর ধর্ম আসলে তাদেরই ধর্ম, কিন্তু তিনি তা পেয়েছেন বিশুদ্ধ আকারে। এবং তিনি আশা করেছিলেন যে, ইহুদিরা তাঁকে স্বীকৃতি দেবে, দুই হাত দিয়ে স্বাগত জানাবে। এটা অনেকটা দীর্ঘদিন আগে হারিয়ে যাওয়া ভাইদের আনন্দময় পুনর্মিলনের মতোই।

ইহুদিরা তাঁর ব্যাপারে কৌতূহলী ছিল। তিনি উপত্যকায় আসার আগেই তাঁর খবর সারা আরব জুড়ে ছড়িয়েছিল। তাঁরা মুহাম্মদের সম্পর্কে যা শুনেছে তার বেশিরভাগই এসেছে তাদের মক্কার লোকজনের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে, এবং যার সবটাই চাটুকারিতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু এটা বোধগম্য ছিল যে, তিনি তাদের মূর্তিপূজার নিন্দা করেছিলেন। ইহুদিরা নিজেরা তাঁর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।

যখন তিনি আবু আইয়ুবের বাড়িতে ছিলেন, তখন প্রধান ইহুদি গোত্রদের ধর্মযাজক তথা রাব্বীরা তাঁর সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ দেখা করেন এবং বিনীতভাবে তাঁর কথা শোনেন। মুহাম্মদ তাদের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন এবং একসাথে সহাবস্থানের সদিচ্ছা দেখান। প্রথমেই তাদের ধর্মান্তরিত করতে বাধ্য করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, শুধু তাদেরকে তাঁর পাশাপাশি থাকার চিন্তা করছিলেন, যেমনটা দুটি কাফেলা একসাথে পাশাপাশি চলে দুই ভিন্ন গন্তব্যে ঠিক সেরকম। এই লক্ষ্যে তিনি তাঁর অনুসারীদের জেরুজালেমের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করার আদেশ দিলেন। যদিও শুক্রবারকে তিনি তাঁর বিশ্রামের দিন হিসেবে বেছে নেন, আর ইহুদিদের ছিল শনিবার। তিনি কিছু ইহুদি রীতিনীতিও গ্রহণ করেন, যেমন প্রায়শ্চিত্তের জন্য রোজা রাখা (Day of Atonement)। ইহুদিদের জন্য এই দিনটি ছিল পবিত্র দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ইহুদিদের পবিত্র খাদ্যাভ্যাসের নিয়মকানুন পালন করার জন্য তাঁর অনুসারীদের আদেশ দিলেন। তথাকথিত মদীনার সংবিধানের মাধ্যমে তাঁর অনুসারীদের একটি নতুন গোত্রতে পরিণত করেছিলেন, সেখানে তিনি সংযুক্ত করলেন যে ইহুদিরা তাদের নিজেদের ধর্ম স্বাধীনভাবে অনুসরণ করতে পারবে।

তবে ইহুদিদের কৌতূহল দ্রুত বিলীন হয়ে যায় এবং প্রথমে তাঁকে বিনোদন হিসেবে গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে তা ক্রোধে রূপান্তরিত হয়, যখন মুহাম্মদ দাবি করেন যে তিনি তাদের নবী, সেই মুক্তিদাতা যার জন্য তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে প্রার্থনা করেছিলেন। মুহাম্মদ এ-ও বলেন, তাদের পবিত্র গ্রন্থে তাঁর সমন্ধে শুধু ভবিষ্যদ্বাণীই করা হয়েছে তাই-ই নয়, উপরন্তু ইয়াছরিবের ইহুদিরাও তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তারা আউস এবং খাজরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে একজন মুক্তিদাতার (Messiah) আগমনের মধ্য দিয়ে তাদের দেশ ঈসরাইলে ইহুদিদের পুনর্বাসন করার হুমকি দিত, এটা তিনি স্মরন করিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, বরং কয়েক শতাব্দী ধরে আউস ও খাজরাজ গোত্র যে তাদের কাছ থেকে ইয়াছরিবের নিচু ভূমি নিয়ে চাষ করেছে তাও ফিরিয়ে দেবেন। মুহাম্মদের এই দাবি শুনে ইহুদিরা স্তম্ভিত হয়ে গেল! তিনি ছিলেন একজন আরব যার বংশ পরম্পরা ইয়েমেনে খুঁজে পাওয়া যাবে, যেমনটা পাওয়া যাবে আউস এবং খাজরাজ গোত্রেরও। তাদের শাস্ত্রে যেই নবীর ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, যেই মুক্তিদাতার (Messiah) কথা বলা আছে, তাঁকে হারুনের (Aaron) বংশধর হতে হবে, তাঁকে ইহুদি হতে হবে। মুহাম্মদ তাহলে এটা কিভাবে জানলেন না? তা সত্ত্বেও মুহাম্মদ জোর দিয়ে বলতে থাকলেন যে, তিনি তাদের শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী করা নবী। এমনকি তাওরাতে তাঁর নামও উল্লেখ করা হয়েছে; তাঁর শারীরিক বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। তাঁর ভুল ভাঙানোর জন্য ইহুদি ধর্মযাজকগণ কষ্ট করে তাদের তাওরাত আরবিতে অনুবাদ করে সূত্র দেখান। যখন মুহাম্মদের সামনে এই সূত্র পড়ে শোনানো হয়, মুহাম্মদ উল্টো ইহুদিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অভিযোগ আনেন (১)।

ইহুদি ধর্মীয় পণ্ডিতরা তাঁর কাছ থেকে তাদের নবীদের কাহিনী শুনতে চাইলেন। তাঁরা ছিলেন তোরাহ'র (Torah) পণ্ডিত এবং এছাড়া ইহুদি কিংবদন্তিদের নিয়েও তাদের ভালো ধারণা ছিল। বাইবেলে যেই গল্পগুলো পাওয়া যায়, সেই চরিত্রগুলো ইহুদিদের গল্পের অলংকৃত জনপ্রিয় সংস্করণ যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিকশিত হয়েছে। কিংবদন্তিদের গল্পগুলো লোকজনদের বলা হতো নৈতিকতার আদর্শ হিসেবে দেখাতে, এবং এই গল্পগুলো ধর্মগুরুরা মানুষকে আদর্শিক দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য ব্যবহার করত। মুহাম্মদের নবীর কাহিনী যতই তাঁরা শুনছিলেন ততই তারা বুঝতে পারলেন যে, সেগুলো তাওরাতের উপর ভিত্তি করে নয়, বরং কিংবদন্তির উপর ভিত্তি করে। এমনকি তাঁর গল্পেও উল্লেখযোগ্য ত্রুটি ও অসঙ্গতি ছিল (২)।

এমন কি হতে পারে যে, আল্লাহ তোরাহ গ্রন্থকে ইহুদিদের কাছে নাযিল করেছেন, আর তিনি মুহাম্মদের কাছে তাদের লোককাহিনীর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছেন? নাকি মুহাম্মদ যাদের কাছ থেকে পৌরাণিক কাহিনীগুলো শুনেছিলেন, তাদেরই হয়তো এই চরিত্রগুলো নিয়ে ভুল জ্ঞান ছিল? অথবা হয়তো তারাই সঠিক সংস্করণ বলেছে, কিন্তু তিনি তা পরিবর্তন করছেন, যাতে তাঁর গল্পের সাথে মানানসই করা যায়। নাদির গোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় পন্ডিত যার নাম সালাম মিশকাম (Sallam Mishkam) পরিশেষে এই রায় দিলেন যে, "তিনি (মুহাম্মদ) আমাদের কাছে এমন কিছু (গল্প) নিয়ে আসেননি যার মাধ্যমে আমরা তাঁকে চিনতে পারব" (৩)।

মক্কাবাসীরাও যখন তাঁকে সন্দেহ করা শুরু করল মুহাম্মদ তখন রেগে গেলেন। তিনি ইহুদিদের সমালোচনা করে কোরআনের আয়াত নিয়ে এলেন এবং তার দ্বারা আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকেন ও ধর্মীয় পণ্ডিতদের সামনে তা পাঠ করে শোনাতে থাকেন। তিনি 'প্রমাণ' হিসেবে বলেন, আল্লাহ যে তাঁর সাথে শুধু কথা বলেন তাই না, বরং আল্লাহ তাঁকে ব্যবহার করছেন ইহুদিদেরকে সতর্ক করে দিতে যে, তাদের কাছে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তাঁরা বিকৃত করে ফেলেছে। আর তাই তাদেরকে সঠিক পথে আহবান করার জন্য আল্লাহ তাঁকে পাঠিয়েছেন। এমন একটি আয়াতে মুহাম্মদ বলেন, "আর অবশ্যই মূসা তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে। অতঃপর তোমরা বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করলে। আর তোমরা তো যালিম" (৪)।

আরেকটিতে তিনি বলেন যে তাঁকে নবী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করা আসলে ইহুদিদের পুরনো রীতির একটি অংশ, কারণ এর আগেও অনেক নবীকে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছে : "অতএব যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তোমার পূর্বে রাসূলগণকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল যারা স্পষ্ট প্রমাণসমূহ, সহীফা ও আলোকময় কিতাবসহ এসেছিলেন" (৫)।

উপরন্তু মুহাম্মদ তাদের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন : "কোরআনের মত বিস্ময়কর কিছু রচনা করুন অথবা এর কাছাকাছিও কিছু রচনা করে দেখান!" কিন্তু রাব্বী তথা ইহুদি পন্ডিতেরা তাঁকে এড়িয়ে গেলেন। তাঁরা মুহাম্মদের বানোয়াট গল্প যথেষ্ট শুনেছেন। তাঁরা বরঞ্চ অহংকার করে টেবিল তাঁর দিকেই ঘুরিয়ে দিয়ে বললেনঃ বুঝলাম আপনার কাছে আকাশ থেকে একটি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে ঠিক যেমন তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে মূসার উপর, কিন্তু তা প্রথমে আমাদের কোন এক রাব্বির উপর অবতীর্ণ হওয়া উচিত যিনি সাক্ষ্য দেবেন যে, মুহাম্মদ তাদের একজন নবী। তখন আমরা বিশ্বাস করতাম। মুহাম্মদ জবাবে আরো একটি কোরানের আয়াত বলেন এবং এতে তাঁরা বরং তাঁকে আরও অবিশ্বাস করতে লাগলেন। আয়াতটির বক্তব্য "কিতাবীগণ তোমার নিকট চায় যে, আসমান থেকে তুমি তাদের উপর একটি কিতাব নাযিল কর। অথচ তারা মূসার কাছে এরচেয়ে বড় কিছু চেয়েছিল, যখন তারা বলেছিল, 'আমাদেরকে সামনাসামনি আল্লাহকে দেখাও'। ফলে তাদেরকে তাদের অন্যায়ের কারণে বজ্র পাকড়াও করেছিল। অতঃপর তারা বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করল, তাদের

নিকট স্পষ্ট প্রমাণসমূহ আসার পরও। তারপর আমি তা ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং মূসাকে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট প্রমাণ" (৬)।

মুহাম্মদ দাবি করেন যে, তিনি ইহুদি এবং খ্রিস্টধর্মের সংস্কার করতে এসেছিলেন। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছে যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তা থেকে তাঁরা নাকি বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মদ এটি আরো এগিয়ে নিতে একবার ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্মবেত্তাদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করেছিলেন (৭)। সেখানে তাঁরা নিজেরা নিজেরাই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং এই ঘটনার দ্বারা মুহাম্মদ প্রমাণ করতে চাইলেন যে, তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে এবং তাদের পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন ছিল। মুহাম্মদের জন্য এটা খুবই আনন্দের বিষয় ছিল যে, ইহুদিরা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে তাদের ধর্মকে মিথ্যা বলার জন্য অভিযুক্ত করছে; আর খ্রিস্টানরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে তাদের মুক্তিদাতাকে (ঈসাকে) হত্যার অভিযোগ এনেছে। ইহুদিরা বলেছে যে, খ্রিস্টানদের জন্য জান্নাতে কোন স্থান নেই, কারণ তারা একজন মিথ্যা নবীকে অনুসরণ করে। অন্যদিকে খ্রিস্টানরা দাবি করে যে, ঈসার প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমেই কেবল পরকালের সুখ নিশ্চিত হবে। যখন তাদের তর্ক শেষ হয় মুহাম্মদ তাদেরকে দেখিয়ে দেন যে, তারা উভয় পক্ষই দাবি করছে তাদের উপর কিতাব নাজিল হয়েছে, কিন্তু তারা এ বিষয়ে একমত হতে পারেনি তাই তারা উভয় পক্ষই ভুল। তাঁরা আল্লাহর বাণীকে নষ্ট করে দিয়েছিল, আর সেজন্যই তিনি মুহাম্মদকে সর্বশেষ নবী হিসেবে বিশ্বের কাছে পাঠিয়েছনে যাতে সত্য উন্মোচন হয় এবং মানুষ সঠিক পথে পরিচালিত হয়। তিনি ঘোষণা করলেন খ্রিস্টানরা ভুল ছিল, কারণ তারা যীশুর সাথে ঐশ্বরিক ক্ষমতা যুক্ত করে কিন্তু তারা নিজেরাই একমত হতে পারেনি, কি এই ঐশ্বরিক ক্ষমতা। তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে এবং প্রত্যেকেই মনে করে তাদেরটাই সত্য পথ। এরচেয়েও বড় যে অপরাধ তারা করছে সেটা হলো, বহুশ্বরবাদীদের মতো তাঁরাও দাবি করেছে যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র (৮)।

ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয়কে অবাক করে দিয়ে মুহাম্মদ যীশুর মৃত্যুর জন্য ইহুদিদের দায়ী করা থেকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। মুহাম্মদ তাদের বলেন, তারা (ইহুদিরা) যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেনি, বরং যীশুর পরিবর্তে অন্য একজনকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। শেষরাতের খাবারের (The last Supper) সময় যখন যীশুর শত্রুরা তাঁর মৃত্যুর ষড়যন্ত্র করছিল যীশু তখন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে থেকে একজন স্বেচ্ছাসেবককে তাঁর জায়গায় মরতে বললেন এবং তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তাঁকে জান্নাতে একটি বিশেষ স্থান দেয়া হবে। আল্লাহ স্বেচ্ছাসেবকের চেহারা যীশুর মতো বদলে দিয়েছিলেন। ওই স্বেচ্ছাসেবককে নির্যাতন করা হয় এবং ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। স্বেচ্ছাসেবককে যখন টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আল্লাহ তখন যীশুকে ঘুম পাড়িয়ে দেন। আর যে ভবনে রাতের শেষ খাবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার ছাদে ফুটো করেই যীশুকে তুলে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর শিষ্যেরা তা দেখেও চুপ করে ছিলেন। এমনকি মরিয়মও (Mary) এই অদল-বদল দেখে বোকা বনে গিয়েছিলেন (৯, ১০)।

ইয়াছরিবে মুহাম্মদের আগমনের এক বছরের মধ্যে ইহুদিরা তাঁর সাথে এই বিষয়ে কথা বলা ছেড়ে দেয়। তারা উদ্বিগ্ন ছিল, কারণ তিনি ছিলেন অনমনীয় এবং অদ্ভুত প্রকৃতির। ইহুদিদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগগুলো অর্ধসত্য, বিকৃত, সরাসরি মিথ্যা অথবা গাঁজাখুরি গল্প, যেমন তাঁর যীশুর গল্পটি। তাঁর মত এমন একজনের সাথে কথা বলার কি আছে? মুহাম্মদ দাবি করতেন যে, তিনি সবসময় সঠিক ছিলেন আর তারা সবসময় ভুল ছিল, এবং হাজার তর্ক করেও তাঁকে বোঝানো যেত না। ঠিক মক্কাবাসীরা যেমন করেছিল, তেমনি তারাও প্রকাশ্যে তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগলেন। কাব বিন আশরাফ (Kab Ashraf) নামের একজন ইহুদি কবি ও বনু নাদির/নযীর (Nadir) গোত্রের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুহাম্মদকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর সাথে অন্যান্য ইহুদি কবিরাও যোগ দেন। যখনই তারা মুহাম্মদ বা তাঁর কোন লোকদের মুখোমুখি হতেন, ইহুদিরা "আপনার উপর 'শান্তি' বর্ষিত হোক" এই শুভেচ্ছা বাণীটিতে শান্তির বদল 'মৃত্যু' শব্দ বসিয়ে বলতেন, যার মানে দাঁড়াত – "আপনার উপর মৃত্যু বর্ষিত হোক"।

যখন মুহাম্মদ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে, ইহুদিরা তাঁকে মেনে নেবে না মুহাম্মদ আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলেন। তাঁর মৃগীরোগের অভিজ্ঞতা তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিল যে, আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বলছিলেন। তাঁর মাথায় যা কিছু আসে তা সবই আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে এবং আল্লাহ কখনো মিথ্যা বলেন না। ইহুদিরা কি ঈশ্বরকে মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করছে? তারা কিভাবে তাঁকে বুঝতে পারল না যে, তিনি তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছেন? একপর্যায়ে ইহুদিদের পবিত্র দিনে, তাদের প্রার্থনাস্থলে তিনি এবং তাঁর সমমনা ঘনিষ্ঠদের একটি দল ঢুকে চরমপত্র দেন এই বলে : "হে ইহুদিরা, আপনাদের মধ্যে বারোজন লোক দেখান যারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর প্রেরিত রাসূল। শুধু এটুকু করলেই আল্লাহ আপনাদেরকে ছেড়ে দেবেন এবং স্বর্গে দাখিল করবেন"। তিনি আরও দু'বার একই কথা বললেন, কিন্তু ইহুদিরা চুপ করে রইল। তিনি বললেন, "আপনারা প্রত্যাখ্যান করলেন! আল্লাহর কসম, আমিই শেষ নবী এবং আমিই শেষ নবী এবং আমিই মনোনীত নবী; আপনারা তা বিশ্বাস করেন আর নাই করেন" (১১)।

ইহুদিরা যেহেতু তাদের দাড়ি ছেঁটে গোঁফ রাখত তাই তিনি তাঁর অনুসারীদের ইহুদিদের সাথে পার্থক্য করার জন্য দাড়ি লম্বা করে রাখা এবং গোঁফ ছেঁটে রাখার আদেশ দিলেন। মসজিদে নামাজের মধ্যে তিনি ইহুদিদেরকে ক্রমাগত অভিশাপ দিতেন, ঠিক যেমনি মক্কায় তিনি তাঁর বিরোধীপক্ষের প্রতি ঘৃণার চাষ করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের প্রতি আহ্বান জানাতেন এভাবেঃ "হে আল্লাহ! তাদের অবিশ্বাস ও ত্রুটির কারণে ইহকালে ও পরকালে তাদের শাস্তি দাও। নিশ্চয়ই তারা জালেম"। প্রায়ই তিনি প্রার্থনা করতেন কোরআনের আয়াত দিয়ে, যার মধ্যে অনেকগুলো রচনাই ছিল বিস্তারিতভাবে অভিশাপের বর্ণনা। তাঁর অনুসারীরা তোতাপাখির মতো তাঁর কথাই পুনরাবৃত্তি করতেন। তিনি তাদের এই ধারণা দিয়েছিলেন যে, মুহাম্মদ যেই আচরণ করছে তা সবসময়ই ইশ্বরের ইচ্ছার প্রতিফলন, তাঁকে সেইভাবে অনুকরণ করা মানে সহজভাবে জান্নাতের পথে ঢোকা। অতএব তাদের প্রার্থনায় বিশ্বাসীরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিশাপের পুনরাবৃত্তি করত। তারা কোরআনের আয়াতগুলো মুখস্ত করেছিল, যেগুলিতে ইহুদিদের নিন্দা করা হয়েছে। ক্রমশ মুহাম্মদের ঘৃণা তাদের ঘৃণা হয়ে ওঠে; তাঁর শত্রুরা তাদের শত্রুতে পরিগণিত হয়ে ওঠে ।

মুহাম্মদ যখন ইহুদিদের শয়তান বলা শুরু করলেন, তিনি আর থামেননি। তিনি একটা আক্রমণাত্মক এবং কলঙ্কজনক প্রচারণা চালান। ঘৃণার মাত্রা যখন বাড়তে থাকল, তিনি একজন ইহুদি কিংবদন্তির সাথে একটি গল্প জুড়ে দেন যে, ঈশ্বর একসময় কিছু ইহুদি জেলেকে বানরে রূপান্তরিত করেছিলেন, কারণ তারা বিশ্রামবারের দিন বিশ্রাম না করে আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিল। তারা চালাকি করে শনিবার একটি মাছের ফাঁদ তৈরি করেছিল এবং রবিবার তা সংগ্রহ করেছিল এবং এই দুষ্ট কাজের জন্য তাদের পুরুষ এবং নারীদের বানরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। মুহাম্মদ ইহুদিদের উপর কাহিনী ঘুরিয়ে দেন এবং তাদেরকে "বানর" বলতে শুরু করেন। তিনি তাঁর এই কাহিনীর সংস্করণ কোরআনে যোগ করেছেন : "আর তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছিল, তাদেরকে অবশ্যই তোমরা জান। অতঃপর আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও" (১২)

সকল আক্রমণাত্মক এবং ব্যঙ্গাত্মক বক্তব্যের মাধ্যমে মুহাম্মদ মূলত ইহুদিদের সামরিক শক্তির পরীক্ষা করছিলেন এবং সেই সময়টুকুতে শুধু তাদেরকে অপমান এবং অপদস্ত করার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখছিলেন। তিনটি ইহুদি গোষ্ঠীর প্রত্যেকেরই সাতশত যোদ্ধা নিয়ে ময়দানে যাওয়ার সক্ষমতা ছিল। তিনটি গোত্রের একটির আবার খাজরাজ প্রধান আবদুল্লাহ উবাইয়ের সাথে মিত্রতা ছিল, যিনি এখনো পুরো উপত্যকার নেতৃত্ব দেয়ার আশা ছাড়েননি। যদিও অনেক আউস এবং খাজরাজ মুহাম্মদের কাছে ভিড়েছে, তবে আবদুল্লাহ এখনও শতশত যোদ্ধা নিয়ে মাঠে নামতে পারেন। আঞ্চলিক ক্ষমতার ভারসাম্যও মুহাম্মদের পক্ষে ছিল না। ইহুদিরা মক্কাবাসীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে ছিলেন এবং ইয়াছরিবের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বেদুইন গোত্রদের সাথেও তাদের ভালো সম্পর্ক ছিল। উপরন্তু, তারা ইয়াছরিবের নব্বই মাইল দুরত্বের এক সমৃদ্ধ অঞ্চল খাইবারের লোকদের সাথে ধর্ম এবং পারিবারিক বন্ধন দ্বারা সম্পর্কিত ছিল। তবে মুহাম্মদের জন্য

অন্যতম সুবিধা হচ্ছে, ইয়াছরিবের ইহুদিরা ঐক্যবদ্ধ নয়। পৌত্তলিক গোত্রদের সাথে জোটের কারণে, তারা সাম্প্রতিক আন্তঃগোত্রীয় যুদ্ধে একে অপরের সাথে লড়াই করেছে এবং তাদের মধ্যে তিক্ততাও অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু তিনি ভয় পেতেন যদি তিনি তাদের উত্তেজিত করেন, তাহলে তাঁরা হয়তো একত্রিত হয়ে একটি শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত হয়ে তাঁকে পিষে ফেলতে পারবে।

তবে ইহুদিরা মুহাম্মদকে নিয়ে ক্রমশ উদ্বিগ্ন হতে থাকেন। তিনি ইতোমধ্যে ভয়ঙ্কর সহিংসতার লক্ষণ দেখিয়েছেন। প্রথমে দিকেই তাঁর অনুসারীরা মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটায়, যা শুধুমাত্র তাঁর প্ররোচনায় ঘটে থাকতে পারে। সম্প্রতি, মক্কাবাসী কাফেলার বিরুদ্ধে যে অভিযান চালিয়েছিলেন, তা মূলত তাঁর নিজের লোকদের বিরুদ্ধেই অভিযান। প্রথমে এই অভিযান ছোটমাত্রায় শুরু হয়েছিল, কিন্তু সম্প্রতি তিনি একশত বা দুইশত যোদ্ধা পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর ক্ষমতা পরিষ্কারভাবে বেড়ে চলছে।

মুহাম্মদের উদ্দেশ্য সন্দেহজনক মনে করে ইহুদিরা তাঁর উপর গুপ্তচরবৃত্তি করে। ইসলামিক সাহিত্যে পাওয়া যায়, তাঁর উদ্দেশ্য জানতে ছয়জন ইহুদি ধর্মান্ধরিত হওয়ার ভান করে, যাতে তাঁরা মসজিদের ভেতর যেতে পারে। এভাবে তাঁরা মুহাম্মদের উপদেশ শুনতে এবং সেখানকার আলোচনা শুনে তা তাদের রাব্বির কাছে পেশ করত। মুহাম্মদ সন্তুষ্ট হলেন যখন তাঁরা তাঁর ধর্ম গ্রহণ করল, এই বিশ্বাসে যে, অবশেষে ইহুদিদের সাথে তাঁর যেই ঝামেলা তা এখন মিটমাট হচ্ছে। কিন্তু কিছুক্ষনের মধ্যেই তিনি তাদের আন্তরিকতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন, যখন তাঁরা নামাজের শুরুতেই ঝিমুচ্ছিল, আর নাক মোছা ও শরীর চুলকাতে ব্যস্ত ছিল। তাঁরা কোরানের আয়াত বিড়বিড় করে বলত। যখন সিজদায় যাওয়ার সময় হলো, তাঁরা অন্য উপাসকদের সাথে সমন্বয় করছিল না। আরও বিরক্তিকর ব্যাপার হচ্ছে, তাঁরা পেছনের সারিতে একসাথে ছিল এবং নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। একবার যখন মুহাম্মদ খুৎবা (শুক্রবারের ভাষণ) দিচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদের হাসাহাসি করতে দেখে রেগে ফায়ার হয়ে গেলেন। তাঁরা আন্তরিক (মুখলিস) নয়, সুতরাং তাদেরকে মুনাফিক বলে তিনি অভিযুক্ত করেন এবং তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়ার আদেশ দেন। মুহাম্মদের অনুসারীরা লাফ দিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং মাটিতে ফেলে মারেন, রাস্তায় টেনে নিয়ে যান। একজনকে তাঁর চুল ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, অন্যজনকে তাঁর দাড়ি ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। একজন বিশ্বস্ত চিৎকার করে বলে, "আর কখনো যেন তারা রাসুলের মসজিদের কাছে এসো না, কারণ তোমরা অশুচি" (১৩)!

কোরআনে তাঁর অবস্থান থেকে এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, মুহাম্মদ এই সময়কার কাহিনীগুলো আব্রাহাম, ইসমাইল ও হাগার (মুসলিমরা বলে হাজেরা) থেকে নিয়েছেন। ইহুদিদের কাছ থেকে স্বীকৃতি না পেয়ে হতাশ হয়ে তিনি তাঁর কাহিনীতে বাইবেলের আব্রাহাম ও তাঁর প্রথম পুত্র ইসমাইলকে মক্কায় স্থানান্তর করে প্রতিশোধ নেন। বাইবেলের আব্রাহাম (ইব্রাহিম), সারাহ, ইসমাইল ও হাগারের পারিবারিক গল্প-উপাখ্যানের পটভূমি একচেটিয়াভাবে লেভান্ত (লেভান্ত বলতে বোঝায় বর্তমান ইসরায়েল, জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন ও প্যালেস্টাইনের বিস্তীর্ণ ভূমি) অঞ্চল থেকে সরিয়ে মুহাম্মদ একটি গল্পের নয়া পটভূমি তৈরি করেন। এই গল্পে তিনি বাইবেলের আব্রাহাম, ইসমাইল ও তাঁর মাকে মক্কার উপত্যকায় নিয়ে যান এবং সেখানে তাদেরকে পরিত্যাগ করে চলে যান। এবং এভাবেই মুহাম্মদ ঈসমাইলের বংশধরদের সাথে তাঁর নিজের একটি বংশপরম্পরার যোগসূত্র তৈরি করেন। এই নতুন পরিস্থিতিতে মুহাম্মদ এখন আব্রাহামের সরাসরি বংশধর বনে যান, যে আব্রাহাম ইহুদি বা খ্রিস্টান ছিলেন না, কিন্তু তিনি একেশ্বরবাদের প্রথম বিশ্বাসী ছিলেন। এবং তাঁর সরাসরি বংশধর হিসেবে মুহাম্মদকে পাঠানো হয়েছে 'আমাদের পিতা ইব্রাহীমের' প্রকৃত বিশ্বাস পুনরুদ্ধারের জন্য। এভাবেই তিনি তাঁর নিজের মহাকাব্যিক চিত্রনাট্যের নায়ক হয়ে ওঠেন (১৪, ১৫)।

এই নতুন সংস্করণটি কোরানের রচনার মাধ্যমে জীবন্ত রূপ দেয়া হয়েছে এই বলে যে, ইসমাইল ও তাঁর মাকে নির্জন ও জলশূন্য উপত্যকায় ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। যখন তারা তৃষ্ণায় দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন হাগার জলের খোঁজে দুটি নিচু পাথরের

পাহাড়ের মধ্যিখানে দৌড়াতে থাকে। শিশু ইসমাইল মাটিতে আঘাত করে এবং এর ফলে সেখানে জীবন রক্ষাকারী জলের ফোয়ারা বয়ে যায়। অবশেষে অব্রাহাম ফিরে আসেন এবং ইসমাইলকে নিয়ে উপাসনালয় তৈরি করেন। উপাসনালয়ের দেয়ালের উচ্চতা বাড়ার কারণে আব্রাহাম একটি বড় পাথরখন্ডের উপর দাঁড়িয়েছিলেন (নির্মাণ কাজ করেছিলেন)। সেই পাথরটিকে মুহাম্মদ পরে 'আব্রাহামের দাঁড়ানোর স্থান' (মাকামে ইব্রাহিম) বলে অভিহিত করেছিলেন। দাবি করা হয়, সেই পাথরের উপর দাঁড়িয়েই নাকি আব্রাহাম তাঁরা পুত্র ইসমাইলের হাতে মন্দির নির্মাণের পাথর তুলে দিতেন।

মুহাম্মদ যখন তাঁর রচনাটি সম্পন্ন করে ফেললেন, তিনি তাঁর অনুসারীদের 'কিবলা' পরিবর্তন করার আদেশ দিলেন - প্রার্থনার দিক এখন থেকে জেরুজালেমের পরিবর্তে মক্কার দিকে হবে। ইসলামের মৌলিক গ্রন্থসমূহে এই কিবলা পরিবর্তনের ঘটনাটি এভাবে বিবৃত হয়েছে : একদিন মসজিদের প্রার্থনা অধিবেশন (নামাজ) চলাকালীন সময়ে যখন সবাই সেজদারত ছিল, তখনই আল্লাহ মুহাম্মদকে দিক পরিবর্তন করতে নির্দেশ দেন। সে সময়েই ইবাদতকারীদের (উপাসক) সারির সামনে থাকা মুহাম্মদ হঠাৎ করে উত্তর থেকে দক্ষিণে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন এবং অনুগামীদেরকেও একই কাজ করার আদেশ দিলেন এবং তাদের জানালেন যে, তিনি এইমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে একটি আদেশ পেয়েছেন। এরপর থেকেই অব্রাহাম ও ইসমাইলের বানানো 'ঈশ্বরের ঘরের' (কাবা) দিকে মুখ করে প্রার্থনা করার প্রচলন শুরু হয়। এই যে নামাজের দিক পরিবর্তন করা হলো এটি মুহাম্মদের তরফ থেকে ইহুদিদেরকে প্রত্যাখ্যান করার ইঙ্গিত এবং এর ভবিষ্যৎ প্রভাব হবে ভয়ানক!

পরবর্তী কয়েক বছর তিনি তাঁর ইয়াছরিবকে শুদ্ধ করবেন ইহুদি জনসংখ্যা থেকে। তিনি উপত্যকা থেকে দুটি প্রধান গোত্রকে তাড়িয়ে দেবেন এবং তাদের পৈতৃক সম্পত্তি দখল করে নেবেন। তৃতীয় গোত্রের ভাগ্য আরও খারাপ হবে। ইয়াছরিবে আসার পর যে মুহাম্মদ আব্রাহাম আর মক্কা-কাহিনী রচনা করেছিলেন, তাঁর প্রমাণ ইসলামি আদি গ্রন্থেই পাওয়া যায়। ইবনে কাছির তাঁর কোরানের তাফসীরে লিখেছেন যে, ইয়াছরিবে বসতি স্থাপনের কয়েক বছর পর মুহাম্মদ যখন মক্কায় যাত্রা করেছিলেন উমর তখন মন্দিরের পাশে মাটিতে অর্ধেক গাঁথা বর্গাকার একটি পাথরের দিকে ইঙ্গিত করে মুহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মন্দির নির্মাণের সময় "আমাদের পিতা আব্রাহাম" যে পাথর ইসমাইলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, এটিই কি সেই পাথর? মুহাম্মদ বলেছিলেন, "হ্যাঁ" (১৬)। উমরের প্রশ্নটি ছিল এক শক্ত প্রমাণ, যা থেকে বোঝা যায় যে, মুহাম্মদ এই গল্পটি মক্কা থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরেই আবিষ্কার করেছেন। উমরের জন্ম হয় মক্কায়, তাঁর বেড়ে ওঠাও সেখানে। পাথরটি যদি মক্কার ধর্মীয় ঐতিহ্যের অংশ হতো তাহলে তিনি নিশ্চয়ই এটা সম্পর্কে জানতেন। আর মক্কার ধর্মীয় ঐতিহ্যের সূচনা হয়েছে মুহাম্মদের নবী হিসেবে আত্মপ্রকাশেরও দশ প্রজন্ম আগে, ইয়েমেন হতে আগত পূর্বসূরীদের হাত ধরে। উমরের এই প্রশ্ন দেখিয়ে দেয় যে, আব্রাহাম-মক্কার (মক্কার সাথে আব্রাহামকে জুড়ে দেয়া) কাহিনীর পটভূমি মুহাম্মদের ইয়াছরিবে আসার পরেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

সেই সময় উমর আরো জিজ্ঞাসা করেন, "আমরা কি এটাকে প্রার্থনার স্থান বানাতে পারি?" আল্লাহ নিশ্চয়ই শুনছিলেন, কারণ মুহাম্মদ দ্রুতই একটি আয়াত নিয়ে আসেন : **"আর যখন আমি কাবাকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানালাম এবং তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর"** (১৭)। তবে পাথরের একটি গল্প আছে, কিন্তু মুহাম্মদ যা আবিষ্কার করেছেন সেই গল্পটি এটি নয়। পাথরখন্ডটি কাটা ছিল, এবং সম্ভবত ৬০৫ সালে যখন মন্দির পুনর্নির্মাণ করা হয় সেই সময়ই পাথরের অর্ধেকটা মন্দিরের প্রবেশপথের কাছে মাটির নিচে ডুবে গিয়েছিল। সেই বছরই প্রথম মন্দিরের পুনর্নির্মাণ করা হয় এবং মুহাম্মদ সেই কাজে সাহায্যে করেন, এবং মন্দিরটি ঘনক আকৃতি ধারণ করে। এ সময়ে তাঁকে কাপড় খুলে ফেলার জন্য চাপ দেয়ার ফলে তিনি মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সম্ভবত পাথরটির উপর দাঁড়িয়ে মন্দির নির্মাণের পাথর তোলার পা-দানি হিসেবে তাকে ব্যবহার করা হয়েছিল। মুহাম্মদ হয়তো নিজে খিঁচুনির পর বিব্রতকরভাবে পড়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতার আগে বা পরে সহকর্মীদের হাতে পাথর তুলে দিতে এই পাথরটির উপর দাঁড়িয়েছিলেন। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, পাথরটি পেছনে ফেলে রাখা হয়েছিল এবং গ্রীষ্মের গরমে ছায়ার জন্য এটির উপর মানুষ বসতেন।

মক্কার সবাই এটি সমন্ধে জানত এবং মন্দিরের শীতল ছায়া ফেলার সময় তাঁর উপর মানুষজন বসত। এমনকি মুহাম্মদও এর উপর বসেছিলেন। তুখোড় বিচক্ষণতা দিয়ে তিনি মক্কায় আব্রাহামের কাহিনী তৈরি করে সামান্য একটি পাথরকে মুহাম্মদ পিতৃতান্ত্রিক পাথরে রূপান্তরিত করেন। এবং ছলনাহীন সরল প্রশ্নের মাধ্যমে উমর এই দুটোর কল্পিত উৎসের প্রমাণ আমাদের কাছে রেখে গেছেন।

অধ্যায় - ১৫
আপনার মাঝেই কসাই

ইয়াছরিবের বাইরে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা লুটতরাজের সংস্কৃতি চালু করেছিল। মক্কার অর্থনৈতিক ক্ষতি করতে, সেই সাথে তাঁর নিজের বাহিনীর সদস্যদের অর্থের ব্যবস্থা ও তাঁর আন্দোলনের অর্থনৈতিক উন্নতির স্বার্থে মুহাম্মদ মক্কার প্রতিটি বাণিজ্য কাফেলায় আক্রমণ করতেন। অধিকাংশ বহেরাগত মক্কাবাসী দরিদ্র ছিল, তাঁরা দিনমজুরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। ইয়াছরিবের ধর্মান্তরিতদের সাথে ভাতৃত্ববন্ধন তাদের কষ্ট কিছুটা লাঘব করেছিল, কিন্তু সাথে তাদের আর্থিক সমস্যার বোঝা ইয়াছরিবী ধর্মান্তরিতদের কাঁধে চেপে বসেছিল। মুহাম্মদকে বিশ্বাস করলে পারলৌকিক শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, কিন্তু তাঁর অনুসারীদের আরও প্রতিশ্রুতির দরকার ছিল। তাদের নগদ অর্থের দরকার, আর তা দরকার ছিল খুব দ্রতই।

মুহাম্মদের ইয়াছরিবে আসার ষোল মাস পরে বড় ডাকাতির একটা সুযোগ আসল, যখন মুহাম্মদ জানতে পারলেন যে, তাঁর একসময়কার মক্কান নিকট প্রতিবেশী আবু সুফিয়ান একটা বড় বাণিজ্য কাফেলার দায়িত্ব নিয়ে মক্কা থেকে সিরিয়া যাচ্ছেন। মুহাম্মদ তখন একদল বাহিনী পাঠালেন সেটার খোঁজ নিতে, কিন্তু তাঁর কাছে কাফেলা সম্পর্কিত তথ্যটি কয়েকদিনের পুরনো হওয়ার কারণে কাফেলাটি ফস্কে যায়। কাফেলাটি ইতিমধ্যেই ইয়াম্বুর (Yambu) তীর ধরে উত্তর দিকে চলে গেছে। তারপরও, যেটা উত্তর দিকে গেছে তা আবার দক্ষিণ দিকে আসবে। ফেরত আসার সম্ভাব্য সময় হিসেব করে কাফেলাটিকে খুঁজে বের করতে মুহাম্মদ তালহাকে (Talha) পাঠালেন, যাকে মক্কাবাসীরা একসময় আবু বকর এবং সাঈদের সাথে বন্দি করেছিল। সাঈদ ছিলেন আব্রাহামের ধর্মের প্রথম অনুসন্ধানী জায়েদের ছেলে। লোহিত সাগরের পথ ধরে চলতে থাকা এই কাফেলার অবস্থান অবশেষে তাঁরা জানতে পারল। এরপর ইয়াছরিবে ছুটে গিয়ে তাঁরা মুহাম্মদকে সেই কাফেলার লোকসংখ্যা, উট আর উটের উপর বোঝাই করা বস্তার পরিমাণ দেখে মালামালের হিসেব জানালেন। মুহাম্মদ এই কাফেলা আক্রমণের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের আহবান করে বললেনঃ "এই কাফেলায় আছে মক্কাবাসীদের সম্পদ, হয়ত ঈশ্বর এটি তোমাদের জন্য গনিমতের মাল হিসেবে মঞ্জুর করবেন" (১)। তিনি তাঁর অনুসারীদের বললেন, এই ডাকাতির আক্রমণ হল জিহাদ - আল্লাহর নামে যুদ্ধ। এখানে কেউ মারা গেলে তার জন্য পুরষ্কার হিসেবে আছে নিশ্চিত বেহেশত, আর যদি কেউ বেঁচে যায় তার জন্য আছে এই লুটের মালের (গনিমতে মাল) অংশ।

মক্কাবাসী দেশত্যাগীদের মধ্য থেকে সদস্য নেয়ার পরেও এমন বিশাল এক কাফেলার পুরোটা দখলে নিতে মুহাম্মদের আরো লোকবলের দরকার হলো, তাই তিনি ইয়াছরিবের ধর্মান্তরিতদেরও এই অভিযানে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করলেন। গনিমতের মাল কিংবা বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি সহসাই তিনশত লোক জোগাড় করে ফেললেন, যাদের তিন চুতর্থাংশই ছিল ইয়াছরিবের ধর্মান্তরিত; কিন্তু তাদের মাঝে মাত্র সত্তরটি উট আর দুটি ঘোড়া ছিল। তাদের যার যা কিছু অস্ত্রশস্ত্র ছিল সব নিয়ে এলো – তীর, ধনুক, ঢাল-তলোয়ার, ছোরা, আংটা ইত্যাদি। তাদের কারো কারো শিরস্ত্রাণ ও বর্ম ছিল। বলা হয়ে থাকে, মুহাম্মদের খুব কাছের পরামর্শদাতাদের একজন এই আক্রমণে আপত্তি জানিয়েছিলেন, কেননা তাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে যাদেরকে সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহ তাঁর অনন্য ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যে মনোনীত করেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ তাঁর এই আপত্তি খারিজ কর দেন।

মুহাম্মদের নেতৃত্বে ছোট সৈন্যবাহিনী, ইয়াছরিব থেকে প্রায় আশি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কাফেলার বিরতিস্থল, সবুজে ঘেরা একটা জলাশয়ের স্থান বদরের (Badr) উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল, যা জলের প্রাচুর্য আর নারিকেল গাছের সুশীতল ছায়ার জন্য কাফেলার মাঝে জনপ্রিয় ছিল। সিরিয়া, ইয়াছরিব আর মক্কার পথের সংগমস্থল হওয়ায় মুহাম্মদ বিশ্বাস করলেন, আবু

সুফিয়ানের কাফেলার সম্ভাব্য গন্তব্য এখানেই হবে। অনুমান সঠিক হল, যখন দুজন গুপ্তচর উটকে জল খাওয়াতে নিয়ে গেলেন তারা সেখানে থাকা দাসীদের মধ্যকার কথাবার্তায় জানতে পারল যে মক্কার বহরটি আগামী দুই-একদিনের মধ্যেই এসে পৌঁছবে।

আবু সুফিয়ান ততক্ষণে আক্রমণের ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। তিনি সিরিয়া ছাড়ার আগেই জেনে গিয়েছিলেন যে, উত্তরদিকের যাত্রার সময় মুহাম্মদ তাঁর কাফেলাটি আটকে রাখতে চায়েছিলেন এবং সুফিয়ানকে সতর্ক করা হয়েছিল যে, তিনি ফেরার পথে মুহাম্মদ এখানে ডাকাতি করার পরিকল্পনা করছেন। তিনি মক্কায় সতর্ক ঘন্টা বাজানোর জন্য দ্রুতগতির একজন দূতকে প্রেরণ করলেন। মক্কাবাসীদের একত্রিত করতে খুব একটা সময় লাগেনি। ফিরতি কাফেলাটি বড় অংশীদার এবং ছোট অনেক বিনিয়োগকারীর প্রায় পঞ্চাশ হাজার সোনার দিনারের পণ্যদ্রব্য আর মুনাফা নিয়ে যাচ্ছিল, যা এমনকি আজকের যুগেও একটি সৌভাগ্যের ব্যাপার। তিনদিনের মধ্যে মক্কাবাসীরা নয়শত পঞ্চাশজন লোকের একটি বাহিনী জড়ো করে আবুল হাকামের নির্দেশে উত্তর দিকে যাত্রা করে। উট এবং যুদ্ধের ঘোড়াগুলি প্রস্তুত করার সময় হাকাম বললেন, "মুহাম্মাদ কি মনে করেছে যে, নাখলাতে তাঁর সহযোগীরা যা নিয়েছিল, তা সে আমাদের কাছ থেকেও নিতে পারবে? সে এইবার বুঝতে পারবে, আমরা আমাদের কাফেলা রক্ষা করতে পারি কিনা!" (২) আরো উত্তরে গিয়ে আবু সুফিয়ান নিরাপদ দূরত্বে কাফেলাটি থামালেন এবং মক্কার সেনাবাহিনীর অপেক্ষায় থাকলেন, আর মুহাম্মদের বাহিনীর খোঁজ করতে দূত প্রেরণ করলেন। তিনি নিজে গভীর রাতে বদর সফরে এসে, মুহাম্মদের প্রেরণ করা গুপ্তচর সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। তাদের উটচলার পথে পড়ে থাকা গোবরগুলিতে ইয়াছরিবে জন্মানো বিশেষ ধরণের খেজুরের অবশিষ্ট দেখে তিনি তাদের উপস্থিতির ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলেন। বদরের হ্রদ ঘেরা মরুদ্যানের দিকে যাত্রার পরিবর্তে তিনি কাফেলাকে একটি পাহাড়ের পথ পেরিয়ে লোহিত সাগরে নিয়ে পৌঁছেছিলেন এবং দক্ষিণ উপকূলটি অনুসরণ করেছিলেন। জোর করে দু'দিন পদযাত্রার পরে তিনি মুহাম্মদের কাছ থেকে অনেক দূরে কাফেলা সরিয়ে নিতে পারলেন। কাফেলাটির নিরাপত্তা একবার যখন নিশ্চিত হয়ে গেল তখন তিনি আবুল হাকামকে এই বার্তা পাঠালেন যে, তারা বিপদমুক্ত এবং সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁর মক্কায় ফিরে যাওয়া উচিত। তবে আবুল হাকাম এই অগ্রগতি সম্পর্কে জানার পর পিছু হটতে অস্বীকার করেছিলেন। তারা যদি এখন লড়াই না করে মক্কায় ফিরে যায় তাহলে এটা তাদেরকে দুর্বল প্রতিপন্ন করবে এবং মুহাম্মদ আরও আক্রমণ চালিয়ে মক্কার বাণিজ্যকে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করবে। খালি হাতে ফিরে কিছুই লাভ হবে না, সবকিছু হারিয়ে যেতে পারে। তিনি মুহাম্মদকে হত্যা বা ধরে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তারা যদি তাঁকে জীবিত ধরতে পারে, তবে তাঁকে শৃঙ্খলে বেঁধে মক্কায় ফিরিয়ে আনবে। যদি দেখা যায় যে, মুহাম্মদ যুদ্ধ থেকে পালিয়েছে তবে তাঁরা তিনদিন বদরে ভোজনে কাটাবে এবং পূর্বনির্ধারিতভাবে বিজয় উদযাপন করবে।

মক্কার সমস্ত নেতা তাঁর মতো যুদ্ধের জন্য আগ্রহী ছিলেন না। রাবিয়া ভাইদের মতো গুরুত্বপূর্ণ বণিকরা মক্কায় ফিরে যাওয়া ভালো বলে মনে করেছিলেন। উতবা ইবনে রাবিয়া যুক্তি দিলেন যে, তাঁরা কাফেলা রক্ষার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন এবং কাফেলাটি এখন যেহেতু নিরাপদ তাই তিনি আর এগিয়ে যাওয়ার কোনও যৌক্তিকতা দেখছেন না। যদি তাদের বিশ্বাস অনুসারে মুহাম্মদ মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য আরবরা খুব শীঘ্রই তাঁর বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে তাঁকে হত্যা করবে। আবুল হাকাম তাঁকে কাপুরুষ বলে অভিযুক্ত করেন। তিনি (উতবা) যুদ্ধ করতে চাননি তার একমাত্র কারণ ছিল, তাঁর পুত্র আবু হুযায়ফা মুহাম্মদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্রকে হত্যা করা হবে বলে তিনি ভয় পেয়েছিলেন। আবুল হাকাম একটি সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এভাবে যে, তারা এই বিশ্বাসঘাতকদের কাউকে হত্যা করার চেষ্টা করবে না বরং কেবল তাদের ধরে মক্কায় ফিরিয়ে আনবে। হয়ত তাঁরা এখনও পুনর্বাসিত হতে পারে এবং তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মে ফিরে আসতে পারে। তবে রাবিয়া ভাইরা এই লড়াই না করার পক্ষে তর্ক করতে থাকে। তারা নিশ্চিত ছিল যে, এতে কোন ভালো ফল আসবে না।

এই তর্ক একধরনের হট্টগোলে পরিণত হয়। সেই রাতে দুটি ছোট গোত্র তাদের সাথে একশত যোদ্ধা নিয়ে সেনাবাহিনী ত্যাগ করেছিল। শেষ পর্যন্ত আবুল হাকাম উমাইয়া বিন খালাফ এবং অন্যান্য নেতাদের সমর্থনে রাবিয়া ও তাদের গোষ্ঠীগুলির সাথে তর্কাতর্কিতে বিজয়ী হন এবং যেই সংখ্যক সেনাদল অবশিষ্ট ছিল তাদের নিয়ে বদরের দিকে অগ্রসর হন।

মুহাম্মদ বদর থেকে মাত্র একদিন দূরে থাকতেই মক্কা সেনাবাহিনী সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। সিধান্ত নিতে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছিলেন - প্রস্তুতি নিয়েছিলেন মক্কার সম্পদ লুণ্ঠন করার, কিন্তু এখন মক্কাবাসীদের অস্ত্রের মুখোমুখি হতে হচ্ছে! সম্ভবত মুখ না হারিয়ে পিছিয়ে যাওয়ার উপায় সন্ধান করতে তিনি তাঁবুতে একটি সভা আহ্বান করেছিলেন এবং তাঁর শীর্ষ লোকদের কাছ থেকে পরামর্শ চেয়েছিলেন। আবু বকর এবং উমর একটি অপ্রতিরোধ্য মক্কা বাহিনীকে মোকাবিলার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়েছিলেন, তবে দু'জন নেতৃস্থানীয় ইয়াছরিবী সাদ বিন মুয়াদ ও মিকদাদ (Miqdad) যুদ্ধের সমর্থনে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছিলেন। একটি আবেগময় বক্তৃতায় সাদ যুক্তি দিয়েছিলেন যে, মুহাম্মদ আল্লাহর নির্দেশিত এবং তিনি কোনও ভুল করতে পারেন না। যদি মুহাম্মদ তাদেরকে যুদ্ধ করতে বলেন তবে তা-ই সই, কারণ আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদকে যুদ্ধ করতে বলেছিলেন। "আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি" - সাদ বললেন। "আমরা আপনার সত্যকে ঘোষণা করি, এবং আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি যা এনেছেন তা সত্য এবং আমরা আপনাকে কথা দিয়েছি, আর শোনার ও মেনে চলার অঙ্গীকার করেছি; কাজেই আপনি যেখানে ইচ্ছে সেখানে যান, আমরা আপনার সাথে আছি। এবং ঈশ্বরের শপথ, আপনি যদি আমাদেরকে এই সমুদ্রটি অতিক্রম করার অনুরোধ করেন এবং আপনি এটিতে নিমজ্জিত হন, আমরাও আপনার সাথে ডুবে যাব; একজন মানুষও পেছনে পড়ে থাকবে না। আমরা আপনার শত্রুর সাথে আগামীকাল দেখা করার প্রস্তাবকে অপছন্দ করি না। আমরা যুদ্ধে অভিজ্ঞ, লড়াইয়ে বিশ্বাসী" (৩)।

তারপরই মুহাম্মদ যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং দৃঢ় সংকল্পের সাথে নিজেকে এতে নিয়োগ করেছিলেন। ইরাকী ভ্রমণকারীর বেশ ধারণ করে তিনি এবং তাঁর বেশ কয়েকজন সহযোগী উপত্যকায় চড়ে বেড়িয়েছেন এবং পথে লোকজনকে থামিয়ে মক্কার সেনাবাহিনী সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করছিলেন (৪)। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, মক্কাবাসীরা বিশালাকার বালির ঢিবিগুলোর পেছনে শিবির স্থাপন করেছে। তাঁর বাহিনীতে ফিরে এসে তিনি তাঁর চাচাত ভাই আলী, জুবায়ের, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং অন্যান্যকে জলের এবং আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠালেন। তিনি মক্কার সেনাদলের আকার এবং গঠন সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন, তবে তিনি এই কাফেলার অবস্থান সম্পর্কেও জানতে আগ্রহী ছিলেন এই ভেবে যে, তাহলে হয়ত মক্কা সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপের আগেই সেখানে আক্রমণ করার সুযোগ পাবেন।

অসংখ্য বদরের কূপগুলির মধ্য থেকে একটিতে মক্কাবাসীদের জন্য চামড়ার ব্যাগগুলি পূরণ করার জন্য জল নিতে আসা ছেলেদেরকে মুহাম্মদের চাচাত ভাইরা ধরে ফেলল। তারা তাদের শিবিরে ছেলেদেরকে নিয়ে এসে মারধর করল, যেখানে মুহাম্মদ নামাজ আদায় করছিলেন। মারধরের কারণে তারা মুখ খুলল। বালকরা মক্কাবাসী বাহিনীর সঠিক সংখ্যাটি জানত না, কেবল জানত একথা যে তাদের খাবারের জন্য প্রতিদিন নয় থেকে দশটি উট জবাই করা হয়। সেখান থেকে মুহাম্মদ মক্কাবাসী বাহিনীর আকারটি কমপক্ষে নয়শ থেকে এক হাজারের মধ্যে অনুমান করেছিলেন। ছেলেরা কাফেলা সম্পর্কে কিছুই জানত না, কারণ তারা মক্কার সেনাবাহিনীর সাথে ছিল (কাফেলার সাথে নয়)। ছেলেগুলি যখন সেনাদলের নেতাদের নামসমূহ বলল, মুহাম্মদ আনন্দিত হয়েছিলেন। তারা প্রত্যেকেই মুহাম্মদের প্রতিশোধের তালিকায় ছিল। "মক্কা তাঁর কলিজার একটুকরো তোমাদের দিকে ছুঁড়ে ফেলেছে!" মুহাম্মদ তাঁর চাচাত ভাইদেরকে বলেছিলেন (৫)।

বদর উপত্যকাকে জানতেন, এমন একজন ইয়াছরিব ধর্মান্তরিতের পরামর্শ নিয়ে মুহাম্মদ মক্কাবাসীদের অবস্থানের নিকটতম একটি ঝর্নার কাছে শিবির স্থাপন করেছিলেন। এটি একটি বিচক্ষণ পদক্ষেপ ছিল, কারণ এটি মরূদ্যান থেকে বদরের প্রধান ঝর্নাগুলোর দিকে যাওয়ার পথে মক্কাবাসীদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে। মুহাম্মদের লোকেরা তাদের প্রয়োজনের পর্যাপ্ত জল

ধরে রাখার জন্য একটি চামড়ার জলাশয় তৈরি করেছিলেন। অবস্থানটিও একটি চতুর নির্বাচন ছিল, কারণ মক্কাবাসী অশ্বারোহীদের আক্রমণে বাধা দেয়ার জন্য যথেষ্ট বড় পাথর দ্বারা এই এলাকাটি বিস্তৃত ছিল। এছাড়াও মুহাম্মদ তাঁর শিবির এমনভাবে স্থাপন করেছিলেন, যাতে সকালের সূর্যের আলো অগ্রসরমান মক্কাবাসীদের চোখ বরাবর পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্রের একটা পরিপূর্ণ চিত্র সম্পর্কে নিজেকে ধারণা দিতে এবং শত্রুদের ছোঁড়া তীরের পরিসীমা থেকে নিজেকে নিরাপদে রাখতে কাছাকাছি কিছুটা উঁচু স্থানে তাঁর জন্য একটি ছাউনি তৈরি করা হয়েছিল, যেখান থেকে তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারবেন। দক্ষ যোদ্ধার মতো অভয় দেয়া এবং জান্নাতের পুরস্কার সম্পর্কে প্রচারণার পরেও মুহাম্মদের ভেতর ভয় ছিল। ওদের প্রতি একজনে বিপরিতে মক্কাবাসীদের সংখ্যা ছিল তিনজন, আর মক্কাবাসীরা ভালো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। তিনি এখন মারা যাওয়ার মতো সম্ভাবনার মুখোমুখি হলেন, এবং তিনি মারা গেলে তাঁর ধর্মও সম্ভবত হারিয়ে যাবে। কথিত আছে যে, তিনি রাতের বেশিরভাগ সময় নামাজে কাটাতেন, প্রায়শই কাঁদতেন এবং মক্কাবাসীদেরকে অভিশাপ দিতেন এবং তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের ধ্বংস করতে আল্লাহকে বলেছিলেন।

সেই রাতে বৃষ্টি হয়েছিল এবং মুহাম্মদের লোকেরা তাদের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিয়েছিল। ভোরের আলো ফোটার আগেই তিনি তাদেরকে যথারীতি প্রার্থনার জন্য ডাকলেন এবং ভেজা মাটিতে নামাজ আদায় করলেন। যখন চারদিকে আরো ফর্সা হল, তিনি তাদের সারিবদ্ধ লাইন ধরে দাঁড় করালেন। যদিও মুহাম্মদের সেনারা শত্রুভাবাপন্ন কিছু গোত্রের সাধারণ লোকদের মিশ্র দল ছিল, কিন্তু প্রার্থনার শারীরিক আচার-অনুষ্ঠানগুলি তাদের মধ্যে সুসজ্জিত সামরিক বাহিনীর ন্যায় শৃঙ্খলা আর জোশের তৈরি করেছিল। মুহাম্মদ সর্বদা নামাজের সোজাসুজি সারি বিন্যাসে জোর দিতেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ফেরেশতা এই পদ্ধতিতেই প্রার্থনা করেছিলেন। তারা একযোগে যেন তাদের প্রার্থনা রুটিনগুলি করতে পারে সেদিকে তিনি জোর দিয়েছিলেন, যার ফলে সামরিক বাহিনী গঠনের জন্য সারিবদ্ধ অবস্থান এখন প্রায় স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যাচ্ছে। একটি ড্রিল সার্জেন্টের (Drill sergeant) মতো, তিনি সারিগুলির উপরে এবং নিচে যাওয়া আসা করছিলেন, এবং যে কাউকে লাইনের বাইরে দেখলেই তীরের ধারালো ডগা দিয়ে গুঁতো দিতেন। সাওয়াদ (Sawwad) নামের এক ব্যক্তি তাঁর শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে যাওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়েছিল, বাহিনী হতে সরে যাওয়ার জন্য জোরাজুরি করছিল। মুহাম্মদ তাঁকে তীরটি ধরিয়ে দিলেন এবং জামাটি খুলে তাঁর পেটটি উন্মোচিত করলেন, এবং স্বতস্ফূর্তভাবে বললেন, "এগিয়ে যাও, এটি দিয়ে আমাকে আঘাত কর!" প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে, লোকটি তাঁর ঘাড়ের উপর দিয়ে অস্ত্র ছুঁড়ে মারলেন এবং হাঁটু গেড়ে বসে মুহাম্মদের খালি পেটে চুমু খেলেন। কেন এমনটি করল মুহাম্মদ তাঁকে জিজ্ঞেস করলে লোকটি বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনি যা ঘটতে যাচ্ছে তা দেখতে পাচ্ছেন। আমি চেয়েছিলাম আপনার সাথে আমার শেষ যোগাযোগটি যেন আপনার ত্বককে স্পর্শ করে হয়"। মুহাম্মদ তাঁর আত্মবিশ্বাসের প্রতি আস্থা রাখার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন এবং তাঁর জন্য একটি প্রার্থনা করলেন (৬)।

ততক্ষণে মক্কাবাসীরা বাতাসে তাদের পকাতা উড়িয়ে এবং হুবাল, আল-উজ্জা এবং আল-লাতের মূর্তিগুলি উঁচু খুঁটিতে তুলে প্রদর্শন করে ঘোড়ায় চড়ে এবং পায়ে হেঁটে বালির টিলার দিকে এগিয়ে আসছিল। তারা শীঘ্রই মুহাম্মদের বিপরীতে তাদের নিজস্ব লাইন তৈরি করে দাঁড়ালো, ধনুকের তীরের আওতার বাইরে। কিন্তু এতে করে মক্কানদের অনেকেই তৃষ্ণার্ত পড়ে, কেউ কেউ ছিল চরম হতাশায় নিমজ্জিতও। এর আগের রাতেই মুহাম্মদের লোকেদের কারণে তাঁরা কেবল তাদের জল সরবরাহকারী ছেলেগুলোকেই নয়, তাদের জলের থলে এবং উটগুলিও হারিয়ে ফেলেছিল। মুহাম্মদের সামরিক শিবিরের অবস্থানটি উপত্যকার জলের উৎস থেকে মক্কাবাসীদের বিচ্ছিন্ন করেছিল। এই জলের সংকট মক্কাবাসীদের উপর কতটা মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তাদের মধ্য থেকে একটা দল তাদের দলীয় শৃংখলা ভেঙে ফেলে আর মুহাম্মদের লোকদের তৈরি করা চামড়ার জলাশয়ের দিকে দৌড়ে যায়, যা মুহাম্মদের যুদ্ধক্ষেত্রের পাশেই ছিল। মুহম্মদ তাদের জল পান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যার মূল কারণ ছিল এই দলের একজন ছিলেন খাদিজার ভাগ্নে হাকিম ইবনে হিজাম, যে ব্যক্তি জায়েদ ইবনে হারিছা নামের এক দাসকে বাজার থেকে কিনে খাদিজাকে দিয়েছিল। তারা জলপানের পর

তাদের বহরে ফিরে আসার পরে, আবুল হাকামের মাখজুম গোত্রের আসওয়াদ (Aswad) নামে এক ব্যক্তি দৌড়ে জলাশয়ের দিকে ছুটে গেল, কিন্তু সে মুহাম্মদের প্রতিশোধের তালিকায় ছিল এবং তাঁকে দয়া দেখানো হয়নি। মুহম্মদ তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ করার জন্য হামজাকে ইঙ্গিত দিলেন। জল খেতে নামার আগে হামজা আসওয়াদের একটি পা কেটে ফেলেছিল এবং আসওয়াদ শেষবারের মতো জল খাওয়ার জন্য তাঁর শরীরকে কোনমতে কুয়োর টেনে নিয়ে যাওয়ার সময়েও হামজা তাঁকে অনুসরণ করে। এরপর হামজা পেছন দিকে তাঁর পিঠে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিল। আসওয়াদের রক্তাক্ত লাশটি জলের নিচের দিকে মুখ করে ভেসে রইল।

সত্যিকারের লড়াই শুরু হওয়ার ঠিক আগে মুহাম্মদের একটি মৃগীরোগের খিঁচুনি হল। যুদ্ধ শুরুর আগে আগে তাঁর লোকদের লাইনে দাঁড় করিয়ে তদারকি করার সময়কালীন মানসিক চাপ তাঁর স্নায়ুর পক্ষে খুব বেশি ছিল, যা একপর্যায়ে বিগড়ে গিয়ে এই খিঁচুনির সূত্রপাত হয়। তিনি লক্ষণগুলি জানতেন — ঠান্ডা ঘাম হওয়া, মাথার ভেতরে ভারি অনুভূতি, ঘণ্টা বাজানোর শব্দ এবং গলা চেপে ধরা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়া। কঠোর প্রার্থনায় খিঁচুনিকে দূরে রাখার প্রয়াসে তিনি ছাউনির দিকে ছুটে গেলেন, পেছন পেছন শঙ্কিত আবু বকরও ছুটলেন। তিনি অনেক সময় ধরে প্রার্থনা করতে থাকলেন যে, একান্ত অনুগত আবু বকর পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। "যথেষ্ট হয়েছে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার পালনকর্তাকেও অধৈর্য্য করে ফেলছেন"(৭)।

মূর্ছা যাওয়ার আগে মুহাম্মদ আবু বকরকে আদেশ দিয়ে বললেন : "আমি তোমাকে আদেশ না দেয়া পর্যন্ত লড়াই শুরু করো না। যদি তারা কাছাকাছি আসে তীর দিয়ে তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করবে, তবে তরবারিগুলি বের করবে না যতক্ষণ না তারা তোমার উপর প্রবল হয়"। খিঁচুনি বাড়ার সাথে সাথে মুহাম্মদের মুখ লাল হয়ে গেল এবং তাঁর ঠোঁট বিদঘুটে রকম বেঁকে গেল। আবু বকর তলোয়ার উঁচিয়ে মুহাম্মদকে পাহারা দিতে লাগলেন এবং কাউকে তাঁর কাছে যেতে দিলেন না, এমনকি উমর বা সেনাপতিদেরও না, যারা আদেশ পাবার জন্য ছাউনিতে ছুটে এসেছিল। আবু বকর তাদের সবার দিকেই তলোয়ার তাক করে মুহাম্মদের নির্দেশের কথা পুনর্ব্যক্ত করলেন।

খিঁচুনি পর্বের শেষে মুহাম্মদ যেন ভাবের এক উঁচু স্তরে চলে গেলেন। তাঁর মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোব তাঁর মনে আর দৃষ্টিতে এক ধরণের তীব্র আনন্দানুভূতির খোরাক জুগিয়েছে, এবং এটা তাঁর খুবই দরকার ছিল। তিনি জিব্রাইল ফেরেশতাকে বেহেশত ও পৃথিবীর মাঝামাঝি কোনো এক স্থানে একটি ঘোড়ায় চড়তে দেখেছিলেন, এবং তাঁর ঘোড়া সেখানে যুদ্ধের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ছিল। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফেরেশতা, যেমন কাফেরদের শত্রু মিকাইল (Michael) এবং শিংগা বাজানোর ফেরেশতা ইস্রাফিল (Israfil) ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া ঝকঝকে সাদা পোশাকের ফেরেশতাদের বিশাল বহরকে নেতৃত্বে দিচ্ছিলেন। তলোয়ার উঁচিয়ে ঈমানদারদের পক্ষে লড়াই করার জন্য তারা নিচে নেমে আসছিলেন — জিব্রাইলের নিজের এক হাজার সহ তাদের সারির ডানদিকে মিকাইলের এক হাজার ফেরেশতা, বামে ইস্রাফিলের আছে আরো এক হাজার ফেরেশতা (৮)।

বিভ্রান্তির আচ্ছন্নতায়, প্রভুর সহায়তার আনন্দময় সংবাদটি লোকদের কাছে চিৎকার করে বলতে মুহাম্মদ তাঁর ছাউনি থেকে ছুটে গেলেন। ফেরেশতাদের মনোবল চাঙ্গা করা ঐশ্বরিক কথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল এবং সংখ্যায় একেবারে ছোট সেনাবাহিনীর উচ্চপদের ও সাধারণ সেনাদের মাঝে যথেষ্ট সাহসের সঞ্চার করল। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য লড়াই করে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য বেহেশতের, আর বেঁচে যাওয়াদের জন্য গণিমতের মালের প্রতিশ্রুতির কথা মুহাম্মদ ব্যক্ত করলেন। ঈমানদারগণ ইতিমধ্যে এই পুরস্কার সম্পর্কে জানত; এ কারণেই তারা এই অভিযানের জন্য স্বেচ্ছাসেবীর কাজ করেছিল, কিন্তু নবীর কাছ থেকে সেকথা আবার শুনতে পেয়ে তাদের মনোবল আরও সুদৃঢ় হল।

ঘোড়ার পিঠে সওয়ার এবং পায়ে দাঁড়ানো শিরস্ত্রাণে ঢাকা মক্কাবাসী সৈন্যদের সমাবেশ যেন একটি শক্তিশালী প্রাচীর হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল। আবিসিনিয়ার অনেক ভাড়াটে সৈন্যসহ স্থলভাগের সেনারা নাঙ্গা তলোয়ার আর তীর-ধনুক হাতে সুসজ্জিত ছিল। মক্কাবাসীদের যুদ্ধায়োজনের ঐক্যের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল এক অভ্যন্তরীণ কোন্দল। এমনকি সৈন্যদের সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে রাখার পরেও মক্কার নেতারা আগের রাতে হওয়া তাদের ঝগড়া চালিয়ে যান। উৎকট সুগন্ধি মাখা লৌহবর্মের পোশাক পরে আবুল হাকাম যুদ্ধের ঘোড়ায় সওয়ার হলেন, এর আগে অস্ত্রশস্ত্র গুছানোর সময় তাঁর সাহস সম্পর্কে উতবাকে একটু খোঁচাও করে দিলেন। "তোমার ফুসফুস ভয় দিয়ে তোমার পেট ভরে ফেলেছে" তিনি উতবাকে বললেন। ক্ষুব্ধ হয়ে উতবা আবুল হাকামের ঘোড়ার সামনের পায়ে আঘাত করে ঘোড়ার রগ কেটে করে দেয়, আর তাতে ঘোড়াটি নিচে পড়ে যায়। এরপর মুখে ভেংচি কেটে আবুল হাকামকে অন্যদের মত পায়ে হেঁটে লড়াই করার করতে বললেন উতবা (৯)।

নিজের সাহসিকতা প্রমাণের জন্য উতবা তাঁর ছেলে ওয়ালিদ এবং তাঁর ভাই শাইবাকে নিয়ে মক্কাবাসীদের সারি থেকে সামনের দিকে এসে শত্রুদেরকে সম্মুখ সমরের আহ্বান জানালেন। তিন তরুণ ধর্মান্তরিত ইয়াছরিবী তাদের সারি থেকে সামনে এসে দাঁড়াল, কিন্তু উতবা অভিযোগ করলেন যে, তাঁরা পদমর্যাদায় দিক থেকে তাদের সমান নয়। একজন মক্কান সেনানায়ক হিসেবে তিনি সমমর্যাদার যোদ্ধাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে চাচ্ছেন। ততক্ষণে মুহাম্মদ তাঁর মৃগীরোগজনিত খিঁচুনি থেকে বের হয়ে এসেছেন এবং তাঁর বাহিনীর সৈন্যদের সামনে-পেছনে ছোটাছুটি করে ফেরেশতাদের দেয়া প্রতিশ্রুতিসমূহ চিৎকার করে বলছিলেন। মক্কাবাসীদের দেখে নিতে মুহাম্মদ হামজা, আলী এবং অন্য এক নিকটাত্মীয়, আগের বছরের এক কাফেলা অভিযানের নেতা উবায়দা বিন হারিছকে নির্দেশ দিলেন। তাঁরা মুখ ও মাথা লোহার শিরস্ত্রাণে ঢেকে বাইরে বের হয়ে এলেন, যা তাদের একপ্রকার ছদ্মবেশ প্রদান করল। এবং কেবল উতবা জানতে চাইলে তাঁরা তাদের পরিচয় প্রকাশ করলেন। এটি একটি অসম লড়াই ছিল। বয়স্ক উতবা ও শায়বা বীর হলেও, শারীরিকভাবে সমর্থ ছিলেন না। শিকারের দক্ষতা এবং উত্তপ্ত মেজাজের জন্য খ্যাতিমান হামজা ষাটের কাছাকাছি বয়সেও শারীরিকভাবে শক্তিশালী ছিলেন। হিংস্র ক্ষিপ্রতার সাথে তিনি দ্রুত উতবাকে মেরে ফেলেন, আর আলী দেখতে ছোটখাটো হলেও পেশীবহুল হাত আর শরীরকে কাজে লাগিয়ে উতবার পুত্র ওয়ালিদকে হত্যা করেন। শায়বা তাঁর একটি পা হারিয়েও উবায়দার চেয়ে ভালো করছিল, কিন্তু হামজা ও আলী শায়বাকেও কুপিয়ে হত্যা করে।

উভয়পক্ষেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত বা আহত হয়েছে। উবায়দাকে মুহাম্মদের ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তাঁর সামনে তাঁকে শুইয়ে দেয়া হয়েছিল, তাঁর বিচ্ছিন্ন পা থেকে রক্ত ঝরছে। মুহাম্মদ তাঁকে তাঁর পায়ে মাথা রাখার অনুমতি দিলেন যাতে ঈশ্বরের রাসুলকে স্পর্শ করার মধ্য দিয়ে তাঁর মৃত্যু সম্মানিত হয়। উবায়দা রক্তক্ষরণের ফলে মারা গেলে মুহাম্মদ ঘোষণা দেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি একজন শহীদ" (১০)।

এ পর্যায়ে, যুদ্ধটি পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। উভয়পক্ষই তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে পস্পরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে সারিবদ্ধভাবে থাকায়, মুহাম্মদের যোদ্ধারা তীরের আঘাত থেকে নিজেদের ভালো করে রক্ষা করতে পারছিল। খুব শীঘ্রই দুই পক্ষের সব সৈন্য একাকার হয়ে লড়াই করে যেতে লাগল, যা হাতাহাতির পর্যায়ে চলে গেল। তলোয়ার উঁচিয়ে একে অপরের শিরস্ত্রাণ, বর্মে আঘাত করে যেতে লাগল। বর্শা লোহার পাত ভেদ করে মাথার খুলিতে গিয়ে আছড়ে পড়ছিল।

এটি ছিল দেবতাদের যুদ্ধক্ষেত্র। ঐশ্বরিক মা আল-উজ্জা, প্রজনন শক্তির দেবী আল-লাত এবং পৌরুষদীপ্ত দেবতা হুবালের সাথে মুহম্মদের প্রতিশোধপরায়ণ এক ঈশ্বরের সাথে সংঘর্ষ, যে ঈশ্বর মুহাম্মদের উপর বিশ্বাস না রাখা সকলের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি নিয়ে আসছিলেন।

সংখ্যায় মক্কাবাসীরা ছাড়িয়ে গেলেও, মুহাম্মদের লোকেরা উগ্র আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান ছিল। গণিমতের মাল বা জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের উন্মত্ত করে তোলা হয়েছে। রক্ত এবং নিজ তলোয়ারের দক্ষতায় উচ্ছ্বসিত আলী রণাঙ্গন জুড়ে ঝড় তুলে একের পর এক লোককে হত্যা করে যাচ্ছিলেন। তিনি হাজিজ, নুবায়ে, আমির, জায়েদ, উমায়ের, মাসুদ, আবদুল্লাহ, ইয়াজিদ, আমওয়াজ সহ আরও অনেককেই হত্যা করেছিলেন। তাঁর হাতে নিহত হওয়া কয়েকজন ছিলেন স্বনামধন্য মক্কাবাসী নেতা, যেমন আবু সুফিয়ানের পুত্র হানজালা (Hanzala)। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে আলী আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধবন্দিকেও হত্যা করেছিলেন, যাদের মধ্যে ছিলেন খুওয়ালিদের পুত্র এবং খাদিজার সৎ ভাই নওফাল (Nawfal), যিনি একবার তাঁর মা সাফিয়ার প্রহার থেকে জুবায়েরকে উদ্ধার করেছিলেন। মুহাম্মদ যখন জানতে পারলেন তাঁর চিরশত্রু এই শ্যালককে আলী হত্যা করেছে তখন তিনি চিৎকার করে বললেন, "আল্লাহু আকবার! সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর (নওফাল) বিষয়ে আমার প্রার্থনার জবাব দিয়েছেন"(১১)। এই যুদ্ধ ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই, চাচাত ভাইয়ের বিরুদ্ধে আরেক চাচাত ভাই, ছেলের বিরুদ্ধে বাবাকে মুখোমুখি দাড় করিয়েছিল। বলা হয়, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ এতটাই উন্মত্ত ছিল যে, সে তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহকেও হত্যা করেছিল। মক্কার ধর্ম পরিত্যাগ এবং মুহাম্মদের পছন্দ অনুসারে তাঁর সাথে যোগদানের কারণে, যুদ্ধে ঘৃণার বহিপ্রকাশ হিসেবে আবদুল্লাহ তাঁর দিকে তীর ছুঁড়েছিলেন। পথ অবরুদ্ধ না করা পর্যন্ত আবু উবায়দা তাঁর পিতাকে এড়াতে সক্ষম হন। দুজনের মাঝে সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষের পর, পুত্র তাঁর তলোয়ারটি পিতার উপর চালিয়ে দেয়। আরও বলা হয় যে, মুহাম্মদের ধর্ম অস্বীকার করার কারণে যুদ্ধের সময় আবু বকরও তাঁর এক পুত্রকে হত্যার উদ্দেশ্যে তীর ছুঁড়েছিলেন, কিন্তু পুত্র তাঁর ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গিয়েছিল।

লোকদের তাঁর কারণে মরতে উদ্বুদ্ধ করার পেছনে মুহাম্মদের এক অনন্য প্রতিভা ছিল। লড়াইয়ের এক চূড়ান্ত সময়ে, নবীন এক ঈমানদার তাঁর হুকুমদাতার (মুহাম্মদ) ছাউনিতে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "সমর্পণকারীদের এমন কী করা উচিত যা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট করতে পারে?" মুহাম্মদ যখন বলেছিলেন, "তাদের উচিত শিরস্ত্রাণ বা লৌহবর্ম ছাড়াই শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া" যুবকটি তখন তাঁর শরীর থেকে লৌহবর্মটি খুলে ফেলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণ পর মারা যায় (১২)।

যুদ্ধ থেকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকা আরেকজন যুবক মুহাম্মদকে চিৎকার করে বলতে শুনল : "যে সমস্ত লোক সাহসের সাথে লড়াই করে এবং পিছপা না হয়ে অগ্রসর হয় আল্লাহ তাদের স্বর্গে প্রবেশ করিয়ে দেবে"। এ কথা শুনে লোকটি চিৎকার করে বলল, "দুর্দান্ত! দুর্দান্ত! আমার ও জান্নাতের মধ্যেকার যা কিছু আছে, তা কি আমাকে মেরে ফেললেই ঘুচে যাবে?" এরপর তিনি লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত লড়াই করলেন (১৩)।

মুহাম্মদের হিটলিস্টের শীর্ষে ছিলেন আবুল হাকাম। মুহাম্মদের সমস্ত যোদ্ধারা জানতেন যে, তিনি তাদের প্রধান লক্ষ্য। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তাঁর গোষ্ঠীপতিরা তাঁকে ধর্মান্ধদের ছোবল থেকে রক্ষা করেছিল, কিন্তু মুহাম্মদের লোকেরা তাঁকে পাকড়াও করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। তারা যখন মক্কাবাসীদের বাহিনীর মাঝে ছেদ দেখতে পেল, তাদের মধ্যে তিনজন আবুল হাকামের জন্য একটা হিংস্র আক্রমণের পরিকল্পনা করল। আবুল হাকাম একজন বয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে যতটা সাহসের সাথে লড়াই করতে হয় ঠিক সেভাবেই তরুণ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন। তাঁর পুত্র ইকরিমা তাঁর বাবাকে রক্ষা করে তাঁর পাশে থেকেই লড়াই করছিল, তবে আক্রমণকারীদের মধ্যে একজন আবুল হাকামের এক উরুর মাঝ বরাবর কেটে ফেলে মারাত্মক জখম করেছিল। ইকরিমা আক্রমণকারীটির বাহু কেটে ফেলল, একটা পাতলা মাংসের উপর হাতের বাকি অংশটা ঝুলে ছিল। কথিত আছে যে, আহত ব্যক্তিটি তাঁর হাত নিজে ছিঁড়ে ফেলেছিল এবং যতক্ষণ না ব্যথা এবং রক্তের ক্ষয় তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়তে বাধ্য করে, ততক্ষণ সে লড়ে গেছে।

মুহাম্মদ উঁচু পর্যবেক্ষণ চৌকি থেকে মৃতদেহগুলির স্তুপ করা দেখছিলেন। তিনি ছিলেন সেই যাদুকরের শিক্ষানবিশের মতো, যিনি আবেগ দিয়ে শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। এমন বর্বর দৃশ্যপট তাঁকে উত্তেজিত করল, কিন্তু এই শক্তি তাঁর বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন কোনও ঝুঁকি তিনি নিলেন না। প্রহরী হিসেবে তাঁকে ঘিরে ছিলেন উমর, আবু বকর, সাদ বিন মুয়াদ, মিকদাদ এবং অন্যান্য প্রমুখ তাঁর শীর্ষ অনুচররা। এই অভিযানের দুটি মাত্র ঘোড়া যা বাঁধা ছিল ছাউনির বাইরে। যদি এই উপত্যকা রক্ত দিয়ে ভরে উঠত এবং রক্ত যদি ক্রমাগত বাড়তেই থাকত এবং তাঁর চারপাশটা ঘিরে ফেলত, তবে তিনি এবং আবু বকর একলাফে সেগুলোর উপর সওয়ার হয়ে দ্রুত পালিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলেন।
যুদ্ধ কতদিন স্থায়ী ছিল তা লিপিবদ্ধ নেই, তবে এটি মুহাম্মদের জন্য অপ্রতিরোধ্য বিজয় হিসেবেই শেষ হয়েছিল। তাঁর অনুসারীরা নিশ্চিত ছিল যে, তাঁরা যদি নিহত হয়, দক্ষ এক বাহিনীকে যদি তাঁরা পিটিয়ে মেরে ফেলে এবং মক্কার সেনাদলের বেশিরভাগ অংশ যদি পালিয়ে যায় তবে তাঁরা জান্নাতবাসী হবে। যুদ্ধের ময়দানের বাঁদিকে ছিল সত্তর মক্কাবাসীর মৃতদেহ যার বেশিরভাগই নেতাদের। আরও সত্তর মক্কাবাসীকে বন্দী করা হয়েছিল। মুহাম্মদের মাত্র চৌদ্দজন সৈন্য মারা গিয়েছিল।

লড়াই শেষ হয়ে গেলে বিশ্বস্ত চাকর আর একসময়ের রাখাল ছেলে আবদুল্লাহ বিন মাসুদকে মুহাম্মদ আবুল হাকামের মৃতদেহ সন্ধানের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। মুহাম্মদ মাসউদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁকে চিহ্নিত করতে যদি সমস্যা হয় তবে তাঁর হাঁটুর উপর একটি দাগ দেখতে। বাল্যকালে, মুহাম্মদ একটা ভোজসভায় নিজের জায়গা করে নিতে আবুল হাকামকে একটা বেঞ্চ থেকে ধাক্কা দিয়েছিলেন। এতে আবুল হাকামের হাঁটু পাথরের মেঝেতে ঘষা খেলে স্থায়ী ক্ষতের তৈরি হয়। মাসুদ যখন তাঁকে পেল মক্কার এই নেতা তখনও বেঁচে ছিলেন। তিনি একটা কাঁটাঝোপের মাঝে চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন। রক্তক্ষরণে তিনি এতটাই দুর্বল ছিলেন যে, নিজের আত্মরক্ষার জন্য তলোয়ারটি তোলার শক্তিও তাঁর ছিল না। তাঁর প্রতি মাসুদের ব্যক্তিগত ঘৃণা ছিল, কারণ তিনি সেই মক্কাবাসীদের একজন ছিলেন যিনি একবার মাসুদকে মন্দিরের সামনে মুহাম্মদের আয়াত পাঠ করার জন্য মারধর করেছিলেন। আবুল হাকাম তাঁকে চিনতে পেরে বললেন, "তুমি সেই ছোট্ট রাখাল ছেলে, আজ দুনিয়ায় মাথা তুলে আছো"। মাসুদ তাঁর শিরস্ত্রাণ ছিঁড়ে ফেলল এবং মাথা কেটে ফেলল। সে মুহাম্মদের কাছে ছিন্ন মাথাটি নিয়ে তাঁর পায়ের কাছে রাখলেন। মুহাম্মদ এতটাই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি বেহেশতের দিকে হাত তুললেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন, আবুল হাকামের মৃত্যু তাঁর কাছে 'আরবের সেরা উট' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট (উপহার)। তারপর তিনি দু'রাকাত নামাজ পড়লেন এবং মাসুদকে আবুল হাকামের রৌপ্য-নির্মিত কারুকার্যময় হাতলসহ তলোয়ারটি রাখার জন্য দিলেন, যা বংশ পরম্পরায় পারিবারিক উত্তরাধিকার হিসেবে রয়ে গেছে (১৪)।

মক্কার মন্দিরের পাটাতন থেকে মুহাম্মদকে প্রায়শই জমিদারসুলভ টিটকারী দেয়া মক্কার ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন উমাইয়া বিন খালাফকে আত্মসমর্পণের পর হত্যা করা হয়। তাঁর প্রাক্তন দাস বিলাল (Bilal) তাঁকে এবং তাঁর ছেলেদেরকে বন্দিদের মাঝে চিহ্নিত করেছিল। উমাইয়া একবার বিলালকে বেশ উত্তপ্ত মরুর মাঠে আটকে রেখেছিল এবং মুহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ করার জন্য তাঁর বুকে একটি ভারি পাথর রেখেছিল। খালাফকে হেফাজতে দেখে বিলাল চিৎকার করে বলে উঠল, "আরে, এখানে তো বহুশ্বরবাদীদের নেতা উমাইয়া বিন খালাফ আছে দেখছি! সে বাঁচলে আমি বেঁচে থাকব না" (১৫)! উমাইয়া এবং তাঁর ছেলেদের দ্রুত ঘিরে ফেলা হলো। কারারক্ষী তাদের রক্ষার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাঁকে একপাশে ঠেলে দেয়া হয় এবং উমাইয়া ও তাঁর ছেলেদের কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

মুহাম্মদ এমনভাবে এত চমৎকার বিজয় উদযাপন করেছিলেন যে, যেন কেবল মুহাম্মদেরই এমনটা করার কথা। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, এবং তিনি আরও প্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন। নামাজের পরে তিনি বন্দি উটগুলিকে তাঁর লোকদের ভোজ দেয়ার জন্য জবাই করার আদেশ দেন। প্রার্থনা ও ভোজের আয়োজনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর কারণে যারা "শহীদ" হয়েছে তাদের কবর দেয়ার পাশাপাশি মক্কার মৃতব্যক্তিদেরও স্থানের (দেহ রাখার) ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর প্রতিশোধের

তালিকায় যারা ছিলেন, তাদের জন্য তিনি এক বিশেষ শেষকৃত্যের আয়োজন করেছিলেন। স্থানীয় লোকদের ডাস্টবিন হিসেবে ব্যবহৃত একটি পরিত্যক্ত কূপে মৃতদেহগুলি ফেলে দেয়া হয়েছিল।

যুদ্ধের তিনদিন পরে লাশগুলোর কবর দেয়া হয়েছিল এবং তীব্র গরমের ফলে মৃতদেহগুলি ফেঁপে উঠে পচতে শুরু করে। নিজের উটের পিঠে বসে মুহাম্মদ এই আয়োজনের দেখভাল করেন। আবু বকর মৃত ব্যক্তিদের নামগুলো সব একবারে ঘোষণা করলেন। হাত ও পা ধরে ঝুলিয়ে লাশগুলোকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। উতবার পুত্র আবু হুযায়ফা তথায় উপস্থিত ছিলেন। যখন আবু বকর তাঁর পিতার নাম ডাকলেন তখন লাশটি গর্তে নিক্ষেপ করার আগে মুহাম্মদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর বাবার মৃত্যুর জন্য দুঃখ পেয়েছেন কিনা! হুযায়ফা জোর দিয়ে বললেন যে, তিনি দুঃখিত নন। তিনি তাঁর পিতাকে জ্ঞানী, সংস্কৃতমনা এবং পুণ্যবান হিসেবে মনে করতেন, কিন্তু তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং তাই তিনি তাঁর নিজের ধ্বংস ডেকে এনেছেন। "আমি আশা করেছিলাম ইশ্বর তাঁকে ইসলামের পথে পরিচালিত করবেন। যখন এটি ফসকে গেল এবং আমি দেখলাম যে, তিনি এটি গ্রহণ করেননি তখন আমি বিরক্ত হয়েছিলাম" হুযায়ফা বলেন (১৬)।

একমাত্র মক্কাবাসী যাকে গর্তে ফেলে দেয়া হয়নি তিনি হলেন উমাইয়া বিন খালাফ। এর কারণ, তিনি এতটাই মোটা ছিলেন যে তাঁর শরীরটা তোলার চেষ্টা করার সময় তাঁর হাত-পা শরীর থেকে আলাদা হয়ে আসে। পরবর্তীতে কাদা আর পাথরচাপা দিয়ে তাঁকে কবর দেয়া হয়।

যখন শেষ মৃতদেহগুলি গর্তে ফেলে দেয়া হয়েছিল মুহাম্মদ উটের উপরে থেকে তাদের সমাধিতে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিলেন : "তোমাদের কি ইচ্ছে করে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করতে?" যখন উমর ইশারা করলেন যে তিনি আসলে মৃতদের সাথে কথা বলছেন, মুহাম্মদ জবাব দিলেন যে, তারা কবরের নিচে থাকলেও শুনতে পাচ্ছে। ওমর যেমনটা শুনতে পাচ্ছে, তারাও ঠিক তেমনিভাবেই তাঁকে শুনতে পাচ্ছে (১৭)।

শত্রুদের প্রতি ঘৃণা তাঁকে পোড়াতে লাগল। গভীর রাতে লোকেরা তাঁকে উদ্ভ্রান্তের মত বলতে শুনত : "হে উতবা, হে শাইবা, ও উমাইয়া, হে আবু জাহল! আমার পালনকর্তা আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার সত্যতা আমি পেয়েছি। "তোমাদের দেবতারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা কি সত্য বলে তোমরা খুঁজে পেয়েছ?" (১৮)।
শুধু মৃতদেহ ছাড়াও তাঁর অনেক কিছু নিষ্পত্তি করার আছে। বন্দিদের ভাগ্য নির্ধারণ এবং যুদ্ধের মুনাফা বিতরণ করা। কাফেলাটি দখল করতে সক্ষম হলে তারা যে মালসামান অর্জন করতে পারত সে তুলনায় তাঁরা যুদ্ধে খুব কমই মালসামান পেয়েছিল, তবে 'আল্লাহর অনুগ্রহের' প্রমাণ এখনও পাওয়া যাচ্ছে! অস্ত্র এবং যুদ্ধের সরঞ্জামাদি ছাড়াও লুটপাটের বস্তুর মাঝে ছিল একশত পঞ্চাশটি উট বোঝাই পণ্য, দশটি ঘোড়া এবং তাঁবু, পোশাক এবং বালির ঢিবির অন্যপাশে তাদের শিবিরে ফেলে রাখা বিবিধ ব্যক্তিগত জিনিসপত্র।

লুটের মাল বিতরণ করা একপ্রকার দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছিল। তিন শতাধিক লোক দাবি ও পাল্টা দাবি করছিল। বিভ্রান্তির জন্য মুহাম্মদই দায়ী ছিলেন। যুদ্ধ চলার সময় এক বার্তাবাহককে তিনি প্রেরণ করেছিলেন এই ঘোষণা দিতে যে, "যাকে যে হত্যা করবে, সে তাঁরই লুটের মাল ও যুদ্ধবন্দী পাবে, সে তার মালিক হবে"। যে যোদ্ধারা হত্যা করেছিল বা বন্দি করেছিল তারা ছিল প্রাথমিক সুবিধাভোগী, তবে সবাইই হত্যা করতে বা কোন শত্রুকে ধরতে সক্ষম হয়নি, যেমন মুহাম্মদকে নেতৃত্বের আসনে ঘিরে রাখা তাঁর লোকেরা। তাদের কি কিছু পাওয়া উচিত নয়? অন্যান্য সমস্যাগুলি ছিল : তাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকেরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল যে, তাদের কিছু বন্দিদের অযথা হত্যা করা হয়েছিল, যেমন উমাইয়া বিন খালাফ এবং তাঁর



[মক্কার উপদেষ্টাদের প্রধানের ছিন্ন মাথা যখন মুহাম্মদের সামনে নিয়ে আসা হয়, তিনি তখন উল্লাস করেছিলেন। মক্কাবাসীরা তাঁর নাম দিয়েছিল আবুল হাকাম, যার অর্থ বিদগ্ধ সিদ্ধান্তদাতা, কিন্তু মুহাম্মদ তাঁকে আবু জাহল (Abu Jahl) তথা পাগলামির জনক নামে ডাকতেন। মুহাম্মদের আক্রমণ থেকে মক্কার কাফেলা রক্ষার লড়াইয়ে তিনি মারাত্মক আহত হয়েছিলেন। যুদ্ধে নিহত হওয়ার খবর পেয়ে মুহাম্মদ তাঁর এক চাকরকে আবুল হাকামের লাশ সন্ধান করতে পাঠিয়েছিলেন। যখন চাকরটা তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পেল, তখন সে তাঁর মাথা কেটে মুহাম্মদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন, যিনি মক্কার নেতার মৃত্যু কামনা করে তাঁর প্রার্থনার জবাব দেয়ার জন্য ঈশ্বরের শুকরিয়া আদায় করেছিলেন।]

পুত্র যাদেরকে বিলালের উস্কানিতে হত্যা করা হয়েছিল। আলী ও উমরও সমস্যা সৃষ্টি করেছিলেন, কারণ তারা যুদ্ধবন্দিদের মালিকদের কাছ থেকে কিছু ঘৃণ্য (তাদের দৃষ্টিতে) বন্দিদের ধরে নিয়েছিলেন এবং তাদের পরে জবাই করে খুন করেছিলেন। কৌশল করে বলতে গেলে, আলী এবং উমর এই হত্যাকাণ্ডের জন্য গনিমতের মাল দাবি করতে পারেন। ঐ বন্দিদের আটককারীরা নয়, বরং তাঁরা দুজন গণিমতের মাল লাভ করেছিলেন। জটিলতা আরও বেড়েছে এখন, কারণ নিহত বন্দিদের মুক্তিপণের মূল্য থেকে যুদ্ধবন্দিদের ন্যায়নিষ্ঠ মালিকেরা বঞ্চিত হচ্ছে। মৃত লোকদের তো কোন মূল্য নেই (সুতরাং তাদের মুক্তিপণও নেই)। এরপর ছিল ফেরেশতাদের সমস্যা। ফেরেশতারা যাদের মেরেছে তাদের গনিমতের মাল কে পাবে? মুহাম্মদের কিছু যোদ্ধা শপথ করে বলেছিলেন যে, তাঁরা যুদ্ধের ময়দানে ফেরেশতা দেখেছেন। একব্যক্তি পাওনা লুটের মাল দাবি করার জন্য মুহাম্মদের কাছে তিনজন মক্কাবাসীর কাটা মাথা নিয়ে আসে, কিন্তু সে তাদের মধ্যে কেবল দু'জনের মাথা কেটে ফেলার কথা স্বীকার করেছে। "তৃতীয়টির ক্ষেত্রে আমি দেখলাম, এক লম্বা সাদা মানুষ তাঁর মাথায় আঘাত করেছে

এবং এটি আলাদা হয়ে আমার সামনে গড়িয়ে পড়েছে, আর আমি এটি তুলে নিয়েছিলাম” সে বলল। মুহাম্মদ বলেছিলেন, “তিনি ছিলেন ফেরেশতাদের একজন” (১৯)।

মুহাম্মাদ এ সমস্ত ঝগড়া-বিবাদে এতটাই বিরক্ত হয়ে গেলেন যে, তিনি সমস্ত লুটের মাল ও বন্দিদের একত্র করে তাঁর হাতে সমর্পণ করার নির্দেশ দিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিলেন যে, আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং দেখেন। কেউ যদি কিছু লুকোয়, এমনকি একটি জীর্ণ কম্বল থেকে শুরু করে একটি সুতোও এবং যদি সে ধরা পড়ে তবে এই জীবনে মুহাম্মদের এবং পরের জীবনে ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কার কী মালামাল প্রাপ্য তা নির্ধারণ করার জন্য দৈনিক পাঁচবার নামাজ এবং অন্যান্য প্রার্থনা আয়োজনের মাঝেই দুটি দিন তিনি ব্যয় করে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সলোমনের (Solomon) প্রজ্ঞাময় পথ অবলম্বন করলেন, অর্থাৎ তিনি লুটের মালের এক পঞ্চমাংশ নিজের জন্য রাখলেন এবং অন্য সবার মাঝে ন্যায়সঙ্গত বণ্টন করে দিলেন। যে দু'জন লোক যুদ্ধের জন্য কিছু ঘোড়া নিয়ে এসেছিল তাদেরকে যোদ্ধাদের জন্য ঘোড়াগুলোর গুরুত্ব ও সেগুলোর দেখভালের খরচ বিবেচনা করে ভাগে প্রাপ্ত মালামালের অতিরিক্ত অংশ দেয়া হয়েছিল।

বন্দিরাই সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল। মুহাম্মদ প্রথমে উমরের সাথে একমত হয়েছিলেন যে, তাদের সবার মাথা কেটে ফেলা উচিত। তবে, যখন বন্দিদের একত্র করা হয়েছিল এবং মুহাম্মদ তাদের মাঝে নিকটাত্মীয়দের দেখেছিলেন, তখন একটি সমস্যা দেখা দিল। বন্দিদের মধ্যে ছিলেন সর্বদা সহানুভূতিশীল কিন্তু নিরপেক্ষ তাঁর চাচা আব্বাস, আরও ছিলেন মুহাম্মদের জামাতা তথা খাদিজার ভাগ্নে এবং মুহাম্মদের কন্যা যয়নবের বর আবুল আস। মুহাম্মাদ ইয়াছরিবে পালিয়ে যাওয়ার পরে আবুল আস মক্কায় তাঁর স্ত্রী জয়নাবের সাথে ছিলেন। আলীর বড় ভাই আকিলও (Aqil) বন্দিদের মধ্যে ছিল। যদিও আকিল সর্বদা মুহাম্মদের নবুওয়াতের (নবী হওয়া) দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং মুশরিক ছিল, কিন্তু মুহাম্মদ তাঁর সাথেই আবু তালিবের ঘরে বেড়ে উঠেছিলেন এবং আকিল তখনও তাঁর নিকট ভাইয়ের মতো ছিলেন। নিকটাত্মীয়দের বাঁচিয়ে রেখে মুহাম্মদের কি বাকি সবাইকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করা উচিত?

মুহাম্মদ পরামর্শের জন্য তাঁর শীর্ষ লোকদের ডাকলেন। ওমর, সাদ বিন মুআয এবং মিকদাদ ছিল কট্টরপন্থী - বন্দিদের মাথা কেটে ফেলতে হবে, তাদের পরামর্শ ছিল। তারা যুক্তি দিয়েছিল যে, বন্দিরা আল্লাহর ও তাঁর রাসুলের শত্রু, সুতরাং কাউকেই রেহাই দেয়া উচিত নয়। উমর উদাহরণ সৃষ্টি করার জন্য এতটাই এগিয়ে গেছিলেন যে, বন্দিদের মধ্যে থাকা তাঁর নিকটাত্মীয়দের মাথা তিনি নিজেই কেটে ফেলেছিলেন। আর তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, আলীও এবার তাঁর ভাই আকিলের (Aqil) মাথা কেটে ফেলে খুশি হবেন। আকাবা অঙ্গীকারের একজন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা শিরশ্ছেদের বিকল্প হিসেবে পরামর্শ দিয়েছিলেন এরূপ : বনের মাঝে সমস্ত বন্দিদের একটি গাছে বেঁধে রাখুন এবং সেই বনে আগুন জ্বালিয়ে দিন। তবে আবু বকর অশ্রুসজল চোখে তাদের ক্ষমার জন্য আবেদন করেছিলেন এবং এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যে, বন্দিরা মৃতের চেয়ে আরও বেশি মূল্যবান, কেননা মক্কাবাসীরা তাদের ফেরত নেয়ার জন্য বেশ ভালো অর্থ প্রদান করবে। আবুল হাকামকে শিরোচ্ছেদ করার কারণে অভিজ্ঞ ও দাড়িওয়ালা নেতাদের মাঝে আবদুল্লাহ বিন মাসুদও একটা অবস্থান তৈরি করতে পেরেছেন। হালকাপাতলা গড়নের এই তরুণ আবদুল্লাহ বিন মাসুদও বন্দিদের ব্যাপারে নমনীয় ভাব প্রকাশ করলেন। সুহাইল নামে একজন ব্যবসায়ী যিনি অতীতে তাঁর সাথে সদয় আচরণ করা এক বন্দির প্রতি নমনীয় ছিলেন। পরামর্শকদের কথা শোনার পরে মুহাম্মদ তাঁর তাঁবুতে ফিরে গেলেন এবং তাঁর মনকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব নিতে দিলেন। তিনি নবী এবং ফেরেশতাদের নিয়ে তাঁর মস্তিষ্কের মাঝে একটা কল্পনার জগৎ তৈরি করেছিলেন এবং তিনি তাদের ঘনিষ্ঠতম সহযোগী হিসেবে তাদের সাথে নিজের মনোজগতে বাস করতেন (২০)। তারা তাঁর রক্তমাংসের সাথীদের মতোই ছিলেন। নবীদের কাহিনীসমূহ, বা সেই গল্পগুলোতে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর জন্য উদাহরণ হিসেবে কাজ করেছে এবং তাঁর চিন্তার

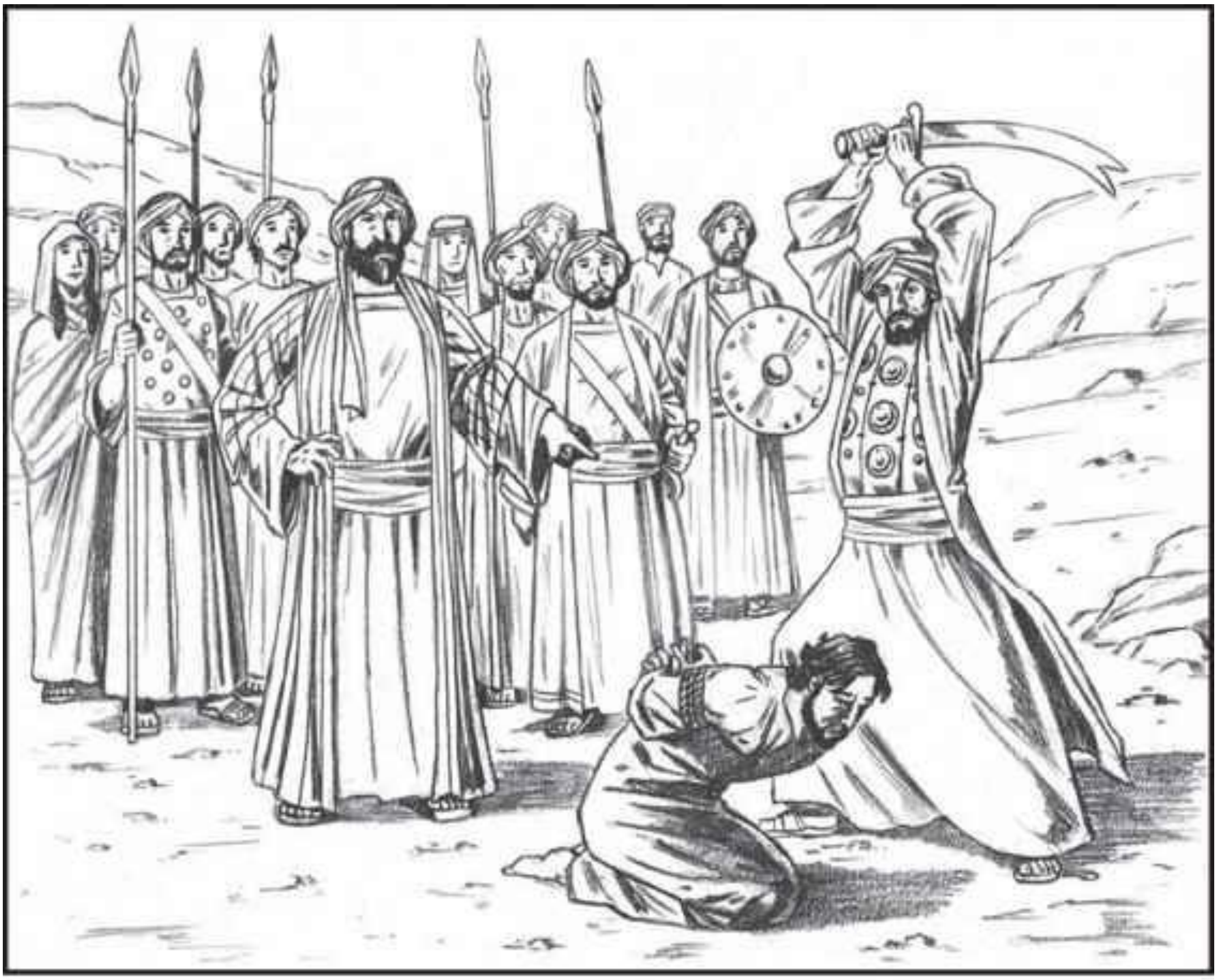
একটা ভিত্তি দিয়েছে। বাইরের জগতের ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করতে আর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে তিনি প্রায়শই এসব গল্পের পুনর্গঠিত সংস্করণ ব্যবহার করতেন।

অবশেষে তাঁবু থেকে বের হয়ে এসে মুহাম্মদ আবু বকর এবং উমর উভয়ের পক্ষে চটকদার কথা বলেছিলেন। তিনি তাদের বললেন যে, তাঁরা দুর্দান্ত পরামর্শ দিয়েছেন! তাঁরা প্রাচীন নবীদের মতো ছিলেন এবং কার্যতঃ তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গদূতের ভাইদের মত ছিল। আবু বকর, প্রকৃতপক্ষে ফেরেশতা মিকাইলের সাথে আবু বকরের অনেক মিল আছে, যার কাজ হচ্ছে লোকদের প্রতি প্রভুর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা এবং তাদের জন্য ঈশ্বরের ক্ষমা প্রকাশ করা। তিনি ইব্রাহিমের মতোও ছিলেন, যাকে তাঁর লোকেরা একবার চুল্লিতে ফেলে দেয়ার পরও তাদের সাথে মধুর চেয়েও মিষ্টি ব্যবহার করতেন। অবশ্যই তিনি কোমল যীশুর মতো ছিলেন, যিনি ঈশ্বরের প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে তাঁর ক্ষমাশীলতার প্রশংসা করেছিলেন। অন্যদিকে, উমর ছিলেন ফেরেশতা জিব্রাইলের মতো যার কাজ ছিল ঈশ্বরের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা এবং যারা ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত সীমালঙ্ঘন করেছিল তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিশ্চিত করা। ওমর নূহের মতোও ছিলেন, যিনি ঈশ্বরের পথ থেকে বিচ্যুত লোকদের বিরুদ্ধে পাথরের মতো কঠোর ছিলেন। মুসার সাথেও ওমরের সাদৃশ্য রয়েছে, যিনি একজন কট্টরপন্থী ছিলেন। মুহাম্মাদ মূসার মুখের কথারই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন : "হে রব, তাদের ধনসম্পদ ধ্বংস করুন এবং তাদের অন্তরকে শক্ত করুন, যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ যন্ত্রণা দেখে বিশ্বাস স্থাপন করবে" (২১)।

এভাবে তাদের প্রশংসা করার পরে, মুহাম্মদ আল্লাহর সিদ্ধান্তটি পেশ করলেন। এটি ছিল আবু বকর এবং উমর উভয়ের জ্ঞানের মিশ্রণ : অনেকের জন্য মুক্তিপণের মাধ্যমে ক্ষমা, তবে তাদের জন্য রয়েছে মৃত্যু যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সীমা অতিক্রম করেছেন। ঐতিহ্যবাহী সূত্রগুলি জানিয়েছে যে, সত্তরজন বন্দিকে বদর থেকে ধরে নেয়া হয়েছিল, তবে তাঁর মাঝে মাত্র উনপঞ্চাশ জন ইয়াছরিবে যেতে পেরেছিল। ইয়াছরিব নেয়ার সময়ে দুজন ব্যক্তিকে হত্যার কথা আমরা জানতে পারি - নাদের আল হারিছ এবং উকবা ইবনে আবু মুয়াইত। তাঁরা উভয়েই অপরাধীদের তালিকার শীর্ষে ছিল। প্রাচীন লোকদের কল্পকাহিনী হিসেবে মুহাম্মদের নবীওয়ালা গল্পগুলিকে উপহাস করার জন্য এবং পারস্যের রাজা-বাদশাহ ও নায়কদের সম্পর্কে আরও আকর্ষণীয় গল্প বলে মুহাম্মদকে বিদ্রূপ করার জন্য মুসলিমরা নাদেরকে ঘৃণা করত। এই বিদ্রূপ মুহাম্মাদকে এতটাই বিরক্ত করেছিল যে, তিনি কোরআনে বেশ কয়েকবার (আয়াত নাজিল করে) তাঁকেও পাল্টা বিদ্রূপ করেছেন! আর উকবা হলেন সেই মক্কাবাসী যিনি মন্দিরের সামনে প্রার্থনা করার সময় মুহাম্মদের পিঠে উটের নাড়িভুঁড়ি তুলে দিয়েছিলেন যা মক্কার অন্যান্য নেতাদের মাঝে অট্টহাস্যের সৃষ্টি করেছিল এবং সেজন্য মুহাম্মদ তাদের সকলকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছিলেন।

বদলা নেয়ার প্রথম ধাপের বিরতিতে, নাদেরের মাথা কেটে ফেলার জন্য মুহাম্মদ আলীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন মিকদাদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও, কেননা এতে বন্দিকারী হিসেবে মিকদাদ নাদেরের মুক্তিপণ হারাবে। মিকদাদ সারাংশে বলেছিলেন, "আরে তা করবেন না, সে আমার বন্দী!" পিঠের পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় নাদেরকে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং এরপর আলী নাদেরের ঘাড়ে তাঁর তলোয়ার চালিয়ে দিয়েছিলেন। মাথাটি এত তাড়াতাড়ি আলাদা হয়ে গেছিল যে, নাদেরের শরীর লুটিয়ে পরার আগেই তাঁর মাথাটি মাটিতে পড়েছিল। মুহাম্মদ মিকদাদকে তাঁর মৃত্যুর জন্য পরকালে আল্লাহর পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রশান্ত করেছিলেন। পরের দৃশ্যপটের বিরতিতে উকবার শিরশ্ছেদ করা হয়। মুহাম্মদ যখন তাঁকে হত্যার নির্দেশ দিলেন তখন উকবা তাঁর প্রাণে বাঁচানোর আকুতি জানিয়ে বলেছিলেন, "তাহলে আমার বাচ্চাদের দেখাশোনা করবে কে?" মুহাম্মদ গর্জন করে বললেন "জাহান্নাম!" এরপর তাঁকে জবাই করার জন্য আসিম বিন ছাবিত নামের এক ধর্মান্তরিতকে ইঙ্গিত দিলেন।

মুহাম্মদ যুদ্ধ নিয়ে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছিলেন, কোরানে প্রথম কোন যুদ্ধের ইশতেহার। জঙ্গিবাদী আয়াত সমূহের



[মুহম্মদ কখনও অপমানের কথা ভুলতেন না। এখানে, মুহাম্মদের প্রথম চাচাত ভাই আলী বদর যুদ্ধে বন্দিদের একজন নাদের আল হারিছের শিরশ্ছেদ করছেন। মুহাম্মদের সাথে ঈশ্বর কথা বলেন, মুহাম্মদের এই দাবিটির জন্য নাদের মক্কায় প্রায়শই তাঁকে বিদ্রূপ করতেন। নাদের তাঁকে আশেপাশে অনুসরণ করতেন এবং যে লোকদের সাথে মুহাম্মদ দেখা করেছিলেন তাদের কাছে পারস্যের মহাকাব্যের গল্পগুলি আবৃত্তি করার প্রস্তাব দিতেন। তাদেরকে বলতেন, পারস্যের গল্পগুলি মুহাম্মদের নবী বিষয়ক গল্পের চেয়েও চটকদার।]

মধ্যেঃ "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তবে যদি তারা বিরত হয় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে সে বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা" (২২) এবং, "আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে" (২৩)। **'যুদ্ধের ফজিলত' (The Spoils of War) বোঝানোর জন্য নাজিল করা এই সূরায় মুহাম্মদ তাঁর ধর্মকে লুটপাট অনুমোদনের জন্য একটি সংগঠিত অপরাধমূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছিলেন। তিনি এর আয়াতগুলিতে লুণ্ঠিত মালামাল বিতরণের জন্য তাঁর সাধারণ নীতিও ঘোষণা করেছিলেন এভাবে : তিনি (মুহাম্মদ) ভবিষ্যতের সকল গনিমতের মালের এক পঞ্চমাংশ নেবেন, আর বাকি সব মাল মুমিনদের মধ্যে বিলিবন্টন করা হবে। তোমরা যুদ্ধে যা গনিমতের মাল পেয়েছ তা "ভোগ করো"। বিশ্বাসীদের তিনি বলেছিলেন, এটা "হালাল এবং উত্তম"** (২৪) মক্কাবাসীরা বিভিন্ন কারণে বদরের যুদ্ধে হেরে যায়। ঐতিহাসিকদের মতে, এর সবচেয়ে স্পষ্ট কারণ ছিল তাদের নেতারা ঝগড়াটে এবং যুদ্ধে অদক্ষ বয়স্ক ব্যবসায়ী যারা তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা যদি বিচক্ষণ হতেন,

তাহলে মুহাম্মদ নিজেই যে ভূখণ্ডটির সুবিধা দিয়েছিল তা দেখতে পেতেন এবং তাঁকে বিচ্ছিন্ন ও ধ্বংস করার কৌশল চিন্তা করতেন। তাঁরা যদি ধূর্ত ও নির্মম হতেন তবে ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই আক্রমণের জন্য শত্রুপক্ষের একজোট হয়ে নামাজ পড়ার সুযোগটা নিতে পারতেন, আর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা প্রার্থনায় মগ্ন থাকার নাজুক সময়টাতে মারাত্মক বিধ্বংসী হামলা চালাতে পারতেন। তবে মক্কার নেতারা ছিলেন প্রবীণ, যারা গোত্রগত যুদ্ধের পুরনো নিয়মগুলি দ্বারা পরিচালিত হতেন যা ছিল মূলত - আক্রমণ এবং সাহসের সাথে লড়াই করা, তারপর শত্রুরা স্থির হতে চায় কিনা তা দেখার জন্য আক্রমণ থামিয়ে দেয়া এবং তারা যদি তা করে তবে টাকার বিনিময়ে জীবন ফিরিয়ে দেয়া।

মক্কাবাসীরা আরো একটি কারণে সম্ভবত পরাজিত হয়েছিল, আর তা হচ্ছে, তারা কীসের বিরুদ্ধে লড়ছিল সেটি বুঝতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিল। তারা আগে কখনও মানসিক বিকৃতিসম্পন্ন মৃগীরোগীর মোকাবেলা করেনি। সমাজে পৃথকভাবে এই দুই উপকরণের সাথে তাদের পরিচয় থাকলেও, একই ব্যক্তির মাঝে দুটোর সন্নিবেশ তারা দেখেনি। তারা মৃগীরোগ সম্পর্কে জানত। এটি তখন আজকের মতোই একটা সাধারণ অসুখ ছিল, তবে সেই সময়ে এটির আলাদা ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছিল - ক্ষতিকর জিন তথা দানবের হাতছানিই এটির কারণ। ঠিক যেমনটা হালিমা সন্দেহ করেছিলেন, একেবারে ছোটবেলায় তাঁর যত্নে থাকা মুহাম্মদের প্রথম খিঁচুনির সময়ে। সেরকম একটা সমাজে মৃগীরোগীরা গ্রহণযোগ্য হলেও, প্রায়শই গণক, জাদুকর এবং ভীতিকর ও ঘৃণাযোগ্য অবস্থায় তাঁরা বেড়ে উঠত। মক্কাবাসীদের মানসিক বিকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বেরও অভিজ্ঞতা ছিল। কেনই বা তাদের সেই অভিজ্ঞতা হবে না, সেই সমাজে তো মুহাম্মদের খালা সাফিয়া তাঁর পুত্র জুবায়েরকে জীবনের বাস্তবতার জন্য প্রস্তুত করতে মারাত্মকভাবে মারধর করত এবং খাত্তাব তার প্রতিটি ইচ্ছা লঙ্ঘনের জন্য নির্মমভাবে তাঁর পুত্র উমরকে মারধর করত! আরব সমাজের এ জাতীয় উপকরণগুলো প্রায়শই চিরস্থায়ী রক্তাক্ত সংঘাতের কারণ ছিল, যা গোত্র এবং গোত্রসমূহদের একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল। এই উভয় উপাদানই ব্যক্তি মুহাম্মদের সাথে একত্রে মিশ্রিত হয়েছিল। তাঁর মৃগীরোগ তাঁকে বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করেছিল যে, ঈশ্বর তাঁর সাথে কথা বলেছেন। তাঁর মানসিক বিকৃতি তাঁকে এমন লোকদের হত্যা করতে পরিচালিত করেছিল যারা এসব বিশ্বাস করে না।
তৃতীয় উপাদানটি ছিল তাঁর কথার জাদুময়তা। তিনি তাঁর কথার জালে অজ্ঞদের আটকে ফেলে তাঁর বিভ্রমকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি তাদের সামনে এক মনোজাগতিক পৃথিবী অঙ্কন করেছিলেন এবং এটিকে বাহ্যিক পৃথিবীর চেয়েও তাদের কাছে আরও বাস্তবিক করে তুলেছিলেন। এই কল্পিত বিশ্বের প্রতি বিশ্বাস দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে মুহাম্মদের অনুসারীরা বদরের প্রান্তরে নিজেদের মধ্যকার কসাইকেই সামনে নিয়ে এসেছিল, যেমনটা তিনি প্রায়শই প্রার্থনা করতেন।

মক্কায় থাকাকালীন মুহাম্মদ কখনও সহিংসতা করার হুমকির বাইরে যাননি, কারণ এরচে বেশি কিছু করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এখন তাঁর সেই শক্তি চলে এসেছে।

অধ্যায় - ১৬
হত্যার বেসাতি

মুহাম্মদ যখন মক্কাবাসী কাফেলা আক্রমণ করতে চলে গেলেন তখন ইহুদি ও ইয়াছরিবের বহুঈশ্বরবাদীরা (তাঁরা তখনও ধর্মান্তরিত হননি) ভীত হয়ে পড়লেন। যখন তিনি মক্কান সেনাদলের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফিরে এলেন তখন তাঁরা আরো বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। উকবাহ ইবনে মুয়াইতের শিরশ্ছেদের দিন মুহাম্মদ তাঁর বিজয় ঘোষণা করার জন্য ইয়াছরিবে দুজন বার্তাবাহী পাঠান। সকালের গরমের মধ্যেই মুহাম্মদের ব্যক্তিগত উটের উপর চড়ে জায়েদ বিন হারিছা ইয়াছরিবের নিম্নভূমিতে সংবাদ (বিজয়ের) ছড়িয়ে দিলেন, অন্যদিকে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা যিনি সকল যুদ্ধবন্দিদের বেঁধে জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ফেলার জন্য মুহাম্মদকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি ইয়াছরিবের উচ্চভূমিতে সংবাদটি নিয়ে আসেন। মসজিদের উঠোনে গিয়ে উটের পিঠ থেকেই জায়েদ বিজয়ের ঘোষণা দিলেন, "সাহায্যকারীরা (আনসার) আনন্দ করুন, আল্লাহর রাসূল ভালো আছেন এবং তিনি মুশরিকদের বন্দি এবং হত্যা করেছেন"। যখন তিনি মৃত মক্কাবাসীদের নাম একে একে বলতে শুরু করলেন, তখন বিশ্বাসীরা আল্লাহু আকবর বলে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করল! শিশুরা রাস্তা এবং অলিগলি দিয়ে দৌড়াচ্ছিল আর চিৎকার করে বলছিল, "শয়তান আবু জাহেল মারা গেছে!" (১)। এভাবেই তাঁরা আবুল হাকামকে মুহাম্মদের দেয়া ডাকনামটি বারবার উল্লেখ করছিল। ইহুদি ও পৌত্তলিক আরবরা এই কথা শুনে এতই অবাক হন যে, তাঁরা প্রথমে তা বিশ্বাস করতেই অস্বীকৃতি জানান। তারা ভেবে নেন যে, জায়েদ যেহেতু মুহাম্মদের উটে চড়ে এসেছেন তাঁর মানে এটিই প্রমাণ যে, মুহাম্মদকে হত্যা করা হয়েছে এবং তাঁর সেনাবাহিনী পরাজিত হয়েছে। এটা এক ধরণের কৌশল হবে হয়তো। একজন বহুশ্বরবাদী জায়েদের নয় বছরের ছেলে ওসামার দিকে লক্ষ করে বললেন, "তোমার মনিবকে হত্যা করা হয়েছে, এবং তাঁর সাথে যারা আছে তাদেরকেও"! ছেলেটি দৌড়ে তাঁর বাবার কাছে গিয়ে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। জায়েদ তাঁকে বললেন, এটা মিথ্যা কথা। মুহাম্মদ সত্যিই বিজয়ী হয়েছেন এবং তাঁর সৈন্যদল এবং তাদের বন্দিদের নিয়ে আগামী এক বা দু'দিনের মধ্যেই তিনি ইয়াছরিবে পৌঁছবেন। ছেলেটি দৌড়ে বহুশ্বরবাদী লোকটির কাছে ফিরে গিয়ে মিথ্যা ছড়ানোর অভিযোগ করে বললো, "আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসূলের সামনে আনবো, আর তিনি আপনাকে মেরে ফেলবেন!" (২) মুহাম্মদের মৃত্যুর গুজব সত্যি বলেই মনে হচ্ছিল এবং তা নিয়ন্ত্রণে বাইরে চলে গিয়েছিল। শেষমেশ একজন ক্ষুব্ধ অনুসারী রাস্তায় নেমে এসে অবিশ্বাসীদের এবং যারা গুজব ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সহিংস আক্রমণের হুমকি দিয়ে তবেই তাদের থামাতে সক্ষম হন।

মুহাম্মদ পরেরদিন সকালে এসে পৌঁছেন। তাঁর বিজয়ী যোদ্ধাদল এবং তাদের হতভাগা বন্দিরা একদিন পরে আসে। যখন তিনি নাজ্জার এলাকা প্রবেশ করলেন তখন সেই সে লিকলিকে শরীরের ওসামাকেও উটের পিঠে তুলে তাঁর সাথে বাকি পথ নিয়ে আসেন। যখন তিনি তাঁর মসজিদে পর্দাপণ করলেন তখন তাঁর থেকে দূরত্ব বজায় রাখা শক্তিশালী গোত্রের নেতারাও তাঁকে এই যুদ্ধে বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানাতে চলে এসেছিলেন। মুহাম্মদ তাঁর সাথে সুহায়েল বিন আমর নামের একজন বন্দিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী সাওদার ঘরটিকে তাঁর জন্য জিন্দানখানা হিসেবে তৈরি করলেন। মক্কাবাসী এই গুরুত্বপূর্ণ নেতা সুহায়েল ছিলেন সাওদার সাবেক দেবর; এবং তিনিই সেই ব্যক্তি যার কাছে মুহাম্মদ প্রথম সুরক্ষা দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন তায়েফ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর, এখন থেকে চার বছর আগে।

সুহায়েল যদিও মুহাম্মদের ধর্ম থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন, তবে তাঁর ভাই সাকরান বিন আমর মুহাম্মদের ধর্মে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় অভিবাসী দলের একজন। সাকরান বিন আমর পরে সেখানেই মারা যান। সুহায়েল বদরে ধরা পড়ে, কিন্তু জোরপূর্বক তাদের যখন ইয়াছরিবে নেয়া হচ্ছিল সেই দল থেকে পালিয়ে যায়। মুহাম্মদ আদেশ দেন, যে তাঁকে খুঁজে পাবে সে যেন তাঁকে সেখানেই মেরে ফেলে। কিন্তু এরপর যখন তাকে গাছের পেছনে লুকিয়ে

থাকতে দেখা যায় তখন মুহাম্মদ তাকে তাঁর উটের কাছে নিয়ে আসেন এবং তাকে ঘাড়ের পেছনে হাত বেঁধে দিয়ে ইয়াছরিবের পথ পাড়ি দিতে বাধ্য করেন। মুহাম্মদের এই অতিথির (?) জন্য আয়োজনের কথা সাওদাকে জানানোর সুযোগ ছিল না। যখন তিনি তাঁর বন্দিকে নিয়ে মসজিদে পৌঁছেন সাওদা তখন বদরে নিহত দুই যুবকের পরিবারের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সাওদা বাড়ি ফেরার পর চমকে উঠলেন দেখে যে তাঁর প্রাক্তন দেবর তাঁর ঘরের এক কোণে হাঁটু গেড়ে বসে আছে! তাঁর হাত এখনো ঘাড়ের পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা। তিনি তাঁকে তাঁর ডাকনাম ধরে সম্বোধন করে বললেন, "হে আবু ইয়াজিদ, তুমি তাহলে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলে! তুমি কি একটা মহৎ মৃত্যুকে বরণ করতে পারতে না?" (৩)।

মুহাম্মদ যুদ্ধের পরের মাসের বেশিরভাগ সময় মুক্তিপণের লেনদেনের জন্য সময় ব্যয় করেন। উচ্চমূল্যের বন্দিরা তাদের মুক্তির জন্য চার হাজার দিরহাম প্রদান করে, যা প্রায় ত্রিশ পাউন্ড খাঁটি রূপার সমান। সুহায়েল যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ বন্দী ছিলেন, পুরো মূল্য পরিশোধ করতে তাঁকে বাধ্য করা হয়। একজন মক্কাবাসী, যিনি তাঁর মুক্তির সমঝোতা করতে ইয়াছরিব পৌঁছেছিলেন এবং যতক্ষণ না সুহায়েল মক্কা থেকে মুক্তিপণের টাকা পাঠান ততদিন পর্যন্ত তাঁকে জিম্মি করে রাখা হয়। কিছু অসহায় শিক্ষিত বন্দী ছিল, তাদের ইয়াছরিবের ধর্মান্তরিতদের সন্তানদের পড়ালেখা শেখানোর বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হয়। মুহাম্মদের চাচা আব্বাস তাঁর মুক্তির জন্য সবচেয়ে বেশি অর্থ প্রদান করেন। মক্কার কাফেলা বাণিজ্যের প্রধান বিনিয়োগকারী ছিলেন আব্বাস। অর্থনৈতিকভাবে তিনি ভালো অবস্থানে ছিলেন এবং তিনি স্বর্ণপ্রেমী হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। সেই সময়ে তিনি চল্লিশজন ক্রীতদাসের মালিক ছিলেন, যাদেরকে বিভিন্ন আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের কাজে নিয়োগ করেছিলেন। ইসলামের মৌলিক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, তাঁকে চল্লিশটি স্বর্ণের আউকিয়া (awqiyyas) দিতে বাধ্য করা হয় যা একশো পঁচাত্তর আউন্স সোনার সমতুল্য; যার মাধ্যমে তাঁর ও তাঁর বেশ কয়েকজন ভাগ্নে এবং তাঁর কর্মচারীদের মুক্তি নিশ্চিত করা হয় (৪)।

যুদ্ধের গণিমতের মাল ভাগ বাটোয়ারার মতো মুহাম্মদ মুক্তিপণের পরিমাণ থেকেও নিজের জন্য এক পঞ্চমাংশ রাখেন, আর বাকি অংশ বন্দিকারীদের মধ্যে বিতরণ করেন। সবচেয়ে কঠিন ঝামেলায় পড়েন তাঁর জামাতা আবুল আসের মুক্তিপণ নিয়ে যে ছিল খাদিজার বোন হালার পুত্র। হেরা পর্বতে মৃগীরোগের অভিজ্ঞতার একবছর আগে মুহাম্মদ তাঁর বড় মেয়ে জয়নবকে আবুল আসের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও জয়নব তাঁর পিতার ধর্ম গ্রহণ করেন, তবে মুহাম্মদ ইয়াছরিবে পালিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর অবিশ্বাসী বরের সাথে মক্কায় থেকে যান। ইসলামের ইতিহাসের বইয়ে পাওয়া যায়, তারা একে অপরকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। যখন জয়নবের কাছে তাঁর বরের আটকের খবর পৌঁছে তখন তিনি বরের মুক্তিপণের জন্য বাবার কাছে টাকা পাঠান এবং কয়েক স্তরবিশিষ্ট একটি গলার হারও সঙ্গে পাঠান। হারটি তাঁর মা খাদিজা তাঁকে বিয়ের উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। অবশেষে মুহাম্মদ তাঁর জামাইকে ছেড়ে দেন এই শর্তে যে, মক্কায় পৌঁছেই তিনি জয়নবকে ইয়াছরিবে পাঠিয়ে দেবেন এবং এটাও মেনে নেবেন যে, তিনি যেহেতু মুহাম্মদের ধর্মে যোগ দেননি তাই তাদের বিয়েও অবৈধ হয়ে গেছে।

মক্কায় ফিরে আবুল আস তাঁর স্ত্রীকে বলেন যে, তাদের আলাদা হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই এবং তিনি তাঁর ভাইকে বলেন জয়নবকে পাহারা দিয়ে ইয়াছরিবে নিয়ে যেতে। তবে শেষ মুহূর্তে মক্কাবাসীরা যখন তাঁর চলে যাওয়ার কথা জানতে পারলেন তারা এসে হস্তক্ষেপ করলেন। তাঁরা জয়নবের চলে যাওয়াকে অপমান হিসেবে দেখছেন। তাঁর বাবা তাদের ডজন ডজন লোককে হত্যা করেছিল এবং মুক্তিপণের জন্য আরো অনেককে আটকে রেখেছিল, তাই তাঁরা জয়নবকে জিম্মি হিসেবে রেখে দিতে চেয়েছিল। সে সময় জয়নব গর্ভবতী ছিলেন, এবং এই টানাটানির ভেতর তিনি উট থেকে পড়ে যান। এর ফলে তাঁর গর্ভপাত হয়। আবু সুফিয়ান, যিনি মক্কার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন, অবশেষে তাঁকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেন। তিনি মুহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন বাবার কাছ থেকে কারও কন্যা আটকে রাখার সঠিক সময় সেটা নয়। মুহাম্মদ পরে একটি অভিযানকারী দলকে মক্কায় পাঠান এই আদেশ দিয়ে যে, যারা

তাঁর মেয়েকে জোর করে ফেরত পাঠাতে গিয়ে গর্ভপাত ঘটিয়েছে তাদের যেন পুড়িয়ে মারা হয়। কিন্তু মুহাম্মদের প্রেরিত হামলাকারীরা মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হবার একদিন পর তিনি আবার খবর পাঠান যে, তিনি তাদের জীবিত পুড়িয়ে মারার ব্যাপারে মন পরিবর্তন করেছেন। কারণ, আল্লাহ নির্দেশিকা দিয়েছেন, "শুধু তাদেরকে মেরে ফেলো (আগুন দিয়ে নয়), কেননা আল্লাহ ছাড়া আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেবার অধিকার আর কারোর নেই" (৫)।

বদরের পরাজয়ের সংবাদ মক্কার শহরকে ভেঙ্গে ফেলেছিল। সবাই সবার সাথে সম্পর্কিত ছিল। কারো ছেলে, কারো ভাই, কারো বাবা, কারো চাচাত ভাই বা কেউ তাঁর চাচাকে হারিয়েছে। আবু সুফিয়ান যদিও তাঁর একপুত্র এবং অনেক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে হারিয়েছেন, কিন্তু তিনি তাঁর শোককে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং জনগণকে শোক না করার পরামর্শ দেন যাতে দুঃখ কমে না যায়। দুঃখ কমে গেলে তা তাদের প্রতিহিংসার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিকে কেড়ে নেবে। এই কথা শুনে এক অন্ধলোক যিনি যুদ্ধে তাঁর তিনটি ছেলেকে হারিয়েছেন তাঁর এক দাসের সাথে শহর ছেড়ে পাহাড়ে চলে যান, যাতে সেখানে তিনি গোপনে শোক পালন করতে পারেন। তিনি তাঁর সাথে মদ নিয়ে এলেন এবং মাতাল হওয়ার পর তিনি কাঁদতে কাঁদতে ভেঙে পড়েন এবং যন্ত্রনায় মাথার উপর বালি তুলে ঢেলে দিচ্ছিলেন। প্রায় একই সময়ে উপত্যকায় কান্নার ঢেউ উঠল এবং তাঁর কাছেও আওয়াজ আসছিল। মক্কাবাসীরা আবু সুফিয়ানের উপদেশ উপেক্ষা করেছিল, যার ফলে শহর জুড়ে তাদের শোক ছড়িয়ে পড়েছিল।

অন্ধ লোকটি দাসকে তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। দাস ফিরে এসে তাঁকে মিথ্যা বলল - এক মহিলার উট মারা গিয়েছে, তাই কাঁদছে। শোক করা থেকে থেকে বিরত থাকার পরিবর্তে মক্কার নারীরা তাদের চুল কেটে ফেলল আর গলি ও রাস্তায় পর্দা মধ্যে লাগিয়ে দিল, যাতে মানুষ একত্রিত হয়ে তাদের প্রিয়জনের জন্য শোক প্রকাশ করতে পারে। নিহতদের একটি প্রিয় উট বা ঘোড়া আনা হতো এবং তারা মাথানত করে তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়ে এবং একহাত প্রাণীর উপর স্থাপন করত, যাতে সেই পশুর মাধ্যমে মৃতদের আত্মার সাথে সংযুক্ত হতে পারে।

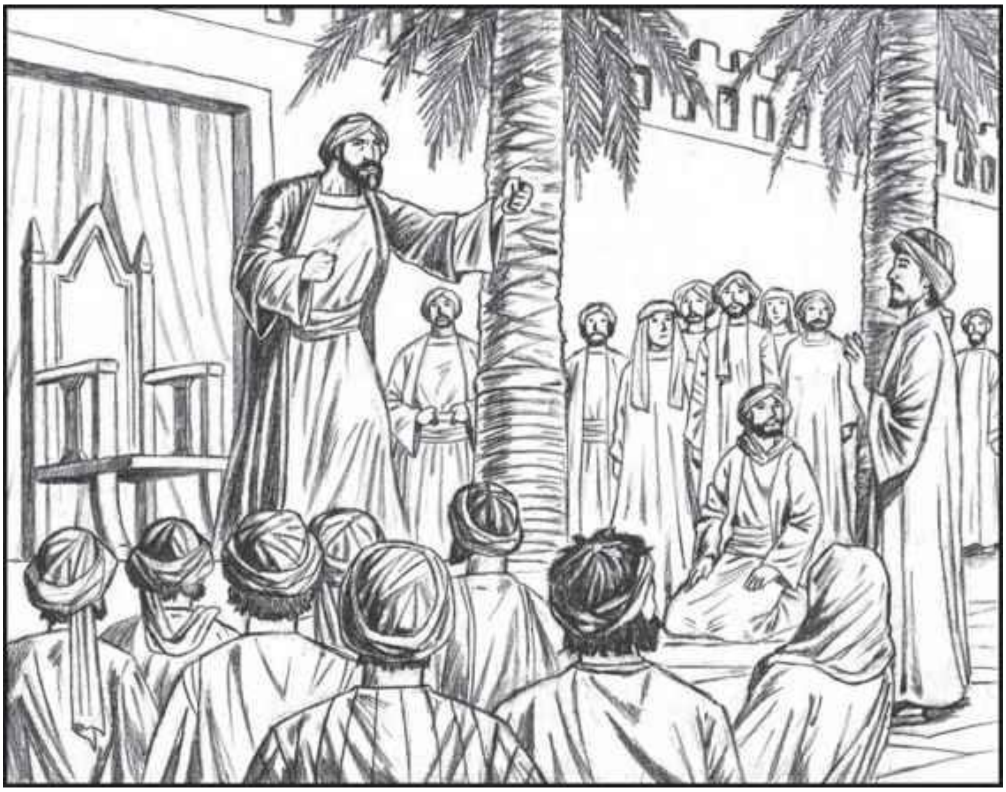
তবে যারা শোক করতে অস্বীকার করেছে তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ, যিনি মুহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কারণ তাঁর ছেলে হানজালা, তাঁর পিতা উতবা, তাঁর ভাই ওয়ালিদ এবং তাঁর চাচা শায়বাকে মুহাম্মদ হত্যা করেছিলেন। যখন একজন মহিলা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কাঁদবে না তোমার ঘরের মানুষের জন্য?" তিনি উত্তরে বললেন, "ঈশ্বর আপনার গলা বন্ধ করুক! আমি যদি তাদের জন্য কাঁদি তবে তা মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গী আর খাজরাজের নারীদের কাছে পৌঁছাবে। তাতে তারা আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য আনন্দিত হবে না? না, ঈশ্বরের কসম, যতক্ষণ না আমি মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের প্রতিশোধ নিচ্ছি" (৬)।

মুহাম্মদের উপর প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত হিন্দ তাঁর বরের সাথে ঘুমাতে অস্বীকার করেন এবং আবু সুফিয়ান প্রকাশ্যে জীবনের সুখ ত্যাগ করেন যতক্ষণ না তিনি মক্কার শক্তিমত্তা দেখাতে পারেন। মুক্তিপণের টাকা পরিশোধ করামাত্রই যুদ্ধবন্দিরা মক্কায় ফিরে আসে। আবু সুফিয়ান দুইশত লোকের সমন্বয়ে একটি অভিযান সংগঠিত করেন এবং তাদেরকে নিয়ে ইয়াছরিবের উত্তর দিকে যান। তারা দক্ষিণ-পূর্ব দিকের পর্বতমালার ভেতর দিয়ে ইয়াছরিবের উচ্চভূমিতে প্রবেশ করার জন্য গভীর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, যেখানে অধিকাংশই ইহুদি দুর্গ অবস্থিত ছিল। আবু সুফিয়ান প্রথমে তাঁকে এবং তাঁর লোকদের ঢুকতে দেয়ার জন্য বনু নযীর গোত্রের অন্যতম নেতা হুয়াই বিন আখতাবের (Huyayy ibn Akhtab) দুর্গের দরজায় ধাক্কা মারেন, কিন্তু তিনি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। উপরন্তু তিনি তাদেরকে তাঁর দুর্গের নিকটবর্তী আরেক দুর্গে থাকা প্রধান রাব্বি এবং নেতা সালাম মিশকামের (Sallam Mishkam) কাছে নিয়ে গেলেন। এই ভদ্রলোক তাঁর জন্য দরজা খুলে দেন এবং খাবার ও মদ নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। অন্যান্য রাব্বিদের মধ্যে সালামও মুহাম্মদের সাথে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক করেছিলেন এবং পরে তাঁকে উপহাস করেছিলেন। আবু সুফিয়ান মুহাম্মদকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু একমাত্র যে উপায়ে তা

করা সম্ভব সেটা হলো তাঁকে মসজিদের ভেতরে আক্রমণ করা, কিন্তু সেটি (মসজিদ) ছিল নাজ্জার অঞ্চলের কেন্দ্রে। অন্ধকারের আড়ালে থেকে অতি সন্তর্পণে তিনি এবং তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনী সনাক্ত হওয়ার আগেই মসজিদে পৌঁছাতে পারবেন হয়তো, কিন্তু সালাম তাঁকে সতর্ক করে দেন যে, তারা যদি মুহাম্মদকে হত্যা করতে সক্ষমও হন তাঁর মানে এই না যে তাদের মধ্যে সবাই জীবিত অবস্থায় ইয়াছরিব থেকে বের হতে পারবেন। এটা একটা আত্মঘাতী অভিযান হবে।

আবু সুফিয়ানের এই অভিযানের জন্য কিছু একটা করার দরকার ছিল। সালাম তাদেরকে তুলনামূলক সহজ একটি লক্ষ্যবস্তু দেখিয়েছেন, আর তা হচ্ছে, উচ্চভূমির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত মুহাম্মদের একজন অনুসারীর মালিকানাধীন একটি খামার। রাতের শেষে দিন এলে সকালেই মক্কান বাহিনী খামারে আক্রমণ করে খামারের মালিক ও একজন দাসকে হত্যা করে। তারা ঘরবাড়ি, যবের ক্ষেত ও খেজুর বাগানে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং মুহাম্মদের সৈন্যরা তাদের বিরুদ্ধে গঠিত হবার আগেই পালিয়ে যায়। মুহাম্মদ বেশ কয়েকদিন ধরে এই বাহিনীর পেছনে ধাওয়া করেন, কিন্তু আবু সুফিয়ান মরুভূমির মধ্য দিয়ে পালিয়ে যান।

বদরের বিজয় মুহাম্মদকে তাঁর ইয়াছরিবী শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে দেয়। বদর থেকে ফিরে আসার পরপরই তিনি কবিদের হত্যার পরিকল্পনা করেন, যারা তাঁকে উপহাস বা সমালোচনা করেছিলেন। তাদের (কবিতার) প্রভাব তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলছিল। গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু গুজবের প্রতি মনোভাব কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হতো, অনেকটা আজকের দিনের সম্পাদকীয়ের মত। ইহুদি কবি এবং পৌত্তলিক কবিরা তাদের কবিতা দিয়ে মুহাম্মদের বিরোধিতা করছিলেন, তাঁকে বহেরাগত বলে আখ্যায়িত করছিলেন এবং মুহাম্মদের হাতে ইয়াছরিবের ক্ষমতা তুলে দেয়ায় তারা ইয়াছরিবের লোকদের প্রজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। মুহাম্মদ সিদ্ধান্ত নিলেন এদের মোকাবেলা করার চেয়ে খুন করাই সবচাইতে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।



[কে আমাকে মুক্ত করবে...? যখনই তিনি কাউকে খুন করতে চাইতেন, মুহাম্মদ মসজিদের ভেতরেই সেই আততায়ীকে নিয়োগদান করতেন। খুনিরা খুন করে ফিরে তাঁর কাছে জানাত যে, হত্যাকাণ্ড সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মুহাম্মদ এই বলে খুনির ভালো কাজের জন্য সবার সামনে প্রশংসা করতেন, “এটি আল্লাহর পথে (আল্লাহর জন্য)”]

প্রথম কবি যাকে হত্যা করা হয় তিনি হচ্ছেন আবু আফাক (Abu Afak) নামের একজন বৃদ্ধ শেখ, যিনি বদরের আগেও ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা দিয়ে মুহাম্মদকে বিরক্ত করেছিলেন। মুহাম্মদ বিজয়ী হয়ে ফিরে আসার পর শেখ একটি কঠোর কবিতা রচনা করেন, যার মাধ্যমে তিনি ইয়াছরিবের পূর্বপুরুষদের প্রশংসা করে মুহাম্মদকে অপসারণের আহ্বান জানান। মুহাম্মদ যখন কবিতাটি শুনলেন তখন তিনি মসজিদের এক সমাবেশে একজন খুনিকে অনুরোধ করলেন এই বলে : 'কে আমার হয়ে এই বদমাশের মোকাবেলা করবে?" (৭)

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা নাজ্জার গোত্রের একজন ধর্মান্তরিত এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। শেখ আবু আফাক তাঁর বাড়িরই উঠোনে ঘুমিয়ে ছিলেন, এই ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর মধ্যে সেই আততায়ী তলোয়ার ঢুকিয়ে দিলেন। একই নিষ্ঠুরতার সাথে হত্যা কর হয় মারোয়ানের (Marwan) কন্যা আসমাকে, যিনি শক্তভাবে মতামত ব্যক্ত করতেন এবং ঠোঁটকাটা জবাব দিতেন। আসমার পূর্বেকার কাহিনী অসম্পূর্ণ, তবে তিনি সম্ভবত একজন ইহুদি ধর্মান্তরিত অথবা ইহুদিদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ শর্তে একটি গোত্রের অন্তর্গত ছিলেন; কারণ তিনি একটি ইহুদি দুর্গের কাছেই বাস করতেন। আবু আফাকের হত্যাকাণ্ডে ভীত হওয়ার পরিবর্তে তিনি ইয়াছরিবের গোত্রদের নিয়ে রাগান্বিত হয়ে কবিতা রচনা করেন। একজন বহিরাগতকে তাদের উপত্যকার দায়িত্ব দেয়া জন্য তিনি ইয়াছরিবের লোকদের তিরস্কার করেন। তিনি লেখেন : "মালেক, নাবিত, আওস ও খাজরাজের লোকগুলা মরুকগে! তোমরা এমন একজন অচেনা আগন্তুকের আনুগত্য করছ যে তোমার মধ্যের কেউ না!" (৮)। এই কবিতাটির মাধমে তিনি তাঁর লোকদের সমালোচনা করে বলেন, মুহাম্মদ কিভাবে তাদের নেতা আবু আফাককে হত্যা করে পার পেয়ে গেল? তিনি এই রচনার মাধ্যমে তাঁর গোত্রের পুরুষদের আহ্বান জানান মুহাম্মদকে যেন হত্যা করা হয়।

আবু আফাকের রচনার মতই মুহাম্মদ আসমার কবিতার উপর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। মসজিদের সমাবেশে তিনি চরম ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেন, এই মহিলার এত বড় সহস যে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ক্ষতি করতে চাইছে? এখন তাঁর মৃত্যু অনিবার্য! তিনি গর্জন দিয়ে বলেন, "মারওয়ানের মেয়ের হাত থেকে কে আমাকে মুক্ত/রক্ষা করবে?" (৯)

আসমার বরের গোত্রের একজন সদস্য মুহাম্মদের পায়ে লাফিয়ে পড়লেন। তিনি আংশিক অন্ধ হওয়ার কারণে সতর্ক করতে অন্ধকার রাতে তিনি আসমার বাড়িতে যেতে পারেননি। বলা হয়, যখন মুহাম্মদের নিযুক্ত আততায়ী আসমার বাড়িতে প্রবেশ করে, আসমা তাঁর ছোট বাচ্চাদের সাথে ঘুমাচ্ছিল এবং তাঁর কোলে একটি নবজাতক শিশুও ছিল। ঘাতক শিশুটিকে একপাশে সরিয়ে দেয় এবং আসমার পেটের ভেতর তরবারি ঢুকিয়ে দেয়। ভোরের নামাজের সময় মুহাম্মদকে আসমার হত্যাকাণ্ডের খবরটি দেয়া হলো। মুহাম্মদ যখন ঘাতককে দেখলেন তখন তাকে কাছে আসার জন্য ইশারা দিলেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি কি মারওয়ানের মেয়েকে মেরেছো?" আততায়ী বলল, 'হ্যাঁ, ও আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার কাছে আমার বাবার চেয়েও প্রিয়"। ঘাতক চিন্তিত ছিল এই ভেবে যে, তাঁর এই কাজ হয়তো আল্লাহকে ক্ষুব্ধ করেছে, কিন্তু মুহাম্মদ তাঁকে বলেছিলেন এই কাজের জন্য যেন সে দুশ্চিন্তা না করে। "এমনিকি দুটি ছাগলও তাঁর (আসমার) জন্য তাদের মাথা একে ওপরের সাথে খুটাবে না" বললেন মুহাম্মদ (১০)। মুহাম্মদ তাঁর নামাজের ঘরে ঢুকে এই কাজের বর্ণনা দেন এবং হত্যাকারীর ভুয়ষী প্রশংসা করে বলেন, সে এমন এক পুরুষ যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভীষণভাবে সাহায্য করেছে!

আকস্মিকভাবে অথবা ইচ্ছা করে, যেটাই হোক আততায়ী আসমার শেষকৃত্যের সময় গোরস্থানের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। শোকার্ত পরিবারের এক সদস্য তার দিকে আঙ্গুল তুলে তাকে খুনি হিসেবে দেখিয়েছিলেন। সে তখন তাদের কাছে সগর্বে চ্যালেঞ্জ করে বলে, যদি তোমরা এই ব্যাপারে কিছু করতে চাও তবে করতে পারো। সে তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলে যে, যদি তারা মুহাম্মদকে অপমান করে তবে তাদেরও একই পরিণতি হবে। আরেকটি কবিতা দিয়ে এই ঘটনার সমাপ্তি ঘটে। এ সময় মুহাম্মদ ইয়াছরিবের একজন কবি হাসসান বিন ছাবিতকে তাঁর জনসংযোগ প্রতিভা কাজে লাগানোর জন্য নিয়োগ

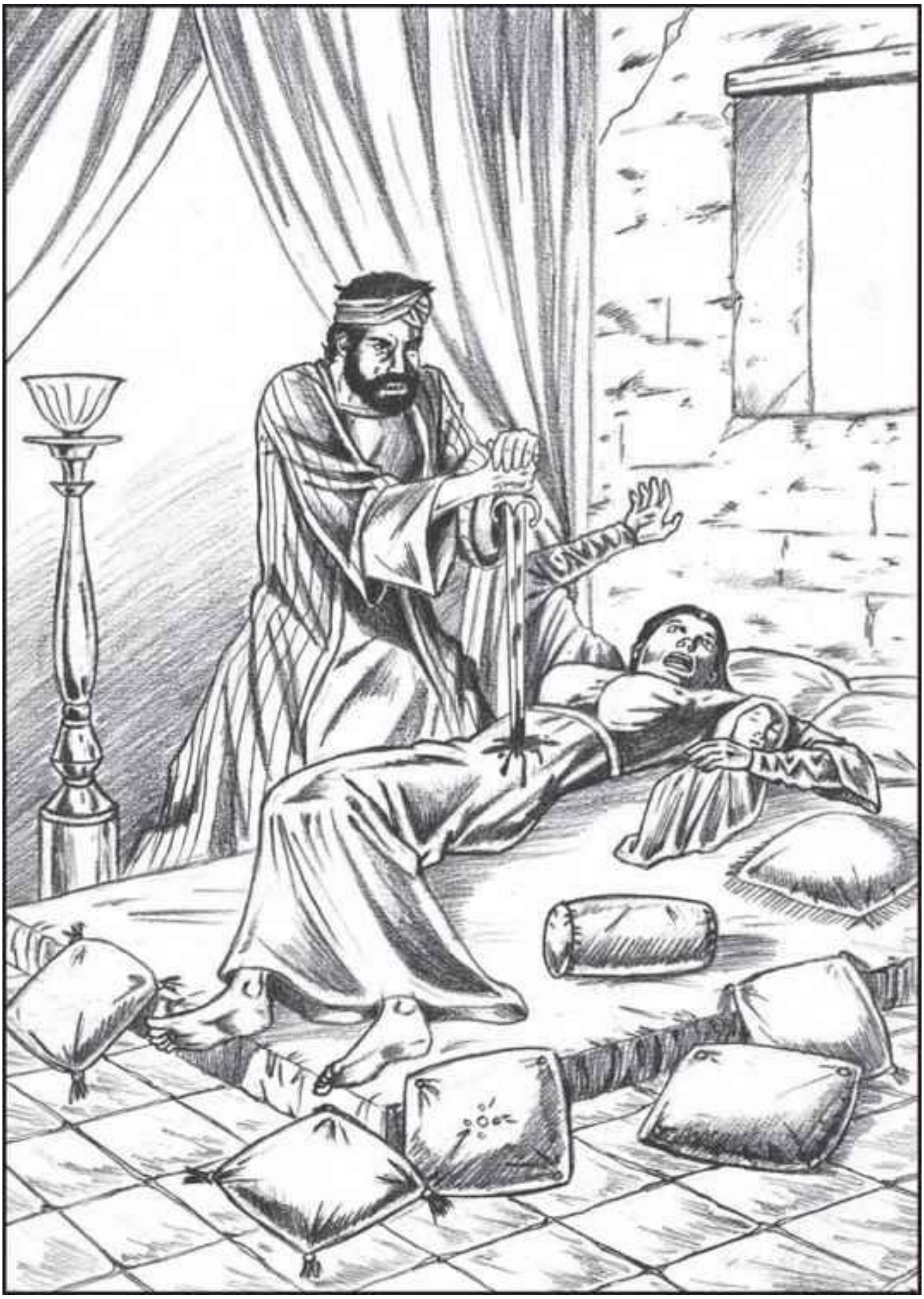
করেন। তিনি যখন মুহাম্মদের একজন মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব নিলেন তখন তাঁর প্রথম রচনাবলীর (কবিতা) মধ্যে একটিতে আসমার হত্যাকারীর প্রশংসা করা হয়েছে। হাসসান লেখেন : "একজন গৌরবময় বংশোদ্ভূত, পবিত্র মানুষকে তাঁর চলাচলের সময়, সে (আসমা) উত্তেজিত করে তুলেছিল। তাই ভোরের আলো ফোটার আগেই, আততায়ী তাঁর (আসমার) রক্তেই তাঁকে রাঙিয়ে দিয়েছে, এবং এজন্য তিনি কোন অনুশোচনাও অনুভব করেননি" (১১)।

সমালোচকদের হত্যা করার পাশাপাশি, মুহাম্মদ তাঁর ঘনিষ্ঠ ইহুদি প্রতিবেশী কায়নুকাস (বনু কাইনুকা) থেকে শুরু করে ইয়াছরিবের ইহুদিদের বিরুদ্ধে এক ধর্মীয় শুদ্ধি অভিযান ও গণহত্যার প্রথম পর্যায়ের কর্মসূচী শুরু করেছিলেন। মক্কায় নামাজের দিক পরিবর্তন এবং একটি নতুন আব্রাহাম গল্পকাহিনীর আবিষ্কারের সাথে সাথে মুহাম্মদ ইঙ্গিত দেন যে, তিনি তাদের ধর্মের সাথে তাঁর সকল প্রকার যোগসূত্র ছিন্ন করেছেন। কিন্তু তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াই যথেষ্ট ছিল না। বদর যুদ্ধের কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি তাদের দুর্গের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে এবং সমগ্র গোত্রটিকে একটি শেষ হুঁশিয়ারি দেন : হয় মুহাম্মদের ধর্মে যোগ দেয়া হোক, অথবা "ঈশ্বর" তাদের উপর প্রতিশোধ নেবে, ঠিক যেমন তিনি মক্কাবাসীদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছেন তাঁকে সত্যের বাহক হিসেবে প্রত্যাখ্যান করার জন্য। "তোমরা জানো যে আমি একজন নবী, তোমাদের জন্যই আমাকে পাঠানো হয়েছে - তোমরা তা তোমাদের পবিত্রগ্রন্থে এবং তোমাদের সাথে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় দেখতে পাবে আমার কথা" বলেন মুহাম্মদ (১২)।

মুহাম্মদের মসজিদ থেকে দুই মাইল দূরে, ইয়াছরিবের উপরাংশে যাওয়ার পথে পাহাড়ি ঢালের চূড়ায় এবং প্রধান নদীগুলোর অন্যতম একটির উপরে বিশেষ কৌশলগত অবস্থানে নির্মিত সেতুর কাছে চারতলা বিশিষ্ট কায়নুকা দূর্গটি অবস্থিত ছিল। বনু নযীর এবং বনু কুরাইজা গোত্রের ইহুদিরা সম্পদশালী হয়েছিল কৃষির কারণে। অন্যদিকে কায়নুকার ইহুদিরা ছিলেন স্বর্ণকার, কারিগর, অস্ত্র প্রস্তুতকারক এবং ব্যবসায়ী। দুর্গের সামনে তাদের বাজার ছিল এবং পুরো আরব জুড়েই তাদের নিখুঁত গয়নার জন্য সুখ্যাতি ছিল। তারা খাজরাজের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে ছিল এবং বিগত দশকের বেশ কয়েকটি আন্তঃগোত্রীয় যুদ্ধে তাদের পক্ষ নিয়েছিল। তাদের সাথে যোদ্ধারা একাধিকবার খাজরাজের বহুশ্বরবাদী নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাইকে বিজয় এনে দিয়েছে। মুহাম্মদ যখন তাঁর শেষ হুঁশিয়ারি ঘোষণা দিচ্ছিলেন তখন দুর্গের ভেতর থাকা নেতারা বেরিয়ে আসলেন তাঁকে যুক্তি দেখাতে। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, মুহাম্মদ তাওরাতে যে দাবি করেছেন সেটা আসলে ভিত্তিহীন - তাদের পবিত্রগ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। এমনকি মুহাম্মদ নিজে ইহুদিও নন, তাহলে তিনি কিভাবে তাদের নবী হতে পারেন? তাঁরা মুহাম্মদকে একটি অনাগ্রাসন চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যার ধারামতে তাঁরা যদি মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ নাও করেন তবুও সেই চুক্তি ভঙ্গ হয় না (১৩)। একপর্যায়ে একজন ইহুদি নেতা রেগে গিয়ে বললেন: "নিজেকে প্রতারিত করবেন না, কারণ আপনি যাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন তাদের যুদ্ধ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ছিল এবং আপনি সেই সুযোগটিই গ্রহণ করেছেন। আপনি যদি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন, তাহলে আপনি আমাদের সত্যিকারের পৌরুষ দেখতে পাবেন!" (১৪)

যেকোন চুক্তি যদি মুহাম্মদের উপকারে লাগত তাহলে তা তিনি মেনে নিতেন, কিন্তু যখন আর উপযোগী হতো না তখন সেগুলোকে তিনি বাতিল করে দিতেন। অনাগ্রাসন চুক্তির সমাধান তিনি টেনেছিলেন একটি কোরানের আয়াত রচনা করে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে চুক্তি প্রত্যাখ্যান করার অনুমতি দেয়া দিয়েছিলেন। যদি তিনি অন্যপক্ষের কাছ থেকে 'বিশ্বাসঘাতকতার ইঙ্গিত' পান, তাহলে সেই চুক্তি তিনি ভঙ্গ করতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন : "আর যদি তুমি কোন কওম থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা কর, তাহলে (তাদের চুক্তি) তাদের দিকে সোজা নিক্ষেপ কর, নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না" (১৫)।

এখন কায়নুকার ইহুদিদের সাথে তাঁর কৃত চুক্তি বাতিল করার জন্য কেবল বলতে হবে যে, তিনি তাদের নিয়ে সংশয়ে আছেন। কায়নুকা বাজারের একটি মজার ঘটনা তাঁকে তাঁর প্রয়োজনীয় সেই অজুহাতও দিয়েছে। ইয়াছরিবের ধর্মান্তরিতকে



[মারওয়ানের মেয়ে আসমার হত্যাকাণ্ড। মুহাম্মদ তাঁকে মৃত দেখতে চেয়েছিলেন একটি কবিতাঁর কারণে, যেটাতে তিনি একজন বয়স্ক শেখকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে ব্যর্থ হওয়ায় ইয়াছরিবের গোত্রগুলির সমালোচনা করেছিলেন। মুহাম্মদকে নিয়ে তিনি ব্যাঙ্গাত্মক শ্লোক রচনা করেছিলেন। মুহাম্মদ মসজিদে আততায়ী নিযুক্ত করেন, যে গভীর রাতে তাঁর বাড়িতে ঢুকে তাঁর ভেতর তলোয়ার ঢুকিয়ে দেয় যখন সে তাঁর পাঁচ সন্তানের সাথে ঘুমিয়েছিল, যার মধ্যে একটি নবজাতকও ছিল। শুধুমাত্র নবজাতক শিশুটিকে এখানে দেখানো হয়েছে।]

বিয়ে করা এক বেদুইন তরুণী কায়নুকার একজন স্বর্ণকারের কারিগরের কাছে তাঁর একটু ছোট স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছে বিক্রি করার জন্য। যখন সে তাঁর সাথে সেটির মূল্য নিয়ে দেনদরবার করছিলেন তখন একজন ইহুদি পেছন থেকে উঠে এসে তাঁর স্কার্ট এমনভাবে বেঁধে দিল যে, যখন সে উঠে দাঁড়াল তখন তাঁর নিতম্ব উন্মুক্ত হয়ে গেল। তরুণীর অস্বস্তি দেখে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। মুহাম্মদের একজন অনুসারী কি ঘটেছে তা কাছ থেকে দেখছিলেন এবং তিনি অপরাধীকে হত্যা করে ফেলেন। প্রতিশোধ নিতে একদল ইহুদি তাঁকেও ঘিরে ফেলে এবং হত্যা করে। এই ঘটনাই যথেষ্ট ছিল মুহাম্মদের ঘোষণা দেয়ার যে, **"আমি বনু কায়নুকাকে নিয়ে ভীত"** (১৬, ১৭)।

একইদিনে তিনি কায়নুকার দুর্গ অবরোধ করার জন্য শতশত অনুসারীকে একত্রিত করেন। ইহুদিরা ভেতরে ব্যারিকেড করে প্রার্থনা করল যে, তাদের মিত্ররা তাদের উদ্ধার করতে আসবে, কিন্তু সেই সাহায্য আসেনি। পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে মুহাম্মদ গণিমতের মালের প্রতিশ্রুতি ব্যবহার করে আরো বেশি সংখ্যক মানুষকে অবরোধে যোগ দিতে উৎসাহিত করেন। স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে যায়, যা দেখে কেউই কায়নুকাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। এমনকি অন্যান্য ইহুদি সম্প্রদায়ও সাহায্য পাঠায়নি। তাদের নিকটতম অ-ইহুদি মিত্র ছিল আবদুল্লাহ বিন উবাই, কিন্তু তাঁর ক্ষমতা মুহাম্মদের তুলনায় কমে গিয়েছিল এবং তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, হস্তক্ষেপ করবেন না। কারণ, এতে তাঁর কোন স্বার্থ নেই। ইহুদিরা দুই সপ্তাহ ধরে আটকে ছিল, কিন্তু বাইরের সাহায্য না পেয়ে হতাশ হয়ে অবশেষে তাঁরা মুহাম্মদের দয়ার উপর নিজেদের সঁপে দিলেন। দয়া দেখানোর জন্য মুহাম্মদ ছিলেন ভুল ব্যক্তি। তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তিনি তাদের ঘৃণা করতেন এবং তাদের ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত এর প্রয়োজনীয়তা অনুমান করে তিনি বদরে একটি আয়াত রচনা করেছিলেন, যেখানে তিনি গণহত্যা করার জন্য নিজেকে নিজেই আল্লাহর আশীর্বাদ দিয়েছিলেন : "কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় যে, তার নিকট যুদ্ধবন্দি থাকবে যতক্ষণ না তিনি যমীনে (তাদের) রক্ত প্রবাহিত করেন" (১৮)।

যখন আত্মসমর্পণকারী ইহুদিরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন তাদের বেঁধে রাখা হয় এবং উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে যে, মুহাম্মদ তাদের সবাইকে শিরোচ্ছেদ করতে চাইছেন। যদিও আবুদুল্লাহ বিন উবাই সামরিকভাবে তাদের উদ্ধার করতে আসেননি, কিন্তু তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে যান এবং মুহাম্মদের কাছে তাদের সাথে ভালো আচরণ করার দাবি জানান। মুহাম্মদ যখন তাঁকে উপেক্ষা করলেন, তখন খাজরাজের প্রধান সেনাপতি (আবদুল্লাহ বিন উবাই) মুহাম্মদের জামা টান দিয়ে চেপে ধরে চিৎকার করে তাদের ছেড়ে দিতে বললেন। মুহাম্মদ রাগে লাল হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ধুর, আমাকে করতে দাও!" আবদুল্লাহ বললেন, "না, ঈশ্বরের নামে বলছি, যতক্ষণ না তুমি আমার মিত্রদের সাথে ভালো ব্যবহার কর, আমি তোমাকে যেতে দেব না। বর্মবিহীন চারশত লোক এবং তিনশত বর্ম পরা, যারা আমাকে আরব এবং অনারবদের থেকে সমানভাবে রক্ষা করেছে, আর তুমি এক সকালে এসে তাদের মেরে ফেলবে? ঈশ্বরের নামে বলছি, আমি নিরাপদ বোধ করছি না এবং ভবিষ্যতে কি হবে তা নিয়ে আমি শঙ্কিত!" মুহাম্মদ অবশেষে হার মানলেন আর এর উত্তরে বললেন, "আচ্ছা তোমার কথাই সই, যত্তসব!" (১৯)

মুহাম্মদ কায়নুকাদের বহিষ্কার করেন এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন, যার মধ্যে রয়েছে তাদের দুর্গ, কাঠের বাড়ি, ব্যবসা, কারিগরি সরঞ্জাম এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র। তিনি তাদেরকে কেবল তাদের উট এবং ব্যক্তিগত ব্যবহার্য কিছু জিনিসপত্র সাথে নিতে দিলেন। তিনি তাদের কয়েকদিন সময় দিয়েছিলেন সবকিছু গুছিয়ে নিতে এবং প্রায় একহাজার বছর ধরে বাস করা তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে। যাত্রার দিন তাদেরকে শহরের বাইরে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে মুহাম্মদ তাঁর এক আনুসারীকে আদেশ দিলেন। যখন তারা উপত্যকার সীমা অতিক্রম করল, তখন লোকটি তাদের আরও এগিয়ে যেতে বলল। এরপর লোকটি তাদের বলল, "যত দূরে যাবে ততই ভালো এবং আর ফিরে আসবে না"।

তাদের মধ্যে কেউ খায়বারে (Khaybar), কেউবা আরেকটি ইহুদি মরূদ্যান ওয়াদি আল-কুরায় (Wadi al-Qura) চলে গেলেন। তাদের অধিকাংশই অবশেষে সিরিয়ায় স্থানান্তরিত হয় এবং ইহুদি সম্প্রদায়ে বসতি স্থাপন করে।

এদিকে মুহাম্মদ লুটের মালামাল সব মসজিদের উঠোনে নিয়ে স্তুপ করে রাখেন। তিনি তাঁর জন্য নির্ধারিত পঞ্চমাংশ হিসেবে প্রথমে অস্ত্র বেছে নেন, নিজের জন্য তলোয়ার, বর্শা এবং বর্ম নির্বাচন করেন যেসবের আবার যুদ্ধে বেশ খ্যাতি থাকার কারণে নামকরণও করা হয়েছিল। অবশিষ্ট মালামাল তিনি তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। বিতরণ করে তিনি মুমিনদের বললেন, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং মুমিনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা আল্লাহর দলের, তারাই বিজয়ী" (২০)।

কায়নুকা ইহুদিদের বহিষ্কারের পর কবি-সমালোচকদের হত্যা অব্যাহত থাকে। মুহাম্মদের হত্যা তালিকায় শীর্ষে ছিলেন কাব আশরাফ (Kab Ashraf)। তিনি একজন ধনী সুগন্ধি ব্যবসায়ী ছিলেন, মায়ের দিক থেকে তিনি অর্ধেক ইহুদি, যিনি নযীর গোত্রের ছিলেন। বদরের যুদ্ধের আগে তিনি মুহাম্মদকে বারবার আক্রমণাত্মক কবিতা দিয়ে অপমান করেছিলেন। তাঁর কবিতা অন্যান্য সমালোচকরাও গ্রহণ করেছিলেন। মূলত তিনি যা লিখতেন তার সার ছিল এরূপ : মুহাম্মদ হচ্ছে একজন বহেরাগত যে উপত্যকার জীবন বিঘ্নিত করছেন এবং তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা উচিত। বদরে মক্কাবাসী পরাজয়ের পর খেপাটে আশরাফ মক্কায় গিয়ে তাদের উভয়েরই শত্রু মুহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে আহবান করেন। তিনি তাদের চাটুকারিতার সাথে প্রশংসা করে বলেন যে, তাদের ধর্ম মুহাম্মদের চেয়ে ভালো : "আপনারা অধিক ধর্মপরায়ণ এবং সত্যপথ প্রদর্শনকারী"। যে সকল মক্কাবাসীরা যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গিয়েছে আশরাফ তাদের জন্য কবিতা রচনা করেন মক্কাবাসীদের প্রশংসা করে। তিনি তাদের যোদ্ধাদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন এবং মুহাম্মদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

মুহাম্মদ যখন তাঁর কবিতা সম্বন্ধে জানতে পারলেন তখন তিনি শুধু আশরাফের বিরুদ্ধেই নয়, বরং তাঁকে যে সকল মক্কাবাসী আশ্রয় দিয়েছিল তাদের সবার উপর দমন অভিযান চালান। মুহাম্মদের নিযুক্ত কবি হাসসান বিন ছাবিত আশরাফের আশ্রয়দাতাদের "প্রতারণার ক্রীতদাস" এবং "শিক্ষিত বানর" বলে অভিহিত করেছিলেন। একে অন্যের বিরুদ্ধে তারা অপমানজনক কবিতার পঙক্তি নিক্ষেপ করতে থাকে, অবশেষে মুহাম্মদের করা অপমানই জয়ী হয়। যদিও আশরাফ মক্কাবাসীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছিল, কিন্তু ছাবিতের কুখ্যাত কবিতার মাধ্যমে মক্কাবাসীরা এত অপমানিত হয়েছিল যে, তারা আশরাফের আতিথেয়তা শেষ করতে বাধ্য হয়, যার ফলে আশরাফ চলে যেতে বাধ্য হয়। যখন তিনি ইয়াছরিবে ফিরে আসলেন, ইতিমধ্যে আবু আফাক ও আসমাকে খুন করা হয়ে গেছে এবং আশরাফ তাঁর প্রাণের ভয় পাচ্ছিলেন। যখন মুহাম্মদ তাঁর প্রত্যাবর্তনের কথা জানতে পারেন তিনি মসজিদের সমাবেশ থেকে একজন আততায়ী নিয়োগ করেন। এবারের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন মুহাম্মদ বিন মাসলামা (Muhammad ibn Maslama) নামে একজন বদরের যোদ্ধা, যিনি মুহাম্মদের জন্য এই হত্যাকাণ্ড ঘটাতে একলাফে রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি একটু চিন্তিত হলেন, এই হত্যাকান্ড সংঘটিত করতে কিছু কৌশলগত সমস্যা আছে যার সম্মুখীন আগের আততায়ীরা হয়নি। তাদের শিকারদের কাছে পৌঁছানো তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল, কিন্তু আশরাফ একটি নিচু পাহাড়ের উপরে নির্মিত কাঠের দূর্গে বাস করতেন। এবং কবি যেহেতু জানতেন যে তাঁর জীবন বিপন্ন, তিনি সহজে তাঁর দুর্গের দেয়ালের বাইরে যেতেন না। তাঁকে বাইরে আনতে গেলে প্রলুব্ধ করতে হবে, কিন্তু মাসলামা এই নিয়ে চিন্তিত ছিলেন কারণ প্রতারণা করলে আল্লাহ হয়তো তাঁর উপর ক্ষুব্ধ হতে পারেন। যখন মুহাম্মদ তাঁকে কাজটি সম্পন্ন করার জন্য যা যা প্রয়োজন তা করতে বলেন, তখন মাসলামা তাঁর সাথে আরো চারজন উৎসাহী সাহায্যকারী খুঁজছিলেন, যার মধ্যে একজন ছিলেন আশরাফের পালিত ভাই যার নাম আবু নাইলা (Abu Naila)। এই পালিত ভাই আশরাফের বিশ্বস্ততা অর্জন করেছিলেন এই বলে যে, তিনি মুহাম্মদের প্রতি অসন্তুষ্ট। মুহাম্মদকে কর প্রদানের মাধ্যমে তাদের অনুসারীরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছেন এবং এটা এতটাই কঠিন হয়ে গিয়েছে যে, তাদের খাদ্যের জন্য পর্যাপ্ত টাকা থাকছে না। তিনি এবং তাঁর আরো কয়েকজন লোকের পরিবারের খাদ্য কেনার জন্য জরুরি ঋণ প্রয়োজন। সে কি দয়া করে তাদের

সাহায্য করবে? ঋণের বিপরীতে তারা তাদের অস্ত্র এবং বর্ম তাঁর কাছে বন্ধক রাখতে ইচ্ছুক। আবু নায়লা বুঝতে পারছিলেন প্রলুব্ধতা আসলেই কাজ করছে যখন আশরাফ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে তুমিও তাঁর উপরে বিরক্ত?" (২১)

হত্যাকাণ্ডের রাতে ষড়যন্ত্রকারীরা মসজিদে মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের পরিকল্পনার কথা জানায়। তিনি তাদের কবরস্থান পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসেন এবং বলেন, "আল্লাহর নামে যাও"। প্রলোভন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেছে। যখন অন্য লোকেরা অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, তখন মাসলামার পাশে থাকা আবু নাইলা আশরাফকে রাস্তায় তাঁর সাথে দেখা করার জন্য ডাকলেন। আশরাফ তাঁর চুলে সুগন্ধি লাগিয়ে ঋণের অর্থ প্রদান করতে বেরিয়ে এলেন। তিনি কেবলমাত্র তাঁর স্ত্রীর সাথে বিছানায় গিয়েছেন, যাবার আগে তারা আশরাফের দামি সুগন্ধি মেখে নিয়েছিলেন। আবু নায়লা এই সুগন্ধির প্রশংসা করলেন এবং আশরাফের সুগন্ধি চুলের ভেতর দিয়ে আঙ্গুল ঢুকিয়ে স্পর্শ করছিলেন। ঠিক এরপরই আবু নাইলা আশরাফের মাথাটা তাঁর চুল ধরে পেছনে টেনে ধরলেন আর অন্যদের সংকেত দিলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন "আল্লাহর শত্রুকে মেরে ফেলো!" মাসলামা আশরাফের পেটে একটা ছুরি ঢুকিয়ে নিচের দিকে ছিঁড়ে ফেলল যাতে তাঁর অন্ত্রগুলো বেরিয়ে এলো। তবে কিছু ইতিহাসের সংস্করণে তাঁর মাথা কেটে ফেলা হয়েছে এমন কথা পাওয়া যায়, হয় ছুরি দিয়ে অথবা তলোয়ার দিয়ে কাটা হয়েছে (২২)। ইহুদিরা তাদের খুঁজতে লোক পাঠাতে পারে সেই ভয়ে তাঁরা বাইরের তুলনামূলক নির্জন মাঠের পথ দিয়ে মসজিদে ফিরে আসে, সঙ্গে আশরাফের কাটা মাথাটাও তাদের সাথে নিয়ে আসে। তারা মসজিদে পৌঁছতে পৌঁছতে ভোর হয়ে গেল এবং মুহাম্মদ তখন ফজরের নামাজ আদায় করছিলেন। তিনি যখন তাদের শুভেচ্ছা জানালেন তাঁরা তখন আশরাফের কর্তিত মাথাটি তাঁর পায়ের কাছে ফেলে দিল (২৩)। শত্রুর মৃত্যুর জন্য মুহাম্মদ আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের হয়ে ভালো কাজের জন্য খুনিদের প্রশংসা করলেন।
ইসলামি মৌলিক গ্রন্থে তাঁর মাথা দিয়ে কি করা হয়েছে তা পাওয়া যায় না; সম্ভবত এটা একটা বর্শার উপর সেটা বাঁধা ছিল যাতে সবাই দেখতে পারে। জানা যায় যে, ফজরের নামাজের পর মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের সকল ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে বলেন : "যে ইহুদি তোমাদের হাতের নাগালে পড়বে, তাঁকেই মেরে ফেলবে!" (২৪)

ইহুদিরা নিজেদেরকে দুর্গে আটকে রাখে। তাঁরা ভয় পায় যে, শীঘ্রই তাদের অবরোধের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু মুহাম্মদের এই খুনের প্রকাশ্য নির্দেশিকা সত্ত্বেও সেসময় শুধু একজন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন - সুনায়না (Sunayna) নামের একজন ইহুদি ব্যবসায়ী। মুহাইইয়িসা (Muhayyisa) নামের এক ধর্মান্তরিত লোক যে সুনায়নার ব্যবসায়িক সহযোগী ছিল সে তাঁকে বাড়ি বের হতে প্রলুব্ধ করে এনে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে। খুনির বড় ভাই যে ধর্মান্তরিত ছিল না, সে তাঁকে প্রচণ্ড মারধর করে বলে : "তুমি তাঁকে মেরে ফেললে যার সম্পদ খেয়ে তোমার পেটের চর্বি হয়েছে?" মুহাইয়িসা তাঁর কর্মোৎসাহের গভীরতা উন্মোচন করে বললো, "যিনি হত্যা করার আদেশ আমাকে দিয়েছেন তিনি যদি আপনাকেও মেরে ফেলার আদেশ দিতেন তাহলে আমি আপনার মাথাও কেটে ফেলতাম"। ইসলামিক গ্রন্থে বলা হয়েছে, এই কথার শোনার পর সুনায়নার বড়ভাই আলো দেখতে পেলেন এবং বললেন, "ঈশ্বরের কসম, যে ধর্ম আপনাকে এই রকম বানিয়ে ফেলতে পারে সেটা সত্যিই বিস্ময়কর!" এরপর তিনি শীঘ্রই ইসলামে দীক্ষিত হলেন (২৫)।

যখন কিছু ইহুদি এবং বহুশ্বরবাদীরা অভিযোগ করেন যে, হত্যা করার মতো কোন অপরাধ আশরাফ করেননি তখন মুহাম্মদ সতর্ক করে দেন যে, যদি কেউ তাঁকে অপমান করে ভবিষ্যতে তাঁকেও "তলোয়ারের নিচে রাখা হবে" (২৬)। এই হত্যাকাণ্ড ইয়াছরিব এবং এর বাইরে ত্রাস ছড়িয়ে দেয় এবং মুহাম্মদের পোষা ক্রমবর্ধমান উগ্রবাদিদের হাত থেকে নিজেদের প্রাণ এবং নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য বহুশ্বরবাদীদের অনেকেই দলবেঁধে নামে মাত্র মুহাম্মদের ধর্মে যোগ দেয়। এমনকি আসমা বিনতে মারওয়ানের বর্ধিত পরিবারও যোগদান করেছে, কারণ তাঁরাও মুহাম্মদের 'ধর্মের ক্ষমতা' (২৭) দেখেছে। জীবনের ভয়ে খাজরাজ প্রধান আবদুল্লাহ বিন উবাই, যার ইয়াছরিবের রাজা হবার কথা ছিল তিনিও ধর্মান্তরিত হন। মক্কায় প্রারম্ভিক বছরগুলোতে মুহাম্মদ মাত্র একশ বা ততোধিক বিশ্বাসী লাভ করেছিলেন। একের পর এক হত্যাকাণ্ড এবং কায়নুকা

ইহুদিদের বহিষ্কার সংঘটিত হবার কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর ধর্মের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। ইয়াছরিবের প্রায় সব অ-ইহুদি জনসংখ্যার অনেকটাই এখন তাঁর দলে অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, সন্ত্রাসই এখন সবচে বিশ্বাসযোগ্য ধর্মপ্রচারক।

অধ্যায় - ১৭
সৌভাগ্যের বিপরীতে

বদরের যুদ্ধের অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিয়ে এবং একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ছিল মোহাম্মদের মেয়ে রুকাইয়ার জন্য। বদরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে রুকাইয়া অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তার বর ও ভবিষ্যতের খলিফা উসমান বিন আফফান তার দেখাশোনার জন্য ইয়াছরিবে অবস্থান করেন। মোহাম্মদ যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার আগে রুকাইয়া মারা যান, এবং জায়েদ যখন উটের পিঠে করে ইয়াছরিবের নিচু অংশে তাদের বিজয়ের সংবাদ নিয়ে আসছিলেন, তখন রুকাইয়ার কবরের মাটি সমান হয়ে গেছে। তিনি কিভাবে মারা গেছেন ইসলামের আদি গ্রন্থে তা নিয়ে কোন ইঙ্গিত নেই, কিন্তু জানা যায় যে, তার বয়স বিশের কোঠায় ছিল এবং তার কোন জীবিত সন্তান ছিল না। মক্কায় তার একটি ছেলে সন্তান হয়েছিল, কিন্তু বলা হয় যে একটি ঈগল পাখি সেই বাচ্চাটির চোখ উপরে ফেলে, যার ফলশ্রুতিতে বাচ্চাটি মারা যায়। মোহাম্মদ রুকায়ার কবরের গিয়ে শোকাহত হয়ে পড়েন এবং প্রার্থনা করেন। কয়েক মাস পরে, উসমান রুকাইয়ার বোন উম্মে কুলসুমকে (Umm Kulthum) বিয়ে করেন।

কিছুদিনের মধ্যে ৫৪ বছর বয়সী মোহাম্মদের সাথে উমরের মেয়ে হাফসার দ্বিতীয় বিয়েটি সম্পন্ন হয়, যখন হাফসার বয়স বিশ বছর এবং বিধবা ছিলেন। তিনি এবং তার স্বামী খুনাইস (Khunais) আবিসিনিয়া অভিবাসীদের মধ্যে ছিলেন এবং মোহাম্মদ ইয়াছরিবে আসার পর তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিলেন। খুনাইস বদরের যুদ্ধের কিছুদিন পরেই মারা যান, হয়ত যুদ্ধের ক্ষত থেকে কিংবা রোগে আক্রান্ত হয়ে। মোহাম্মদ এর কয়েক মাস পরে হাফসাকে বিয়ে করেন এবং তাঁকে মসজিদের পাশে নির্মিত একটি ছোট কক্ষে স্থানান্তর করেন। তিনিও সাওদা এবং আয়েশার সাথে একই গৃহে যোগ দেন। আয়েশার বয়স তখন প্রায় বারো বছর।

তৃতীয় বিয়েটি ছিল আলী ও মোহাম্মদের ছোট মেয়ে ফাতিমার মধ্যে। আলী ছিলেন চব্বিশ বছরের যুবক এবং ফাতেমা ছিলেন তাঁর চেয়ে তিন-চার বছরের ছোট। তিনি বদরের যুদ্ধের ঠিক আগে ফাতেমাকে বিয়ে করার জন্য মোহাম্মদের অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু সে সময়ে তিনি ছিলেন অর্থবিত্তহীন মানুষ এবং ফাতিমাকে মোহরানা দেয়ার মতো কিছুই তার কাছে ছিল না। মোহাম্মদ আলীকে বলেছিলেন যে, আলী যদি ফাতিমাকে তাঁর যুদ্ধের বর্মটি দেন সেটাই যথেষ্ট রোমান্টিক হবে, যার মূল্য ছিল প্রায় চার দিরহাম। আসলে উদ্দেশ্যই এখানে মুখ্য। বর্মটি দেখতেও তেমন ছিল না। এটি একটি সস্তা হুটামি স্যুট যার মধ্যে একটি হুড পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেটি থার্টি ফাইভ পাউন্ড লোহার চেইন দিয়ে বানানো হয়েছিল। এটিকে মরীচিকা থেকে দূরে রাখতে তেল মাখতে হতো, কিন্তু তেল দেয়ার পরও একটু ভিজে গেলে পোশাকে মরীচিকার দাগ লেগে যেত। তিনি এটা ফাতিমাকে দিয়েছিলেন, কিন্তু সম্ভবত আবু সুফিয়ানের কাফেলায় হামলার সময় আবার তিনি তা ধার নিয়েছিলেন।

বদর থেকে ফিরে আসার পর আলী বিয়ের প্রস্তুতি শুরু করেন। তাঁর তলোয়ারটিতে তখন কুড়িটির মত দাগ ছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মাল ছিল তার গর্বের বিষয়। তিনি পেয়েছিলেন দুটি উট এবং কিছু অস্ত্র আর বর্ম। তবে এই আনন্দ অনুষ্ঠানে কিছু ধাক্কা তাঁকে পেতে হয়েছিল, যখন হামজা তার গনিমতের মালও খেয়ে ফেলেছিল। আলি চেয়েছিলেন ইয়াছরিবের নিচু জলাভূমি থেকে মিষ্টি গন্ধযুক্ত গুল্ম নিয়ে আসতে, যা কায়নুকার কলাকুশলীদের কাছে বিক্রি করে তিনি টাকা সংগ্রহ করতে পারবেন (১)। তিনি যুদ্ধ থেকে গণিমতের মাল হিসেবে প্রাপ্ত দুটি উটকে ইয়াছরিবের এক ধর্মান্ধরিত লোকের বাড়ির বাইরে বেঁধে রেখেছিলেন, যে ধর্মান্তরিত লোকটি হামজার বিজয়ে আনন্দ আয়োজন করেছিলেন । কিন্তু আলী যখন আরো গুল্ম সংগ্রহ করতে নিচু ইয়াছরিবের দিকে যান তারপর ফিরে এসে তাঁর উটগুলোকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। তাঁর উটগুলো শুধু মৃতই ছিল না, তাদের আসলে জবাই করা হয়েছিল। তাদের পিঠের দিকের কুঁজটা কেটে ফেলা হয়েছিল এবং তাদের কলিজাও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। হামজাকে সন্দেহ করে আলী ছুটে যান মোহাম্মদের কাছে। হামজা ছাড়া আর

কেউ এটা করতে পারত না, আলী নিশ্চিত! আলীর মাথা খারাপের জোগাড় - এখন কিভাবে তিনি তাঁর বিয়ের জন্য টাকা তুলবেন?

আলী এবং জায়েদের পর মোহাম্মদ হামজার রঙ্গশালায় যান এবং দেখেন হামজা তার সুন্দরী ক্রীতদাসীকে পাশে বসিয়ে মদ্যপ হয়ে আছেন। ওখানে যাওয়ার পর জানা গেল এই তরুণী (দাসী) হামজার কানে ফিসফিস করে বলেছিল যে, উটের কুঁজের রোস্ট ছাড়া আর কিছুই তাঁকে (মেয়েটিকে) খুশি করতে পারবে না। কথা শুনে হামজা তড়িঘড়ি করে বাইরে গিয়ে হাতের কাছে যেই উট পায় সেটিকেই জবাই করে। সম্ভবত মদ্যপ থাকায় ঈর্ষান্তিত হয়েই সে উটটিকে আলীর মালিকানাধীন জেনেই হত্যা করেছে। বাস্তবতা হচ্ছে এই, সবাই জানত যে আলী বদরের যুদ্ধে হামজার চেয়ে চারগুন বেশি মানুষ খুন করেছে, তবুও হামজা “সিংহ” নামে পরিচিত ছিল। সে হয়তো সিংহ ছিল, কিন্তু আলী এখন সিংহের রাজা।



[কাব আশরাফ হত্যা। একজন ধনী ইহুদী সুগন্ধি ব্যবসায়ী কাব বিন আশরাফ মোহাম্মদের সমালোচনা করে কবিতা লেখার জন্য মোহাম্মদ তাঁকে হত্যার নির্দেশ দেন। আশরাফ একটি দুর্গবেষ্টিত কক্ষে বাস করতেন এবং তাঁকে বাইরে আনতে প্রলুব্ধ করা হয়েছে। মোহাম্মদের পাঠানো হত্যাকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন আশরাফের প্রতিপালিত ভাই আবু নাইলা (Abu Naila)। তিনি খাবার কেনার জন্য টাকা ধার নেয়ার অজুহাতে আশরাফকে তার দুর্গের কক্ষ থেকে বের করে আনতে সক্ষম হন।]

মদ্যপ থাকার কারণে হামজার চোখ ছিল রক্তাক্ত, তিনি অনুতপ্ত ছিলেন না। মোহাম্মদকে দেখে হামজা তার দিকে তাকিয়েছিলেন এবং মাদকতার ঢেঁকুর তুলে তাকে বললেন, "তুমি আমার বাবার দাস ছাড়া আর কিছুই নও"। সম্ভবত মাতাল অবস্থায় হামজা কি করতে সক্ষম তা জেনে মোহাম্মদ সাবধানতা অবলম্বন করে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলেন (২)। এই ঝামেলা সত্ত্বেও বিয়ের অনুষ্ঠান এগিয়ে গেল। বিয়ের উপহার হিসেবে, মোহাম্মদ ফাতিমাকে একটি নরম গাউন, একটি পানির চামড়ার পাত্র, এবং একটি মিষ্টি গন্ধের গুল্মে ভরা চামড়ার বালিশ দেন, এবং বিয়ের ভোজের জন্য একটা ছাগলের ভুনা বরাদ্দ ছিল। ইসলামের আদি গ্রন্থে হামজা সেই বিয়ের অতিথিদের মধ্যে ছিলেন কিনা, তা উল্লেখ করা হয়নি। আলী ও ফাতিমার দুই সন্তান ছিল, হাসান ও হুসাইন। তাদের পিতার মতো তাঁরাও পরবর্তী সময়ে ইসলাম ধর্মের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং পরবর্তীতে দুটো প্রধান দল সুন্নি এবং শিয়ায় বিভক্ত হওয়ার জন্য অনুঘটক হয়ে উঠেন। এই তিনটি বিয়ে এবং আয়েশার সাথে মোহাম্মদের বিয়ে করার ব্যাপারটা কতিপয় শীর্ষ ব্যক্তিদের সাথে মোহাম্মদের পারিবারিক সম্পর্ককে আরো মজবুত করে তোলে। এই ব্যক্তিরা ছিলেন আবু বকর (Abu Bakr), আলী (Ali), উমর (Umar) এবং উসমান (Uthman)। পরবর্তীতে দেখা যাবে, তারা প্রত্যেকেই অবশেষে ধর্মের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, এবং আবু বকর বাদে সবাইকে হত্যা করা হবে।

বদরের পরাজয় শুধু অভিজ্ঞ মক্কান নেতৃত্বকেই সরিয়ে ফেলেনি, ইয়াছরিবের পশ্চিমে আদিবাসী অঞ্চলের মধ্য দিয়ে সিরিয়া যাওয়ার ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্য পথও এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, যা মক্কানদের জীবন ও জীবিকার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপকূলীয় আদিবাসীদের সাথে মক্কানদের দীর্ঘদিনের চুক্তি ছিল, যার মাধ্যমে কাফেলা বাণিজ্য নিরাপদে যাতায়াত করতে পারত। মোহাম্মদ এইসব গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে বৃদ্ধাগুলি দেখিয়ে উপকূলীয় আদিবাসীদের প্রলুব্ধ করেন, যদি তারা মক্কান কাফেলাদের সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে দেয়, তাহলে গনিমতের মালের কিছু অংশ তাদেরও দেবেন। এই গোত্রের একজন সংবাদদাতাই মোহাম্মদকে উত্তর দিকে যাওয়া আবু সুফিয়ানের কাফেলা সম্পর্কে খবর দিয়েছিল এবং কাফেলা সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করার এই সময়ে আরেকটি আদিবাসী মোহাম্মদের গুপ্তচরদের আশ্রয় দিয়েছিল। বদরের বিস্ময়কর বিজয়ের মাধ্যমে মোহাম্মদ এখন ইয়াছরিব ও উপকূলের মধ্যবর্তী অবশিষ্ট আদিবাসীদের ভেতরেও জায়গা করে নিতে সক্ষম হন, এর মাধ্যমে তিনি কার্যকরভাবে লোহিত সাগরকেন্দ্রিক মক্কান বাণিজ্যপথ বন্ধ করে দেন।

উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতে মক্কানরা পূর্ব ইয়াছরিবের মরুভূমির প্রধান যাযাবর আদিবাসীদের প্ররোচিত করে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে জেগে উঠতে এবং একটি কূটনৈতিক প্রচারণা শুরু করে, এবং পূর্ব অঞ্চলের মধ্য দিয়ে একটি নিরাপদ কাফেলা পথও তাঁরা তৈরি করেন। তাঁরা মোহাম্মদকে শুধু মক্কাবাসীর জন্যই না বরং পুরো আরবের জন্যই বিপজ্জনক হিসেবে চিত্রিত করেন। আবু সুফিয়ানের কাফেলার বিরুদ্ধে মোহাম্মদের অভিযান সফল হবার পরে মক্কাবাসীরা পুর্বাঞ্চলের কিছু আদিবাসীকে ইয়াছরিব আক্রমণে আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, কিন্তু এবার মোহাম্মদ প্রাচীন এক পন্থা অবলম্বন করলেন।

যখনই তিনি জানতে পারলেন তার বিরুদ্ধে এ ধরনের প্রস্তুতি (রণপ্রস্তুতি) নেয়া হচ্ছে তিনি তখন আগেই আক্রমণ করার জন্য একটি বাহিনী একত্রিত করলেন এবং আক্রমণ করে বসলেন। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল যতটা সম্ভব বেশি মানুষকে হত্যা করা, চরম রকমের ভাংচুর করা, স্থানীয়দের মূল্যবান গবাদিপশু লুট করা এবং ত্রাস ছড়ানো। এমনই একটি অভিযানের পর তিনি যখন জানতে পারলেন যে, ইয়াছরিব থেকে ষাট মাইল দক্ষিণের সুলাইম বেদুইনরা (Sulaym Bedouins) তার বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনা করছে তখনই মোহাম্মদ দুইশো লোককে সঙ্গে নিয়ে তড়িৎ গতিতে এগিয়ে যান। মোহাম্মদ বেদুইনদের নিকটে আসার আগেই তাঁরা তাদের পাঁচশত উট এক রাখাল বালকের কাছেই রেখেই দিগ্বিদিক পালিয়ে যায়। মোহাম্মদ সেই রাখাল বালক এবং পাঁচশত উট সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। ইয়াছরিব ফিরে গনিমতের মাল শহরের ঠিক বাইরে ভাগ করে দেন। মোহাম্মদ তার নিজ অংশ হিসেবে একশটি উট রাখেন এবং তার অভিযানের সঙ্গীরা প্রত্যেকে দুটি

করে উট পান। মোহাম্মদ মেষপালককে দুটো পছন্দ দেন, হয় সে ধর্মান্তরিত হবে নয়ত তার মাথা হারাবে। রাখাল বালক ধর্মান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

বদর বিজয়ের চার মাস পর ইয়াছরিবের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গাতফান যাযাবররা (Ghatafan nomads) মোহাম্মদের পরবর্তী অভিযানের লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়। এই অভিযানের জন্য মোহাম্মদ সাড়ে চারশত লোক নিয়ে ইয়াছরিব ত্যাগ করেন, কিন্তু এগারো দিন পরে খালি হাতে ফিরে আসেন। ইতিহাসে পাওয়া যায়, তার আগমনের খবর পেয়ে গাতফানরা আগেই পাহাড়ের দিকে দৌড়ে পালায় এবং তিনি চলে না যাওয়া পর্যন্ত লুকিয়ে থাকে।

কাফেলা আক্রমণের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল এমন – তাঁরা যাত্রাপথে ছোট একটি মক্কান কাফেলা আক্রমণ করেন, যারা তখন তাদের পূর্ববর্তী রুট ছেড়ে নতুন করে ইস্টার্ন রুটে (পূর্ব দিককার পথে) কাফেলা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বদরের ছয়মাস পরে, মক্কানরা উমাইয়া খালাফের ছেলে সাফওয়ানের (Safwan) নেতৃত্বে একলাখ দিরহাম মূল্যের পণ্য বহনকারী একটি কাফেলা পাঠায়। ধারণা করা হয় রৌপ্য মুদ্রাগুলো কার্গোর অংশ ছিল, কিন্তু সম্ভবত রৌপ্যমুদ্রাকে গলিয়ে রূপার পাত বানিয়ে সিরিয়ার শোধনাগারগুলোর কাছে তাঁরা বিক্রি করতে চেয়েছিল (৩)। সাফওয়ান তাদেরকে অচেনা এলাকার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন পথপ্রদর্শক ভাড়া করেছিল। কাফেলাটি সিরিয়ায় ঠিকই যেতে পারত যদি না একজন ঠোঁট পাতলা মক্কান ব্যবসায়ী ইয়াছরিব ভ্রমণ করতেন এবং এই বিষয়ে কথা না বলতেন। এই মক্কান লোকটি নাদির গোত্রের কিনানা (Kinana) নামের এক রাব্বির দুর্গে এক সন্ধ্যা অতিবাহিত করেন। তিনি যখন অন্যান্য অতিথিদের সাথে খাবার খাচ্ছিলেন ঠিক তখনই মুখ ফস্কে মক্কানদের সম্পত্তি এবং কাফেলা নিয়ে কথা বলে ফেলেন। কিনানা বিশ্বাসযোগ্য মানুষ ছিলেন, কিন্তু সেখানে থাকা একজন অতিথি বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। সেই লোকটি দৌড়ে মসজিদে গিয়ে মোহাম্মদকে এই কাফেলার কথা জানায়। মোহাম্মদ কালবিলম্ব না করেই ১০০ জনের একটি বাহিনী একত্রিত করেন আক্রমণের জন্য, এবং তাঁর পালক পুত্র জায়েদকে সেই বাহিনীর সেনাপতি করেন।

জায়েদ কাফেলাটিকে পথিমধ্যে আটকে দিল। সঙ্গে থাকা সেই পথপ্রদর্শক ছাড়া কাফেলার সকল সদস্য পালিয়ে যায়, আর পণ্যবোঝাই উট এবং তাদের মালপত্র হামলাকারীদের হাতে পড়ে যায়। জায়েদ লুটের মাল সব ইয়াছরিবে ফিরিয়ে আনেন এবং মোহাম্মদ উল্লসিত হয়ে মসজিদের উঠোনেই তা বিলিবন্টন করে দেন। প্রায়ই মোহাম্মদ বিবিধ লুটের মাল স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে নিলামে উঠাতেন এবং তারপর যারা ঝুঁকি নিয়ে এই অভিযান চালাতেন তাদের মধ্যে স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রাগুলো ভাগ করে দিতেন। এই লুটের জন্যও, সম্ভবত তিনি একই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন; যেমন তাঁর নিজের জন্য এক পঞ্চমাংশ, সেই হিসেবে তিনি বিশ হাজার দিরহাম রেখেছিলেন। আগের অভিযানের সময় ধরা পড়া মেষপালকের সাথে তিনি যেমন করেছিলেন, এই পথপ্রদর্শকের সাথেও একই আচরণ করেছিলেন। তাঁকে ধর্মান্তরিত হওয়া বা মৃত্যু এ দুটির মধ্যে যেকোনো একটিকে বেছে নেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। এক্ষেত্রে সেও ধর্মান্তরিত হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এটা পরিষ্কার হয়ে উঠছিল যে, মক্কান ও মোহাম্মদের মধ্যে আরেকটি যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে এবং সমস্ত আরবরা তা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছিলে। একদিকে মোহাম্মদের রাস্তা অবরোধ এবং অন্যদিকে মক্কান কাফেলার উপর উপর্যপুরি হামলা মক্কানদের উপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলছিল।

মক্কাবাসীদের শস্য এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য কেনার প্রয়োজন ছিল, এবং শুধুমাত্র তাদের বাণিজ্য মিশন থেকে প্রাপ্ত মুনাফার অর্থ দিয়েই তাঁরা খাদ্যশস্য কিনতে পারত। তাদের উত্তর দিকের বাণিজ্য পথ একেবারে কেটে ফেলা হয়েছে, আর যা মূলধন ছিল খাদ্যের ক্রয়ে তাও তাঁরা খরচ করে ফেলল। সাফওয়ানের কাফেলা ডাকাতি হবার পর মক্কানরা আর্থিকভাবে যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল সেটিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু অর্থনৈতিক ঝুঁকির চাইতে তাদের প্রাণের ঝুঁকিটাও এখন নেহাত কম না। আরবদের মধ্যে মক্কার লোকদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল, এবং পৌত্তলিক সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে তাদের জীবনযাত্রাও হুমকির মুখে পড়েছিল।

বদর যুদ্ধে পরাজয়ের পর আবু সুফিয়ানের কাফেলা মক্কায় ফিরে আসার পরপরই নতুন এক যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়। মক্কানরা তাদের ব্যবসায়িক মুনাফার ভাগবাটোয়ারার একটি অংশ দিয়ে নতুন একটি সেনাদল সজ্জিত করার ব্যাপারে একমত হয়। পরবর্তী বারোমাস ধরে এই প্রস্তুতি চলতে থাকে যেন পরের বছরের মার্চ মাসের মধ্যেই আবু সুফিয়ারের নেতৃত্বে ইয়াছরিবের উপর হামলা চালাতে পারে। এটা বদরে পাঠানো সেনাবাহিনীর চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল। তিন হাজার সৈন্য, তীক্ষ্ণ তলোয়ার এবং বর্শা তৈরি করা হয়েছে। শক্ত কাঠের ধনুক, ধারালো পিতলের মাথা সহ প্রচুর তীর এবং ছুরি এবং আংটা তৈরি করা হয়েছে। অশ্বারোহী বাহিনী এবং সামনের সারির যোদ্ধারা যুদ্ধের পোশাক এবং চামড়ার বর্ম সেলাই করা ধাতব পাতের বর্ম বানিয়ে নিয়েছিল। এই বাহিনী মক্কান এবং তাদের আঞ্চলিক মিত্রদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। তায়েফের ছাকিফ গোত্র তাদের তিনশত যোদ্ধা সরবরাহ করে। এছাড়া মক্কার আশপাশের বিভিন্ন বেদুইন আদিবাসীরা আরো শতশত যোদ্ধা সরবরাহ করে এবং আবিসিনিয়ান ভাড়াটেদের একটি দলকেও প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য তৈরি রাখা হয়। ডজনখানেক ক্রীতদাস, যাদের ভূমিকা ছিল ক্যাম্পের জন্য তাঁবু খাটানো, প্রয়োজনে তাঁবু ভেঙ্গে ফেলা, আনুষঙ্গিক কাজকর্মে সাহায্য করা ও বাহিনীর সাথে থাকা।

ক্রীতদাসদের মধ্যে একজন ছিলেন ওয়াহশি (Wahshi) নামের একজন আবিসিনিয়ান, যিনি বর্শা ছুঁড়ে মারার দক্ষতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। মোহাম্মদকে তায়েফ থেকে পালিয়ে আসার পর সুরক্ষা দানকারী মক্কান এক নেতার পুত্র জুবায়ের বিন মুতিম (Jubayr ibn Mutim) ওয়াহশিকে বলেছিলেন, তিনি যদি হামজাকে হত্যা করতে পারেন তাহলে তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা হবে। বদরে হামজা জুবায়েরের চাচা তুয়াইমাকে (Tuayma) হত্যা করেছিল, জুবায়ের এর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ তার প্রস্তাবকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছিল, “যাও আবু দাসমা (Abu Dasma), আমাদের হয়ে প্রতিশোধ নাও এবং নিজের দিকে খেয়াল রেখো” (৪)।

যখন সেনাদল বেরিয়ে পড়ল মক্কার সমগ্র জনতা তখন তাদের জন্য উল্লাস করতে লাগল। কিছু যোদ্ধা আল-উজ্জা এবং হুবাল দেবতার মূর্তি খুঁটিতে বেঁধে তা বহন করে চিৎকার করে বলতে লাগল, “আল-উজ্জার গৌরব! হুবালের গৌরব!” অন্যরা তাদের গোত্রীয় ও বংশীয় যুদ্ধপতাকা বহন করছিল। সেনাদল আস্তে আস্তে আগাতে থাকল, আর তাদের সাথে হাতির পিঠে ছিল দুই ডজন নারী - কয়েকজন যোদ্ধার স্ত্রী, মা এবং কন্যা। সেনাদল শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় নারীরা খঞ্জনি বাজিয়ে তাদের জয়গান গাইতে থাকে।

মোহাম্মদ তার চাচা আব্বাসের মাধ্যমে সেনাদলের মক্কা ছাড়ার কথা জানতে পারেন। আব্বাস ছিলেন মোহাম্মদের মক্কার খবর প্রাপ্তির চোখ ও কান। বদরে বন্দি হবার পর আব্বাস নিজেকে একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু ইয়াছরিবে না থেকে তিনি মক্কায় ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি অর্থনৈতিকভাবে মক্কার সাথে এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন যে, তার পক্ষে সবকিছু ছেড়ে চলে আসা সম্ভব ছিল না। বাস্তবতা হচ্ছে, তিনি মুক্তিপণের জন্য সবচেয়ে বেশি অর্থ প্রদান করেছিলেন আর সেজন্য মক্কাবাসীরাও বিশ্বাস করে ফেলে যে, আব্বাস মক্কার অনুগত। পক্ষান্তরে আব্বাস মোহাম্মদকে সাধারণভাবে মক্কাবাসীদের কার্যকলাপ এবং বিশেষ করে যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানাতে শুরু করেন। মক্কান সেনাদল শহর থেকে রওনা হওয়ার ঠিক আগেই আব্বাস একজন বেদুইনকে বেশ অর্থকড়ি দিয়ে একটি গুপ্ত চিঠি মোহাম্মদকে পৌঁছে দিতে বলেন, যেখানে তিনি ঐ সেনাদলের শক্তি এবং নেতৃত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। বেদুইনটি কুবার উচ্চভূমির মসজিদে (মসজিদ আল কুবা) দেখা করে মোহাম্মদের হাতে চিঠিটি তুলে দেন, যেখানে একজন শিক্ষিত বিশ্বাসী তাঁর কাছে তা পাঠ করে শোনান। মোহাম্মদ এই বিষয়ে নিরব থাকার আদেশ দেন যতক্ষণ না তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কি করতে হবে, কিন্তু ইয়াছরিবের কেন্দ্রস্থলে যে প্রধান মসজিদ ছিল সেখানে ফিরতে না ফিরতেই সংবাদটি ছড়িয়ে পরে।

সবাই বিতর্ক জড়িয়ে পড়ল কিভাবে মক্কানদের মুখোমুখি হতে হবে। আবদুল্লাহ বিন উবাই প্রথম উপদেশটি প্রদান করেন, এই সেই লোক যিনি এক বছর আগে কায়নুকা ইহুদিদের গণহত্যা থেকে বাঁচাতে মোহাম্মদের সাথে কথা বলেছিলেন। উবাই মসজিদের সমাবেশে হাজির হলেন এবং মোহাম্মদ তাঁকে কথা বলার অনুমতি দিলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে এই বলে মত দিলেন যে, “ইয়াছরিবকে যুদ্ধের ময়দানে টেনে নিয়ে যেতে দেওয়া উচিত নয়”। তিনি দেখিয়েছেন যে, সুদূর অতীতের যখনই ইয়াছরিবীরা আগ বাড়িয়ে যুদ্ধে গেছে তখনই তারা হেরে গেছে। বরঞ্চ যখন তারা রক্ষণাত্মক যুদ্ধ করেছে তখনই সফল হয়েছে। তারা তাদের ভবনগুলোকে সংযুক্ত করার জন্য চারপাশে দেয়াল তৈরি করেছিল যাতে ইয়াছরিবে সবদিক থেকে দুর্গের মতো প্রাচীর গড়ে ওঠে। শত্রুপক্ষ যখনই তা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকতে চেয়েছে তখনই ছাদ থেকে তীর ছুঁড়ে তাদের হটিয়ে দিত, আর শহরে ঢুকে গেলে তলোয়ারধারীরা রাস্তায়ই তাদের শেষ করে দিত।

উবাই যুক্তি দেখিয়ে বলেন, আমাদের উচিত পূর্বপুরুষদের উদাহরণ অনুসরণ করা। মোহাম্মদও তাতে একমত হন, কারণ তিনিও একটি স্বপ্নে দেখেছিলেন যেখানে তাঁকে বলা হয়েছিল যে তাঁর সামনে বিপদ আছে এবং ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করা তাঁর পক্ষে অনুকূল হবে না। উমর এবং তাঁর দলের অভ্যন্তরীণ অন্যান্যরাও একমত হয়েছেন, কিন্তু কিছু পদমর্যাদা সম্পন্নরা একমত হতে পারেননি। বেশ কয়েকজন লোক মোহাম্মদের পায়ে পড়ে যুক্তি দেখায় যে, যদি তাঁরা দেয়ালের পেছনে লুকিয়ে থাকে তাহলে তাদের দুর্বল এবং কাপুরুষ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। মক্কাবাসীরা বাইরের এলাকা লুট করবে, তাদের খেজুর গাছ ও ক্ষেত পুড়িয়ে ফেলবে এবং ভবিষ্যতে তাদের আবার আক্রমণ করতে উৎসাহিত হবে। বাইরে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ শক্তি দেখিয়ে তাদের মুখোমুখি হতে হবে। অন্যরা তার কাছে করজোড়ে আবেদন জানায়, মোহাম্মদ যেন এইরকম যুদ্ধ করার সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত না করে, যা তাদের শহীদ হবার সুযোগ করে দেয় যে বিষয়ে মোহাম্মদ তাদের বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

মোহাম্মদ প্রতীকীভাবে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। আবু বকর ও উমরকে নিয়ে তিনি প্রার্থনা মঞ্চের পিছনের ঘরে ফিরে গেলেন এবং তাদের সাহায্য নিয়ে তিনি তার বর্ম (যুদ্ধপোশাক) পরিধান করলেন। যখন তিনি তার প্রার্থনার জায়গায় ফিরে এলেন, তখন তিনি একজন যোদ্ধা হয়ে ফিরে এলেন এবং তা ইঙ্গিত দিল যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে মক্কানদের মোকাবেলা করতেই যাচ্ছেন। কিছু অনুসারী যারা কিছুক্ষণ আগেও যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানিয়েছে, এখন তারা অনুতপ্ত হচ্ছেন। কারণ তারা দেখেছে যে, তারা তাদের প্রিয় নেতাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তারা তাকে পিছনে থাকতে অনুরোধ করে, কিন্তু উত্তরে মোহাম্মদ বলেন, "যে নবী তার বর্ম পরেছেন, তার পক্ষে যুদ্ধ না করে ঘরে বসে থাকা সমীচীন হবে না”(৫)।

মক্কান সেনাবাহিনীর ইয়াছরিব পৌঁছাতে দশদিন লেগেছিল। মোহাম্মদ তাদের গতিবিধির উপরে নজরদারি করার জন্য গুপ্তচর পাঠান, এবং তাদের মধ্যে দুজন মক্কান বাহিনীতে অনুপ্রবেশ করতেও সক্ষম হয়। গোয়েন্দারা মক্কানদের সাথে উহুদ পর্বতের পাদদেশ থেকে শিবির পর্যন্ত ছিল, যা ইয়াছরিব উপত্যকার উত্তর প্রান্তে আটকে ছিল। আবু সুফিয়ানের উত্তর দিক দিয়ে প্রবেশ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না, কারণ উপত্যকাটি অন্য যেকোন দিক থেকে অপ্রতিরোধ্য ছিল। পাহাড় এবং লাভাক্ষেত্র এমনিতেই প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রেখেছিল। তার সাথে ছিল ভবন এবং ঘন খেজুরের বাগান যেগুলো আরো বেশি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। উপত্যকার পশ্চিম পার্শ্বে লাভাক্ষেত্রের ভিতর, যেটা উহুদ পর্বতের পাদদেশে বয়ে সমতল সমভূমিতে ঠেকে, আর যেখান দিয়ে কাফেলা যাওয়া আসা করত, আবু সুফিয়ান তার বাহিনীকে সেদিক দিয়ে নিয়ে যায়।

মোহাম্মদ সাতশত লোকের একটি শক্তিশালী বাহিনী একত্রিত করতে সক্ষম হন। আরও তিনশত যোদ্ধা আবদুল্লাহ বিন উবাইর অধীনে ছিল। দুই বাহিনী পৃথকভাবে তৈরি হয়, কিন্তু একত্রিত হয়ে উপত্যকার উত্তর প্রান্তে যোগ দেয়। মোহাম্মদের তখনও কোন পরিকল্পনা ছিল না। উত্তরের শেষ বসতি ছিল দুই স্তম্ভবিশিষ্ট শায়খাইন (Shaykhayn) নামের একটি দুর্গ। একটি স্তম্ভ থেকে মোহাম্মদ চারপাশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং উহুদ পর্বতের দিকের ভূখণ্ড দেখতে সক্ষম ছিলেন। দুর্গের

ওপারের মাটি সমতল ও বন্ধ্যা ছিল। তার মধ্য দিয়ে একটা শুকনো নদীতট বয়ে গেছে। বদরের মত এইখানে পাথর ছিল না, যার মানে মক্কানরা তাদের অশ্বারোহী বাহিনীর পূর্ণ ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। তিনি আব্বাসের চিঠি এবং তার গুপ্তচরদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, মক্কাবাসীরা তাদের সঙ্গে দু'শত ঘোড়া নিয়ে এসেছে। সুতরাং শায়খাইন বসতির এলাকা জুড়ে তার যুদ্ধের সারি গঠন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ এটি অবস্থিত ছিল ইয়াছরিবের স্বল্প জনবহুল প্রান্তে এবং চারপাশে খোলা জমি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। সেখানে থাকলে তাকে চারপাশ দিয়ে তীরন্দাজদের আক্রমণের করার ঝুঁকি থেকে যাবে। সমভূমি থেকে প্রায় আধা মাইল দূরে, উহুদ পর্বতের পাদদেশ। একমাত্র প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান হতে পারে শায়খাইনের সোজা উত্তরে, যেখানে সাগরের তীরে পাথুরে দ্বীপের মত উহুদ পর্বত ভিতরের দিকে বেশ বাঁক নিয়েছে। মোহাম্মদ এটাকে লড়াইয়ের জন্য উপযুক্ত অবস্থান হিসেবে বেছে নিলেন। যদি মোহাম্মদ সেই পাহাড়ের বাঁক ঘেঁষে তার সেনাবাহিনীকে আঁটসাঁট রেখা তৈরি করে সন্নিবেশ করতে পারেন তাহলে তিনি পাহাড়কে পিছনে নিরাপত্তা হিসেবে পাবেন। আর সেটা তাঁকে প্রতিপক্ষের তীর আক্রমণের হাত থেকেও বাঁচাবে।

তিনি যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই তার তিনশত সৈন্য নিয়ে ফিরে চলে যায়, ফলে মোহাম্মদ মারাত্মক ধাক্কা খেয়েছিলেন। উবাই মোহাম্মদকে একজন আইনজীবীর মত ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন: মোহাম্মদ ইয়াছরিবে আসার কয়েকদিন পর তার সাথে মোহাম্মদের চুক্তি হয়েছিল, তা ছিল যদি ইয়াছরিব আক্রান্ত হয় তবে একে অন্যকে সাহায্য করবে, যেটা ছিল পারস্পরিক সুরক্ষা চুক্তি। কিন্তু যে মুহূর্তে মোহাম্মদ শায়খাইনের বাইরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, সেই মুহূর্তে তিনি ইয়াছরিবের বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই সৈন্যরা ইয়াছরিব সীমানার বাইরে যুদ্ধ করতে বাধ্য নয়, কারণ তখন সেটি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে। রক্ষণাত্মকভাবে যুদ্ধ না করার জন্য তার উপদেশ মোহাম্মদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, আর তাই উবাই তার সৈন্যদের জন্য এমন ঝুঁকি নেয়াটা উচিত মনে করছেন না। উবাই কোন কারণ খুঁজে পেলেন না যে, কেন তার উত্তম উপেক্ষা করা হয়েছে! মোহাম্মদ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, “আমরা তাকে ছাড়াই করতে পারি”। বদরের মত মোহাম্মদও তার সুবিধার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র গঠন করেন। শায়খাইন দুর্গের পশ্চিমে এক মাইলেরও কম দূরে মক্কান বাহিনী তার গতিবিধির উপর কড়া নজর রেখেছিল, কিন্তু এখনো তারা মুখোমুখি হওয়ার জন্য অগ্রসর হয়নি। কিন্তু মোহাম্মদের বাহিনীর সেই যুদ্ধমুখে আসতে বেশি সময় লাগেনি। তিনি দ্রুত তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে সোজা দাঁড়াতে বললেন, কিন্তু দেখলেন যে তার বাম পাশ ঢেকে রাখার মত যথেষ্ট লোকবল নেই, যার ফলে তার অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়ার সময় আক্রান্ত হবার ঝুঁকি থেকে যায়। তাই তিনি পঞ্চাশজন তীরন্দাজকে বিস্তৃত পাহাড় থেকে আরেকটি ছোট পাহাড়ে পাঠালেন এবং তাদের কঠোর আদেশ দিলেন: "আপনারা সেখানে থাকুন এবং আমাদের পিছনে পাহারা দিন। আপনারা যদি দেখেন যে আমরা গনিমতের মাল সংগ্রহ করছি, তা হলেও আমাদের সাথে যোগ দেবেন না, এবং যদি আমাদের নিহত হতে দেখেন, তাহলেও আমাদের সাহায্য করতে আসবেন না” (৬)।

মক্কাবাসীরা শীঘ্রই মোহাম্মদের সারিবদ্ধ সৈন্যদের বিপরীতে নিজেদের সাজানো শুরু করে। আবু সুফিয়ানের সৈন্যরা মোহাম্মদের চেয়ে চারগুন বেশি ছিল, তার একজনের বিপরীতে চারজন সৈন্য ছিল এবং তারা খালি পায়ে, উটের পিঠে এবং ঘোড়ার পিঠে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য একটি শক্তিশালী প্রাচীর নির্মাণ করেছিল। হিন্দ এবং অন্যান্য মক্কান নারীরা রণবাদ্য বাজিয়ে বদরে নিহত আত্মীয়দের জন্য প্রতিশোধ নেয়ার জন্য চিৎকার করতে থাকে।

এসবের বিপরীতে মোহাম্মদের অনুসারীদের উৎসাহ ছিল চরম পর্যায়ে। মক্কাবাসীদের কেউই মৃত্যু কামনা করেনি, কিন্তু মোহাম্মদের অনুসারী মুমিনদের মাঝে সবচেয়ে গোঁড়ারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিল এবং তাই মৃত্যুর আগে যত বেশি সম্ভব অবিশ্বাসীকে হত্যা করতে উদগ্রীব ছিল। সেদিন মোহাম্মদের যুদ্ধের আর্তনাদ ছিল, “হত্যা করো, মেরে ফেলো” (৭)। এবং এ ব্যাপারে তিনি একেবারেই আপোষহীন ছিলেন। এই হত্যাযজ্ঞকে উৎসাহিত করার জন্য তিনি বদর থেকে প্রাপ্ত ধারালো এক তলোয়ার তার একজন অনুসারীর হাতে তুলে দেন এবং বলেন, “যতক্ষণ না তা ভেঙ্গে যায় ততক্ষণ তাদের মুখে আঘাত

কর"। তলোয়ার নেয়ার পর লোকটি তার যুদ্ধের শিরস্ত্রাণের উপর 'মৃত্যুর পাগড়ি' বলে পরিচিত লাল পাগড়ি পেঁচিয়ে মোহাম্মদের সৈন্যদের সারির সম্মুখে বুক ফুলিয়ে আসা যাওয়া করতে থাকে এবং মক্কানদের দেবতাদের ব্যঙ্গবিদ্রুপ করতে শুরু করে (৮)।

বদর যুদ্ধের মতই এই যুদ্ধের শুরু দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মাধ্যমে হয় এবং বদরের মতই, আলী ও হামজা যে সমস্ত মক্কানদের একা মুখোমুখি হয়েছে তাদেরকেই হত্যা করে ফেলে। প্রতিটি হত্যার সাথে সাথে মোহাম্মদ "আল্লাহু আকবর" বলে চিৎকার করতে থাকেন, এবং তার সাথে সাথে পুরো সেনাদল সেটি বারংবার আওড়াতে থাকে। এরপর যেই দুই পক্ষ একে অপরের দিকে অগ্রসর হলো সাথে সাথে তারা একে অন্যকে লক্ষ করে তীর ছুঁড়তে লাগল। মুখোমুখি যুদ্ধ একপর্যায়ে হাতাহাতি লড়াইয়ে রূপ নিলে যোদ্ধাদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা গেল। আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ যখন তুঙ্গে তখন মক্কানরা তাদের নেতা ওয়ালিদের পুত্র খালিদের নেতৃত্বে মোহাম্মদের বাম দিকে আক্রমণ করে, কারণ সেই পাশটি ছিল উন্মুক্ত। কিন্তু পাহাড়ের চূড়ায় থাকা মুহম্মদের তীরন্দাজরা তীর ছুঁড়ে কিছু ঘোড়া এবং তাদের আরোহীদের নামিয়ে নিয়েছিলেন। মোহাম্মদ শত্রুদের পতাকাগুলোকে নিশানা করেন, সেগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন; যতক্ষণ সেগুলোকে উপরে তুলে ধরে রাখা হবে, বুঝে নিতে হবে যে যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। যুদ্ধের শুরুতে জুবায়ের মক্কান যোদ্ধার উটের উপর ঝাঁপিয়ে উঠে, তাকে মাটিতে ফেলে দেয়, তারপর উট থেকে লাফ দিয়ে নেমে তাকে হত্যা করে। মোহাম্মদ, যিনি পঞ্চাশ গজের বেশি দূরত্বে থেকে এই দৃশ্য দেখছিলেন, তিনি তার অনুসারীদের কানে পৌঁছে দেয়ার মতো জোরে জোরে চিৎকার করে বলেন : "প্রত্যেক নবীরই শিষ্য আছে, আর আমার শিষ্য হচ্ছে জুবায়ের!" (৯)

হামজা যখন যুদ্ধের একেবারে মাঝখানে এবং সে বুঝতে পারেনি তাকে পিছন দিক থেকে ঘিরে ফেলা হচ্ছিল। হামজাকে সিংহের মত শিকার করার জন্য জুবায়ের বিন মুতিম কর্তৃক নিযুক্ত আবিসিনীয় ক্রীতদাস ওয়াহশিকে পাঠানো হয়েছিল। হাতে বর্শা নিয়ে সে সিংহের মত শিকার ধরতে ওঁৎ পেতে ছিল। হামজা এক মক্কানের দিকে তলোয়ার চালাতেই ওয়াহশি শিকারের কাছাকাছি চলে আসে। হামজা তার দিকে ফিরতেই আবিসিনীয় দাস ওয়াহশি তার দিকে বর্শা ছুঁড়ে মারল। বর্শাটি হামজার পেট কেটে লেজের মত তার নিচের পিঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো। হামজা ওয়াহশির দিকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলেন ঠিকই, কিন্তু তারপর পাশ ফিরে পড়ে গেলেন এবং প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মারা গেলেন। অভিযান সম্পন্ন হয়, ওয়াহশি হিন্দের কাছে তার সাফল্যের কথা জানান এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে যান (১০)।

মোহাম্মদের সৈন্যরা মক্কান পতাকা বাহকদের উপর হামলা চালিয়ে যায়। সব মিলিয়ে নয়জনকে হত্যা করা হয়েছে। শেষের জন ছিল একজন ক্রীতদাস, যে মক্কান পতাকা উঁচু করে ধরে রেখেছিল যতক্ষণ না তার কপাল কেটে ফেলা হয়। তার মৃত্যু ঘটে যখন মোহাম্মদের সবচেয়ে হিংস্র যোদ্ধাদের একটি দল মক্কান বাহিনীর সাথে ধস্তাধস্তি করে তাদের শিবিরে ঢুকে নারীদের ছত্রভঙ্গ করে। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ এবং অন্যান্য মক্কান নারীরা তাদের পরিধেয় স্কার্টের প্রান্ত ধরে দ্রুত পাহাড়ের দিকে দৌড়ে পালাতে সক্ষম হন। যখন তারা দেখল যে তাদের সারি ভেঙ্গে গেছে এবং তাদের পতাকা পড়ে গেছে, তখন মক্কানরা আতঙ্কিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। তাদের তাড়া করার বদলে মোহাম্মদের অনুসারীদের মধ্যে কম প্রতিশ্রুতিবদ্ধরা মক্কান শিবিরের দিকে দৌড়ে গনিমতের মাল দখল করে নেয়। মোহাম্মদের তীরন্দাজরা এই কর্ম দেখছিল, এবং যখন তারা দেখল তাদের নিজস্ব লোকজন লুটপাটের জন্য দৌড়ে যাচ্ছে, দশজন তীরন্দাজ ছাড়া সবাই তাদের অবস্থান ছেড়ে পাহাড়ের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ল গনিমতের মালের ভাগ নিতে, যাতে তাদের ভাগে মাল কম না পড়ে। এটা ছিল একটা মারাত্মক ভুল! একশো অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন খালিদ এবং আরও একশত অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন আবুল হাকামের পুত্র ইকরিমা (Ikrima), তারা পাহাড়ের চূড়ায় আক্রমণ করে বসেন। তারা সেখানে অবশিষ্ট তীরন্দাজদের হত্যা করে এবং পিছন থেকে মোহাম্মদের সৈন্যদের আক্রমণ করেন।

দুর্ধর্ষ এই অশ্বারোহী বাহিনী যুদ্ধের প্রকৃতি বদলে দেয়। মক্কী সৈন্যদের অশ্বারোহী বাহিনীর লাঠি এবং তলোয়ার দ্বারা মোহাম্মদের লোকেরা মারা পড়ছিল। এখন মুমিনদের পালানোর পালা, তাদের অধিকাংশই দক্ষিণের পথ দিয়ে পালিয়ে ইয়াছরিবের দিকে যাচ্ছিল। জুবায়েরের মা সাফিয়া ছিলেন অল্প কয়েকজনের মধ্যে একজন যারা পিছু হটতে অস্বীকার করে। তিনি পলায়নরত মোহাম্মদের অনুসারীদের দিকে একটা বর্শা তাক করে এই পালানোর স্রোত উল্টা পথে নিতে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। যখন জুবায়ের তার কাছে দৌড়ে এসে বলল, "মা, ফিরে এসো! ফিরে এসো!" তখন তিনি তার ছেলের দিকে বর্শা তাক করে বললেন, "আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও! তোমার কোন মা নেই!"(১১)

তীরন্দাজরা তাদের অবস্থান ধরে রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় মোহাম্মদের জীবন প্রায় বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। মক্কানদের আক্রমণে তিনি এবং একদল যোদ্ধা অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। জীবনের ভয়ে চিৎকার করে তাকে রক্ষা করতে বললেন, "কেউ কি আমাকে রক্ষা করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবে যার বিনিময়ে সে পরকাল পেয়ে যাবে?" (১২) পালিয়ে যাওয়া লোকদের অনেকেই আতঙ্কে ছিল এবং তারা ছুটে যাওয়ার সময় তাকে উপেক্ষা করে নিরাপত্তার জন্য কাছাকাছি একটি খাঁড়ির কাছে চলে আসে। তবে অন্যরা তার চারপাশে জড়ো হয় এবং মৃত্যুর সাথে লড়াই করে মোহাম্মদকে আগলে রেখে পাহাড়ের দিকে দৌড়াতে দেয়। তবে পাহাড়ে পৌঁছানোর আগেই নিহত মক্কান নেতা উমাইয়া ইবনে খালাফের ভাই উবাই ইবনে খালাফ সোজা তার দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে এগিয়ে আসেন। তার ছেলে বদরে বন্দিদের একজন ছিল, এবং যখন সে তার ছেলের মুক্তিপণ পরিশোধ করতে ইয়াছরিব গিয়েছিল, তখন তিনি মোহাম্মদকে সতর্ক করে দিয়েছিল তারও একদিন আসবে যেদিন তিনি তাকে হত্যা করবেন। এর জবাবে মোহাম্মদ বলেছিলেন, "না, আমিই তোমাকে হত্যা করব" (১৩)। উবাই যখন খুব কাছে চলে আসছিলেন, তখন মোহাম্মদের বেশ কয়েকজন যোদ্ধা তার ঘোড়াকে আটকে দিল। যখন তিনি ঘোড়ার পিঠে থেকে তাদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন, তখন মোহাম্মদ তার গলায় একটি বর্শা ঢুকিয়ে দিলেন যার ফলে তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। মক্কান সৈন্যরা যদি চারপাশে ঘিরে না থাকতো, তাহলে হয়তো তিনি তার মাথা কেটে ফেলতেন। মোহাম্মদ এবং তাঁর সাথে থাকা একটি ছোট দল খাদের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পাথরের পেছন থেকে তীর ছুঁড়তে থাকে। অন্যদিকে তাঁর কিছু অনুসারী মক্কানদের দৌড়ানির উপর রাখে যাতে তারা মোহাম্মদের দিকে যেতে না পারে। মোহাম্মদ তাদের উৎসাহ দেয়ার জন্য চিৎকার করে বলতে থাকেন, "যে কেউ তাদেরকে আমাদের কাছে আসা হতে প্রতিহত করবে সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে" (১৪)।

মক্কানদের মধ্যে কয়েকজনের হাতে গুলতি ছিল, তারা ছোট ছোট দলগুলোকে পাথর ছুঁড়ে মারতে থাকে। একটি পাথর মোহাম্মদের মুখের পাশ ঢেকে রাখা লৌহবর্মের উপর আঘাত করে, যার ফলে ওর লোহার কিছু অংশ গভীরভাবে তাঁর গালে আঘাত করে। এই পাথরের আঘাতে তিনি মাটিতে পরে যান এবং পাথরের উপরে মুখ থুবড়ে পড়েন, যার ফলে তার নিচের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং তার ঠোঁট কেটে যায়। মক্কান সৈন্যরা তখনও তার দিকে ছুটে আসতে লাগল এবং তাদের মধ্যে একজন এত কাছে চলে এসেছিলেন যে, তার তলোয়ার দিয়ে মোহাম্মদের শিরস্ত্রাণের উপর আঘাত করে বসেন। এর ফলে শিরস্ত্রাণটি মোহাম্মদের মাথায় ভেঙে গিয়ে আঘাত করে, যার ফলে প্রচুর রক্তপাত হয়। এত রক্ত দেখে মক্কানরা নিশ্চিত হয়ে গেছিল যে, আঘাতকারী ব্যক্তি মোহাম্মদের মাথা দুই খন্ড করতে পেরেছে। আনন্দের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে গেল, "মোহাম্মদকে হত্যা করা হয়েছে!"

প্রাথমিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়েছে ভেবে মক্কানরা পিছিয়ে গেল। যখন তারা চোখের সামনে থেকে চলে গেল, তখন রক্তাক্ত মোহাম্মদকে তাঁর দলের সদস্যরা নিরাপদে লুকিয়ে রাখার জন্য গিরিখাত বেয়ে উঠে একটি গোপন আস্তানার খোঁজ করতে লাগল। আবু বকর ও উমর সহ তার আরেকদল যোদ্ধা ইতিমধ্যেই একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছে। রক্তাক্ত মোহাম্মদকে না চিনতে পেরে গুহার ভিতর থেকে একজন তাকে লক্ষ্য করে তীর তাক করে ধরে, কিন্তু মোহাম্মদ চিৎকার করে বললেন, "মারবেন না! এটা আমি, আল্লাহর রাসূল"(১৫)!

আবু বকর ও উমর তাকে দেখে উল্লসিত ছিলেন। তারা শত্রুদের বিজয়ের ধ্বনি শুনছিল যে, মোহাম্মদকে হত্যা করা হয়েছে এবং এটি শুনে তারা হতাশ হয়ে পড়েছিল। মোহাম্মদ আসার আগে তারা পরস্পর আলোচনা করছিলেন যে, তারা আবদুল্লাহ বিন উবাইকে আবু সুফিয়ানের কাছে পাঠাবেন যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করতে। এখন তারা আনন্দের সাথে চিৎকার করে উঠল যে, তাদের নেতা বেঁচে আছেন, কিন্তু মোহাম্মদ তাদের চুপ থাকতে বললেন। কারণ তখনও মক্কানরা সেখানে ঘোরাফেরা করছিল, আর তাই মোহাম্মদ চিন্তিত ছিলেন – না জানি ওরা তাঁর অবস্থান জেনে যায়! এরপর মোহাম্মদ তাঁর সাথে থাকা লোকেদেরকে অন্যান্য আহতদের কাছে যেতে আদেশ দিলেন এবং নিজের ক্ষত দেখতে লাগলেন। তিনি তার ভাঙ্গা দাঁতের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, “যারা এই কাজ করেছে তাদের উপর ঈশ্বরের অভিশাপ বর্ষিত হোক” (১৬)। সেখান থেকে একজন লোক তার গাল থেকে লোহার খন্ডটি বের করতে তাকে সাহায্য করেন। ইনি ছিলেন আবু উবাইদা, তিনি বদরের যুদ্ধে তার নিজের বাবাকে হত্যা করেছিলেন। তিনি তার দাঁত দিয়ে এই লোহার টুকরোটি বের করে আনেন, যার ফলে তার নিজের সামনের দাঁত ভেঙে যায়। তারপর তিনি মোহাম্মদের মুখের রক্ত চাটতে লাগলেন, যেন এটা তার কাছে ঐশ্বরিক সুধা। মোহাম্মদও তাতে আপত্তি করেননি, তিনি বরং বললেনঃ “যার নিজের রক্ত আমার রক্তকে স্পর্শ করেছে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না” (১৭)।

নিচে যুদ্ধক্ষেত্র মৃতদেহে ভরা ছিল। প্রকৃত হিসেব অনুযায়ী বাইশজন মক্কাবাসী নিহত হয়, অন্যদিকে মোহাম্মদের সত্তর জনেরও বেশী অনুসারী নিহত হয়। মক্কাবাসীরা মোহাম্মদের বাহিনীদের মধ্যে নিহতদের অস্ত্র ও বর্ম খুলে ফেলে এবং মক্কান ধর্মান্তরিতদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিতদের কান ও নাক কেটে ফেলে। হিন্দ, যিনি হামজার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার শপথ নিয়েছিলেন, তিনি হামজার পেট কেটে তার কলিজা কেটে ফেলেন। বলা হয় যে, তিনি আসলে তার কলিজাতে কামড় দেন এবং চিবিয়ে খান, এবং তারপর থুথু ফেলে তার ঘৃণা প্রকাশ করেন। হামজা তাঁর (হিন্দের) পরিবারের অনেক সদস্যকে হত্যা করেছে।

আবু সুফিয়ান মোহাম্মদের মৃতদেহ অনুসন্ধান করতে লাগলেন, কিন্তু যখন তিনি তা খুঁজে পেলেন না তখন তিনি সন্দেহ করতে লাগলেন যে, মোহাম্মদ হয়তো মারা যাননি। যে লোকটি তাকে হত্যা করেছে বলে দাবি করেছে, তিনি তার কাছ থেকে বর্ণনা শোনেন কি ঘটেছে। সে আবু সুফিয়ানকে সেই খাড়ার কাছে নিয়ে যায়, যেখানে বেশ কিছু মৃতদেহ পরে ছিল, কিন্তু মোহাম্মদ তাদের মধ্যে ছিলেন না। তিনি এটাও ভাবতে লাগলেন, সম্ভবত বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা তার মৃতদেহ লুকিয়ে রেখেছেন।

এদিকে, মোহাম্মদ তিনি একটু দোদুল্যমান অবস্থায় পড়ে গেলেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, মক্কানরা এখন ইয়াছরিবকে আক্রমণ করতে পারে, কিন্তু তিনি পাহাড়ে আটকে আছেন এবং আক্রমণ থেকে বিরত করার জন্য কিছুই করতে পারবেন না। উত্তর দিকে উহুদকে ইয়াছরিবের কাছ থেকে পৃথক করা আধা মাইল খোলা ভূখণ্ড আছে, কিন্তু সেখানে ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত মক্কান বাহিনীর মুখোমুখি হওয়া আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে। কিন্তু আবু সুফিয়ান ইয়াছরিবকে আক্রমণ না করার সিদ্ধান্ত নেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন ঘরে ঘরে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার বিপদ বাড়তে পারে। তবে প্রধান কারণ ছিল তিনি মনে করেছেন যে, তার যুদ্ধ মোহাম্মদের সাথে ছিল, ইয়াছরিবের লোকদের সাথে নয়। তাই তাদের নিহত যোদ্ধাদের কবর দেয়ার পর মক্কানরা তাদের তাঁবু ও মালপত্র উটের উপর বেঁধে চলে যাবার প্রস্তুতি নেয়।

যাওয়ার আগে আবু সুফিয়ান তার ঘোড়াকে খাদের দিকে টেনে নিয়ে গেলেন, যেখানে মোহাম্মদের সাথে শেষ যোগাযোগ হয়েছিল। তিনি পাহাড়ের দিকে চিৎকার করে বললেন হুবাল বিজয়ী হয়েছে এবং মোহাম্মদ, আবু বকর ও উমরের নাম উল্লেখ করে চিৎকার করে বলেন, “আর আবু কাবশার (Abu Kabsha) ছেলে কোথায়? আর আবু কুহাফার (Abu Kabsha) ছেলে কোথায়? আল-খাত্তাবের (al-Khattab) ছেলে কোথায়?” (১৮) তিনি বেশ কয়েকবার চেঁচিয়ে উঠলেন। পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মোহাম্মদ উমর ও আবু বকরকে উত্তর দেয়া থেকে বিরত রাখেন, এই ভয়ে যে মক্কানরা তাদের খুঁজে

পাবেন। কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে যখন আবু সুফিয়ান চিৎকার করে বলেন, "আচ্ছা বুঝেছি, এদের হত্যা করা হয়েছে; যদি তারা বেঁচে থাকত, তাহলে তারা সাড়া দিত"। উমর আর নিজেকে আটকাতে পারলেন না। তিনি জবাব দিলেন, "তোমরা মিথ্যা বলছ, তোমরা আল্লাহর শত্রু! আল্লাহ তোমাদের দীর্ঘস্থায়ী শাস্তি প্রদান করুন" (১৯)! মক্কান বণিক নেতা তাকে বিদ্রুপ করে বলেন যে হুবালই বিজয়ী, মোহাম্মদের আল্লাহ নয়। মোহাম্মদের প্ররোচনায় উমর চিৎকার করে বলেন, "আমাদের মৃতরা জান্নাতে আছে এবং তোমাদের মৃতরা জাহান্নামে আছে" (২০)।

ধর্মতাত্ত্বিক পাল্টাপাল্টি আলাপের পরিসমাপ্তি ঘটে যখন আবু সুফিয়ান উল্লেখ করেন যে, এটি শুধুমাত্র উমরের বিশ্বাস এবং মোহাম্মদ জীবিত কিনা তিনি তা জানতে চেয়েছিলেন। উমর বললেন, "তিনি তোমার কথা শুনছেন"। এতে আবু সুফিয়ান মোহাম্মদের অঙ্গহানির কথা স্মরণ করিয়ে বলেন, "এটা আমাদের নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত ছিল না। তারপরও যদি আমরা ইচ্ছে করেই এটি করে থাকতাম, তাতে আমাদের আপত্তি থাকত না" (২১)। তিনি পরের বছর বদর উপত্যকায় মোহাম্মদকে পুনরায় মুখোমুখি হওয়ার চ্যালেঞ্জ জানান। উমর মোহাম্মদের দিকে ফিরে তাকালেন, তিনি কি করতে চান জানতে। মোহাম্মদ যখন মাথা নাড়লেন, তখন উমর চিৎকার করে বললেন, "আমরা সেখানে তোমাদের সাথে দেখা করব"।

মক্কাবাসীরা চলে যাওয়ার পর মোহাম্মদ আলী ও অন্যান্যদের নির্দেশ দিলেন দেখতে যে, তারা কোথায় যাচ্ছে। তিনি বলেন, "যদি তারা উটে চড়ে আর তাদের ঘোড়ার নেতৃত্ব দেয়, তাহলে তারা মক্কার দিকে যাবে। যদি তারা ঘোড়ায় চড়ে উটের নেতৃত্ব দেয়, তাহলে তারা ইয়াছরিবের দিকে যাবে।" তিনি শপথ করে বলেন, তারা যদি ইয়াছরিবের দিকে যায়, তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন যতক্ষণ না তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় (২২)। আলী উৎসাহব্যঞ্জক সংবাদটি নিয়ে এলেন, মক্কানরা তাদের উট চালাচ্ছিল এবং তারা দক্ষিণে যাচ্ছিল।

যখন মোহাম্মদ নিশ্চিত হলেন যে, তিনি এখন নিরাপদ তখন উহুদ থেকে বের হলেন। তার সাথে যারা ছিল তাদের সকলকে নামাজের জন্য পাহাড়ে নিয়ে গেলেন। ক্ষত থেকে হওয়া যন্ত্রণার কারণে তিনি সিজদা করা থেকে বিরত থাকলেন, কিন্তু পা দুখানা জোড়া করে বসে আয়াত আবৃত্তি করলেন। প্রার্থনা শেষ হলে তিনি হামজার মৃতদেহ খুঁজতে লাগলেন। হামজাকে চেনাই যাচ্ছিল না। তার নাক এবং কান কেটে ফেলা হয়েছে, তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে নেয়া হয়েছে। তার কলিজা কেটে ফেলা হয়েছে এবং কলিজাটি তার শরীরের পাশেই মাটিতে পরে আছে, তাতে গভীর কামড়ের চিহ্ন আছে। মোহাম্মদ সাফিয়াকে দূরে রাখতে জুবায়েরকে বলেন, যাতে সে তার ভাইকে এই অবস্থায় দেখতে না পারে, কিন্তু যাই হোক না কেন সাফিয়া এসে ভাইয়ের মৃতদেহের উপর কাঁদতে থাকে। মোহাম্মদ জানতে পারলেন যে, হিন্দই (Hind) হামজার কলিজা কেটে ফেলেছে এবং তাতে কামড় বসিয়েছে। এটি ক্রোধে ফুঁসতে থাকেন যখন তাঁর ধারণা হয়, হিন্দ হয়তো হামজার কলিজার কিছুটা গিলে ফেলেছে বা হজম করে ফেলেছে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ ও তার রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য হিন্দকে চিরন্তন আগুনে জ্বালানো হবে। কিন্তু যে চিন্তা তাকে আতংকিত করে তুলেছিল সেটি হলো, তিনি মনে করেছিলেন হিন্দ হয়তো হামজার কিছু অংশ শুষে তার শরীরে ভিতর নিয়েছে, যার ফলে হামজার শরীরের অনু-পরমাণুও জাহান্নামের চিরস্থায়ী আগুনের তাপ অনুভব করবে! (২৩)

শোকার্ত পরিবারের অনেকেই ইয়াছরিব থেকে আসেন মৃতদেহ বাড়ি নিয়ে গিয়ে কবর দিতে, কিন্তু একডজন বা ততোধিক মৃতদের যুদ্ধক্ষেত্রেই সমাহিত করা হয়। হামজাকে একটি কবরে কবরস্থ করা হয়। অন্য মৃতদেহগুলিকে দুই বা তিনজন করে একই কবরে সমাধিস্থ করা হয়, তবে তার আগে দেহগুলোকে আশীর্বাদের জন্য মোহাম্মদের পাশে রাখা হয়। তারপর তাদেরকে মাটি দেয়া হয়। মোহাম্মদ বলেন, তারা সবাই কিয়ামতের দিন তাদের ক্ষত নিয়েই জেগে উঠবে। সেই ক্ষত থেকে চমৎকার সুগন্ধি বের হবে, এই সুগন্ধি দ্বারা আল্লাহর প্রতি তাদের ভক্তির প্রমাণ হবে।

ইয়াছরিবে নিহত কিছু ধর্মান্ধরিতদের মা-বাবা তাদের সন্তানদের মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ হয় এবং অভিযোগ করে যে, তাদেরকে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে এখানে এনে হত্যা করা হয়েছে। ইয়াজিদ (Yazid) নামে এক অল্প বয়সের এক যুবক এর মধ্যে ছিলেন। মারাত্মক আহত অবস্থায় তাকে তার বাবা হাতিবের (Hatib) বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং একটি গালিচায় রাখা হয়, এবং সেখানেই তিনি মারা যান। যারা তার ক্ষতবিক্ষত দেহকে নিয়ে এসেছিল তারা শোকার্ত পিতার পাশে বসে বলেন যে, ইয়াজিদ শহীদের মর্যাদা ও জান্নাত যাবেন, যেখানে তিনি কালো চোখের কুমারিদের পুরস্কার হিসেবে পাবেন। ইয়াছরিবের অনেকের মত, হাতিবও (Hatib) নির্যাতন থেকে বাঁচতে নামমাত্র ধর্মে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু একপর্যায়ে তিনি এই সমস্ত কথা আর নিতে পারেননি। তিনি তাদের দিকে রাগান্বিত হয়ে বলেন : "আল্লাহর শপথ, তোমরা তার সাথে এই কাজ করেছ! তোমরা তাকে এইভাবে প্রলুব্ধ করেছ যতক্ষণ না সে তোমাদের সাথে যায় এবং তাকে হত্যা করা হয়। তোমরা তাকে কথা দিয়েছিলে যে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাত একটা বিভ্রম!" হাতিব তাদের ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বলেন। যেতে যেতে তারা হাতিবকে মুনাফিক ডাকলেন এবং বললেন, "আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন!" (২৪)

মসজিদের বাসভবনে ফেরার পথে মুখে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় সাদ বিন মুয়াযের গোত্র আউসের দুর্গের পাশে মোহাম্মদকে থামানো হয়। সাদের ভাই আমর সহ এই গোত্রের বারোজন মারা পড়েছে এবং আরও ত্রিশজন লোক বিভিন্ন মাত্রায় গুরুতর আহত হয়েছিল। ঘোড়ায় পিঠে বসেই মোহাম্মদ ঘোষণা করেন যে, তার কাছে আহতদের জন্য সুখবর আছে : তাদের ক্ষত ঈশ্বরকে খুশি করবে, তাদের ক্ষত পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তা দেখতে "গভীর লাল, রক্তের রঙ, এবং তা থেকে কস্তুরির সুগন্ধ ছড়াবে"। মৃতদের পরিবারের জন্য তিনি প্রার্থনা করলেন: "হে আল্লাহ, তাদের অন্তর থেকে দুঃখ দূর করুন এবং তাদের দুর্দশা থেকে পুনরুদ্ধার করুন।" তিনি এছাড়াও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, নিহতরা তাদের প্রিয়জনদের জন্য বেহেস্তের সুপারিশ করবে। তিনি বলেন, "আনন্দিত হও এবং পরিবারকে জানিয়ে দাও যে, মৃতরা তাদের পরিবারের সাথে একসাথে জান্নাতে থাকবেন - তারা বারোজন পুরুষ - এবং তারা তাদের পরিবারের জন্য সুপারিশ করবে" (২৫)।

সারাদিনের ভয়াবহ ঘটনা এবং তার আঘাতের মাত্রা বিবেচনা করলে, মোহাম্মদ তার ঘোড়ার উপর সোজা হয়ে থেকে অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি প্রদর্শন করেন। তার সেনাবাহিনী হতাশাজনক পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিল; তার আর শৌর্যবীর্য দেখানোর প্রয়োজন ছিল, কিন্তু মসজিদে পৌঁছতে পৌঁছতে ততক্ষণে ঘোড়া থেকে তার পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তিনি তার মেয়ে ফাতিমার হাতে তলোয়ার তুলে দিয়ে বললেন, "এটা থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলো, বাছা। আমি ঈশ্বরের কসম খেয়ে বলছি, আজকে এটা আমার কাছে সত্য ছিল!" (২৬)। বেশ কয়েকজন লোক মোহাম্মদকে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করে এবং একটি ঘরে নিয়ে যায় যেখানে তার স্ত্রীরা তার বর্ম খুলে তার ক্ষত পরিষ্কার করে। বিলাল যখন সন্ধ্যায় নামাজের আহ্বান জানালেন, তখন সাদ বিন মুয়াযের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি নামাজে গেলেন। তিনি প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিলেন, তবে পুরো সময়টা বসে, শেষ করে বিছানায় গেলেন। ভোর হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি গভীর ঘুমিয়ে ছিলেন, এবং শোকার্ত নারীদের কান্না শুনে জেগে উঠেছিলেন। তিনি ঘরের বাইরে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলেন ব্যাপারটা কি। দেখা গেল, মোহাম্মদ হয়তো সন্তুষ্ট হবেন এই ভেবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বিভিন্ন গোত্রের কিছু নারীদের নিয়ে এসে হামজার মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করার জন্য কাঁদতে বলেন। তারা কাঁদছিল, চিৎকার করছিল এবং মাতম করে নিজেদের মাটিতে ফেলে দিচ্ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এই কাজ করেছিলেন, কারণ তিনি মোহাম্মদকে বলতে শুনেছেন, হামজার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করার জন্য কোন নারী ছিল না শুধু তার বোন সাফিয়া ছাড়া। রাওয়াহার কাছে মোহাম্মদের ওই কথাকে ইঙ্গিতপূর্ণ আদেশের মত মনে হয়েছিল, কিন্তু মোহাম্মদ এই কান্নাকাটির মাতম দেখে রেগে গেলেন। এক কথায়, এটা ছিল ভুয়া, ঠিক যেমন পেশাদার শোকসন্তপ্তদের শোক জানানোর জন্য অর্থ প্রদান করা। এই মহিলাদের একজনও সত্যিকারে হামজাকে পরোয়া করে না। তারচেয়েও বড় কথা, তিনি কান্নার আওয়াজকে ঘৃণা করতেন। এটা শারীরিকভাবে তাকে আঘাত করত, এটা তার মস্তিষ্কে গিয়ে বিঁধত; যেমন সঙ্গীত এবং কুকুর ঘেউ ঘেউ করা এবং হাত হাততালি, আর অন্যান্য তীক্ষ্ণ শব্দ যা তার মস্তিষ্কের গভীরে স্নায়বিক বিস্ফোরণের মত অনুভূত করাত। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ক্রন্দনরতদের কান্না থামানোর

আদেশ দিলেন। এর পাশাপাশি তিনি তাদের ধন্যবাদ জানালেন এবং বললেন আমি বুঝতে পারছি তোমাদের উদেশ্য ভালো, কিন্তু "আমি মাতম করে কান্নাকাটি পছন্দ করি না!" (২৭)। তারপর থেকেই, তিনি কাঁদতে নিষেধ করেন, তা যত আন্তরিক শোকের প্রকাশ হোক বা পেশাদার শোক হোক না কেন। তবে তিনি শব্দ না করে কাঁদার অনুমতি দিলেন।

মোহাম্মদ ছিলেন একজন বিচক্ষণ নেতা। তিনি জানতেন পরাজয়ের জন্য তার অনুসারীদের কাছ থেকে তিনি প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন: আল্লাহ কোথায় ছিলেন? আল্লাহ কেন তাদেরকে মুশরিকদের কাছে হেরে যেতে দিলেন? আল্লাহর অসন্তোষ অর্জনের মতো তারা দোষ কি করেছে? এমন ধরনের প্রশ্ন মনের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে। মোহাম্মদ আল্লাহকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ দিতেন কোরআনে, কিন্তু কি বলা উচিত সেই আয়াত তৈরি করতে সময় লাগবে। কিন্তু এখনই তাকে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি মক্কাবাসীদের বোঝাতে চান যে তার হাতেই সকল ক্ষমতা ছিল। ফজরের নামাজের পর মোহাম্মদ বিভিন্ন গোত্র থেকে সেনাদল গঠনের আদেশ দেন, কিন্তু যারা আগের দিন উহুদে যুদ্ধ করেছিল কেবল তাদেরই যেতে দেওয়া হবে। ঘোষকরা ছিল গোত্রের নেতা। তাদের একদল মোহাম্মদকে সুরক্ষা দিতে মসজিদের উঠোনে ঘুমিয়ে ছিল এবং তারা বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে যোদ্ধাদের উত্তেজিত করে তুলেছিল। যারা তাদের ক্ষতের কারণে তাদের ছেড়ে দিতে মাফ চাইলেন মোহাম্মদ তখন তার ক্ষতের দিকে ইঙ্গিত করলেন। যতটা সম্ভব পুরুষদের একত্রিত করার পর, তিনি আবু সুফিয়ানের সৈন্যবাহিনীর ঘোড়া ও উটগুলি যেই পথ ধরে গিয়েছে সেই পথের অনুসরণ করে হামরা আল-আসাদ বা লাল সিংহ (Hamra al-Asad) নামের একটি জায়গায় যান যা ইয়াছরিব থেকে প্রায় আট মাইল দক্ষিণে এবং সেখানে তিনি শিবির স্থাপন করেন।



[মোহাম্মদ উহুদ যুদ্ধের সময় আহত হন, যখন একজন মক্কাবাসী তার হেলমেটে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে এবং আরেকজন গুলতি দিয়ে পাথর ছুঁড়ে মারে তার মুখের পাশে আঘাত করে। যার ফলে তার হুডের কিছু অংশ তার গালে ঢুকে যায়। মক্কানরা প্রথমে ভেবেছিল যে তাকে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু তিনি উহুদ পর্বতে তার লোকের সাথে লুকিয়ে ছিলেন।]

মক্কানরা আগের রাতে শিবিরে অবস্থান করেছিল, কিন্তু আবু সুফিয়ানের নেতৃত্ব নিয়ে কমান্ডারদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। মোহাম্মদ তার হাতের মুঠোয় ছিল, পাহাড়ের ধারে আটকে ছিল কিন্তু সে তার পিছু নিতে ব্যর্থ হয়। তারচেয়েও বড় কথা, তিনি ইয়াছরিবকে আক্রমণ করতে নারাজ ছিলেন যা মোহাম্মদের অনুসারীদের উপর মারাত্মক আঘাত হতে পারত। তিনি এমন পরিস্থিতিতে আরবের পুরনো নিয়ম মানতে চেয়েছেন, কিন্তু এখন আর পুরনো নিয়ম প্রয়োগ করার সুযোগ নেই। আবু সুফিয়ানের একজন সমালোচক বললেন, "আপনি কিছুই অর্জন করতে পারেননি। আপনি তাদের নেতৃত্ব এবং তাদের অভিজাতদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন, কিন্তু আপনি তাদেরকে একেবারে শেষ না করেই ছেড়ে দিয়েছেন। এখনও তাদের নেতা আছে যারা আপনার বিরুদ্ধে লোক জড়ো করবে" (২৮)। তাদের অনেকেই ফিরে গিয়ে কাজ শেষ করতে চেয়েছিল (অর্থাৎ মদিনায় আক্রমণ করা)। আবু সুফিয়ান অবশেষে এ ব্যাপারে রাজি হলেন।

মোহাম্মদ একজন ভ্রমণকারী ব্যবসায়ী, দক্ষিণ উপকূলীয় আদিবাসীদের একজন নেতার কাছ থেকে তাদের পরিকল্পনা জানতে পারেন, যিনি উভয় পক্ষেই খেলতেন। আবু সুফিয়ান তাকে কিছু অর্থ দিয়ে মোহাম্মদের কাছে একটি বার্তা দিতে বলেন যে, মক্কানরা ফেরত আসছে এবং তারা চলে যাবে না যতক্ষণ না তিনি নিহত হন এবং তাঁর অনুসারীরা একেবারে ধ্বংস হয়। মোহাম্মদ সেই ব্যবসায়ীকে ফিরতি বার্তা দিয়ে ফেরত পাঠান যে, তিনি তাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী সৈন্য নিয়ে তাদের স্বাগত জানাবেন। মোহাম্মদের বাহিনী সংখ্যায় পাঁচশোর বেশি হবে না, কিন্তু তারা মনস্তাত্ত্বিকভাবে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ ছিল। এমন পরিস্থিতিতে হিসেব করা শক্তির চেয়ে প্রদর্শিত শক্তিই মুখ্য হয়ে উঠে। মোহাম্মদ বললেন - "যুদ্ধে প্রতারণা সিদ্ধ" এবং সে রাতে তার সৈন্যরা পার্শ্ববর্তী পাহাড়গুলোতে শত শত আগুনের কুন্ডলি জ্বালিয়ে দিল, যাতে মাইলের পর মাইল এই আলো দেখা যায়। এটা কৌশলে একটি বিশাল সৈন্যদলের ইঙ্গিত দিচ্ছিল, যা ছিল আসলে এক ধরণের ধোঁকাবাজি। মক্কাবাসীরা এই আলো দেখে ভয়ে ঘুরে মক্কায় ফিরে গেল।

মক্কাবাসীদের মোকাবেলা করার আগে মোহাম্মদ তাদের সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য দুজন গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তাদেরকে আটক করে হত্যা করা হয় এবং তাদের মৃতদেহ মোহাম্মদের জন্য ফেলে রেখে যায়। এর বদলা নিতে মোহাম্মদ উমাইয়া ইবনে খালাফের জুমাহ গোত্রের দলছুট সদস্য আবুল আজ্জা (Abul Azza) নামে একজন মক্কানকে বন্দি করেন। তিনি গভীর ঘুমে ছিলেন এবং মক্কানরা তাকে ছাড়াই হামরা-আল-আসাদ ত্যাগ করেছিল। তিনি একজন কবি ছিলেন, যিনি বদরের বন্দিদের মধ্যেও ছিলেন। সেই সময়ে (বদর যুদ্ধের পর) তিনি মোহাম্মদকে অনুরোধ করেছিলেন তাকে যেন হত্যা না করা হয়। তিনি দরিদ্র ছিলেন এবং তার অনেকগুলো কন্যা ছিল। মোহাম্মদ তাকে মুক্তিপণ না নিয়েই ছেড়ে দেন এই প্রতিশ্রুতিতে যে, তিনি আর কখনো তার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেবেন না, কিন্তু তিনি মক্কাবাসীদের সাথে উহুদের যুদ্ধে যোগ দিয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিলেন। তিনি আবারো তার প্রাণভিক্ষা চান, কিন্তু মোহাম্মদ তাকে ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন "তুমি মক্কায় গিয়ে দাড়ি নাড়তে নাড়তে বলবে, আমি মোহাম্মদকে দুইবার ধোঁকা দিয়েছি!" (২৯) ইসলামের আদিগ্রন্থে এই ব্যক্তির হত্যাকারীর সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। কিছু সূত্র দাবি করে যে, মোহাম্মদের চাচাতো ভাই জুবায়ের আবুল আজ্জাকে হত্যা করেছে; আর অন্য সূত্র বলছে যে, বদরে উকবাহ ইবনে মুয়াইতকে (Uqbah Muayt at Badr) শিরচ্ছেদ করা আসিম বিন ছাবিত তাকে হত্যা করেছে। আবুল আজ্জার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার পর মোহাম্মদ তার ছোট সৈন্যদল নিয়ে ইয়াছরিবে ফিরে আসেন।

একই পরিণতি ঘটে আরেকজন মক্কানের বেলায়, যিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং ইয়াছরিবে পালিয়ে তার প্রথম চাচাত ভাই উসমান ইবনে আফফানের (Uthman Affan) বাড়িতে সুরক্ষা চেয়েছিলেন। মোহাম্মদ তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উসমানের অনুরোধে তিনি লোকটিকে তিনদিন সময় দেন ইয়াছরিব ছেড়ে চলে যেতে। পাঁচদিন পরে যখন মোহাম্মদ হামরা-আল-আসাদ অভিযান থেকে ফিরে আসেন, তিনি জানতে পারেন যে লোকটি এইমাত্র ইয়াছরিব ছেড়ে গেছে। তাকে খুঁজে বের করার জন্য তিনি তার পালকপুত্র জায়েদ ও অন্য একজনকে পাঠান। তারা তাকে ইয়াছরিবের বাইরে থেকে

ধরে আনে, একটি গাছের সাথে বেঁধে রাখে এবং তার দেহকে তীর নিক্ষেপের নিশানা অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করে। তারপর তার মৃতদেহ থেকে তীর উদ্ধারের পর তারা তার মৃতদেহকে শকুনের জন্য রেখে দেয় (৩০)।

উহুদের যুদ্ধ কোরআনে প্রবেশ করে আয়াতের মাধ্যমে, যেখানে মোহাম্মদ আল্লাহর কণ্ঠে তার লোকদের শাস্তি দেন, যারা তার কথা অমান্য করছিল। তীরন্দাজরা তার কঠোর আদেশ থাকা সত্ত্বেও তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করেছিল। আয়াতগুলো উল্লেখ করেছে যে, অন্যরা আতংকিত হয়ে তাকে মহাবিপদে রেখেই দৌড়ে পালায় এবং তাকে রক্ষা করার আবেদন উপেক্ষা করে। তা সত্ত্বেও মোহাম্মদ তাদের প্রশংসা করলেন, কারণ তারা আল্লাহর পথেই ছিল। তারা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে রাসূলের প্রতি ভালবাসা দেখিয়েছে এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের প্রমাণ দিয়েছে। আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে তারা আল্লাহ আর তার প্রতি ভালবাসা দেখিয়েছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে এটা যথেষ্ট ছিল না, এবং এটা এক ধরনের বিচ্যুতি। আল্লাহ তাদের দৃঢ়তা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন গনিমতের মাল দিয়ে। তারা যাদের হত্যা করেছে তাদের গনিমতের মালে তাদের অধিকার ছিল, কিন্তু তারা ধৈর্যশীল ছিল না। তারা পৃথিবীতেই তাৎক্ষণিক তৃপ্তি কামনা করে, তারা গনিমতের মালের ভাগবাটোয়ারা পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি। সুতরাং তারাই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাদের কয়েকজনকে তাদের কাঙ্ক্ষিত শহীদের মর্যাদা দান করেছেন। কেন আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনা সেই শিক্ষাই অন্যদেরকেও দিচ্ছে, এবং যেহেতু এটি একটি শিক্ষা ছিল তাই এবারের মতো আল্লাহ তাদের ভুলের মার্জনা করে দিয়েছেন (৩১)।

উহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলীর আরও একটি পর্ব তখনো বাকি ছিল। মোহাম্মদ জানতে পারলেন যে, যুদ্ধের সময় হারিছ নামের একজন মুমিন (বিশ্বাসী) আরেকজন মুমিনকে হত্যা করেছে। মূলত এটা ছিল পুরনো একটি ঘটনার প্রতশোধমূলক নিষ্পত্তি। যুদ্ধের বিভ্রান্তিতে যাতে এই খুনটি লুকানো যায়, সেই কারণেই উহুদ যুদ্ধের সময়ে খুন করা। কিন্তু তাকে অন্যরা দেখা ফেলে, এবং হত্যাকান্ডের কথাটি মোহাম্মদকে জানানো হয়। এটা ছিল একটা প্রতিশোধমূলক খুন যা আউস আর খাজরাজের মধ্যেকার পুরনো দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত। যে মানুষটিকে হারিছ খুন করেন তিনি দশবছর আগে তার বাবাকে খুন করেছিল, যা একটি গোত্রগত যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। দশবছর ধরে সে তার বাবার হত্যাকারীর প্রতি ঘৃণার চাষ করে আসছিল এবং প্রতিশোধ নেবার জন্য মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষা করছিল।

হামরা-আল-আসাদ অভিযান থেকে ফিরে আসার পর মোহাম্মদ একটি গাধার উপর চড়ে কুবা গ্রামে যান, যেখানে খুনি বাস করতেন। মোহাম্মদ সপ্তাহে একবার কুবায় গিয়ে মসজিদে নামাজ আদায় করতেন। এই মসজিদটি ইয়াছরিবে প্রথম নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু এটা অন্যান্য সাধারণ দিনের মতো ছিল না। মসজিদের লোকজন তাকে দেখে কিছুটা বিস্মিতও হলেন। মোহাম্মদ যখন লোকজনকে সারিবদ্ধ নামাজের জন্য সাজাচ্ছিলেন, তখনই হারিছ নামাজের জন্য সেখানে উপস্থিত হন। যখন হারিছ সেই সারিতে যোগ দিতে গেলেন, মোহাম্মদ তাকে থামতে বলেন এবং তাকে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। এরপর বিশেষ কিছু আয়াত পাঠ করে হারিছকে ধরে ফেলার আদেশ দিলেন। হারিছ খুনের কথা স্বীকার করলেন, কিন্তু তার কাছে জীবন ভিক্ষা করলেন। হারিছ বললেন, আল্লাহর রাসূল যদি তাকে ক্ষমা করেন তবে তিনি সবকিছু করবেন। তিনি রক্তমূল্য পরিশোধ করবেন, দুই মাসের জন্য রোজা রাখবেন, ক্রীতদাসকে মুক্ত করবেন এবং দরিদ্রদের খাওয়াবেন। মোহাম্মদ তাতেও বিচলিত হলেন না। তিনি তাকে শিরশ্ছেদ করে মৃত্যুদণ্ডর আদেশ দিলেন। হারিছকে মসজিদের ফটকের বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে বাধ্য করা হয়। ধারালো তলোয়ারের দ্বারা তার জীবনের সমাপ্তি ঘটানো হলো (৩২)।

লোকটি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল যে, এটি ছিল একটি নতুন জগৎ। আউস এবং খাজরাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব পুরাতন জগতের ছিল। মোহাম্মদ পুরাতন নিবাসীদেরকে এক নতুন নিবাসীতে প্রতিস্থাপিত করেছিলেন, এবং এটি এখন বিশ্বাসীদের জগত। নতুন গোত্রের সদস্য হওয়ার ফলে সৃষ্ট সম্পর্কের কারণে সব পুরনো সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে। যারা নতুন নিবাসের (ইসলামিক নিবাস,

ইসলামী বিশ্বাস) সদস্য ছিল না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং হত্যা করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। সত্যিই, এই যুদ্ধ করার বাধ্যবাধকতা ছিল, কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করা এবং একে অপরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ছিল।

এই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে মোহাম্মদ দেখিয়েছেন যে, উহুদের পরাজয়ও তার কর্তৃত্ব হ্রাস করেনি। সে এখনো জীবন নিতে পারে - যেটি চূড়ান্ত ক্ষমতা। নতুন গোত্রের কেউ তাকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস রাখে না। লোকটির পরিবার তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চাইবে না, অথবা রক্তমূল্যও চাইবে না। তারাও বিশ্বাসী ছিল, এবং মোহাম্মদের নিয়ম অনুযায়ী তাদের খেলতে হবে - মোহাম্মদের নিয়মই তাদের নিয়ম হতে বাধ্য ।

অধ্যায় - ১৮

তোমার যা, তা আমারও

ভয় অনেক লোককে মুহাম্মদের ধর্মে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল। প্রতিমা বিধ্বংসী অভিযান, মধ্যরাতের হত্যাকাণ্ড, বিদেশী আদিবাসী নেতাদের হত্যা, ইহুদিদের একটি পুরো গোত্রকে বহিষ্কার করা — এই সমস্ত পরিণতির ফলে ধর্মান্তরিত হওয়া বাড়ছিল। অন্যদের প্রতি যা করেছিলেন তাদেরও তিনি সেটাই করবেন, এই আতঙ্কে তারা তার হাত ধরতে এবং বিশ্বাসের ঘোষণা তথা শাহাদা দেয়ার জন্য মসজিদে এসে দাঁড়াল এবং পাঠ করল : আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদই তাঁর রাসূল! ধর্মটি ছড়িয়ে পড়ছিল, কিন্তু মুহাম্মদ কর্তৃক সন্ত্রাসবাদকে ব্যবহারের একটি বিপর্যয় ছিল এই যে, এটি পুরোপুরি নতুন একদল বিরোধী শ্রেণী আর লোকেদের তৈরি করেছিল যারা বিশ্বাসী হবার ভান করেছে, কিন্তু তারা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে চলছিল। এই লোকেরা কোরআনের কথা বলত, প্রকাশ্যে ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান মেনে চলত, কিন্তু তারা এই ছলনার আড়ালে মুহাম্মদকে অপদস্থ করার চেষ্টা করছিল।

ইয়াছরিবের শুরুর বছরগুলিতে ওদের কপটতা বুঝতে মুহাম্মদের অসুবিধা হয়েছিল, বা তার অনুসারীদের নিয়োগ যে ভয়ভীতির মাধ্যমে হয়েছিল তাও বুঝতে বিলম্ব হয়েছিল। তিনি তার আয়াত এবং ঐশ্বরিক আদেশের প্রতি নিজের বিশ্বাসের দ্বারা এতটাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিলেন যে, অন্যরা যখন তার মতো ভাবত না তখন তিনি তা পছন্দ করতেন না। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, অবিশ্বাসীদের ধর্মান্তরিত করার জন্য আয়াতের সৌন্দর্যই যথেষ্ট। আয়াতগুলির আত্মা তাদের মধ্যে প্রবেশ করবে, তাদের আত্মারা আলোকিত হয়ে উঠবে এবং তারা ঘটনাস্থলেই বিশ্বাসী হয়ে উঠবে। কিন্তু তারপরে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, তার অনুসারীরা ভুয়া ছিল। তারা বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়ার আগে তার বিরুদ্ধে যেমন ছিল, এখনো তেমন; কিন্তু এখন তারা তার ধর্মকেই ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। এদের মাঝে অর্ধ-ডজনের মতো ইহুদি ছিল, যারা মসজিদে তার উপর গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। এ ধরনের লোকদের চিহ্নিত করা এবং তাদের সাথে মোকাবেলা করা মুহাম্মদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তিনি তাদের "ভন্ড" হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তাদের তিরস্কার করে অজস্র আয়াত রচনা করেছিলেন এবং দোযখে তাদের অনন্তকাল শাস্তি ভোগের হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করেছিলেন।

সমস্যাটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলে, মুহাম্মদ সর্বত্র ভণ্ডামি চিহ্নিত করেছিলেন এবং সময়ের সাথে সাথে তিনি 'ভন্ড' এবং 'ভন্ডামি' শব্দটি কেবল ভুয়া বিশ্বাসী এবং বিপর্যয়কারীদের জন্য নয়, যারা তাকে অর্ধেক বিশ্বাস করত বা সন্দেহ করত তাদের বেলায়ও ব্যবহার করতেন। তার মতে, মোনাফেকরা (ভণ্ড বা কপট) এমন ব্যক্তি ছিল যারা নামাজ এড়িয়ে যায়, অন্য মুমিনদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলে, কাফেরদের (অবিশ্বাসী) পক্ষে তর্ক-বিতর্ক করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং পেছনে পেছনে মোহাম্মদের সমালোচনা করে। মোনাফেক তাঁরাও যারা স্বেচ্ছায় জিহাদ করতে অস্বীকার করেছিল বা যারা কেবলমাত্র মাল লুট করার জন্য লড়াই করেছিল, আল্লাহ বা তার রাসূলের প্রতি ভালোবাসা থেকে নয়। এই তকমাটি সমানভাবে সেই লোকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা মুহাম্মদের কোরআনের আয়াতের তেলাওয়াত (আবৃত্তি) করে শুনেছিল কিন্তু ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকার করেছিল, এবং যে সমস্ত মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েও (ইসলাম গ্রহণ) এবং পরে অবিশ্বাসে ফিরে গেছে, তবে তা (ইসলাম ত্যাগের কথা) সকলের কাছ থেকে তারা লুকিয়ে রেখেছিল। একপর্যায়ে তিনি যেকোন ভিন্ন চিন্তাভাবনা, কথা বা কাজ যা তার শিক্ষাকে মেনে চলত না সেগুলোকে ভণ্ডামি হিসেবেই চিহ্নিত করেছিলেন।

অপরাধীদের মোকাবেলা করার জন্য মুহাম্মদ প্রায়শই দলগত চাপ ও অপমানের মুখোমুখি হন। বলা হয় যে, সমবেত প্রার্থনা চলাকালীন সময়ে তিনি এরকম বেশ কয়েকজনকে খুঁজে বের করেছিলেন। একবার তিনি জানতে পারলেন যে, তারা গোপনে এমন কিছু বলেছেন যার দ্বারা তাদেরকে ভন্ড (মোনাফেক) হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কি বলার কারণে তাদের

ওরকম বলা হয়েছিল, আদিগ্রন্থে তা উল্লেখ করা হয়নি। কেবল বলা হয়েছে যা তিনি তাদের সাথে করেছিলেন সেটাই। ঘটনাটি এমন - একদিন মোহাম্মদ মিম্বার (মসজিদের যে স্থানে দাঁড়িয়ে ইমাম ভাষণ প্রদান করেন) থেকে ঘোষণা করলেন যে, এখানে মোনাফেকেরা আছে। হ্যাঁ, ভণ্ড, মোনাফেক! তিনি যা শুনেছিলেন তা প্রকাশ করলেন, তারপরে নাম উল্লেখ না করেই তিনি অপরাধীদের স্বেচ্ছায় তাদের ভণ্ডামি স্বীকার করে এবং আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য দোষী হয়ে দাঁড়াতে বললেন। যখন কেউ দাঁড়াল না, তিনি তাদের নাম প্রকাশের হুমকি দিলেন; তবে তিনি দৃঢ়ভাবে জোর দিলেন যে, তারা তাদের নিজের পাপ স্বীকার করার জন্য ওঠে দাঁড়াক এবং তাদের হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তার কাছে সুপারিশ করার অনুরোধও করুক। তবুও কেউ যখন দাঁড়াল না, তিনি তাদের নাম ধরে ডাক দিলেন এবং প্রত্যেককে দেখার জন্য তাদের ওঠে দাঁড়াতে আদেশ দিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে সাদ উল্লেখ করেছেন, "তারা উঠেছিল, লাঞ্ছিত হয়েছিল এবং তাদের মুখ ঢেকে রেখেছিল" (১)।

মোনাফেকদের মুখোশ উন্মোচনের ক্ষেত্রে, উহুদের (Uhud) অবস্থান ছিল বেশ স্পর্শকাতর। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই শায়খাইনের নিকটবর্তী স্থান থেকে তিনশত অনুসারীসহ চলে আসার সময়ই মুহাম্মদ জানতেন যে, তার সামনে খারাপ কিছু আছে। ধূসর শ্মশ্রুমন্ডিত খাজরাজের মহান নেতা (আবদুল্লাহ ইবনে উবাই) তাকে শক্তিধর মক্কার সেনাদলের সামনে অসহায় ফেলে রেখে গিয়েছিলেন এবং এটাই হয়তো মুহাম্মদের জন্য মারাত্মক হুমকি বা জীবননাশের কারণ হতে পারত। সম্ভবত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাঁর বাহিনীকে ফিরিয়ে নেয়ার কারণেই মুহাম্মদের প্রাণ হুমকির মধ্যে পড়েছিল। যদি মুহাম্মদ সেদিন নিহত হতেন, তবে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুহাম্মদ যেখানে নেতৃত্বে ছেড়ে গেছেন সেখান থেকেই তাঁর নিজের নেতৃত্ব শুরু করে ইয়াছরিবকে একত্রিত করার চেষ্টা করতে পারতেন।

আবদুল্লাহর বিশ্বাসঘাতকতা মুহাম্মদকে হতবাক করেছে এবং তাকে গভীরভাবে আহত করেছে। খাজরাজের এই সর্দার তাকে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আর তা সম্ভবত আন্তরিকতার সাথেই দিয়েছিল। তিনি বানু কায়নূকা গোত্রের (Qaynuqa Jews) ইহুদিদের বহিষ্কারের অল্প কিছুদিনের মধ্যে এবং সে সময়ে কবিদের হত্যাকাণ্ড (মুহাম্মদ কর্তৃক) দেখেই তিনি ধর্মান্তরিত হন। আবদুল্লাহ আশঙ্কা করেছিলেন যে, তার দিকে তলোয়ার তাক করা কেবলমাত্র সময়ের ব্যাপার। তিনি মুহাম্মদকে হুমকি দেয়ার চেয়ে বরং তিনি নিজের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি মানুষের মনোভাব বুঝতে পারতেন, আর তাই মুহাম্মদের মাঝে তিনি এমন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেয়েছিলেন যিনি স্তুতি পেতে খুবই উদগ্রীব। মুহাম্মদের সুনজরে থাকার জন্য যা করতে হতো তা হলো, কেবল তার চাটুকারিতা করা এবং সেটা করার জন্য যা করার দরকার তা হচ্ছে মুহাম্মদকে বিশ্বাস করানো যে, মুহাম্মদ যে আল্লাহর সাথে কথা বলেন সেটি ব্যক্তি বিশ্বাস করছে। মুহাম্মদের হাত ধরে লোক দেখানো নামমাত্র বিশ্বাস স্থাপনেরো প্রথম দিন থেকেই আব্দুল্লাহ বেশ সপ্রতিভ হয়ে এই চাটুকারিতার খেলাটা শুরু করলেন। এরপরে, তিনি জুমার খুতবার জন্য মসজিদে পৌঁছতেন এবং সামনে তার জন্য সংরক্ষিত জায়গায় দাঁড়াতেন। মুহাম্মদ যখন আয়েশার ঘর থেকে মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং মিম্বারের আসনে বসতেন, তখন আবদুল্লাহ তার পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতেন, "হে লোকেরা, তোমাদের সামনে ইনিই তো আল্লাহ্‌র রাসূল। ঈশ্বর তাঁর মধ্য দিয়ে তোমাদেরকে সম্মান ও গৌরব দিয়েছেন। ওনাকে সাহায্য সহায়তা দাও এবং ওনার কথা শোনো ও মান্য কর"(২)।

কিন্তু উহুদে মুহাম্মদের সঙ্গে না থেকে আবদুল্লাহ তার দল নিয়ে ইয়াছরিবে ফিরে যাওয়ার ফলে সবকিছু খোলাসা হয়ে গেল। মুহাম্মদের কাছে তিনি এখন সবচেয়ে নিচু স্তরের মোনাফেক বনে গেলেন। যুদ্ধের পরেও তিনি ভন্ডামি বজায় রেখেছিলেন। যখন ইয়াছরিব জুড়ে পরাজয়ের কথাটি ছড়িয়ে পড়ে — এবং আহত ও হতাশাগ্রস্ত যোদ্ধারা তাদের বংশের দিকে ফিরে যাওয়ার আগেই আবদুল্লাহ মুহাম্মদের নেতৃত্বের প্রকাশ্য সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, "মুহাম্মদ আমার কথায় কান দেননি; তিনি সুপরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং দেখুন সেজন্য কী পরিণতি হলো!" আব্দুল্লাহর পরামর্শ অনুসারে মুসলিমরা যদি ইয়াছরিবে অবস্থান করত তবে আজকের মৃতরা এখনও বেঁচে থাকত এবং ইয়াছরিবে এমন বিয়োগান্তক ঘটনার প্রেক্ষিতে

শোকাবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। লোকেরা খারাপ পরামর্শ, এবং প্রকারান্তরে একজন খারাপ নেতাকেই অনুসরণ করেছে – বোঝাতে চাইলেন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।

তিনি যদি মুহাম্মদকে হত্যা করার ব্যাপারে সত্যই বাধা দিতেন তবে তিনি হেরে যেতেন। এটি বুঝতে পেরে আবদুল্লাহ বিষয়গুলো ঠিক করার (দু'কূল সামলানোর) চেষ্টা করেছিলেন। মুহাম্মদ যখন মক্কাবাসীদের তাড়া করার জন্য আরেকটি বাহিনী গঠন করলেন তখন আবদুল্লাহ মসজিদে উপস্থিত হয়ে তার সাথে ফিরিয়ে নিয়ে আসা তার লোকদেরও নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদ তাকে বহিষ্কার করেছিলেন। তিনি বললেনঃ "যারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল কেবল তারাই যেতে পারবে। যারা উহুদে গিয়েছিল তারা আল্লাহ্‌র দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং সত্যপথ অনুসরণ করেছিল। যারা যায়নি তারা মোনাফেক, এবং তারা আল্লাহর আরোপিত শাস্তি তারা ভোগ করবে।"

হামরাউল আসাদ (রেড লায়ন) থেকে ফিরে আসার পর খাজরাজ গোত্রপতি আর অন্য মোনাফেকদের সাথে মুহাম্মদ কি ব্যবহার করবেন তা ঠিক করছিলেন। সর্বদা শিরোচ্ছেদ করতে আগ্রহী উমর তাদের সবাইকে মেরে ফেলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, তারা কেবল তলোয়ার থেকে বাঁচতেই "ধর্মান্তরের আশ্রয় নিয়েছে। ওরা প্রথম থেকেই মোনাফেক ছিল" (৩)। মুহাম্মদ অবশ্য বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ জাতীয় লোকদের হত্যা করা এক বিপর্যয়কর নীতি হবে, কারণ এটি বিশ্বস্তদের নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্থ করবে। কেউই আর নিরাপদ বোধ করবে না, এমনকি যারা বিশ্বাসে অবিচল তারাও নয়। শাহাদার (ইসলাম গ্রহণ করার কালিমা বা বাক্য) সুরক্ষা অলঙ্ঘনীয় হওয়া দরকার। মুহাম্মদ রায় দিয়েছিলেন যে, একজন মুমিনকে হত্যা করা কেবলমাত্র তিনটি ক্ষেত্রেই ন্যায়সঙ্গত হতে পারে : ব্যভিচার, ধর্মত্যাগ এবং মুমিনের দ্বারা আরেক মুমিনের হত্যাকান্ড।

উমরের হাতে আবদুল্লাহকে ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে মুহাম্মদ খাজরাজের আভিজাত্যকে অবমাননাকর পতনের জন্য প্রস্তুত করেন। এটি ঘটেছিল যখন আবদুল্লাহ পরের শুক্রবারের খুতবাতে মুহাম্মদের প্রতি তার প্রশংসাসূচক বাক্য যা তিনি বরাবরই করতেন তা উচ্চারণ করার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। অনেক লোক হঠাৎ করে চেঁচিয়ে ওঠে বলল, "বসে পড় হে আল্লাহর শত্রু!" আবু আইয়ুব, যিনি মসজিদটি নির্মাণের সময় মুহাম্মদকে জায়গা দান করেছিলেন, তিনি আবদুল্লাহকে তার দাড়ি ধরে ভরা উঠোন পেরিয়ে মসজিদের প্রবেশ অব্দি টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর তাকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে আবু আইয়ুব চিৎকার করে বললেন, "আপনি এই জায়গার জন্য মোটেও ভালো নন!" আবদুল্লাহর গোত্রের বেশ কয়েকজন লোক সেই মুহূর্তে মসজিদে ঢুকতে যাচ্ছিল। তারা তাকে ফিরে আসতে এবং মুহাম্মদকে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুরোধ করে। আবদুল্লাহ জবাব দিয়েছিলেন, "আল্লাহর কসম, আমি চাই না যে সে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুক" (৪)।

পরবর্তীতে মুহাম্মদ কোরআনে আয়াত ঢুকিয়ে তাকে আরও তিরষ্কার করেছিলেন: "যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ তোমরা এসো, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাও যে, তারা দম্ভভরে ফিরে যায়। তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেননা। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেননা।"(৫)।

এমন রুক্ষ আচরণ আবদুল্লাহকে হতাশ করেছে। উহুদে আহত হওয়া আব্দুল্লাহর মুসলিম পুত্র সহ কয়েকশো লোক এই অপমান প্রত্যক্ষ করেছে। আব্দুল্লাহর পুত্র পেছন দিককার সারিতে (নামাজের সারি বা কাতার) মধ্যে ছিল এবং তার পিতাকে টেনে বাইরে নেয়ার সময় সে তার চোখ ঘুরিয়ে রেখেছিল। অপমানের কথাটি পুরো উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আবদুল্লাহ ছিলেন আধ্যাত্মিক সাফল্যের মানুষ, আদিবাসীর মধ্যে প্রথমদিকের লড়াইয়ের একজন সাহসী যোদ্ধা এবং শান্তি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠাকারী এক ব্যক্তি। তিনি একটি দুর্গ, উৎপাদনশীল শস্যক্ষেত এবং খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন এবং উদারতা,

আতিথেয়তা এবং বুদ্ধিমান পরামর্শের জন্য খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু সেদিন থেকে তাঁকে দাড়ি ধরে বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রতিচ্ছবিই জনসাধারণের মনে থেকে গেল।

আবদুল্লাহর অবমাননা এবং মোনাফেকি সম্পর্কে কোরআনের আয়াতগুলির একটি সংকলন প্রকাশের ফলস্বরূপ, ডাইনী শিকারের মতো করে অন্যান্য ছদ্মবেশি ব্যক্তিদেরও সনাক্ত করার একটি প্রবণতা শুরু হয়েছিল। কপট বলে চিহ্নিত হওয়ার ভয়ে এমন একটি ভীতিকর পরিস্থিতির তৈরি হয়েছিল যে, আন্তরিক ও কপট বিশ্বাসী উভয়ই ভন্ড তকমাটি এড়াতে ধর্মের জন্য চূড়ান্তভাবে কাজ করছিল। জনসমক্ষে এবং ব্যক্তিগতভাবে তারা একে অপরকে ঈশ্বর ও তাঁর রাসূলের প্রতি, বিশেষত তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের ভালোবাসার কথা ঘোষণা করত। লোকেরা অতিরিক্ত নামাজ আদায় করত। কেউ কেউ প্রার্থনা করার সময় মাটিতে এমনভাবে মাথা ঠেকিয়ে দিতেন যে, তারা তাদের কপালে স্থায়ী দাগ বা চিহ্ন দিয়ে ফেলে দিয়েছিল — ন্যায়নিষ্ঠ ধর্মসাধকের নিশানা হিসেবে। অসুস্থ লোকেরা, যারা সাধারণত অজুহাত দিত, তারাও বাধ্য হয়ে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যেত। অন্যরাও নিজেদের বিশ্বাসী প্রমাণ করতে এমনকি মৃত্যুবরণ করতে যুদ্ধে পর্যন্ত যোগ দিত। ভণ্ড তকমাটি যেন ছিল একটি তলোয়ার, আর এটি তাদের সকলের উপরেই ঝুলছিল।

ইয়াছরিবের বাইরে, মুহাম্মদ তার বিরুদ্ধে সামরিক হামলা ব্যর্থ করার লক্ষ্যে একাধিক অভিযান পরিচালনা করেন। যখনই তিনি খবর পেতেন যে, কোনও গোত্র তাঁর বিরুদ্ধে হামলা করার পরিকল্পনা করছে, এমনকি তার পশুপালকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে তিনি তৎক্ষণাৎ একটি মারাত্মক আঘাতের মোকাবিলায় তার বাহিনীকে প্রেরণ করতেন। উহুদের পরপরই এমন এক অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। প্রথমটি খায়বারের নিকটে উত্তর দিকের একদল বেদুইনদের বিরুদ্ধে ছিল, যারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন উহুদে আহত হওয়া মুহাম্মদের প্রথম চাচাত ভাই আবু সালামা (Abu Salama)। বেদুইনরা বিনা লড়াইয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল, কিন্তু আক্রমণকারীরা প্রচুর পরিমাণ পশু নিয়ে ইয়াছরিবে ফিরে আসে। আবু সালামা ফিরে আসার অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ক্ষত থেকে সংক্রমণ হয়ে মারা যান। তার উপরের বাহুতে একটি তীর আঘাত করেছিল এবং অভিযান চালানোর সময় এটির প্রদাহ বেড়ে গিয়েছিল। চারমাস পরে, মুহাম্মদ তার বিধবা স্ত্রী উম্মে সালামাকে (Umm Salama) (৬) বিয়ে করেছিলেন, তার জন্য মসজিদের আরেকটি কক্ষ বরাদ্দ করেছিলেন। এভাবেই তিনি সাওদা, আয়েশা এবং হাফসার পাশের কক্ষের প্রতিবেশি হয়ে ওঠেন।

আবু সালামা তার আক্রমণ থেকে ফিরে আসার প্রায় একই সময়ে মুহাম্মদ গোয়েন্দা তথ্য পেয়েছিলেন যে, বেদুইনদের আরও একটি দল আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে। এরা ছিল ইয়াছরিবের আরো দক্ষিণে মরুভূমির মানুষ এবং মক্কাবাসীদের সাথে তাদের সন্ধি ছিল। উহুদ যুদ্ধে তারা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং তার আশঙ্কা ছিল যে, তারা বেদুইন আদিবাসীদের নিয়ে একটি জোট গঠন করবে যারা তাঁর বিরুদ্ধে আরেকটি আক্রমণ করবে। বিশাল বাহিনীকে ঝুঁকিতে ফেলার তুলনায় তারা যেহেতু অনেক দূরে ছিল, মুহাম্মদ তাদের নেতা খালিদ বিন সুফিয়ানকে হত্যার জন্য একটি অভিজ্ঞ ঘাতককে নিয়োগ করেছিলেন। খুনি সফল অভিযানের প্রমাণ হিসেবে খালিদের মাথা নিয়ে ইয়াছরিবে নিয়ে আসে। নেতার হত্যার ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে বেদুইনরা পিছু হটেছিল (৭)।

খালিদের হত্যার পরেও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য মুহাম্মদ তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিন্তু খুন হওয়া নেতার সাথে পারিবারিক সম্পর্কযুক্ত একটি গোত্র মুহম্মদের ‘ধর্মপ্রচারকদের’ হত্যা করে এর প্রতিশোধ নিয়েছিল। তারা মুহাম্মদের ধর্মের গুণগান করার জন্য এবং ধর্ম শেখানোর জন্য কিছু লোককে তাদের কাছে পাঠানোর জন্য মুহাম্মদকে প্রলুব্ধ করেছিল। কোনরূপ সন্দেহ না করে মুহাম্মদ তাদের ফাঁদে পা দিলেন এবং একদল ধর্মপ্রচারককে পাঠিয়েছিলেন। কারো মতে, এদের সংখ্যা ছিল ছয়জন আর কারো মতে দশজন যারা প্রেরিত হয়েছিল সংশ্লিষ্ট গোত্রের লোকদের নামাজের নিয়মসমূহ শিক্ষা দেয়ার জন্য এবং তাদের কোরআন পড়ানোর জন্য। কিন্তু তারা ষড়যন্ত্রকারীদের অঞ্চলে যাওয়ার সাথে

সাথেই তাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছিল এবং দলের দু'জন বাদে সবাই মারা গিয়েছিল। যে দুজন বেঁচে গিয়েছিল তাদের একজন ছিলেন খুবায়েব (Khubayb) এবং অন্যজন দছিন্না নামে একব্যক্তি। তাদেরকে পঞ্চাশটি উটের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। **মক্কাবাসীরা পরে এই দু'জনকে হত্যা করেছিল, একজনকে শিরোশ্ছেদ করে এবং অপরজনকে ক্রুশবিদ্ধ করে।** উমাইয়া ইবনে খালাফের পুত্র সাফওয়ান (Safwan) ব্যক্তিগতভাবে দছিন্নার শিরোশ্ছেদ করেছিলেন, কারণ বলা হয়েছিল যে, আত্মসমর্পণের পরেও বদর নামক স্থানে তার বাবা ও ভাইকে হত্যা করা লোকদের মধ্যে দছিন্না একজন ছিলেন। খুবায়েবকে হত্যা করা হয়েছিল, কারণ তিনি মুহম্মদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লোক ছিলেন। তাকে হয় মাটিতে লাগানো ক্রুশের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিল বা গাছের সাথে বাঁধা একটা দন্ডে আটকে পেটানো হয়েছিল। মক্কাবাসীরা তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাকে বর্শা মারতেই থাকে। তাঁর শেষ কথাটি ছিল: "হে আল্লাহ, তাদের সংখ্যা গুণে রাখুন এবং তাদেরকে একে একে হত্যা করুন, ওদের একজনকেও ছাড়বেন না!" (৮)।

খুবায়েবকে মৃত্যদণ্ড দেয়ার আগে আবু সুফিয়ান এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মুহাম্মদকে হত্যা করার জন্য কাউকে নিয়োগ দিতে চাইলেন। একজন বেদুইন এই কাজটা নিল, তবে ইয়াছরিবে সে ধরা পড়ে এবং স্বীকার করে যে, আবু সুফিয়ান তাকে প্রেরণ করেছিলেন। প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এবার মুহাম্মদ আবু সুফিয়ানকে হত্যা করার জন্য একজন খুনিকে প্রেরণ করেছিলেন, তবে মুহাম্মদের ঘাতকও আবু সুফিয়ানের বেদুইনের মতোই অদক্ষ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল এবং প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল। যদিও সে আবু সুফিয়ানকে মারতে পারেনি, তবে মুহাম্মদের নিয়োগকৃত এই খুনি ইয়াছরিবে ফিরে আসার পথেও অনেক 'কাফের' হত্যা করেছিল।

মুহাম্মদ আরও বড় ধাক্কা খেয়েছিলেন, যখন তিনি ইয়াছরিবের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে একটি আপাতদৃষ্টিতে সহনশীল গোত্রে ধর্মাচরণ শিক্ষাদানের জন্য লোক পাঠানোর পরে তার সত্তরজন প্রচারককে জবাই করা হয়েছিল। খুবায়েব ও তার সঙ্গীদের সাথে যা হয়েছিল তার কারণে মুহাম্মদ আর কোনও প্রচারক প্রেরণ করতে রাজি ছিলেন না, কিন্তু গোত্রের বয়স্ক নেতা যিনি তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। তাঁরা (মুসলিমরা) অঞ্চলটিতে পৌঁছে তাদের তাঁবু খাটানোর পর স্থানীয় গোত্রদের জোট দ্বারা ঘেরাও হয়ে যায় এবং তাদের হত্যা করা হয়(৯)। যেহেতু ধর্মপ্রচারকেরা অভিজ্ঞ এবং তাঁরা আপাদমস্তক সজ্জিত যোদ্ধা হয়েই এসেছিল, তাই শত্রুরা তাদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস করেনি। তারা দূর থেকে তীরের আঘাতে বেশিরভাগ লোককে হত্যা করেছিল, আর পরে কাছে এসে তীরের আঘাতে যারা আহত হয়েছে কিন্তু মারা যায়নি তাদেরও শেষ করে এবং তীরের আঘাত থেকে বেঁচে যাওয়া কয়েকজনকে হত্যা করে। মুহম্মদের একজন সাহাবিই (অনুসারী) কেবল এই আক্রমণ থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। এটি অবস্থানগত কারণে মাওনের কূপের (বিরে মাউ'না) ঘটনা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল।

এই হত্যাযজ্ঞগুলি মুহাম্মদের প্রতি বিদ্বেষের গভীরতা এবং তাকে প্রতিরোধ করার ক্রমবর্ধমান আরব সংকল্পের পরিচায়ক ছিল। এই বার্তাটি তাকেও এড়িয়ে যায়নি। তিনি একেবারে ভেতর থেকেই ধাক্কা খেয়েছিলেন এবং বাহ্যিক আগ্রাসন থেকে সাময়িকভাবে সরে এসে ইয়াছরিবের উপর তার নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন (১০)। একই মাসে তিনি ইহুদি গোত্রগুলির থেকে আরো একটি গোত্রকে আক্রমণ ও বহিষ্কার করেছিলেন, তারা ছিল বানু নাযীর গোত্র। এর উদ্দেশ্য ছিল ঘৃণা এবং লোভ। মুহাম্মদ তাদেরকে ঘৃণা করতেন, কারণ তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তবে তিনি তাদের যা ছিল, তাই চেয়েছিলেন। বানু নাযীরদের অসংখ্য খেজুর গাছ ও খামার ছিল, তাঁরা হিজাজের সবচেয়ে সমৃদ্ধ গোত্র ছিল। মুহাম্মদের সাহাবিদের (অনুসারী বা সঙ্গী) মধ্যে মুহাম্মদের প্রতি অব্যাহত আনুগত্য নিশ্চিত করতে এবং তাঁর ক্রিয়াকলাপগুলির অর্থ ব্যয় বহন করতে লুণ্ঠনের প্রয়োজন ছিল। এই আক্রমণটিকে বৈধতা দেয়ার জন্য তিনি সেই একই অজুহাত ব্যবহার করেছিলেন, যা তিনি একবছর আগে কায়নূকার ইহুদিদের উপর হামলার সময়ে করেছিলেন। তিনি বানু নাযীরদের এমন পরিস্থিতি তৈরির জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন যার মাধ্যমে 'বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা' প্রকট হয়েছিল। যেহেতু বানু নাযীর

গোত্রও মুহাম্মদের পক্ষ হতে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল তাই আল্লাহ তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন যে, তিনি তাদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন তা প্রত্যাখ্যান করতে এবং তাদের উপরে আক্রমণ করতে (১১)।

তার মাঝে যা বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা কাজ করেছিল সেই ঘটনাটি ঘটেছে বানু নাযীর দুর্গের গেটে। উমর, আবু বকর এবং আলী সহ নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে নিয়ে মুহাম্মদ দু'টি খুনের ঘটনায় ইহুদিদের কাছ থেকে খুনের রক্তপণ (আরবিতেঃ দিয়াত) দাবি করতে দুর্গে গিয়েছিলেন, যেটি মওনার কূপের হত্যাযজ্ঞ থেকে একমাত্র বেঁচে যাওয়া ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল (১২)। এই হত্যাকাণ্ডের সাথে ইহুদিদের ন্যূনতম সম্পর্কও ছিল না, কিন্তু ইসলামের আকরগ্রন্থে লেখা আছে যে, গোত্রগত জোটবদ্ধতার কারণে নিহত পুরুষদের রক্তপণের কিছু অর্থ দেয়ার বাধ্যবাধকতা তাদের ছিল। কিন্তু ইহুদিরা মুহাম্মদকে তাদের দুর্গের গেটের ভেতর প্রবেশ করতে দেয়নি, তবে তারা মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবিদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কথা বলার জন্য তাদের গেটের কাছে অপেক্ষমাণ রাখে। যখন সাহাবিরা অপেক্ষা করছিল, মুহাম্মদ হঠাৎ চলে গেলেন, এবং আর কখনওই ফিরে আসেননি। উমর ও অন্যান্যরা প্রথমে ভেবেছিল যে তিনি প্রস্রাব করার জন্য গিয়েছেন। তারা অবশেষে তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে মসজিদে অনুসন্ধান করতে গেলেন। তারা তাকে সেখানে রাগান্বিত ও উত্তেজিত অবস্থায় খুঁজে পেয়েছিল। তিনি রেগে গিয়েছিলেন, কারণ ফেরেস্তা জিব্রাইল তাকে ফটকের কাছে অপেক্ষা করার সময় জানিয়েছিলেন যে, ইহুদিরা দূর্গের উঁচু জায়গা থেকে তার উপর থেকে একটি বড় পাথর ফেলে দেয়ার পরিকল্পনা করছিল। সে কারণেই তিনি চলে গেয়েছিলেন। তিনি তাদের বিশ্বাসঘাতকতায় ভয় পেয়েছিলেন। তিনি উচ্ছ্বসিত ছিলেন, কারণ এখন তাদেরকে আক্রমণ করার কারণ পাওয়া গেল। তাদের চূড়ান্ত ষড়যন্ত্রের দ্বারা তারা নিজেরাই তার সাথে যে ঐক্যমত্য ও চুক্তি করেছিল, তা এখন বাতিল হয়ে গেছে। তিনি আর তাদের হাতে আবদ্ধ হননি (১৩)। তিনি বানু নাযীরদের অবরোধের নির্দেশ দেন। নির্দেশ পাবার সাথে সাথেই গনিমতের মালের গন্ধ পেতে লাগল মুহাম্মদের সেনাদল, সুতরাং তাদের উদ্দীপ্ত হতে আর বিলম্ব হয়নি। শত শত বিশ্বস্ত অনুসারী তাদের বর্ম এবং তলোয়ার নিয়ে ইহুদিদেরকে ছিন্নভিন্ন করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হলো। দুর্গে অবরোধ করার আগে, মুহাম্মদ অবশ্য ইহুদিদেরকে তাদের একহাজার বছরের বাড়িঘর এবং জমি স্বেচ্ছায় ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। একবছর আগে বানু নাযীর গোত্রের কবি কাব বিন আশরাফকে হত্যার কারিগর ইবনে মাসলামাকে তিনি এই বার্তা দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন, "আমার দেশ ছেড়ে যাও। আমি তোমাদের জন্য দশদিনের সময়সীমা মঞ্জুর করেছি। এরপরে যাকেই দেখা যাবে, তার মাথা কেটে ফেলা হবে"(১৪)। মাসলামার মতো কাউকে প্রেরণ করে মুহাম্মদের হুমকি দেয়ার মানে তাদের মনে এ ব্যাপারে কোনও প্রশ্নই আসতে পারে না যে, মুহাম্মদ যা বলেছে তা সে করবেই। ইহুদিরা জানত যে সে (মাসলামা) কাব বিন আশরাফের হত্যায় জড়িত ছিলেন। আশরাফের মাথা কেটে পাঠানোর মতই, তাকে পাঠানোর মানেই হলো একটি সতর্কবার্তা দেয়া। তবুও তারা চলে যেতে অস্বীকার করেছিল। তাদের মিত্র আবদুল্লাহ উবাই তাদের বলেছিলেন যে, তিনি তাদেরকে যোদ্ধা দিয়ে সাহায্য করবেন। বানু বানু বানু বানু বানু কুরাইযার ইহুদিদের কাছ থেকেও সমর্থনের প্রতিশ্রুতি আসে।

অবরোধ আরোপ করার আগে, তাদের অঞ্চলের কাঠের বাড়ি এবং গ্রামগুলির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বানু নাযীররা সুরক্ষার জন্য মূল দুর্গে একত্রিত হয়েছিল। বিপদের সময় আশ্রয়ের জায়গা হিসেবে কাজ করা বড় দুর্গগুলির ভূমিকা ছিল। এগুলিতে সাধারণত খাদ্য এবং অস্ত্র মজুদ করা থাকত এবং ঘন প্রাচীরের মধ্যে পুরো গোত্রের প্রয়োজন সরবরাহের জন্য গভীর কূপ থাকত। মুহাম্মদ চারদিকে বানু নাযীর দুর্গকে ঘিরে রেখেছিলেন। ইহুদিদের কটূক্তি করার জন্য মুহাম্মদ এবং তার অনুসারীরা ইহুদিদের তাদের তীরের নাগালের বাইরে গিয়ে তাদের দেখিয়ে নিয়ম করে নামাজ পড়ত। নেতৃত্ব দেয়ার উদ্দেশ্যে, এক বছর আগে হত্যা করা (মুহাম্মদের নির্দেশে) খাতমা গোত্রের কবি আসমা বিনতে মারওনের একটি উঠোনে মুহাম্মদ তাঁবু স্থাপন করেছিলেন। আযওয়াক (Azwak) নামে একজন ইহুদি তীরন্দাজের তীর তাঁবুতে আঘাত করার পর তিনি তাঁবুটি স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হন। আজওয়াককে ধরে নিয়ে তার শিরোশ্ছেদ করা হয়। অন্ধকারের আড়ালে ক্ষুদ্র একদল যোদ্ধা নিয়ে আজওয়াক কমান্ডো হামলার জন্য বের হয়েছিলেন, কিন্তু আলী তাকে ধরে ফেলেন এবং মুহাম্মদের

কাছে তার কর্তিত মুণ্ডু নিয়ে আসেন। মুহাম্মদের কাছে মুণ্ডু রেখে দিয়ে আলী বাকি কমান্ডোদেরও শিকার করলেন এবং আরও মাথা নিয়ে ফিরে এলেন। মুহাম্মদ সেগুলোকে খাতমাসের (Khatmas) একটি কূপে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। ইহুদিদের প্রতিরোধ অব্যাহত রাখার সাথে সাথে, মুহাম্মদ দুর্গের চারপাশে খেজুর গাছগুলো কাটতে বা আগুনে পুড়িয়ে দেয়ার নিষ্ঠুর পদক্ষেপ নিলেন। ইহুদিদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য তিনি এই কাজ করেছিলেন। তাদের উৎপাদিত ফলের মাঝে খেজুর ছিল বেশ দামী, গাছ রোপন করার পর অনেক বছরের যত্নে এরা ফল দেয়া শুরু করে। ইহুদিরা তাদের প্রিয় গাছগুলিকে এভাবে ধ্বংস হওয়া দেখে যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একজন দূত এসে মুহম্মদের কাছে অযথা ধ্বংসযজ্ঞ করার সম্পর্কে অভিযোগ করেছিল। মুহাম্মদ হেসে বললেন যে, ওদের অপমান ও ক্ষতি করার জন্য এটিই আল্লাহ্‌র উপায়। তার কয়েকজন অনুসারী এই কাজ না করতে চাপ দিতে থাকে, যারা দেখতে পাচ্ছিলেন যে তাদের লুটের মাল (গনিমত) ধোঁয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। তিনি বিরত হয়েছিলেন, তবে কোরআনের একটি আয়াত দিয়ে তার পুরনো কাজটি জায়েজ করে নিয়েছিলেন (১৫)।

মিত্রদের সহায়তার প্রত্যাশায় ইহুদিরা দু'সপ্তাহ ধরে অবস্থান নিয়েছিল, কিন্তু সাহায্য কখনও আসেনি। কায়নূকা ইহুদিদের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়েছিল, আবদুল্লাহ উবাই তার প্রতিশ্রুতি দিতে ব্যর্থ হন। তিনি তখন দুর্বল ছিলেন, এবং মুহাম্মদ তাকে মসজিদে অপমান করায় তিনি এখন আরো দুর্বল হয়ে পড়লেন এবং পর্যাপ্ত শক্তিও তিনি জোগাড় করতে পারেননি। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্র ধর্মান্তরিত হওয়া আবদুল্লাহ ছিল আরেক বাঁধা, যেদুর্গ ঘেরাও করা লোকদের মধ্যে অন্যতম। অসম্মানিত খাজরাজ নেতা যদি ইহুদিদের রক্ষা করতে যান, তবে তাকে প্রথমে নিজের ছেলের সাথেই লড়তে হবে।

শেষ অবধি ইহুদিরা হার মানল, তবে মুহাম্মদের কাছ থেকে তাদের চলে যাওয়ার অনুমতির প্রতিশ্রুতি অর্জনের পরেই। তিনি অস্ত্র ছাড়া তাদের উটের উপরে যা কিছু নিতে পারেন তা তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তারা তাদের সমস্ত অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জাম সমর্পণ করুক। ইহুদিরা উটের গায়ে তাদের জিনিসপত্র উঠাতে তিনদিন সময় নিল। কেউ কেউ মূল্যবান চৌকাঠ এবং থামগুলো পুনরুদ্ধার করতে তাদের বাড়িঘর ভেঙ্গে ফেলেছিল, যা তারা উটের উপরেও বোঝাই করল। তারা ছয়শত উটের একটি বিশাল কাফেলা তৈরি করেছিল। যেদিন তারা চলে গেলেন, রাব্বি-নেতা সাল্লাম হুকায়িক (Sallam Huqayq), কিনানা রাবি (Kinana Rabi) এবং হুয়াই বিন আখতাব (Huyayy Akhtab) ঘোড়ার পিঠে চড়ে কাফেলার সামনের দিকে ছিলেন। নারী এবং শিশুরা উটগুলিতে চড়ে যাচ্ছিল, আর পুরুষরা তাদের পাশে হাঁটছিল। তারা হতাশার পরিবর্তে উৎফুল্ল থেকে তাদের মর্যাদা ধরে রাখার চেষ্টা করেছিল। উট এবং ঘোড়ার পেছনে হাঁটতে হাঁটতে ছেলেরা টাম্বুরিন ও বাঁশি বাজাচ্ছিল এবং মেয়েরা আনন্দসূচক গান করছিল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের কটূক্তি করার জন্য তারা তাদের সম্পদগুলো দেখাতে লাগল। উটের উপর কারুকাজ করা পালকিতে বসা নারী ও শিশুরা তাদের গলায় সোনা ও মুক্তার হার, হাতে ব্রেসলেট পরেছিল। নারীরা তাদের সেরা রেশমির গাউন পরেছিলেন এবং সোনা এবং রৌপ্যের পানপাত্র নিয়েছিলেন। তাদের সোনার ও রৌপ্য নৈশভোজের পাত্রগুলো এত বিখ্যাত ছিল যে, মক্কাবাসীরা কখনও কখনও তাদের উৎসবে সেগুলো ধার নিত। মুহাম্মদ এই লোক দেখানো প্রস্থান দেখে এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তাদের দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরেছিলেন (১৬)। বানু নাযীর পরিবারের কেউ কেউ সিরিয়ার কায়নুকা ইহুদিদের সাথে যোগ দিতে গিয়েছিল, তবে বেশিরভাগই খাইবার (Khaybar) থেকে নব্বই মাইল উত্তরে বসতি স্থাপন করল, যেখানে তারা সম্পত্তির মালিক হল এবং খেজুর চাষে নিজেদের নিয়োজিত করল।

এই ঘটনা থেকে মুহাম্মদের প্রাপ্তি ছিল বিশাল। বানু নাযীর আদিবাসীর সমস্ত দুর্গ, কাঠের বাড়ি, খেজুর গাছ ও খামার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে আরো ছিল সাতটি বড় শস্যক্ষেত, গাছগাছালির সমাহার এবং কয়েকটি ছোট ছোট খামার। ইয়াছরিবের সবচেয়ে উর্বর অঞ্চলে বানু নাযীরদের স্থাবর সম্পত্তি কয়েক বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত ছিল। গণিমতের মালগুলোও আকর্ষনীয় ছিল। এতে পঞ্চাশটি বর্ম, পঞ্চাশ শিরস্ত্রাণ এবং তিনশতত চল্লিশটি তলোয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলামিক গ্রন্থে

অবরোধে অংশ নেওয়া মুমিনদের সংখ্যার বর্ণনা মেলে না, তবে সম্ভবত এটি এক হাজারের কাছাকাছি ছিল। প্রত্যেকেই এর ভাগ নিতে উদগ্রীব ছিল, কিন্তু মুহাম্মদ ভাগবাটোয়ারা সম্পর্কে আগেই ভেবে রেখেছিলেন যে, সবকিছু মক্কার অভিবাসীরা পাবে। মক্কা প্রবাসীদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি ইয়াছরিবী ধর্মান্তরিতদের বাদ দেয়া হয়েছিল। মুহাম্মদ মিষ্টি কথা ও চাটুকারিতার সাথে খবরটা ছড়িয়ে দিলেন। তিনি তার ইয়াছরিব সমর্থকদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, এটা আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ তাকে ফেরেস্তা জিব্রাইলের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কাফেররা লড়াই না করে হাল ছেড়ে দিলে মুহাম্মদকেই সবকিছু দেয়া হবে এবং গণিমতের মালের বিলিবন্টনের দায়িত্বও তার উপরে, তিনি যা ভালো মনে করেন তাই হবে (১৭)। আর এখন তিনি মক্কাবাসীদের কাছে সবকিছু দিয়ে দেয়াই সঠিক মনে করছেন। কারণ, ইয়াছরিবী ধর্মান্তরিতরা মক্কার শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদানের ক্ষেত্রে উদারতা প্রদর্শন করেছিল। তাদেরকে তারা নিজেদের মাঝে নিয়ে এসেছিল, তাদের সাথে ভাইয়ের মত আচরণ করেছিল এবং তাদের জন্য সাধের চেয়ে অনেক বেশি করেছে। তিন বছর ধরে তারা এই ধরনের আতিথেয়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, তবে এটি স্পষ্টতই তাদের জন্য একটি আর্থিক চাপ ছিল। কারও কারও জন্য এই টানাপোড়েন অন্যদের চেয়ে বেশি ছিল। মুহাম্মদ লুটের মালামাল বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন, যা তাদের দায় থেকে মুক্তি দিল। মক্কাবাসীরা এখন তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবে এবং তাদের ভাইদের জন্য আর বোঝা হয়ে উঠবে না। তিনি আল্লাহকে কোরআনের আয়াত সহকারে নামিয়ে আনলেন: "সুতরাং রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং তিনি তোমাদের যা থেকে বারণ করেন তা থেকে বিরত হও। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর" (১৮)। আউস বা খাজরাজের কেউ প্রতিবাদ করেছিল কিনা তা লিপিবদ্ধ নেই। যদি এটি আল্লাহর ইচ্ছা হত তবে কারা আপত্তি করবে? যদি তাদের মধ্যে কেউ সত্যিই অসন্তুষ্ট হত, তারা এটিকে নিজের ভেতরেই রাখত। তারা জানত যে, তারা যদি প্রতিবাদ করে তবে তারা ভন্ড হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার ঝুঁকি বহন করবে।

নিজে এক পঞ্চমাংশ নেয়ার প্রচলিত নিয়মানুসারে মুহাম্মদ নিজের জন্য সবচেয়ে বড় গাছ আর শস্যক্ষেত বেছে নিলেন, আর তার এক দাসকে দেখভালো করার জন্য নিয়োগ করলেন। আবু বকর, উমর এবং যুবায়েরকে সম্পত্তির অন্যান্য প্রধান অংশ দিলেন, এবং আরেকটা অংশ মক্কার ব্যবসায়ী আবদুল রহমানের (Abdul Rahman) কাছে গেল, যিনি প্রথম দিককার অন্যতম ধর্মান্তরিত ছিলেন। অন্যান্য সম্পত্তি তিনি ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করেছিলেন এবং এগুলি বাকী মক্কাবাসীদের মধ্যে ভাগ করেছেন। এমনকি তার প্রাক্তন আবিসিনিয়ার দাসী বারাকা, যিনি জায়েদকে বিয়ে করেছিলেন এবং ওসামার মা ছিলেন তিনিও খেজুর গাছের একটি অংশ পেয়েছিলেন। ইয়াছরিবের ধর্মান্তরিতদের মধ্যে কেবল দু'জন এখান থেকে স্থাবর সম্পত্তি পেল সেটাও বদর ও উহুদে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের সমস্ত পরিষেবার কথা এবং চরম দারিদ্র্যের অজুহাত দেখিয়ে। মুহাম্মদ তার অনুসারী লোকদের একটি ছোট খামারের যৌথ মালিকানা দিলেন। চির-বিশ্বস্ত আউস নেতা সাদ বিন মুআযকে নাদিরের নেতা সাল্লাম হুকায়কের (Sallam Huqayq) খ্যাতিমান তলোয়ারটি প্রদান করলেন। আদিগ্রন্থে বলা হয়েছে যে, নাদিরের দু'জন ইহুদি তাদের খামার এবং পরিবার রাখার শর্তে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তারা আত্মসমর্পণের আগে দুর্গ থেকে সটকে গিয়েছিল এবং বিশ্বস্ততার শপথ করেছিল। তাদের একজনের নাম ইয়ামিন উমাইর (Yamin Umayr)। আমাহ জাহাশ (Amr Jahash) নামের এক বানু নাযীর ইহুদিকে খুন করে মুহাম্মদ তাকে তার আনুগত্য প্রমাণ করার দায়িত্ব দিয়েছিল। জাহাশের একমাত্র অপরাধটি ছিল যে, সে ভুল সময়ে মুহাম্মদের কল্পনায় প্রবেশ করেছিল। মুহাম্মদ যখন কল্পনা করেছিলেন যে কেউ তার মাথায় বড় পাথর ফেলতে চলেছে, তখন জাহাশের মুখটি তার মনে ভেসে ওঠে। মুহাম্মদকে খুশি করার জন্য ইয়ামিন কোন একজনকে দশটি সোনার মুদ্রা দিয়েছিলেন এই কাজটি সম্পন্ন করতে। বানু নাযীর ইহুদিদের আত্মসমর্পণের পরে, তবে তাদের চলে যাওয়ার আগে এই হত্যার ঘটনাটি ঘটেছিল। ইসলামিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে, ইয়ামিন যখন মুহাম্মদকে এই হত্যাক্যান্ডটি সম্পন্ন করেছে বলে জানিয়েছিল, তখন "নবী সন্তুষ্ট হয়ে যান" (১৯)।

বানু নাযীর ইহুদিদের ভাগ্য নিয়ে কোরআনে “বিলুপ্তি (Banishment)” শিরোনামের একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ের (সূরা) রচনা করা হয়েছিল। তার আয়াতগুলিতে মুহাম্মদের এই পদক্ষেপের পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং ইহুদিদের বহিষ্কার এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য জটিল যৌক্তিকতা দেয়া হয়। প্রথম কয়েকটি আয়াতে লেখা ছিল:

هُوَ الَّذِیۡۤ اَخۡرَجَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مِنۡ اَهۡلِ الۡکِتٰبِ مِنۡ دِیَارِهِمۡ لِاَوَّلِ الۡحَشۡرِ ؕؔ مَا ظَنَنۡتُمۡ اَنۡ یَّخۡرُجُوۡا وَ ظَنُّوۡۤا اَنَّهُمۡ مَّانِعَتُهُمۡ حُصُوۡنُهُمۡ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنۡ حَیۡثُ لَمۡ یَحۡتَسِبُوۡا * وَ قَذَفَ فِیۡ قُلُوۡبِهِمُ الرُّعۡبَ یُخۡرِبُوۡنَ بُیُوۡتَهُمۡ بِاَیۡدِیۡهِمۡ وَ اَیۡدِی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ * فَاعۡتَبِرُوۡا یٰۤاُولِی الۡاَبۡصَارِ ﴿۲﴾
وَ لَوۡ لَاۤ اَنۡ کَتَبَ اللّٰهُ عَلَیۡهِمُ الۡجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمۡ فِی الدُّنۡیَا ؕ وَ لَهُمۡ فِی الۡاٰخِرَۃِ عَذَابُ النَّارِ ﴿۳﴾
ذٰلِکَ بِاَنَّهُمۡ شَآقُّوا اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ ۚ وَ مَنۡ یُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِیۡدُ الۡعِقَابِ ﴿۴﴾

আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে তিনি (আল্লাহ) বের করে দিয়েছিলেন প্রথমবারের মতো। তোমরা ধারণাও করনি যে, তারা বেরিয়ে যাবে। আর তারা ধারণা করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহ এমন এক দিক থেকে তাদের কাছে এলেন যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি এবং তিনি তাদের অন্তরসমূহে ত্রাসের সঞ্চার করলেন, ফলে তারা তাদের বাড়িঘর আপন হাতে ও মুমিনদের হাতে ধ্বংস করতে শুরু করল। অতএব হে দৃষ্টিমান লোকেরা তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। আল্লাহ যদি তাদের জন্য নির্বাসন না লিখে দিতেন, তাহলে তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতেই শাস্তি দিতেন, আর পরকালে তো তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছেই। এটি এজন্য যে, তারা সত্যিই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। আর যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর। (২০)। একই সূরায় বেশকিছু আয়াত আছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে উদ্দেশ্য করে, তার একটিতে বলা হয়েছেঃ

اَلَمۡ تَرَ اِلَی الَّذِیۡنَ نَافَقُوۡا یَقُوۡلُوۡنَ لِاِخۡوَانِهِمُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مِنۡ اَهۡلِ الۡکِتٰبِ لَئِنۡ اُخۡرِجۡتُمۡ لَنَخۡرُجَنَّ مَعَکُمۡ وَ لَا نُطِیۡعُ فِیۡکُمۡ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّ اِنۡ قُوۡتِلۡتُمۡ لَنَنۡصُرَنَّکُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ یَشۡهَدُ اِنَّهُمۡ لَکٰذِبُوۡنَ ﴿۱۱﴾
لَئِنۡ اُخۡرِجُوۡا لَا یَخۡرُجُوۡنَ مَعَهُمۡ ۚ وَ لَئِنۡ قُوۡتِلُوۡا لَا یَنۡصُرُوۡنَهُمۡ ۚ وَ لَئِنۡ نَّصَرُوۡهُمۡ لَیُوَلُّنَّ الۡاَدۡبَارَ ۟ ثُمَّ لَا یُنۡصَرُوۡنَ ﴿۱۲﴾

তুমি কি মুনাফিকদেরকে দেখনি যারা আহলে কিতাবের মধ্য হতে তাদের কাফির ভাইদেরকে বলে, ‘তোমাদেরকে বের করে দেয়া হলে আমরাও তোমাদের সাথে অবশ্যই বেরিয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনোই কারো আনুগত্য করব না। আর তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব।’ আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা মিথ্যাবাদী (২১,২২)।

সমালোচকদের হত্যা, ইহুদি গোত্রগুলির বিতাড়ন এবং তাদের সম্পত্তি ছিনিয়ে নেয়ার মধ্য দিয়ে মুহাম্মদ ইয়াছরিবকে এক অরাজক অঞ্চলে পরিণত করেছিলেন, যেখানে নৈতিকতার কম্পাসের কোন নির্দেশনা আর কাজ করত না। তিনি সেটার নির্দেশক সূচকটিতে এমন জোরালো ঘূর্নন দিয়েছিলেন যে, এটি যখন থামত খারাপ হয়ে যেত ভালো, আর ভালো হয়ে যেত ‘শয়তান’।

অধ্যায় - ১৯
নবীর নগরে ঘৃণা ও ভয়

অনুতপ্ত হও। কেয়ামত সন্নিকটে। কেয়ামতের সময়কাল একেবারেই দোরগোড়ায়, এটা এতটাই দৃঢ়ভাবে মুহাম্মদ বিশ্বাস করতেন যে, তিনি পারলে সেই সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধটির মতো কেয়ামতের সতর্কবাণীর চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তিনি তার আরব সমসাময়িকদের উদ্দেশ্যে এই বার্তাটি চেঁচিয়ে বললেন : "আমাদের উপর অশুভ ভর করেছে, কেয়ামতের দিন ঘনিয়ে আসছে, জাহান্নামের রক্ষীরা দরজা খুলে ফেলেছে! যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং পাপসমূহের জন্য অনুশোচনা কর, তবে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আগুন থেকে রক্ষা পাবে!"

মুহাম্মদ বিশ্বাস করতেন তিনি স্রেফ কেয়ামতের ঘোষক বা শেষ সময়ের (আখেরি জামানা) বার্তাবাহকই নন; তিনি হলেন এই সতর্কতাসমূহ নিয়ে আসা বার্তাবাহক বা নবীদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি। তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণের সেই দীর্ঘ সারির একেবারে চূড়ান্ত ব্যক্তি ছিলেন, কারণ ধ্বংসের 'শেষ' খুব দ্রুততই এগিয়ে আসছে। ফেরেস্তারা ইতিমধ্যে শিঙা বাজানোর জন্য পৌঁছেছিলেন। সতর্কঘন্টা বাজানোর জন্য আর কারও প্রয়োজন হবে না।

তিনি সকলকে এই কথাটি বলেছিলেন এবং সময়সীমার বিষয়ে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, তার মৃত্যুর পর কেয়ামত ঘটতে খুব বেশি সময় বিলম্ব হবে না। সেই থেকে শেষ সময়ের লক্ষণগুলি শুরু হবে। কিছু যাযাবর একবার এই প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য তার মসজিদে এসেছিল। নামাজের জায়গাগুলিতে তারা যখন হাঁটু ভাঁজ করে বসেছিল তখন তারা বলল, "হে আল্লাহর রাসূল, কেয়ামত (শেষ সময় বা মহাপ্রলয়) কখন আসবে?" মুহাম্মদ তাদের সাথে থাকা একটি শিশুর দিকে ইশারা করে বললেন, "যদি এই ছোট্ট ছেলেটি বেঁচে থাকে তবে কেয়ামত পেতে তাকে বেশি বৃদ্ধ হতে হবে না"(১)।

মুহাম্মদ ছিলেন একজন সহজাত প্রবৃত্তিসম্পন্ন প্রভাব বিস্তারকারী। তিনি তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মানব প্রকৃতির স্বরূপ বুঝতে পারতেন এবং তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতার ময়দান মক্কা থেকেই তিনি জানতেন যে, মানুষের ভেতরে ভয় সৃষ্টি করা হচ্ছে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রথম পদক্ষেপ। এই ভয় সৃষ্টি করার কৌশল তখন তার অনুসারীদের ছোট গোষ্ঠীর বেলায় কাজ করেছিল, এবং এটি এখন আরো বৃহত্তর গোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রেও বেশ কাজ করছে। এটি কাজ করেছিল, কারণ তিনি নিজের কল্পনাগুলিকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং অন্যান্য লোকজনদেরও বোঝানোর মতো কল্পনাশক্তি ও শৈল্পিকতা তার মধ্যে ছিল। ভয় সৃষ্টি করা এবং সেই ভয়ের সাথে যে নিয়ন্ত্রণের নাটাই মুহাম্মদের হাতে চলে আসত তা ধরে রাখার জন্য তিনি কখনও কখনও একটানা ভীতি সঞ্চারের আবহ তৈরি করতেন যার প্রতিপাদ্য ছিল সময়ের সমাপ্তি, কেয়ামতের আগমনের চিত্র এবং যারা তাকে বিশ্বাস করে না তাদের জন্য নরকের আগুন। এই মাহফিলগুলোর (ধর্মসভার) উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যত নিয়ে অজানা ভয় ছড়িয়ে দেয়া। তিনি একটানা আশা সঞ্চার সম্পর্কিত মাহফিলগুলো পর্যালোচনা করতেন, যেগুলো তাদের মধ্যে তৈরি হওয়া ভয় থেকে আবার মুক্তির পথ বাতলে দিত – আর এটি হচ্ছে মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জনের জন্য দ্বিতীয় ধাপ। এটি হচ্ছে সেই ঝানু পণ্য বিক্রেতার একের ভিতর-দুই কৌশলের মতই - প্রথমে ভয় দিয়ে দিয়ে ক্রেতার হৃদয় অস্থির করে ফেল, তারপর সেটি থেকে তাদের মুক্তির পথ বাতলে দাও।

তিনি যখনই কোনও ভীতি সংক্রান্ত বয়ান করতেন, এটি সারাদিন এবং সারারাত ধরে চলত এবং এটি তার অনুসারীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্লান্তির চূড়ান্তে নিয়ে যেত। ইসলামের গ্রন্থে এরকম একটি অধিবেশনের কথা বলা হয়েছে, যা ভোরের আলো ফোটার আগে শুরু হয়েছিল (২)। দু'দফায় প্রার্থনা করার পরে মুহাম্মদ নিজেকে মিম্বারের আসনে বসালেন

এবং সেখান থেকে তিনি বিশ্বস্তদেরকে ভবিষ্যতের জন্য কি অপেক্ষা করছে তা নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বয়ান করলেন। দুপুরে বিলালের বাধ্যতামূলক নামাজের আহবানের আগ পর্যন্ত তিনি বলতেই থাকলেন, মাঝেমধ্যে শুধু প্রশ্ন আহ্বান করছিলেন। এরপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে এসে নামাজের স্থানে এলেন, মুমিনদের উদ্বেগ-প্রশমনমূলক কর্মকাণ্ডের আরও কয়েকটি মাহফিলের নেতৃত্ব দিলেন, তার জন্য উপযুক্ত যে আয়াতগুলি আবশ্যক তা তিলাওয়াত করলেন, তারপরে মিম্বারে এসে আবার তার বয়ান শুরু করলেন। তিনি এটি পুরো দিন জুড়েই চালালেন, নেমে এসে বিকেলের নামাজ পড়ালেন অন্ধকার হওয়ার আগে, তারপর আবারো অন্ধকার না নামা পর্যন্ত শুরু করলেন।

এই বিভীষিকাময় মাহফিলগুলোর মধ্য দিয়ে মুহাম্মদ যেন দক্ষিণাঞ্চলীয় পুনর্জাগরনবাদী বিলি সানডে (Billy Sunday) হয়ে উঠতেন, যিনি তার ধর্মসভার সবাইকে নরকের আগুনের ভয়াল বর্ণনা শোনাতেন। মুহাম্মদ বর্ণনা করতেন কিভাবে চরম বিভীষিকাময় সময় অপেক্ষা করছে নিকৃষ্টদের জন্য, আর তাদের ভাগ্যে কি আছে তা জানতে তাঁকে প্রশ্ন করতে আহবান করতেন। তিনি বলতেন, "এই ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস কর, আমাকে জিজ্ঞেস কর"। একটা মাহফিলে এক লোক তার পায়ে লাফিয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহর রাসুল, আমার ঠিকানা কোথায় হবে?" মুহাম্মদ তাকে আর তার মত যারা জানতে চাইত তাদেরকে চিৎকার করে বলতেন, "জাহান্নামে!"

তিনি চেঁচিয়ে বলতেন, "আমাকে জিজ্ঞাসা কর! আমাকে জিজ্ঞাসা কর!" অন্য কেউ যখন কথা বলার সাহস করত না, তিনি চিৎকার করে উঠতেন, "আমি প্রার্থনা করার সময় জান্নাত ও জাহান্নাম আমার সামনে এই প্রাচীর জুড়ে প্রদর্শিত হয়েছিল"। তিনি মসজিদের একটি দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং গুরুগম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, "আজকের মতো ভালো-মন্দ আমি আর কখনও দেখিনি"। এরপর তিনি তাঁর সাহাবিদের দিকে তাকিয়ে বললেন "আমাকে জিজ্ঞাসা কর! আমাকে জিজ্ঞাসা কর!" তিনি কেবল জ্বলন্ত মাংসের গন্ধই নয়, বরং তাদের নিজেদের মাংস পোড়ানোর গন্ধ শুকাতেন। তিনি তাদের কেবল যন্ত্রণার আর্তনাদ শুনাতেন না, তাদের নিজেদের গলা দিয়ে যন্ত্রণার চিৎকার বের করে আনতেন। লোকেরা এত ভয় পেত যে, তারা মাটিতে গড়িয়ে পড়ত আর অবিরত কান্না করত। এমনকি দুঃসাহসী উমরও ভয়ে কাতর হয়ে থাকতেন। তারপর তিনি হাঁটু ভেঙ্গে বসতেন এবং কাঁদতেন, আর বেহেশতে লাভের নিশ্চয়তা প্রদানকারী কথাগুলো বললেন : "আমরা আল্লাহকে আমাদের রব হিসেবে এবং ইসলামকে আমাদের ধর্ম হিসেবে এবং মুহাম্মদকে আমাদের রাসূল হিসেবে গ্রহণ করি!" (৩)

তবে এই ঘটনাগুলি ছাড়িয়ে যায় বিশ্বাসীদের এই সন্তুষ্টিমূলক অনুভূতি যে, তারা আল্লাহর রাসূলের মুখোমুখি বসে আছে, তারা মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সিংহাসনের সামনে তলব করা ব্যক্তিটির কথা শুনার সুযোগ পাচ্ছে। তারা নিশ্চিত ছিল যে, তারা তার কাছ থেকে যা শুনছিল তা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে। এটি ছিল তাদের উপকারের জন্য, তাদের নৈতিক উন্নয়নের জন্য, তাদেরকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে প্রজ্বলিত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য। অবশেষে যখন একটানা বয়ানগুলো বন্ধ হতো তাদের ছেড়ে দেয়া হত। পরদিন ভোরে নামাজের জন্য না ডাকা পর্যন্ত তারা বাসায় গিয়ে সংক্ষিপ্ত একটা ঘুম দিত।

মুহাম্মদ কেয়ামতের বিষয়ক গল্পগুলির প্রথম এবং দৃঢ়চেতা একজন বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই চিন্তা তার মনের পুরোটাই দখল করেছিল। তিনি কিয়ামতের দিন নিয়ে এতই ভাবতেন যে, এমনকি এ সম্পর্কে তার দুঃস্বপ্নও হত। একরাতে পালকপুত্র জায়েদের প্রাক্তন স্ত্রী, জয়নাব বিনতে জাহশ (Zaynab bint Jahsh) (৪) এর সাথে শুয়ে থাকার সময় তিনি উত্তেজিত হয়ে জেগে উঠলেন, তার মুখটিও রক্তিমাকার হয়ে গিয়েছিল। জয়নব হতবাক হয়ে গেলেন, আর মুহাম্মদ চিৎকার করে বললেন : "আরবের জন্য ধ্বংস অপেক্ষা করছে! কারণ, অশান্তি ও ইয়াজুজ-মাজুজের (Gog and Magog) বাধন খুলে গেছে" (৫)।

এই ঘোষণাটি তার পৌরাণিক এক বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ছিল। পৌরাণিক গল্পে বলা হতো, অনেক দূরে পূর্বদিকে বরফের একটি অঞ্চলে, সম্রাট যুল কারনেইন (Alexander the Great) একটি বর্বর গোষ্ঠীকে লোহার প্রাচীরের আড়ালে বন্দি করে রেখেছিল। সেখান থেকে তাদের পালিয়ে যাওয়া হবে কেয়ামতের নির্দেশক। মুহাম্মদের স্বপ্নে সেই প্রাচীরটিতে ফাটল ধরেছিল, আর বর্বরদের বিশাল দলটি সেদিকে ছুটে যাচ্ছিল। ফাটলটা কেমন তা বোঝাতে তিনি তার হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল আর তর্জনীর মাধ্যমে একটা বড় ও (O) আকার করে জয়নাবকে দেখালেন। আর বেশি দেরি নেই যখন এই জাহান্নামীরা (ইয়াজুজ-মাজুজ) আরব মরুভূমিতে হুঙ্কার দিয়ে বেড়াবে। তিনি বললেন যে, স্বপ্ন মিথ্যা বলে না এবং বোঝালেন যে, তার স্বপ্নটিতে স্পষ্ট প্রমাণ ছিল কেয়ামত সন্নিকটে।

যখন তার উপদেশগুলি শাস্তি ও নিন্দায় ভরে উঠত, তখন তিনি প্রায়শই ক্রোধে ফেটে পড়তেন। একসময় তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, "আমি তোমাদের আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি!" মসজিদ থেকে সামান্য দূরের বাজারেও তার কণ্ঠ শোনা যেত। তখন তার শরীর এত জোরে কেঁপে উঠল যে, কাঁধের উপরের পোশাকটি মাটিতে পড়ে গেল (৬)। কেয়ামতের জন্য কি অপেক্ষা করছে তা বলার সময় তার কণ্ঠ ক্রোধে কাঁপছিল। তিনি বললেন, দোযখের আগুন এমনই হবে যে সেখানে থাকা মানুষের পায়ের চটির ফিতা আগুনের তৈরি হবে, যার উত্তাপ মাথার ভেতরের মগজকে সেদ্ধ করবে। যদিও এই ব্যক্তিটির শাস্তিটি হচ্ছে সর্বনিম্ন শাস্তি তবুও মনে হবে তার মত এত মারাত্মক যন্ত্রণায় হয়তো আর কেউ নেই(৭)।

মসজিদের মঞ্চে দেয়া টানা বয়ানগুলোর সময় মুহাম্মদ ছিলেন পুরোদস্তর অভিনেতা। তিনি বয়ানের গতি ক্রমশ বাড়াতেন, কমাতেন, তর্জনীটি উঁচিয়ে আর কপাল কুঁচকে শ্রোতাদের দিকে তাকাতেন। তার টানা খুতবা শুরু হত মুমিনদের আসন্ন কেয়ামতের বিষয়ে ছোটখাটো আলামত বলার মধ্য দিয়ে : ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ আর মারামারির যুদ্ধ হবে, ভূমিকম্পের মতো মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয় সবকিছুকে মাটিতে মিশিয়ে দেবে; প্রচণ্ড আগুন পাহাড় এবং বৃক্ষরাজিকে পুড়িয়ে কয়লা বানিয়ে ফেলবে। যখন পরিস্থিতি একেবারেই খারাপ হয়ে উঠবে ঠিক তখনই পরিস্থিতি একটু ভালো হয়ে উঠবে, তবে তারপরে আরও একটি ঘটনা ঘটবে যা দেখে জীবিতরা মৃতদের হিংসা করবে। মুমিনরা মুমিনদের সাথে লড়াই করবে, তীর্থযাত্রীদের (হজ্বযাত্রী) মালামাল লুট করা হবে এবং তাদের হত্যা করা হবে, পবিত্র পাহাড়গুলোতে লড়াই হবে এবং শৃঙ্খলা রূপ নেবে বিশৃঙ্খলায়। এই তান্ডবের মাঝে ফোরাত (Euphrates) থেকে সোনার পাহাড় উত্থিত হবে, এবং শতশত স্বর্ণ সন্ধানকারীদের মধ্যে একজন ছাড়া আর সবাইকেই সীমাহীন লোভ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে ন্যায়ের পথপ্রদর্শক, মুহাম্মদের রক্তের বংশধর, তার সাথে আশ্চর্য সাদৃশ্যপূর্ণ ইমাম মাহদীর (Imam Mahdi) আবির্ভাব ঘটবে। তিনি আসবেন ইয়াছরিবে যখন তার বয়স হবে চল্লিশ, আর তিনি হবেন ইসলামের শেষ আশা-ভরসা (৮)।

মুহাম্মদ বলেছেন, মাহদীর প্রথম চ্যালেঞ্জ হবে আবু সুফিয়ানের (Abu Sufyan) এক বংশধরকে মোকাবেলা করা, যিনি দামেস্কে তার ঘাঁটি থেকে অরাজকতা ও অপরাধ ছড়িয়ে দেবেন। তিনি এমন নিষ্ঠুর হবেন যে, শিশুদের হত্যা করবেন এবং গর্ভবতী নারীদের পেট চিঁড়ে ফেলবেন (৯)। সুফিয়ানি (Sufyani) নামে ডাকা এই আবু সুফিয়ান, মাহদীর আবির্ভাব সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তাকে হত্যা করার জন্য একদল সেনা পাঠাবে, তবে তার এই বাহিনীকে মরুভূমি গ্রাস করবে। প্রায় একই সময়ে খিলাফতের উত্তরাধিকারের যুদ্ধও হবে। মাহদী হবেন একজন দোনোমনা শাসক; তিনি এই সুফিয়ানী আক্রমণের আগেই মক্কায় পালিয়ে যাবেন এবং মক্কায় তার সভাসদেরা তাকে খলিফার দায়িত্ব দেয়ার জন্য তার ঘর থেকে কাবার দিকে টেনে আনবেন, যেখানে তারা কালো পাথরের (হাজারে আসওয়াদ) সামনে তার প্রতি আনুগত্যের শপথ করবে। তাকে ডাকা হবে পথের দিশারী বলে এবং লোকজন তাঁর আনুগত্য মেনে নেবে। তারপর তিনি জোট গঠন করবেন এবং মুরতাদ এবং খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিশ্বাসীদের (মুসলিমদের) নেতৃত্ব দেবেন।

মুহাম্মদ সকালের অধিবেশন চলাকালীন এই ইমাম মাহদীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করতেন। ঈমানদারগণ আচ্ছাদিত প্রার্থনার স্থানের পুরোটা জুড়ে হাঁটু ভাঁজ করে সারিবদ্ধভাবে বিভিন্ন সারিতে বসে থাকতেন এবং অনেক সময় তা পেরিয়ে বাইরের বিশাল আঙ্গিনায় পর্যন্ত গিয়ে ঠেকত। দুপুরের নামাজের আহ্বানে, তিনি জামাতের ইমামতি করার জন্য সামনের খালি জায়গায় চলে আসতেন এবং সর্বদা নিখুঁতভাবে আয়াত বলে সেজদার মাধ্যমে নামাজ শেষ করতেন। তারপরে তিনি আবার খুৎবার মিম্বারে ফিরে এসে বয়ানের জন্য প্রস্তুতি নিতেন। তার পাগড়িটি শক্তভাবে তার মাথায় জোড়ানো ছিল, আর পাগড়িটির কিছু অংশ ছিল কাঁধে ঝোলানো। ভবিষ্যতের দৃশ্যপট তার মস্তিষ্কে গেঁথে নিতে তিনি তার মিম্বারের আসনে দু'চোখ বন্ধ করে বসেন। সমস্ত প্রতিভাধর সাধকদের মতো তার মাঝেও নাটকীয়তা ছিল। তার মনে আসা দৃশ্যগুলোকে কথায় প্রকাশের সাথে সাথে, তাতে জোর আরোপ করতে তিনি মিম্বারের বাহুতে স্বীয় হাত মুষ্টিবদ্ধ করে চাপ দিতেন; তিনি উপরের দিকে অদৃশ্য শক্তির দিকে নির্দেশ করতেন, আল্লাহর কাছে দু হাত তুলে প্রার্থনা করতেন, শরীরের পশ্চাদ্দেশ দিয়ে কাঠের মেঝেতে আঘাত করতেন, অনেক সময় অনুসারীদের উজ্জীবিত করতে তিনি লাফিয়ে উঠতেন। নিজের কোমরে হাত রেখে তিনি সামনে বেঁকে গিয়ে সমাবেশের উদ্দেশ্যে আলঙ্কারিক প্রশ্নসমূহ ছুঁড়ে দিতেন, শুধুমাত্র নিজে উত্তর দেয়ার জন্য, অথবা তিনি সামনে পেছনে স্ফীত হয়ে বেহেশতের উদ্দেশ্যে তীব্র আবেগে কেঁপে কেঁপে কথা বলতেন। মুমিনরা তাদের মুখ এবং চোখ একেবারে স্থির রেখে মুখ হা করে তার কথা শুনত।

মুহাম্মদ তাদের বলেন যে, নিকটতম ভবিষ্যতে কেয়ামতের অন্যতম প্রথম আলামত হবে মাহদীর শাসন। যিনি সাত বছর রাজত্ব করবেন এবং মরিয়মের পুত্র যীশুর পৃথিবীতে পুনরায় আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবেন। একই সময়ে একজন ধুরন্ধর প্রতারক, প্রচণ্ড শক্তিশালী যীশু-বিরোধী ভুয়া নবী দাজ্জালের (Dajjal) আবির্ভাব ঘটবে। সিরিয়া এবং বাইজান্টাইনের খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে মাহদীর নেতৃত্বে একটি বাহিনী এগিয়ে যাওয়ার পরেই বিশ্বে দাজ্জালের উপস্থিতির গুজব ছড়িয়ে পড়বে, যদিও তার এক তৃতীয়াংশ যোদ্ধাকে হত্যা করা হবে এবং অন্য এক তৃতীয়াংশ প্রস্থান করবে। বিশাল সিরিয়ার সেনাদলর বিরুদ্ধে মাহদীই বিজয়ী হবেন, এবং তারপরে তিনি কনস্ট্যান্টিনোপলের (Constantinople) দিকে তার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাবেন। সেখানে তার সৈন্যরা একযোগে চিৎকার করবে: "আল্লাহু আকবর!" এবং তখন কনস্ট্যান্টিনোপলের দেয়ালগুলি ভেঙে পড়বে। কিন্তু মাহদী তার বিজয় উপভোগ করতে পারবেন না, কারণ সেই মুহূর্তে এমন কথা শোনা যাবে যে দাজ্জাল সিরিয়ায় হাজির হয়েছে এবং মায়াজাল ও জাদুকরী কথার মাধ্যমে লোককে তার মিথ্যা ধর্মের দিকে প্ররোচিত করছে।

মুহম্মদের বর্ণিত শেষ সময়ের পরিস্থিতি যেন হলিউডের মহাকাব্যের একটি পাণ্ডুলিপির মতো ছিল, যার মাঝে থাকত অনেক অভিনেতা এবং বিশেষ কারিগরি চমকও। যেমন, বাম চোখ অন্ধ এবং ঘন লোমশ শরীরের দাজ্জাল সিল্ক পরিহিত থাকবে আর তার হাতে থাকা ধারালো তলোয়ার সহ সত্তর হাজার ইহুদি নিয়ে পারস্য থেকে সে এগিয়ে আসবে। সেই শয়তান তথা দাজ্জালের পা থাকবে বাঁকানো এবং তার কপালে ছাপ মারা থাকবে 'কাফির' শব্দের নির্দেশক তিনটি আরবি অক্ষর। সে একটা বিশাল খচ্চরের উপর খুব দ্রুতগতিতে চলা, একেবারে মুহাম্মদকে মক্কা থেকে জেরুজালেমে নিয়ে যাওয়া শক্তিশালী প্রাণী বুরাকের চেয়েও দ্রতগতিতে ছুটে চলা বিশাল এক খচ্চরের উপর চড়ে অভিযানে বেরোবে সে। দাজ্জালের হাতের স্পর্শে আগুন হয়ে যাবে জল এবং জল হয়ে যাবে আগুন। তার সাথে বাদ্যযন্ত্র থাকবে এবং তিনি সংগীতপ্রেমীদের বিমোহিত করার জন্য সুন্দর সংগীত তৈরি করবেন। তিনি তার যাদুকরী কৌশলের মাধ্যমে আরও বেশি লোককে তার অনুসরণ করতে প্রভাবিত করবেন, এবং মনে হবে যেন সবই অলৌকিক। মঞ্চে দেখানো কৌশলগুলির মধ্যে একটিতে একজন ব্যক্তিকে কেটে অর্ধেক করা হবে, আর পরে তাকে আবার জীবিত করা হবে। অন্য আরেকটিতে তিনি মৃত পিতা এবং তার ভাইয়ের জীবন ফিরিয়ে আনবেন, তবে বাস্তবে ওরা তাদের রূপ নেয়া শয়তান হবে। সেখানে কোন জাদু নেই, কেবলই প্রতারণা! এবং সবচেয়ে খারাপ ধরনের ছলনাও, কারণ এটি লোকেদের জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে! দাজ্জাল তখন মুহাম্মদের ধর্মের সত্যিকারের বিশ্বাসীদের দেশে খরার সৃষ্টি করবেন, কিন্তু তিনি তার নিজের অনুসারীদের প্রাচুর্যে ভরে দেবেন। তিনি যে শক্তি অর্জন করেছিলেন তাতে উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি ইয়াছরিব ও মক্কায় আক্রমণ করবেন, কিন্তু সেখানের সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা

ফেরেস্তাদের সাথে তিনি শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে পারবেন না। তাদের শক্তি দেখে হতাশ হয়ে দাজ্জাল সিরিয়ায় ইমাম মাহদীর সাথে শক্তি প্রদর্শনের জন্য উত্তরের অভিমুখে তার বাহিনীকে নেতৃত্ব দেবেন।

মুহাম্মদ আরও একটি নামাজ বিরতি নিলেন, এটি বিকেলের নামাজের জন্য। নিখুঁত প্রার্থনায় সিজদা এবং সুরেলা কণ্ঠে আয়াতগুলির তেলাওয়াত শেষে, মুমিনদেরকে যীশুর প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে জানাতে তিনি সমাবেশের খালি জায়গা থেকে মঞ্চে এসে উঠলেন। খ্রিস্টানদের দাবি করে যীশু ক্রুশে নিহত হয়েছেন, কিন্তু এটি সঠিক নয়, বরং তাঁকে শেষ নৈশভোজের সময়ে ভোজকক্ষের ছাদের একটি ফুটো দিয়ে বেহেশতে (স্বর্গে) তুলে নেয়া হয়েছিল। দাজ্জালকে পরাভূত করাই মরিয়মের পুত্র যীশুর অন্যতম উদ্দেশ্য, যে দাজ্জাল এখন সিরিয়ায় ইমাম মাহদীকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করছেন। জাফরানের হালকা রঙিন পোশাক পরে যীশু বেহেশত থেকে নেমে আসবেন। হয় তিনি মেঘের উপর নেমে আসবেন অথবা দু'জন ফেরেস্তার কাঁধে হাত রেখে নামবেন। যদি তিনি স্বর্গদূতদের সাথে অবতীর্ণ হন তবে তারা তাকে দামেস্কের একটি মসজিদের কাছে নামিয়ে দেবেন, যেখানে ইমাম মাহদী ফজরের নামাজে আটশোত পুরুষ এবং চারশো নারী সহ মোট বারোশত ঈমানদার মুমিনের নেতৃত্ব দেবেন। মাহদী প্রার্থনা শুরু করার আগমুহূর্তে যীশু পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করবেন এবং মুমিনরা তখন তাদের মনের মধ্যে একটি আওয়াজ শুনবে। তারা শুনবে, "তোমাদের আবেদন যিনি শুনবেন তিনি এসেছেন!" যীশু নিজেকে পরিচয় করিয়ে দেবেন, মাহদী তাকে নামাজের ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করবেন, কিন্তু যীশু সম্মানের সাথে তাতে অমত করবেন এবং তাকেই ইমামতি চালিয়ে যেতে বলবেন। নামাজের পরে যীশু ঘোষণা করবেন যে, সবেমাত্র দামেস্কের দরজায় পৌঁছে যাওয়া দাজ্জাল শীঘ্রই মরবে। যীশুকে কেবল নিঃশ্বাস ফেলতে হবে, আর যতদূর চোখ যাবে তার প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে কাফেরদের লাশ পড়বে। যীশু দামেস্কের দরজায় যাবেন। তার নিঃশ্বাসের প্রভাবে প্রকৃত মুমিনরা পর্বত থেকে নেমে আসবে, এবং তারা দাজ্জালের বাহিনীকে ধ্বংস করবে। বর্ম পরিহিত হয়ে এবং দুটি তলোয়ার ও একটি ঢাল নিয়ে যীশু যুদ্ধের ময়দানে ধীরে ধীরে দাজ্জালের দিকে এগিয়ে যাবেন। তিনি শহরের একটি দরজার সামনে চূড়ান্ত মোকাবেলা করে তাকে মেরে ফেলবেন এবং শয়তানের রক্তে তার ঢালটি রাঙিয়ে তারপর যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে যাবেন।

অবশেষে দাজ্জালের সমস্ত অনুসারী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং এরপরে যীশু পৃথিবীর সমস্ত শুকর সহ ঘৃণ্য প্রাণীদেরকে মেরে ফেলবেন, কারণ তারা নিজেদের মলমূত্র খায়। তিনি তার সম্পর্কে তৈরি হওয়া নকল ধর্মের ক্রসকেও ধ্বংস করবেন যে ধর্মে তার সমন্ধে ভুলভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি ক্রুশে মারা গিয়েছিলেন এবং তাকে পুনরুত্থিত করা হয়েছিল। অথচ সত্যিটা হচ্ছে, তার জায়গায় অন্য কেউ একজন স্বেচ্ছায় মারা যেতে এগিয়ে এসেছিল। যীশু এটি পরিষ্কার করে দেবেন যে, তিনি নশ্বর, তিনি আল্লাহর রাসূল মাত্র, যেই সত্যকে ইহুদিরা অস্বীকার করেছিল। দাজ্জালের হত্যার পর খুব শীঘ্রই ইমাম মাহদী মারা যাবেন এবং যীশু তখন খলিফা তথা মুমিনদের সর্বাধিনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করবেন। যীশু মুহাম্মদের কবর জিয়ারত করবেন যেখানে তিনি ঈশ্বরের শেষ ও চূড়ান্ত রাসূলকে শ্রদ্ধা জানাবেন।

তবে দাজ্জালের মৃত্যু সত্ত্বেও সবচেয়ে খারাপ সময় শেষ হয়নি। আল্লাহ যীশুর সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে থাকবেন। একপর্যায়ে আল্লাহ তাকে জানিয়ে দেবেন যে, তিনি ইয়াজুজ এবং মাজুজের বাসিন্দাদের তাদের দূরবর্তী লোহার কারাগার থেকে মুক্তি দিচ্ছেন এবং তারা তাদের সমস্ত ক্রোধ নিয়ে এগিয়ে যাবে। তারা এতবড় একটি সেনাদল নিয়ে পুরো দেশ জুড়ে এমন দাবানল ছড়িয়ে দেবে যে, এই সেনাদলর মাত্র অর্ধেক সৈন্য টাইবেরিয়াস হ্রদ (Sea of Galilee) থেকে সমস্ত পানি পান করতে সক্ষম হবে। এটি শুকনো হ্রদ অববাহিকায় পরিণত হবে। তারা জেরুজালেমে পৌঁছে ঘোষণা করবে, "আমরা পৃথিবীর লোকদের জয় করেছি, এখন আমরা আকাশে যারা আছে তাদেরও ধ্বংস করব"। ততক্ষণে যীশু এবং তার অনুসারীরা সিনেই পর্বতে (Mount Sinai) পালিয়ে যাবেন এবং তারা ক্ষুধা ও কষ্টে ভুগবেন। যীশু আল্লাহর কাছে স্বস্তির জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ তার প্রার্থনার প্রতি সম্মান দেখাতে ইয়াজুজ এবং মাজুজ সেনাদলর ঘাড়ে ফোড়া সৃষ্টি করবে। তাদের সবারই দ্রুত কিন্তু বেদনাদায়ক মৃত্যু হবে। এরপরে যীশু এবং তার অনুসারীরা সিনেই থেকে নেমে আসবেন এবং তারা পচা

লাশের সমুদ্র দেখতে পাবেন যা নিদারুণ এক দুর্গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে দেবে। এরপর যীশু এই লাশের সমুদ্র থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া (প্রার্থনা) করবেন এবং আল্লাহ উটের মতো মোটা গলাবিশিষ্ট অনেক পাখি প্রেরণ করবেন, এবং তারা তাদের ঠোঁটে করে লাশগুলো ধরে নিয়ে দূরে সাগরে ফেলে দেবে।

তখন থেকে যীশুর রাজত্ব হবে স্বপ্নের মত। তিনি একজন ন্যায়বিচারক এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক হবেন যিনি মুহাম্মদ ও তার সুন্নাহর শিক্ষার প্রচার করবেন, আল্লাহর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বার্তাবাহক হিসেবে মুহাম্মদের অনুকরণীয় জীবন ব্যবস্থাকে তিনি ফলো করবেন। মুহাম্মদ দুনিয়াতে যে শরিয়া নিয়ে এসেছিল তা দুনিয়াতে মুমিনদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সমস্ত কাফেররা তখন ধর্মান্তরিত হবে বা মারা যাবে, কেবল মুমিনরাই বেঁচে থাকবে, আর তাই পবিত্র ধর্মযুদ্ধ (জিহাদ) এবং পরাধীন কাফেরদের থেকে জিজিয়া (অমুসলিমদের কাছ থেকে নেয়া কর) নেয়ার আর দরকার পড়বে না। বিশ্বজুড়ে শান্তির রাজত্ব কায়েম হবে, এমনকি বন্যপ্রাণী, সাপ এবং বিচ্ছুগুলিও শান্ত হয়ে যাবে। মেষশাবক সিংহের সাথে শুয়ে থাকবে। তখন সম্পদ এত বেশি হবে যে, কারও কিছুরই অভাব হবে না। পৃথিবী ফলফলাদির ভান্ডারে পরিণত হবে। একটা ডালিম এত বড় হবে যে, সেটা দিয়ে পুরো সম্প্রদায়কে খাওয়ানো যাবে এবং উতপ্ত সূর্যের আলো থেকে বাঁচার জন্য ডালিমের খোসাকে ছায়াদার হিসেবে ব্যাবহার করা হবে। প্রতিটি পরিবারের প্রয়োজনের জন্য একটি উট এবং ছাগল থাকবে। যীশুর মতো ধার্মিক শাসকের তত্ত্বাবধানে, লোকেরা জীবনের অন্য যেকোন কিছুর ভালোবাসার চেয়ে মুহাম্মদের সালাতের নিয়মগুলোর প্রতি বেশি ভালোবাসা প্রকাশ করবে, এবং তারা আনন্দের সাথে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে। যীশু পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন এবং শাসনকালের আরো উনিশ বছর থাকাকালীন তিনি বিয়ে করবেন এবং তার সন্তান হবে। তিনি মারা গেলে তাকে মুহাম্মদের কবরের পাশে দাফন করা হবে।

অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পরেও মুহাম্মদ একটানা ভয়ের বয়ান অব্যাহত রাখলেন। তারপর একদফা দোয়া অনুষ্ঠিত হলো। মশাল জ্বালানো হয়, চারদিকে তখন শয়তানি আলোর ঝলকানি। মুহাম্মদ মঞ্চে ফিরে এসে কোমরে হাত রেখে দাঁড়ালেন। তাকে একটি প্রশ্ন করা হলো "হে আল্লাহর রাসূল, তখন কি বিশ্বাসীরা জান্নাতে থাকবে না? আপনি যা বর্ণনা করলেন তাতো জান্নাত।"

"না!" - মুহাম্মদ আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে গর্জে উঠলেন। "আমি কি তোমাকে কেয়ামতের শেষ চিহ্নগুলি, ধোঁয়ার কথা এবং যেদিন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উত্থিত হবে, মাটির নিচ থেকে প্রানি বের হবে এবং কাবাকে ধ্বংস করা হবে এসব কথা বলিনি? আমি কি এখনও তোমার সাথে প্রলয়-শিংগা সম্পর্কে কথা বলিনি?"

তার ধর্মসভা একটানা চলছে, মুহাম্মদ বারোঘন্টা আগে যেমনভাবে শুরু করেছিলেন তেমনই পূর্ণ শক্তিতেই। তিনি তার মজলিসে যন্ত্রণাময় কল্পনাগুলো একে একে বয়ান করে যাচ্ছিলেন - যীশুর মৃত্যুর পরে অন্য শাসকরা আসবে এবং আবারও অরাজকতা ও অবনতি ধীরে ধীরে সমাজে প্রবেশ করবে। একপর্যায়ে আল্লাহ এক ঘন কুয়াশা বা ধোঁয়ায় আকাশ ঢেকে দেবেন এবং এই অবস্থা চল্লিশ দিন চলবে। এই ধোঁয়া ঈমানদারদের অসুস্থ করে তুলবে এবং যারা কুফরিতে লিপ্ত ছিল তারা অজ্ঞান হয়ে পড়বে। এটি শেষ হবে যখন একটি রাত তিনদিনের সমান স্থায়ী হবে। তারপরে একটি মহাজাগতিক বিশৃঙ্খল ঘটনা ঘটবে - সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠবে এবং এর রশ্মিগুলি অত্যন্ত নিস্তেজ হয়ে যাবে । মধ্যাহ্নের সময় এটি নিজেই জ্বলে উঠবে এবং তারপরে সূর্যটি যেখানে সাধারণত অস্ত যাওয়ার কথা সেখানেই অস্ত যাবে। সূর্য যখন তার জায়গাই ফিরে যাবে সেই মুহূর্তটি বিশ্বাসীদের জন্য তাদের পাপের অনুশোচনা (তাওবা) করার কিংবা অবিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর উপর ঈমান (বিশ্বাস) স্থাপন করার সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। কর্মফল ভোগ করার জন্য তখনই তাদেরকে আবদ্ধ করে ফেলা হবে।

এবং তারপরে মহান আলামতটি দেখা দেবে হবে - কাবার নিকটে একটি ভূমিকম্পে পৃথিবী বিভক্ত হয়ে যাবে এবং সেই ফাটল দিয়ে আরবি ভাষায় কথা বলা বিরাট এক জন্তু বের হয়ে আসবে। মাথা থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলে এটি কাবার দিকে রওনা হবে এবং একে দেখে সমস্ত লোকেরা পালিয়ে যাবে না তাদের মুখমণ্ডলগুলি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করবে।

কাবা থেকে শুরু করে এই জন্তুটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিশ্বভ্রমণ করবে। আল্লাহর আদেশে মুমিনদের মুখ সে উজ্জ্বল করে দেবে, আর কাফেরদের মুখ কালো করে দেবে। এইভাবে সমস্ত মানবজাতিকে বিভক্ত করা হয়ে গেলে পশুটি অদৃশ্য হয়ে যাবে। তারপর দক্ষিণ দিক থেকে একটি সুগন্ধযুক্ত বাতাস সারা বিশ্বে প্রবাহিত হবে এবং উজ্জ্বল মুখযুক্ত সমস্ত মানুষগুলো মারা যাবে। কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর অবিশ্বাসী কালো মুখধারী কাফেররাই বেঁচে থাকবে। এই কালো বাহিনীই কাবা ধ্বংস করবে। কলঙ্কজনক এবং অকল্পনীয় সব ঘটনা ঘটতে থাকবে তখন। কোরআনের বাণীগুলো তার পৃষ্ঠা থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে, এবং কেউ আল্লাহকে ভয় করবে না বা তাঁর রাসুল মুহাম্মদের কথা মানবে না। দুর্নীতি, শয়তানি, অনৈতিকতার মধ্য দিয়ে মানুষ তার আচরণের সবচেয়ে খারাপ স্তরে নিপতিত হবে। স্বৈরাচারীরা তাদের প্রজাদের উপর কঠোরতম শাস্তি প্রদান করবে এবং পিছিয়ে পড়া মুর্খ জনগণ রক্তপাত ও নৈরাজ্যের শিকার হবে। এমন অজ্ঞতা বিরাজ করবে যে, কোন একজন পুরুষ, নারী বা শিশু আল্লাহর নাম উচ্চারণও করবে না। ঠিক সেই মুহূর্তে ইয়েমেনে একটি মারাত্মক দাবানল ছড়িয়ে পড়বে এবং যা উত্তর দিকে ধাবিত হবে। লোকেরা এটা থেকে পালিয়ে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করবে এবং যখন সবাই সিরিয়ায় একত্রিত হবে, তখনই এই আগুনের অবসান হবে। এটিই কিয়ামতের চূড়ান্ত নিদর্শন, মুহাম্মদ ঘোষণা করেছেন, সেই মুহূর্তে যখন ইস্রাফিল ফেরেস্তা কেয়ামতের ঘোষণা দেয়ার জন্য শিংগা বাজাবেন। প্রথমে কেউ খেয়াল করবে না, তবে শব্দের তীব্রতা বজ্রের চেয়ে আরও জোরে বৃদ্ধি পাবে, এবং আতঙ্কে লোকেরা হতভম্ব হয়ে পড়বে। কারণ, এটিই সৃষ্টির চুড়ান্ত ধ্বংসের শব্দ হয়ে উঠবে; সমুদ্র পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়বে, পর্বতগুলি ভেঙ্গে যাবে, আকাশগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে ভেঙে পড়ে যাবে, এবং চাঁদ, তারা এবং সূর্য টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে, কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। এর মাধ্যমে পুনরুত্থানের সূচনা হবে। সমস্ত লোকেদের যাদের অস্তিত্ব ছিল, তাদের মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করা হবে। তারা মাংসে পুনরুত্থিত হবে। কাঁপতে কাঁপতে তারা আল্লাহর নিকট থেকে তাদের ভাগ্য নির্ধারণের অপেক্ষায় থাকবে। মুহাম্মদ তার কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে ভয় উদ্রেককারী একটানা বয়ানের শেষ পর্যায়ে চলে আসেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তার পুরো বয়ানকে কোরআনের উদ্ধৃতিসমূহ দিয়ে সংযুক্ত করেন। তিনি এই কথাটি দিয়ে শেষ করেন : "সেই দিনটিতে মানুষ কান্না করবে", "পালানোর মতো জায়গা কোথায়? সব বিফলে যাবে — কোনও আশ্রয় নেই, আপনার পালনকর্তার কাছেই সেদিন একমাত্র আশ্রয় মিলবে" (১০)।

এই ধরনের ভয় সঞ্চারকারী মাহফিলগুলো তার অনুগামীদের মধ্যে বেশকিছুকে মানসিকভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে তুলত, এবং এদের কেউ মানসিক রোগীর মত আচরণ শুরু করলে মাঝে মাঝে তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে পরামর্শ দিতে হত। যেদিকেই তারা তাকাত, শুধু কেয়ামতের আলামতই দেখতে পেত। এরকম একটানা বয়ানের পরে মুহাম্মদের বেশ কয়েকজন সাহাবি তার কাছে এসে জানায় যে, তারা খেজুর বাগানের মাঝে একটি তালগাছে দাজ্জালকে দেখতে পেয়েছে। তাদের মুখমণ্ডল বেশ বিমর্ষ দেখাচ্ছিল এবং মুহাম্মদ তাদেরকে ভয় না পেতে উৎসাহ দিয়ে বললেনঃ "আমি তোমাদের মধ্যে থাকাকালীন যদি সে বেরিয়ে আসে, তবে আমি তোমাদের পক্ষ হয়ে তার বিরুদ্ধে লড়াই করব" (১১)। তবে, দাজ্জাল যদি তার মৃত্যুর পরে আসে তবে তাকে মোকাবেলার জন্য আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতে হবে। মুহাম্মদ তার বিমর্ষ অনুসারীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, শয়তানের মুখোমুখি হলে তাদের উচিত কোরআনের অধ্যায়গুলি থেকে শুরুর আয়াতগুলো তেলাওয়াত করা। আয়াতগুলো তাদের খারাপ যেকোন কিছু থেকে রক্ষা করবে। তিনি তাদেরকে কোরআনের ১৮ নম্বর সূরা পাঠ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে সুরাটি তাদেরকে এ জাতীয় (শয়তান বা দাজ্জালের আক্রমণ) পরিস্থিতিতে সাহায্য করবে; এবং তিনি তাদের স্মৃতিকে সতেজ করার জন্য এটি আবৃত্তিও করেছিলেন।

দাজ্জালের উপস্থিতির সময় সম্পর্কে মুহাম্মদ নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি ইতিমধ্যে বিশ্বে জন্মগ্রহণ করতে পারেন, তবে দাজ্জাল মুহম্মদের মৃত্যুর কয়েক বছর না যাওয়া অবধি তার উপস্থিতি প্রকাশ করবে না। দাজ্জালকে একটি দ্বীপে দেখা গিয়েছে, এমন একটি সংবাদ মুহাম্মদের ভবিষ্যদ্বাণীকে আরেকটু গতি দিয়েছিল। আর এই সংবাদ এনেছিল তামিম দারি (Tamim

Dari) নামের গাজা থেকে সাম্প্রতিক সময়ে ধর্মান্তরিত হওয়া একজন ব্যক্তি (১২), যিনি মুহাম্মদকে বলেছিলেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে দ্বীপটিতে দাজ্জালকে দেখেছেন এবং কুড়িদ বর্ণনা দেয়ার পর মুহাম্মদ নিশ্চিত হলেন যে সে মিথ্যা বলছে না।

এই সংবাদ শুনে উত্তেজিত হয়ে মুহাম্মদ বিশ্বস্তদের মসজিদে বিশেষ ঘোষণার জন্য ডেকে আনতে দূত প্রেরণ করলেন। শত শত মুমিনরা যে যা কাজ করছিল তা ফেলে রেখে মসজিদে জড়ো হয়েছিল। তাদের নামাজে ইমামতি করার পরে মুহাম্মদ মুখে এক আগ্রহী হাসি নিয়ে তার সচরাচর জায়গা মিম্বারের আসনে গেলেন। তিনি বললেন, "তোমরা কি জান যে, আমি কেন তোমাদের জড়ো হতে বলেছি?" মুমিনদের বেশিরভাগ সেই বাধ্যতামূলক জবাব দিল – "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন"। মুহাম্মদ তখন বলেছিলেনঃ "আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের কোন উপদেশ বা সতর্কতা দেবার জন্য জড়ো করিনি। তবে আমি তোমাদের এখানে এনেছি, কারণ একজন খ্রিস্টান তামিম দারি যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, আমাকে এমন কিছু বলেছে যার সাথে দাজ্জাল সম্পর্কে আমার বলা কথার মিল আছে"(১৩)।

মুহাম্মদ ধর্মান্তরিত তামিম থেকে যা শুনেছিলেন তা হুবহু বলতে লাগলেন : তামিম ত্রিশজন লোকের সাথে বণিক জাহাজে ছিলেন। জাহাজটি ঝড়ের কবলে সমুদ্রের কাছে হারিয়ে যায় এবং একটি দ্বীপে এসে আছড়ে পড়ে। তারা নৌকাগুলি নিচে নামিয়ে উপকূলে চলে এসে লোম আচ্ছাদিত একটি বিশাল জন্তু দেখতে পেলেন, যার সামনে আর পেছনে দেখতে একইরকম। তারা বলল, "তোমার প্রতি সমবেদনা, কে তুমি?" প্রানীটি বলল "আমি জুরাসা (Jurassa)"। তারা তার সম্পর্কে মুহাম্মদ সম্পর্কিত আরও খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করেছিল, তবে প্রাণীটি উল্টা তথ্যের জন্য তাদের প্রলুব্ধ করছিল এবং বলেছিল যে, তারা যথাসময়ে তার সম্পর্কে জানতে পারবে। এদিকে, তাদেরকে আশেপাশে কোন মানুষ বা কোন আশ্রমের সন্ধানে বের হতে হবে যেখানে কেউ তাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আটকা পড়ে থাকা নাবিকরা এই ভয়ে পথ চলতে লাগল যে, তারা হয়ত কোন শয়তানের খপ্পরে পড়তে যাচ্ছে, কিন্তু তারা তখন এমন এক লোককে পেয়েছিল যার হাত তার ঘাড়ের পেছনে বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং যার পায়ে লোহার বেড়ি পরানো ছিল। নাবিকরা বন্দিকে দেখে বলেছিল : "তোমার প্রতি সমবেদনা, তুমি কে?" লোকটি তার শেকলগুলিতে হিংস্রভাবে টান দিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলল "শীঘ্রই আপনারা আমার সম্পর্কে জানতে পারবেন, তবে আপনারা কারা আমাকে বলুন"। তারা আরব থেকে এসেছে জানার পরে বন্দী তাদেরকে একাধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল, যার মধ্যে একটি টাইবেরিয়াস হ্রদের সম্পর্কিত ছিল। জবাবে বলেছিলেন, "আপনি এটি সম্পর্কে কী জানতে চান?" শৃঙ্খলে থাকা লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, "এতে কি পানি আছে?" তারা তাকে জানিয়েছিল যে, এতে প্রচুর পরিমাণে পানি রয়েছে। তিনি জবাব দিয়ে বললেন, "আমি মনে করি এটি শীঘ্রই শুকিয়ে যাবে"। অতঃপর তিনি তাদেরকে নিরক্ষর নবী সম্পর্কে বলার জন্য অনুরোধ করলেন এবং আরবরা জবাব দিল যে, তিনি মক্কা থেকে ইয়াছরিবে গিয়েছিলেন এবং তার বিরোধীদের অনেককে পরাস্ত করেছিলেন, যারা এখন তার কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেছে। তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যক্তি তার পরিচয় প্রকাশ করে বলল, "আমি দাজ্জাল"। শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই তার শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে সবকিছু ধ্বংস করে ফেলবেন, মক্কা ও ইয়াছরিব বাদে কোনও শহরকে ছাড়বেন না। এই দুটো শহর কেবল তার জন্য নিষিদ্ধ। তিনি যদি ওদের কাছে যান, তলোয়ার দিয়ে সজ্জিত ফেরেস্তারা তার পথ আটকে দেবে।

তামিমের কাছ থেকে তিনি যে কাহিনী শুনেছিলেন, তা পুনর্বিবেচনা করতে গিয়ে মুহাম্মদ উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে পড়লেন। টাইবেরিয়াস জলাশয় শুকিয়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ হতে পারে প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত ইয়াজুজ-মাজুজ কর্তৃক তার জল পান করা; এবং স্বর্গদূতদের সারি মক্কা ও মদিনায় যাওয়ার পথে দাজ্জালকে বাধা দেয়া! এই দুটো ছিল তার ভবিষ্যদ্বাণীগুলির নিশ্চিতকরণ নিদর্শন - "আমি কি আপনাকে এরূপ কোনও বিবরণ বলিনি?" (১৪)। কিন্তু মুহাম্মদ তামিমের সাথে একটু দ্বিমতও পোষণ করলেন এই বলে যে, দাজ্জাল ইয়াছরিবের পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিমের কোথাও থাকার কথা এবং সে সম্ভবত কোনও দ্বীপে বন্দি হয়ে আছে। এটি ভূমধ্যসাগর বা লোহিত সাগরের কোথাও হবে। তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করেছিলেন যে, দাজ্জাল এবং তার

সেনাদল পূর্বদিক তথা পারস্য থেকে অগ্রসর হবে। উত্তেজনায় ফেটে গিয়ে মুহাম্মদ তার লাঠিটা দিয়ে মেঝেতে আঘাত করলেন, আর সেটিকে পূর্ব দিকে তাক করে রাখলেন। তিনি বললেন, অশুভ দাজ্জাল আসবে ঐ দিক থেকেই।

তামিম নামে একজন মদ ব্যবসায়ী পর্যটক গল্পটির রহস্যময়তা বিচার করে, মুহম্মদের শেষ সময়ের ঘটনাবলী জেনে থাকতে পারেন। এবং তিনি মুহাম্মদের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে দ্বীপের গল্পটির অবতারণা করেন। ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি বছরের পর বছর মক্কা আর ইয়াছরিবে যাতায়াত করেছেন, আর মুহাম্মদের কাফেলার সাথীদের সাথে আলাপের বিষয়বস্তু থেকে মুহাম্মদের পদক্ষেপ সম্পর্কে জেনে থাকা তার জন্য সহজ ছিল। খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, পুনরুত্থানবাদী আর খৃস্টবিরোধীদের চারদিকে বেশ কিছু গল্প ভেসে বেড়াচ্ছিল। একজন খ্রিস্টান হিসেবে তামিম সেগুলোর মধ্যে কিছু শুনে থাকবেন, এবং এই ঘটনার সাথে খাপ খাওয়াতে বিশেষ এই গল্পটির কাটছাঁট করা তার কাছে খুবই সহজ একটা কাজ ছিল। তামিম ছিলেন এক বিচক্ষণ লোক, সুযোগ সন্ধানীও যিনি মসজিদে যাওয়া আর মুহাম্মদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করার আগে বেশ পরিশ্রম করেছেন। মুহাম্মদ যা শুনতে চেয়েছিলেন তিনি সেটাই মুহাম্মদকে বললেন, আর মুহাম্মদ সেই টোপ, দড়ি আর খাবার সবটাই গিলেছিলেন। তামিম শেষপর্যন্ত মুহাম্মদের উপদেষ্টা হয়েছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে খলিফাদের অধীনে তাকে জর্ডানে একটা তালুক দেয়া হয়েছিল।

মুহাম্মদের শেষ সময় বা কেয়ামত নিয়ে অত্যধিক উৎকণ্ঠা তার অনুসারীদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে, এবং তারা সর্বত্র দজ্জালের (Dajjal) আলামত খুঁজে বেড়াতে থাকে। তিনি প্রতিটি কোণে ছিলেন; সর্বদা পাথরের পেছনে আটকে ছিল; এমনকি প্রতিটি খেজুর গাছের প্রতিটি পাতায়ও তারা দাজ্জাল খুঁজে পেত। এটি অনিবার্য ছিল যে, শেষপর্যন্ত কেউ না কেউ শয়তান হিসেবে চিহ্নিত হবে। এটির সমাপ্তি হল, যখন সংখ্যালঘু ইহুদি গ্রামের বারো বছর বয়সী রোগাপাতলা এক ছেলে মুহাম্মদের ক্রোধ থেকে রক্ষা পায়। তার ডাক নাম ছিল সাফ (Saf), আর সে ছিল সাইয়াদ (Sayyad) নামে এক লোকের সন্তান। ছোট থেকেই ছেলেটি ভবিষ্যৎ বলতে পারার এক প্রতিভা নিয়ে সবার মাঝে এসেছিল, এবং লোকেরা পরামর্শ বা ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতে তার কাছে আসত। দাজ্জাল-উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ার পরে সাফ সন্দেহভাজনদের এক নম্বরে পরিণত হয়। গুজব রটে গিয়েছিল যে, নিজেকে ঈশ্বরের রাসূল বলে প্রচার করার জন্য সাফ বড় মাপের ছলাকলা অবশ্যই কিছু করবেন। মুহাম্মদ এটা আঁচ করতে পেরেছিলেন, এবং একদিন তিনি উমর ও অন্যদের সাথে বিষয়টার তদন্ত করতে বেরিয়ে যান। তারা ছেলেটিকে অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে খেলতে দেখলেন। মুহাম্মদ তার পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন, “ইবনে সাইয়াদ, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে আমি আল্লাহর রাসূল?”
যদিও মুহাম্মদের সাথের লোকজন ইবনে সাইয়াদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, বিশেষতঃ উমর যিনি এদের মাঝে সবচেয়ে লম্বা এবং বলিষ্ঠ ছিলেন। অবশ্য ছেলেটিও মোটেও নড়বড়ে ছিল না। সাফ বলল, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিরক্ষরদের রাসূল”। এর মানে হচ্ছে, মুহাম্মদ আরবদের রাসূল যারা মূলত অশিক্ষিত, কিন্তু শিক্ষিত ইহুদিদের রাসূল না। সে উল্টো মুহাম্মদকে চ্যালেঞ্জ জানালো : “আপনি কি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে আমিই আল্লাহর রাসূল?” (১৫)

ততদিনে খুব কম লোকই মুহাম্মদের সাথে ঠাট্টা করে কথা বলত। তিনি ছেলেটির সরু কাঁধে চেপে ধরে বললেন, “তোমার কাছে কি ধরনের স্বপ্ন আছে?”

সাফের উত্তর রহস্যজনক ছিল, সে বলল “যে সত্য কথা বলে সে এবং যে মিথ্যা বলে সেও আমার কাছে আসে”।

মুহাম্মদ তাকে জানালেন যে, তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন এবং তিনি মনে মনে কি কি ভাবছেন তা জানিয়ে তার ক্ষমতা প্রমাণের জন্য তাকে চ্যালেঞ্জ দিলেন। যদি ছেলেটি সত্যই মহান ছলাকার হয়, তবে সে মুহাম্মদের মনে যে ভাবনা আছে তা

জানার কথা। শেষ সময়ে করণীয় নিয়ে মক্কায় রচিত একটা সূরার (অধ্যায়ের) একটা পংক্তি (আয়াত) আছে 'ধোঁয়া' (দুখান) নামে। আয়াতটি এমন – "অতপর অপেক্ষা করো সেই দিনের জন্য, যখন আকাশে একটি দৃশ্যমান ধোঁয়া দেখা দেবে" (১৬)।

মুহাম্মদ জিজ্ঞেস করলেন, "বল তো আমি কি ভাবছি?"
সাফ 'ধোঁয়া' শব্দটি বেছে নিল, তবে তার উত্তরটা শেষ সময়ের (কেয়ামতের) সম্পর্কিত ছিল না। সে কেবল উত্তর দিল "ধোঁয়া"।

মুহাম্মদ উল্লসিত হয়ে গেলেন। এটি দাজ্জালের সূত্র খুঁজে পাওয়ার একটা মুহূর্ত ছিল। ছেলেটি ভালো, সত্যিই দারুণ, তবে তার দক্ষতা একজন তান্ত্রিকের স্তরের উপরে ওঠেনি। হ্যাঁ, যা অন্যকে শুনতে দেয়া হয়নি তার তাই শোনার দক্ষতা ছিল। তবে মুহাম্মদ বিশ্বাস করতেন যে, এই জাতীয় লোকেরা খারাপ জীনের কাছ থেকে তাদের জ্ঞান অর্জন করত, মুহাম্মদের মতো সম্পর্কযুক্ত উঁচু কোন উৎস থেকে নয়। একটি জিন মুহাম্মদের মন থেকে 'ধোঁয়া' শব্দটি বেছে নিয়ে ইবনে সাইয়াদের (সাফ) মনে জানিয়ে দিয়েছিল। জিনরা ক্ষতিকর গুজব ছড়াত, যারা একজন ব্যক্তির মন থেকে জিনিসগুলি বেছে নিত এবং অন্য ব্যক্তির কাছে তা সরবরাহ করতে পারত। তবে তারা ভালো বার্তাবাহক ছিল না, বরং তারা বিচ্ছিন্ন কিছু বার্তা প্রচার করত। মুহাম্মদ তাই মোটামুটি নিশ্চিত ছিলেন, যদিও সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে ওঠে নিশ্চিত ছিলেন না যে, সাফ তথা ইবনে সাইয়াদই সেই ভয়ঙ্কর দাজ্জাল ছিলেন না। তিনি তাই ইবনে সাইয়াদের কথা বাতিল করে দিয়ে বলেছিলেন, "তুমি নিজের পদমর্যাদার চেয়ে বেশি আর কিছু পেতে পার না"। এর অর্থ, সাইয়াদের পুত্র এক তান্ত্রিক ছাড়া আর কিছুই না। মুহাম্মদের সাথে ছেলেটি এরকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভঙ্গিতে কথা বলছে দেখে উমর বেশ হিংস্র হয়ে গেলেন। ছেলেটির সাথে মুহাম্মদের কথা বলা শেষ হবার পর উমর তার তলোয়ার হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন "আমি কি তার মাথা কেটে দেব, মুহাম্মদ?"

মুহাম্মদ তার হাত ধরে বললেন, "যদি সে কেয়ামতের সময় উপস্থিত হওয়া দাজ্জাল হয়, তবে তুমি তাকে পরাভূত করতে পারবে না। আর যদি সে তাই না হয় তবে তাকে হত্যা করে তোমার কোন উপকার হবে না"। গল্পটির অন্য একটি সংস্করণে মুহাম্মদ বলেছিলেন যে, কেবলমাত্র যীশুই দাজ্জালকে হত্যা করতে সক্ষম হবেন।

সাইয়াদের পুত্রের প্রতি মুহাম্মদের আগ্রহ ছিল প্রচুর। সে যে দাজ্জাল নয় এই ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত হননি। সম্ভবত তিনি আশা করেছিলেন যে, সে যেন দাজ্জালই হয়, যার অর্থ দাঁড়াবে যে, কেয়ামত তার খুবই সন্নিকটে বা একেবারে হাতের মুঠোয়। পরে তিনি এর শেষ দেখার জন্য আরও একটি প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। এবার তার সাথে সাক্ষাতের ঘটনাটির প্রমাণ ধরে রাখার জন্য তিনি সাথে করে এক লিপিকার নিয়ে যান। সেই বিশেষ দিনটিতে, সাফ একটি তালগাছের ছায়ায় ঘুমাচ্ছিল। মুহাম্মদ সেই লিপিকারকে সাথে নিয়ে বাগানের ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সেখানে পৌঁছে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন, এই আশায় যে ছেলেটি ঘুমের মাঝে কথা বলে উঠবে। এটি নিঃসন্দেহে ইঙ্গিত দেবে যে, সে নিজে শয়তানের সাথে কথোপকথন করছে। তবে সাফের মা তাকে খুঁজে বের করলেন এবং তার ছেলেকে সতর্ক করলেন যে, মুহাম্মদ গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে। ছেলেটি লাফ দিয়ে ওঠে পড়ে আর মুহাম্মদের দিকে তাকায়। হতাশ মুহাম্মদ পরে তার সঙ্গীকে বললেন, "নারীটি যদি তার ছেলেকে একা ছেড়ে দিত, সে সবকিছু পরিষ্কার করে দিত"(১৭)।

মহাপ্রতারক হিসেবে সবার সন্দেহ থেকে সাইয়াদের ছেলে সাফ কখনোই নিজেকে বের করে আনতে পারেনি। সে যেখানেই গেছে, লোকেরা তার দিকে ইশারা করত। অবশেষে সে মুহাম্মদের ধর্মে যোগ দিয়েছিল, তবে তাতে কিছুই হেরফের হয়নি; লোকেরা তখনও তাকে দাজ্জাল হিসেবে বিবেচনা করত। মুহাম্মদের মৃত্যুর একদশক পর সে মক্কায় একটি তীর্থযাত্রায় ছিল, যখন সে মুহাম্মদের অনেক যুদ্ধের সাথী একজন প্রবীণ ব্যক্তির সাথে শিবির স্থাপন করেছিল। তাকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে প্রবীণ লোকটি তাকে দূরে সরে যেতে বলেছিল। গভীরভাবে আহত হলেও সাফ ছাগলের তাজা দুধ সরবরাহ করে সেই

প্রবীণ লোকটির মন ভোলানোর চেষ্টা করেছিল। সবার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যানের কারণে সে কিভাবে ফাঁসিতে ঝুলতে চেয়েছিল, এই কথা বলতে গিয়ে সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। এই ধরনের প্রত্যাখ্যান একজন মানুষকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।



["আমি কি তার মাথা কেটে ফেলব, মুহাম্মাদ?" এক ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা বালককে হত্যা করার জন্য উমর তার তলোয়ার বের করেন যাকে মুহাম্মদ ভয়ঙ্কর দাজ্জাল তথা শয়তান বলে সন্দেহ করতেন। মুহাম্মদ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, কেয়ামতের দিনটি সামনে ঘনিয়ে আসছে এবং এর অন্যতম লক্ষণ হবে দাজ্জালের উপস্থিতি। ছেলেটি একজন প্রতিভাশালী ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, যার গোপন বিষয় সম্পর্কে কথা বলার দক্ষতার কারণে লোকজন তাকে ভয় পেত। এখানে মুহাম্মদ তাকে পরীক্ষা করছেন এবং এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, সে একজন তান্ত্রিক ছাড়া বেশি কিছু না]

ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে প্রচলিত সংস্কারগুলোর প্রধান উৎস ছিল হযরত উমরের পুত্র আবদুল্লাহ। তিনি সাফ সম্পর্কে তার বাবার কাছ থেকে সব শুনেছিলেন। সে যে দাজ্জাল ছিল তা নির্ধারণ করার জন্য মুহাম্মদ যে প্রচেষ্টা করেছিলেন সেই গল্পও। এবং তিনি সারাজীবন নিশ্চিত ছিলেন যে, ইবনে সাইয়াদ প্রকৃতপক্ষেই সেরা প্রতারক ছিল। ইসলামের কিতাবি

সংস্করণগুলোতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ঘোষণা করেছেন, “আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, ইবনে সাইয়াদ যে খ্রিস্টবিরোধী তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই” (১৮)।

বছরখানেক পরে, মাঝবয়সে এক রাস্তায় আবদুল্লাহর সাথে সাফের দেখা হয়েছিল। মুখোমুখি হওয়ার সময় দেখা গেল, সাফের পুত্র একটি চোখের সংক্রমণে ভুগছিল এবং এটি ফুলে গিয়েছিল। তাকে নিশ্চয়ই শয়তানের মতো দেখতে লাগছিল, যেমন মুহাম্মদ তার অনুসারীদের বলেছিলেন ‘দাজ্জাল এক চক্ষুবিশিষ্ট হবে, খারাপ চোখটি ফুলে আঙ্গুরের মত বেরিয়ে আসবে।’ সাফের ফুলে যাওয়া চোখটি অবশ্যই পুষ্ট আঙ্গুরের মতো লাগছিল।

আবদুল্লাহ তখন সাফকে বললেন, “আপনার চোখে কি হয়েছে?”

সাফ জবাবে বললেন “আমি জানি না”

আবদুল্লাহ বললেন “এটি আপনার মাথায় আছে, আর আপনি এটি সম্পর্কে জানেন না?”

অনেকদিন ধরে চোখের যন্ত্রণায় ভোগার ফলে এই কথা শুনে সাফ রেগে ফেটে পড়লেন। তিনি আবদুল্লাহর বহনকারী জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, “আল্লাহ ইচ্ছা করলে সেটার মাঝেই একটি চোখ তৈরি করতে পারেন”। তিনি আবদুল্লাহর কাছে গাধার মতো ডাকাডাকি করতে লাগলেন, পাগলের মত তিনি ডেকেই গেলেন। সম্ভবত আবদুল্লাহর উপর রাগ দেখানোর এটিই ছিল তার ধরন, যার বাবা তার মাথা কেটে ফেলতে চেয়েছিলেন মুহাম্মদের সাথে ঠাট্টার করার কারণে। সাফ হয়তো এসবের অনেককিছুই নিয়েই ভাবতেন।

সেই অভিজ্ঞতা আবদুল্লাহকে বিচলিত করেছিল, তবে ততদিনে আব্দুল্লাহ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়া ধর্মটির একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠেছিলেন। তিনি তার বোন হাফসাকে দেখতে গেলেন যিনি মুহাম্মদের একজন বিধবা স্ত্রী ছিলেন। তিনি যখন ইবনে সাইয়াদের (Ibn Sayyad) সাথে মুখোমুখি হওয়ার কথা হাফসাকে জানালেন, তখন হাফসা তাকে এতটা নির্বোধ হওয়ার জন্য তিরস্কার করে বললেন “আপনি কেন ইবনে সাইয়াদকে রাগাতে গেলেন? আপনি জানেন যে, তার চরম রাগ দাজ্জালকে পৃথিবীতে হাজির করবে?” (১৯)

অধ্যায় - ২০
পিতা ও পুত্র

বানু নাযীরের ইহুদিদের বহিষ্কারের পরপরই মুহাম্মদ তার দত্তক পুত্র জায়েদের স্ত্রীকে বিয়ে করে তার অনুসারীদের চমকে দেন। কারণ, এর মাধ্যমে তিনি আরব সংস্কৃতির নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করেন; এমনকি সাহাবিদের (অনুসারী) একাংশের মধ্যে মুহাম্মদকেই এখন 'মোনাফেক' বলে খারিজ করে দেয়ার একটা মনোভাব দেখা যাচ্ছে! অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি তার সমালোচকদের শাহাদার (ইসলাম গ্রহণের বাক্য) সুরক্ষা তুলে নিয়ে হত্যার করার হুমকি দিলে তবেই পরিস্থিতি শান্ত হয়।

ইসলামিক আদিগ্রন্থে ঘটনাটি নিম্নরূপ :
এটি একটি উষ্ণ বিকেল ছিল এবং মুহাম্মদ স্বপ্নময় অবস্থায় ছিলেন যখন তিনি তার পালকপুত্র জায়েদের ঘরের দরজায় টোকা দেন। তাকে সেদিন স্বাভাবিক সময়ের অপেক্ষার চেয়ে একটু বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল, কিন্তু অবশেষে যখন দরজা খোলা হল, মনে হচ্ছে যেন আল্লাহ স্বর্গের দরজা খুলে দিয়ে মুহাম্মদের সামনে একটি কালো চোখের হুরকে দেখাচ্ছেন! তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল জাহাশের (Jahsh) মেয়ে - জায়েদের স্ত্রী জয়নাব। তিনি পাতলা পোশাক পরিহিতা ছিলেন। পোশাকের ভিতর দিয়ে তার কোমর আর দুই স্তনের মধ্যকার ভাঁজ দেখা যাচ্ছিল। জয়নাব তার ঠোঁট বাঁকা করে তাকে ঘরে ঢোকার আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাদের ঘরে আসবেন?" যদিও মুহাম্মদ স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতেন, তিনি একজন স্পষ্টভাষী মানুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি একটি শব্দও বের করতে পারলেন না। তিনি তোতলাতে তোতলাতে বললেন, "আ...মি...আমি...আমি......জায়েদকে দেখতে এসেছি!"

জয়নাব তার চোখের পাতা পিটপিট করে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, তিনি বাড়িতে নেই। আমি কি তাকে বলব যে আপনি তাকে খুঁজতে এসেছিলেন?"
"হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই"।
এবার তিনি এই লোভাতুর অবস্থা থেকে দূরে সরে গেলেন এবং বিড়বিড় করে বললেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি হৃদয়ের নিষ্পত্তি করেন!"
ইসলামিক আদিগ্রন্থে লেখা আছে যে, যখন জায়েদ ফিরে আসেন, জয়নাব তাকে মুহাম্মদের কথা বলেন এবং তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি তাঁকে ভেতরে আসতে বলেছিলে, তাই না?"
"জী বলেছি, কিন্তু উনি প্রত্যাখ্যান করেন"।
"তুমি কি তাঁকে কিছু বলতে শুনেছ?"
জয়নাব বললেন, যখন তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন তখন তাঁকে এমন কিছু বলতে শুনলাম যার কিছুই আমি বুঝতে পারিনি। আমি তাকে বলতে শুনেছি, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি অন্তরকে নিষ্পত্তি করেন"।
জায়েদ মসজিদে মুহাম্মদের কাছে গিয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি আমার বাড়িতে এসেছিলেন। আপনি কি ভেতরে ঢুকেছিলেন?" মুহাম্মদ তাকে বলেন যে তিনি ভেতরে যাননি। জায়েদ তখন সন্দেহ করেন যে তিনি তার স্ত্রীর প্রতি প্রেমমুগ্ধ হয়েছেন, এবং যদি তাই হয় তাহলে তিনি তার সাথে বিচ্ছেদ করতেও রাজি আছেন। "হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা ও মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। হয়তো আপনি জয়নাবকে পছন্দ করেছেন। আমি তাকে ছেড়ে (তালাক) দিতে পারি"
মুহাম্মদ বললেন "তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো"
জায়েদ বললেন "হে আল্লাহর রাসূল, আমি তাকে ছেড়ে চলে যাব"
তিনি আবার বললেন "তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো"

গল্পের স্বাভাবিক রূপায়ণে ইসলামিক সাহিত্যিকরা বিষয়টি নিয়ে বারবার ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে লিখে গেছে। তাদের লেখায় যেটা ভেসে ওঠে সেটা হলো, জায়েদ তাকে তালাক দেয়, এবং চারমাস অপেক্ষা করার পর যখন মুহাম্মদ নিশ্চিত হলেন যে জয়নাব গর্ভবতী না তখন তিনি জায়েদকেই জয়নাবের কাছে পাঠিয়ে দেন বিয়ের পয়গাম নিয়ে যে পয়গাম জয়নাব আনন্দের সাথেই মেনে নেন। সেখানে একটা বিয়ের ভোজসভার আয়োজন করেন মুহাম্মদ। মুহাম্মদের অন্যান্য স্ত্রীরাও সবাই আনন্দিত হন। মুহাম্মদ এবং জয়নাব আনন্দিত ছিলেন এবং জায়েদও আনন্দিত হন তাদের দুজনকে আনন্দিত দেখে (১)।

মুহাম্মদের বিয়ে নিয়ে আনন্দের এই আবেগী গল্পটি নিষ্ঠুর এক বিশ্বাসঘাতকতা এবং ছেলের প্রতি বাবার কৃত অন্যায়কে আড়াল করে দেয়। জায়েদ নিছক একজন বিশ্বস্ত সাহাবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন মুহাম্মদের পালকপুত্র, তার (জীবিত) একমাত্র পুত্র। ৩০ বছর ধরে জায়েদ তাকে পিতা হিসেবেই দেখেছেন। জায়েদের বাল্যকালের ইতিহাস সবাই জানত। খাদিজার ভাগ্নে হাকিম ইবনে হিজাম জায়েদকে ওকাযের দাসবাজার থেকে কিনে উপহার হিসেবে খাদিজাকে দেন; আর খাদিজা জায়েদকে ব্যক্তিগত দাস হিসেবে মুহাম্মদকে দিয়েছিলেন। যখন জায়েদের আসল পিতা মক্কায় তাকে খুঁজতে আসেন এবং পেয়ে যান জায়েদ তখন মুহাম্মদের সাথেই থাকার সিদ্ধান্ত নেন। মুহাম্মদ জায়েদকে দত্তক নেন এবং কাবা-মন্দিরে গিয়ে পিতা-পুত্রের এই সম্পর্কের কথা ঘোষণা করেন। এরপর থেকে তিনি মুহাম্মদের পুত্র জায়েদ তথা জায়েদ ইবনে মুহাম্মদ নামে পরিচিত ছিলেন। খাদিজা ও আলীর সাথে জায়েদ প্রথম ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। জায়েদ যখন বিশ্বাস করলেন যে, আল্লাহ তাঁর পিতা মুহাম্মদকে বিশেষ উদ্দেশ্যে (নবী হিসেবে) অভিষিক্ত করেছেন তখন তিনি প্রথম আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন।

এই ঘটনার পর মুহাম্মদ তার মায়ের (আমিনা) কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আবিসিনীয় দাস বারাকাকে জায়েদের সাথে বিয়ে করিয়ে দেন। সেই ঘরে মুহাম্মদের পুত্র জায়েদের একটি ছেলে হয়, যার নাম রাখা হয় ওসামা (Osama)। মুহাম্মদের সাথে পিতা-পুত্রের সম্পর্কের জন্য জায়েদ গর্বিত ছিলেন। যখন তিনি নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিতেন তখন তিনি বুক ফুলিয়ে বলতেন, "আমি মুহাম্মদের পুত্র জায়েদ!" আর তিনি যেখানেই যেতেন, লোকে তার দিকে ইঙ্গিত করে বলত, "ইনি মুহাম্মদের পুত্র জায়েদ!" পরবর্তীতে আলী, জুবায়ের, হামজা এবং অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সাথে জায়েদকেও সবসময় তার পালক পিতার পক্ষে লড়াই করতে হয়েছে। যদিও হত্যার সংখ্যার দিক দিয়ে তিনি জুবায়ের আর আলীর সমান কখনো হবেন না, তারপরও যখন প্রয়োজন হতো তখন তিনি ঠান্ডা মাথায় হত্যা করতে বেশ পটু ছিলেন। যেমন, বিধ্বংসী উহুদ যুদ্ধের পরে একজন দলভ্রষ্ট মক্কাবাসীকে নিশানা অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করতে একটি গাছে বেঁধেছিলেন জায়েদ। সেই যুদ্ধের একবছর পর যখন জায়েদ চল্লিশ বছর পূর্ণ করলেন তখন মুহাম্মদ তাকে আরেকটি স্ত্রী নেয়ার ব্যবস্থা করেন- এই স্ত্রী ছিলেন জয়নাব।

তিনি মুহাম্মদের ফুফু উমাইমার কন্যা ছিলেন - সম্ভবত শত শত কাজিনের একজন যিনি মুহাম্মদের পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের বংশের একজন (২)। জয়নাব ও তার প্রথম বর ছিলেন প্রথমদিকের ধর্মান্তরিতদের মধ্যে অন্যতম এবং মক্কাবাসী নির্যাতন থেকে বাঁচতে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন, কিন্তু তিনি আবিসিনিয়াতেই মারা যান। মুহাম্মদ মক্কা থেকে পালিয়ে ইয়াছরিবে যাওয়ার পর জয়নাব আবিসিনিয়া ছেড়ে ইয়াছরিবে চলে আসেন। মুহাম্মদের একজন উৎসাহী সমর্থক হিসেবে উল্লেখ করা ছাড়া, জায়েদের সাথে তার বিয়ের আগে পর্যন্ত তার সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। বলা হয় যে, তিনি (জয়নাব) এই বিয়েতে আপত্তি জানিয়েছিলেন, কারণ জায়েদ দাস ছিলেন, অন্যদিকে জয়নাব ছিলেন অভিজাত মুত্তালিবের বংশের একজন। কিন্তু বিয়েটি মুহাম্মদের ইচ্ছেতেই হয় এবং অবশেষে মুহাম্মদ জায়েদের পক্ষ থেকে বিশাল অংকের যৌতুক দিয়ে তাকে বিয়েতে রাজি করান (৩)। বিয়ের সময় জয়নাবের বয়স ছিল ৩৪ বছর।

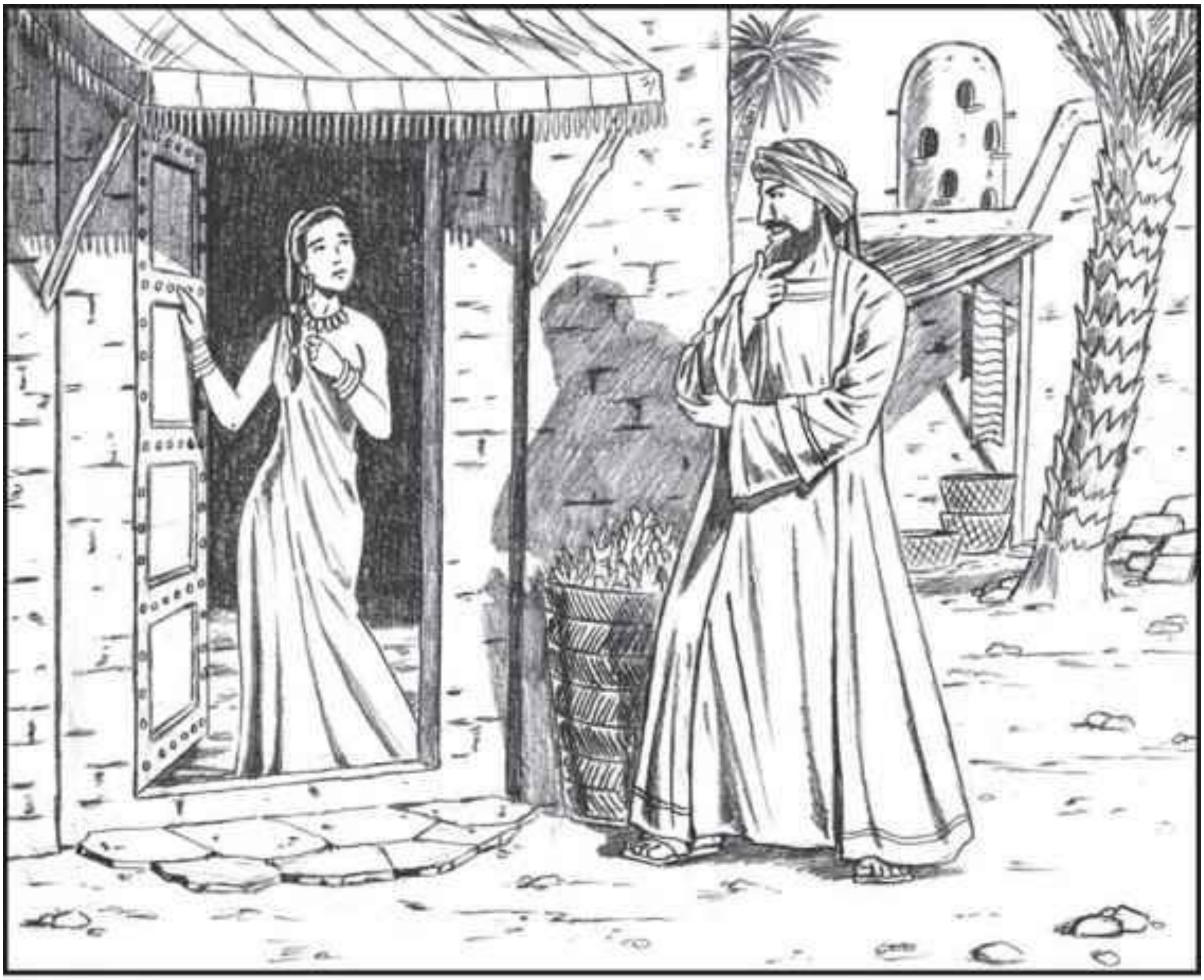
ইসলামিক ইতিহাসে বলা হয়, জয়নাবের জায়েদকে বিয়ে করতে রাজি হবার পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে, তিনি মুহাম্মদের কাছাকছি থাকতে পারবেন। জয়নাব মুহাম্মদের প্রাক্তন দাসের বদলে মুহাম্মদকেই বিয়ে করা বেশি পছন্দ করতেন, এবং সেটি নিশ্চয়ই প্রকাশ করেছিলেন। এক বছরের মধ্যে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি ঘটে, এবং জায়েদের ঈর্ষার পেছনে সম্ভবত এটিও আরেকটি কারণ ছিল। মুহাম্মদের দিকে তাকালে জয়নাবের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে যেত, কিন্তু এই জয়নাবেরই মুখের উজ্জ্বলতা মলিন হয়ে যেত যখন দেখতে বেঁটে, কালো, গোলাকার চেহারা, চ্যাপ্টা নাকের বিবাহিত প্রাক্তন ক্রীতদাস জায়েদের দিকে তিনি তাকাতেন। যখনই মুহাম্মদ তার সাথে দেখা করতে আসতেন, তিনিও তখন মুহাম্মদের কাছে আসতেন। জায়েদের চোখ এই বিষয়গুলো এড়াত না। মুহাম্মদও জয়নাবের আগ্রহের প্রতি সম্মতি দেখালেন। সম্ভবত এজন্যই তিনি জায়েদের বাড়িতে এমন সময়ে যেতেন যখন জায়েদ সেখানে থাকত না। জয়নাবের মায়াময়ী চোখ দুটি মুহাম্মদের কামভাব জাগিয়ে দিত। আর মুহাম্মদ তখন জয়নাবের মধ্যেও তাঁর প্রতি যে আকর্ষণবোধ দেখতে পেতেন তার সত্যতা যাচাই করা প্রয়োজন মনে করলেন। যখন জয়নাব দরজা খুলে দিয়েছিলেন তখন তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি যা ভাবছেন তাই সঠিক। মুহাম্মদ জয়নাবকে এত গভীরভাবে চেয়েছিলেন যে, তাঁর পালকপুত্রকে দিয়ে তালাক পর্যন্ত করিয়ে নিজের পথ পরিষ্কার করার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন এই বলে, “সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি হৃদয়ের ফয়সালা করেন!” এমনকি জায়েদও সত্যিই বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ মুহাম্মদের সাথে কথা বলেছেন এবং ফেরেস্তারা নিয়মিত তার কাছে এসে তাকে এই বিষয়ে সর্বশেষ আয়াত দিয়ে গিয়েছে। বিশ্বাস করেই তিনি অধীর আগ্রহে তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছেন। সম্ভবত মানসিকভাবে বিপর্যস্ত জায়েদ মুহাম্মদকে তার বাড়িতে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি একদিকে মুহাম্মদের প্রতি আনুগত্য এবং অন্যদিকে স্ত্রীর উপর সন্দেহের দোলাচলে দুলছিলেন। আসলেই তাদের দুজনের মাঝে কি ঘটেছে তা জানতে জায়েদ জিজ্ঞেস করলেনঃ “আমি জানতে পেরেছি আপনি আমার বাড়িতে গিয়েছিলেন। আপনি কি ভেতরে গিয়েছিলেন?” এটি প্রশ্নের চেয়েও অভিযোগের ইঙ্গিত বেশি বহন করে।

মুহাম্মদ জয়নাবকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার ইচ্ছা কয়েক মাসের জন্য প্রকাশ্যে আনেননি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে জয়নাব গর্ভবতী নন। একদিন সকালে আয়েশার সাথে বিছানায় শুয়ে থাকা অবস্থায় অচেতন হয়ে যান, পরে সজাগ হলে তিনি মুচকি হেসে আয়েশার কানে কানে কিছু একটা বললেন। তিনি উত্তেজিত ছিলেন, এবং এটা পরিষ্কার ছিল যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে যাচ্ছেন, কিন্তু তিনি কথা বলার জন্য একটু সময় নিচ্ছিলেন। মুহাম্মদের অদ্ভুত ব্যাপার ছিল তিনি মুখে অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে পারতেন - তা হোক আনন্দ, ক্রোধ বা যাই হোক না কেন - এবং তারপর এই মুখের অভিব্যক্তি দেখে লোকে তাকে জিজ্ঞেস করত, তার মনে যা আছে তা প্রকাশ করার জন্য। এবারও তিনি প্রথমে বলেননি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আয়েশা তার মুখের অভিব্যক্তির কারণ জানতে চাইলেন- “হে আল্লাহর রাসূল, কি এমন ঘটল যে আপনাকে এত খুশি দেখাচ্ছে?”

মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সদ্য পাঠানো বার্তা পাঠ করলেন :

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِىْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَ بَنٰتِ عَمِّكَ وَ بَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَ بَنٰتِ خَالِكَ وَ بَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِىْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۫ وَ امْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِىُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا * خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٠﴾

“হে নবী, আমি তোমার জন্য তোমার স্ত্রীদেরকে হালাল করেছি যাদেরকে তুমি মোহরানা দিয়েছ, আর আল্লাহ তোমাকে ফায় (বিনা যুদ্ধে লব্ধ) হিসেবে যা দিয়েছেন তন্মধ্যে যারা তোমার মালিকানাধীন তাদেরকেও, এবং তোমার জন্য হালাল করেছি এবং তোমার চাচার কন্যা, ফুফুর কন্যা, মামার কন্যা, খালার কন্যাকেও যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে; আর কোন মুমিন নারী যদি নবীর জন্য নিজকে হেবা করে, নবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও তার জন্য বৈধ। এটা বিশেষভাবে তোমার জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়; আমি তাদের ওপর তাদের স্ত্রীদের ও তাদের দাসীদের ব্যাপারে যা ধার্য করেছি তা আমি নিশ্চয় জানি; যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু” (৫,৬)।



[মুহাম্মদ প্রেমে মুগ্ধ! । রাজা ডেভিডের মত যখন তিনি বাথশেবাকে (Bathsheba) স্নান করতে দেখলেন, মুহাম্মদ পালকপুত্রের বাড়িতে গিয়ে একদিন জয়নাবকে দেখে মুগ্ধ হয়ে পুত্রকে দিয়ে তাকে তালাক দিয়ে তার হেরেমে আরেক নতুন সদস্য যুক্ত করলেন। এরপরই তিনি পালকপুত্র নেওয়ার প্রথা (দত্তকপ্রথা) বিলুপ্ত করে এই প্রথার সমালোচনা করেন, যাতে জায়েদকে আর কেউ তার পুত্র বলে সম্বোধন না করে।]

কিন্তু তেরো বছরের আয়েশা ঠিকই ঘটনাটি বুঝতে পারলেন। ছোট আয়েশার অনুভূতিতে নিশ্চয় আঘাত লেগেছিল এবং তিনি ঈর্ষান্বিত হলেন যে, মুহাম্মদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আরেকজন প্রতিদ্বন্দ্বী তার জীবনে আসছে, তাই তিনি বললেন, "আমি তো দেখছি আপনার প্রভু আপনার মনস্কাম পূরণ করার ব্যাপারে খুব অগ্রণী!" (৭)।

মুহাম্মদ তার রচনাগুলোকে বিশেষ কয়েকভাবে প্রচার করতেন। প্রধান পদ্ধতি ছিল উপদেশ বিতরণ। যখন তার জামাতে সবাই জড়ো হয়ে খেজুর পাতার মাদুরের উপরে দুই হাঁটু ভাঁজ করে সামনে বসতেন, তিনি তখন কবিতা পাঠের মতো করে তার রচনাগুলোকে আবৃত্তি করতেন এবং নতুন আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। তিনি বলতেন, এইগুলো তার উপর "নাজিল হয়েছে"। বিভিন্ন সময়ের যে পরিস্থিতি বা প্রেক্ষিতের সৃষ্টি হয়েছে তার সাথে একটা যোগসূত্র স্থাপন করতেন একথা বলে যে, "আল্লাহ আমাকে একথা জানিয়েছেন" অথবা, "ফেরেস্তা আমার কাছে আল্লাহর বাণী নিয়ে এসেছেন" – এবং এভাবেই তিনি নতুন আয়াত প্রবর্তনের সূত্র ব্যাখ্যা দিতেন। আরেকটি পদ্ধতিও অবলম্বন করতেন - তিনি তার অনুসারীদের মধ্য হতে কয়েকজনকে তার সাম্প্রতিক নাজিলকৃত আয়াতগুলোকে মুখস্থ করিয়ে জনসম্মুখে বারবার আবৃত্তি করার জন্য বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাতেন। তবে আয়াতগুলো যেভাবেই আসুক না কেন, প্রত্যাশা করা হতো যে তারা সেগুলো মুখস্থ করবে এবং নামাজের সময় তা পাঠ করবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুমিনরা তার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আবৃত্তি করত, “হে নবী! আমি আপনার জন্য আপনার স্ত্রীদেরকে হালাল করে দিয়েছি......”।

জয়নাব মুহাম্মদের প্রস্তাব সম্পর্কে জানতে পারলেন। একটি সংস্করণে পাওয়া যায়, মুহাম্মদ একজন ক্রীতদাসীকে সুসংবাদ নিয়ে তার কাছে পাঠিয়েছেন, কিন্তু অন্য সংস্করণে পাওয়া যায় এবং সম্ভবত যা ঘটেছিল, তিনি এই প্রস্তাব (বিয়ের) নিয়ে জয়নাবের প্রাক্তন বর জায়েদকেই পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “যাও এবং তার কাছে আমার কথা বলো”। জায়েদ আনুগত্যের সাথে জয়নাবের কাছে গেল। সে দরজায় টোকা না দিয়েই জয়নাবের ঘরে ঢুকলো। জয়নাবের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। জয়নাব বুঝতেও পারেনি যে, জায়েদ তার পেছনে দাঁড়ানো। সে রান্নার জন্য ময়দা মাখাচ্ছিল, ঠিক যেমনটা তারা একসাথে থাকার সময় জয়নাব করতেন। তার কালো চুল ঘাড় পর্যন্ত এসে পোশাকের উপর পিঠে আটকে ছিল। জয়নাব একই পোশাক পরিহিত ছিলেন ঠিক যখন তারা একসাথে থাকতেন। সেই একই চপ্পল আর পায়ে সেই একই নুপুর পরা ছিল। যখন তিনি ঘুরে দেখলেন পেছনে কে আছে, তখন তার মুখটি মলিন হয়ে গেল, ঠিক যেভাবে তিনি আগেও মলিন হয়ে যেতেন তাকে দেখে। জায়েদ অত্যন্ত আনন্দের সাথে তাকে বললেন, “হে জয়নাব, আনন্দ কর! আল্লাহর রাসূল আমাকে তার পক্ষে থেকে তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন” (৮)।

মসজিদের এক কক্ষেই বিয়ের ভোজের আয়োজন করা হয়। যে ঘরটিতে জয়নাব থাকবেন ঠিক তার পাশেই অন্য স্ত্রীদের ঘর। যদিও অন্য স্ত্রীরা তাদের গৃহের ভিতরেই অবস্থান করছিলেন। অতিথিরা দলে দলে নবদম্পতিকে (মুহাম্মদ-জয়নাব) অভিনন্দন জানাতে এবং ভোজে অংশগ্রহণ করতে এসেছিল। খাবারের তালিকায় ছিল মোটা রুটি এবং সদ্য জবাই করা ছাগলের মাংস। অতিথিরা সেখানে বেশ সময় পর্যন্ত আনন্দ করছিলেন, মুহাম্মদ শেষমেষ দাঁড়িয়ে ইঙ্গিত দিলেন যে পার্টি শেষ হয়ে গেছে। এরপর যা ঘটেছে তা কোরআনেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে : বেশিরভাগ মানুষ তার ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছিল এবং চলেও গিয়েছিল, কিন্তু তিনজন লোক গভীর কথোপকথনে ব্যস্ত ছিল এবং অবশ্যই মুহাম্মদ ও জয়নাব ছাড়া বাকি সবাই চলে গেছে। বলা হয়, মুহাম্মদ এই ধরনের পরিস্থিতিতে তাদেরকে বের হয়ে যেতে বলতে লজ্জাবোধ করেন, এবং তাই তিনি তাদেরকে বের হতে বলেননি। তার বদলে তিনি আলাদা ঘরে তার অন্য স্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। প্রতিটি ঘরে যাওয়া-আসার মধ্যে তিনি একবার করে বাসর ঘরের দিকে তাকাতেন, এবং তখনও তারা সেখানে ছিল! এখন যখন চারমাসের অন্তর্বর্তীকালীন আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়ে গেছে, তিনি খুব প্রবলভাবে জয়নাবের সাথে শুতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এরা অবিবেচকের মতো তাতে বাধা তৈরি করে খোশগল্পে মত্ত ছিল । মুহাম্মদের ভেতর সন্দেহ এলো যে, তারা হয়তো এইভাবে এখানে পড়ে আছে যার আসল কারণ হচ্ছে তারা মুহাম্মদের নববধূর প্রতি কু-দৃষ্টি দিচ্ছে! অবশেষে তারা চলেও গেল, কিন্তু মুহাম্মদের এই সন্দেহ এত গভীরে গিয়ে দানা বাঁধল যে, তিনি এখানে আল্লাহকে নামিয়ে আনলেন। আল্লাহর মাধ্যমে তিনি এই ধরনের উৎসব সম্পর্কে শিষ্টাচারের নিয়মকানুন জারি করলেন। সম্ভবত ভবিষ্যতে আরো প্রেমের সন্ধান এবং আরো বিয়ে এবং বিয়ের ভোজেরও আয়োজন করবেন, তাই আগেই এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিলেন। আল্লাহ মহাবিশ্বের শাসনকার্যের মাঝে সময় বের করে মুহাম্মদকে এই বিষয়ে বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَ لٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ
فَانْتَشِرُوْا وَ لَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۫ وَ اللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ

“হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর ঘরসমূহে প্রবেশ করো না; অবশ্য যদি তোমাদেরকে খাবারের অনুমতি দেয়া হয় তাহলে (প্রবেশ কর) খাবারের প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে। আর যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে তখন তোমরা প্রবেশ কর এবং খাবার শেষ হলে চলে যাও আর কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ো না; কারণ তা নবীকে কষ্ট দেয়, সে তোমাদের বিষয়ে সঙ্কোচ বোধ করে; কিন্তু আল্লাহ সত্য প্রকাশে সঙ্কোচ বোধ করেন না” (৭)

এই বিয়ে নিয়ে জনগণের মধ্যে বিভক্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তার এই কর্মকাণ্ডে তারা ঝাঁকুনি খেলেও, সত্যিকারের মুমিনরা ভেবে নিয়েছিল যে, মুহাম্মদ কোন অন্যায় করতে পারেন না। যদি ঈশ্বর নিজেই বিয়ের অনুমতি দেন, তাহলে তিনি কিভাবে না করে থাকতে পারেন? এমনকি যদি তাদের মনের কোনো কোণে সন্দেহের জন্ম দেয় যে এই ব্যাপারটাতে ঝামেলা আছে, আর আয়াতগুলো মুহাম্মদের নিজের সেবার উদ্দেশ্যেই আবির্ভূত হয়েছে, তবুও তারা তা নিজেদের মনের ভেতরই রাখলেন। ঈশ্বরের অনুমতিপ্রাপ্ত মুহাম্মদের আচরণের জন্য সমালোচনা করা হবে ভণ্ডামি, মুনাফিকী কাজ, জাহান্নামের আগুনে পোড়ার মতো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। নামমাত্র যারা জীবনের ভয়ে মুহাম্মদের ধর্মকে আলিঙ্গন করেছিল তারা এই বিষয়টি নিয়ে চুপচাপ ছিল না। সবসময় মুহাম্মদের বদনাম করার উপায় খুঁজতে থাকা অদম্য আবদুল্লাহ বিন উবাইর নেতৃত্বে একদল মুহাম্মদের এই কাজকে অনৈতিক বলে তিরস্কার করেন। মুহাম্মদের আগমনের আগপর্যন্ত আরবরা সবসময়ই যৌনতার বিষয়ে সহজ ছিল, কিন্তু দত্তক বা নিজের পুত্রের সঙ্গীকে নিজের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করাকে ভালো চোখে দেখতেন না। এটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কারণ এটি পিতাকে পুত্রের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে এবং পারিবারিক বন্ধন ধ্বংস করে দেবে। এখন মুহাম্মদ সেই নিষেধাজ্ঞাকেই লঙ্ঘন করেছেন। মুহাম্মদ এবারও তার সমালোচকদের একটিমাত্র উপায়ে থামানোর চেষ্টা করছিলেন : তিনি তাদের উপর থেকে শাহাদার ঢাল (কালেমার সুরক্ষা) সরিয়ে নেয়ার হুমকি দেন, যার ফলে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। এবং আল্লাহর কণ্ঠে তিনি এক রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের হুমকিও দেন :

لَئِنۡ لَّمۡ یَنۡتَہِ الۡمُنٰفِقُوۡنَ وَ الَّذِیۡنَ فِیۡ قُلُوۡبِہِمۡ مَّرَضٌ وَّ الۡمُرۡجِفُوۡنَ فِی الۡمَدِیۡنَۃِ لَنُغۡرِیَنَّکَ بِہِمۡ ثُمَّ لَا یُجَاوِرُوۡنَکَ فِیۡہَاۤ اِلَّا قَلِیۡلًا ﴿۶۰﴾
مَّلۡعُوۡنِیۡنَ ۚۛ اَیۡنَمَا ثُقِفُوۡۤا اُخِذُوۡا وَ قُتِّلُوۡا تَقۡتِیۡلًا ﴿۶۱﴾

"যদি মুনাফিকগণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা ও শহরে মিথ্যা সংবাদ প্রচারকারীরা বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে উত্তেজিত করে দেব। অতঃপর তারা সেখানে তোমার প্রতিবেশী হয়ে অল্প সময়ই থাকতে পারবে। অভিশপ্ত অবস্থায়, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, পাকড়াও করা হবে এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হবে।" (১০)

সমালোচকদের হত্যা করার পরিবর্তে তিনি তাদের সমালোচনার কারণকে হত্যা করেন। ঠিক একজন রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশে স্বাক্ষর করার মতো, তিনি দত্তক নেয়ার মতো প্রাচীন আরব প্রথা এবং দত্তক পুত্রের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অধিকারকে বিলুপ্তর ঘোষণা দেন। তিনি শুধু তা নিষেধই করেননি, তিনি এটাকে পেছনে সংঘটিত ঘটনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করে তুলেছিলেন। তাই তাকে আক্রমণ করার আর কোন কারণও ছিল না। যেহেতু জায়েদ এখন আর তার দত্তক নেয়া ছেলে না, এমনকি অতীতেও ছিল না। মুহাম্মদ তার ঈশ্বরের কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ দত্তক নেয়াকে সমর্থন করেন না; এটা মানুষের একটা আবিষ্কার ছিল, আর নিজের নাম অন্যকে দেয়ার যে অভ্যাস আরবে ছিল, তা ঈশ্বরের কাছে অসন্তোষজনক ছিল।

কোরআনে এ বিষয়ে নাজিল হয়েছেঃ

اُدۡعُوۡہُمۡ لِاٰبَآئِہِمۡ ہُوَ اَقۡسَطُ عِنۡدَ اللّٰہِ ۚ فَاِنۡ لَّمۡ تَعۡلَمُوۡۤا اٰبَآءَہُمۡ فَاِخۡوَانُکُمۡ فِی الدِّیۡنِ وَ مَوَالِیۡکُمۡ ؕ وَ لَیۡسَ عَلَیۡکُمۡ جُنَاحٌ فِیۡمَاۤ اَخۡطَاۡتُمۡ بِہٖ ۙ
وَ لٰکِنۡ مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوۡبُکُمۡ ؕ وَ کَانَ اللّٰہُ غَفُوۡرًا رَّحِیۡمًا ﴿۵﴾

"তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাক; আল্লাহর কাছে এটাই অধিক ইনসাফপূর্ণ। আর যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তাহলে তারা তোমাদের ধর্মের ভাই এবং তোমাদের বন্ধু। আর এ বিষয়ে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন পাপ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে (পাপ হবে)। আর আল্লাহ অধিক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (১১)।

জায়েদ মুহাম্মদের এই অধ্যাদেশের (দত্তক নেয়ার নিষেধাজ্ঞা) ভিকটিম। মুহাম্মদ এখন শুধু তার স্ত্রীর সাথে শুইছেন তাইই না, ত্রিশ বছর পিতৃত্বে থাকা একজন পিতা তাঁর বিশ্বস্ত ছেলেকে প্রত্যাখ্যানও করছিলেন। জায়েদ এখন আর জায়েদ ইবনে মুহাম্মদ (মুহাম্মদের পুত্র জায়েদ) না, সে এখন হারিছার (Haritha) পুত্র জায়েদ। হারিছা তার জন্মদাতা পিতার নাম যিনি তিনদশক আগে মক্কায় তার হারানো ছেলেকে খুঁজতে এসেছিলেন। এই অপমানের দ্বারা জায়েদের মানসিক বিপর্যয় বেশ জটিল হয়ে উঠেছিল। সবাই জেনেছে কি ঘটেছে, সুতরাং জায়েদ যেন এখন একেবারেই নিঃস্ব একজন।

তখন থেকেই জায়েদ এক ক্রুদ্ধ মানুষ হয়ে গেলেন। তিনি স্বেচ্ছায় জিহাদের নেতৃত্ব দিতেন এবং এক্ষেত্রে তিনি আরো বেশি হিংস্র হয়ে উঠলেন। একটা লুণ্ঠন অভিযান যেটা উত্তর দিকের বেদুইন আদিবাসীর এক কাফেলার বিরুদ্ধে পরিচালনা করেছিলেন সেখানে তিনি আহত হন এবং তার কিছু লোক নিহত হয়। তিনি সুস্থ হয়ে ওঠার পর আবার একটি দূর্ধর্ষ বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। হামলাকারীরা হাতের কাছে যাকেই পাচ্ছে তাকেই হত্যা করছে। আদিবাসী নেতার স্ত্রী উম্মে কিরফা (Umm Qirfa) এবং তার মেয়েকে তারা আটক করে। জায়েদ উম্মে কিরফাকে এমন নির্মমভাবে হত্যা করলেন যা আগে কখনো কেউ দেখেনি। জায়েদ উম্মে কিরফাকে দুটি উটের মাঝখানে বেঁধে উট দুটি ছুটিয়ে দিলে তাঁর শরীর দু'ভাগ হয়ে যায়। এটা একটা নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ছিল। উম্মে কিরফার নিস্তেজ দেহটিকে একটা উটের পেছনে বেঁধে মরুভূমির মধ্য দিয়ে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনি অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে মৃত্যুবরণ করেন। সাধারণত শুধুমাত্র পুরুষদের হত্যা করা হতো এবং নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস হিসেবে গ্রহণ করা হতো। মুহাম্মদ এ ব্যাপারে একটি সাধারণ অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন।

জায়েদ বেদুইন নারীর সাথে যা করেছেন, তার প্রাক্তন স্ত্রীর সাথে কি ঠিক তাই করতে চেয়েছিলেন? যদি তাই হয়, তাহলে মুহাম্মদের সাথে তার অন্তর কি করতে চেয়েছিল সেটা সহজেই অনুমেয়! জায়েদ উম্মে কিরফার মেয়েকে বন্দি করে মুহাম্মদের কাছে নিয়ে আসেন, সম্ভবত অবমাননা কাকে বলে শুধুমাত্র জায়েদই বুঝতে পারতেন। তিনি এখন তার প্রাক্তন পিতার কাছে নারীদের সরবরাহকারী হয়ে উঠলেন। এই নারী ছিলো মরুভূমির একজন সুন্দরী রমণী, তরুণ বয়সী, শক্তিশালী এবং গর্বিত, কিন্তু এখন সে কেবল একজন ক্রীতদাসী। প্রথমে মুহাম্মদ তাকে নিজের করে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদের এক মামা মুহাম্মদের কাছে এসে এই মেয়েকে নিজের জন্য চাইলেন। মামা তাকে দেখেছিলেন, তার চেহারা দেখে খুশি হয়েছিলেন, এবং তাকে সঙ্গী (যৌনদাসী) হিসেবে নিতে চেয়েছিলেন। কয়েকদিন দোদুল্যমানতায় থেকে অবশেষে মুহাম্মদ নারীটিকে তার মামার হাতে তুলে দিলেন। মুহাম্মদ ছিলেন দাউদের (David) মতো যিনি হিতিতকে (Hittite) যুদ্ধে মরতে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি তার স্ত্রী বাথশেবাকে (Bathsheba) নিজের কাছে নিতে পারেন। জয়নাবের সাথে বিয়ের পর মুহাম্মদ জায়েদকে বিভিন্ন অভিযানে ব্যস্ত রাখেন, এটির কারণ সম্ভবত প্রাক্তন দত্তক নেওয়া ছেলেকে যতটা সম্ভব ইয়াছরিব থেকে দূরে রাখা। দুই বছর পর হিতিতের ভাগ্যের মতই জায়েদের ভাগ্যেও একই পরিণতি ঘটে - যেই জায়গায় জায়েদের প্রাক্তন স্ত্রী তার প্রাক্তন পিতার সাথে শুয়ে আছে, সেই জায়গা থেকে বহুদূরের ভূমিতে একঝাঁক শত্রুর হাতে জায়েদ নিহত হন (১২, ১৩)।

অধ্যায় - ২১

আদর করে ডাকা

নিজের দত্তক পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করার ছয়মাস পার না হতেই মুহাম্মদ আরেকজন স্ত্রী গ্রহণ করেন, ইনি ছিলেন জুয়াইরিয়া (Juwayriya)। মুহাম্মদ তার গোত্রের লোকদেরকে পূর্ব-পরিকল্পিতভাবে এক অভিযানের মাধ্যমে পরাস্ত করেন। উম্মে কিরফা (Umm Qirfa) হত্যাকাণ্ডের কয়েকমাস পরে মুহাম্মদ মুস্তালিক (Mustaliq) অভিযান করেন। মুহাম্মদ খবর পান যে, লোহিত সাগরের কাছে ইয়াছরিবের দক্ষিণ-পশ্চিমে যাযাবরদের একটি জোট তার উপর হামলার জন্য সংগঠিত হচ্ছে। তারা মুস্তালিক গোত্রের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা আল-হারিছের নেতৃত্বে তৈরি হচ্ছেন। তার বিরুদ্ধে যেকোন সামরিক হামলার পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দিতে পূর্বের মতই মুহাম্মদ এবারও প্রথমেই আক্রমণ করে বসেন।

সাতশো লোকের একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে তিনি ইয়াছরিব থেকে চারদিনের যাত্রা পথে একটি জলাশয়ের দিকে রওনা দিলেন। যাওয়ার আগে বিরোধীপক্ষের শক্তি সম্পর্কে অবগত হতে মুহাম্মদ একজন গুপ্তচরকে পাঠিয়েছিলেন। মুস্তালিকরাও মুহাম্মদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য একজন গুপ্তচর পাঠায়, কিন্তু তাকে ধরে ফেলা হয় এবং মুহাম্মদের সামনে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। গুপ্তচরকে নতুন ধর্ম গ্রহণ করার শর্তে প্রাণ বাঁচানোর প্রস্তাব দেয়া হয়। যতক্ষণ না তার পুরো গোত্র এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করে তিনিও ততক্ষণ এই ধর্ম মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান, যা ছিল মারাত্মক ভুল। কাঁধ বাঁকিয়ে মুহাম্মদ তাকে শিরোচ্ছেদ করার ইঙ্গিত দিলেন।

শিরোশ্ছেদের খবর যাযাবরদের কাছে পৌঁছে গেল। মুহাম্মদের সাথে যুদ্ধ করলে নিজেদের ভাগ্যে কি ঘটতে পারে সে কথা চিন্তা করে কিছু বেদুঈন অংশীদাররা মুস্তালিক গোত্রকে পরিত্যাগ করল, সুতরাং আসন্ন শত্রুদের মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে মুস্তালিক একা হয়ে গেল। মুহাম্মদ শীঘ্রই দুর্ধর্ষ যুদ্ধজয়ের সংকল্প নিয়ে হাজির হলেন, বললেন “হে বিজেতারা হত্যা করো, হত্যা!” (১) মুস্তালিকরা সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ মোকাবেলা করে, কিন্তু মুহাম্মদের যোদ্ধাদের সংখ্যা তাদের চাইতে অনেক বেশি, সুতরাং তারা হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। কিছু সুত্রমতে, যুদ্ধটা কোন পূর্ব পরিকল্পিত লড়াই ছিল না, বরং একটি আকস্মিক আক্রমণ ছিল যা মুহাম্মদ ভোরের দিকে শুরু করেন। এটা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, মুস্তালিক যোদ্ধাদের মধ্যে দশজন নিহত হয়েছে, কিন্তু মুহাম্মদের একজন অনুসারী মারা গিয়েছিল, যে মক্কার বংশোদ্ভূত ছিল। তার মৃত্যুটি ঘটেছিল নিজেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি থেকে - একজন বিশ্বাসী তাকে মুস্তালিক গোত্রের মনে করে ভুল করে তীর ছুঁড়ে মারে, ফলে সে মারা যায়।

গনিমতের মালের দিক থেকে, এই হামলাটির সাফল্য ছিল বেশ ভালো। তাদের তাঁবু, অন্দরমহলের সকল সামগ্রী ছাড়াও দুই হাজার উট ও পাঁচ হাজার ভেড়া ও ছাগল জব্দ করা হয়। ছয়শত লোককে আটক করা হয় এবং তারা মুসলমানদের দাসদাসীতে পরিণত হয় (২)। যাওয়ার আগে মুহাম্মদ গণিমতের মাল বিতরণের জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন, এবং প্রত্যেক যোদ্ধার দায়িত্ব ছিল তার লুণ্ঠিত বস্তুকে ইয়াছরিবে নিয়ে যাওয়া। বন্দিরাও এখন গলিমতের মালের অন্তর্ভুক্ত, এবং তাদেরকে বিভক্ত করা হয়েছিল। ততদিনে মুহাম্মদ আদেশ জারি করছিলেন যে, অবিশ্বাসী নারীরা বন্দি হলে তাদের বিয়েও বাতিল হয়ে যাবে (৩), সুতরাং দাসী হিসেবে এসব মেয়েরা এখন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের যৌনতার জন্য ন্যায্য ক্ষেত্র। এইভাবে নারী ও মেয়েদের তাদের বর, পিতা, চাচা, ভাই ও সন্তানদের থেকে আলাদা করে ফেলা হয় এবং মুহাম্মদের যোদ্ধাদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। একবার তারা নির্ধারিত মালিকদের (মুসলিমদের) দখলে চলে এলেই, নারী এবং মেয়েদের তাঁবুতে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়। মুহাম্মদের এক যোদ্ধাকে বলতে শোনা যায়, “তখন আমাদের জন্য যৌনতাবিহীন থাকা অত্যন্ত কঠিন ছিল!” (৪)

তবে বন্দি নারীরা তাদের হাতে (বন্টিত হয়ে) আসার সাথেই হানাদাররা একটি সংকটের সম্মুখীন হন এবং একটি ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন - যদি তারা মিলিত হবার পর এই নারীরা গর্ভবতী হয়ে যায়? তারা কি তাহলে নারীদের যোনিপথের বাইরে বীর্যপাত (আজল) করবে, যাতে গর্ভবতী হওয়া থেকে ঠেকানো যায়? এই বিষয়টি তাদের জন্য উদ্বেগের কারণ ছিল, কেননা তারা এই নারীদের দিয়ে মুক্তিপণ আদায় করার জন্য গোত্রবাসীদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার কথাও ভেবেছিল। কিন্তু তারা গর্ভবতী হয়ে গেলে মুক্তিপণের মূল্য কমে যাবে। তারা এই বিষয়ে একটি দিকনির্দেশনার জন্য মুহাম্মদের কাছে গেলেন। কিছুক্ষণ এটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করার পর মুহাম্মদ তাদের এটা নিয়ে ভাবতে নিষেধ করলেন, আর বললেনঃ "যদি নারীরা গর্ভবতী হয় তাহলে সেটা হওয়ারই কথা ছিল, এবং এটি আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়েছে" (৫)।

বন্দিদের মধ্যে ছিলেন মুস্তালিকদের প্রধানের কন্যা জুয়াইরিয়া (Juwayriya)। জুয়াইরিয়াকে একজন যোদ্ধাকে পুরস্কার হিসেবে দেয়া হয়, কিন্তু পরে মুহাম্মদই তাকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই সাহাবিও তাতে সম্মতি দেন। এই গল্পের দুটি সংস্করণ পাওয়া যায়। একটিতে পাওয়া যায়, জুয়াইরিয়া যার মালিকানায় পড়েছেন তার সাথে একটি চুক্তি করেন যিনি নয় আউন্স সোনার বিনিময়ে জুয়াইরিয়াকে মুক্তি দিতে সম্মত হন। কিন্তু এতটা অর্থ না থাকায় জুয়াইরিয়া মুহাম্মদের তাঁবুতে গিয়ে তার সাহায্য কামনা করেন। এটা উল্লেখ করতে হবে যে, তিনি গোত্রপ্রধানের কন্যা ছিলেন। মুহাম্মদ তাঁর দুই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসেছিলেন - আয়েশা ও উম্মে সালমা - এবং আয়েশা তার সঙ্গে ছিল যেই মুহূর্তে জুয়ারিয়া তার তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে তার সাথে কথা বলার অনুমতি চাইলেন। প্রায় তের বছর বয়সী আয়েশা যখন জুয়ারিয়াকে দেখল তখন সে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল। মুহাম্মদের মনোযোগ আকর্ষণের আরেকজন প্রতিদ্বন্দ্বী হয়তো সে দেখতে পাচ্ছে। এবং তার ঈর্ষা সত্যই হয়ে গেল যখন মুহাম্মদ তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। মুহাম্মদ জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আরো ভালো কিছু পছন্দ করবে?"
জবাবে তিনি বললেন, "সেটা কি হতে পারে হে আল্লাহর রাসূল?"
প্রতিউত্তরে মুহাম্মদ বললেন, "আমি নিজেই তোমার সবকিছুর দায়িত্ব নেব এবং তোমাকে বিয়ে করব।"
ইসলামিক ইতিহাস গ্রন্থ অনুসারে, তিনি তখন সেখানেই তার প্রস্তাব গ্রহণ করেন"(৬)।

আরেকটি সংস্করণে পাওয়া যায়, সম্ভবত এটিই ছিল আসল কাহিনী যে, ইয়াছরিবে এই বিয়ের প্রস্তাবটি একমাসেরও বেশি সময় পরে ভেসে ওঠে, এবং এটি একটি চুক্তির একটি অংশ ছিল যে, বিয়ের বিনিময়ে মুহাম্মদ জুয়াইরিয়ার সমস্ত আত্মীয়দের মুক্ত করে দেবেণ। জুয়াইরিয়া তাঁর গোত্রের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলেন। ততদিনে মুস্তালিক বন্দিদের কয়েকজনকে মুক্তিপণ দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। নারী ও শিশুদের ছয়টি উটের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হচ্ছিল। জুয়াইরিয়ার বাবা প্রথমে সম্মত হওয়া নয় আউন্স স্বর্ণের পরিবর্তে একপাল উট নিয়ে ইয়াছরিবে এসেছিলেন মেয়ের মুক্তিপণ হিসেবে। জুয়াইরিয়া তাঁর বাবাকে এই চুক্তির ব্যাপারে মুহাম্মদের সাথে কথা বলতে বললেন এবং সেই সময় মুহাম্মদ মসজিদের একটি ঘরে আয়েশার সাথে ছিলেন। আয়েশা পরে এই ঘটনার কথা স্মরণ করেন এইভাবে : "তিনি ছিলেন একজন মিষ্টি, সুন্দরী রমণী, যে কেউ তার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যাবে। তিনি তার চুক্তির ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের কাছে আসেন সাহায্য চাইতে। আল্লাহর কসম, যখনই আমি তাকে আমার কক্ষের দরজায় দেখতে পেলাম তখনই আমি তাকে অপছন্দ করলাম, এবং আমি জানতাম যে আমি যা দেখেছি তা সেও (মুহাম্মদ) তার মধ্যে দেখতে পাবে"(৭)। জুয়ারিয়া মুহাম্মদকে বিয়ে করেন এবং তার সকল আত্মীয়স্বজন যাদের এখনো মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়ানো হয়নি তাদের মুক্তি দেয়া হলো। ধর্ষিত নারীদের তাদের বরের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং বন্দি মেয়েদের তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। জুয়াইরিয়াই একমাত্র তাদের সাথে ফিরে না গিয়ে পেছনে পড়ে থাকেন। তিনি তার লোকদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন বলে পরবর্তীতে ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, তিনি মুহাম্মদকে তাকে স্পর্শ করতে দেননি। যখনই মুহাম্মদ তার কক্ষে আসতেন তখনই তিনি প্রার্থনার ভান করতেন। তিনি যখনি দরজায় টোকা দিতেন, দরজা খোলার আগে তিনি সেজদার ভঙ্গিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন এবং

কোরআনের আয়াত বিড়বিড় করতেন, আর মুহাম্মদ তখন দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে যেতেন। যদি তিনি কয়েক ঘন্টা পরেও ফিরে আসতেন তবুও দেখতে পেতেন যে, জুয়াইরিয়া তখনো প্রার্থনায় মগ্ন।



[উম্মে কিরফা হত্যাকাণ্ড। তিনি সেই গোত্রের একজন বিশিষ্ট নারী যে গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদের লুটেরাদের সাথে লড়াই করেছিল, তাদের কয়েকজনকে হত্যা বা আহত করেছিল। প্রতিশোধ হিসেবে মুহাম্মদ জায়েদকে কিরফার গোত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযানের নেতৃত্ব দিয়ে পাঠান। উম্মে কিরফাকে আটক করা হয় এবং জায়েদ তার শরীরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে মেরে ফেলার আদেশ দেয়। তাকে দুটি উটের মাঝখানে বেঁধে ফেলা হয় এবং উটগুলোকে দুইদিকে দৌড়ানোর ফলে তার দেহ দুইভাগে ছিঁড়ে যায়।]

মুস্তালিক অভিযানে কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনাও ঘটে, তার মধ্যে অন্যতম হলো প্রতিশোধমূলক হত্যাকান্ড। যখন গনিমতের মাল বিতরণ চলছিল, তখন ভুলক্রমে হত্যা করা এক মুমিনের ভাই মিকইয়াস (Miqyas) মক্কা থেকে এসে দাবি করে যে, সে মুহাম্মদের ধর্মের অনুসারী। সে তার ভাইয়ের অন্যায়ভাবে হত্যার জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে রক্তমূল্য দাবি করে। মুহাম্মদ তাকে রক্তমুল্য দেয়ার পরও কিছুদিন সেখানে সে ঘুরঘুর করে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সফরের প্রকৃত উদ্দেশ্য সামনে আসে। এক সুযোগে সে তার ভাইয়ের হত্যাকারীর গলা কেটে মক্কায় পালিয়ে যায় (৮)।

পানি নিয়ে মক্কাবাসী মুসলিম ও ইয়াছরিবী মুসলিমদের মধ্যে এবার লড়াই শুরু হয়। খরার কারণে মুস্তালিক কূপের পানির স্তর নিচে নেমে গিয়েছিল এবং যা অবশিষ্ট ছিল তা পেতে প্রতিযোগিতা ছিল অনেক বেশি। লড়াই শুরু হয় যখন প্রতিটি দলের লোকেরা কুয়োর মধ্যে বালতি নামিয়ে দেয় এবং সবার বালতির রশিতে প্যাঁচ লেগে যায়। তারা সেখান থেকে শুধু একটা বালতি তুলতে সক্ষম হলো এবং তারা একে অপরকে ধাক্কা দিতে লাগল। এর মধ্যে দেশপ্রেমিক এক মক্কাবাসী ইয়াছরিবের এক ধর্মান্ধরিতের নাক ফাটিয়ে রক্ত বের দেয় যার ফলে উভয়পক্ষ একে অন্যের সাথে তলোয়ার নিয়ে মুখোমুখি হয়। উভয়পক্ষের নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত করা হয় এবং অবশেষে তাদের মনে করিয়ে দেয়া হয় যে, তারা নতুন ধর্মের ভাই ভাই এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের পারস্পরিক ভালোবাসার মাধ্যমে একসাথে এক বন্ধনে জড়িয়ে আছে। এই লড়াই একটি গুরুতর জটিলতার সৃষ্টি করে যখন আবদুল্লাহ বিন উবাই মক্কাবাসীদের সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করেন। তিনি এবং তার ডজনখানেক খাজরাজ (Khazraj) বন্ধু দূর থেকে পুরো বিষয়টি দেখেছিলেন এবং তারা দেখেন যে, মক্কার এই লোকই প্রথমে এই লড়াই শুরু করেছে। আবদুল্লাহ মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন, তারা অশ্লীল, তারা গুন্ডামি করে, সবসময় লড়াই শুরু করার জন্য প্রস্তত থাকে। তিনি তাদের "জালাবিব (jalabibs)" বলে উপহাস করেন, যা মক্কাবাসীদের পরিধেয় একধরনের এলেমেলোভাবে বোনা লম্বা ঢোলাঢালা জামা ছিল। কিন্তু মূলত এটিকে ত্যানা অর্থে ব্যবহার করা হতো। তিনি আরো বলেন, ইয়াছরিবের লোকেরা ত্যনাকে তাদের উপত্যকায় ঢুকতে দিয়ে বোকামি করেছে। এখন এরা তাদের ঘরেই খাচ্ছে; উল্টা তাদের ধাক্কা দিয়ে সব দখলে নিচ্ছে। ইয়াছরিবীদের এই ত্যনাগুলার সাথে মিলে যুদ্ধ করতে ব্যবহার করা হচ্ছিল, এবং যার ফলে তাদের জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে কিন্তু এদিকে আবার আগত ত্যানার সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছিল। আবদুল্লাহ বিন উবাই তার গোত্রবাসীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা নিজেদের উপর এটি এনেছ! তোমরা তাদেরকে তোমাদের দেশে বসতি স্থাপন করতে দিয়েছ, এবং এখন তোমাদের ধনসম্পদই তাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হচ্ছে! তোমরা যদি তাদের থেকে দূরে থাকতে তাহলে আল্লাহর কসম, তারা তোমাদের এখান থেকে অন্য দেশে চলে যেত! তিনি শেষে বললেন, ইয়াছরিবে ফিরে গিয়ে এই পরিস্থিতি বদলে দেয়ার এটাই মোক্ষম সময় "যারা শক্তিশালী তারা দুর্বলদের তাড়িয়ে দেবে" (৯)।

খাজরাজ গোত্রের সাথে ছিল জায়েদ বিন আরকাম নামের এক কিশোর, যে একজন মুমিন। সে তাদের কথোপথন শুনেছে, সে দৌড়ে গিয়ে তার চাচাকে এ ব্যাপারে বলতে লাগল। চাচা মুহাম্মদের কাছে গেলেন। মুহাম্মদ ছেলেটিকে তলব করলেন, সরাসরি তার কাছ থেকে শুনতে চাইলেন। প্রথমে মুহাম্মদ তাকে বিশ্বাস করেননি এবং প্রশ্ন করেন যে, সে সঠিক শুনেছে কিনা। কিন্তু ছেলেটি শপথ করে বলে, সে সত্য বলছে এবং আশা করে যে আল্লাহও মুহাম্মদকে অবগত করবেন। সত্যি হলে এটি গুরুতর অভিযোগ ছিল, কারণ আবদুল্লাহ বিন উবাই মূলত মুহাম্মদের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের আহ্বান জানিয়েছিলেন। উপরন্তু, ছেলেটি যদি সত্যবাদী হয় তাহলে এটি প্রমাণিত হয় যে, আবদুল্লাহ একজন ভুয়া বিশ্বাসী, তথা মোনাফেক। যেদিন থেকে আব্দুল্লাহকে তার দাড়ি ধরে মসজিদ থেকে টেনে বের করে দেয়া হয়েছে, তারপর থেকেই আবদুল্লাহ সবাইকে তার আন্তরিকতা বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। তিনি নামাজ আদায় এবং আচার-অনুষ্ঠানে দক্ষ হয়ে ওঠেন। তিনি মুহাম্মদের প্রশংসা করে দীর্ঘ বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু মক্কাবাসীদের সম্পর্কে তার কূমন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তার হৃদয়ে ভণ্ডামির "রোগ" ছিল। মুহাম্মদের শীর্ষ ব্যক্তিরা যাদের বেশিরভাগ মক্কা থেকে ছিল, আবদুল্লাহ সম্পর্কে তাদের ধারণা খুব একটা ভালো ছিল না, বিশেষ করে তিনি যখন তাদের "ত্যানা" বলে অপমান করেছিলেন। উমর বরাবরের মতই তার মাথা কেটে ফেলার প্রস্তাব দিলেন। যদি কম প্রভাবশালী কেউ হতো তাহলে মুহাম্মদ হয়তো উমরকে তাই করতে বলতেন, কিন্তু আবদুল্লাহ বিন উবাই একজন গুরুত্বপূর্ণ অনুসারী ছিল। তাকে হত্যা করলে বিরোধীপক্ষ বিদ্রোহ করতে পারে, এবং যেহেতু তারা মরুভূমিতে ছিল যেখানে মুহাম্মদ সাহায্যের জন্য অন্য কারো উপর ভরসা করতে পারেননি। উপরন্তু, তারা শত্রু গোত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন যারা অপেক্ষায় ছিল মুহাম্মদের বিরুদ্ধে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। কিছু খাজরাজ ধর্মান্তরিত মুহাম্মদকে সংযম দেখানোর আহ্বান জানালেন। ছেলেটির হয়তো ভ্রম হয়েছে। তারা বলতে চাচ্ছিলেন, সে ভুল শুনেছে। এবং এমনকি যদি সত্যও হয়, তবুও মুহাম্মদের আবদুল্লাহকে ঘিরে বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করা উচিত। ইয়াছরিবীরা

তাকে শাসক বানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদ তার নতুন ধর্ম নিয়ে এসে তাকে টপকে উপরে ওঠে গেলেন। তার রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল।

আবদুল্লাহ শীঘ্রই জানতে পারেন যে, আরকাম ছেলেটি মুহাম্মদকে তাদের কথোপকথনের কথা জানিয়েছে এবং তাকে হত্যা করার কথা আলোচনা হয়েছে। তিনি বুঝতে পারেননি, যে ছেলেটি তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে চেনে এবং আবদুল্লাহর মতই ছেলেটির বাবাও একই গোত্রের সে কিভাবে এরূপ মুহাম্মদের ধর্মের দৃঢ় বিশ্বাসী ও চোগোলখোর হবে! বুঝলে তিনি হয়তো তার কথা নিয়ে আরেকটু সাবধানী হয়েই বলতেন। এই কথা শুনে তড়িঘড়ি করে তিনি মুহাম্মদের তাঁবুর দিকে গেলেন এবং তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন কুয়োর কাছে একটা মারামারি হয়েছিল। মক্কাবাসী অভিবাসীরা এটা শুরু করেছিল, এবং যখন তারা ইয়াছরিবী বিশ্বাসীদের একজনকে ঘুষি মেরেছিল তখন তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন, এবং এর ফলে তিনি কিছু বাজে মন্তব্য করেণ ঠিক কিন্তু ছেলেটি সেসবের ভুল ব্যাখ্যা করেছে। মুহাম্মদ তাঁর জিহাদি দলকে যুদ্ধচৌকি এবং তাঁবু ভেঙ্গে ইয়াছরিবের দিকে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিলেন এই ভেবে যে, এতে করে তাদের এই ঘটনার উপর থেকে মনোযোগ ভিন্নদিকে ঘুরবে। মানুষ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, এবং তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে কেউ হয়তো আবদুল্লাহকে হত্যা করে ফেলবে এবং তারপর সেখানে আবার তিনি মিত্রতার ঝামেলায় পড়ে যাবেন। চৌকি ও তাঁবু ভাঙা সবসময়ই সময়সাপেক্ষ কাজ ছিল। তাঁবু নামিয়ে মালপত্র উটের উপর তোলা, যুদ্ধলব্ধ মাল উটের উপর ভালো করে বাঁধা এবং এর সাথে খাদ্য ও পানিও সুরক্ষিতভাব রাখতে হবে। পুরুষ বন্দিদের একসাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে এবং ধৃত গবাদিপশুগুলোকে একত্রিত করতে হবে। অনুসারীদের চাপের মধ্যে রাখতে মুহাম্মদ দুপুরের নামাজের ঠিক পরেই প্রচন্ড গরমের মধ্যেই রওনা দেয়ার আদেশ দেন। মরুভূমিতে বের হওয়ার জন্য এটা অস্বাভাবিক সময় ছিল এবং এটি দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মদ আবদুল্লাহর পরিস্থিতি নিয়ে কতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন। সারারাত মিছিলের মতো লম্বা সারি মেনে তার পুরো দল যাত্রা করতে থাকে। পরদিন সকাল হতেই ক্লান্ত হয়ে পথিমধ্যে যাত্রাবিরতি নিয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়েন। এই ধরনের শাস্তিমূলক যাত্রায়ও, মুহাম্মদের মনে আবদুল্লাহ বিষয়টি জীবিত ছিল। বন্দিদের এবং বাজেয়াপ্ত গবাদিপশু নিয়ে যখন সেনাদল মুস্তালিক এলাকা থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি তার উটের ছন্দময় আওয়াজের সাথে ধ্যানে মগ্ন। আল কাসওয়া (al-Qaswa) নামে একটা সাদা উটের পিঠে চড়ে তিনি তার প্রিয় পাহাড়ে চড়ছিলেন। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তা তার মাথায় আসতে থাকে। কথাগুলো বিচ্ছিন্ন হয়, আবার তা সাজানোও হচ্ছিল মনে মনে, এবং একপর্যায়ে এগারোটা আয়াতের একটা স্তবকে তা মিশে গেল। এবারের আলোচ্য বিষয় ছিল বিশ্বাসের ভেকধারী মোনাফেকদের নিয়ে, এবং এটির মাধ্যমে আবদুল্লাহর ঘটনাকে আবারও পুনরুদ্ধার বা পুনর্নির্মাণ করা হয়। যদিও তার নাম নেয়া হয়নি, তবে এটা ছিল আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ। আবদুল্লাহ একজন ভেকধারী বিশ্বাসী ছিলেন। আল্লাহর অভিশাপ তার উপরে ছিল!

আরকাম ছেলেটি মুহাম্মদের পেছনে যাচ্ছিল। সে মুহাম্মদকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পতিত হতে দেখেছিল এবং বিস্মিত হয়েছিল যে, সে হয়তো বিস্ময়কর মুহূর্তের সাক্ষী হতে যাচ্ছে যেই মুহূর্তে আল্লাহ তাঁর রাসূলের সাথে কথা বলবে। সে শীঘ্রই তা জানতে পেরেছিল, কারণ মুহাম্মদ যখন তার রচনায় সন্তুষ্ট হলেন তখন ধ্যানমগ্ন অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে উটের পিঠ থেকে ঘুরে আরকামকে কাছে এগিয়ে আসতে বললেন। ছেলেটি তার পাশের উট থেকে মুহাম্মদের দিকে ঝুঁকলে মুহাম্মদ তার কান এত জোরে ধরলেন যে, সে তার উটের আসন থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। মুহাম্মদ তাকে বললেন "বৎস, তোমার কান ঠিকই আছে, আল্লাহ তোমার দেয়া সংবাদকে নিশ্চিত করেছেন" (১০)! তখনো ছেলেটির কান ধরাই ছিল, আর মুহাম্মদ তার চারপাশের অশ্বারোহীদের দিকে ফিরে খবর দিলেন যে, ছেলেটা আবদুল্লাহ বিন উবাই সম্পর্কে যা বলেছিল তা সত্য ছিল। আল্লাহ এইমাত্র এটা নিশ্চিত করেছেন! যখন তার উট ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছিল, মুহাম্মদ যথেষ্ট জোরে আয়াত পাঠ করলেন, যাতে সবাই শুনতে পারে (১১)।

নতুন অধ্যায় রচিত হলো "মোনাফেক" শিরোনামে যা অবশেষে মুহাম্মদের দলে থাকা সকল পদমর্যাদার লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এবং তখন সবাই নিশ্চিতভাবে জানতে পারল যে, আল্লাহই আব্দুল্লাহকে একজন মিথ্যাবাদী হিসেবে বিবেচনা করেন। যদিও আবদুল্লাহর উদ্দেশ্যে রচিত আয়াতগুলোতে ভণ্ডামি সম্পর্কে একটি সাধারণ বিবৃতি প্রদান করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য, কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে যে ঘৃণা উস্কে দিয়েছিল তাতেই এটি (সূরা) ইন্ধন জোগাল। এটার প্রমাণ পাওয়া যায় পরদিন যখন সকালে সেনাদল বিশ্রামের জন্য থামল। মুহাম্মদ একটি গাছের ছায়ায় এক তরুণ কৃষ্ণাঙ্গ দাসের কাছ থেকে পিঠে মালিশ নিচ্ছিলেন, তখন উমর তার কাছে এসে আবার আবদুল্লাহকে হত্যার প্রস্তাব দিলেন। উমর বললেন যে, যদি আল্লাহর রাসূল তাকে এই কাজ করতে দিতে না চান, তাহলে তিনি অবশ্যই মাসলামাকে (Maslama) তাকে হত্যা করতে বলতে পারেন, অথবা আব্বাদ ইবনে কুড়ির (Abbad ibn Bishr) বা অন্য কোন অভিজ্ঞ গুপ্তঘাতককে হত্যা করতে আদেশ দিতে পারেন। কিন্তু মুহাম্মদ তাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "উমর, যদি লোকে বলতে শুরু করে যে মুহাম্মদ তার অনুসারীকে হত্যা করেছে তাহলে সেটা কেমন হবে"(১২)?

উমরই এই কাজে একমাত্র স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন না। আবদুল্লাহ বিন উবাইর ছেলে আবদুল্লাহ জুনিয়রও (Abdullah Jr.) তাকে হত্যার প্রস্তাব দেয়। তার যুক্তি ছিল জটিল এবং বেশ বিদঘুটে, তবে মুহাম্মদ যে বিদঘুটে পৃথিবীর জন্ম দিয়েছিলেন, তার যুক্তি সেই পৃথিবীতে অবশ্য মানানসই ছিল। আবদুল্লাহ জুনিয়র যুক্তি দেখায় যে, তাঁর আশঙ্কা হচ্ছে যদি অন্য কেউ তার বাবাকে হত্যা করে তাহলে সেই খুনিকে সে হত্যা করতে বাধ্য হবে, কিন্তু সে জানে যে সে অবশ্যই আরেকজন বিশ্বাসীকে হত্যা করার জন্য জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। অতএব, নরকে যাওয়া এড়াতে তাকেই তার বাবাকে হত্যা করতে হবে। সে মুহাম্মদকে বলল "যদি আপনি এটা করতে চান, তাহলে আমাকে এটা করতে আদেশ দিন। আমিই আপনার কাছে তার কাটা মাথা নিয়ে আসব" (১৩)। মুহাম্মদ আবারো তাতে না করলেন। "আসুন আমরা তাকে বিনয় দিয়ে মোকাবেলা করি এবং যতক্ষণ তিনি আমাদের সাথে আছেন, আমরা তার সঙ্গে থাকি" – মুহাম্মদ বললেন। হত্যা করার পরিবর্তে আবদুল্লাহপুত্র তার বাবাকে অপমান করে ইয়াছরিবে প্রবেশের উপর বাধা সৃষ্টি করলেন। বাবা উপত্যকার দিকে এগিয়ে আসার সময় লম্বা একটি দলের সম্মুখভাগে ছিলেন। পুত্র তার পিতার পথে তার উট নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং বলল, "আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূল আপনাকে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আপনি প্রবেশ করবেন না" (১৪)। আব্দুল্লাহপুত্র মুহাম্মদের জন্য অপেক্ষা করতে খাজরাজ সর্দারকে জোর করতে থাকে, মুহাম্মদ পেছনের সারিতে ছিলেন। মাথা নেড়ে মুহাম্মদ তাঁকে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

ফিরে আসার সময় মুহাম্মদ আরো গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হন যখন আয়েশা একদিনের জন্য নিখোঁজ হয়ে যায়। যখনই তিনি অভিযান যেতেন, তিনি তার সঙ্গে এক বা দুই স্ত্রীকে নিয়ে যেতেন। স্ত্রীরা উটের উপর পাতা আসনে বসে যাত্রা করত। তাদের ভূমিকা ছিল মুহাম্মদকে যৌনসন্তুষ্ট রাখা এবং খাদ্য প্রস্তুত করা, তাঁবু পরিষ্কার রাখা। কিন্তু যখন তারা ইয়াছরিব থেকে একদিনের দুরত্বে ছিলেন, লম্বা সারির মিছিল যখন বিশ্রামের জন্য থামলো, তিনি বুঝতে পারলেন আয়েশা তার উটের উপর আসনটাতে ছিল না। তাকে কোথাও খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না। উধাও হয়ে গেছে! সবকিছু স্তম্ভিত হয়ে গেল। মুহাম্মদ ভাবতে লাগলেন, এখন কি করা উচিত। যারা তাকে উটের উপর বসার আসনটাতে তুলেছেন সেই লোকদের তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। আয়েশাকে বহনকারী পালকিটি একটি খুঁটির নিচে বাঁধা ছিল, আর চারজন লোক হাঁটু গেড়ে বসে চারকোনা ধরে উটের উপর তুলে দিত। পুরো বাঁধনটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা ছিল যাতে খুলে না যায়।

তারা ভেবেছিল সে পালকির ভেতরে আছে, কিন্তু এটা যেহেতু পর্দা দিয়ে ঢাকা ছিল, তাই তাদের নিশ্চিতভাবে জানার কোন উপায় ছিল না। তারা ধরেই নিয়েছিল যে, আয়েশা পালকির ভেতরে ছিল। তাছাড়া সে অল্পবয়সী যেহেতু তরুণী ছিল এবং তার ওজনও খুব বেশি ছিল না তাই বোঝার উপায়ও ছিল না। মুহাম্মদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করতে থাকেন। তিনি বুঝলেন, আয়েশা খুব দৌড়াতে পারে এমনটা নয়। তাছাড়া এই মরুভূমির মাঝখানে কোথায় পালিয়ে যাবে? আর সে পালিয়েই

বা যাবে কেন? একমাত্র যে ব্যাখ্যা তার মনের ভেতর তৈরি হলো তা হচ্ছে, আয়েশাকে হয়তো ভুলক্রমে পেছনে ফেলে চলে এসেছেন তাঁরা। আয়েশাকে খুঁজতে লোক পাঠাতে হবে, কিন্তু এটার আর দরকার পড়েনি। যখন তিনি লোকজনকে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করতে যাচ্ছিলেন তখন দূরে একটি উট দেখতে পেলেন এবং কাছে আসতেই তারা দেখতে পেলেন যে, উটের উপরে একটি ছোট পর্দা আবৃত একজন বসে আছে এবং পায়ে হেঁটে একলোক দড়িবাঁধা উটের নেতৃত্ব দিচ্ছে। একলা, দলচ্যুত এ দুজনেরই মুহাম্মদের সেনাদলর নিকট পৌঁছতে কিছুটা সময় লেগেছিল, এবং কাছে আসতেই তারা সবাই দেখতে পেল যে, উটের উপর যিনি বসা তিনি আয়েশা আর উটের নেতৃত্বে ছিলেন সাফওয়ান নামের এক যুবক।

বিব্রত আয়েশা মুহাম্মদকে ব্যাখ্যা করেছেন আসলে কি ঘটেছে। তিনি বললেন, আগের দিন সন্ধ্যায় তাকে পেছনে ফেলে রেখে এসেছে সবাই। মুহাম্মদ সূর্য ডুবে যাওয়ার পরই রওনা দেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন এবং যাত্রা শুরু হওয়ার আগে তিনি (আয়েশা) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে পার্শ্ববর্তী মরুভূমিতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তার মায়ের দেয়া বিয়ের উপহার মূল্যবান জাফর হারটি তার ঘাড় থেকে পড়ে গেছে। সেটিকে খুঁজতে আবার সেখানে ফিরে গেলেন। ততক্ষণে সেনাদল তাকে রেখে চলে গেছে। এই পরিস্থিতিতে আয়েশা যেটি করেছেন, নিজেকে ঢেকেঢুকে বসে ছিলেন এবং আশা এবং প্রার্থনায় ছিলেন যে, শীঘ্রই ফাঁকা কোন পালকি হয়তো তিনি পাবেন যা তাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। একপর্যায়ে দক্ষিণ বেদুইন আদিবাসীদের থেকে আগত তরুণ ধর্মান্তরিত সাফওয়ান, যে নিজেও মুস্তালিক অঞ্চল থেকে ছেড়ে সেনাদলর চলে যাওয়ায় পেছনে পড়ে গিয়েছিল সেও উটের পিঠে করে সেদিকেই আসছিল। যখন আয়েশা তাকে দেখতে পেলেন তার মুখ ঢেকে রেখেছিলেন, কারণ ততদিনে মুহাম্মদ পুরো মুখে পর্দা রাখার আদেশ দিয়েছেন।

সাফওয়ান আস্তে আস্তে উটকে হাঁটু গেড়ে বসাল, তাকে উটের উপরের আসনে উঠে বসতে সাহায্য করল এবং কোনো বাক্যবিনিময় ছাড়াই উটটিকে সেনাদলের চলার পথের দিকে নিয়ে গেল। কিন্তু পরদিন সকালে তারা আবার সবকিছুতে গতি ফিরে পেল। সেই সন্ধ্যায় যখন সেনাদল আবার মুহাম্মদের নেতৃত্বে যাত্রা শুরু করল তখন আয়েশা তার পালকিতে চড়লেন এবং একদিন পর তারা ইয়াছরিবে ফিরে এলেন। আয়েশা এই বিষয়টি নিয়ে আর চিন্তা করেননি যতক্ষণ না তার এক খালা কয়েক সপ্তাহ পরে এসে তাকে জানালেন যে, চারিপাশে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে, সাফওয়ানের সাথে আয়েশা ঘুরে বেড়িয়েছে। তিনি সেই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত এই গুজব সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। ইয়াছরিবে ফিরে আসার পরই আয়েশা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তার কামরায় আবদ্ধ হয়ে ছিলেন, কিন্তু তারপর তাঁর বাবার বাড়িতে চলে আসেন যাতে তার মা তার পরিচর্যা করতে পারে। ব্যাপারটা তার কাছে অদ্ভুত লেগেছে যে, মানুষ তার সাথে অদ্ভুত আচরণ করছিল, এমনকি মুহাম্মদও। অতীতে তিনি যখন অসুস্থ হতেন মুহাম্মদ তাকে সান্ত্বনা দিতেন, দেখভালো করতেন, কিন্তু এখন তিনি শুধু দরজায় মাথা ঢুকিয়ে তার পরিচর্চাকারীকে জিজ্ঞেস করেন “সে কেমন আছে?” এইবার যখন আয়েশা মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি এই অসুস্থ অবস্থায় তার বাবা-মায়ের কাছে যেতে পারবেন কিনা তখন মুহাম্মদের উত্তর ছিল “তুমি যা চাও তাই করো”।

এমনকি তার বাবা-মাও তার সামনে অস্বাভাবিকভাবে চুপচাপ ছিল এবং তার দিকে দুঃখের চোখে তাকিয়ে থাকত, যেন সে মৃত্যুশয্যায় ছিল। একদিন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে তিনি তার একজন খালার সাথে বাইরে গেলেন। সেই সময়ের নারীরা দলবেঁধে এভাবেই প্রাকৃতিক কাজ সারতে যেতেন। মূলত তারা ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে বা আঁকাবাঁকা গিরিপথের মাঝে বয়ে চলা কোন খাঁড়িতে গিয়ে মলত্যাগ করতেন। ফেরার পথে তার খালা হোঁচট খেয়ে প্রায় মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন। খালা এর জন্য মিসতাহ নামের তার ছেলেকে অভিশাপ দেয়া শুরু করলেন। মিসতাহ একজন গুরুত্বপূর্ণ বদরী (যারা বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তাদের বদরী সাহাবি বলা হয়) বদরী হওয়ার কারণে সাহাবিদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন তিনি কেন মিসতাহকে ব্যক্তিকে অভিশাপ দিচ্ছেন। খালা বললেন, “বোকা মেয়ে, তুমি কি শুনতে পাওনি সে কি বলেছে?” (১৫)।

তখনই সবকিছু বেরিয়ে এলো - মিসতাহ এবং অন্যরা অভিযোগ করছিল যে, আয়েশা সাফওয়ানের সাথে বিয়েবহির্ভূত সম্পকে জড়িয়ে পড়েছিল, যা হারাম (নিষিদ্ধ) কাজ এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ। এমন অপরাধের শাস্তি হচ্ছে পাথর ছুঁড়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা। নিকট অতীতে পর্দাপ্রথা আরোপের আগে, এমনকি তারপরেও নাকি আয়েশা এবং সাফওয়ানকে একসাথে কথা বলতে দেখা গেছে। তাহলে আয়েশা পুরো রাতভর নিখোঁজ, এবং পরদিন সকালে সাফওয়ানের সাথে লোকের মাঝে হাজির, এটা দিয়ে তবে লোকে কি ধারণা করবে? সম্ভবত সবাই যাতে আবদুল্লাহ বিন উবাইর উপর থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেয় সেই আশায় উবাই ইয়াছরিবে ফিরে আসার আগেই এই গুজব শুরু করেছিলেন। কিন্তু এখন অন্যরাও এই গুজব ছড়াচ্ছে, বিশেষ করে মিসতাহ, যিনি নিজেই অলস এবং বেঁচে থাকার জন্য আবু বকরের উপর নির্ভর করত। এই গুজব ছড়িয়ে দিতে মুহাম্মদের পঞ্চম স্ত্রী ও জয়নাবের বোন হামনার (Hamna) হাতও ছিল। মুহাম্মদের নিয়োজিত কবি হাসান থাবিট (Hassan Thabit) সাফওয়ান সম্পর্কে কিছু উস্কানিমূলক পংক্তি রচনা করে পরিস্থিতি আরো খারাপ করে তুলেছিল।

তার সমন্ধে সবাই কি বলছে তা জানার পর আয়েশা এত কান্নাকাটি করেন যে, যেন “আমার কলিজা এখনই ফেটে যাবে!”- পরে তিনি এভাবেই ঘটনা সম্পর্কে বলেছিলেন। নিজেকে রক্ষা করতে আয়েশা আর কিইবা বা করতে পারে যখন সবার আচরণ এতটা জঘন্য, আর ওরা এত বাজে গুজব ছড়াচ্ছে তার নামে? এমনকি আয়েশা পরিস্থিতি বোঝার আগেই তাকে তালাকের সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য মুহাম্মদ গোপনে তদন্ত শুরু করেন। তিনি আলী এবং জায়েদের ছোট ছেলে ওসামাকে ডেকে আয়েশা সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চাইলেন। আলী আয়েশাকে একটি উটের নিচে (আঁস্তাকুড়ে) নিক্ষেপ করার জন্য মুখিয়ে ছিলেন। তিনি বললেন : “মেয়েলোক অনেক পাওয়া যায় এবং আপনি সহজেই একটা স্ত্রীকে বদলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন”। অবশ্য আলী আয়েশার ব্যাপারে মানহানিকর কিছু বলতে পারল না (১৬, ১৭)। ওসামা আয়েশার পক্ষে দাঁড়িয়েছে। মুহাম্মদ বিভিন্ন মানুষকে ডাকলেন তাদের মতামত চাওয়ার জন্য। এদের মধ্যে একজন ছিলেন বারীরা নামে এক ক্রীতদাসী, যিনি আয়েশার সাথে ছিলেন। যখন তাকে মুহাম্মদের সামনে আনা হলো, আলী তাকে মারধর করে বলেন “আল্লাহর রাসূলের কাছে সত্য কথা বল”। নিজেকে আলীর কাছ থেকে আলগা করে নিয়ে সে বলল, “আমি আয়েশার মাঝে কোন দোষ খুঁজে পাইনি, শুধুমাত্র আমি ময়দা মলার সময় যদি তাকে তা দেখতে বলতাম, এসে দেখতাম সে ঘুমিয়ে গেছে। যার ফলে মাঝে মাঝে পোষা ভেড়া এসে তা খেয়ে ফেলত”(১৮)।

সত্য যাই হোক না কেন, তার সম্পর্কে যে বিদ্বেষপূর্ণ গুজব ছড়িয়ে পড়েছে তা মুহাম্মদকে দুর্বল এবং অসহায় করে তুলেছে। ভাবা যায়, আল্লাহর রাসূলের তেরো বছরের স্ত্রীর অন্য কারো সাথে পরকিয়া করছে?! যেভাবেই হোক এ ঘটনার ইতি টানতে হবে। মুহাম্মদ এখন যতদূর বলতে পারেন, আবদুল্লাহ বিন উবাই সেই ব্যক্তি যিনি পরচর্চা শুরু করেছিলেন, কিন্তু তিনি এই ক্ষেত্রে তেমনই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকলেন, মরুভুমির যাত্রাপথে উবাইয়ের উভ্যুত্থানের চেষ্টার খবর জেনে ঠিক যেমনটা ছিলেন তিনি। যদিও বিন উবাইয়ের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল কিন্তু তবুও তার খানিকটা প্রভাব ছিল তখনো; এবং তাকে নির্মূল করার পরিণাম হয়তো খারাপই হবে। সুতরাং এমন ঝুঁকি নেয়াটা কি ঠিক হবে? পানি কোন দিকে গড়ায় তা পরীক্ষা করতে মুহাম্মদ এবার ভরা মজলিশে বিন উবাইয়ের বিষয়টি তোলেন।

যদি আবদুল্লাহ বিন উবাইকে হত্যা করার প্রতি ব্যাপক সমর্থন থাকে, অথবা যদি এ কারণে তীব্র বাধার সম্মুখীন হতে তাহলে শাহাদাকে (আব্দুল্লাহকে, বা তাঁর ইসলাম গ্রহণের ভনিতাকে) অভিশপ্ত করা হবে। আর তখন হয়ে যাবেন কেবল ইতিহাস (নিহত হলেই)। মজলিস শুরুর সাথেই মুহাম্মদ আয়েশাকে সমর্থন করে বক্তৃতা শুরু করেন যে, তিনি তার মধ্যে খারাপ কিছুই পাননি। এমনকি সাফওয়ানের প্রতি তার সমর্থনমূলক কথাও ছিল যে, তিনি তাকে “একজন পুরোদস্তর ধার্মিক” বলে অভিহিত করেছিলেন। এরপর সমালোচকদের থেকে মুক্তি পেতে তিনি একজন স্বেচ্ছাসেবককে আহ্বান জানান, ঠিক যেমনটা

তিনি বদরের পরে করেছিলেন, যারা তাকে তাদের কবিতা দিয়ে উপহাস করেছিল। তিনি বললেন : "কে আমাকে সেই লোকের অভিযোগ থেকে মুক্তি দেবে, যে লোক আমার পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করেছে"(১৯)? মুহাম্মদ আবদুল্লাহর নাম উল্লেখ করেননি, কিন্তু সবাই বুঝতে পেরেছিল যে, তিনি খাজরাজ প্রধানের দিকে ইঙ্গিত করছেন। ইতিবাচক সাড়া পাওয়া শুরু করলেন মুহাম্মদ। আউস গোত্রের অন্যতম প্রধান নেতা সাদ বিন মুয়ায দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন যে, অপরাধী যেই গোত্রের হোক না কেন তিনি তার মাথা কেটে ফেলাকে সমর্থন করবেন – চাই সে আউস বা খাজরাজ যে গোত্রেরই হোক। সাদ কার্যত বললেন, "আপনি কেবল আদেশ করুন, আমরা তা মেনে চলবো।" কিন্তু তারপর তা দক্ষিণে যেতে শুরু করল। সাদ বিন উবাদা (Sad Ubada) নামের একজন গুরুত্বপূর্ণ খাজরাজ নেতা এবং আবদুল্লাহর দীর্ঘদিনের বন্ধু ও মিত্র এবার লাফ দিয়ে উঠলেন। তিনি চেঁচিয়ে বললেন যে, আউস গোত্রকে কখনোই খাজরাজের কাউকে হত্যা করতে দেয়া হবে না। খাজরাজীরাই তাকে রক্ষা করবে। এরপর তিনি সাদ বিন মুয়াযের দিকে ঘুষি দেখিয়ে বলল, "খোদার কসম, আপনি এই কথাগুলো বলতে পারছেন কারণ আপনি জানেন যে সে খাজরাজ থেকে এসেছে। তিনি যদি আউস গোত্র থেকে আসত তাহলে আপনি এভাবে কথা বলতেন না"(২০)। তারপর সাদ বিন মুয়াযের প্রথম চাচাতো ভাই আউস গোত্রের সাদও যোগ দেয় এবং বলে যে, তারাও সত্যি সত্যি তাকে হত্যা করার আদেশ পালন করবে। সে সাদ বিন উবাদাকে লক্ষ করে বলে, "তুমি একজন মোনাফেক, আর তাই তুমি মোনাফেকদের পক্ষে তর্ক করছো" (২১)।

তারা বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে গেলেন, নিজেদের মধ্যে কলহ বাঁধালেন। নামাজের জায়গা ছেড়ে সবাই উঠানে গেলেন এবং পরিস্থিতি ভয়ানক দিকে মোড় নিচ্ছিল, ঠিক মুহাম্মদ যেমনটা আশংকা করেছিলেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, যদি তাদের সাথে তলোয়ার থাকত - মসজিদে অস্ত্র নিয়ে ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল - তবে তারা তক্ষুনি একে অন্যকে শেষ করে দিত, এবং মাটি রক্তে লাল হয়ে যেত। মুহাম্মদ মজলিশ থেকে ওঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে থামানোর জন্য চিৎকার করলেন, (সাহাবিরা থামছেই না) কিন্তু অবশেষে তাকেই লড়াইয়ের মধ্যখানে নেমে আসতে হল লড়াই থামানোর জন্য।

বোঝা যাচ্ছে, বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত সমাধান প্রয়োজন এবং যত তাড়াতাড়ি হবে ততই ভালো হয়। ততদিনে অবশ্য আয়েশা তার বাবার বাড়ি থেকে ফিরে সরাসরি বয়ান কক্ষের পেছনের কক্ষ যেটা (মুহাম্মদ কর্তৃক তাঁর জন্য নির্ধারিত ঘর) এসে বাস করতে থাকেন। আয়েশা ছিলেন এই ঝড়ের মূল কারণ, যা এইমাত্র নামাজের জায়গা ছাড়িয়ে বাইরেও ছড়িয়ে পড়ছিল, এবং আয়েশাও নিশ্চয়ই প্রতিটি শব্দ শুনেছেন! জামাত ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর মুহাম্মদ মসজিদের পর্দা ঠেলে ভেতরের ঘরে ঢুকলেন। আয়েশা এবং তার এক বান্ধবী কাঁদছিলেন। মুহাম্মদ সেখানে বসলেন, আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন "আয়েশা, তুমি জানো মানুষ কি বলাবলি করছে। যদি তুমি সত্যিই কোন পাপ করে থাকো তাহলে আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহর কাছে তওবা কর। আল্লাহ তার বান্দাদের তওবা কবুল করেন" (২২)। মুহাম্মদের নিজের মনেও কিছু প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। যদি সে দোষ স্বীকার করে, তাহলে তাকে ঈশ্বর ক্ষমা করবেন, কিন্তু তাকে পার্থিব শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী ব্যভিচারীদের (বিবাহিত হলে) পাথর ছুঁড়ে হত্যা করতে হয়।

মুহাম্মদ বেশ কয়েক বছর আগেই তাঁর অনুসারীদের মধ্যে নজির স্থাপন করেছিলেন, যখন ব্যভিচারে লিপ্ত দুই ইহুদিকে তার সামনে আনা হয়েছিল। বদরের আগে এই ঘটনা ঘটেছিল, এবং তখনও তার সাথে ইহুদিরা কথা বলত। সম্ভবত অপরাধীরা একটি সাধারণ গোত্রের ছিল যার উপর মুহাম্মদের এখতিয়ার ছিল, অন্যথায় তাদের বিচার ইহুদি আদালতেই করা হতো (২৩)। মুহাম্মদ ইহুদি রাব্বিদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিভাবে তারা এই ধরনের পরিস্থিতির (ব্যভিচার সংক্রান্ত) মোকাবেলা করে? তারা ব্যাখ্যা করে যে, নবীদের দিনগুলোতে ব্যভিচারীদের পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হতো, কিন্তু তারপর দেখা গেল এক রাজার কন্যা ব্যভিচারে লিপ্ত হল। রাজা কন্যাকে পাথর মারতে পারলেন না, ফলে শাস্তি কমিয়ে দোষীদের চাবুক মারা হয়েছিল এবং চূড়ান্ত অপমানের জন্য তাদের মুখ ছাই দিয়ে কালো করে দেয়া হয়েছিল, এবং তাদের একটি গাধার পিঠে চড়িয়ে শহর জুড়ে হাঁটানো হয়েছিল। রাব্বিরা মুহাম্মদকে বলেন, এটিই পুরুষ ও নারীর শাস্তি হওয়া উচিত। মুহাম্মদ তাদের

শাস্ত্র দেখতে চাইলেন। তারা তাদের তওরাত তার কাছে নিয়ে এলো এবং সেখান থেকে তাদের একজনকে তা পড়তে বাধ্য করলেন। যখন তিনি পড়ছিলেন, রাব্বি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদের উপর হাত রাখলেন এবং এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেখানে আরেকজন ইহুদি পন্ডিত যে দলত্যাগ করে মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছিল সে সেই অধ্যায়টি রাব্বিকে জোরে জোরে পড়তে বাধ্য করল যেখানে নবীদের দ্বারা আরোপিত শাস্তি সম্পর্কে বলা আছে। শাস্তি ছিল পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা, আর তাই মুহাম্মদ ঐ দুজন ইহুদি ব্যভিচারীদের ব্যাপারে একই আদেশ দিলেন। অপরাধীদের মসজিদের প্রধান ফটকের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মারা না যাওয়া পর্যন্ত একদল লোক তাদের উপর পাথর ছুঁড়তে থাকে। সুতরাং একই শাস্তি আয়েশার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে (ব্যভিচার প্রমানিত হলে)। মুহাম্মদ কয়েক সপ্তাহ ধরে আয়েশার বিষয়টা নিয়ে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিলেন।

হাতাহাতির কারণে নামাজের জায়গাটি তছনছ হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মদ সামান্য মাথা ঘোরা এবং উদ্বেগ অনুভব করতে শুরু করলেন যা খিঁচুনির সাধারণত আগে হয়ে থাকে, সেই সাথে তার মাথায় চাপও বাড়তে থাকে। তিনি আয়েশার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তার চোখ লাল হয়ে গেছে। মুহাম্মদের চোখ ছলছল করছে এটা ভেবে যে, তার এই সুন্দর তরুণী বধুর চেহারা শেষপর্যন্ত পাথরের আঘাতে থেতলে যাবে, ঠিক যেমনট হয়েছিল ইহুদি অপরাধীদের মুখগুলো। এটি ভাবতেই তার মাথা ঘোরা এবং উদ্বেগ আরো বেড়ে যাচ্ছিল। আয়েশা তেরো বছর ধরে তার জীবনে আছে। তিনিই প্রথম আয়েশার জন্মের পর তার বাবা-মাকে অভিনন্দন জানান এবং তিনিই প্রথম শিশুটিকে কোলে তুলে নেন। তার সাথে অনেক মূল্যবান স্মৃতি আছে, যেমন তিনি তার সাথে মসজিদের উঠোনে দৌড়াদৌড়ি করতেন, এবং সবার বিনোদনের জন্য তাকে জিতিয়ে দেয়া হতো। সে খুব খেলাপ্রিয় ছিল, যেমন মুহাম্মদ যখন মাঝরাতে বিছানায় বসে অতিরিক্ত নামাজ পড়তেন। আয়েশা তখন আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতেন। মুহাম্মদ একবার তাকে নামাজ চলাকালীন ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে তিনি বুঝতে পারেন যে, নামাজের সময় এভাবে পা ছড়িয়ে দিয়ে নামাজে ব্যঘাত ঘটানো উচিত না। তিনি শেষপর্যন্ত তার (মুহাম্মদের শিশু-স্ত্রী) কাছে এটি একটি খেলা ছিল। তারপর থেকে আয়েশা দেয়ালের দিকে পিঠ ঠেকিয়ে চিবুকে হাঁটু টেনে বসে থাকত, খিলখিল করে হাসতে থাকত, মুহাম্মদ যখন সেজদায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতেন তখনই সে তার হাঁটু প্রসারিত করে দিত, সেজদা শেষ হলেই হাঁটু টেনে তার চিবুক পর্যন্ত ধরে রাখত, আবার যখন সেজদা থেকে ওঠে দ্বিতীয় সেজদা দিতে মুহাম্মদ প্রস্তুত হতেন তখনই সে তার পা আবার প্রসারিত করে দিত। তার সাথে বিছানায় থাকাকালীন কোরআনের অনেক আয়াত মুহাম্মদের কাছে এসেছিল। কি সংখ্যক রচিত হয়েছিল সেই সংখ্যাটা বলতে হয়ত তার কষ্ট হবে, কিন্তু সেটা তার অনন্য স্ত্রীদের সাথে থাকার সময়ের চেয়ে পরিমাণে বেশি ছিল।

খিঁচুনি শুরু হওয়ার লক্ষণগুলো ক্রমশ বাড়তে থাকে যখন মুহাম্মদ আয়েশার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মনে হচ্ছিল আয়েশা তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে এবং তার মাথায় চাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে। আয়েশা সেখানে উপস্থিত তার পিতামাতার কাছে তার আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলার আহ্বান করলেন, কিন্তু তার মা বলেন, "আল্লাহর কসম, আমরা জানি না তাঁকে (মুহাম্মদকে) কি জবাব দিতে হবে"। অবশেষে আয়েশা বললেন, "আপনি যেইজন্য আমাকে আল্লাহর কাছে তওবা করতে বলেছেন, আমি সেইজন্য তওবা করবো না। আমি শপথ করে বলছি, আমি ভালো করেই জানি যে, লোকে যা বলছে তা যদি আমি নিশ্চিত করি যেখানে আল্লাহ জানে আমি নির্দোষ, তার মানে যা ঘটেনি তা আমি নিশ্চিত করলাম। আর যদি তারা যা বলছে তা আমি অস্বীকার করি, তাহলে আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন না" (২৪)।

মুহাম্মদ সুবিধামতো খিঁচুনির ভান করতে পারতেন যেমনটা করেছিলেন তিনি আয়েশার সাথে, তারই ঘরে, কয়েকমাস আগে একই বিছানায় তার পালকপুত্রের প্রাক্তন স্ত্রী জয়নাবকে বিয়ে করার অনুমতির কথা আল্লাহর তরফ থেকে পেয়েছেন বলেছিলেন। কিন্তু এবারেরটা ভনিতা ছিল না। এর আগের অস্বস্তি এবং মাথার ভিতর যে চাপ অনুভূতিতে অগ্রসর হয়েছিল তা প্রচন্ড ভয় শেষে তাকে এক ধরনের চরম সুখানুভূতি এনে দিল, তিনি ভেবেছিলেন যেন তিনি ঐশ্বরিক সংস্পর্শে ছিলেন।

তারপর তার শরীরের কম্পন শুরু হলো, যেটা আসলে সেই আগের মতোই তার মস্তিষ্কের টেম্পরাল লোব হতেই উদ্ভূত। আবু বকর ও তার স্ত্রী আয়েশা এই উপসর্গগুলো জানতেন। তাদের কাছে এটির ব্যাখ্যা ছিল। আবার মুহাম্মদের সাথে আল্লাহ তার যোগাযোগ স্থাপন করছেন। তারা সেখানে একটি মহান ঘটনার সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য সৌভাগ্যবান মনে করে রোমাঞ্চিত হলেন। আয়েশা কখনও নিজেকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ মনে করেননি যে, আল্লাহ তার সম্পর্কে কথা বলবেন। কিন্তু এটা পারিবারিক ঐতিহ্যের অংশ, ঠিক যেমন মক্কা থেকে পালানোর সময় আল্লাহ আবু বকরকে মুহাম্মদের সফরের সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। এই সম্মান আবু বকরকে এতটাই বিগলিত করেছিল যে, তিনি এটা শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন।

এখন আল্লাহ তার সম্পর্কে তার রাসূলের সাথে কথা বলছে! ছোট আয়েশা আল্লাহর উপর ভরসা করলেন। এখন তার রায় ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। মুহাম্মদ আয়েশার বিছানায় প্রসারিত হয়ে শুলেন। তারা তার মাথার নিচে একটা চামড়ার বালিশ দিলেন এবং তাকে তার পোশাক দিয়ে ঢেকে দিলেন। ইসলামিক ইতিহাস গ্রন্থের কোথাও উল্লেখ নেই তার এই অবস্থা কতক্ষণ স্থায়ী ছিল, কিন্তু যখন তিনি তা থেকে মুক্তি পেলেন তিনি এরপর ওঠে বসলেন। কপাল থেকে ঘাম মুছতে মুছতে হেসে বললেন, "আনন্দ করো, আয়েশা! আল্লাহ তোমাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেছেন"(২৫)। তিনি তার কাছে আসা আয়াতের পুনরাবৃত্তি করলেন, খুব সম্ভবত তার মাথায় দিনের পর দিন এই কথামালা ঘুরপাক খাচ্ছিল। তিনি আয়েশার বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানোর জন্য আরেক আয়াত দিয়ে নিন্দা জানিয়েছিলেন, এবং এর সাথে আরো সাধারণ কিছু আয়াত যুক্ত ছিল, যাতে গুজব ছড়ানোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং মিথ্যা সাক্ষ্যকে পাপ বলে একটি কঠোর শাস্তির আওতায় আনা হয়েছিল যা ছিল আশিটি বেত্রাঘাত। তিনি ওঠে দাঁড়িয়ে বিশ্বাসীদের একটি সমাবেশের আহ্বান জানালেন এবং সমাবেশ থেকে তার রচিত আল্লাহর বাণী পাঠ করলেন। তার ঐশ্বরিক এই বাণী যেন জিহ্বায় চাবুক মেরে দিচ্ছে :

لَوۡ لَاۤ اِذۡ سَمِعۡتُمُوۡهُ ظَنَّ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتُ بِاَنۡفُسِهِمۡ خَیۡرًا ۙ وَّ قَالُوۡا هٰذَاۤ اِفۡکٌ مُّبِیۡنٌ ﴿۱۲﴾

"যখন তোমরা এটা শুনলে, তখন কেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা তাদের নিজদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করল না এবং বলল না যে, 'এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ'?" (২৬)। তিনি অবশেষে মিসতাহ, হামনা এবং হাসসানকে চাবুক মারার আদেশ দিয়ে এই ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করলেন। কিন্তু খাজরাজের প্রতিক্রিয়ার ভীত হয়ে তিনি আবদুল্লাহ বিন উবাইকে কোন শাস্তি না দিয়েই ছেড়ে দেন।

আউস এবং খাজরাজের মধ্যে পরিস্থিতি ঠিক করার জন্য মুহাম্মদ ব্যক্তিগত উদ্যেগে আন্তঃগোত্রীয় নৈশভোজের আয়োজন করেন। প্রথমবারের এই ধরনের আয়োজনে মুহাম্মদ আউস নেতা সাদ বিন মুয়াদকে হাতে ধরে সাদ বিন উবাদার বাসভবনে নিয়ে যান, যিনি একদল খাজরাজীর সাথে বসে ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই উবাদা খাবার এনে হাজির করলেন। এবং উভয়পক্ষই মাংসের বাটিতে হাত রেখে অন্যের সাথে শান্তির সমঝোতা করল। কয়েকদিন পরে মুহাম্মদ সাদ বিন উবাদাকেও হাত ধরে সাদ বিন মুয়াযের গোত্র-প্রাঙ্গণে নিয়ে গেলেন, যেখানে তিনিও তার একদল লোকের সাথে বসে ছিলেন। আবার সেখানে খাবার পরিবেশন করা হলো।

বিষয়টি সমাধানের জন্য মুহাম্মদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইতোমধ্যে ঘটা একটি ঘটনা আরেকটি নয়া জটিলতার দিকে মোড় নেয়া শুরু করেছে। সাফওয়ান হাসসানকে (হাসসান মুহাম্মদের সভাকবি ছিলেন) হত্যা করার চেষ্টা করে। হাসসানের রচিত কবিতাগুলোর মধ্যে সাফওয়ানকে নিয়ে উপহাস রয়েছে। শুধুমাত্র চাবুক মেরেই হাসসানকে মুক্তি দেয়ায় তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। সাফওয়ান বরাবরই আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছেন যে, তিনি কেবল দিনের আলোতে শুধুমাত্র আয়েশার সাথে উটে চড়ে এসেছেন যেটি পুরো সেনাদল এবং মুহাম্মদ দেখেছেন, সুতরাং তাদের মধ্যে কিছুই ঘটেনি। যদি তারা সত্যিই অভিযুক্ত হত, তাহলে কি তারা এ ব্যাপারে এত স্বচ্ছ থাকত? কিন্তু তার এই আত্মপক্ষ সমর্থন হাসসানকে মুগ্ধ করেনি, তাই তার সম্পর্কে কবিতা লেখে এবং গুজবে কান দেয়। সাফওয়ান তাকে একটি খাজরাজী সভায় খুঁজে বের করে, এবং লোকজন

নিরস্ত্র করার আগেই হাসসানের দিকে তলোয়ার দিয়ে একটি কোপ বসিয়ে দেয়। সাফওয়ান চেঁচিয়ে হাসানের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় বলেছিল, "এই যে তোমার জন্য আমার তলোয়ারের ধার! যখন তুমি আমার মতো একজন মানুষকে ব্যঙ্গ কর তখন প্রত্যুতরে কোন কবিতা তুমি পাবে না (২৭)! হাসসান গুরুতর আহত হন। যখন মুহাম্মদ এটা জানতে পেরেছিলেন তিনি সাফওয়ান এবং হাসসান উভয়কেই মসজিদে নিয়ে আসেন। উভয় পক্ষের কথা শোনার পর তিনি রায় দিলেন, "সাফওয়ানকে বন্দি কর, এবং যদি হাসসান মারা যায় তাহলে তাকেও মেরে ফেল" (২৮)।

খাজরাজীরা আয়েশার ঘটনায় যথেষ্ট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে এবং হাসসানের উপর চাপ সৃষ্টি করে সাফওয়ানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ প্রত্যাহার করে নিতে এবং শান্তিপূর্ণভাবে বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে। মুহাম্মদও তাতে রাজি হলেন, হাসসানকে বললেন, "নিজের আঘাতের ব্যাপারে যত্ন নিও" (২৯)। আরেকটু মিষ্টি ঢালতে তিনি তার ভাড়াটে কবির জন্য একটি দুর্গ এবং একটি বাগান গিফট করলেন, যা ইহুদি বানু নাযীর গোত্রের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। প্রথমে এই জায়গাটা অন্য একজনকে গনিমতের মাল হিসেবে পুরস্কৃত প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু সে তা মুহাম্মদের হাতেই ফেরত দিয়েছিল যাতে তিনি এটিকে দাতব্য কাজে ব্যবহার করতে পারেন।

অনেক দশক পরে, অবশেষে আয়েশা তার সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায়টি পেতে সক্ষম হন : "ইবনুল মুয়াত্তাল (সাফওয়ান) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং জানা যায় যে সে নপুংশক ছিল, সে নারীদের সংস্পর্শে আসত না। এরপর সে শহীদ হয়। তার উপর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বর্ষিত হোক" (৩০)।

অধ্যায় - ২২
সশস্ত্র পরিখা যুদ্ধ

অভিযান ও হত্যাকাণ্ড অব্যাহত ছিল। একটি অভিযানে মুহাম্মদ উত্তর-পূর্ব মালভূমির শক্তিশালী গাতফান (Ghatafan) গোত্রের বিরুদ্ধে চারশো লোককে নেতৃত্ব দেন, তিনি তাদের বিরুদ্ধে প্রথমে আক্রমণ চালান এবং সংঘর্ষের পরে তিনি তাদের বেশ কিছু নারীকে করায়ত্ব করেন। ইয়াছরিবের জনসংখ্যা গাতফানের সমানই হবে। তারা ইয়াছরিবের পূর্ব ও উত্তরে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করত। গোত্র এবং উপগোত্র সমূহ পৃথকভাবে ঘোরাফেরা করত এবং তাদের পশুপালের জন্য যেখানেই পানি এবং ঘাস পাওয়া যেত, সেখানেই তারা তাদের তাঁবু স্থাপন করত। এই হামলার ঘটনা ঘটেছিল যখন একজন ভ্রমণকারী মুহাম্মদকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি গাতফানদের ইয়াছরিবের উপর হামলা চালানোর জন্য যোদ্ধাদের জমায়েত হতে দেখেছিলেন। মুহম্মদের এই আক্রমণের বিবরণ অতটা স্পষ্ট নয়, তবে ইসলামিক গ্রন্থে নারীদের ধরে আনার কথা বলা হয়েছে। কাহিনীর পরিক্রমায় দেখা যায়, একজন বন্দি নারীর বর মুহাম্মদকে হত্যা এবং তার স্ত্রীকে পুনরুদ্ধারের অভিপ্রায় নিয়ে আক্রমণকারীদের পিছু নিয়েছিলেন, তবে তিনি কেবল তীর দিয়ে রক্ষীদের একজনকে বিদ্ধ করতে পেরেছিলেন (১)। সেই বর, তার স্ত্রী এবং অন্য বন্দি নারীদের ভাগ্য কি ঘটেছিলো তা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। তবে নারীদের ক্ষেত্রে তিনটি সম্ভাব্য পরিণতি হয়েছিল : ১. এদের যৌনদাসে পরিণত করা হয়েছিল, ২.দাসের বাজারে বিক্রি করা হয়েছিল, বা ৩. মুক্তিপণের জন্য রাখা হয়েছিল।

এই সময়কালে, মুহাম্মদ পূর্ব-পশ্চিম বাণিজ্যপথের একটি প্রাচীন কাফেলা শহর দুমায় (Duma) একটি দুর্ধর্ষ আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন। দুমা শহরটি লোহিত সাগরকে পারস্য উপসাগরের সাথে যুক্ত করেছিল। এটি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে ইয়াছরিব থেকে পাঁচশো মাইল উত্তরে একটি ঊষর, বেলেপাথরে ভরা খ্রিস্টান শহর ছিল। এটি প্রাচীন পৌত্তলিক মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষের বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক বাজারও ছিল। মুহাম্মদ এই প্রথমবারের মতো ব্যক্তিগতভাবে এতদূর উত্তরের দিকে কোনও বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যার কারণ ছিল মূলত মাল লুণ্ঠন করা, খ্রিস্টানদের ভয় দেখানো এবং ইহুদি ও পৌত্তলিকদের মনেও তার ব্যাপারে ভয় ধরিয়ে দেয়া যাতে তারা ইয়াছরিবে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকে। সে সময় এই অঞ্চলটির মহাসড়কে পণ্যসম্ভারসহ বণিকদের কাফেলার যাতায়াত ছিল যেখানে ডাকাতরা অতর্কিত হামলা চালাত। তাই তিনি জানতেন যে, কেবল এই ডাকাতদের ছিনতাই করার মাধ্যমেই প্রচুর লুটের মাল পাওয়া যাবে। একজন পথপ্রদর্শক মুহাম্মদকে তাঁর এক হাজার সৈন্যবাহিনী সহ এমন এক উপত্যকায় নিয়ে গেল যেখানে ডাকাতরা তাদের ডাকাতি করা পশুপাল চরাচ্ছিল। মুহাম্মদ আগাম কোনরকম সতর্কতা ছাড়াই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ইসলামী গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে, আল্লাহর রাসূল যাকে পেরেছেন আক্রমণ করেছেন। "যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা সবদিক দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল" (২)। সেখান থেকে মুহাম্মদ এবং তার লুটেরা বাহিনী দুমার দিকে যাত্রা করল, কিন্তু তারা সেখানে পৌঁছে যাওয়ার সাথে সাথে নগরবাসী, যাযাবর এবং ব্যবসায়ীরা সবাই পালিয়ে গেল। শহরটি লুট করার পরে মুহাম্মদ ইয়াছরিবের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন এবং পুরো একমাস পরে বাড়ি পৌঁছলেন।

ততদিনে উহুদের যুদ্ধের এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, এবং মুহাম্মদের জন্য মক্কাবাসীদের সাথে পুনরায় মুখোমুখি হতে আবু সুফিয়ানের দেয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সময় চলে এসেছে। তবে খরার কারণে পুরো অঞ্চলে পশুখাদ্য ঘাসের অভাব দেখা দেয়ায় আবু সুফিয়ান শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে গেলেন। এটি মুহাম্মদকে একটি সহজ জনসম্পৃক্ত বিপ্লব করার সুযোগ দিয়েছে - সুফিয়ানের মক্কায় অবস্থানের খবর আগেই জেনে, তিনি বদর প্রান্তরের উদ্দেশ্যে ফাঁকা অভিযানে (সুফিয়ানের দেয়া চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী) তাঁর বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মক্কাবাসীরা যেহেতু মোকাবেলা করতে আসেনি, তাই তিনিই বিজয় ঘোষণা করেন। যদিও মুহাম্মদকে একেবারে চিরতরের জন্য শেষ করার উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ান পরের একটা বছর ধরে

ইয়াছরিবে একটি বৃহত্তর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মক্কার নেতৃত্বে ইয়াছরিব আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে একটি জোটে যোগ দিতে রাজি করানোর জন্য মুহাম্মদের সাথে শত্রুভাবাপন্ন যাযাবর আদিবাসীদের কাছে মক্কার রাষ্ট্রদূতদের পাঠানো হয়েছিল। তারা সমস্ত আরব জুড়েই আগ্রহ দেখেছে, কেননা মুহাম্মদের জোরপূর্বক ধর্ম চাপিয়ে দেয়ার অভিযানটিকে তারা সবাই নিজেদের জানমালের নিরাপত্তার হুমকি মনে করছে। মুহাম্মদের শত্রুদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বানু নাযীর গোত্রের ইহুদিরা, ইয়াছরিব থেকে মুহাম্মদ তাদেরকে বের করে দেয়ার পরে তারা খাইবারে বসতি স্থাপন করেছিল। আবু রাফি নামে পরিচিত কবি সাল্লাম হুকাইকের (Sallam Huqayq) নেতৃত্বে ছয়জন বানু নাযীর নেতা মক্কায় গিয়ে মক্কাবাসীদের সাথে এক অভিন্ন উদ্দেশ্যে জোট গঠনের প্রস্তাব দেন। তারা পৌঁছলে আবু সুফিয়ান তাদেরকে খোলা বাহুতে জড়িয়ে ধরলেন। মক্কাবাসীদের ধর্ম মুহাম্মদের ধর্মের চেয়ে ভালো ছিল এবং তারা সত্যের নিকটবর্তী আছেন, এই আশ্বাসের জন্য পুরো শহরজুড়ে তাদের মেহমানদারি করা হয়েছিল (৩)। সংহতি প্রকাশের সময় ইহুদিরা মক্কার নেতাদের সাথে মন্দিরের দিকে গিয়েছিল, যেখানে মক্কাবাসী এবং ইহুদিরা তাদের হৃদয় থেকেই মন্দিরের আচ্ছাদন স্পর্শ করেছিল আর মুহাম্মদকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত লড়াই করে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করল (৪)। মক্কা থেকে ইহুদিরা ইয়াছরিবের উত্তর-পূর্বে গাতফান অঞ্চলগুলিতে রওনা হয়ে গাতফানদেরকে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

তবে তাদের এই সংহতি টিকেনি। মুহাম্মদ মক্কায় এবং গাতফানে ইহুদিদের সফর সম্পর্কে ইতিমধ্যে জানতে পেরেছিলেন। খাইবার ইহুদিদের ভয় দেখাতে তিনি খায়বারের দুর্গে ঢুকে কবি আবু রাফিকে হত্যা করার জন্য খুনিদের একটি দল নিয়োগ করেছিলেন। ঘাতকদের নেতৃত্বে ছিলেন হিব্রু ভাষায় কথা বলা খাজরাজ উগ্রবাদী আবদুল্লাহ বিন আতিক এবং আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস - এই ইবনে উনাইসকে যাকে মুহাম্মদ আঠারো মাস আগে হুযায়লি নেতা সুফিয়ান ইবনে খালিদকে হত্যার জন্য নিয়োগ করেছিলেন। প্রাচীন বালির মাঠের মধ্যে একটি সরু উপত্যকায় খায়বার অবস্থিত ছিল এবং সেখানে খেজুর গাছের গাছগুলি ছাপিয়ে বিশাল দুর্গের সারি ছিল। আবু রাফির দুর্গটি ছিল অন্যতম বৃহত্তম এবং উপত্যকা জুড়ে নেতৃত্ব দেয়ার মতো একটা অবস্থানে। হিব্রু ভাষায় তার সাবলীলতার কারণে আতিক এবং তার ঘাতক দল রাতে দুর্গে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং তারা শোবার ঘরেই আবু রাফিকে হত্যা করেছিল। খুনিরা সেচ খাদের মধ্যে লুকিয়ে তাদের সন্ধানকারীদের ধোঁকা দিয়ে পালাতে সক্ষম হয় এবং তাদের সাফল্যের কথা ইয়াছরিবে ফিরে এসে মুহাম্মদকে জানায় (৫)।

শেষপর্যন্ত যখন ইয়াছরিবে জোটবদ্ধ আক্রমণ করার সময় আসে তখনই খাইবারের ইহুদিরা সরে দাঁড়ায়। এটি সম্ভবত আবু রাবি হত্যার পরিণতি দেখে হতে পারে, তবে ইয়াছরিবের শেষ অবশিষ্ট ইহুদি গোত্র বানু বানু কুরাইযাও তাদের উপর চাপ দিয়েছিলেন সরে আসতে। তাদের আশঙ্কা ছিল যে, জোটের আক্রমণ ব্যর্থ হলে মুহাম্মদ খায়বার ইহুদিদের জড়িত থাকার বিষয়টি তাদের বিরুদ্ধে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করবেন, যেমনটা তিনি বানী কায়নূকা ও বানু নাযীরের ইহুদিদের সাথে করেছিলেন। খাইবারকে দূরে থাকার জন্য চাপ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মদ প্রথমবার ইয়াছরিবে আসার পর বানু বানু কুরাইযাইহুদিদের সাথে যে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, তা পুনরায় নিশ্চিত করতে বানু বানু বানু বানু বানু কুরাইযার ইহুদিরা মুহাম্মদকে বার্তা পাঠিয়েছিল। মক্কা থেকে মুহাম্মদ তার জীবন নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রায় সাড়ে চার বছর পরে ৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির শেষদিকে জোটের আক্রমণ শুরু হয়। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কী সেনাদল চার হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা ত্যাগ করে। এই বাহিনীর মধ্যে আবিসিনিয়ার ভাড়াটে যোদ্ধার দল এবং প্রতিবেশি ও দূর তায়েফের যাযাবর গোত্রের মিত্রদের দ্বারা সরবরাহ করা লোকজনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে সেনাদল উত্তরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে, আরো কিছু বিচ্ছিন্ন বেদুইন গোত্রের যোদ্ধারাও তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন, যাদের সাথে হয় মুহম্মদের বিরোধ ছিল নতুবা লুটপাটের আশায় তারা যোগ দিয়েছিল। জোট সেনাদল ইয়াছরিব পৌঁছতে পৌঁছতে সেনাসংখ্যা দশ হাজার লোকের বিশাল এক আকার ধারণ করে। ইতিমধ্যে গাতফানরা দুই হাজার যোদ্ধা নিয়ে উত্তর থেকে ইয়াছরিবের দিকে যাত্রা করেছে।

ইয়াছরিবের উদ্দেশ্যে একটি বিশাল সেনাদল রওয়ানার পরেই কেবল তার খবরটি মুহাম্মদ জানতে পারেন তাই প্রতিরক্ষার প্রস্তুতির জন্য তিনি খুব কম সময় পান। যথারীতি তার সংবাদদাতা ছিলেন তার চাচা আব্বাস, যিনি মক্কাবাসীর সাথেই মিশে ছিলেন, তবে মক্কার সেনাদল মদিনার কাছে যাওয়ার মাত্র ছয়দিন আগে এই বার্তা তিনি মুহাম্মদকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সালমান (Salman) নামের পারস্যের একজন ধর্মান্তরিত মুসলিম শহরের চারপাশে একটি পরিখা খনন করার পরামর্শ দেন, যা এমন পরিস্থিতিতে মক্কার অশ্বারোহী বাহিনীকে ধাঁধায় ফেলে দেবে এবং পরিখাটি পেরোনোর চেষ্টা করলে সময় এটি তাদের জন্য মৃত্যুফাঁদ হিসেবে কাজ করবে। মুহাম্মদ বানু কুরাইযাগোত্রের ইহুদিদের বাদ দিয়ে ইয়াছরিবের অবশিষ্ট প্রতিটি সক্ষম দেহের তিন হাজার লোককে একত্রিত করেছিলেন এই পরিখা খননে। কুরাইযারা সৌজন্য দেখানোর জন্য কাস্তে-কোদাল ধার দিয়েছিল, কিন্তু পরিখা খননের কর্মীবাহিনীতে যোগদানের জন্য মুহাম্মদের অনুরোধকে উপেক্ষা করেছিল। লোকদের একত্রিত করা এবং হুকুম করার সুবিধার্থে মুহাম্মদ তার তাঁবুটি পরিখার কাছেই স্থাপন করলেন। তিনি নিজেও একটি কোদাল হাতে নিয়ে মুমিনদের পাশাপাশি কাজে নেমে পড়লেন। পরিখাটি তিন মাইলেরও বেশি দীর্ঘ হল। উপত্যকার দক্ষিণ দিক ধরে এটি আঁকাবাঁকা হয়ে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছিল, যেখানে এটি একটি পর্বতের সাথে সংযুক্ত ছিল, এবং উত্তরাঞ্চল জুড়ে পূর্বদিকে এটি বালির ক্ষেত অবধি পৌঁছল যার মাঝ বরাবরে ছিল কিছু দালানকোঠা, দেয়াল এবং পাহাড়। প্রাচীরযুক্ত পাছপালা, দুর্গ এবং জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের গ্রামগুলির মধ্যকার সংযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক প্রাচীর গড়ে তুলতে মুহাম্মদ পূর্বদিকের বালির মাঠও বিবেচনায় আনেন। পরিখা খননের অঞ্চলটি বিস্তৃত ছিল। পরিখাটি কমপক্ষে ছয় ফুট গভীর ছিল এবং বেশিরভাগ জায়গায়ই অশ্বারোহীদের উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পার হওয়া ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল। মুহাম্মদের প্রতিরোধকারী যোদ্ধাদের জন্য পরিখার ভেতরের কিনারা জুড়ে নরম কাদার আস্তরণ ছিল। শত্রু সেনাদল উপত্যকার নিকটবর্তী হলে মোহাম্মদ পরিখার বাইরের দিকে বসবাসকারী প্রত্যেককে তাদের গবাদিপশু এবং সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র সাথে নিয়ে ভেতরে যাওয়ার আদেশ দিলেন। পুরুষরা কাদার আস্তরণের মাঝে অবস্থান নিয়েছিল, আর নারী, শিশু এবং প্রবীণদের দুর্গে পাঠানো হয়েছিল। দিনরাত অবিরাম কাজকর্মের ফলস্বরূপ, পরিখা খননের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল আক্রমণকারীরা উহুদ পর্বতের পাদদেশে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসর হওয়ার অব্যবহিত পূর্বেই। মক্কাবাসী ও তাদের মিত্ররা পাহাড়ের ছায়ায় তাদের শিবির স্থাপন করেছিল এবং ইয়াছরিবকে আক্রমণ করার জন্য যেকোনো সময় প্রস্তুত ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, তাদের সামনে একটি সহজ বিজয় অপেক্ষা করছে। তারা মনে করেছিল তাদের বাহিনী মুহাম্মদের প্রতিরক্ষা-ব্যুহ ভেঙে তাদের বসতি স্থাপনকারী অঞ্চলে প্রবেশ করবে; তার সাথে মক্কার বিশ্বাসঘাতকদের সাথে মুহাম্মদকেও হত্যা করা হবে; তার মসজিদটিকে আগুনে পুড়িয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হবে; তার ধর্মও ধ্বংস হবে। কিন্তু হায় - পরিখাটির কাছে না যাওয়া পর্যন্ত এর বিষয়ে যে তাদের ন্যূনতম ধারণাও ছিল না! অশ্বরোহী এবং পদাতিক সৈন্যরা যখন সেখানে পৌঁছেছিল, তাদের উদ্দেশ্যে কাদার আস্তরণের আড়ালে পেছন থেকে তীরের ঝাঁক ও পাথরের গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। সুতরাং পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। সমূলে বিনাশের উদ্দেশ্যে নিয়ে মক্কাবাসীরা যে আক্রমণ করতে এসেছিলেন সেই আশা যেন একটা স্থবির অবস্থায় এসে দাঁড়ালো।

অচলাবস্থাটি প্রায় তিন সপ্তাহ স্থায়ী হয়েছিল। মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত লড়াই চলছিল, তবে লড়াইয়ে বেশিরভাগই একে অপরের উদ্দেশ্যে পরিখার কাছাকাছি থেকে পাথরের গুলি চালিয়েছিল। উভয়পক্ষের মাঝে তীর ছোঁড়াছুড়ির মাঝে নিশ্চয়ই অসংখ্য আহত হয়েছে, আদিগ্রন্থে কেবল দশজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। নিহতদের মধ্যে দু'জন ছিল মক্কার একটি ছোট্ট ঘোড়সওয়ার দলের অংশ যারা একটি সরু জায়গার খাঁদ দিয়ে তাদের ঘোড়াগুলি নিয়ে প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অশ্বারোহীদের মধ্যে একজন ছিলেন বিখ্যাত মক্কাবাসী যোদ্ধা আমর, যিনি এই পরিখাটি পার হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে মুহম্মদের লোকদের মুখোমুখি লড়ার চ্যালেঞ্জ জানালেন। কিন্তু আলী যখন তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন আমর তার পরিবর্তে অন্য কাউকে আসতে বললেন। "তোমার বাবা আমার বন্ধু ছিল। আমি তোমাকে মারতে চাই না" – আমর বললেন। আলী জবাবে বললেন "তবে আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই"(৬)। তারা মুখোমুখি হলেন, এবং একপর্যায়ে আমর মারা নিহত হলেন। কথিত আছে যে, পিছু হটার সময় ঘোড়া নিয়ে খাদে পড়ে আরেক ঘোড়সওয়ারের মৃত্যু হয়। তলোয়ারের আঘাতে

তার ঘোড়ার উপরের আসন থেকে বাঁধন কেটে যায়, যার ফলে সে ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে যায়। মুহাম্মদের লোকেরা তাকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে থাকে, কিন্তু সে তাদের কাছে অনুরোধ করে যেন অন্তত একটু সম্মানজনক উপায়ে তারা তাকে হত্যা করে। "হে আরব, এরচেয়েও ভালো একটি মৃত্যু প্রার্থনা করছি!" – বলছিল সে। কথিত আছে, আলী – আরেকটি সূত্র বলছে, এটা জুবায়ের - খাদে ঝাঁপ দিয়ে নেমে তাকে কুপিয়ে হত্যা করে। দু'পক্ষের মাঝে পাল্টাপাল্টি আঘাত সহ, গভীর রাতে বেশ কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও ঘটে যখন মুহাম্মদের দুজন পাহারাদার বিপরীত দিক থেকে আসছিল এবং আঘাতের মুখে পড়ে। তারা যে একই পক্ষের তা বুঝতে না পারা পর্যন্ত অন্ধকারে একে অপরের সাথে লড়াই করে যাচ্ছিল। জুবায়েরের মা সাফিয়াকেও একটি হত্যার জন্য দায়ী করা হয়েছিল। যে দুর্গে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখান থেকে ইহুদি বলে মনে হওয়া এক ব্যক্তিকে তিনি দেখতে পেলেন, যে দেয়াল টপকে ভেতরে আসার চেষ্টা করছিল। তিনি ছুটে এসে একটি মোটা লাঠি নিয়ে তাকে পিটিয়ে হত্যা করলেন। আহতদের মধ্যে মুহাম্মদের নিকটতম ব্যক্তিদের অন্যতম আউস নেতা সাদ বিন মুয়াযও ছিলেন। একটি তীর তার কব্জির উপরে আঘাত করেছিল এবং কয়েক সপ্তাহ পরে এর সংক্রমণ থেকেই তিনি মারা যান। মক্কাবাসী ও তাদের মিত্ররা দীর্ঘদিন ধরে অবরোধের জন্য অপ্রস্তুত ছিল এবং শীঘ্রই তাদের নিজেদের জন্য খাদ্য এবং তাদের পশুর জন্য খাবার সরবরাহের বিষয়ে তাদের দুশ্চিন্তা করতে হয়েছিল। আবু রাফির হত্যার পরে বানু নাযীর ইহুদিদের নেতা হয়ে যাওয়া হুয়াই বিন আখতাবের সহায়তায় তারা খায়বার থেকে রসদ যোগানের একটি পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। খাদ্য সহায়তা নিয়ে বেশ কয়েকটি ছোট কাফেলা খায়বার থেকে মক্কার যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে ইয়াছরিবে পৌঁছেছিল, কিন্তু মুহাম্মদের লোকেরা একটি কাফেলাকে আটক করার পর তাদের এই সরবরাহও শেষ হয়ে যায়। মক্কার নেতারা বিবাদে জড়িয়ে পড়ল। পরিখার বাধা অতিক্রম করার কোন উপায় তারা দেখতে পেল না। পরিখা ভেদ করতে গেলে তাদের লোকদের জবাই করা হবে এমন ভয় তাদের পেয়ে বসেছিল। আবু সুফিয়ান এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে তাদের এখন একমাত্র ভরসা হচ্ছে বানু কুরাইযার ইহুদিদেরকে ভেতর থেকে আক্রমণ করতে রাজি করা। এটি মুহাম্মদের লোকদের পরিখা থেকে বিচ্যুত করবে এবং তাদের জোটকে বাঁধা টপকে যাওয়ার একটা পথ করে দেবে। বানু কুরাইযার সমর্থন পেতে হুয়াই বিন আখতাবকে (Huyayy) প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদের এলাকাটি উচ্চভূমির দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ছিল এবং বালিরর মাঠ লাগোয়া ছিল। উপত্যকার বাইরের দিক থেকে তাদের দুর্গে যাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল এই সঙ্কীর্ণ বালিরর মাঠ পেরিয়ে যাওয়া। এই ঘুরপথের যাত্রায় হুয়াইয়ের অর্ধদিনের বেশি সময় লেগেছিল। তিনি বানু কুরাইযানেতাদের তাদের সাথে আক্রমণে যোগ দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, তবে তাতে মোটেও আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। কুরাইযারা নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, নিরপেক্ষতা বজায় রাখাই তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র আশা। শেষপর্যন্ত জোটের সংখ্যাধিক্যের দিকে যিনি ইঙ্গিত করে হুয়াই তাদের মন জয় করেন। মক্কাবাসীদের সংখ্যা ছিল অপ্রতিরোধ্য। তারা যদি পরিখা প্রতিরক্ষা ভেঙে ফেলতে সক্ষম হয় তাহলে তাদের বিজয় আর ঠেকায় কে? এবং শেষমেষ মুহাম্মদের মৃত্যু হলে তো আর ইহুদিদের আর তাদের নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কগ্রস্তও থাকতে হবে না! কুরাইযারা পেছন থেকে আক্রমণ করে মুহাম্মদের ধ্বংসসাধনে মক্কাবাসীদের সহায়তা করতে পারে। তাদের সাত শতাধিক যোদ্ধাও মাঠে নামতে পারে। তাদের মোকাবিলা করতে মুহাম্মদকে পরিখার কিনারা থেকে তার যোদ্ধাদের টানতে হবে, এবং তাতে করে যৌথবাহিনী মদিনার ভেতর ঢোকার সুযোগ পেয়ে যাবে। হুয়াই বানু কুরাইযাবাহিনীর শক্তি বাড়ানোর জন্য বালির মাঠ ধরে যোদ্ধা প্রেরণের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন।

অনিচ্ছাসত্বেও বানু কুরাইযার রাব্বি (ইহুদি ধর্মযাজক) ও নেতা কাব বিন আসাদ শেষপর্যন্ত রাজি হলেন তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন "হে হুয়াই, আপনি যে ঘৃণার কথা বলছেন তা আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু আমি আশঙ্কা করছি যে মুহাম্মদকে হত্যা করা যাবে না। তারপর কুরাইশরা তাদের ভূমিতে ফেরত যাবে এবং আমি আমার জায়গায় থাকব, এবং আমিসহ যারা আমার সাথে ছিল তাদের সবাইকে মেরে ফেলা হবে" (৮)। হুয়াই বিন আখতাব প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যদি এরকম পরিণতি হয় তবে তিনিও তাদের সাথে থাকবেন এবং একই ভাগ্য বরণ করবেন।

মুহম্মদের সর্বত্রই চোখ এবং কান ছিল, সুতরাং বানু কুরাইযার নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে সরে আসার খবর তার কাছে দ্রুত পৌঁছে গিয়েছিল। তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে কিনা তা জানার জন্য তিনি জুবায়েরকে প্রেরণ করলেন। দূর থেকে সে দেখল যে, তারা নারী, শিশু এবং পশুপালকে তাদের প্রধান দুর্গের ভিতর নিয়ে যাচ্ছে এবং পুরুষরা অস্ত্র নিয়ে তৈরি হচ্ছে। জুবায়ের তার পর্যবেক্ষণের কথা জানানোর পরে বানু কুরাইযানেতাদের জিজ্ঞাসা করতে মুহাম্মদ আউস সর্দার সাদ বিন মুয়ায এবং আরও কয়েকজনকে প্রেরণ করেছিলেন। প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি বয়সী, লম্বা গড়নের, সুঠামদেহী সাদ ছিলেন বানু কুরাইযার প্রাক্তন মিত্র। আউস গোত্রের একটি শাখা সাদের (নিজ বংশ) আশাল (Ashal) বংশের দুর্গ এবং গাছগাছালি বানু কুরাইযাঅঞ্চল থেকে দুই মাইলেরও কম উত্তরের দিকে ছিল। একদশক আগে তারা আন্তঃগোত্রীয় যুদ্ধে একে অপরকে সমর্থন করেছিল, খাজরাজ ও তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল। সাদ বিন মুয়ায কাব বিন আসাদের দুর্গে প্রবেশ করে 'আল্লাহর রাসূলের' সাথে তার চুক্তি ভঙ্গ করার গুজব নিয়ে ইহুদি নেতাদের জেরা করলেন। কাব ইতস্ততভাবে আমতা আমতা করলেন এবং মুহাম্মদের সাথে তার আদৌ কখনও চুক্তি হয়েছিল কি না সে বিষয়ে সন্দিগ্ধ ভাব দেখালেন। সাথে তিনি এ-ও বললেন "এই আল্লাহর রাসূল আবার কে? মুহম্মদের সাথে আমাদের কোন চুক্তি নেই" (৯)। সাদ তাদের সতর্ক করেছিলেন যে, তারা যদি মক্কাবাসী ও তাদের মিত্রদের পরাজিত করে ফেলে তবে তারা একটি বিপর্যয়ের পথে নিজেদের ঠেলে দেবেন। কুরাইযার ইহুদিরা নিজেরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো শক্তিশালী ছিল না, তবে তাঁরা সাদ বিন মুয়াযকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, কুরাইযার লোকেরা দশবছর আগে খাজরাজীদের কাছে তার আশাল বংশের পরাজিত হওয়া রোধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, বানু কুরাইযার যোদ্ধারা ভয় পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তাঁরা ভয় পায়নি। বৈঠকটি পারস্পরিক অপমান এবং হুমকিতে শেষ হয়েছিল। উত্তেজিত সাদ যা জানতে পেরেছিল সবই গিয়ে মুহাম্মদকে জানালো।

মুহাম্মদের বাহিনীও ছিল মারাত্মক অবস্থায়। শীতের শেষের দিকে এই আক্রমণের সময় ছিল এবং তার যোদ্ধারা শীতার্ত, ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত ছিল। শত্রুদের বাগাড়ম্বর এবং পরিখার বাইরে তাদের বিশাল সংখ্যা দেখে তারা ক্রমশ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, তাদের আত্মবিশ্বাসও হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। বানু কুরাইযার বিমাতাসুলভ আচরণের খবরটাও ছড়িয়ে পড়ে, এবং মুহাম্মদের সেনারা এখন পেছন থেকে একটি আকস্মিক আক্রমণের আশঙ্কাও করছে। এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতি মুহাম্মদের মাঝে ম্যাকিয়াভেলিয়ান (Machiavellian) প্রকাশ করে এবং শত্রুকে বিভক্ত করার জন্য তিনি মরিয়া কৌশল নিয়ে এসেছিলেন। তার প্রথম প্রয়াস ছিল গাতফানদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেয়া যে, তারা যদি শান্তি স্থাপন করে এবং তাদের গোত্রীয় অঞ্চলে ফিরে যায় তবে তাদের সাথে তিনি সমঝোতা করবেন এবং তিনি তাদেরকে বছরের এক তৃতীয়াংশ খেজুর উপহার দেবেন। তিনি তাদের কাছে একজন রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করলেন, কিন্তু প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হলো না । বানু নাযীরের ইহুদিরা ইতিমধ্যেই গাতফানদেরকে আক্রমণে অংশ নেয়ার প্রতিদান হিসেবে খাইবারের পুরো বছরেরই খেজুর দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাদের উত্তরের মরুদ্যানে খাইবারের ইহুদিরা ব্যাপক আকারে খেজুর উৎপাদন করত, ইয়াছরিবের উৎপাদিত খেজুর তাদের খেজুরের সংখ্যার ধারেকাছেও ছিল না। অধিকন্তু, মুহাম্মদের লোকেরা তাদের খেজুরগুলো বেদুইন মুশরিকদেরকে (গাতফান) দিয়ে দেয়াটা ঠিক পছন্দ করছিল না। যদিও মুহাম্মদ এবং গাতফানিদের মধ্যে সমঝোতার কোন সিদ্ধান্ত হয়নি, তবুও উত্তরাঞ্চলীয় মিত্ররা মুহাম্মদের সাথে যে কথা বলছিল তা মক্কাবাসীদের কানে পৌঁছেছিল এবং তাঁরা তাদের আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। মুহাম্মদ বিচক্ষণতার সাথে তার শত্রুদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ জাগিয়ে তোলার জন্য একটি ভুলতথ্য বাহককে প্রেরণ করেছিলেন। নুয়াইম নামে এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি জোট আক্রমণ বাহিনীর সাথে ছিলেন, তবে তিনি মুহাম্মদের সাথে গোপনে সাক্ষাত করে বলেন যে তিনি ধর্মান্তরিত হয়েছেন এবং বলেন যে, তিনি মিথ্যা তথ্য প্রচার করে মক্কাবাসী ও বানু কুরাইযার মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারবেন। তিনি এমন একজন বণিক ছিলেন, যিনি যেখানেই গেছেন সেখানেই নিজেকে প্রিয়পাত্র করে তুলতে পারতেন। এছাড়াও তিনি বানু কুরাইযার রাব্বি (ইহুদি যাজক), মক্কাবাসী নেতা এবং জোটের বিভিন্ন গোত্রের শেখসহ সবাইকে চিনতেন। কেউ তার ধর্মান্তরিত হওয়া সম্পর্কে জানত না, সুতরাং তিনি বিশ্বস্তও ছিলেন। নুয়াইম প্রথমে বানু কুরাইযার নেতাদের কাছে গিয়ে মক্কাবাসী ও

গাতফানদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি তথ্যের গোপনীয়তা দাবি করে বলেন যে, লড়াই শেষ অবধি চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের উপর নির্ভর করা যাবে না। যদি তারা মুহাম্মদকে শেষ না করেই তাদের দেশে ফিরে যায় তবে বানু কুরাইযাবিপদে পড়ে যাবে। তাদের নিজস্ব সুরক্ষার জন্য কুরাইযার লোকদের উচিত সঙ্গ ছেড়ে যাওয়ার বিপরীতে মক্কাবাসী এবং গাতফানদের কাছ থেকে বীমা হিসেবে জামিনদার দাবি করা। একইসাথে নুয়াইম তখন আবু সুফিয়ানের কাছে গিয়ে তাকে বানু কুরাইযার ইহুদিদের থেকে সাবধান থাকার কথা বলেন! তিনি গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জেনেছেন যে, কুরাইযার লোকেরা জোটের পক্ষে থাকার বিষয়ে আফসোস করেছে এবং তারা মক্কা ও গাতফানদের থেকে জামিনদার দাবি করে মুহাম্মদের সাথে তাদের সম্পর্ক সুসংহত করার চেষ্টা করছে। এবং তারা পরবর্তীতে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার দায়মুক্তির বিনিময়ে মোহাম্মদের হাতে জামিনদারদের তুলে দেবে। একই গল্প নিয়ে নুয়াইম গাতফানিদের কাছেও গেলেন।

মক্কাবাসীরা এই কূটচালের শিকার হয় যখন তারা এবং তাদের সহযোগীরা আক্রমণ করার পরিকল্পনার ছক বানাতে আবুল হাকামের পুত্র ইকরিমাকে এবং আরও বেশ কয়েকজনকে বানু কুরাইযার নেতাদের কাছে প্রেরণ করে। এটি ছিল শুক্রবারের রাত এবং মক্কাবাসীরা পরদিন আক্রমণ শুরু করতে চেয়েছিল। তবে উৎসাহের পরিবর্তে এই দূতদেরকে বানু কুরাইযাসন্দেহের সাথে বরণ করে নিয়েছিল। কুরাইযার লোকেরা আঙ্গুল ততক্ষণ তুলবে না যতক্ষণ না মক্কাবাসী এবং তাদের গাতফানী মিত্ররা তাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু লোককে, বিশেষতঃ সম্মানিত প্রবীণদেরকে জিম্মি হিসেবে তাদের হাতে তুলে না দেয়। এটি তাদের জন্য ভবিষৎ সুরক্ষা হিসেবে কাজ করবে।

অনুরোধটি যুক্তিসঙ্গত এবং মক্কাবাসীরা এটার উপর কাজ করবে, এই বিশ্বাস করে ইহুদি নেতারা বিনয়ী কিন্তু দৃঢ় ছিলেন। অধিকন্তু, তারা শর্ত দিয়েছিল যে, শনিবার সাবাথ (Sabbath) তথা বিশেষ প্রার্থনার দিন হওয়ায় রবিবার আক্রমণটি করতে হবে। হতাশ ইকরিমা তার শিবিরে ফিরে এসে আবু সুফিয়ানকে নতুন এই অগ্রগতির কথা জানান। নুয়াইমের সতর্কবাণীগুলি স্মরণ করে মক্কার নেতা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তারা বানু কুরাইযাদের এতটা ছাড় দেবেন না। আবু সুফিয়ান বলে উঠলেন, “তারা যদি আমার কাছে একটা ছাগল চায়, তবু আমি তা দেবো না। আমি আমার প্রবীণ সঙ্গীদেরকেও তাদের হাতে এজন্য দেবো না যেন তারা তাদের হত্যা করার জন্য মুহম্মদের হাতে তুলে দেয়” (১০)।

নাযীর নেতা হুযাই বিন আখতাব তাদের মধ্যে সমঝোতা করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি মক্কাবাসীদের আক্রমণকে আরও একদিন বিলম্বিত করার এবং বানু কুরাইযার সাথে কথা বলার জন্য সময় দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু মক্কাবাসীরা তাকে বলেছিল যে, বিশেষ প্রার্থনার শনিবারের দিনটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করতে পারবে না। জোট বাহিনীর পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি হচ্ছিল। তাদের কিছু ঘোড়া এবং উট খাদ্যের অভাবে মারা যাচ্ছিল; তাদের নিজস্ব খাদ্যও শেষ হয়ে এসেছিল; তারা শীতার্ত এবং ক্লান্ত ছিল; তারা আর গাতফানদের বিশ্বাসও করতে পারছিল না। তদুপরি আবহাওয়াও খারাপ হয়ে উঠছিল। মক্কাবাসীদের সাথে বৈঠকের পর হুয়াই বানু কুরাইযার ইহুদিদের কাছে গিয়ে মক্কানদের কাছে জিম্মিদের দাবি না করতে এবং প্রার্থনার দিনই যুদ্ধের জন্য সম্মতি জানাতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। হুয়াই আবু সুফিয়ানকে খবর দিতে মক্কাবাসীদের শিবিরে ফিরে এলেন, তারপর বানু কুরাইযায় ফিরে গিয়ে তাদের জানালেন যে, মক্কাবাসীও এখন বানু কুরাইযার নিকট জামিনদার দাবি করেছে। বালির মাঠে এবং উহুদ পর্বতমালার পাদদেশের সমভূমিতে যাওয়া-আসা বেশ সময়সাপেক্ষ ছিল, এবং হুয়াই যখন আবু সুফিয়ানকে জিম্মি করার দাবি নিয়ে বানু কুরাইযার কাছে ফিরে এসেছিল, ততক্ষণে প্রার্থনার দিনটির সকাল হয়ে গেল। কুরাইযার লোকেরা জিম্মি বিনিময় ছাড়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে অস্বীকার করেছিল এবং পুনরায় তারা মুহাম্মাদের উপর আক্রমণ করার জন্য পবিত্র দিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার জোর দাবি জানিয়েছিল।

প্রার্থনার দিন বিকেলে হুয়াই বানু কুরাইযার জবাব নিয়ে মক্কার শিবিরে ফিরে আসেন। আবু সুফিয়ান যখন এটি জানতে পেরেছিলেন তখন তিনি এটিকে সত্যিই তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ হিসেবে ধরে নিলেন। ততক্ষণে আবহাওয়া খারাপ হয়ে গিয়েছিল এবং সেই সাথে উহুদ শিবিরে সবার মেজাজও খারাব হয়ে উঠেছিল। জোটবাহিনী তাদের তাঁবুর পাশে শতশত আগুনের শিখা জ্বালিয়ে সেগুলো ঘিরে বসে থাকল। হিমশীতল বৃষ্টি পড়তে শুরু করল আর শীতের তীব্রতা বাড়তে লাগল। পুরো দিনব্যাপী চলমান উপত্যকা জুড়ে হিমশীতল বাতাসটির শক্তি এখন প্রবল ঝড়ের রূপ নেয়। গভীর রাত অবধি বাতাসের তীব্র আঘাত শিবিরগুলির আগুন নিভিয়ে দেয়, রান্নার হাঁড়ি-পাতিলগুলো উল্টে যায় এবং তাঁবু উপড়ে যায়। লোকেরা নিজেদের উষ্ণ রাখার জন্য যথাসম্ভব নিজেদের গুটিয়ে রাখে এবং তাদের বাঁধা উটগুলির পাশে জবুথুবু হয়ে বসে থাকে।

জোটের নেতাদের সাথে বৈঠকে বসে আবু সুফিয়ান বানু কুরাইযাকে বিশ্বাসঘাতক বলে তাদের নিন্দা করেন। তাদের উদ্বেগ এবং সাথে বাতাসের তাণ্ডব যে ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল তাতে তিনি হতাশ হয়ে মদিনায় আক্রমণ না করে মক্কায় ফিরে যাবার হৃদয়বিদারক সিদ্ধান্তটাই নিলেন! তিনি অন্যান্য গোত্রীয় নেতাদের বললেন, "ছেড়ে যাও, কারণ আমিও ছেড়ে চলে যাচ্ছি" (১১)। ক্রোধের বশে তিনি তার উটে চড়ে বসলেন এবং উটটিকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য পায়ে লাথি মারলেন। কিন্তু ক্রোধের কারণে তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন যে, উটটি তখনও বাঁধা ছিল এবং উট চলতে হলে তাকে আগে এটির বাঁধন খুলতে হবে। তিনি শিবিরের মধ্যে দিয়ে উট চড়িয়ে মক্কাবাসীকে তাদের তাঁবু বোঝাই করে তাকে অনুসরণ করে বাড়ি ফেরার জন্য বলেন।

মুহাম্মদের ধূর্ততা এখানে জিতে গেল। পরদিন সকালে চারদিকে আলো ফুটলে তিনি এবং তার অনুসারীরা যখন পরিখার ওপারে তাকালেন তখন দেখলেন, বিশাল সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেছে। যথারীতি মুহাম্মদ অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রেরণা অর্জন করেছিলেন। তিনি যুদ্ধ সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় (সূরা) রচনা করেছিলেন এবং এটিকে "মিত্রবাহিনী" নামে অভিহিত করেছিলেন। আয়াতগুলি পড়লে মনে হবে এ যেন উদ্দেশ্যহীনভাবে লেখা ডায়েরির কথামালা :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اذۡكُرُوۡا نِعۡمَةَ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ اِذۡ جَآءَتۡكُمۡ جُنُوۡدٌ فَاَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ رِيۡحًا وَّ جُنُوۡدًا لَّمۡ تَرَوۡهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرًا ۚ﴿۹﴾

اِذۡ جَآءُوۡكُمۡ مِّنۡ فَوۡقِكُمۡ وَ مِنۡ اَسۡفَلَ مِنۡكُمۡ وَ اِذۡ زَاغَتِ الۡاَبۡصَارُ وَ بَلَغَتِ الۡقُلُوۡبُ الۡحَنَاجِرَ وَ تَظُنُّوۡنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوۡنَا ﴿۱۰﴾

هُنَالِكَ ابۡتُلِىَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ وَ زُلۡزِلُوۡا زِلۡزَالًا شَدِيۡدًا ﴿۱۱﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিআমতকে স্মরণ কর, যখন সেনাবাহিনী তোমাদের কাছে এসে গিয়েছিল, তখন আমি তাদের উপর প্রবল বায়ু ও সেনাদল প্রেরণ করলাম যা তোমরা দেখনি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। যখন তারা তোমাদের কাছে এসেছিল তোমাদের উপরের দিক থেকে এবং তোমাদের নিচের দিক থেকে আর যখন চোখগুলো বাঁকা হয়ে পড়েছিল এবং প্রাণ কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা রকম ধারণা পোষণ করছিলে। সে সময় মু'মিনগণকে পরীক্ষা করা হয়েছিল আর তাদেরকে ভীষণ কম্পনে প্রকম্পিত করা হয়েছিল" (১২)।

মুহাম্মদ যখন ডায়েরি লেখার কাজ করছিলেন, হুয়াই তখন বানু কুরাইযার সাথে যে কথা দিয়েছিলেন তার রক্ষার্থে তাদের সাথে দুর্গে যোগদান করেছিলেন এবং তার নিয়তির জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

অধ্যায় - ২৩
চূড়ান্ত সমাধান

ইসলামের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে, যৌথবাহিনী চলে যাওয়ার পর ফেরেস্তা জিব্রাইল মুহাম্মদের কাছে হাজির হন এবং তাকে বানু কুরাইযাইহুদিদের আক্রমণ করার আদেশ দেন। এই ফেরেস্তা দেখতে লক্ষণীয়ভাবে কালব গোত্রের (Kalb tribe) খলিফার ছেলে দিহইয়ার (Dihya) মতো সুদর্শন যুবক ছিলেন। এমব্রয়ডারি করা পাগড়ি পরে চমৎকারভাবে সজ্জিত ফেরেস্তা একটি গাধার উপর ভর করে মসজিদের উঠোনে নামলেন এবং মুহাম্মদ তার সাথে কথা বলতে মসজিদের বাইরে গেলেন। ফেরেস্তা শীঘ্রই চলে গেল, কিন্তু মুহাম্মদের একজন স্ত্রী উম্মে সালামা তাদেরকে (দিহইয়ার সাথে মুহাম্মদকে) কথা বলতে দেখেছিলেন এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, এটি দিহইয়া ছাড়া আর কেউ হবে না। ইয়াছরিবের সকল নারীরা সুদর্শন দিহইয়াকে চিনত (১)। মুহাম্মদ তার ভুল ভাঙলেন, তিনি বললেন : উনি আসলে দিহইয়া না, বরং ফেরেস্তা জিব্রাইল যাকে দেখতে অনেকটা আসল দিহইয়ার মতোই লেগেছে। জামাতে এবং ব্যক্তিগত কথোপকথনে মুহাম্মদ প্রায়ই নবী ও ফেরেস্তাদের উপস্থিতিকে তার জামাতের শরিক হওয়া অনুসারীদের শারীরিক গঠনের সাথে তুলনা করতেন। এটা ছিল বিশ্বাসীদের প্রশংসা করার একটি কৌশল, এবং এর ফলে তারাও ফেরেস্তাদের সম্পর্কে ধারণা করতে পারত এবং নিজেদের এই বর্ণনা শুনে আনন্দিত হতো। মুহাম্মদ গাধার উপর দিহইয়ার মতো দেখতে ফেরেস্তার সাথে তার সাক্ষাতের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে যে, দিহইয়ার রূপ ধরে ফেরেস্তা জিব্রাইল তাকে জানায় যে, সদ্যই মুহাম্মদ দক্ষিণে মক্কাবাসীদের রেড লায়ন (হামরাউল আসাদ) পর্যন্ত অনুসরণ করে ফিরে এসেছেন। মুহাম্মদ সেই ফেরেস্তাদের একটি সৈন্যদলের কমান্ডার ছিলেন, কিন্তু বর্ম খুলে ফিরে আসার জন্য মুহাম্মদকে ফেরেস্তারা তিরস্কার করেছে, কারণ তার হয়ে যুদ্ধ করার জন্য ফেরেস্তারা তাদের যুদ্ধের পোশাকে তৈরি ছিল, অথচ তিনি তাদের ফেলে চলে এসেছেন। এখন ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুহাম্মদকে সাহায্য করাই তাদের কাজ। ফেরেস্তাদের প্রধান জিব্রাইল বললেন, "আল্লাহ আপনাকে আদেশ দিয়েছেন বানু কুরাইযার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে। আমি নিজে ওদের দিকেই যাচ্ছি এবং তারা আমাদের দেখে নিশ্চিতভাবেই আঁতকে উঠবে!" (২)।

মুহাম্মদের ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত লোকেরা ইতিমধ্যেই তাদের নিজ নিজ ঘরে চলে গেছে। মুহাম্মদ যখন বর্ম পরিহিত হয়ে বানু কুরাইযার এলাকায় দিকে যেতে যুদ্ধ-ঘোষককে তাদের কাছে পাঠালেন, ঘোষণা শুনে তারা আর্তনাদ করে উঠল। এমনকি তিনি ইহুদি দুর্গের মুখোমুখি না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে বিকেলের নামাজ (আছরের নামাজ) বিলম্বিত করার নির্দেশ দিলেন। ইসলামিক গ্রন্থ থেকে আরো জানা যায় যে, উম্মে সালামার সৌভাগ্য হয়েছিল ফেরেস্তা জিব্রাইলকে দেখার, কারণ তিনি (জিব্রাইল) নিজেকে সাধারণত এমনভাবে প্রকাশ করতেন যে, শুধুমাত্র মুহাম্মদই তাকে দেখতে পেতেন। শুধু উম্মে সালামাই সেইদিন ভাগ্যবতী ছিলেন তা নয়, নিকটবর্তী নাজ্জার গ্রামের (Najjar village) যোদ্ধারাও জিব্রাইলকে সেদিন দেখতে পেয়েছিলেন। দিহইয়ার মতো দেখতে সুদর্শন যুবক তাদের বলেছিল যুদ্ধের সরঞ্জাম নিয়ে তৈরি হতে এবং মুহাম্মদের কাছ থেকে আরও নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করতে, যিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের কাছে এসে পৌঁছাবেন (৩)।

মুহাম্মদ ঘোড়ায় চড়ে এবং অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে গ্রামে পৌঁছলেন, যেখানে যুদ্ধে সক্ষম সকল পুরুষরা একত্রিত হয়েছে। তিনি তাদের সামনে ঘোড়া থামিয়ে বললেন, "কাউকে কি তোমাদের পাশ দিয়ে যেতে দেখেছ"? তারা বলল, "হ্যাঁ, দিহইয়া আল কালবি একটা খচ্চরের উপর চড়ে যাচ্ছিল। মুহাম্মদ তাদের চমকে দিলেন এই বলে যে, "সে ছিল জিব্রাইল; তাকে বানু কুরাইযা গোত্রে পাঠানো হয়েছে তাদের মনে কম্পন ধরানো ও তাদের ভেতর ভয়ের সঞ্চার করার জন্য (৪,৫)। মুহাম্মদ নাজ্জার যোদ্ধাদের বানু কুরাইযা অঞ্চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। মুহাম্মদ নিজেও তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে অশ্বের গতিতে এগিয়ে গেলেন। তার সাথে তখন ছিল তার তিন ডজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি (৬)। বলা যেতে পারে একটি তারকা খচিত দল যার

মধ্যে ছিলেন চারজন ভবিষ্যৎ খলিফা - আবু বকর, উমর, ওসমান এবং আলী; এবং আউস নেতা সাদ বিন মুয়ায যার হাতে তীরের ক্ষত থাকা সত্ত্বেও তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন। আরো সাথে ছিলেন মুহাম্মদের প্রথম চাচাতো ভাই জুবায়ের (Zubayr) ও সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, মাসলামা যিনি ইহুদি কবি কাব বিন আশরাফকে হত্যা করেছিলেন। ছিলেন আবু নায়লা, সেই আততায়ী দলের অন্যতম সদস্য যারা কাব বিন আশরাফকে হত্যা করেছিল। ছিলেন তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (৭) যিনি মক্কার প্রথম দিককার ধর্মান্তরিত; আবু বকরের চাচাতো ভাই যিনি উহুদে মুহাম্মদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিয়ে বেশ কয়েকটি আঙ্গুল হারিয়েছিলেন; আবু উবাইদা মক্কী ধর্মান্তরিত যিনি উহুদে মুহাম্মদের মুখ থেকে রক্ত চেটে খেয়েছিলেন এবং মুহাম্মদের গাল থেকে লোহার খন্ড বের করে আনার সময় দাঁত হারিয়েছিলেন; ছিলেন অপমানিত খাজরাজ নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের ছেলে আবদুল্লাহ; বদরে নিহত মক্কাবাসী নেতা উতবা ইবনে রাবিয়ার ছেলে আবু হুযাইফা সহ আরও কুড়ি বা ততোধিক উল্লেখযোগ্য যোদ্ধারা তার এই দলে ছিলেন যারা সকলেই বদর ও উহুদের গর্বিত যোদ্ধা।

শক্তিশালী ঘোড়সওয়ার দিয়ে ঢাল, তলোয়ার, ও বর্শা নিয়ে তারা মুহাম্মদের চারপাশে একটি উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন প্রহরীদল গঠন করা হলো। মুহাম্মদ আলী এবং প্রহরীদের একটি অংশকে অগ্রে পাঠিয়ে দিলেন যুদ্ধপ্রস্তুতির অংশ হিসেবে। আলী সেখানে পৌঁছেই ইহুদি দুর্গের অদূরে একটি কুয়োর গায়ে যুদ্ধ-ব্যানার সাঁটিয়ে দিলেন। ইহুদিরা আলীকে দেখতে পেয়েই বুঝে গিয়েছিল যে, যুদ্ধ শুরু হবে। বানু কুরাইযার লোকেরা জানত যে, অবরোধ শুরু হতে যাচ্ছে সুতরাং তারা মুহাম্মদের সাহাবিদের উদ্দেশ্যে অপমানজনক কথা এবং বিভিন্ন হুমকিধামকি ও চিৎকার করে কথা বলতে শুরু করে। তারা মুহাম্মদ ও তার স্ত্রীদের অপমান করেও কথা বলছিল। সেসব শুনে মুমিনদের (ইসলামে বিশ্বাসী) মধ্য হতে একজন চিৎকার করে বলল, “হে আল্লাহর শত্রুরা! অনাহারে তোমরা মারা না যাওয়া পর্যন্ত আমরা দুর্গ ছেড়ে যাব না” (৮)।

পরবর্তী কয়েক ঘন্টার মধ্যে মুহাম্মদের শত শত যোদ্ধারা অকুস্থলে পৌঁছে যায় এবং শীঘ্রই মোট তিন হাজার যোদ্ধাকে সশস্ত্র যুদ্ধ (জিহাদ) করার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। যখন মুহাম্মদ ও তার অশ্বারোহী প্রহরীরা সেখানে পৌঁছে গেল তখন ইহুদি সৈন্যরা তাকে নিশানা করে তীর ছুঁড়ল, কিন্তু সে তীর মুহাম্মদকে ছুঁতে পারল না, কারণ তিনি অনেক দূরে ছিলেন। তিনি তার লাল রঙের তাঁবুটি কুয়োর কাছে স্থাপন করলেন যেখান থেকে তিনি বানু কুরাইযার দুর্গ দেখতে পেতেন, কিন্তু সেটি বানু কুরাইযা যোদ্ধারের তীরের নিশানার বাইরে ছিল। যখন আলী মুহাম্মদকে বললেন যে ইহুদিরা মুহাম্মদকে অপমান করেছে, তখন মুহাম্মদ রেগে চিৎকার করে বললেন “হে বানর, শুকর ও অশুভ উপাসকদের ভাইয়েরা, তোমরা কি আমাকে অপমান করেছ?” (৯)। ইহুদিরা সমস্বরে অস্বীকার করে উঠল। দুর্গের চারপাশে অবস্থান নেবার আগে মুহাম্মদের সৈন্যরা দেখিয়ে দেখিয়ে নামাজের জন্য জড়ো হলো এবং কোরআনের আয়াত পাঠ করল। নামাজ শেষ হবার পরেই মুহাম্মদ ৫০ জন তীরন্দাজকে তাদের উদেশ্য করে তীর ছুঁড়তে পাঠালেন। ইহুদিরাও পাল্টা তীর ছুঁড়ল। এই তীর ছোঁড়াছুড়ি চলতে থাকে রাতের অন্ধকার নেমে না আসা অবধি। ততক্ষণে একটি খাজরাজী বাগান থেকে এক খেজুর বাগানের মালিক তাদের জন্য কিছু খেজুর পাঠায়, এবং মুহাম্মদের যোদ্ধারা সেগুলো খেয়ে রাত পার করে। পরদিন সকালে অবরোধ আবার শুরু হয় এবং তিন সপ্তাহ ধরে এই অবরোধ চলতে থাকে।

ইহুদিরা একটি হতাশাজনক পরিস্থিতিতে ছিল। তারা ভালোভাবে সবকিছু নিয়ে প্রস্তুত ছিল না। মুহাম্মদের সৈন্যরা সংখ্যায় তাদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল, এবং এটা ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র যে, হয় তারা অনাহারে মরবে নয়তো আত্মসমর্পণ করবে। অবরোধের কুড়ি দিনের মাথায় তারা তাদের মধ্যে থেকে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নাব্বাশকে (Nabbash) আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিয়ে পাঠান এই শর্তে যে, মুহাম্মদ যেন তাদের চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়, ঠিক যেমন তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন কাইনুকা এবং বানু নাযীর গোত্রকে।

মুহাম্মদ তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। যখন নাব্বাশ দুঃসংবাদ নিয়ে দুর্গে ফিরে আসেন, তখন কাব বিন আসাদ সহ অন্যান্য নেতারা বিভিন্ন বিকল্প অপশন বিবেচনা করতে লাগল। আর মধ্যে ছিল মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করে তলোয়ারের নিচ

থেকে রক্ষা পাওয়া। যদি তারা মুহাম্মদকে নবী হিসেবে মেনে নেয় তবেই বাঁচতে পারবে, এমন একটি প্রস্তাব দেয়া হলো। কিন্তু কুরাইযার লোকেরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে মরতে রাজি আছেন, তবুও মুহাম্মদ নিজের সম্পর্কে যা দাবি করেছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে তাঁরা নারাজ। তাঁরা হতাশ ছিল। একটি ঘটনার মাধ্যমে তাদের হতাশার গভীরতা বোঝা যায়। ঘটনাটি এমন : কাব বিন আসাদ পরামর্শ দিয়েছেন যে, রোমানদের দ্বারা জেরুজালেমে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর মাসাদার পাহাড়ের (fortress of Masada) চূড়ায় ইহুদি বিদ্রোহেরা যা করেছিল তারাও তা করতে পারে। বিদ্রোহী ইহুদিরা তাদের শত্রুদের (রোমানদের) হাতে একজন একজন করে মৃত্যুবরণের মাধ্যমে রোমানদের তৃপ্তি দেয়ার চেয়ে বরং গণ-আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কাব বললেন, “আসুন আমরা আমাদের সন্তানদের ও আমাদের নারীদের আগে হত্যা করি এবং তারপর আমাদের তলোয়ার নিচু করে মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের কাছে যাই। তাহলে আর আমাদের পেছনে কোন দায়িত্ব থাকবে না, পিছুটানও থাকবে না এবং ঈশ্বরই তখন আমাদের মাঝে ও মুহাম্মদের মাঝে সিদ্ধান্ত নেবেন। যদি আমরা ধ্বংস হয়ে যাই, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব কোন সমস্যা নেই; কিন্তু আমাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করার জন্য কোন পরিবার বা সন্তান আমরা রেখে যাবো না। আর যদি আমরা বিজয়ী হয়ে যাই, তাহলে আমরা অবশ্যই অন্য নারী লাভ করব এবং শিশুদের জন্ম দিতে পারব। কিন্তু অন্যান্য ইহুদি নেতারা এই বিকল্পটাকে ভালোভাবে নিল না, তারা বলল: “আমরা কি এই হতভাগাদের মেরে ফেলব? তাদের মেরে ফেলে আমরা বেঁচে থেকেই বা কি করব?” (১০)

তাদের এই আলোচনা দুর্গের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল; এমনকি সাহসী পুরুষরাও তা শুনে ভয়ে কেঁপে উঠল এবং নারী ও শিশুরা কাঁদতে লাগল। নেতারা অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয় যে, একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজেদেরকে মুহাম্মদের কাছে দয়া ভিক্ষার জন্য আত্মসমর্পণ করা, কিন্তু এটি একজন বিশ্বস্ত মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে করলে ভালো হবে, যিনি তাদের পক্ষ হয়ে সুপারিশ করতে পারেন। তারা মুহাম্মদের কাছে বার্তা পাঠালো যে, তারা আব্দুল মুনযিরের (Abdul Mundhir) সাথে কথা বলতে চান যিনি আউস গোত্রের প্রাক্তন মিত্র, যার ডাক নাম ছিল আবু লুবাবা (Abu Lubaba)। মুহাম্মদ তাকে ইহুদি দুর্গে যেতে দিলেন এবং যখন তিনি দুর্গে ঢুকলেন তখন ইহুদি নেতারা লাফ দিয়ে উঠে তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল। নারী ও শিশুরা তার চারপাশে জড়ো হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। তিনি ছিলেন তাদের শেষ ভরসা। তিনি গভীরভাবে আপ্লুত হলেন, কিন্তু তিনি এ-ও জানতেন যে, তিনি তাদের জন্য কিছুই করতে পারবেন না। যখন ইহুদিরা তাকে জিজ্ঞেস করল যে তারা কি মুহাম্মদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে কিনা, তখন তিনি বলেন যে, তাদের তাই করা উচিত। এছাড়া একমাত্র বিকল্প ছিল অনাহারের কষ্ট ভোগ করে বেদনাদায়ক মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া। তারা জিজ্ঞেস করল, মুহাম্মদের কাছ থেকে কি ধরনের আচরণ আশা করা যায়? আবু লুবাবা তার আঙ্গুল দিয়ে গলা চেপে ধরে ইঙ্গিত দিলেন।

ইসলামিক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, আবু লুবাবা তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করার পর ভয় এবং অনুতাপে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। মুহাম্মদ স্পষ্টতই পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে, তিনি ইহুদিদের সাথে কী করার পরিকল্পনা করেছিলেন তা আঙ্গুল দিয়ে গলা চেপে ধরে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আসলে আবু লুবাবা তাদের কাছে মুহাম্মদের উদ্দেশ্যই ফাঁস করেছিলেন। এটুকু দেখানোই মুহাম্মদের কাছে বিদেশি শত্রুর কাছে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ফাঁস করে দেবার বিষয় হতে পারে এবং এ কারণে আবু লুবাবা বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তির (শিরোচ্ছেদ) সম্মুখীন হতে পারেন। আবু লুবাবা নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি মুহাম্মদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, এবং এখন তিনিই ভয় পাচ্ছেন যে, তাকেও হয়তো বানু কুরাইযা গোত্রবাসীর মতই ভাগ্যবরণ করতে হবে! সুতরাং মুহাম্মদের কাছে ফিরে এসে বিস্তারিত জানানোর পরিবর্তে তিনি প্রচণ্ড আতঙ্ক নিয়ে মদিনার প্রধান মসজিদে পালিয়ে যান এবং সেখানে তিনি একজনকে দিয়ে তাঁর নিজের দেহকে একটি স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখতে বলেন। এরপর তিনি জানিয়ে দিলেন যে, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতাকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন, ততক্ষণ তিনি মুক্তি চাইবেন না! (১১)।



[বানর ও শূকরের ভাইয়েরা! ইহুদি গোত্র তার ধর্মে যোগ দিতে অস্বীকার করলে এবং তাকে নবী হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তিনি এই অপমানসুচক কথাবার্তা বলে তাদের দুর্গ অবরোধ শুরু করেন। অবরোধ তিন সপ্তাহ স্থায়ী হয় এবং তাদের আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে শেষ হয়। তারা মুহাম্মদকে তাদের ইয়াছরিব থেকে চলে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়ার জন্য আহবান করে, কিন্তু তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানান এবং সমস্ত পুরুষ ও ছেলেদের হত্যা করেন।]

ইহুদিরা পরদিন হাল ছেড়ে দিল। তাঁরা বুঝতে পারল যে, তাদের জন্য সবচেয়ে করুণ পরিণতিই অপেক্ষা করছে। যখন ইহুদিরা তাদের দুর্গ থেকে বের হয়ে আসছিল তখন তাদের হাত বাঁধা ছিল। তাদেরকে উত্তপ্ত রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হল। মুহাম্মদের তাঁবুর ভেতরে অনুষ্ঠিত সভায় আউস গোত্রের কিছু নেতা তাকে তাদের প্রাক্তন মিত্রদের সাথে কিছুটা নমনীয় আচরণ করার জন্য অনুরোধ করেন। তারা যুক্তি দেখান যে, বানু কুরাইযা নবীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার জন্য অনুতপ্ত। তাছাড়া বানু নাযীর নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব মুহাম্মদকে বানু নাযীর গোত্রের জন্য সুপারিশ করেছিলেন যার ফলে তিনি বানু কাইনুকা ও বানু নাযীরের প্রতি কিছুটা নমনীয় ছিলেন, সুতরাং তিনি হয়তো এবারও বানু কুরাইযার প্রতি সমান দয়ালু হবেন। তাদেরকে হয়তো তিনি ইয়াছরিব থেকে বিতাড়িত করবেন, ঠিক যেমন তিনি অন্যদের বেলায় করেছেন। মুহাম্মদ এমন চাপ অনুভব করছিলেন যে, নিজের কাঁধ থেকে সিদ্ধান্তের দায়িত্ব সরানোর একটি উপায় খুঁজছিলেন, তবে

তিনি তার মনমতো ফলাফলই পেতে চাচ্ছিলেন। আর তাই, তিনি আউসদের মধ্যে থেকেই একজনকে বানু কুরাইযার ভাগ্য নির্ধারণ করার প্রস্তাব করে বসেন।

যখন তারা রাজি হলেন, তিনি সাদ বিন মুয়াযকে বেছে দিলেন। সাদের ততক্ষণে খন্দকের যুদ্ধের সময় বিদ্ধ হওয়া তীরের আঘাতের ক্ষতে প্রায় মরেই যাচ্ছে অবস্থা! তীরটি তার কব্জির ঠিক উপরে আঘাত করেছিল, এবং মুহাম্মদ একটি গরম লোহার রড তার ক্ষতের উপর ধরেছিলেন। সে সময়ে তলোয়ার এবং তীরের ক্ষতের জন্য এই পদ্ধতিটিকে আদর্শ চিকিৎসা বলে মনে করা হতো। মনে হচ্ছিল যে, তার হাত আরোগ্য লাভ করছে। সাদ সেই অশ্বারোহীদের মধ্যে ছিলেন যারা মুহাম্মদের সাথে বানু কুরাইযার উপর হামলার জন্য এসেছিল, কিন্তু অবরোধের সময় তার হাত ফুলে গিয়েছিল, সে কোনো কিছু করতেও অক্ষম ছিল। সে ছিল একজন লম্বা, শক্ত পেশীর অধিকারী, যার গায়ে ষাঁড়ের মতো শক্তি ছিল। যখন মুহাম্মদ বুঝতে পারলেন যে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে এবং তিনি মারা যাবেন, তখন মুহাম্মদ তাকে প্রধান মসজিদে পাঠিয়ে দিলেন যাতে সে সেবা-শ্রুশুষা পেতে পারে। রুফায়দা (Rufayda) নামের একজন নারীকে উঠানে একটি তাঁবু স্থাপন করে জোটবাহিনীর হামলার সময়ে আহতদের এবং এখন বানু কুরাইযার হামলায় আহতদের পরিচর্যা করার জন্য রাখা হয়। মুহাম্মদ যখন বানু কুরাইযার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য সাদের নাম বললেন তখন তার গোত্রের লোকেরা তাকে ধরে ধরে মসজিদ থেকে বের করল এবং তারা তাকে একটা গাধার উপর চড়িয়ে এবং উপত্যকার পথ দিয়ে নিয়ে আসলো।

সাদ প্রচন্ড জ্বরে আক্রান্ত ছিল। সে নিজেকে সোজা ধরে রাখতে পারছে না। সে যখন সেখানে পৌঁছল তখন তার গোত্রবাসীরা উঠে দু'পাশে দাঁড়িয়ে সারি তৈরি করল যাতে সে মাঝখান দিয়ে যেতে পারে। মুহাম্মদ সেই সারির শেষের মাথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাকে শুভেচ্ছা জানালেন। আউস নেতা সত্যিকারের বিশ্বাসীদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিল। সে ইয়াছরিবী ধর্মান্তরিতদের মধ্যে প্রথমদের একজন ছিল, এবং গোত্রের নেতা হিসেবে সে তার লোকেদেরও এই দলে (ইসলামে) নিয়ে এসেছিল। সে বদরে মুহাম্মদের সাথে ছিল এবং তাকে বিশাল মক্কাবাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিল। উহুদে পরাজয়ের রাতে সে মুহাম্মদকে পাহারা দিয়েছিল, তার দরজার সামনে ঘুমিয়ে ছিল। সে ধীরস্থির এবং নির্ভরযোগ্য ছিল। তদুপরি সে পৌত্তলিক-বিরোধী আন্দোলনকারী ছিল, এবং ছিল একজন ভালো পরামর্শদাতা। যখন পাহারা দেয়ার (মুহাম্মদকে) দরকার হতো তখন সে হয়ে যেত একজন দক্ষ প্রহরী, একইসাথে যুদ্ধের (জিহাদের) সময়ে একজন যোদ্ধা, এবং গলা কাটার প্রয়োজন হলে গলা কাটার জন্য একজন স্বেচ্ছাসেবক! মুহাম্মদ ঘটনাস্থলে আসার আগে সে বনু বানু কুরাইযার প্রতিবেশী এবং বিশ্বস্ত মিত্র ছিল।

সে তাদের রাব্বিদের চিনত এবং সবসময় তারা তাকে সম্মান জানাত। কিন্তু এই ইহুদিরা মুহাম্মদকে তাদের নবী হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে এবং সাদ যখন মুহাম্মদের বিরুদ্ধে জোটে যোগ দেয়া থেকে তাদের বিরত রাখতে গেল তখন তাঁরা তাকে অপমান করেছে। সুতরাং এরা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রু (সাদের চোখে) এবং তাদের জন্য জাহান্নামের জায়গা নির্ধারিত। সাদ একবার বলেছিল, "অন্য সব মানুষের চেয়ে আল্লাহর রাসূলকে বিশ্বাস করতে অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ করতেই আমি বেশি আগ্রহী" (১২)।
সাদ জানত, মুহাম্মদ আসলে তার কাছে কী সিদ্ধান্ত চাইছেন, সুতরাং মুহাম্মদ যা চেয়েছিলেন সে-ও তাই-ই চাইল। সাদ যখন পথ ধরে যাচ্ছিল তখন তার গোত্রের লোকেরা তাকে অনুরোধ করল সে যেন সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে নমনীয় হয়, দয়া দেখায়। এমনকি গোত্রের একজন তো বললেন : "আপনার পুরাতন বন্ধুদের দয়ার সাথে মোকাবেলা করুন, কারণ রাসূল আপনাকে সেই উদ্দেশ্যেই সিদ্ধান্তদাতা বানিয়েছেন" (১৩)।

কিন্তু সাদ পুরনো দিনের পাথরের মূর্তির মতই অনড় ছিল। জনবহুল সৈন্যভর্তি তাঁবুর ভেতরে গোত্রের সব লোকেরা উপস্থিত ছিল। সাদ সেখানে তাদের এবং মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করে যে, তার সিদ্ধান্তই কী সবার উপর বাধ্যতামূলক হবে কিনা? যখন

খাজরাজ ও আউসের বিভিন্ন শেখগণ এবং সবশেষে মুহাম্মদ যখন বললেন যে, “হ্যাঁ”, সাদ তখন ঘোষণা করলঃ “তাহলে আমি হুকুম করছি যে, তাদের মধ্যে সকল পুরুষদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে”। এরপর সে নারী ও শিশুদের দাসদাসী হিসেবে বিক্রি করে দেয়ার আদেশ দেয় এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে গনিমত হিসেবে বিতরণ করার নির্দেশনা দেয় (১৪)। এই আদেশ শুনে মুহাম্মদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং এমন সিদ্ধান্তের জন্য সাদকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন : “নিশ্চিতভাবেই তুমি সাত আসমানের উপরে থাকা আল্লাহ্‌র রায়ের মতোই রায় দিয়েছ”(১৫)।

রায় ঘোষণার পর বানু কুরাইযার বন্দিদের একত্রিত করে বেঁধে ইয়াছরিবের কেন্দ্রস্থলের নিকটবর্তী একটি দুর্গের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় এক হাজার নারী ও শিশুকে মসজিদের কাছাকাছি একটি প্রাঙ্গনে নিয়ে যাওয়া হলো। ইহুদি দুর্গ এবং তাদের এলাকার অন্যান্য সম্পত্তিগুলো ভবিষ্যতে গনিমতের মাল হিসেবে বিতরণের জন্য একত্রিত করে রাখা হলো। মূল দুর্গের ভেতর তাঁরা (মুমিনরা) ১৫০০ তলোয়ার, ৩০০ বর্ম, ১০০০ বল্লম এবং ১৫০০ ঢাল খুঁজে পায়। বাসস্থানে কারুকাজ করা আসবাবপত্র এবং রূপার পাত্র পায়। বিজয়ীরা এছাড়াও মদ সম্বলিত মদের জার খুঁজে পায়। মদগুলো ফেলে দেয়া হয়, কিন্তু বিশাল পাত্রগুলো গনিমতের মালের জন্য রাখা হয়। এছাড়াও বানু কুরাইযা অঞ্চলের জায়গাজমি ছিল তাদের অন্যতম প্রাপ্তি। তাদের খামার, বাড়ি, গ্রাম, যবের ক্ষেত এবং খেজুর বাগান; এবং কয়েক প্রজন্মের সঞ্চিত সম্পদ সবই এখন মুহাম্মদের সাহাবিদের দখলে।

যখন মুহাম্মদ মসজিদে ফিরে আসেন তখন নাজ্জারদের প্রধান বাজারে একটি গর্ত খননের আদেশ দেন যা ছিল বেশ দীর্ঘ, যথেষ্ট গভীর এবং সকল অভিযুক্ত মানুষের মৃতদেহ রাখার জন্য যথেষ্ট চওড়া। ঐ বাজারের একটি খাবারের দোকানে তিনি সকালের নাস্তা করার পরই এই খনন কাজ শুরু হয় (১৬)। খনন কাজ শেষ হয় বিকেলের আগে আগেই। তিনি সাধারণত যেভাবে তার ‘বিশিষ্ট সাহাবিদের’ দ্বারা সৃষ্ট ঘনিষ্ঠ নিরাপত্তা-পরিমণ্ডলে বসেন সেভাবেই তখনো বসে ছিলেন ঠিক যেমনটা ওয়াকিদি (Waqidi) লিখেছেন যে, মুহাম্মদ “এরপর বন্দিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য তাদেরকে কারাগার থেকে বের করে আনার নির্দেশ দেন”। বানু কুরাইযা গোত্রের লোকেরা প্রার্থনা করে, তওরাত আবৃত্তি করে এবং একে অপরকে তাদের বিশ্বাসের মধ্যে শক্তি খুঁজে পেতে উৎসাহিত করার মধ্য দিয়ে নির্ঘুম রাত পার করে। যখন তাদের হত্যাকাণ্ডের সময় ঘনিয়ে এলো তখন মুহাম্মদের সঙ্গীরা তাদের একবারে পাঁচজন বা ছয়জন করে করে বের করে আনলো। হাত বাঁধা অবস্থায় তাদেরকে বাজারের দিকে আনা হলো এবং আলী অথবা জুবায়ের তাদের ধরে একে একে শিরোচ্ছেদ করে ফেলল (১৭)।

বানু নাযীর নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের মাথা প্রথমে কাটা হয়। তিনি একটি দামী লাল রঙের পোশাক পরেছিলেন এবং শিরোচ্ছেদের আগেই এটার অনেক জায়গায় তিনি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন যাতে গনিমতের মাল হিসেবে এর কোন মূল্য না থাকে। তাকে মুহাম্মদের সামনে যখন আনা হয়, মুহাম্মদ তাকে বিদ্রুপ করে বলেন যে, আল্লাহ তাকেই বিজয়ী করেছেন, ইহুদিদের নয়। এবং এর মানে হচ্ছে মুহাম্মদ সত্যের দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন, আর ইহুদিরা ‘মিথ্যার পথে’ ছিল। উত্তরে হুয়াই বললেন, “আপনার বিরোধিতা করার জন্য নিজের উপর আমার কোন খেদ নেই” (১৮)। মুহাম্মদ তাঁকে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন। হুয়াইকে খাদের কিনারায় নিয়ে যাওয়া হলো, জোর করে হাঁটু গেড়ে বসানো হলো, এবং তার মাথাটা কেটে ফেলা হলো। যখন বানু কুরাইযার নেতা কাব বিন আসাদকে সামনে আনা হয়, মুহাম্মদ তাঁকে বিদ্রুপ করে বলেন যে, তুমি আমাকে গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলে, শুধু যদি স্বীকার করে নিতে যে আমিই প্রকৃত নবী এবং আমার ধর্ম গ্রহণ করতে তবে বাঁচতে পারতে। কিন্তু সেটা তুমি করলে না, আর এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে! বানু কুরাইযার নেতা বললেন, “যদি ইহুদিরা তলোয়ারের ভয়ে ধর্ম গ্রহণ করাকে তিরস্কার না করত, তাহলে আমি তোমার অনুসরণ করতাম। কিন্তু আমার কাছে ইহুদি ধর্মই ধর্ম”। এই কথা শুনে মুহাম্মদ তাঁকে হত্যার আদেশ দিয়ে বললেন : “তাকে সামনে নিয়ে যাও, তার মাথাটা কেটে ফেলো” (১৯)।

নাব্বাশ নামের একজন ইহুদি নেতা যিনি মুহাম্মদের কাছ সাথে আত্মসমর্পণ চুক্তি করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাকে খাদের নিয়ে যাবার সময় তিনি পালিয়ে যাওয়ার জন্য জোরাজুরি শুরু করেন। এজন্য তার মুখে আঘাত করা হয়, যার ফলে মুখ রক্তাক্ত হয়ে যায়। নাব্বাশকে আঘাত করার জন্য মুহাম্মদ তার রক্ষীকে তিরস্কার করেন। উত্তরে রক্ষী বলল যে, তার বন্দী পালানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু নাব্বাশ বলেছে, "তওরাতের কসম, ও মিথ্যা বলছে! যদি আমাকে সে ছেড়ে দিত তাহলে আমি সেই জায়গায় চলে যেতাম যেখানে আমার লোকজনকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমিও দেরি না করে তাদের একজন হতাম"। মুহাম্মদ বন্দিদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে রক্ষীদের আদেশ দেন। "তাদের বিশ্রাম নিতে দাও; তাদের তৃষ্ণা দূর করতে সময় দাও, যতক্ষণ না তারা ঠান্ডা হয়। ততক্ষণে যারা অবশিষ্ট আছে তাদের মেরে ফেলো"- মুহাম্মদ বললেন (২০)।

বানু কুরাইযার কয়েকজনকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। আত্মসমর্পণের আগে বেশ কয়েকজন ইহুদি এবং তাদের পরিবার দুর্গ থেকে পালিয়ে তাদের ধর্মান্তরের ঘোষণা দিয়ে এই মৃত্যুদণ্ডের থেকে বাঁচতে পেরেছিল। হত্যাকাণ্ডের দিন, মুহাম্মদের এক খালা তাকে অনুরোধ করেছিল তার পরিবারের সদস্যের মতো একজন ইহুদির জীবনটা ভিক্ষা দিতে। মুহাম্মদের খালা চেয়েছিলেন ওই ইহুদিটি তার সুরক্ষার অধীনে আসুক এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, শেষপর্যন্ত তাকে তিনি ধর্মান্তরিত করে ফেলবেন। তাই তাকে না মেরে মুহাম্মদ তাঁর খালাকে বললেন, "সে আপনার জন্য"। আরেকজনকে মুহাম্মদ ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছিলেন যিনি একজন বৃদ্ধ রাব্বি ছিলেন, যিনি ক্ষীণদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এই বৃদ্ধ চেয়েছিলেন তার লোকদের সাথে তাকেও যেন হত্যা করা হয়; তাই তাকেও হত্যা করা হয়েছিল। এই বৃদ্ধ রাব্বি এক দশকেরও বেশি সময় আগে আন্তঃউপজাতীয় যুদ্ধের সময় আউস গোত্রের এক ধর্মান্ধরিতের জীবন বাঁচিয়েছিলেন।

আউসের ধর্মান্তরিত ব্যক্তিটি এই ইহুদি রাব্বির কাছে ঋণী ছিলেন এবং তাই তিনি মুহাম্মদের কাছে তার জীবন ভিক্ষা চান, এবং তিনি তাকে তার সুরক্ষার আওতায় আসার অনুমতি দেয়ার জন্য মুহাম্মদের কাছে আবেদন করেন, কিন্তু বৃদ্ধ রাব্বি তার পরিবর্তে তার স্ত্রী, পুত্র এবং তার সম্পত্তি তার (ধর্মান্তরিত সেই মুসলিমের) সুরক্ষার অধীনে নিতে বললেন। এই বৃদ্ধলোকটি বাকি ইহুদিদের সাথে মরতে রাজি হলেন, তবে তার বিনিময়ে তার ছেলের জীবন ভিক্ষা চাইলেন। মুহাম্মদ তাতে রাজি হলেন। তখন বৃদ্ধ লোকটি জুবায়েরের কাছে গেলেন এবং হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। জুবায়ের তার মাথায় তরবারির আঘাত করে তা আলাদা করে দিল।

এই সময়ে কুরাইযার এক তরুণীর শিরোচ্ছেদ করা হয়। দুর্গ অবরোধের সময়ে মুহাম্মদের এক সদস্য উপর থেকে ছুঁড়ে দেয়া পাথরের আঘাতে নিহত হয়েছিল। বানু কুরাইযার আত্মসমর্পণের পর জানা যায় যে, কাজটি (পাথর ছুঁড়ে মারা) এই তরুণী করেছিল। তার নাম ধরে ডাকা হলো। সে এলো। যখন তাকে গর্তের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন সে উন্মাদের মত হাসছিল (২১)। বয়োসন্ধিতে পা দেয়া সব ছেলেগুলোকে হত্যা করা হয়। যদি তাদের বয়স সম্পর্কে মনে কোন প্রশ্ন জাগত, তবে তাদের নিমাঙ্গের চুল (Pubic hair) পরীক্ষা করা হতো। যদি সঠিক মনে হতো তাহলে তাদের পাঠানো হত (শিরোচ্ছেদ করার জন্য)। যে সমস্ত লোকেরা দামি বা ভালো পোশাক পরিধিত ছিল যেগুলো সংরক্ষণযোগ্য ছিল, তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল কাপড় খুলে ফেলতে, তাই তাদের মধ্যে কেউ কেউ নগ্ন অবস্থায় নিহত হয়।

যদিও ইসলামিক ইতিহাস গ্রন্থে এটির উল্লেখ করা হয়নি, তবে সম্ভবত তখন মুহাম্মদের মিম্বারটি মসজিদ থেকে সরিয়ে বাজারে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। শিরোশ্ছেদের প্রাথমিক বর্ণনাগুলোর মধ্যে একটি থেকে বোঝা যায় যে, মুহাম্মদ মিম্বারে বসে বসে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলেন। কর্তৃত্ব দেখানোর জন্য হয়তো তিনি তার মিম্বারটি হত্যা করার স্থানে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথবা কর্মীদের উৎসাহ দেয়ার জন্যেও মুহাম্মদ এমনটি করতে পারেন, যেহেতু শিরোশ্ছেদের ঘটনা রাত পর্যন্ত চলে। এটা একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ ছিল। ইসলামের আদিগ্রন্থে বিভিন্ন সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায় - কোথাও

সংখ্যাটা চারশো থেকে নয়শত পুরুষ এবং বালক ছিল। প্রতি মিনিটে যদি একটি শিরোশ্ছেদ হয়, তাহলে চারশো মানুষকে হত্যা করতে সময় লাগবে সাত ঘন্টা এবং নয়শোত হলে সাত ঘন্টার দ্বিগুণেরও বেশি সময় লেগেছিল (২২)। মুহাম্মদের সাহাবিরা সমাবেশে আসা ভলান্টিয়ারদের মতো দক্ষতার সাথেই তাদের কাজ সম্পাদন করেছিল। প্রতি পাঁচ মিনিটে পাঁচজন বা ছয়জন পুরুষকে জেলখানা থেকে বের করে তাদের বাজারে নিয়ে যাওয়া হতো। একবার তারা গর্তের কিনারায় হাঁটু গেড়ে বসলে আলী আর জুবায়ের তাড়াতাড়ি মাথাটা কেটে ফেলত। সহকারীরা ধড়গুলোকে এমনভাবে গর্তে ফেলত যাতে তা সমানভাবে ভর্তি হয়। গর্তের মধ্যে ঘাড়, পা এবং বাহু সবকিছু এমনভাবে ফেলছিল যে, মাঝখানে মাথাগুলো স্যান্ডউইচের মতো ছিল। কোনটার মুখ উপরে, কোনটার মুখ নিচে, কোনটা পাশে, সব কাটা ঘাড় উন্মুক্তভাবে সমান করা ছিল। যদিও পুরুষরা মৃত্যুর মুহূর্তে ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন, কিন্তু তাদের ঘাড় কেটে ফেলার পর পেশিসমূহ শিথিল হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল তারা ঘুমিয়ে আছে, যেন তারা ঘুমাতেই গিয়েছিল।

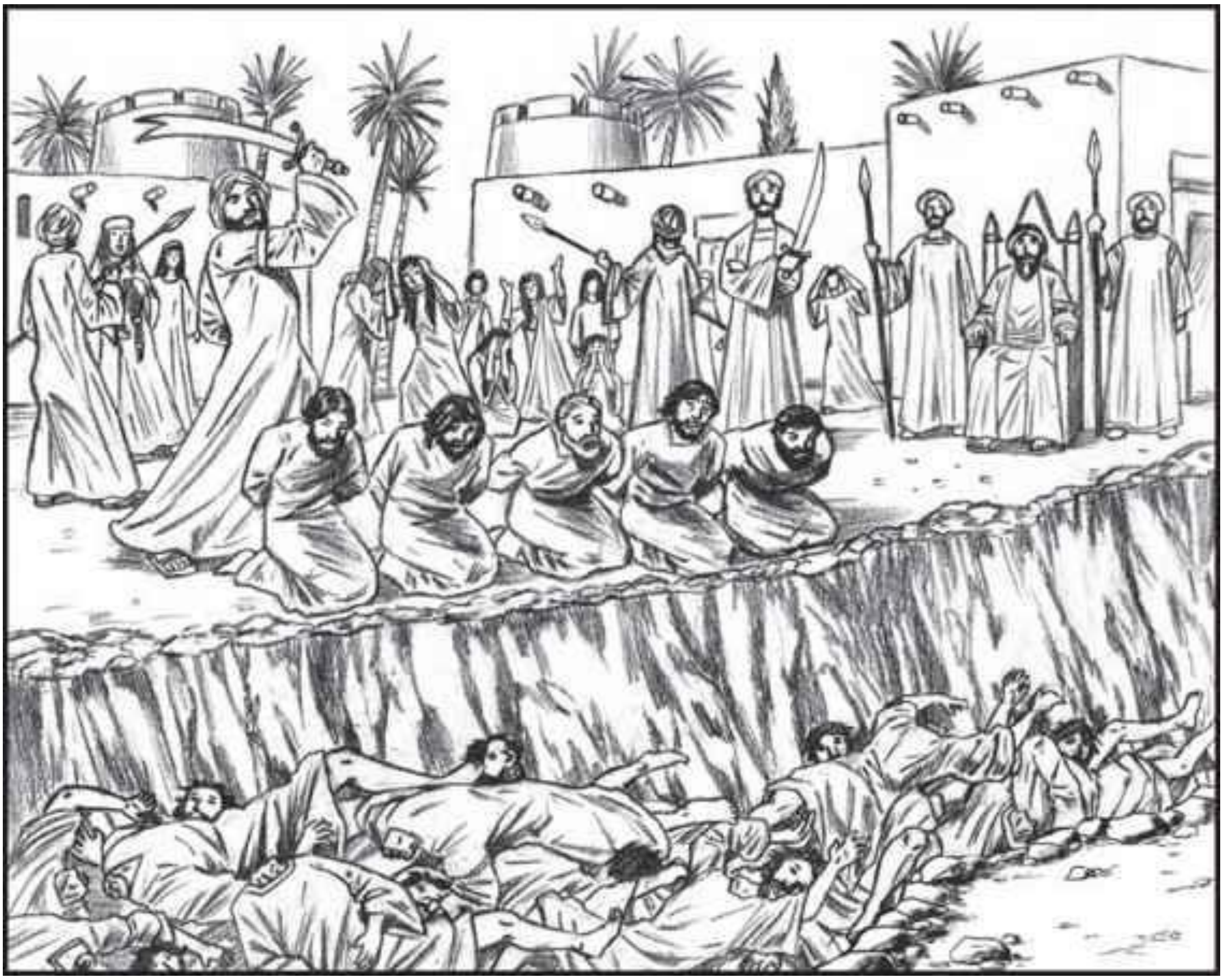
সম্ভবত যেটা হয়েছিল যে, আলী এবং জুবায়ের তাদের শিকারদের হয়তো তাদের ঘাড় সামনের দিকে ঝুঁকতে বলেছিলেন যাতে কল্লা কাটা তাদের জন্য সহজ হয়। এটা হয়তো বন্দিদের সুবিধার চেয়ে নিজেদের কাজকে সহজ করার জন্য হতে পারে, যেহেতু তারা একাধিকবার কোপ দিয়ে মাথা কাটতে চাননি। যদি তারা প্রথমবার কল্লাটা ফেলে দিতে না পারেন তবে তাতে এই ইহুদিরা ব্যথায় কাঁপাকাঁপি এবং চিৎকার করতে থাকবে, তাদেরকে আবার হাঁটু গেড়ে বসাতে হবে অথবা শোয়াতে হবে, যাতে ঘাড়ে পোচ দেয়ার সময়ে তলোয়ারটি মাটিতে ঘষা লাগার কারণে ধার কমে বা ভেঙে না যায়। অনেক মানুষের শিরোশ্ছেদ করতে হবে, তাই নষ্ট করার মতো সময়ও হাতে ছিল না।

ইসলামের আদি গ্রন্থের কোথাও লেখা নেই তারা যখন শিরোচ্ছেদের জন্য অপেক্ষা করছিল তখন কোন ইহুদি কেঁদেছে বা তাদের জীবন ভিক্ষা চেয়েছে, অথবা অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। তবে এটা ধরে নেয়া যায় যে, তলোয়ারের নিচে কোপ খাওয়ার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে তাদের কারো কারো পায়খানা-প্রস্রাব হয়ে থাকবে। যখন তারা খাদের কিনারায় হাঁটু গেড়ে বসে তাদের বাবা, ভাই, ছেলে এবং চাচাদের কর্তিত দেহাবশেষের দিকে তাকিয়েছিল, তখন তারা নিশ্চয়ই শোকে কেঁদেছিল এবং কেউ কেউ অর্ধচেতন অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল।

এটা পরিষ্কার নয় যে, মুহাম্মদ পুরো এই ঘটনার তদারকি করেছেন কিনা। ওয়াকিদির ভাষ্যমতে, তিনি সাদ বিন মুয়াযকে বাদবাকিদের গলা কাটার দায়িত্ব গ্রহণ করার আদেশ দিয়ে অন্য কাজে চলে গিয়েছিলেন। সাদ মৃত্যু-পথযাত্রী ছিল এবং সেবা নেয়ার তাঁবু থেকে একটি আবর্জনা বহনকারী স্ট্রেচারে তাকে বহন করে মসজিদ প্রাঙ্গণে, যেখানে শিরোশ্ছেদ করা হচ্ছিল সেখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেখানে সে কোনমতে উঁকি দিয়ে দিয়ে শিরোচ্ছেদ দেখছিল। মুহাম্মদ যদি সত্যিই চলে গিয়ে থাকেন তাহলে তিনি জবাইয়ের শেষের দিকে আবার ফিরেও এসেছিলেন। ততক্ষণে অনেক রাত হয়ে গেছে। বাজারে মশাল জ্বালানো হয়, এবং মশালের সেই হলদে আলোয় ডজন খানেক ইহুদিকে হত্যা করা হয়। শিরোশ্ছেদের শুরুতে মুহাম্মদ দেখেছিলেন, খাজরাজীরা ইহুদিদের মাথা কেটে ফেলা উপভোগ করছে, অন্যদিকে তাদের (বানু কুরাইযার ইহুদিদের) সাবেক মিত্র আউস গোত্রের মধ্যে অসন্তোষের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তাই তিনি এই হত্যাকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণও বাধ্যতামুলক করার সিদ্ধান্ত নেন। অবশিষ্ট বারোজন ইহুদির প্রত্যেকের জন্য দুজন করে আউসকে একত্রিত করে তিনি আলী ও জুবায়েরের পরিবর্তে তাদের শিরোশ্ছেদ করার আদেশ দেন। কেউ কেউ আগ্রহী ছিল, কিন্তু বেশিরভাগই এই কাজে আগ্রহী ছিল না, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে হয়তো অভিযোগ উঠতে পারে তাই তারা বাদবাকি ইহুদিদের হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল (২৩)।

পরদিন সকালে গর্ত ভরাট করা হলো। কাদামাটি দিয়ে আশপাশ থেকে একটু উঁচু স্তূপাকার করা হয়েছিল। গর্তটি দেখতে উঁচু একটি তাজা কবরের মতো মনে হচ্ছিল, এবং অবশেষে মৃতদেহ পচতে থাকার সাথে সাথে কবরের উচ্চতাও নিচের

দিকে নামতে থাকে। মৃতদেহের গন্ধ অনেকদিন ধরেই ছিল। গর্ত খননের সময়সীমা ধরলে এটির ঘভীরতা বেশি ছিল না, এবং মিথেন ও অন্যান্য গ্যাস ভেসে বেড়াচ্ছিল। এই দুর্গন্ধ কুয়াশার মতো বাজারের চারিধারের এলাকায় অনেকদিন পর্যন্ত রয়ে গিয়েছিল।



[বানু কুরাইযা গোত্রের ইহুদিদের গণহত্যা। মুহাম্মদ চারশো থেকে নয়শত পুরুষ ও ছেলের শিরোচ্ছেদের তদারকি করেন। ইসলামের আদি গ্রন্থ অনুসারে, তাদের একবারে পাঁচজন বা ছয়জন করে বের করে আনা হয় এবং মুহাম্মদের মসজিদের কাছের বাজারে একটি গর্তের পাশে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করা হয়। শিরোচ্ছেদগুলো বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলে - প্রতি মিনিটে একজন করে হত্যা করা হয়, যেটা সাত থেকে পনেরো ঘণ্টা ধরে চলে। মুহাম্মদের প্রথম চাচাতো ভাই (First cousin) আলী ও জুবায়ের বেশিরভাগ শিরোচ্ছেদ করেন।]

যখন হত্যাযজ্ঞ শেষ হয়, মুহাম্মদ নারী ও শিশুদের দাস হিসেবে বিক্রি করেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ তিনি অস্ত্র ও ঘোড়া কেনার জন্য ব্যয় করেন। বেশিরভাগ প্রতিবেদনে পাওয়া যায়, সাদ বিন মুয়ায এই হত্যাকাণ্ডের পরপরই মারা যান।

বেশ কিছু সংস্করণে পাওয়া যায় - প্রতিটির বিস্তারিত বর্ণনা আছে - স্কলারদের সবাই একমত যে, সাদ মসজিদ প্রাঙ্গণে চিকিৎসার তাঁবুতেই মারা যায়। একটি সংস্করণে দেখা যায়, মুহাম্মদ রাতে তার মৃত্যু সম্পর্কে জানতে পারেন যখন জিব্রাইল তার কাছে এসে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে এই সংবাদটি প্রদান করেন। এরপর মুহাম্মদ তাঁবুতে ছুটে গিয়ে তার সঙ্গীকে

মৃত অবস্থায় দেখতে পান। আরেকটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, সাদ যখন মারা যায় মুহাম্মদ তার বিছানার পাশে বসে ছিলেন। তার মৃত্যুটি দ্রুত ঘটল - তার ফোলা হাত বেলুনের মত ফেটে গেল, সেই বেলুন ফেটে গিয়ে মুহাম্মদের মুখে এবং দাড়িতে রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছিল যার ফলে রক্তক্ষরণের কারণে সাদের মৃত্যু হয়। তৃতীয় এবং সম্ভাব্য সঠিক সংস্করণে দেখা যায়, মুহাম্মদকে সাদের মৃত্যুর সংবাদটি জিব্রাইল দেয়নি, বরং অন্য একজন দিয়েছে। মুহাম্মদের বাসস্থানের কাছে মসজিদের উঠোনের এক কোণে চিকিৎসার তাঁবুটি টানানো হয়েছিল, তাই তাঁবুতে পৌঁছতে মুহাম্মদের বেশি সময় লাগেনি। তিনি সাদের জামার ভিতর হাত দিয়ে দেখলেন যে সে মারা গেছে কিনা, এবং যখন এটা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে সে মারা গেছে, তখন মুহাম্মদ তার লাশ দাফনের আদেশ দিলেন। মৃতদেহটি সাধারণ কবরস্থানে একটি কাফনের কাপড়ে মোড়ানো ছিল, এবং তার মৃতদেহকে একটি খাটিয়ায় করে কবরেস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে তাকে শেষবারের মতো দেখার জন্য মুমিনদের সামনে রাখা হয়। এরপর সাদের মৃতদেহ কবরে নামানো হয় এবং মুহাম্মদ তার জন্য প্রার্থনা করতে সবাইকে নির্দেশ দেন (২৪)।



[নারী এবং শিশুরা তাদের প্রিয়জনদের শিরোশ্ছেদের সাক্ষী হয়েছিল। কেউ কেউ, এমনকি সব নারী এবং শিশুদের সেই দৃশ্য দেখতে বাধ্য করা হয়েছিল। বানু কুরাইযা দুর্গ অবরোধের সময়, মুহাম্মদের একজন সৈন্য হত্যার দায়ে এক তরুণীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।]

সবার কবরের কাজ শেষ করে ফেলার পর মুহাম্মদ এখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজে, সবাইকে খুশি করতে গনিমতের মাল বিতরণে মনোনিবেশ করেন। জায়গাজমি, গবাদিপশু, লুণ্ঠিত অস্ত্র, এবং মানুষ এই সবকিছুর ভাগ করা তার জন্য এখন বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, এই লুণ্ঠিত মালের পরিমাণ বানু নাযীর এবং বানু কায়নুকার লুণ্ঠিত মালের চেয়ে অনেক বেশি। এখানে লুণ্ঠিত মাল হিসেবে রয়েছে এক হাজারের অধিক নারী ও শিশু। মুহাম্মদ নিজের জন্য জায়গাজমির একটি অংশ ধরে রাখেন, এবং বাকি অংশটুকু যৌথ মালিকানার সম্পত্তি ভাগ করে দেয়ার মতো করে তিনি আউস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেন। এরপরও অবশিষ্ট থাকা কিছু মালামাল নিলামে তোলা হয় এবং তার আয় থেকে মুহাম্মদের অংশ কেটে রেখে বাকিটা যোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার।

নারী ও শিশুদের নিয়ে তিনি জটিল লেনদেনের দেনদরবারে জড়িত হয়ে পড়লেন। কেননা, তাদের তো আর টুকরো করে তিন হাজার পুরুষের মধ্যে বিতরণ করা যাবে না। সুতরাং তাদের অধিকাংশকেই বিক্রি করা হয় এবং বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ একজন দায়িত্বশীলের হাতে তুলে দেয়া হয় বিতরণ করার জন্য। মুহাম্মদ বন্দিদের দুইশো করে পাঁচটি অংশে বিভক্ত করেন এবং নিজের জন্য দুইশো দাসী রাখেন। ইসলামিক ঔতিহাসিক গ্রন্থ নির্দেশ করে যে, তিনি অনেককে উপহার হিসেবে দাসী দিয়েছেন অথবা বকেয়া ঋণ নিষ্পত্তি করতে দাসীদের ব্যবহার করেছেন। তিনি তার ধর্মগ্রহণ করতে সম্মত হওয়া কয়েকজনকে মুক্ত করলেন এবং অন্যদের ক্রীতদাসী হিসেবে ধরে রাখলেন। অবশিষ্ট আটশো জনের মধ্যে তার দুই প্রধান ব্যক্তি - ভবিষ্যৎ খলিফা উসমান ইবনে আফফান এবং প্রথমদিকের ধর্মান্তরিত মক্কান আব্দুর রহমান - যারা পুরো অংশ (আটশো দাসদাসী), অথবা একেকজন দুইশোজন ক্রীতদাসী কিনতে সক্ষম ছিলেন। দাসী কেনার ক্ষেত্রে উসমান বয়স্ক নারীদের বেছে নেন, কারণ কমবয়সী নারী ও শিশুদের চেয়ে তাদের মূল্য বেশি ছিল। তারা উভয়ই দক্ষ ব্যবসায়ী ছিলেন। সময়ের সাথে সাথে কেনা দাসদাসী পুনঃবিক্রয়ের মাধ্যমে একটি উল্লেখযোগ্য মুনাফা তাঁরা লাভ করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে দাসী বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া গেছিল তা মাল বন্টনের দায়িত্বপ্রাপ্তের কাছে হস্তান্তর করা হয়, যে অর্থ পরে আবার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করা হয়।

তখনও আরও চারশো নারী ও শিশু নিষ্পত্তি করার বিষয় ছিল। মুহাম্মদ তাদের সশস্ত্র প্রহরীর অধীনে উত্তর আরব ও সিরিয়ার ক্রীতদাস বাজারে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের বিক্রয় করা থেকে প্রাপ্ত অর্থ অস্ত্র এবং ঘোড়া কেনার জন্য ব্যয় করা হয়, কিন্তু যারা তাদের ন্যায্য অংশ পেতে বানু কুরাইযা আক্রমণে অংশ নেয়, তাদের জন্য ঘোড়া এবং অস্ত্রগুলোকে ইয়াছরিবে পুনরায় বিক্রি করেন। এই বিক্রয় থেকে টাকা তারপর বন্টনের দায়িত্বপ্রাপ্তের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ঘোড়াগুলোর জন্য চড়া মূল্য পাওয়া যাচ্ছিল। ঘোড়ায় বিনিয়োগকে লাভজনক ব্যবসা হিসেবেও দেখা হয়েছে, কারণ ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করলে তাতে সাফল্য বেশি ছিল। আর তাই পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করলে যেখানে গনিমতের মালের (Booty) একটি শেয়ার পাওয়া যায় সেখানে চেয়ে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করলে গনিমতের মালের তিনটি শেয়ার পাওয়া যেত।
মুহাম্মদের ভাগে পড়া বন্দিদের মধ্যে একজন ছিলেন অনিন্দ্য সুন্দরী এক নারী, খুব সম্ভবত সে সময় সে কিশোরী ছিল, যার নাম রায়হানা। তার বরর শিরোচ্ছেদ করা হয়েছিল। বানু কুরাইযা আত্মসমর্পণ করে তাদের দুর্গ থেকে বের হয়ে এলে নারীদের বন্দি করে তখনই মুহাম্মদের সামনে দাঁড় করানো হয়েছিল। আল্লাহর রাসূল ও মুমিনদের সেনাপতি হিসেবে মুহাম্মদ প্রথমেই নিজের ভাগের মাল বেছে নিয়েছিলেন। এবং মুহাম্মদকে রায়হানাকে দেখানো হলে সব নারীদের মধ্যে থেকে মুহাম্মদ তাকে বাছাই করে নিলেন। মুহাম্মদ রায়হানাকে প্রস্তাব দিলেন যদি সে তাঁকে বিয়ে করে এবং ইসলাম ধর্মে যোগ দেয়, তাহলে তিনি তাকে মুক্ত করে দেবেন, কিন্তু সে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। বরং সে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল যে, মালিকানার ব্যাপারে তার কোন পছন্দ নেই, কিন্তু মুহাম্মদের ধর্ম তার অপছন্দ, এবং সে ইহুদিই থাকতে চায়। সুতরাং সে মুহাম্মদের যৌনদাসী হয়ে থাকল এবং মুহাম্মদের স্ত্রীদের কক্ষসমূহের ভেতরে তাকেও একটি কক্ষ দেয়া হলো। ইসলামের আদিগ্রন্থে বলা হয় যে, মুহাম্মদ তার থেকে দূরে থাকতেন, কিন্তু সম্ভবত সত্যি হচ্ছে রায়হানাই তার থেকে দূরে থাকত। মসজিদ থেকে মাত্র একশো গজ দূরে ছিল গণকবর, যেখানে তার বর এবং তার প্রিয়জনের সবাইকে কবর দেয়া হয়েছে

যাদেরকে মুহাম্মদ হত্যা করেছিল। এবং মুহাম্মদ যে তাদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার করেছিল ওই কবরগুলোই ছিল তার চিরন্তন স্মারক।

ইসলামিক গ্রন্থে এ সম্পর্কিত বর্ণনায় লেখা আছে যে, একদিন একজন দাসী মুহাম্মদকে জানায় যে রায়হানা তার ধর্ম গ্রহণ করেছে, এবং "এই সংবাদে মুহাম্মদ আনন্দিত হয়েছেন" (২৫)। গণহত্যার চার বছর পর, এবং মুহাম্মদের মৃত্যুর এক বছর আগে সে মারা যায়। তার মৃত্যুর কোনো কারণ লেখা পাওয়া যায় না, কিন্তু এটা অস্বীকার করা যায় না যে এটি সম্ভবত দীর্ঘ বিষন্নতার পরিণতি ছিল। তার বিষন্নতা ছিল হয়তো তাকে তার প্রিয়জনের হত্যাকারীর সাথে থাকতে বাধ্য করার পরিণতি। তার আত্মা হয়তো আগেই মরে গেছিল, তারপর তার শরীরটি মারা যায়।

অধ্যায় - ২৪
সবাই জেগে ওঠো

মুহাম্মদের ধর্ম ছিল আইন আর মুহাম্মদ ছিলেন সেই আইনের প্রণেতা। তিনি আলো-ঝলকিত পাহাড় থেকে নেমে আসা মুসা নবীকে কল্পনায় আনেন, যিনি পাথরের পাতে খোদাই করা ঈশ্বরের আদেশ নিয়ে এসেছিলেন; কিন্তু মুহাম্মদ ছিলেন মুসার আরও বিস্তৃত পরিসরের প্রতিকৃতি। মুসা যেখানে কেবলমাত্র ইহুদি সম্প্রদায়ের জন্য ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ নিয়ে এসেছিলেন, মুহাম্মদ সেখানে নিজেকে পুরো পৃথিবীর জন্য প্রভুর বার্তাবাহক হিসেবে দেখেছিলেন। নিজের সম্পর্কে তার মহিমান্বিত ধারণাটি এমন পর্যায়ে প্রসারিত হয়েছিল যে, তিনি বিশ্বাস করতেন অদৃশ্য জিন জাতির জন্যেও সমন্বিত একগুচ্ছ নিয়ম (শরিয়া) আনার জন্য তাকে মনোনীত করা হয়েছে, যাতে জিনদেরকেও বেহেশতে নেয়া সম্ভব হয়। মদিনায় মুহাম্মদের ভূমিকা শুরুই হয়েছিল বিচারক হিসেবে, একজন আইনপ্রণেতা ও বিধানকর্তা হিসেবে। তিনি ইয়াছরিবে স্থায়ী হওয়ার পরে লোকেরা তাদের নানান বিরোধ নিষ্পত্তি করতে তার কাছে আসত। একজন বহেরাগত হিসেবে তাকে সেই উপত্যকায় নিরপেক্ষ হিসেবে দেখা হতো, যেখানে অন্য আর কেউ নিরপেক্ষ ছিল না। প্রথমে, তিনি নাগরিক নানান বিষয়ে বিচার করতেন এবং পারস্পরিক বিবাদের সমাধানের জন্য লোকদেরকে একত্রিত করতেন। লোকেরা যেসব সমস্যার সমাধানের জন্য তার নিকট এসেছিল তার মাঝে প্রথমটি ছিল জল নিয়ে বিরোধের নিষ্পত্তি করা। উপত্যকার (ইয়াছরিব) ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠী বাণিজ্যের চেয়েও কৃষিকাজের উপর বেশি নির্ভরশীল ছিল। কিছু ভূ-পতি শুকনো মওসুমে পানি ধরে রাখতে খালের পাড়ে বাঁধ দিয়েছিল, কিন্তু তা করতে গিয়ে তারা নিম্নভূমির কৃষকদের বঞ্চিত করেছিল। ক্ষতিগ্রস্থরা সমাধান খুঁজে পেতে মুহাম্মদের শরণাপন্ন হলো। তিনি কীভাবে বিষয়টি মীমাংসা করেন তা জানা যায়নি, তবে তিনি সকল পক্ষকে নিয়ে একটি ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন (১)

বহু বছর আগে বুয়াতের (Buath) যুদ্ধের শেষ হওয়া আন্তগোত্রীয় সংঘর্ষের সালিশই-বিচারের জন্যও মুহাম্মদের শরণাপন্ন তারা হয়েছিল। আউসের বিরুদ্ধে তখনও খাজরাজীদের অভিযোগ ছিল, আবার খাজরাজের বিরুদ্ধেও আউসীদের অভিযোগ ছিল। পৌত্তলিক গোত্রের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে বেশ কয়েকটি ইহুদি গোত্রও নানান দাবিদাওয়া পেশ করেছিল। এই বিষয়গুলির বেশিরভাগ ছিল রক্তের মূল্য নিয়ে, তবে জব্দকৃত সম্পত্তিও ছিল তাদের অভিযোগের বিষয়বস্তু। কার কিসে অধিকার ছিল এই ব্যাপারে তিনি সবাইকে একটা ঐক্যমতে পৌঁছাতে সক্ষম হন । লোকেরা পারিবারিক বিষয়, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা, চুক্তির বিরোধ এবং আরও অনেক কিছু সম্পর্কেই সমাধান পেতে তার কাছে আসত।

মসজিদটি নির্মাণের মাধ্যমে মুহাম্মদ তার আল-কায়েদা বা নিয়মকানুন (আইন-আদালতও বলা যেতে পাড়ে) প্রতিষ্ঠার পর সালিশের ভূমিকা পালন করা বাদ দিয়ে বরং সমাধানকল্পে আইন জারি করতে শুরু করেন। তিনি মসজিদে আদালত স্থাপন করেছিলেন এবং ছোট, বড় নানান বিষয়ের বিচারক হয়েছিলেন। তিনি তার কর্তৃত্ব কোরআনের আয়াত আকারে জাহির করেছিলেন, যা সেগুলোকে আবার ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের অবয়ব প্রদান করেছিল। এই আয়াতগুলি অসংখ্য অধ্যায়ে (সূরায়) ছড়িয়ে আছে এবং বারবার নিগূঢ় অর্থসহ তার পুনরাবৃত্তি হয়, আইন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দেয়; এবং সেই সময় হতেই বিভিন্ন ঘটনা মোকাবিলা করার পদ্ধতি সমূহ পরবর্তীতেও নজির বা উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে (২)। নাগরিক বিষয়গুলি প্রায়শই ব্যক্তিগতভাবে শোনা হতো, কারণ লোকেরা তাদের বিষয়ে প্রকাশ্যে বলতে অনিচ্ছুক ছিল। এই ধরনের বিষয়গুলি সাধারণত আয়েশার ঘরে অনুষ্ঠিত হতো। লোকেরা পর্দার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করত, এই পর্দা মূলত মসজিদের মিম্বার (পাটাতন) থেকে ঘরকে পৃথক করেছে। তারা সেখানে পা গুটিয়ে মুহাম্মদের মুখোমুখি বসত। ব্যক্তিগত শুনানির চাহিদা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, একপর্যায়ে তিনি দাতব্য অনুদানের আকারে কিছু পারিশ্রমিকও ধার্য করেন। যাদের পারিশ্রমিক দেয়ার সামর্থ্য ছিল না তারা অতিরিক্ত নামাজ পড়ার মাধ্যমে মুহাম্মদকে পুষিয়ে দিতেন।

তিনি নাগরিক বিষয়ে যেসব রায় দিয়েছিলেন তার উপাখ্যানগুলি বেশ মজাদার, আবার কিছু অত মজাদার নয়। মজাদার বিষয়গুলির মধ্যে একটি এমন - এক নারী মুহাম্মদের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে, পুরুষাঙ্গের আকারের কারণে সে তার দ্বিতীয় বরের কাছ থেকে তালাক (বিবাহ-বিচ্ছেদ) নিয়ে প্রথম বরের কাছে ফিরতে অপারগ হয়ে যাচ্ছে। সেই নারী অভিযোগ করে, "তার (বরের) পুরুষাঙ্গটি কাপড়ের সুতার মতো চিকন"। নারীটি তার পোশাক থেকে একটি সুতো বের করল মুহাম্মদকে দেখানোর জন্য যে, পুরুষাঙ্গটি কতটা ছোট ছিল! তার পরিস্থিতি বেশ জটিল ছিল। সে তার পূর্বের বর যে তাকে (নারীকে) তালাক দিয়েছিল তার কাছেই এখন ফিরে যেতে চাইছে। মুহাম্মাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিবাহবিচ্ছেদের নিয়মানুসারে তালাকপ্রাপ্তা (ডিভোর্সড) নারী তার বরের কাছে আবার ফিরতে চাইলে তাকে আগে অন্য কারো ঘরণী (প্রচলিত অর্থে, হিল্লা বিয়ে) করতে হবে এবং সেখানেও বিবাহটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হবে, অর্থাৎ সহবাস হতে হবে। যদি দ্বিতীয় বিবাহটিও টিকে না থাকে তথা সেখানেও যদি নারীটি তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যায় তবে সে তার প্রথম বরর সাথে পুনরায় বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। কিন্তু এই নারীটি তার দ্বিতীয় বরের লিঙ্গের আকারের কারণে তার আগের প্রিয়তম বরের সাথে পুনরায় মিলিত হতে পারছে না, কারণ তার সাথে তার (উত্থানরহিত লিঙ্গওয়ালা) দ্বিতীয় বরের সহবাস সম্ভব হয়নি। নারীটি ডিভোর্স চাইলে দ্বিতীয় বরও অমত করেনি, তাই মুহাম্মদ বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর করেছিলেন, কিন্তু আশ্চর্জনকভাবেই তিনি রায় দিয়েছিলেন যে, দ্বিতীয় বিয়েতে যৌনমিলন না হওয়ায় সে তার আগের বরর কাছে ফিরে যেতে পারবে না (৩)! এই ঘটনাটি উদ্ভট একটি দিকে মোড় নিয়েছিল, বিশেষ করে পুরুষদের জন্য বিবাহ বিচ্ছেদকে আরও জটিল করে তুলেছিল। আগে কেবল "আমি তোমাকে তালাক দিলাম"এটা বললেই তালাক হয়ে যেত, তবে পুরুষরা আবার প্রায়শই তাদের মন পরিবর্তন করত এবং তাদের স্ত্রীদের ফিরে পেতে চাইত, এবং রাগের বশে স্ত্রীকে আবারও তালাক দিত। পুরুষদের তালাক দেয়ার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য মুহাম্মাদ একটি তিন-তালাকের বিধি নিয়ে এসেছিলেন। তৃতীয়বার তালাক দিলে স্ত্রীকে অন্য কারো সাথে বিয়ে দিয়ে হবে, এবং সেই বিয়ে থেকে তালাকপ্রাপ্ত হলেই কেবল তার প্রথম বর তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে (৪)। তবে এই বিধিটি তার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারেনি। কারণ যেসব পুরুষেরা তাদের প্রাক্তন স্ত্রীদেরকে ফিরে পেতে চাইত, তারা মাঝেমাঝে অন্য কোন পুরুষকে জোগাড়/ভাড়া করে আনত, তাকে দিয়ে স্ত্রীকে বিয়ে করাতো, স্ত্রীর সাথে ঘুমোতে দিত এবং তারপরে তাকে দিয়ে স্ত্রীকে আবার তালাক দেয়াতো। এভাবেই স্ত্রী ফিরে পাবার পন্থা আবিষ্কার করেছিল তারা। কিন্তু যারা এই কাজ করছিল মুহাম্মদ তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং জাহান্নামের আগুনের হুমকি দিয়েছিলেন। তবে দোষীদের (আসল বর এবং ভাড়াটে বর) শাস্তি দেয়া কঠিন ছিল, কারণ ঘটনার সাক্ষী জোগাড় করা ছিল আরো কঠিন।

খাওলা নামের এক নারীকে নিয়ে আরেকটা মজার ঘটনা আছে। খাওলার বর পৌত্তলিকদের তালাকের রীতি মেনে তাকে তালাক দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি তুলনা করেছিলেন যে, খাওলার সাথে সহবাস করার মানে হচ্ছে তিনি যেন তার নিজের মায়ের সাথেই সহবাস করছেন। এই ঘোষণার খুব অল্পক্ষণ পরেই বর তার মন পরিবর্তন করেছিল, কারণ সে স্ত্রীকে পেতে এবং তার সাথে সহবাস পুনরায় শুরু করতে চেয়েছিল। কিন্তু খাওলা তাকে স্পর্শ করতে দিতে রাজি হলেন না এবং এই ব্যাপারে তিনি মুহাম্মদের কাছে আসলেন সমাধান চাইতে। খাওলা কেঁদে কেঁদে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, সে আমার সম্পদ ব্যয় করেছে, আমার যৌবন ক্ষয় করেছে এবং আমার গর্ভে তার অনেক সন্তান ধারণ করেছি। যখন আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি, বাচ্চা জন্ম দিতে পারছি না, তখন সে আমার উপর তালাকে যিহার উচ্চারণ করল!"(৫) তার সমস্ত ঘটনা শোনার একপর্যায়ে মুহাম্মদ সবার সামনে মূর্ছা যান এবং এরপর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে বললেন, "হে খাওলা! আল্লাহ আপনাকে এবং আপনার বর সম্পর্কে কিছু আয়াত অবতীর্ণ করেছেন"। মুহাম্মদ খাওলাকে জানালেন যে, তার বর যদি সত্যিই তাকে ফিরে পেতে চায় তবে তার অপমানজনক কথার প্রায়শ্চিত্ত করতে একটি দাসকে মুক্ত করতে হবে। খাওলা জবাবে বলেছিলেন যে, তার বর কোনও দাসের মালিক নয়। মুহাম্মদ তখন একটি বিকল্প পন্থা দিলেন : বরকে দুই মাস রোজা রাখতে হবে, কিন্তু এবারও খাওলা মাথা নেড়ে বললেন যে, তাতে কাজ হবে না কারণ তার বর বৃদ্ধ; এত দিন রোযা

রাখলে সে মারা যাবে। মুহাম্মদ তখন বললেন, "তাকে বলুন গরিবদের মাঝে এক উট বোঝাই করে খেজুর বিলিয়ে দিতে। খাওলা বললেন, "কিন্তু আমরা তো গরিব। আমার বর বিয়ের সময় তার সব টাকা খরচ করে ফেলেছে"। মুহাম্মদ তখন খাওলাকে কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুর হাতে তুলে দেন, আর সেগুলোর সাথে মিলিয়ে আরো কিছু খেজুর যুক্ত করে গরিবদের মাঝে ভাগ করে দিতে বলেন। তাতে তার বর তাকে আবারো ফিরিয়ে নেবার অধিকার পাবে। খাওলা খুশিতে শিহরিত হয়েছিলেন, কিন্তু তার খুশির কারণ এটি নয় যে তিনি বরের কাছে ফিরে আসতে পারছেন, বরঞ্চ তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহর সাথে মুহাম্মদের যোগাযোগের মুহুর্তের সাক্ষী হয়েছেন! সারাজীবন তিনি গর্ব করেছিলেন যে, তার বৈবাহিক বিরোধের কারণে স্বয়ং আল্লাহ কোরআনের একটি সূরার শুরুর আয়াত নাজিল করে ফেলেছিলেন যা "ফরিয়াদী নারী (pleading women)" হিসেবে পরিচিতি লাভ করে (৬)।

বড় ও ছোট বিষয়ে মুহাম্মদের রায়গুলির বিপরীতে আপিলের কোন সুযোগ ছিল না, তাই একলোকের কাছে তা বেশ কঠিন মনে হয়েছিল। ইসলামের ইতিহাসে বলা হয়েছে যে, লোকটি নাগরিক বিরোধের সমাধানে মুহাম্মদ যে রায় দিয়েছিলেন তাতে বিরক্ত হয়েছিল। মামলার প্রকৃতি জানা যায়নি। যে লোকটি বিচারে হেরে গিয়েছিল সে মুহাম্মদের সাথে একমত হয়নি এবং সেই রায় নিয়ে সে আবু বকরের কাছে যায়। আবু বকর জবাবে বলেছিলেন যে, মুহাম্মদের বাণী আল্লাহর বাণী এবং এটিই চূড়ান্ত। তারপরও সন্তুষ্ট না হয়ে সে উমরের বাড়িতে গিয়ে তার কাছে অভিযোগ জানায়। উমর অভিযোগ শোনার পর রেগে গেলেন। সে আল্লাহর রাসূল নিয়ে প্রশ্ন করার সাহস কী করে পেল? মুহাম্মদ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি ছিলেন। তার বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করা ছিল সর্বশক্তিমানকে প্রশ্ন করা। উমর দ্রুত আপিল পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ছুটে তার নিজের বাড়িতে ঢুকলেন এবং তলোয়ার নিয়ে ফিরে এলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অভিযোগকারীর মাথাটা মাটিতে পড়ে গেল (৭)।

মুহাম্মদ ছিলেন মনে থেকে একজন নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী ব্যক্তি। এবং কোরআনের রচনাবলীর মাধ্যমে তিনি নিজেকে যে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন তা ব্যবহার করেই তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতেন – যেমন, মদ্যপান ও জুয়ার মতো জনপ্রিয় ক্রিয়াকলাপকে তিনি নিষিদ্ধ করে দেন। মদ সবার পছন্দনীয় পানীয় ছিল এবং মদের দোকানগুলোতে সহজেই কাপে করে বা বড় জগে করে মদ কিনতে পাওয়া যেত। লোকেরা বার্লি এবং যবের মন্ড থেকে তৈরি অশোধিত বিয়ারও পান করত। গাঁজানো খেজুর থেকে মধু জাতীয় উদ্ভূত একটি পানীয়ও ছিল জনপ্রিয়। মদের অপব্যবহারে কতটা সামাজিক সমস্যা হয়েছিল তা জানা যায় না, যদিও একটি গোত্রের গল্প থেকে অনুমান করা যায় যে, সেখানে মদ্যপান ছিল ব্যাপক। প্রথম দিকে মুহাম্মদ মদের ব্যাপারে অসম্মতি জানান যখন হামজা মাতাল হয়ে আলীর লুট করা উটকে জবাই করে খেয়ে ফেলেছিল। উহুদ যুদ্ধের পরে তিনি তার যোদ্ধাদের ধমক দিয়েছিলেন যখন তিনি জানতে পারেন যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের ভয় কমানোর জন্য যুদ্ধের আগে মদপান করেছিল। প্রথমত, মদ নিয়ে তার প্রধান উদ্বেগ ছিল এটি মনকে মোহাচ্ছন্ন করে এবং লোকদেরকে আল্লাহর ভাবনা থেকে বিরত রাখে, তবে উমরের চাপের ফলে তিনি নিন্দা থেকে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার দিকে চলে যান। উমরের পিতা খাত্তাব মাতাল হলে হিংস্র হয়ে যেতেন এবং প্রায়শই তাকে মাতাল হয়ে বর্বরভাবে মারতেন, যার ফলে উমর মদ ও মদ্যপায়ীদের ঘৃণা করতে করতে বেড়ে ওঠেন। তবে তিনি নিজেও মাতাল হয়ে ঘরে বসে থাকতেন, কিন্তু মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণের পরে মদ্যপান বন্ধ করে দেন। তিনি যে মুহাম্মদকে মদ নিষিদ্ধ করার জন্য এবং জুয়া খেলা নিষিদ্ধ করার আবেদন করেছিলেন তা ইসলামিক গ্রন্থতে স্পষ্ট, যাতে দেখা যায় যে, মুহাম্মদ তাকে একদিন এই বিষয়ে আল্লাহর কাছ থেকে একটি লিখিত বার্তা পাঠ করার জন্য মসজিদে ডেকে পাঠালেন যেখানে বলা হয়েছে : "তারা আপনাকে নেশা এবং জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, উভয়ের মধ্যেই একটি বড় পাপ এবং উপকারিতা রয়েছে, এবং তাদের পাপ তাদের উপকারিতার চেয়ে বেশি" (৮)।

উমর চেয়েছিলেন যে আল্লাহ কঠোরভাবে এটি নিষেধ করুক এবং পুরোপুরি অ্যালকোহল নিষিদ্ধ করুক। কথিত আছে যে, উমর বলেছিলেন, "হে আল্লাহ! মাদক সম্পর্কিত একটি সুস্পষ্ট রায় দিন" (৯)। মুহাম্মাদ তার আল্লাহকে তৃতীয়বারের মতো নিষেধাজ্ঞার আয়াত রচনা করার জন্য ডেকেছিলেন, যা মদকেও অতিক্রম করেছিল: "হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না?" (১১)।

এটি কোন পরামর্শ ছিল না, এটি ছিল আদেশ। এরপর থেকে যে কেউ মদপান করলে তার সাথে কঠোর আচরণ করা হতো। মুহাম্মদ বা অন্য যে কোনও বিচারিক কর্তৃত্বের আদেশে তাদের শাস্তির জন্য জনতার হাতে তুলে দেয়া হতো। আগেকার দিনগুলিতে তাদের খোঁচা দেয়া হতো, চড় মারা হতো, স্যান্ডেল দিয়ে পেটানো হতো এবং খেজুরের ডালপালা দিয়ে মারা হতো। অবশেষে তাদেরকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল, চল্লিশটি দোররা মারা ছিল তাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি। এই ধরনের ঘটনায় আইন অমান্যকারীদের মুহাম্মদের সামনে যেখানেই আনা হতো, সেখানেই আদালত বসত। একটি বহুল শ্রুত গল্পে বলা হয় যে, তিনি কারও বাসায় গেলে এক মাতাল সেখানে ঢুকে পড়ে। তিনি সেই মাতালকে মারতে বাড়ির সমস্ত পুরুষকে আদেশ দেন (১২)। যদিও মারধর করার বেদনা ও অপমান করা যথেষ্ট শাস্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল, তবে আরেকটি ঘটনায় মুহাম্মদ একাধিকবার পানকারীকে মৃত্যুদণ্ডের হুমকিও দিয়ে বলেছিলেন : "যদি সে চতুর্থবার আবার তা করে তবে তাকে হত্যা কর" (১৩)।

চুরি করাকে তিনি আরও কঠোরভাবে দমন করতেন। হাতের কব্জির উপরে কেটে দেয়া হতো, যাতে অপরাধী যে হাত দিয়ে অপরাধটি করত সেটা আর ব্যবহার করতে না পারে। আরবে পূর্বেও চুরির জন্য হাত কেটে ফেলা হতো, কিন্তু মুহাম্মদ এটিকে বিধিবদ্ধ করেন এবং সবক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রচলন করেন। যদিও একপর্যায়ে তিনি সতর্ক করেছিলেন যে, এমনিকি একটি ডিম চুরির জন্যও হাত কেটে ফেলা হবে! তবে সাধারণত একটি সোনার মুদ্রার এক চতুর্থাংশের চেয়ে বেশি বা তিনটি রৌপ্যমুদ্রার চেয়ে বেশি মূল্যবান কোন জিনিস যা দিয়ে একটি ঝালর বা শরীরের বর্ম কেনা যেত, তেমন জিনিসের চুরির জন্য এই শাস্তি প্রযোজ্য ছিল। অন্যদের মধ্যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতেও এই শাস্তি প্রদান করা হত। এটি অন্যদের জন্য একটি সতর্কতা হিসেবে কাজ করত, কারণ শাস্তিপ্রাপ্ত লোকেরা তাদের খণ্ডিত অঙ্গটি আড়াল করতে পারত না (১৪)।

জাবালে নূর (আলোকিত পাহাড়) থেকে নেমে আসার পর, মুহাম্মদ যৌনতা সম্পর্কিত বিস্ময়কর বিধিবিধান ও নিষেধাজ্ঞা সমূহ জারি করেন। কে কাকে বিয়ে করতে পারবে সে সম্পর্কে নিয়মকানুন নিয়ে এসেছিলেন; তিনি অবিবাহিতদের উপর কৌমার্য চাপিয়ে দিয়েছিলেন; সহবাসের পর শরীর শুদ্ধ করার রীতিনীতি নির্ধারণ করেন এবং যতক্ষণ না সেগুলো মানা হবে, তাদের জন্য প্রার্থনা নিষিদ্ধ করেন। তিনি নারী ও পুরুষকে আলাদা করার উপর জোর দেন, নারীদের উপর পর্দা চাপিয়ে দেন এবং বাড়ির বাইরে নারীদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করেন। ব্যভিচারের জন্য তিনি মৃত্যুদণ্ড এবং বিয়েবহির্ভূত যৌন সম্পর্কের জন্য মারাত্মক দোররা মারার বিধান চালু করেন। তবে তার পক্ষে লড়াই করার জন্য পুরুষদের উৎসাহ দিতে তিনি তাদের জন্য দাসীদের সাথে সহবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তার জন্য লড়াই করে মারা যাওয়া পুরুষদের জন্য তিনি জান্নাতে অনন্তকালীন সহবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

মুহাম্মদ পর্বত থেকে ওহী নিয়ে নেমে আসার আগে আরবের পুরুষ ও নারীরা নগ্নতার বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন ছিল না। মক্কার মন্দির প্রদক্ষিণ করার সময় নির্দিষ্ট ধর্মীয় পোশাক পরতে না পারলে নরনারীরা তাদের পরিধেয় পোশাক খুলে ফেলে পশুর চামড়া গায়ে দিত। অল্পবয়সী মেয়েরা কখনও কখনও গ্রাম বা শহরে ঘুরে বেড়াত কেবল কোমর থেকে নিচে পর্যন্ত পোশাক পরে, আর তাদের স্তনযুগল তারা লম্বা চুল দিয়ে ঢেকে রাখত। তারা কানের দুল, চুড়ি এবং গোড়ালিতে নুপুর

পরে নিজেকে সাজাতো এবং তারা খুব সুন্দর সুগন্ধি গায়ে মাখাত যার সুবাস তাদের পেছনে চলে যাওয়ার পরও অনেক দূর পর্যন্ত পাওয়া যেত (১৫)। এমনকি মুহাম্মদও সুন্দরী নারীদের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তবে তার জন্য এটি একটি ধাক্কা ছিল যখন তার হারেমের একটা অংশ সুন্দরী যুবতীদের দিয়ে ভরে গিয়েছিল। তার নিজের লোকেরা, যারা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত এবং জাহান্নামের আগুনের ভয়ে ভীত থাকত তারাও মুহাম্মদের হারেমের মেয়েদের দিকে লোলুপ দৃষ্টি দিত। দেবে না-ইবা কেন? মোটেলের কক্ষের সারির মতো, তাদের কুঁড়েঘরের দরজা মসজিদের আঙ্গিনার সাথে লাগানো এবং খোলা ছিল, এবং সবাই তাদের আসা-যাওয়া দেখতে পেত।

প্রাক্তন পালকপুত্রের প্রাক্তন স্ত্রী জয়নবকে বিয়ে করার সময়ই মানুষের কৌতুহলী দৃষ্টি থেকে আড়াল করতে মুখ ঢাকার পর্দাপ্রথাটা মুহাম্মদ নিয়ে আসেন। শেষ পদক্ষেপটা এসেছিল যখন বিবাহ-অনুষ্ঠানের পরে বেশ কয়েকজন অতিথি জয়নাব-মুহাম্মদের ঘরে বসে গল্প করতে থাকে, এবং মুহাম্মদ সন্দেহ করেছিলেন যে আসল কারণ হচ্ছে ওরাও তার মতো করে জয়নবকে কামনা করছে। আর তারা জয়নাবের রূপে মুগ্ধও ছিল। মদ ও জুয়ার মতো তিনি তখন থেকে সমস্ত বিশ্বাসী নারীদের মুখমন্ডলের পর্দা পরতে বাধ্য করে দেন যাতে কোন পরপুরুষ তাদের দেখে মন্ত্রমুগ্ধ না হতে পারে। এবং তাদের মুখমণ্ডলের উপরেই কেবল এই পর্দা বাধ্যতামূলক করলেন না, বরং পুরো শরীরের আচ্ছাদনেরও বিধানও নিয়ে এলেন, যাতে নারীদের স্তন এবং নিতম্বের বাঁক দেখে কারও মনে কামনা জাগ্রত না হয়! আল্লাহপাক পাহাড়ের উপর থেকে মুহাম্মাদকে ডাকলেন: "হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বল, 'তারা যেন তাদের জিলবাবের (চেহারা, মাথা ও বুক ঢেকে রাখা যায় এমন চাদর) কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (১৬)।

সবকিছুর মতোই মুহাম্মদ এটিকে চরমাবস্থার দিকে নিয়ে যান। ঘরে থাকা অবস্থায়ও মেয়েদের আচ্ছাদন ছাড়াই কারা করা দেখতে পারবে, মুহাম্মদ তা সংজ্ঞায়িত করেন। সুতরাং নারীরা রক্তের সম্পর্কের স্বজন এবং শ্বশুরবাড়ির উপস্থিতিতে সাধারণ পোশাক পরার অনুমতি পেয়েছিল, তবে অন্য কেউ যদি বাড়িতে আসে তবে পর্দার পেছন থেকে তাদের কথা বলতে নির্দেশ দেয়া হয়। তারা পুরো পোশাক পরিহিত থাকলেই কেবল পর্দার আড়াল থেকে সামনে আসতে পারত। মুহাম্মদের সমস্ত স্ত্রীরাই এই ঢেকে রাখার নিয়মের অধীনে চলে এসেছিল, যখন তিনি অভিযানের সময় তাদের সঙ্গে নিতেন এমনিকি সেই সময়েও। উটের উপর পর্দায় ঢাকা পালকিতে তাদের চড়তে হতো। শিবির স্থাপন করা হলে, নানান বিষয়ে মুহাম্মদের সাথে পরামর্শ করতে আসা পুরুষদের দৃষ্টি থেকে নিজেদের আড়াল করতে নারীরা তাঁবুর মাঝে পর্দার আড়ালে থাকত।

পুরুষদের উপর থেকে পুরনো যৌন রীতিনীতি বাতিল করাও মুহাম্মদের জন্য কঠিন ছিল। পূর্বে আরব পুরুষরা উন্মত্ত যৌনতা উপভোগ করত, তবে সেখানে একমাত্র জটিলতা ছিল পিতৃত্ব। একটি গল্পে মক্কার এক সম্ভ্রান্ত সুন্দরীর কথা বলা হয়েছে যার একটি পুত্রসন্তান ছিল এবং সে পরবর্তীতে একজন বিখ্যাত কবি হয়েছিল। কয়েক ডজন মক্কাবাসী সেই পুত্রের পিতৃত্ব দাবি করেছিল।

এ জাতীয় বিষয়গুলি সাধারণত গোত্রীয় পরিষদগুলোর সামনে জোড়াতালির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হতো। পুরুষ ও নারীরা স্বল্পমেয়াদী চুক্তিতে অস্থায়ী বিবাহে আবদ্ধ হতো যাতে যৌতুকের দরকার পড়ত। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর তারা যে যার মতো চলে যেত। যৌনলালসা অবাধ জীবনাচরণের মাঝে জটিলতা এনে দিয়েছিল, তবে এর ফলে রক্তপাতের কোন ঘটনার কথা জানা যায় না। নতুন শাসন ব্যবস্থায়, অবিবাহিত পুরুষদের এখন কৌমার্য ধরে রাখতে হচ্ছে, যা বিবাহের জন্য অনুপ্রাণিত করে, কিন্তু অনেকেরই বিবাহের জন্য যৌতুক প্রদান করার অর্থ ছিল না। এভাবেই তারা জিহাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত লুটের মাল থেকে অর্থোপার্জন করতে বা আরও বেশি লোভে নিজেদের যৌনতা চরিতার্থ করতে ডাকাতিতে অংশ নিতে

আগ্রহী হয়ে পড়েছিল। মুহাম্মদের মতে বিবাহবহির্ভূত সহবাসে যেকোনও অবিবাহিত পুরুষ বা নারী লিপ্ত থাকলেই তাকে "অবৈধ যৌনাচার" বলা হতো এবং ধরা পড়লে শাস্তিস্বরূপ একশো চাবুক মারা হতো এবং এক বছরের নির্বাসনে পাঠানো হতো। বিবাহিত ব্যভিচারীদের মসজিদের মূল ফটকের বাইরে শাস্তি প্রদানের একটা স্থানে নিয়ে যাওয়া হতো এবং পাথর মেরে হত্যা করা হতো, তবে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগে একশো দোররা মারা হত।

কিভাবে চাবুক মারতে হবে সেটিও নিয়ন্ত্রিত ছিল। শাস্তি প্রদান করা চাবুকটি চামড়ার তৈরি মাঝারি আকারের এক মাথাবিশিষ্ট গিটবিহীন হতে হবে। পুরুষদের পোশাক খুলে ফেলা হতো, কারণ পোশাকের কারণে চাবুক মারায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে পারে, এবং তাদের সমস্ত শরীরের উপরে চাবুক মারা হতো। নারীদের ক্ষেত্রে দোররা কেবল পেছনে এবং কাঁধে মারা হতো। চাবুকগুলি এত জোরে মারা হতো না যাতে চামড়া ফেটে যায় বা জীবন বিপন্ন করে, তবে এত আস্তেও মারা হতো না। পরিণতির কথা ভেবে মুহাম্মদ জেনার জন্য জোরালো প্রমাণের বিধান করলেন। চারজন ধর্মপ্রাণ, খাঁটি সাক্ষীর প্রয়োজন হতো এবং যে কেউ মিথ্যা অভিযোগ আনলে বা এমন কোন অভিযোগ করলে যা প্রমাণ করার জন্য যাচাই করা যায় না তখন উল্টো অভিযোগদাতাকেই চাবুক মারা হতো। মুহাম্মদ অভিযোগকারীদের সতর্ক করেছিলেন, "প্রমাণ দাও, নয়ত তোমার পেছনে দোররা মারা হবে" (১৭)। সাক্ষীর এই নিয়মটি আয়েশার ব্যাপারে ওঠা গুজব (ব্যভিচারের) থেকে অনুপ্রাণিত। সে ঘটনার কোন সাক্ষী ছিল না; সবটাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে ছড়িয়েছিল। আয়েশা যখন মুস্তালিক অভিযান থেকে ফেরার পথে পেছনে পড়ে যান; সাফওয়ান তাকে উদ্ধার করে পুরো সেনাদলের সামনে দিয়ে নিয়ে আসেন, তারপরও কিছু মানুষ অবিশ্বাস করেছিল। যে সকল পুরুষ ও নারী গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল, তাদেরকে শাস্তি দিয়ে মুহাম্মদ নজির স্থাপন করেছিলেন। মিথ্যা অভিযোগ করলে, বা প্রমাণ করা যায় না এমন অভিযোগ করলে তার পরিণতিও একই হবে।

তবে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তার একটা খারাপ দিক ছিল। একলোক যে তার স্ত্রীর কেলেঙ্কারি ধরেছিল, মুহম্মদের কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে, সাক্ষীর খোঁজ করার মতো তার পর্যাপ্ত সময় নেই। মুহাম্মদ তাকে চাবুক দিয়ে হুমকি দিলে লোকটি আকাশের দিকে হাত তুলে আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করে। মুহাম্মদ এমন পরিস্থিতি মোকাবেলায় একাধিক আয়াত নিয়ে এসেছিলেন এবং লোকটিও তার পিঠ বাঁচাতে পেরেছিল (১৮)। তবে মুহাম্মদ সমাধান করেছিলেন শপথ দিয়ে : লোকটিকে মুহাম্মদের সামনে তার স্ত্রীকে আনতে বলা হলো এবং বরকে তার স্ত্রীর মুখের উপরে চারবার তার অভিযোগ বলতে মুহাম্মদ আদেশ দিলেন এবং তারপরে এর সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহর নামে কসম করতে বললেন। তারপর সেই নারী যিনি জানতেন যে, তিনি যদি অভিযোগ স্বীকার করেণ তবে পাথর মেরে তাকে হত্যা করা হবে, তিনি তার বরকে মিথ্যাবাদী বলে চারবার দৃঢ়তার সাথে কসম করেছিলেন এবং তিনি যা বলছেন তার সত্যতার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করেছিলেন। এভাবে মুহাম্মদ ব্যাপারটির সমাধান করেছিলেন। এরপর তিনি বললেন : "যে এখানে মিথ্যা বলেছে তাকে আল্লাহ মৃত্যুর পর শাস্তি দেবেন" (১৯)।

কেবল চাবুক এবং পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার নতুন আইন তাদেরকে মুহাম্মদের হুকুম মেনে চলতে উৎসাহিত করেছিল তা নয়, সাথে জাহান্নামের হুমকিও ছিল। মুহাম্মাদ বিবাহের বাইরের সহবাসকে মারাত্মক পাপ মনে করতেন, এটি ছিল আল্লাহর বিরুদ্ধে অপরাধ এবং আল্লাহ এমন পাপীদের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ! আল্লাহ দুষ্কৃতিকারীদের জাহান্নামের গর্তের মধ্যে ফেলে দেবেন এবং চুল্লির দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেবেন। বিস্তারিত আকারে মুহাম্মদ অভিশপ্ত পাপীদের জন্য জাহান্নামে প্রস্তুত রাখা শাস্তির করুণ বর্ণনা দিতেন। দৃশ্যগুলি এত বীভৎস ছিল যে, মুমিনরা তা শুনে মাঝেমাঝে প্রকাশ্যেই কেঁদে দিতেন। তিনি তাদের বলেছিলেন যে, পার্থিব জীবনের এই শাস্তি হচ্ছে শুদ্ধির জন্য, তবে এটি আখেরাতের (পারলৌকিক জীবনের) শাস্তির চেয়ে অনেক কম কঠোর। যদি তারা তওবা করে ইহলৌকিক শাস্তি গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ পরকালে তাদের ক্ষমা করে দেবেন।

ব্যভিচার এবং বিবাহ-পূর্ব সহবাসকে শয়তানের কাজের সমতুল্য বানিয়ে মুহাম্মদ যৌন অপরাধবোধ ও উন্মাদনা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, আরবে যেটি এর আগে ছিল না। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, লোকেরা মুহাম্মদের কাছে তাদের যৌনপাপ স্বীকার করত এবং আশা করত, এই জীবনে শাস্তি ভোগ করার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হয়ে পরবর্তী জীবনের চিরন্তন আগুন তারা এড়াতে পারবে। ইসলামিক বর্ণনাগুলোতে মাইজ নামের এক ব্যক্তির কথা বলা হয়, যে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করার জন্য মুহাম্মদের সামনে আসে। সে বলে, "আমি আন্তরিকভাবে চাই যে আপনি আমাকে শুদ্ধ করুন" (২০)। প্রথমদিকে মুহাম্মদ তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, সম্ভবত এটি নিয়ে তিনি আর কথা বলতে চাননি। তবে, যতবার তিনি লোকটির কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছিলেন লোকটি ততই তার সামনে চলে আসে। এবং তার নিজের অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। চতুর্থবারের মতো এরকম করার পরে মুহাম্মদ তাকে বললেন, "তুমি কি পাগল?" যখন সে উত্তর দিল যে সে পাগল নয়, মুহাম্মদ তার সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার জন্য লোক পাঠান। যখন জানা গেল যে, সে মানসিকভাবে সুস্থ, মুহাম্মদ তখন তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিলেন। কথিত আছে যে, তাকে যখন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে জনতারা তাকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারে, তখন সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং মুক্ত হয়ে দৌড় দেয়। উগ্র জনতা তাকে উপত্যকার পশ্চিম পাশে বালির মাঠে ধাওয়া করে। বিশ্বাসী জাবির আবদুল্লাহ (Jabir abdullah) বলেন, "তাকে পাথর মারার দলে আমিও অংশ নিয়েছি। যখন পাথর মারার কারণে সে পালিয়ে যায়, তখন আমরা তাকে বালির মাঠে পাকড়াও করলাম, আর পাথর মেরে হত্যা করলাম" (২১)।

একই ধরনের মামলায় একজন নারী জড়িত ছিলেন। তিনি একজন বিবাহিত নারী ছিলেন যিনি একটি সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন, কিন্তু মুহাম্মদ প্রথমে তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি আবার একদিন ফিরে আসেন এবং বলেন যে তিনি গর্ভবতী, এবং পাপের শাস্তির মাধ্যমে তিনি পবিত্র হতে চান। মুহাম্মদ শুধু বললেন "যদি তুমি জোর কর"। তবে তার বাচ্চা ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত তার মৃত্যুদণ্ড বিলম্বিত হয়, কিন্তু বাচ্চা জন্মের পরেও মুহাম্মদ তাকে শিশুটিকে পরিচর্যা করার জন্য আরও দুই বছর সময় দেন। যখন বাচ্চার দুধপান করানোর সময় তিনি পার করলেন, তখন তার সামনে শিশুটিকে নিয়ে এলেন, বাচ্চাটি তার হাতে একটি রুটি ধরে ছিল। মুহাম্মদ শিশুটিকে একজনের হাতে দিয়ে দিলেন এবং তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আদেশ দিলেন। তার মৃত্যুদণ্ড ভিন্নভাবে সম্পন্ন করা হয় - তাকে তার বুক পর্যন্ত মাটির নিচে গাড়া হয় যাতে সে পালিয়ে যেতে না পারে। তার জীবনপ্রদীপ নিভে না যাওয়া পর্যন্ত জনতা তার মাথায় পাথর ছুঁড়তে থাকে। (২২)

মুহাম্মদের আইনের বেশিরভাগ অংশই ছিল প্রতিশোধের সাম্যতা সম্পর্কিত, চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত - আরব রীতিনীতির পুনঃস্থাপন। এই বিষয়গুলি সহিংসতা বা দুর্ঘটনাজনিত আঘাতের অপরাধের সাথে জড়িত। লোকেদের রক্তের বদলে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিশোধ বা নিষ্পত্তি ছিল একমাত্র বিকল্প উপায়। মুহাম্মদের বেশিরভাগ মীমাংসার ঘটনায় জীবনহানি বা অঙ্গহানির ক্ষতি নিষ্পত্তি জড়িত ছিল এবং তিনি এ জাতীয় বিষয়ে মোকদ্দমার জন্য কোরআনের বহু আয়াত সৃষ্টি করেছিলেন। ইচ্ছাকৃত সহিংসতার ক্ষেত্রে তিনি ক্ষমাকে বিকল্প হিসেবে উৎসাহিত করেন, কিন্তু প্রতিশোধের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতেন না। যেমন এক নারীর হত্যার ঘটনাই, যেখানে এক নারী অন্য নারীকে বেলন দিয়ে মারতে মারতে মেরে ফেলেছিল। যে নারী মারা গিয়েছিল সে গর্ভবতী ছিল এবং তার সাথে তার ভ্রূণও মারা যায়। মুহাম্মদ ভ্রূণের মৃত্যুর জন্য একটি উটকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন এবং প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সেই নারীকে ভুক্তভোগীর পরিবারের হাতে তুলে দেন। পরিবারটি সম্ভবত তাকেও বেলন দিয়ে হত্যা করে।

দুর্ঘটনাজনিত হত্যাকাণ্ড বা বিপর্যয় সমাধান করা হতো রক্তের বদলার অর্থ প্রদানের মাধ্যমে। মুহাম্মদ এক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এমন যে, নগরবাসী কাউকে হত্যা করলে মূল্য দিতে হবে চারশো স্বর্ণের মুদ্রা বা তার সমমানের রূপা। বেদুইনরা মূল্য পরিশোধ করবে গবাদি পশুদের দান করে - দু'শো উট বা দুই হাজার ভেড়া বা ছাগল। কারো পুরো নাক কাটা পড়লে

একশো উটের জরিমানা ছিল, তবে যদি নাকের ডগা কাটা যেত তবে অর্ধেক দিতে হতো। হাত বা পা হারালে পঞ্চাশটি উট ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
কম আঘাতের জন্য কম পরিমাণের ক্ষতিপূরণ। আঙুল বা দাঁতের বেলায় প্রত্যেকটি আঙুলের জন্য দশটি উট এবং প্রতিটি দাঁতের জন্য পাঁচটি করে উট ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল।

মুহাম্মদ তাঁর সামনে উপস্থিত কিছু মামলা আদালতের বাইরে হাসতে হাসতে সমাধান করতেন, যেমন লড়াইয়ের সময় কাউকে কামড় দেয়ার সময় সামনের দাঁত হারানো এক ব্যক্তি বদলা হিসেবে দাঁতের বদলে দাঁত বা পাঁচটি উট দাবি করে। মুহাম্মদ বললেন, "আপনি কি তার মাংস খাওয়ার চেষ্টা করছেন?" তিনি আবেদন খারিজ করে দেন এবং বিবাদীকে দায়মুক্তি দেন (২৩)।



["পাথর ছুঁড়ে মার!" ব্যভিচারীদের জন্য এটাই মুহাম্মদের হুকুম ছিল। ইয়াছরিব পৌঁছানোর এক বছরের মধ্যেই তিনি ব্যভিচারে ধরা পড়া দুজন ইহুদিকে পাথর ছুঁড়ে মারার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা স্পষ্টতই ধর্মান্তরিত ছিল, যারা মুহাম্মদের বিধিবিধান মেনে চলা আরব গোত্রসমূহের অন্যতম একটি গোত্রের অন্তর্ভূক্ত। রাব্বিগণ ক্ষমা করে দেয়ার পক্ষে যুক্তি দিয়েছিল, কিন্তু কোন ফল হয়নি। তাদেরকে মুহাম্মদের মসজিদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং জনতা তাদের পাথর মেরে হত্যা করেছিল। কথিত আছে যে, পুরুষটি তার নিজের শরীর দিয়ে নারীকে ঢেকে পাথর থেকে রক্ষা করেছিল।]

একটি অপরাধ মুহাম্মদ কখনোই ক্ষমা করতেন না, তা হলো একজন মুমিনের হাতে আরেকজন মুমিনের হত্যা। উহুদের যুদ্ধের পরে তিনি এর নজির দেখিয়েছিলেন, যখন তিনি এক দশক আগে এক বিশ্বাসীর পিতাকে হত্যা করার বদলা স্বরূপ যুদ্ধের সময়কে কাজে লাগিয়ে আরেকজন বিশ্বাসীকে হত্যা করা এক ব্যক্তির শিরোশ্ছেদ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সামরিক অভিযানগুলোর একটির সময়ে আরেকজন বিশ্বাসী-বিশ্বাসীর হত্যার ঘটনাও ঘটেছিল যা এরূপ :

মুহাল্লিম (Muhallim) নামের একজনকে অন্যদের সাথে মিশনে পাঠানো হয়েছিল। পথিমধ্যে তার সাথে এমন একজনের দেখা হলো যার সাথে মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করার আগে থেকেই তার ব্যক্তিগত ঝামেলা ছিল। যদিও সাক্ষাতের সময়ে লোকটি একজন মুমিনের মতোই মুহাল্লিমকে সালাম দেয়, কিন্তু মুহাল্লিম তাকে একটি তীর দিয়ে হত্যা করে এবং তার উট এবং সাথে থাকা জিনিসপত্র চুরি করে। খুনিকে মুহাম্মদের সামনে টেনে আনা হলো। মুহাম্মদ তখন একটি বাবলা গাছের ছায়ায় বসে ছিলেন। মরুভূমি তখনই আদালত চত্বরে পরিণত হলো এবং ক্ষতিগ্রস্থ গোত্রের (নিহত ব্যক্তির গোত্রের) অসংখ্য যাযাবররা শালিসটি দেখার জন্য মুহাম্মদের সামনের সারিতে পা ভাঁজ করে বসে রইল। সাক্ষীরা উঠে দাঁড়িয়ে যা জানত তা তাকে বললেন। মুহাল্লিমের গোত্রের সদস্যরা তার গুণাবলী বর্ণনা করে তার পক্ষ হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল; আর মৃত ব্যক্তির গোত্রের সদস্যরা মৃত্যুদণ্ডের দাবি জানাল। মুহাল্লিমের গোত্রের একজন হুমকি দিল যে, তিনি পঞ্চাশজন লোককে জোগাড় করে নিয়ে আসবেন যারা শপথ করে বলবে ঐ মৃত ব্যক্তি সত্যিকারের বিশ্বাসী (মুমিন) ছিল না, সে কখনও নামাজও পড়েনি — এককথায়, সে ছিল মোনাফেক। এক্ষেত্রে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে না, কারণ কাফেরদের হত্যা করার জন্য বিশ্বাসীদের হত্যা করা যায় না, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন। মুহাম্মদ মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এই বলে যে, তারা এক্ষুনি পঞ্চাশটি উট, আর বাড়ি ফিরে যাওরার পর আরও পঞ্চাশটি উট পাবে। এটি ছিল একজন কাফেরকে হত্যা করার শাস্তি। তবে ভুক্তভোগীর পরিবার রক্তের বদলে রক্ত দাবি করেছিল। অভিযুক্তকে মুহাম্মদের সামনে দাঁড়ানোর আহবান না করা পর্যন্ত তিনি তার পেছনেই বসে ছিল। সে ছিল বয়সে তরুণ, লম্বা এবং তার চোখে পানি ছিল। সে তার অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইল। মুহাম্মদ আকাশের দিকে হাত তুললেন, আকাশ থেকে নির্দেশনা চলে এলো এবং উচ্চস্বরে সবাইকে মুহাম্মদ শুনিয়ে বললেন : "আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না!"

মুহাম্মদ তিনবার বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করলেন। এটি ছিল তার মৃত্যুদণ্ড, যার কোন পুনর্বিবেচনার সুযোগ ছিল না। দোষী লোকটিকে একটি পাহাড়ের শৃঙ্গ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হলো এবং পাথরের স্তূপের নিচে তাকে দাফন করা হলো (২৪)।

মুহাম্মদ ভিন্নমত বরদাশত করতেন না। কেবলমাত্র ঠাট্টা, তামাশা বা সমালোচনা করার জন্যও তিনি মানুষকে হত্যা করতেন, তবে তার নিকট আত্মসমর্পণ করলে বা ক্ষমা চাইলে ভিন্ন কথা। বদর যুদ্ধের পরে কবিদের হত্যা করার মধ্য দিয়ে তিনি হত্যালীলা শুরু করেন। এমনকি তার অনুসারীরা যখন তাদের নিজস্ব উদ্যোগে মুহাম্মদের সমালোচকদের লোকদের হত্যা করে ফেলত, তখন তিনি তা অনুমোদনও করতেন। ইতিহাসে মুহাম্মদের একজন অন্ধ সাহাবির (অনুসারী) একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে নিন্দা করার দোষে তার ইহুদি শয্যাসঙ্গিনীকে খুন করে ফেলে। সেই নারী প্রায়শই মুহম্মদের সমালোচনা করত, কিন্তু অন্ধ বর তাকে থামার নির্দেশ দেয়া সত্বেও এক রাতে সে মুহাম্মদের নামে যাচ্ছেতাই বলে যাচ্ছিল। এর ফলে অন্ধ সাহাবি তার স্ত্রীকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে। এই কথা চারদিকে ছড়িয়ে পরে এবং পরদিন একটি মসজিদের সমাবেশে মুহাম্মদ অপরাধীকে উঠে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে বলেন। অন্ধ লোকটি দাঁড়িয়ে বলল, "আল্লাহর রাসূল! সে আপনাকে গালাগালি করত এবং আপনাকে অস্বীকার করত। আমি তাকে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু সে থামেনি। আমি তাকে ধমক দিয়েছি, কিন্তু সে অভ্যাসটি ছাড়েনি। তার গর্ভ থেকে মুক্তোর মতো আমার দুটি ছেলে পেয়েছি এবং সে আমার সঙ্গিনী ছিল। গতরাতে সে আপনাকে গালি দিতে থাকে এবং অস্বীকার করতে শুরু করে। তাই আমি একটি ছোরা নিয়ে তার পেটে ঢুকিয়ে দিই এবং মৃত্যু নিশ্চিত না করা পর্যন্ত ছুরিটি চেপে ধরে রাখি"। মুহাম্মদ এই ব্যাখ্যাটা গ্রহণ

করলেন। তিনি সমাবেশে বললেন, “সাক্ষ্য দাও, তার রক্তের জন্য কোনও প্রতিশোধ গ্রহণযোগ্য নয়”। এভাবেই তিনি এক নির্মম হত্যাকে বৈধতা দিলেন এবং এই বললেন যে, “আমার সমালোচনাকারীদের হত্যা করা বৈধ” (২৫, ২৬)।

আরবের অগ্রবর্তী ধর্ম হিসেবে মৃত্যুর আগে মুহাম্মদ জীবনের প্রায় সকল বিষয়ে বিধিবিধান তৈরি করে যান, যেমন : জায়গা জমির ব্যবসা, ঋণ দেয়া, উত্তরাধিকার, শেয়ার ক্রপিং, খেজুর, খেজুর গাছ এবং প্রাণীদের কেনাবেচা এমন সব বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত দিতে থাকেন। কীভাবে মলত্যাগ করবে, কীভাবে ধোবে, কীভাবে পোশাক পরবে, কীভাবে মানুষকে সম্বোধন করবে, কী খাবে এবং কী খাবে না তিনি সে সমস্ত বিষয়ে তার নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। বিবাহ, জন্ম এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমস্ত কিছুই তার বিধিবদ্ধ নিয়মের স্বাক্ষর বহন করে। মিউজিক, গান গাওয়া এবং নাচকে অলস কার্যকলাপ হিসেবে তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন, কেননা এসব কিছু লোককে আল্লাহর পথ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। তিনি প্রার্থনার অনুষ্ঠান, তীর্থযাত্রা এবং পশু কুরবাণীর বিষয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন, এ সমস্তই ছিল ঈমানদার মুমিনের বিশ্বাসের পরিচায়ক। কোরআনের আয়াত এবং তার দৈনন্দিন জীবনযাপনের রীতিনীতি তথা সুন্নাহ, এ দুটির সংমিশ্রণই মুহাম্মদের আইন হয়ে উঠল। মূলত, তিনি নিজে প্রতিটি পরিস্থিতিতে কী করেছিলেন, সেটি হতে পারে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা নিছক তার আচরণের উদাহরণ, তাইই সুন্নাহ। এই সংমিশ্রণটিকে তখন ডাকা হতো এবং আজও ডাকা হয় শরিয়া বা ‘পথের নির্দেশক’ বলে। বিশ্বাস করা হয়, মুহাম্মদের আয়াতসমূহ আর তার দৈনন্দিন জীবনের উদাহরণ তথা সুন্নাহর দেখানো পথে চললে নিশ্চিত বেহেশত লাভ হবে।

খিঁচুনির সময়কার সেই কাব্যিক আয়াতগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য মুহাম্মদ একজন লিপিকার নিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন অর্ধশিক্ষিত, সম্ভবত মৃগীরোগের সাথে সম্পর্কিত dyslexia (লিখতে ও পড়তে না পারার মতো এক ধরনের স্নায়বিক অক্ষমতা) এর কারণে তার ভালোমত লেখাপড়া শেখা হয়ে ওঠেনি। তবে তার অনেক অনুসারীই শিক্ষিত ছিল, আর মুহাম্মদ তাদের সেই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন। গভীর ঘুমের ঘোর থেকে বিছানায় জেগে উঠে বা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ভ্রমণের সময় মুহাম্মদ যখন ওহী লাভ করতেন, চিৎকার করে বলে উঠতেন, “এটি লিখে নাও, লিখে নাও”। এরপরেই বিশ্বস্ততার সাথে তার কথাগুলি লুফে নিয়ে লিপিকার তার দোয়াত-কলম হাতে নিয়ে কাব্যিক ঢংয়ে আয়াতগুলো লিখে নিত। মক্কায় তার তড়িঘড়ি করে নিয়ে আসা ছোট ছোট ছান্দসিক আয়াতগুলোর তুলনায় ইয়াছরিবে নাজিল করা আয়াতগুলি অনেক বড়, ঝাঁজালো ও আইন সংক্রান্ত ছিল। যেমন এই আয়াতে শপথ ভঙ্গ করার বিষয়ে বলা হয়েছেঃ
“আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অর্থহীন কসমের ব্যাপারে, কিন্তু যে কসম তোমরা দৃঢ়ভাবে কর সে কসমের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করেন। সুতরাং এর কাফফারা হচ্ছে দশজন মিসকীনকে খাবার দান করা, মধ্যম ধরনের খাবার যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে খাইয়ে থাক, অথবা তাদের বস্ত্র দান করা, কিংবা একজন দাসকে মুক্ত করা। কিন্তু যে সামর্থ্য রাখে না সে তিনদিন রোজা রাখতে পারে। এটা তোমাদের কসমের কাফফারা, যদি তোমরা কসম কর; আর তোমরা তোমাদের কসম হেফাযত কর। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।” (২৭)।

তার এক সাহাবি, এই আয়াতগুলো প্রস্ততির নাড়িনক্ষত্র টের পেয়ে ধর্মত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। তার পুরো নাম আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে সারহ — সংক্ষেপে আবদুল্লাহ সারহ। তিনি মক্কা থেকে এসেছিলেন এবং প্রথমদিকের ধর্মান্তরিত ছিলেন যিনি মুহাম্মদের সাথে ইয়াছরিবে পালিয়ে গিয়েছিলেন। যেহেতু তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন, পড়তে এবং লিখতে জানতেন, তিনি মুহাম্মদের অন্যতম প্রিয় সহায়ক হয়ে ওঠেছিলেন। তার দক্ষতা চিঠি লেখায়, সমঝোতা স্মারক তৈরিতে এমনকি চুক্তির প্রতিলিপি তৈরিতেও কাজে লাগত। কোরআন রচনার সময় মুহাম্মদ তাকে তার কাছে রাখতেন। বলা হয়ে থাকে যে, মুহাম্মদের আকস্মিক আয়াত বলে ওঠার সময়ে, আবদুল্লাহ মাঝে মাঝে শব্দের মাঝে কিছুটা পরিবর্তন আনার পরামর্শ দিতেন। এমনই একদা মুহাম্মদ যখন “এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী” বলে একটি আয়াত শেষ করেছিলেন তখন

আবদুল্লাহ সম্ভবত কাব্যগুণের কারণে বা কবিতার ছন্দ মেলাতে সেই স্থলে 'বুদ্ধিদীপ্ত এবং জ্ঞানবান' লেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। মুহাম্মদ তার পরামর্শতে আপত্তি করেননি। একপর্যায়ে আবদুল্লাহর কাছে এমন মনে হতো যেন একজন নিছক লেখকের কথা মুহাম্মদ আল্লাহর বাণী বলে দাবি করা করছে। মুহাম্মদের নিবিড় সান্নিধ্যে থাকার কারণে তিনি মুহাম্মদের "ওহী" নাযিলের মুহূর্তগুলি পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হতেন এবং এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দিত, কিভাবে তার পরিচিত মক্কাবাসী কবিগণ তাদের কাব্য-প্রতিভার সর্বোত্তম প্রকাশের জন্য লড়াই করে যেত। তিনি উপসংহারে পৌঁছেছিলেন যে, কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসেনি, এসেছে মুহাম্মদের কাছ থেকেই। তার বিশ্বাস ভেঙে যায়, তিনি পালিয়ে মক্কায় ফিরে যান এবং মুহাম্মদের সাথে আল্লাহ কথা বলে মুহাম্মদের এই দাবিকে অবান্তর বলে মক্কাবাসীদের সামনে হাসতে হাসতেই তিনি খারিজ করে দেন। তিনি বলেন "মুহাম্মাদ জানতেন না তিনি কি বলছেন! আসলে, আমি যা চাইতাম তার পক্ষ থেকে সেটাই লিখতাম। যা আমি লিখেছি, তা আমার কাছে নাজিল হওয়ার মতো, যেভাবে মুহাম্মদের কাছে নাজিল হতো (২৮)।

মুহাম্মদ আবদুল্লাহকে অনন্তকাল আগুনে পুড়িয়ে ফেলার চেয়েও বেশি কিছু করেছিলেন। এর বছরখানেক পরে যখন তিনি মক্কা বিজয় করেছিলেন, তখন তিনি তার সাথে একটি তালিকা রাখতেন যেখানে এমন লোকদের নাম ছিল যাদেরকে তিনি দেখামাত্রই হত্যা করতে চেয়েছিলেন। সেই তালিকার শীর্ষে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবি সারহ।

অধ্যায় - ২৫
পথ, সত্য এবং জীবন

ইয়াছরিবের ভেতরে ও বাইরে বিরোধীদের প্রতি মুহাম্মদের প্রথমদিকের সহিংসতার মূল উদ্দেশ্য তার ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ছিল না, বরঞ্চ তার নিজেকে জীবিত রাখাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। তার ধর্মের সম্প্রসারণ ছিল তার সহিংসতারই উপজাত (by product), এবং তিনি যত আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন এবং যত বেশি বেশি লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞ শুরু করেন ততই তার শত্রু বাড়তে থাকে যারা তাকে পাল্টা আঘাত করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এদিকে আবার তারা যত বেশি মুহাম্মদকে পাল্টা আঘাত করতে উদ্বুদ্ধ হয়, ততই মুহাম্মদও তাদের উপর পাল্টা হামলা চালানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন। তিনি তার নিজের সৃষ্ট শত্রুদের সক্রিয় এবং দৃষ্টান্তমূলক সহিংসতার মাধ্যমে দূরে ঠেলে দিতে সক্ষম ছিলেন। কাল্পনিক ঈশ্বর তার সাথে কথা বলেন বলে তার মধ্যে এক ধরনের বিভ্রমের সৃষ্টি হয়েছিল, আর তাই তার সহিংসতা ছিল প্রতিপক্ষের চেয়ে বেশি হিংস্র এবং অভিনব। তিনি তাদের এমনভাবে অভিভূত করতে সক্ষম হলেন যে, অবশেষে মুহাম্মদ নামটিই তাদের মধ্যে এক আতঙ্কের নাম হয়ে ওঠে। যদিও তার শত্রুরা তার উপর মাঝেমাঝে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু পরিশেষে তারা তার ধর্ম আলিঙ্গন করাকেই তাদের বেদনা এবং দুর্দশা থেকে মুক্তির একমাত্র আশ্রয়স্থল হিসেবে দেখতে বাধ্য হয়। যত বেশি মানুষ তার ধর্মে স্বেচ্ছায় যোগদান করেছে, তার থেকে অনেক বেশি মানুষ ধর্মগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কারণ, তিনি এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন যে তিনিই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠেছিলেন। আর এইভাবে তার ধর্মটা বিস্তার লাভ করে।

বানু কুরাইযার গণহত্যার পর মুহাম্মদের আর ইয়াছরিব নিয়ে চিন্তা করার মত কিছুই রইল না। একসময়কার প্রায় কুড়ি হাজার জনসংখ্যার ইহুদিদেরকে বিতাড়িত করে এবং হত্যা করার মাধ্যমে সংখ্যাটা অর্ধেকে নামিয়ে এনেছিলেন। অন্যদিকে নতুন ধর্মান্তরিত এবং সুযোগসন্ধানীদের একটি দল বিভিন্ন বেদুইন গোত্র থেকে গনিমতের মালের লোভে তার ধর্ম গ্রহণে প্রলুব্ধ হয়েছিল। আউস এবং খাজরাজ গোত্র, জনসংখ্যার সিংহভাগই তাদের এবং প্রায় সবাই ধর্মান্তরিত হয়েছে, যদিও অনেকেই শুধুমাত্র নামমাত্র ধর্মে যোগ দেয় যাতে তারা নির্যাতন থেকে বাঁচতে পারে। এই সুরক্ষিত ঘাঁটি - পুরো ইয়াছরিবই এখন মুহাম্মদের আল-কায়েদা; মুহাম্মদ এর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্বদিকের শত্রুদের উপর আসন্ন বছরের মধ্যেই প্রায় ডজনখানেক হামলা শুরু করবেন। আগের মতই মুহাম্মদ লুণ্ঠনের উপর বেশি জোর দিয়েছিলেন, এবং যত বেশি হামলা তত বেশিই লুণ্ঠিত মাল। এই ধরনের হামলা থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তিই তার আয়ের প্রধান উৎস ছিল, এবং এগুলো ছিল একধনের শক্তিশালী গাম বা আঠার মতো যা তার অনুসারীদের তার সাথে এঁটে থাকতে সাহায্য করছে। 'লুণ্ঠনের ঘুষ' ছাড়াও তিনি তার নিজের সম্পর্কে যা দাবি করেছেন, যেই অলৌকিকতা দাবি করেছেন তার উপর ভিত্তি করে তিনি হয়তো খুব বেশি দূর যেতে পারতেন না। ম্যুর (Muir) যেমন বলেছেন, সমৃদ্ধির সম্ভাবনাই মুমিনদের মাঝে তার প্রতি "সক্রিয় সেবার উৎসাহ" সৃষ্টি করেছে (১), অন্যথায় জনমানুষ তার লড়াইয়ের আহ্বান উপেক্ষা করতেন।

এই ধরনের বাড়তি আয়ের প্রয়োজনেই মুহাম্মদের আক্রমণকারীরা সর্বদা রাস্তায় থাকতেন। বেশিদিন হয়নি, বানু কুরাইযার ইহুদিদের শেষ মৃতদেহের উপর মাটিচাপা দেয়া শেষ হবার পরেই তিনি মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে - যিনি ইহুদি কবি কাব বিন আশরাফকে হত্যা করেছিলেন - একটি বেদুইন গোত্রকে আক্রমণ এবং মাল লুণ্ঠনের অভিযানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই গোত্রটি ইয়াছরিব থেকে ষাট মাইল পূর্বে মরুভূমির উচ্চভূমিতে ঘোরাফেরা করত এবং তাদের অসংখ্য গবাদিপশু ছিল বলে জানা যায়। মাসলামা ত্রিশজন লোকের এক বাহিনী নিয়ে রওনা দিলেন এবং তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে এবং আক্রমণের জন্য নিজেদের অবস্থান ঠিক করে নিতে বেশ কয়েকদিন সময় লেগে গিয়েছিল। মুহাম্মদ ভোরবেলা আকস্মিক হামলার কৌশল প্রণয়ন করেছিলেন। সম্ভবত এটি করেছিলেন আপাতদৃষ্টিতে তাদের শিকারদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে যে, তারা

মুসলিম হয়েছে নাকি হয়নি। যদি তারা ভোরে নামাজ পড়তে বের হত তবে ধরে নেয়া হতো যে, এরা ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। আর যদি নামাজ না পড়ত বা নামাজের জন্য বের না হতো তার মানে তারা কাফের বা অবিশ্বাসী। সুতরাং মুহাম্মদের প্রেরিত দুষ্কৃতিদের জন্য তারা তখন ন্যায্য খেলনায় পরিণত হয়ে যেত, যার ফলে দুষ্কৃতিরা অবাধে চুরি করতে পারত এবং ইচ্ছেমতো হত্যাযজ্ঞ চালাতে পারত। এই নীতি অনুসরণ করেই, মাসলামা এবং তার লোকেরা ভোরের আলো ফোটার আগেই বেদুইন শিবির ঘিরে ফেলে, এবং যখন তারা নামাজের প্রার্থনার আহ্বান শুনল না তখন তারা "হত্যা করো, হত্যা করো" বলে চিৎকার করে মরুভূমির মানুষগুলোকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরে ফেলল। নিজেদের রক্ষা করতে লোকগুলি যখন তাদের শিবির থেকে দৌড়ে মরুভূমির চারপাশে দিগ্বিদিগ ছুটছিল, মাসলামা ও তার লোকেরা তাদের যেভাবে পারে হত্যা করছিল। বাকি বেদুইনরা তাদের দেড়শত উট, তিন হাজার ছাগল এবং তাদের সমস্ত তাঁবু ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রেখে পালিয়ে গেল। হামলাকারীরা পরিবহনযোগ্য সবকিছু দখল করে নেয় এবং গবাদি পশুসহ সবকিছু ইয়াছরিবে নিয়ে আসে। মুহাম্মদ সেই লুটের মাল নিজের জন্য কুড়ি শতাংশ রাখেন এবং বাদবাকি সবার মধ্যে ভাগ করে দেন (২)।

প্রায় একই সময়ে মুহাম্মদ মক্কাবাসীদের এক কাফেলার উপর হামলা চালান যে কাফেলাটি লুকিয়ে মুহাম্মদের অবরোধ করে রাখা লোহিত সাগরের দিককার পথ পার হতে চেষ্টা করেছিল। মক্কাবাসী তাদের অর্থের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে সিরিয়ার বন্দরের দিকে বা উত্তপ্ত মরুভূমি পেরিয়ে ইরাকের দিকে ছোট ছোট কাফেলা পাঠাতে শুরু করে, তবে মুহাম্মদের হাতে ধরা পড়া এড়ানোর জন্য তারা রাতের অন্ধকারে ভ্রমণ করত। মুহাম্মদ এমন এক কাফেলার সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন যেটা সিরিয়া থেকে ফিরছিলো। তিনি তার প্রাক্তন পালকপুত্র জায়েদকে প্রধান করে এই কাফেলাকে আক্রমণ করতে ১৭০ জনের এক বাহিনী পাঠান। ইয়ানবু ও রাবিগের মধ্যবর্তী ইয়াছরিবের দক্ষিণের একটি উপকূলীয় আল-ইস (Al-Is) নামক গ্রামে কাফেলাটিকে তারা আটক করে ফেলেন। আক্রমণকারীরা (মুহাম্মদী সেনা) কাফেলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রতিরোধকারী সৈন্যদের হত্যা করে এবং তাদের মালপত্র বাজেয়াপ্ত করে। উট এবং কার্গো, যার মধ্যে রৌপ্যমুদ্রা, বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ভর্তি করা বস্তা ছিল। কিছু মক্কাবাসী পালিয়ে যায়, কিন্তু অন্যদের আটক করা করে ইয়াছরিব ফিরিয়ে আনা হয় যেখানে তাদের আবার মুক্তিপণের জন্য আটকে রাখা হয়।

মুহাম্মদ আয়েশাকে একজন বন্দির উপর নজর রাখার আদেশ দেন। তার হাত তার মাথার পেছনে বাঁধা ছিল, কিন্তু আয়েশা যখন আরেকজনের সাথে কথা বলছিলেন তখন এই বন্দী নিজের বাঁধ খুলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই ঘটনায় মুহাম্মদ খুবই ক্রুদ্ধ হলেন এবং বলেন, "আল্লাহ যেন তোমার হাত কেটে নেয়!" মুহাম্মদ আয়েশার উপর রাগ করে, চেচামেচি করে তারপর একটি অনুসন্ধান দল সংগঠিত করার জন্য ঘরের বাইরে চলে যান। যখন তিনি ফিরে এলেন, আয়েশা যিনি সম্প্রতি দেখেছেন মুহাম্মদ কিভাবে শত শত ইহুদিদের মাথা কেটে ফেলেছেন, ভয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। সে তার নিজের হাত দেখিয়ে মুহাম্মদকে বলল, সে তার নিজের হাত হারাতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু মুহাম্মদ ইতোমধ্যেই তার রাগারাগির ঘটনা ভুলে গেছেন, তাই উল্টো জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি হয়েছে?" যখন আয়েশা তাকে সেই কথা মনে করিয়ে দিলেন তখন তিনি আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন, "হে আল্লাহ, আমি নিশ্চয়ই একজন মানুষ। আমিও রেগে যাই এবং অন্য যেকোন মানুষের মতো আমিও আফসোস করি। আমি যে বিশ্বাসী পুরুষ বা নারীদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করি, আমার সেই বিরুদ্ধ-প্রার্থনাকে (বদদোয়া) আপনি আশীর্বাদে রূপান্তরিত করুন" (৩)।

কয়েক মাস পরে, খাইবারের উত্তরে অবস্থিত ইহুদিদের একটি মরুদ্যান ফাদাকের (Fadak) একটি বেদুইন গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়, যেখান থেকে তিনি ৫০০ উট এবং ১,০০০ ভেড়ার পাল জব্দ করেন। এই আক্রমণের ঘটনা ঘটে যখন মুহাম্মদের কাছে খবর আসে যে, তার বিরুদ্ধে বেদুইনরা খাইবারের খেজুর বাগানের বিনিময়ে খাইবারে বসবাসরত ইহুদিদের সাহায্য করার ষড়যন্ত্র করছে। মুহাম্মদ তাদের শায়েস্তা করতে আলীকে একশো সেনাদলের নেতৃত্ব দিয়ে পাঠান যেন তাদের দেখে ভয়ে ওরা আর মুহাম্মদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে সাহস না করে। আলী বেদুইন শিবিরে পৌঁছানোর

আগেই তারা খবর পেয়ে যায় এবং ততক্ষণে মরুভূমির সেই বাসিন্দারা তাদের গবাদিপশু এবং শিবিরের সরঞ্জাম রেখে পালিয়ে যায়। আলী সেখান থেকে মালপত্র নিয়ে ইয়াছরিবে ফিরে আসেন, এবং মুহাম্মদ তার স্বাভাবিক (নিজের জন্য নির্ধারিত) এক পঞ্চমাংশ দখল করে বাদবাকি আক্রমণকারীদের মধ্য ভাগ করে দেন(৪)।

এই সময়ের মধ্যে একমাত্র দখলদারি অভিযান চালানো হয়েছিল ইয়াছরিবের পাঁচশো মাইল উত্তরে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী খ্রিস্টীয় শহর দুমায় (Duma), এবং এটি পূর্ব-পশ্চিম কাফেলা পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। মক্কাবাসীর জোট ইয়াছরিবের দিকে সদলবলে আসার ছয়মাস আগেই মুহাম্মদ নিজেই অল্প সময়ের মধ্যে শহরটি দখল করে নেন। সন্দেহভাজন বাহিনী যাদের মনে হয়েছে যে তারা মক্কাবাসী বাহিনীর সাথে যোগ দেয়ার সম্ভবনা আছে তাদের দলভঙ্গ করার জন্য এই হামলা চালানো হয়েছিল। এখন উত্তরের দিকে একটি নতুন জোট গঠিত হচ্ছে যার মধ্যে রয়েছে ইহুদি, খ্রিস্টান এবং আরব পৌত্তলিকরা। দুমা জয় করার মাধ্যমে মুহাম্মদ খ্রিস্টানদের তার শত্রুদের সাথে যোগদান থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি আব্দুর রহমানকে সাতশো লোকের প্রধান করে দুমার লোকদের বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ জিহাদ করার নির্দেশ দিয়ে বললেন : "আল্লাহর পথে সকলের সাথে যুদ্ধ কর এবং যারা আল্লাহতে অবিশ্বাস পোষণ করে তাদেরও হত্যা কর" (৫)। এই আক্রমণের আগে আব্দুর রহমান দুমার জনগণকে মুহাম্মদের ধর্মে যোগ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান, যদি তারা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে এর পরিণাম সম্পর্কে তাদের সতর্ক করে দেন। শহরটিকে চারপাশ দিয়ে ঘিরে ফেলার পর রহমান খ্রিস্টান শাসকের কাছে একটি বার্তা পাঠান যে, তাদের ধর্মান্তরিত হবার জন্য তিনদিন সময় আছে। ধর্মান্তরিত হলে ভালো, নতুবা তারা তাদের হাতে তলোয়ার তুলে নেবে। ঐ বছরের শুরুতে মুহাম্মদ বানু কুরাইযার ইহুদিদের হত্যা করেছিলেন যা এই খ্রিস্টানরা জানত, তাই এই হুমকিকে তারা গুরুত্বের সাথেই গ্রহণ করে। তবে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরিবর্তে তারা একটি পরাধীন (জিজিয়া) কর পরিশোধ করার প্রস্তাব করে। আব্দুর রহমান এই প্রস্তাবটির কথা জানাতে ইয়াছরিবে এক বার্তাবাহককে পাঠান এবং মুহাম্মদ তাদের শাসকের মেয়েকে বিয়ে করার মাধ্যমে আব্দুর রহমানকে এই চুক্তি নিষ্পত্তির আদেশ দিয়ে বার্তাবাহককে আব্দুর রহমানের কাছে ফেরত পাঠান। রহমান তার নববধূকে সঙ্গে নিয়ে ইয়াছরিবে ফিরে আসেন, সঙ্গে করে আরো আনেন প্রথম কিস্তির জিজিয়া কর।

এই সময়ের মধ্যে মুহাম্মদ নিজে দক্ষিণের লিহিয়ান (Lihyan) গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন যারা দুই বছর আগে তারা মুহাম্মদের দশজন ধর্মপ্রচারককে হত্যা করেছিল, এবং তারই প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। লিহিয়ানরা নতুন ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাওয়ার অজুহাতে তার প্রচারকদের প্রলুব্ধ করেছিল, কিন্তু এটি ছিল তাদের অন্যতম মিত্র খালিদ বিন সুফিয়ানের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার একটি ফাঁদ মাত্র।

কিন্তু সব প্রধান যুদ্ধে হস্তক্ষেপের মতোই মুহাম্মদ সম্ভবত খুব দ্রুতই এই অভিযান পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন, কারণ তিনি তার অনুসারীদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে এই অভিযানটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখছিলেন। তিনি এতটাই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, তিনি লিহিয়ানদের পিষে ফেলতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি তাদেরকে হতচকিত করার জন্য দুর্ধষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তারা ছিল হুযাইল গোত্রের (Hudhayl tribe) একটি শাখা যারা মক্কার উত্তর-পূর্ব দিকের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ঘোরাফেরা করত। কিন্তু ইয়াছরিবের দক্ষিণে সহজ পথে যাওয়ার পরিবর্তে তিনি পশ্চিমে লোহিত সাগরের পথ ধরে এগোলেন যে কারণে একদিন বেশি সময় লেগেছিল। তিনি দুইশত পেশাদার সৈন্যের একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। দক্ষিণের উপকূল বরাবর ভ্রমণের পর তিনি লিহিয়ান ভুমিতে ঢুকে তাদের শিবিরের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। এটি ছিল একটি কূটকৌশল। এই রুট নেয়া হয়েছিল মূলত এজন্য যাতে এই অভিযানের কথা ফাঁস না হয়ে যায়, যদিও এভাবে আসার কারণে অতিরিক্ত ২০০ মাইল রাস্তা যোগ হয়েছিল, কিন্তু তাতেও কোন লাভ হয়নি। লিহিয়ানরা কোন না কোনভাবে এই অভিযানের কথা জেনে যায় এবং পাহাড়ে পালিয়ে যায় ও সঙ্গে করে তাদের পশুরপাল ও সহায়-সম্পত্তি নিয়ে যায়। মুহাম্মদ তাদের খুঁজে বের করার জন্য একটি দল পাঠালেন, কিন্তু তারাও খালি হাতে ফিরে এলো। কিন্তু মুহাম্মদ একেবারে খালি হাতে অভিযান থেকে ফিরে

না গিয়ে তিনি কিছু সুবিধা পেতে তার সৈন্যদের নেতৃত্ব দিয়ে আরো দক্ষিণে উসফান (Usfan) গ্রামে নিয়ে যান, যেটার দুরত্ব ছিল মক্কা থেকে একদিনের যাত্রাপথের দুরত্বের সমান। তবে এই অভিযানটি পরিচালনা করেন মক্কাবাসীদের তার ক্ষমতার প্রদর্শন এবং ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেও। মক্কাবাসীরা তখন খালিদের নেতৃত্বে একটি অশ্বারোহী সেনাদল পাঠায় (৬)।

খালিদ ছিলেন সেই অশ্বারোহী নেতা যিনি উহুদের যুদ্ধে মুহাম্মদকে চ্যালেঞ্জ করে সৈন্যদের সারি ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হয়েছিল। এই সংঘর্ষের ফলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়, কারণ মুহাম্মদ বা খালিদ কেউ এই যুদ্ধে জয়লাভের ব্যাপারে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিল না। উভয় বাহিনীই (খালিদের দল এবং মুহাম্মদের দল) পিছিয়ে যায় এবং মুহাম্মদ প্রতিশোধ না নিয়েই বাড়ি ফিরে আসেন। এই অভিযান থেকে মুহাম্মদ না কোন গনিমতের মাল আনলেন, না প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হলেন। এই হামলায় একমাত্র ক্ষতি হয়েছিল লিহিয়ানদের সুনামের ক্ষতি, যাদেরকে মুহাম্মদের একজন ভাড়াটে কবি যুদ্ধ না করে পালিয়ে যাওয়ার জন্য "মামুলি নেউলে" বলে অভিহিত করেছিলেন (৭)। যদিও মুহাম্মদ সেই অভিযান থেকে খালি হাতে ফিরে আসেন, কিন্তু তার লুণ্ঠন কার্যকম তখনো ইয়াছরিবে ঠিকই প্রবাহিত হচ্ছিল, এবং সাম্প্রতিক অন্যান্য অভিযানের লুণ্ঠিত জিনিসপত্রও ইয়াছরিবে ঠিকই আসছিল।

সম্প্রতি কয়েকটি অভিযানের একটি থেকে পনেরো শত প্রাণী, আরেক জায়গা থেকে পাঁচ হাজার, আরেকটি অভিযান থেকে আরও দুই হাজার পশুপাল ঠিকই এনেছিলেন - গতানুগতিকভাবে মুহাম্মদ সবসময় তার কুড়ি শতাংশ কেটেই রাখতেন। এই সাফল্যের ফলে ইয়াছরিব গবাদিপশুতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল ঠিকই, কিন্তু চারণভূমির স্বল্পতা দেখা দিল। অতিরিক্ত পশুখাদ্যের জন্য জমির প্রয়োজন ছিল, যা একটি সংকটের সৃষ্টি করল। তাজা ঘাসের একমাত্র উৎস ছিল ইয়াছরিবের বাইরে, বিশেষ করে পূর্বদিকে, কিন্তু দূরত্বের কারণে রাখালদের জন্য ভেড়াগুলোকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠল। মুহাম্মদ যাযাবরদের সাথে এবং চরাঞ্চলের লোকদের সাথে চুক্তি করেছিলেন যারা এই অঞ্চলগুলি নিয়ন্ত্রণ করত; এবং মুহাম্মদ তার রাখালদের পশুরপাল সহ সেখানে প্রেরণ করেন।

তার উপর হিংস্র প্রতিশোধ নেয়া হতে পারে ভেবে তিনি তার রাখাল বালককে পশুপাল সহ সবসময় দূরে রাখার চেষ্টা করতেন, তবে এই প্রতিরোধ সবসময় কার্যকরী ছিল না। লিহিয়ান অভিযান থেকে ফিরে আসার মাত্র কয়েকদিন পর তিনি খবর পান যে, ইয়াছরিব থেকে অর্ধদিনের দুরত্বের এক চারণভূমিতে একদল বেদুইন অভিযানকারী আক্রমণ করে তার কুড়িটি উট নিয়ে যায়। তারা রাখালকে হত্যা করে এবং উটসহ রাখালের স্ত্রীকেও সাথে নিয়ে যায়। এই উটগুলোর মধ্যে ছিল মুহাম্মদের অন্যতম প্রিয় আল আবদা (al Abda) উট, যেটি বিখ্যাত ছিল দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য এবং উক্ত উটটি সাম্প্রতিক এক অভিযান থেকে গনিমত হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন। তিনি সবসময় গনিমতের মাল প্রথম বাছাই করতেন এবং তার চোখকে কোনভাবেই এটি এড়িয়ে যাওয়ার কথা না, কারণ তীর্থ মৌসুমের বিভিন্ন মেলায় দৌড় প্রতিযোগিতায় উটটি অনেকবার বিজয়ী হয়েছিল। দৌড় প্রতিযোগিতার উট এবং ঘোড়া ছিল আরবদের আবেগের বিষয়, সেই আবেগ মুহাম্মদের মধ্যেও ছিল, এবং তার নিজস্ব উট কাসওয়া (Qaswa) ছিল গনিমতের মাল ছিল। আল-আবদা (al-Abda) তার অতি প্রিয় ছিল। লিহিয়ান অভিযানের সময় তিনি অন্যান্য উটের সাথে এই দুটোকেও চারণভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

এই অভিযানের খবর পেয়ে মুহাম্মদ আক্রমণকারীদের তাড়া করতে অশ্বারোহীদের একত্রিত করলেন এবং দ্রুত তাদের ধাওয়া করতে পাঁচশো সৈন্য জড়ো করলেন। যে লোকটি এই খবরটি নিয়ে এসেছিল সে হলো আল-আকওয়ার (al-Akwa) ছেলে সালামা (Salama), যে সবসময় মুহাম্মদকে খুশি করার উপায় খুঁজত। সে চারণভূমির দিকে যাচ্ছিল সব ঠিক আছে কিনা পর্যবেক্ষণ করতে, অথবা ঐ দিনের দুগ্ধ উৎপাদন আনতে - এগুলোর বেশিরভাগই ছিল দুধের উট। প্রতিদিনের দুধ ইয়াছরিবে যখন নিয়ে যাওয়া হতো, সে ঠিক সেই সময় দূর থেকে এই আক্রমণ দেখে। গাতফান এলাকা থেকে চারণভূমিকে উত্তর-পূর্ব দিকে আলাদা করা পাহাড় থেকে চল্লিশজন হামলাকারী নেমে এসেছিল, এবং তারা ইতোমধ্যেই মুহাম্মদের

গবাদিপশু এবং রাখালের স্ত্রীকে পাহাড়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। সালামা একজন ক্রীতদাসকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে এসেছিল। এই দৃশ্য দেখে মুহাম্মদকে সতর্ক করতে সে দাসকে ঘোড়া দিয়ে পাঠিয়ে দিল। শুধু ধনুক হাতে নিয়ে খালি পায়ে হেঁটে সে হামলাকারীদের তাড়া করল। পর্বতের পথ সংকীর্ণ ও এবড়ো-খেবড়ো হওয়ায় তা পাড়ি দিতে গতি কমে গিয়েছিল। সালামা তখন একটি গাছের পেছনে দাঁড়িয়ে সেটাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তাদের উদ্দেশ্যে তীর ছুঁড়ে মারতে লাগল। প্রতিটি তীর ছুঁড়ে মারার সময় সে চিৎকার করে বলল, "আমি আকওয়ার ছেলে সালামা। আজ দুষ্টরা মারা পড়বে" (৮)। তার নিরলস আক্রমণে হামলাকারীদের চলার গতি কিছুটা মন্থর হয়ে গেল, ইতিমধ্যে মুহাম্মদ যে অশ্বারোহী পাঠালেন তারাও ইতিমধ্যে লড়াইতে যোগ দিল। মুহাম্মদের একজন হামলাকারীসহ আক্রমকারীদের চার-পাঁচজন নিহত হলো। লুট হয়ে যাওয়া কুড়িটি উটের মধ্যে অর্ধেক উদ্ধার করতে পেরেছিল তারা, তবে সেসবের মধ্যে মুহাম্মদের প্রিয় উট আল-আবদা ছিল না। জানা গেল যে, বেদুইন হামলাকারীদের প্রধান ছিলেন আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন উয়াইনা (Uyayna)। তিনি ছিলেন গাতফান নেতা, যিনি মাত্র কয়েকমাস আগে মক্কাবাসী জোটের সাথে মিলে ইয়াছরিবে আক্রমণ করেছিলেন। তিনি সেই ব্যক্তি যাকে মুহাম্মদ ইয়াছরিব এক তৃতীয়াংশ খেজুর ফসল দিয়ে কেনার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে মুহাম্মদ পিছু হটেন যখন তার অনুসারীরা তাদের কোন পণ্য কাফেরের সাথে ভাগ করে নেয়ার ব্যাপারটি ভালো চোখে দেখেনি। ইয়াছরিবের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকের একটি বৃহৎ অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানো গাতফান গোত্রের একটি শাখার প্রধান ছিলেন উয়াইনা। তার গুরুত্ব অনুমেয় করা যায় কারণ তিনি দুই হাজার যোদ্ধাকে একত্রিত করে মক্কাবাসী জোটের সাথে মিলে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সম্ভবত এই শক্তিই তাকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল যে, তিনি যেকোন সময় মুহাম্মদের উটের পাল ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবেন। মুহাম্মদ পাহাড়ের উপর দিয়ে উয়াইনাকে অনুসরণ না করার সিদ্ধান্ত নিলেন, কারণ ততক্ষণে গাতফান (Ghatafan) নেতা তার নিজের এলাকায় ঢুকে যাবেন এবং তাকে প্রতিহত করার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শক্তি একত্রিত করতে সক্ষম হবেন।

দস্যুদের পেছনে তাড়া করার পরিবর্তে তিনি কিছু উদ্ধার করা উটকে জবাই করে সৈন্যদের ভোজনের আয়োজন করেন এবং আগুন জ্বালিয়ে তার চারপাশে বসে সবাই সংঘর্ষের কাহিনী উপভোগ করতে থাকে এবং জেনে আনন্দিত হয় যে, তারা উয়াইনার এক ছেলেকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছে। যখন সালামা দুষ্কৃতিদের দিকে তীর ছোঁড়ার গল্প করল এবং এ-ও বলেছিল যে সে তাদের বলেছে "আমি আল-আকওয়ার ছেলে সালামা, এবং দুষ্টরা আজ মারা পড়বে" মুহাম্মদ তখন মুখ হা করে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যাচ্ছিলেন এবং সালামাকে ওইদিনের জন্য নায়ক ঘোষণা করে দিলেন। ইয়াছরিবে ফিরে আসার সময় মুহাম্মদ তাকে তার সাথে উটের পিঠে চড়ার অনুমতি দিয়ে সম্মানিত করেন। সালামার জন্য এটা ছিল সপ্তম স্বর্গ ছোঁয়ার মতো বিষয়। সৈন্যরা সবাই ফুরফুরা মেজাজে ছিলেন। তাদের লুট করা গনিমতের মাল নিয়ে তৎক্ষণাৎ রচিত আনকোরা আয়াত নিয়েও সৈন্যরা বেশ উল্লসিত ছিল। যখন তারা ইয়াছরিবের কাছাকছি ফিরল, তারা উটের দৌড় প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করল। আর নতুন মর্যাদার জন্য ধন্যবাদ স্বরূপ সালামাকে একটি দ্রুতগতির উট পুরস্কৃত করা হলো। দৌড়ের শুরু হয়েছিল বালির মধ্যে একটি লাইন কেটে। মুহাম্মদের বিশেষ অনুগ্রহ অর্জন করতে পেরে তার মাথা তখন আনন্দে ঘুরছে, সালামা তার বিজয় উদযাপনের জন্য তার উটের পিঠে উঠে বসল।

এদিকে রাখালের বন্দি স্ত্রী রাতের আঁধারে আল-আবদা উটের উপর চড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো, কারণ সে জানত যে উটটি অশ্বারোহীদের সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং সে দ্রুত পালাতে পারবে। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, যদি জীবিত অবস্থায় ইয়াছরিবে পৌঁছতে পারে তাহলে সে আল্লাহকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য এটিকে উৎসর্গ করবে। মুহাম্মদের চলে আসার দু'দিন পর সে মুহাম্মদের প্রিয় উটে চড়ে ইয়াছরিবে সুস্থ এবং নিরাপদে পৌঁছে গেল। মুহাম্মদও তার প্রিয় উটটি ফিরে পেয়ে খুশি হলেন, কিন্তু যখন নারীটি তাকে আল্লাহর পথে এই উটটি উৎসর্গের প্রতিজ্ঞার কথা জানালেন, মুহাম্মদ তাকে তিরস্কার করলেন এবং বললেন : "আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতার কোন মানত করা বৈধ নয়, তেমনি অবৈধ কিছু যা নিজের নয় এমন কিছু মানত করাও বৈধ নয়"।

সম্ভবত মুহাম্মদের রেগে যাওয়ার আসল কারণ ছিল উটটি তার প্রিয় ছিল যেটা তিনি সম্প্রতি এক অভিযান থেকে পেয়েছেন, আর এই নারী তাকেই (উট) উৎসর্গ করতে চেয়েছে! (৯)

শুধু যাযাবরদের অভিযান মোকাবেলাই তার অন্যতম চিন্তার কারণ ছিল না, সঙ্গে চোরদের নিয়েও তিনি বেশ ঝামেলায় ছিলেন। ইতিহাসে পাওয়া যায়, দক্ষিণের উরাইনা গোত্রের (Urayna tribe) আটজন লোক ইয়াছরিবে তার কাছে এসেছিল তার প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করতে, কিন্তু প্রথম সুযোগে তারা তার উট নিয়ে পালিয়ে যায়। তারা এসেছে দক্ষিণের উন্মুক্ত জায়গা থেকে। থাকার মতো কোন ঘর বা তাঁবু তাদের ছিল না। দেয়াল হিসেবে ছিল পাহাড় এবং আকাশ ছিল তাদের ছাদ। তারা ছিল গৃহহীন, এবং তারা দেখতে রোগাপটকা ছিল। তারা রোগে আক্রান্ত হলে সেটা ঘনবসতিপূর্ণ ইয়াছরিবের সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে, বিশেষ করে গরম মাসগুলোতে মাছি এবং মশার উপদ্রব বাড়তে থাকে এবং রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভবনা বেশি থাকে। এই চিন্তা করে তাদের সুস্থ এবং স্বাস্থ্যবান করার জন্য মুহাম্মদ তাদের শহরের বাইরে তার এক মুক্ত দাসের সাথে থাকার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। দাস সেখানে দুধ দেয়া উটগুলো দেখভাল করত। এটা সেই এলাকা যেখানে গাতফানীরা এর আগেও অভিযান চালিয়েছিল। মুহাম্মদ এদের শক্তিবান হতে প্রচুর দুধ পান করার নির্দেশ দিলেন, এবং সাথে উটের প্রস্রাবও পান করতে বললেন, কারণ তিনি উটের মূত্রকে সবচেয়ে ভালো ওষুধ হিসেবে বিবেচনা করতেন।

তাদের কংকালসার শরীর মাংসে পূর্ণ হলো। সুস্থবোধ করার পরই এই আট বেদুইন মুহাম্মদের রাখালকে হত্যা করল এবং মুহাম্মদের গনিমতের মাল সাথে করে নিয়ে পালিয়ে গেল। ইসলামিক গ্রন্থ অনুসারে, তারা প্রথমে রাখালের হাত ও পা কেটে দিয়েছিল এবং তারপর তার জিহ্বা ও চোখ দিয়ে কাঁটা ঢুকিয়ে হত্যা করেছিল। মুহাম্মদ শীঘ্রই তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পারেন এবং কুর্জ (Kurz) নামের একজন প্রাক্তন উটচালককে তাদের ধরে আনার জন্য পাঠান। ছয় বছর আগে কুর্জ মুহাম্মদের কিছু গবাদিপশু চুরি করতে সফল হয়েছিল, কিন্তু পরে সে ধর্মান্তরিত হয় এবং একজন নির্ভরযোগ্য যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। কুড়িজনের একটি দল পাঠিয়ে তিনি সেই চোরদের ধরে ইয়াছরিবে ফিরিয়ে আনেন। মুহাম্মদ তাদের হাত-পা কেটে ফেলার আদেশ দিলেন এবং তাদের চোখ উপড়ে ফেলা হলো। একটি বর্ণনায় আছে, তাদের চোখে উত্তপ লোহা ঢুকিয়ে দেয়া হয়, তারপর তাদেরকে উত্তপ্ত বালির ক্ষেতে ফেলে দিয়ে আসা হয় এবং তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মারা যায়। বলা হয় যে, তারা পান করার জন্য একটু জল চাইতে চাইতেই মারা যায় (১০)।

এই ঘটনাটি মুহাম্মদকে আয়াত রচনা করতে অনুপ্রাণিত করে যা পরবর্তীতে কোরআনের পঞ্চম অধ্যায়ের অংশ হয়ে ওঠে। একটি আয়াতে চুরির শাস্তি কি হবে তার বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে এভাবে : "আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের কর্মের প্রতিফল ও আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে, এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (১১)। তবে এই জঘন্য অপরাধ যেটা এই আটজন বেদুইনের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল, এই ধরনের অপরাধের জন্য তিনি কঠোর শাস্তির আয়াত রচনা করেন: "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জমিনে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি" (১২)।

অধ্যায় - ২৬
আমাদের সময়ের শান্তি

মুহাম্মদের উদ্ভাবনী মনের চাতুর্যের ফলস্বরূপ, ধূলিমলিন মক্কার অতি সাধারণ ঘনক আকৃতির এই মন্দিরটি সকল সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। তিনি চোখ বন্ধ করলেন, এবং কল্পনায় দেখতে পেলেন আল্লাহর চকচকে সিংহাসন সরাসরি মন্দিরের উপরেই রয়েছে। তার কাছে এটা ধর্তব্যের বিষয় ছিল না যে, তার সময়কাল থেকে দুই শতাব্দী আগেও, কুসাইর যুগে মন্দিরটি স্তূপীকৃত পাথরের একটি আয়তক্ষেত্রাকার প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এর দেয়াল টপকে ছাগল পর্যন্ত ঢুকে যেতে পারত। কুসাইরও দুই শতাব্দী আগে মক্কা ছিল একটি জনবসতিহীন উপত্যকা যেটা কাঁটাযুক্ত ঝোপঝাড় দিয়ে আবৃত ছিল। কুসাইর দুই শতাব্দী পরে মুহাম্মদের জন্মের সময়, মন্দিরটি শুধুমাত্র একটি ছাদবিহীন উঁচু আয়তক্ষেত্রাকার পাথরের প্রাচীর দ্বারা ঘেরা ছিল। তার কল্পনায় কাবা এখন আল্লাহর মন্দির হয়ে ওঠে। সৃষ্টির শুরু থেকে এটি এক বা একাধিক আকারে বিদ্যমান ছিল, যখন এটি স্বর্গ থেকে একটি উজ্জ্বল রত্নাকারে অবতীর্ণ হয়। আদমের হাতে তা উপাসনার স্থানে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এখন তা পতিত জায়গা। এই পাথরটি এখন স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করা মানুষের হাতে পতিত হয়েছে, এবং এটিকে যেকোন মূল্যেই তাদের হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে এবং যারা এক স্রষ্টা ছাড়া আর কারোরই পূজা করে না তাদের কাছেই এটিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

খন্দকের যুদ্ধে মক্কাবাসীদের বিশাল সেনাশক্তির মুখোমুখি হওয়ার এক বছর পর মুহাম্মদ মক্কায় একটি দুঃসাহসিক তীর্থযাত্রা (উমরাহ) করতে চাইলেন। এটি ছিল সাহসী পদক্ষেপ, তবুও তিনি দাবি করেছেন যে এটি এখন থেকে এক আল্লাহর ঘর, যদিও প্রতীকীভাবে সাতবার কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করছিলেন, তার শত্রুরা তার দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে ছিল, কিছুই করার ছিল না। তীর্থযাত্রীর সাদা পোশাকে নিজেদের আবৃত করে তিনি পবিত্র মাসগুলোর প্রথমটিতে পনেরো শত লোক এবং কোরবানির জন্য উটের বহর নিয়ে রওনা হন এবং মক্কাবাসীদের চ্যালেঞ্জ করলেন যদি পারে কিছু করে দেখাতে।

ইসলামিক আদিগ্রন্থে মনে করা হয় যে, তীর্থযাত্রার অনুপ্রেরণা মুহাম্মদের স্বপ্নের মাধ্যমে এসেছে। তিনি স্বপ্নে দেখলেন তিনি তার মাথা মুণ্ডন করে মন্দিরে প্রবেশ করছেন এবং নিজ হাতে "বাড়ির" (কাবার) চাবির তোড়া ধরে আছেন। যদি তিনি সত্যিই এমন স্বপ্ন দেখে থাকেন তবে সেটি ছিল মূলত মক্কাবাসীদের ইয়াছরিব আক্রমণ নসাৎ করার পর থেকেই তিনি যা মনে মনে ভেবেছিলেন, তারই প্রতিফলন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তার এখন সক্ষমতা আছে এবং তিনি আরবদের ধর্মীয় রীতিনীতিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে মক্কায় তীর্থযাত্রা করে ফিরে যেতে পারেন। পবিত্র মাসে মক্কাবাসীরা কী তার বা তার সাথীদের উপর আক্রমণ করার সাহস করবে, যখন তিনি এবং তার লোকেরা পবিত্র সাদা পোশাক পরিহিত থাকবেন? তারা কি তাকে হত্যা করার সাহস করবে যখন তারা অন্য সব আরবদের উপাসনা করার জন্য এই মাসে অনুমতি দিয়ে থাকে?

যদিও তার পবিত্র মাসের ঐতিহ্যগত সুরক্ষার অলিখিত চুক্তির কথা মাথায় ছিল, তবুও মুহাম্মদ কোন ঝুঁকি নিতে চাননি। তার অনুসারীরা সশস্ত্র ছিল এবং অশ্বারোহী যোদ্ধাও সঙ্গে আনা হয়েছিল। তারা যখন দক্ষিণে অগ্রসর হল, তখন তিনি বিভিন্ন বেদুইন আদিবাসী, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের সমানভাবে তাদের সাথে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়ে সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাদের বেশিরভাগই তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। যদিও মুহাম্মদ মক্কাবাসীদের অনেক ক্ষতি করেছিলেন, তবুও তারা মুহাম্মদকে বোকা মনে করত এবং বিশ্বাস করত না যে তিনি জীবিত অবস্থায় আবার ফিরে যেতে পারবেন। কেউ কেউ এই ভয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে যে, তার উদ্দেশ্য ছিল এদেরকে ক্ষণিকের জন্য রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করবে। যাত্রার একপর্যায়ে মুহাম্মদের লোকেরা তীর্থযাত্রীদের সাদা পোশাক পরিধান করে তার নেতৃত্ব অনুসরণ করতে থাকল। তিনি তার

পোশাক ইয়াছরিব ছাড়ার আগেই পরেছিলেন, কিন্তু ঐতিহ্যগতভাবে ইয়াছরিব ও মক্কার মধ্যবর্তী যাত্রাবিরতিতে এটি পরিধান করার নিয়ম ছিল। বেশিরভাগ লোক সেই যাত্রাবিরতির স্থান যেখানে পোশাক বদলাবেন সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল।

তীর্থযাত্রীর অনুষঙ্গ হিসেবে শুধু দুটি সাদা চাদরে নিজেকে মোড়ানো নয়, যার এক অংশ ডান কাঁধের উপর পেঁচিয়ে থাকে এবং অন্য কাঁধটি খালি রাখা হয়, বরং আরো অনেক বিষয় নিষিদ্ধ, যেমনঃ যৌনতা করা, পাগড়ি পরা থেকে বিরত থাকা, এবং দাড়ি গোঁফ, চুল, এমনকি নখ পর্যন্ত না কাটা।

ধর্মীয় পবিত্রতার এই কঠোরতা পৌত্তলিক তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী ছিল, কিন্তু মুহাম্মদ তার এই তীর্থযাত্রার সময়ে কিছুটা পরিবর্তন আনতে অতিরিক্ত নিয়মকানুন যুক্ত করেন। আগের নিয়মকানুনকে ওলটপালট করা ছিল তার অনুসারীদের নিয়ন্ত্রণের একটি মাধ্যম। এবং তিনি কখনোই কোন বিষয়ে নতুন কিছু আইন যুক্ত করার সুযোগ হাতছাড়া করেননি, তা যতই তুচ্ছ বা নগণ্য হোক না কেন। উদাহরণস্বরূপ, মক্কা ভ্রমণের সময় তিনি খাওয়ার জন্য প্রাণী শিকার নিষিদ্ধ করেন, কারণ এতে প্রাণী হত্যা করতে হবে এবং তীর্থযাত্রীদের জন্য হত্যা করা হারাম ছিল। শুধু তীর্থযাত্রা শেষ হওয়ার পরই কোরবানির পশুদের হত্যা করার অনুমতি ছিল। তবে তিনি বন্যপ্রাণী বা পোকামাকড়ের বেলায় ব্যতিক্রম আদেশ দিয়েছিলেন। ইঁদুর, শকুন, বিচ্ছু এবং পাগলা কুকুরদের যেকোন সময় হত্যা করার কথা বলেছিলেন, কারণ তারা তাদের জন্য ক্ষতিকর ছিল, আক্রমণ করতে পারে যখন তখন।

তবে শিকারের বিরুদ্ধে তার কঠোরতা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যার জন্য বিশ্বাসীরা আরো পরিষ্কার ব্যাখ্যা চাইতে বাধ্য হন। একরাতে যাত্রাবিরতির সময়, মরুভূমির কিছু বাসিন্দা যারা তীর্থযাত্রার অংশ ছিল না, তারা তিনটি বড় গিরগিটি নিয়ে মুহাম্মদের শিবিরে প্রবেশ করে এবং তারা মুহাম্মদের তীর্থযাত্রীদের সাথে আনন্দ উপভোগ করার সময়ে তাঁবুর সামনে আগুন জ্বালিয়ে তার উপর তাদের এই মাংসগুলো রান্না করতে চায়। তারা গিরগিটিগুলোকে রোস্ট করল, মুহাম্মদের তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে মাংস ভাগ করে খাওয়ার প্রস্তাব দিল, কিন্তু মুহাম্মদের তীর্থযাত্রীরা তা স্পর্শ করতে অস্বীকার করল যতক্ষণ না মুহাম্মদ আল্লাহর সাথে এই ব্যাপারে পরামর্শ করে তাদের জন্য কোনো ফয়সালা দেন। অবশেষে মুহাম্মদ ঘোষণা করলেন, "খাও, কারণ যা তোমাদের জন্য (উদ্দেশ্যে) শিকার করা হয়নি তা খাওয়া অনুমোদিত। কিন্তু যখন তোমরা ইহরাম বাধা অবস্থায় থাকো (ধর্মীয় পবিত্রতার অবস্থা) তখনও অবশ্যই শিকার করা অথবা তোমাদের জন্য যা কিছু শিকার করা হয় তার সবকিছু এড়িয়ে চলতে হবে" (১)। একই ধরনের আরেকটা ঘটনা ঘটে যখন আরেকজন বিশ্বাসী যে তখনো পর্যন্ত তীর্থযাত্রার পোশাক পরেনি, তাই সে একটি বন্য গাধার মৃতদেহ নিয়ে শিবিরে ঢোকে। সে নতুন আইন সম্পর্কেও অজ্ঞাত ছিল, তাই শিকার করতে গিয়েছিল। যখন সে তার শিকার করা মৃত গাধাটি নিয়ে বন্দিশিবিরে এল, সে বুঝতে পারল যে, অন্যরা মুহাম্মদের পরামর্শ ছাড়া এর মাংস খাবে না। গিরগিটির মতো (আইনের রং বদলকারী) মুহাম্মদ এবারো ফুরসত বা অব্যাহতি দিলেন এই বলে যে, শিকারী যেহেতু এখনো তীর্থযাত্রীর মর্যাদা গ্রহণ করেনি, এবং কোন তীর্থযাত্রী যেহেতু তাকে এই শিকারে যেতেও বলেনি তাই এই মাংস খাওয়া বৈধ। তিনি মুমিনদের আশ্বস্ত করলেন যে, এই মাংস খাওয়ার জন্য তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পোড়ানো হবে না। মুহাম্মদ তার নিজের জন্য ওই গাধার মাংস থেকে সিনার অংশ রেখেছিলেন এবং নিজে তা ভোজনও করেছিলেন।

এরপর ইয়াছরিবের দক্ষিণে অবস্থিত গ্রাম আল-আবওয়াতে (al-Abwa) একটি উকুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখানে মুহাম্মদের মাকে সমাহিত করা হয়েছিল। সেখানেও মোহাম্মদের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন পড়ে। কাব বিন উজরা নামের একজন বিশ্বাসী ছিলেন যিনি যাত্রার শুরুতেই তীর্থযাত্রীর পোশাক পরেছিলেন। তিনি একটি রান্নার পাত্রের নিচে চুলোয় ফুঁক দিচ্ছিলেন। মুহাম্মদ লক্ষ্য করলেন যে, তার মাথার চুলে উকুন হাঁটছে। যদিও তীর্থযাত্রা শেষ না হওয়া পর্যন্ত শরীরের কোন পশম বা চুল কাটার কোন নিয়ম ছিল না, কিন্তু উকুনের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে তিনি নিজের তৈরি আইনের ব্যতিক্রম করেন এবং

কাবকে তার মাথা ন্যাড়া করার আদেশ দেন, আর এর বদলে (চুল কাটার কারণে) কাব বিন উজরাকে রোজা রাখতে বা কিছু দান করার ফরমান দেন। এই হুকুমটি শীঘ্রই কোরআনের একটি আয়াতের অংশ হয়ে ওঠে। কাব তার জীবনের বাকি দিনগুলোতে গর্ব করে বলতেন যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিজেই তার মাথায় চুলকানির (এবং উকুনের) বিষয়টি খেয়াল করেছেন (২)। যেহেতু এত বড় আল্লাহ তার মতো এত ক্ষুদ্র এক মানুষকে উকুন থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন সুতরাং সেই খুশিতে উকবা এক বেদুইনের কাছ থেকে একটি ভেড়া কিনে সেটিকে রঙিন রশি দিয়ে বেঁধে এবং তার গলায় রং-বেরঙের মালা দিয়ে সাজিয়ে সেটিকে আনন্দের সাথে কোরবানি (উৎসর্গ) করেন।

মুহাম্মদ এখন একজন বিধায়ক, শিক্ষক এবং অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের ভূমিকায় বিশ্বাসীদের মনের মধ্যে আবির্ভূত হন। তার নিয়মকানুন, আয়াত এবং তার আচার-আচরণ তার হৃদয়ের আলোকবর্তিকা হিসেবে জ্বলজ্বল করত, যে আলোকবর্তিকা মানুষকে জান্নাতে পৌঁছার পথ দেখাবে। তার এমন সব ভাবনাগুলো প্রকাশ করতেও তিনি লজ্জাবোধ করেননি। দক্ষিণের যাত্রাপথে বিরতির সময় তিনি তার লোকদের একটি বাবলা (acacia) গাছের তলা পরিষ্কার করতে বলেন, যাতে তার ছায়ায় বসে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি উপদেশ বিতরণ করতে পারেন। যখন একদল তীর্থযাত্রী তার চারপাশে ভিড় জমায় তখন তিনি একটি বিবৃতি প্রদান করেন, যেটি তার কথার আতিশয্যের কারণেই বিস্ময়কর ছিল। তিনি বলে উঠলেন : "হে বান্দারা, প্রকৃতই আমি তোমাদের নিকট এক উপহার রেখে যাচ্ছি। আমি তোমাদের হাতে যা ছেড়ে যাচ্ছি তা তোমাদের পথভ্রষ্ট করবে না, আর তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং নবীর সুন্নাত"। তিনি তার রচিত কোরআন ও তার সুন্নাতকে, তথা তার কাজকর্মের উদাহরণকেই আদর্শ হিসেবে বুঝিয়েছিলেন (3)।

যখন মক্কাবাসীরা মুহাম্মদের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে পারল, তখনো তারা নিশ্চিত ছিল না যে কি হতে যাচ্ছে। মুহাম্মদ ইতোমধ্যে তার এই ধরনের ঘোষণার জন্য বিখ্যাত ছিলেন যে, তাহলে কি এই যাত্রা প্রতারণার যুদ্ধের জন্য? এটা কি একটা কৌশল ছিল তবে? তাদের পূর্বপুরুষ কুসাইর সম্মিলিত স্মৃতি ছিল তাদের মনে, যিনি তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে শত শত বিদেশী যোদ্ধাকে লুকিয়ে মক্কায় নিয়ে গিয়ে একটি অভ্যুত্থান পরিচালনা করেছিলেন। কুসাই ও তাঁর কুরাইশ গোত্র পবিত্র মক্কা অঞ্চলকে খুজাদের কাছ থেকে মন্দিরের তীর্থযাত্রার রীতিনীতি সহ দখল করে নিয়েছিলেন। কুসাই প্রতারণার প্রতিভু ছিল। মুহাম্মদ কি কুসাইর ষড়যন্ত্রেরই পুনরাবৃত্তি করতে চাইছেন?
মক্কাবাসী নেতারা তাকে পবিত্র এলাকায় (হারাম এলাকা) প্রবেশে বাধা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলে। তারা মক্কার সীমানার প্রায় দশ মাইল দূরেই সব দিক থেকে মক্কার পথে ঢোকায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রেখেছিল। মুহাম্মদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য পর্বতমালার উপর গুপ্তচর পাহারা বসিয়েছিল এবং তার পথ আটকে দিতে এবং প্রয়োজনে তাকে যুদ্ধে পরাজিত করতে ওয়ালিদের ছেলে খালিদের নেতৃত্বে দুইশোজনের এক অশ্বারোহী বাহিনী পাঠিয়েছিল। উপরন্তু, মক্কাবাসীরা বাড়িতে বাড়িতে একটি রক্ষণাত্মক বাহিনীও গঠন করে এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রে মক্কাবাসীদের সাহায্যের জন্য আঞ্চলিক মিত্রদের কাছেও খবর পাঠায়।

মুহাম্মদ মক্কার রক্ষণাত্মক অবস্থার খবর নিয়ে ফিরে আসা এক গুপ্তচরের কাছ থেকে খালিদের অশ্বারোহী বাহিনীর কথা জানতে পেরেছিলেন। সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য মুহাম্মদ একটি স্থানীয় বেদুইনকে ভাড়া করেন যিনি তাকে এবড়োথেবড়ো পাহাড়ের উপর দিয়ে পবিত্র এলাকার সীমানার বাইরে, মক্কার ঠিক পশ্চিমে অবস্থিত হুদাইবিয়া সমভূমির দিকে নিয়ে যায়। এই ফাঁকিবাজি সত্ত্বেও, তাকে এবং তার লোকজনকে সহজেই মক্কাবাসীরা চিনে ফেলে। যেহেতু তীর্থযাত্রীরা সাদা পোশাক পরিহিত ছিল, তাই দূর থেকে দেখতে মনে হচ্ছিল পাহাড় থেকে সাদা রঙের লম্বা ভারি কিছু বাদামী মরুভূমির সমভূমিতে বেয়ে আসছিল। কিন্তু খালিদ মুহাম্মদকে ছেড়ে দিলেন। বলা হয় যে, এই সংঘর্ষ থেকে বিরত থাকার কারণ হচ্ছে খালিদও সেই সময় পক্ষ (ধর্ম) পরিবর্তনের কথা চিন্তা করছিলেন। মুহাম্মদকে আক্রমণ করার বদলে তিনি তার গতিবিধি সরেজমিনে দেখে তা জানাতে মক্কায় ফিরে গেলেন।

মুহাম্মদ হুদাইবিয়াতে একটি পানির গর্তের পাশে শিবির স্থাপন করেন এবং মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে কি হতে যাচ্ছে তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। কয়েকদিন পর খুজাদের একটি দল যাদেরকে কুসাইর গোত্র মক্কা থেকে দুই শতাব্দী আগে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল, তারা মুহাম্মদের তাঁবুর সামনে হাজির হয়। আঠারো মাস আগে মুহাম্মদ মুস্তালিক নামে খুজাদের একটি শাখাকে আক্রমণ করে তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন খুজা গোত্রবাসীই এখন মুহাম্মদকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছে। তারা এখন কাজ করছে মুহাম্মদের চোখ ও কান হিসেবে, যাদের বিস্তৃতি ছিল উত্তর-পশ্চিমে মরুভূমি অঞ্চল থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত। মক্কাবাসীদের সাথে তাদের ইতিহাসের কথা মাথায় রেখে খুজারা আতঙ্কিত না হয়ে বরং এখন মুহাম্মদের ব্যাপারে অনুকূল অবস্থান গ্রহণ করেছে। মুহাম্মদের সাথে দেখা করতে আসা লোকদের মধ্যে ছিলেন খুজাদের সুস্পষ্টভাষী নেতা বুদায়েল বিন ওয়ারাকা যিনি মুহান্মদকে তার আসল উদ্দেশ্য আসলে কি তাই জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন। মুহাম্মদ তাকে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তার কোন ঝামেলা বাধানোর ইচ্ছে নেই। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ছোটখাটো তীর্থযাত্রার আয়োজন করা, এবং তীর্থযাত্রা শেষ করেই চলে যাওয়া। এটা পরের মাসে শুরু হওয়া বার্ষিক প্রধান তীর্থযাত্রা (হজ্ব) থেকে আলাদা ছিল এবং সেই সময় সারা আরব থেকে লোকজন এখানে আসত। বছরের যেকোন সময় ছোট ছোট তীর্থযাত্রা (উমরা) করা যেত, তবে তা কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। যেমন - সাতপাক দেয়া, কালো পাথর চুমো দেয়া, সাফা এবং মারওয়া পর্বতের মাঝে আরো সাতবার দৌড়ানো, তারপর মাথা কামিয়ে, প্রাণী উৎসর্গের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা শেষ করা। এই ধর্মীয় আচারগুলো শতাব্দী আগে বিকশিত হয়েছিল যখন থেকে তারা বিশ্বাস করা শুরু করেছিল যে, এই কালো পাথর চাঁদ দেবতা হুবালের কাছ থেকে একটি বিশেষ উপহার। মুহাম্মদ তাকে (খুজা গোত্রপতিকে) বলেন যে, তিনি শুধু এসেছেন মক্কার মন্দিরের ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে, তবে সেটি করবেন আল্লাহর নামে। মক্কাবাসীরা যদি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায় তবে তিনিও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন।

বুদায়েল মক্কাবাসীদের কাছে মুহাম্মদের এই বার্তা নিয়ে যান, কিন্তু তারা যেহেতু জানত খুজা গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদের অধীনে চলে গেছে তাই তারা বুদায়েলের কথার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। আর সেজন্যই মক্কাবাসীরা অন্য একটি গোত্রের একজনকে হুদাইবিয়াতে মুহাম্মদের কাছে পাঠায় মুহাম্মদকে প্রশ্ন করে তার মতলব বোঝার জন্য। তিনি মুহাম্মদকে কিছু প্রশ্ন করার পর সেই তথ্য নিয়েই মক্কায় ফেরেন যা বুদায়েলের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের সাথে মিলে যায়। এরপরেও সন্তুষ্ট হতে না পেরে তারা তাদের আবিসিনীয় বেদুইন সেনাপতি হুলাইস আলকামাকে (Hulays Alqama) পাঠায়। যখন মুহাম্মদ জানতে পারলেন যে, তার কাছে আলকামাকে পাঠিয়েছে এবং মুহাম্মদ জানতেন যে, এই বেদুইন একজন ধর্মপ্রাণ পৌত্তলিক তখন যেই না হুলাইস কাছাকছি চলে এলেন মুহাম্মদ যাত্রাপথে কোরবানির জন্য রাখা একটি উটকে নানা রঙে সজ্জিত করে পথিমধ্যে বেঁধে রাখেন। যেন এটি দেখে বোঝা যায় যে, এটিকে সত্যিই তীর্থযাত্রায় বলিদানের জন্য রাখা হয়েছে। বলা হয় যে, যখন হুলাইস এই পশুটিকে দেখলেন তিনি নিশ্চিত হলেন, মুহাম্মদ উপাসনার জন্যই এসেছে, সুতরাং মুহাম্মদকে প্রশ্ন করে বিরক্ত না করেই তিনি মক্কায় ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি মন্দিরের সভামঞ্চে মক্কাবাসী নেতাদের কাছে তার পর্যবেক্ষণের কথা জানান। মক্কাবাসীরা এই কথা আসলে শুনতে চায়নি। তার এই তথ্যটি শোনার পর মক্কাবাসী এক নেতা রীতিমত তাকে অপমান করে বললেনঃ "তুমি শুধু একজন বেদুইনই, তবে কান্ডজ্ঞানহীন!" উত্তরে হুলেইস বলেন, "যে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে তাকে কি তাহলে সেটি করা থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে?" (৪)

মক্কাবাসীরা রেগে গিয়েছিল। এটা পরিষ্কার ছিল যে, মুহাম্মদ তাদেরই ধর্মীয় রীতিনীতি ব্যবহার করে তাদের উপর একটি সুবিধা লাভ করতে চাচ্ছে। তিনি পবিত্র মাসের নিরাপত্তার সুবিধা ব্যবহার করছেন, যদিও তিনি নিজে সেই ঐতিহ্যের প্রতি সামান্য শ্রদ্ধাও পোষন করতেন না। আর তাদের তাদের সহিষ্ণুতার প্রতিও তার কোন শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। তিনি তাদের খোলা মনকে এখন নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছেন কেবল। মন্দিরটি ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত - যেখানে যার ইচ্ছে পূজা করতে পারত, কিন্তু মুহাম্মদ শুধু তার নিজস্ব একমাত্র ঈশ্বরের ধারণাটি সহ্য করতেই রাজি ছিলেন, আর কারোর না। মক্কাবাসী

এখন একটি সংকটের সম্মুখীন হয়েছে - তারা কি মুহাম্মদকে সহ্য করবে, যা মূলত ছিল তার অসহিষ্ণুতাকেই সহ্য করা? একজন নেতা বললেন, "তিনি কখনোই আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আসতে পারবেন না, এবং যাতে আরবরা কখনও বলতে না পারে যে আমরা তাকে অনুমতি দিয়েছি" (৫)।

এবার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে তায়েফের এক নাগরিক উরওয়া ইবনে মাসুদকে পাঠায় তারা, যে উরওয়ার মা ছিলেন মক্কাবাসীদের একজন। আর উরওয়া ইবনে মাসুদ ছিল তায়েফের একজন নেতার ছেলে (পিতৃপরিচয়ে)। উরওয়ার বাবা দশ বছর আগে মুহাম্মদকে তায়েফ শহর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। উরওয়া ছিলেন একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ, মুহাম্মদের দ্বারা ভীত হবার পাত্র নন। উরওয়া মুহাম্মদের সামনে আড়াআড়ি পা করে বসলেন এবং দৃঢ়ভাবে মক্কাবাসীদের অবস্থানের কথা জানিয়ে উল্লেখ করলেন যে, তারা ইতোমধ্যেই একটি যুদ্ধের (সম্ভাব্য) জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। মুহাম্মদকে মক্কায় ঢুকতে হলে তাদের সাথে লড়াই করতে হবে এবং এর ফলাফল তার জন্য অনুকূল হবে না। মুহাম্মদের তাঁবুর লোকজনের দিকে তাকিয়ে উরওয়া তাদের প্রশ্ন করলেন যদি কোন সংঘর্ষ হয় তাহলে তারা মুহাম্মদের পাশে দাঁড়াবেন কিনা? তারপর মুহাম্মদকে বললেন, "ঈশ্বরের কসম, আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে এরা আগামীকালই তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে!" এই কথা শুনে আবু বকর মুহাম্মদের চেয়েও বেশি ক্ষুব্ধ হলেন। আবু বকর জানতেন যে উরওয়া তায়েফের, তাই তিনি চিৎকার করে বললেন : "যাও আল-লাতের স্তন চুষতে যাও! আমরা তাকে পরিত্যাগ করি, সত্যিই!" (৬) উরওয়া অনড় ছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, তিনি মুহাম্মদকে ইয়াছরিবে ফেরত পাঠাতে পারবেন, কিন্তু মুহাম্মদ অবিচল ছিলেন। তিনি ও তার লোকেরা মন্দিরে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে এসেছিলেন এবং তারা শান্তিপূর্ণভাবেই তা করতে চেয়েছিলেন। তারা যদি আক্রান্ত হয় তাহলে তারাও লড়াই করবে। যাইহোক, শান্তিপূর্ণভাবে এই সমস্যার সমাধান করার জন্য তিনি মক্কাবাসীদের একটি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করতে প্রস্তুত ছিলেন যেটি কোন আক্রমণের/ডাকাতির ভয় ছাড়াই সিরিয়ার সাথে তাদের বাণিজ্য পুনরায় শুরু করার সুযোগ করে দেবে।

উরওয়া খুব বিচক্ষণ ছিলেন। মুহাম্মদের সাথে থাকাকালীন তিনি পর্বেক্ষণ করেছেন তার প্রতি তার অনুসারীরা কতটা শ্রদ্ধাশীল। তার অনুসারীরা যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলে তখন তারা গলার স্বর নিচু করে কথা বলে এবং সরাসরি তার দিকে তাকায় না। তিনি যেই আদেশ দেন তা বিলম্ব না করেই পালন করে। একপর্যায়ে যখন মুহাম্মদ একটি বাটিতে হাত ধুলেন, লোকেরা যা অবশিষ্ট ছিল তা নিয়ে গেল এবং তাতে হয় তারা নিজেদের হাত ডুবিয়ে দিলেন অথবা পান করলেন। যখনই তিনি থুথু ফেললেন কেউ কেউ তাদের হাত বের করে দিত যাতে মুহাম্মদ তার হাতের উপর থুথু ফেলতে পারে, তারপর সেই থুতু সে তার গায়ে মাখিয়ে নেয় এবং অন্যদের সাথেও ভাগাভাগি করে। উরওয়া এটি ছাড়াও বিস্মিত হল যে, মুহাম্মদ তার ধর্মের দিকে আরো একজন হিংস্র দুর্বৃত্তকে কাছে টেনেছেন যিনি ছিলেন তারই ভাতিজা মুগিরা (Mughira), তারই ভাই শুবার (Shuba) ছেলে। মুহাম্মদের সাথে আলোচনা করার সময় উরওয়া মুহাম্মদের কাছাকাছি এসে তার দিকে ঝুঁকে মুহাম্মদের দাড়িতে হাত বুলাচ্ছিলেন। এটি একটি আরব্য প্রথা ছিল যা অসম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে করা হতো। যখনই তিনি এটি করলেন, ইস্পাতের শিরোস্ত্রাণ পরা একজন যোদ্ধা যার মুখ এবং চোখ ছাড়া সবকিছুই ঢাকা ছিল, হাতে তলোয়ার ধরে চেঁচিয়ে বলল "আল্লাহর রাসূলের মুখ থেকে হাত সরাও, না হলে তুমি তা আর জীবিত ফিরতে পারবে না!" (৭)। উরওয়ার কাছে কণ্ঠস্বরটি পরিচিত শোনালো। তিনি নিশ্চিত হওয়ার জন্য শিরোস্ত্রাণের পেছনে কে কথা বলছে জিজ্ঞেস করলেন। মুহাম্মদ তাকে অত্যন্ত খুশি হয়ে জানালেন যে, এটা তার ভাতিজা মুগিরা। উরওয়া স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন! তার ভাতিজা একজন পলাতক গণহত্যাকারী ছিল। সে এবং তার একটি অনুগত দল তায়েফের আশেপাশের কিছু লোককে ডাকাতি করার পর হত্যা করে, যার ফলে তায়েফের দুই প্রধান গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সে তেরোজন তায়েফ ব্যবসায়ীর একটি দলের সাথে মিশরে যায়। মিশর থেকে আরবে ফেরার পথে যখন তারা ঘুমিয়ে ছিল তখন মুগিরা তার এই তেরোজন সঙ্গীকে হত্যা করে এবং তাদের কাছে থাকা সবকিছু নিয়ে পালিয়ে যায়। মুগিরা শেষমেশ ইয়াছরিবে গিয়ে মুহাম্মদ এবং তার ধর্মের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। মুহাম্মদ এখন তাকে তার কাজের ছেলে এবং দেহরক্ষী হিসেবে ব্যবহার করছেন।

উরওয়া মক্কায় ফিরে এসে যা দেখেছে তা মক্কাবাসীদের জানালেন, এবং মক্কাবাসীদের মুহাম্মদের সাথে এক ধরনের চুক্তিতে রাজি হওয়ার পরামর্শ দিলেন। এরপর তিনি বললেন : "আমি এমন লোকদের দেখেছি যারা কোন কারণেই তাকে পরিত্যাগ করবে না, আর তাই আপনারা নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্ত নিন" (৮)

মক্কাবাসীরা অবশ্য মুহাম্মদের প্রস্তাবে কোন সাড়া দেয়নি। যখন তিনি তাদের কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ পেলেন না তখন তিনি খুজা গোত্রের একজন বেদুইনকে মক্কাবাসীদের কাছে পাঠালেন। তিনি উরওয়াকে যে বার্তা দিয়েছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করতেই পাঠালেন, অর্থাৎ তিনি শুধু মন্দিরে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে চান। কিন্তু মক্কাবাসীরা সেই বার্তাবাহককে কিছু বলার আগেই মারধর করল। বলা হয় যে, আবুল হাকামের পুত্র ইকরিমা বার্তাবাহকের উটের সামনের পায়ের অংশ কেটে ফেললেন, তবে আবিসিনীয় সৈন্যদের এক সেনাপতির হস্তক্ষেপ তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকেন এবং সে বেঁচে যায়। মক্কাবাসীরা তার সাথে যে অভদ্র আচরণ করেছিলেন তাতে এই সেনাপতি খুবই বিচলিত ছিলেন। তিনি ও তার কয়েকজন সৈন্য বেদুইনকে ঘিরে তাকে শহরের বাইরে নিয়ে গেলেন। অসহায় দূত তার ব্যর্থ মিশনের কথা জানানোর পর মুহাম্মদ তার অভ্যন্তরীণ গন্ডির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লোক উসমানকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন, কারণ তিনি মক্কার অন্যতম বিশিষ্ট পরিবারের সদস্য ছিলেন। মক্কাবাসীরা তার কথা হয়তো শুনতে পারে। তিনি তাকে মক্কাবাসী প্রবাসীদের একজন প্রহরী সহ প্রেরণ করেন, আর সেই প্রহরী একইসাথে তার নিজ পরিবারের সাথেও দেখা করতে চেয়েছিলেন। উসমান শহরের কাছে আসতেই তার এক পরিচিতের সাথে দেখা হয় যিনি তাকে তার উটের পেছনে চড়িয়ে নিয়ে ব্যক্তিগত সুরক্ষা দেন। তিনি উসমানকে প্রথমে মন্দিরের মঞ্চের পাটাতনে নিয়ে গেলেন যেখানে উমাইয়া বিন খালাফের ছেলে আবু সুফিয়ান, সাফওয়ান এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা একত্রিত ছিল। তিনি তাদেরকে মুহাম্মদের বার্তা বললেন, কিন্তু আবু সুফিয়ান তাকে জানান যে মক্কাবাসীরা আগের অবস্থানেই আছে - মুহাম্মদকে মক্কায় ঢোকার জন্য কোনো অনুমোদন দেয়া হবে না। কিন্তু তারা সৌজন্য দেখাতে উসমানকে মন্দিরের চতুর্দিকে তাওয়াফ (আবর্তন) করার অনুমতি দেয়া হবে বলে জানায়। উসমান তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহর রাসূলের আগে আমি কখনোই এই আবর্তনে যেতে পারব না" (৯)।

সেই উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থা আরো বেসামাল হয়ে উঠল যখন ইকরিমা তার নিজের উদ্যোগে সত্তরজন অশ্বারোহীর একটি দল নিয়ে মুহাম্মদকে হয়রানি করতে এবং তার কিছু অনুসারীকে জিম্মি করতে মুহাম্মদের শিবিরের দিকে রওয়ানা দিল, কিন্তু তার চেষ্টা বুমেরাং হয়ে যায় যখন কয়েকজন মক্কাবাসীকেই পাকড়াও করে মুহাম্মদের সৈন্যরা। মুহাম্মদের পাঠানো খুজা গোত্রের দূতকে আক্রমণ করার পরই ইকরিমা তার নিজ উদ্যোগে কারো সাথে পরামর্শ না করেই তার অশ্বারোহী বাহিনী সমেত রওনা দিয়েছিল। মক্কাবাসী নেতারা যখন মন্দিরের পাটাতনে বসে উসমানের সাথে কথা বলছিল তখনই কেবল তারা জানতে পারল মক্কাবাসী জিম্মিদের কথা (যাদের একটু আগে মুহাম্মদের সেনারা আটক করেছে)। মক্কাবাসীরা তৎক্ষণাৎ উসমান ও তার সংগে থাকা লোকদের গ্রেফতার করে ফেলে এবং তাদের জিম্মি করে রাখে। দ্রুত মুহাম্মদের শিবিরে গুজব পৌঁছায় যে, উসমান ও তার সঙ্গীদের হত্যা করা হয়েছে। মুহাম্মদ যুদ্ধ করার শপথ নেন, কিন্তু সম্ভবত উরওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীটিও স্মরণে আনেন যে, যুদ্ধ লাগলে মুহাম্মদের সৈন্যরা তাকে ফেলে চলে যেতে পারে। মুহাম্মদ প্রত্যেক তীর্থযাত্রীর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি চাইলেন যে, তারা যুদ্ধ করে যাবে, তাতে যদি তাদের মৃত্যু হয় তবুও। একজন ঘোষককে শিবিরে পাঠালেন এবং তিনি ঘোষণা করলেন যে 'পবিত্র আত্মা' বা জিব্রাইল মুহাম্মদের উপর নেমে এসেছেন, যিনি এখন তাদের তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার কাছে গিয়ে 'আল্লাহর নামে' অঙ্গীকারনামা দিতে বলছেন (১০)। অঙ্গীকার (বায়াত) গ্রহণের জন্য মুহাম্মদ একটি বাবলা গাছের ছায়ার নিচে বসেছিলেন। কয়েক ঘণ্টা ধরে তীর্থযাত্রীরা সবাই তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে এবং একের পর এক তার হাত ধরে যুদ্ধ লাগলে তার পাশে থেকে লড়াই করার শপথ নেয়। তারা প্রতিজ্ঞা করে যে, মুহাম্মদের উদ্দেশ্যকে তাদের জীবন দিয়ে হলেও তারা রক্ষা করবে।

অবশেষে তিনি বুঝতে পারলেন, এই অঙ্গীকারের কোন প্রয়োজনই ছিল না। যখন তিনি সুহায়েল বিন আমরকে শিবিরের দিকে আসতে দেখলেন, তিনি বুঝতে পারলেন যে উসমানের মৃত্যুর খবরটি আসলে মিথ্যা ছিল। যদি তা সত্য হতো তবে মক্কাবাসীরা তাদের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তার কাছে পাঠাতো না। মুহাম্মদ তাকে একজন যুক্তিসঙ্গত মানুষ হিসেবে চিনতেন, তাই মক্কাবাসীরা তাকে পাঠানোর উদেশ্য হচ্ছে তারা সমঝোতা করতে চায়। সুহায়েল ছিল মুহাম্মদের স্ত্রী সাওদার সাবেক দেবর, যাকে বদরের যুদ্ধে বন্দি করা হয়েছিল এবং মসজিদে সাওদার কক্ষে কিছু সময়ের জন্য বন্দি করে রাখা হয়েছিল। মুহাম্মদ এখন নিশ্চিত হলেন যে, মক্কাবাসীদের উপর তার এখনো নিয়ন্ত্রণ আছে, কারণ তাদের অনেক নেতার মৃত্যুতে মক্কাবাসীরা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া যুদ্ধ করতে সৈন্য পাঠানোর জন্য বিপুল আর্থিক খরচের সম্মুখীন হওয়াতে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল তারা। তাদের এই অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার কারণ ছিল সিরিয়ার সাথে তাদের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যে মুহাম্মদের হস্তক্ষেপ বা বাধাদান করা।

যখন সুহায়েলকে মুহাম্মদের তাঁবুতে আনা হলো, মুহাম্মদকে তার ঘনিষ্ঠ লোকেরা ঘিরে ধরে ছিল। তারা সবাই পা জোড়া করে বসে ছিল। মুহাম্মদের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল শিরোস্ত্রাণ সহ মুখোশ পরা সাধারণ যোদ্ধারা। যোদ্ধারা সুহায়েলকে সবার সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করল এবং তাদের একজন তাকে সতর্ক করে দিল যে, সে যেন 'আল্লাহর নবীর' সাথে কথা বলার সময় তার কণ্ঠস্বর উঁচু না করে। সুহায়েল প্রথমে মুহাম্মদের শিবিরের বিরুদ্ধে মক্কাবাসীদের হয়রানির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন যে, যারা তাদের হয়রানি করেছে তাদের মক্কায় কোন স্থান নেই। তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাদের মতামতও গ্রহণ করা হবে না। মুহাম্মদ বন্দিদের অদল-বদল করতে সম্মত হন। উসমান ও তার সঙ্গীদের বিনিময়ে তিনি মক্কাবাসী বন্দিদের ফেরত দেবেন বলে দেন।

বন্দিদের বিনিময় সম্পন্ন হওয়ার পর সুহায়েল ও মুহাম্মদ একটি চুক্তিতে মনোনিবেশ করেন যেটা হুদাইবিয়ার চুক্তি নামে পরিচিত। শর্ত অনুযায়ী, মুহাম্মদকে ঐ বছর মক্কায় প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে না, কিন্তু পরের বছর তিনি ফিরে আসতে পারবেন। মক্কাবাসীরা তাকে পরের বছরের একই মাসে তীর্থযাত্রার অনুমতি দিল, কিন্তু তাকে সেটিও তিনদিনের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে, এবং তাকে এবং তার অনুসারীদের শুধুমাত্র তলোয়ার কোষে রেখে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। অন্য কোন অস্ত্র অনুমোদিত হবে না। উপরন্তু, উভয়পক্ষ দশ বছরের যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে, এবং যুদ্ধবিরতির এই চুক্তির মাধ্যমে মক্কাবাসীরা সিরিয়ায় তাদের বাণিজ্য পুনরায় শুরু করার অনুমতি পাবে। অধিকন্তু, চুক্তির মাধ্যমে এই অঞ্চলের গোত্রগুলির মধ্যেকার গোপন চুক্তি এবং জোটবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। গোত্রবাসী যাদের খুশি তাদের সাথে যুক্ত হতে পারবে, তবে এটি অবশ্যই প্রকাশ্যে করতে হবে (১১)।
চুক্তিতে মক্কাবাসী তরুণদের মক্কায় ফিরিয়ে আনার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল, যারা তাদের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মদের সাথে ইয়াছরিবে যুক্ত হয়েছিল। তবে মক্কাবাসীরা মক্কায় আশ্রয় নেয়া ইয়াছরিবিদের ফিরিয়ে দিতে বাধ্য না - এই ধারাটি যুক্ত ছিল কারণ মক্কাবাসী তরুণদের মধ্যে সুহায়েলের ছেলে আবু জান্দালও ছিল।

এই সমস্যার শুরু হয়েছিল প্রায় দুই দশক আগে, মুহাম্মদ যেদিন থেকে তার ধর্মপ্রচার শুরু করেন। মক্কাবাসী অন্যান্য বিদ্রোহী যুবকদের মতই সুহায়েলও তার ছেলেকে বন্দি করে রেখেছিলেন যখন সে মুহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করেছিল। তারা শর্তাবলীর বিষয়ে সম্মতিতে আসার পর মুহাম্মদ আলীকে চুক্তিটিকে চামড়ার কাগজে লিখতে বলেন। কিন্তু সুহায়েল উদ্বোধনী শব্দের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। আলী লিখতে শুরু করেন : "অসীম দয়ালু, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। এই হচ্ছে শান্তিচুক্তি যা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ উপসংহার টেনেছেন।"

সুহায়েল বললেন, "আমরা যদি জানতাম যে আপনি ঈশ্বরের রাসূল, তাহলে আমরা তো আপনাকে মন্দিরে যেতে বাধা দিতাম না এবং আপনাদের সাথে যুদ্ধ করতাম না"। তিনি মুহাম্মদকে বরঞ্চ 'আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ' এটি লিখতে বললেন।

মুহাম্মদ বললেন, "আল্লাহর কসম! তোমরা আমাকে বিশ্বাস না করলেও আমি ঈশ্বরের রাসূল"। কিন্তু শেষমেষ সুহায়েলের কথাই থাকে (১২)।

মুহাম্মদের অনুসারীরা এই চুক্তিতে অসন্তুষ্ট ছিল, বিশেষ করে উমর। তারা এতটা পথ এসেছিল, কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল যে তারা তীর্থযাত্রা পালন করতে পারবে, কিন্তু এখন তাদের ইয়াছরিবে ফিরে যেতে হবে। অথচ মুহাম্মদের স্বপ্নের কারণেই তীর্থযাত্রার সূত্রপাত ঘটে, যেখানে তিনি দেখেছেন যে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করছেন। উমর এবার মুহাম্মদ এবং আবু বকরের কাছে অভিযোগ করেন যে, তিনি মনে করেন এই চুক্তির মাধ্যমে পৌত্তলিকদের উপকার করা হয়েছে এবং নিজেদের ধর্মকে খর্ব করা হয়েছে। তিনি তীব্র ভাষায় বললেন, "আমরা কি তাহলে বিশ্বাসী নই এবং তারা কি অবিশ্বাসী নয়? আমাদের মৃতরা কি জান্নাতে নেই এবং তাদের মৃতরা কি জাহান্নামে নেই? আমরা কীভাবে এমন লোকদের সাথে চুক্তি করতে পারি যাদেরকে আমাদের হত্যা করা উচিত?" মুহাম্মদ তাকে থামিয়ে দিলেন। যদিও আপাতদৃষ্টে এই চুক্তিটি মক্কাবাসীদের জন্য আরো উপকারী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তিনি আসলে তার জন্য এই চুক্তিকে বিজয় হিসেবেই দেখেছেন। তিনি যা আশা করেছিলেন তারচেয়ে অনেক বেশি এই ভ্রমণ থেকে পেয়েছেন। তিনি ইয়াছরিবের উত্তর দিকের ইহুদি গোত্রগুলি এবং উত্তর-পূর্বের পৌত্তলিক আদিবাসীদের থেকে ক্রমবর্ধমান হুমকির সম্মুখীন হচ্ছিলেন। তিনি গোয়েন্দা তথ্য পেয়েছিলেন যে, খাইবারের ইহুদিরা ফাদাকের ইহুদি, ওয়াদি আল-কুরা এবং অন্যান্য উত্তরাঞ্চলীয় ইহুদিদের সাথে জোট বেঁধেছে। শক্তিশালী গাতফানরা এবং অন্যান্য যাযাবর গোত্রবাসীও তার বিরুদ্ধে জোট করছে। যদি তারা কখনো তাদের বাহিনীকে একত্রিত করে ফেলে তাহলে তারা মুহাম্মদকে পিষে ফেলার ক্ষমতা রাখে। তাই মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধবিরতির চুক্তি তাকে তার উত্তরের শত্রুদের উপর মনোনিবেশ করতে সাহায্য করবে।

মুহাম্মদের চিন্তা ছিল বিস্তৃত যা উমর বুঝতে পারেননি। তীর্থযাত্রীরাও অসন্তুষ্ট হন। মুহাম্মদ হুদাইবিয়া থেকে যখন সবকিছু গুছিয়ে নেয়ার আদেশ দিলেন তখন তীর্থযাত্রীরা আরো বেশি অসন্তুষ্ট হলো। তীর্থযাত্রায় বাকি ছিল তাদের দাড়ি, গোঁফ এবং চুল কাটা; কোরবানির পশু জবাই করা, এবং তারপরেই তারা তাদের স্বাভাবিক কাপড়চোপড় পরে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে। বিরোধীপক্ষের লোকজন যারা চুক্তি করতে এসেছিল মুহাম্মদ পথে তাদেরকে একটু এগিয়ে দিলেন, তারাও চলে গেল। মাথার চুল কামানোর পর মুহাম্মদ চিৎকার করে বললেন, "আল্লাহর নামে, যিনি সবচেয়ে মহান" (১৩, ১৪)। এরপর বর্শা দিয়ে তার উৎসর্গ করার জন্য রাখা উটের গলাটি কেটে ফেললেন। তার উদাহরণ অনুসরণ করে তীর্থযাত্রীরাও অন্যান্য কোরবানির উট জবাই করল, এবং তারা সারাদিন সেগুলোকে রোস্ট বা ভেজে মাংস খেল। ফেরার পথে উমর মুহাম্মদের সাথে চুক্তি নিয়ে তর্ক করার জন্য আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এই ভয়ে যে, তিনি হয়তো মুহাম্মদের সাথে তর্কের জন্য জাহান্নামের আগুনে নিজেকে নিক্ষেপ করলেন! যদিও তিনি বেশ বদমেজাজি ছিলেন তবুও মুহাম্মদের উপস্থিতিতে তিনি অস্বাভাবিকভাবে নিচু স্বরে কথা বলতেন এবং মাঝেমাঝে এত নিচু কণ্ঠে কথা বলতেন যে, মুহাম্মদ উমরকে আরো জোরে কথা বলতে বলতেন। যখন চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ বা এর দুরভিসন্ধি তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন তার ভীতি হারিয়ে গেল এবং আসল উমরকে দেখা গেল। তিনি শুধু যে জোরে জোরে এবং আপত্তিকর কথাবার্তা বলেছিলেন তাই শুধু নয়, তিনি অভদ্র আচরণও করেছেন। তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে নিখুঁত মানুষ যাকে আল্লাহ তার দূত হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তার সাথেই অভব্য আচরণ করেছেন!

এখন উমর ভীত হয়ে পড়লেন যে, আল্লাহ হয়তো তার অভদ্র আচরণের জন্য তাকে মোনাফেক, নকল বিশ্বাসী বলে অভিহিত করে আয়াত 'প্রেরণ করবেন', এবং অনন্তকাল নরকের আগুনে পোড়ানোর জন্য উমরের ভাগ্য নির্ধারণ করে ফেলবেন। উমরের উদ্বেগ প্রকাশ পায় যখন তীর্থযাত্রীদের দীর্ঘ সারি উত্তরদিকে ঘোড়া বা উটের উপর আরোহণ করছিল। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার আশঙ্কা আরও বেড়ে গেল যখন তাঁর উট মুহাম্মদের উটের কাছাকাছি এবং একই কদমে হাঁটার পরও মুহাম্মদ তাঁকে উপেক্ষা করলেন।

এটি তিনবার ঘটল যা উমরকে আতঙ্কিত করে তোলে। মনে হচ্ছিল যেন তার পেট থেকে সবকিছু তার গলায় ওঠে আসছে। তিনি নিজেই নিজেকে বললেন, "তোমার মা তোমাকে হারিয়েছে হে উমর!"(১৫)
উমর তার উটকে দীর্ঘ সেই সারির মাথায় যেতে প্ররোচিত করলেন যাতে তার বিরুদ্ধে যখন ঐশ্বরিক নিন্দার আয়াত আসবে সেসব তার কানে অন্তত না আসে। এই কথা ভাবার বেশ কিছুক্ষণ পরই একজন ঘোষক তার নাম ধরে ডাকলেন যে, মুহাম্মদ তাকে ডেকেছেন। তিনি মনে মনে বলেন, "এইবার শেষ!" এবং তার উটকে মুহাম্মদের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। কিন্তু যখন তিনি মুহাম্মদের কাছে পৌঁছলেন উমর বুঝতে পারলেন যে, মুহাম্মদ তার কল্পনাশক্তি উমরের কাছ থেকে দূরে সরিয়েছেন যথাযথ কারণেই। মুহাম্মদ উমরের সালামও শোনেননি, কারণ তিনি ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করছিলেন! তিনি এখন উমরকে আনন্দের সাথে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, "হে উমর, আমার কাছে একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যা সূর্য ওঠার চেয়ে আমার কাছে প্রিয় (১৬)। তিনি হুদাইবিয়া ত্যাগ করার পর থেকে একটি নতুন অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটি পাঠ করেন : "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি" (১৭)। তিনি আরো বললেন, ঈশ্বর তাকে ক্ষমা, সাহায্য ও ভালো আচরণের এক আনন্দময় বন্ধন দিয়েছেন, আর তিনি তার অনুসারীদের মহত্ত্বের নিশ্চয়তা দিয়েছেন যারা ঈশ্বর ও তার রাসূলের অনুগত।

কোরআনের এই শব্দগুলো মুহাম্মদের কাছে পৌঁছেছে, এই কথা তীর্থযাত্রীদের কানেও পৌঁছে গেছে। মুহাম্মদ সেটা আবৃত্তি করছেন, লোকজন তাদের উটগুলোকে থামিয়ে মোহাম্মদের কাছে দ্রুত এলো আবৃত্তি শুনতে। মুহাম্মদের তেলাওয়াতের অধিকাংশই ছিল আদর্শ রচনা, যা এমন : মুমিনরা অনন্ত জান্নাতে একটি স্থান অর্জন করবে যার নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে, অন্যদিকে মোনাফেক ও বহুশ্বরবাদীরা যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য অনন্ত আগুন নির্ধারিত থাকবে। তিনি তীর্থযাত্রার প্রধান ঘটনাগুলো পুনরায় তুলে ধরলেন। তিনি সেসব লোকদের সমালোচনা করেছেন যারা তার সাথে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং তার অজুহাত নিয়ে ঠাট্টা করেছে। তিনি তাদের প্রশংসা করলেন যারা হুদাইবিয়াতে তার পক্ষে মৃত্যুবরণ করার অঙ্গীকার করেছে। তিনি বললেন যে, আল্লাহ তাদেরকে মক্কায় যুদ্ধ করা থেকে দূরে রেখেছেন কারণ শহরে হয়ত নিরপরাধ, গোপনে বিশ্বাসীরা লুকিয়ে আছে যারা নিহত হতে পারে। এরপর ঐশ্বরিক বাণী শোনালেন, "যদি তারা বিচ্ছিন্ন থাকত, তাহলে আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দিতাম" (১৮)। মুহাম্মদের পবিত্র মন্দিরে প্রবেশের স্বপ্ন ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে পূরণ হবে - আল্লাহ চাইলে, অবশ্যই হবে।

কোরআনের এই অধ্যায়ে যা আশ্চর্যজনকভাবে নতুন সংযোজন ছিল তা হলো জিহাদের ঘোষনা। জিহাদ এখন থেকে বাধ্যতামূলক। এর আগে যুদ্ধে যাওয়া ছিল ঐচ্ছিক কাজ এবং অনেকে তা এড়িয়ে গিয়েছিল। তাই সামনে যুদ্ধে না যাওয়ার একমাত্র অজুহাত হবে অন্ধত্ব, বিশেষ অসুবিধা এবং অসুস্থতা। মুহাম্মদ এই দাবিকে বেহেশতে যাবার চাবির সাথে তুলনা করে বলেছেন, যারা তার যুদ্ধ করার আদেশ পালন করে যুদ্ধে যাবে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে জান্নাত; আর যারা অমান্য করবে তাদের শাস্তি হবে জাহান্নামে। তিনি হুদাইবিয়াতে যারা তার হয়ে যুদ্ধ করতে অঙ্গীকার করেছিল তাদেরকে আসন্ন গনিমতের প্রতিশ্রুতি দেন, এই প্রতিশ্রুতিটি বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করেন কোরআন দিয়ে এভাবে - "আল্লাহ শীঘ্রই তাকে একটি বড় প্রতিদান দেবেন"(১৯) এবং সেখানে তিনি "অনেক মুনাফা অর্জন করবেন" (২০) এবং "আল্লাহ তোমাদেরকে অনেক বড় কিছুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা তোমরা শীঘ্রই অর্জন করবে" (২১)।

এটা সম্ভবত তার জীবনের সেরা বিচক্ষণতা প্রদর্শন। তিনি তার প্রিয় নারী উট কাসওয়ার উপর বসেছিলেন। তিনি তার উটের সাথে শান্ত সুরের মুর্ছনায় কথা বললেন যা তার পালক মাতা হালিমার কাছ থেকে শিখেছিলেন, তার শক্তিশালী কণ্ঠস্বর অনেক দূরে পর্যন্ত শোনা গেল। পনেরোশত লোক উপস্থিত ছিল, সম্ভবত তার মধ্যে অর্ধেক সত্যিকারের বিশ্বাসী ছিল। বাকিরা ছিল দর্শকের মতো যারা তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি বা পুরোপুরি অবিশ্বাস বা অস্বীকার করেনি। অনেকেই

তাদের সর্বোত্তম স্বার্থ ও সুবিধা নেয়ার জন্য নামমাত্রই মুহাম্মদের ধর্মে যোগ দিয়েছিল, এবং এরা ছিল সুযোগসন্ধানীও যারা দূর থেকে ভালো অর্থ উপার্জনের একটি সুযোগের গন্ধ পেয়েই দলে ভিড়েছিল। কিন্তু সত্যিকারের বিশ্বাসীদের জন্য, এটি ছিল জাদুকরী মুহূর্ত। এর আগে তারা তাদের প্রিয় নবীকে আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করতে দেখেনি, কিন্তু এখানে সেটিই তাদের চোখের সামনে উন্মোচিত হয়েছে। আল্লাহ এখন মুহাম্মদের মাধ্যমে মানুষের সাথে যোগাযোগের ঐশ্বরিক ইচ্ছা প্রকাশ করছেন! তাদের মধ্যে যারা যত বেশি কল্পনাপ্রবণ ছিল তাদের যেন দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল যে, আকাশ থেকে আলোর রশ্মি নেমে আসছে, আকাশের ফেরেস্তারা তা নামিয়ে দিচ্ছে। এটা বলাই যায়, তারা একটি রোমাঞ্চকর অনুভূতি অনুভব করেছিল, বিশেষ করে মুহাম্মদ যখন তাদের জন্য গনিমতের মালের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিলেন।

খুব দ্রুত মুহাম্মদের এই চুক্তির পরীক্ষা দিতে হয় যখন আবু বাসির (Abu Basir) নামের মক্কার এক যুবক ধর্মান্ধরিত হয়ে ইয়াছরিবের মসজিদে এসে মুহাম্মদের কাছে আশ্রয় চায়। মক্কাবাসীরা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে আটকে রেখেছিল, কিন্তু সে পালিয়ে পায়ে হেঁটে ইয়াছরিবে পৌঁছে যায়। মক্কাবাসীরা মুহাম্মদের কাছে একজন পুরস্কার-লোভী (মদিনা থেকে ওদের লোক ধরে আনতে পারলে পুরস্কার) বার্তাবাহককে পাঠিয়ে আবু বাসিরকে ফেরত চায়, এবং হুদাইবিয়া চুক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। মুহাম্মদের আর কোন উপায় থাকল না তাকে ফিরিয়ে না দিয়ে। পুরস্কার-লোভী লোকটি আবার আবু বাসিরের উপর নজর রাখতে তার সাথে একজন মুক্ত দাসকে (যে দাস দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে) সাথে নেন। কিন্তু শহর থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে, আবু বসির পুরস্কার-লোভীর কাছ থেকে তার তলোয়ারটি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে হত্যা করে বসে। মুক্ত দাসটি তার জীবন নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আবু বাসির দাসের পেছনেও ধাওয়া করে, কিন্তু দাসটি দৌড়াতে দৌড়াতে মসজিদের মধ্যে ঢুকে মুহাম্মদের দয়া ভিক্ষা করেন। খুনি আবু বাসির তার শিকারের (নিহতের) জিনিসপত্র নিয়ে নিহতের উটে চড়েই কিছুক্ষণ পরেই হাজির হয়। সে মুহাম্মদকে বলে যে, সে সত্যিকারের বিশ্বাসীদের মতো আচরণ করেছে এবং মুহাম্মদকে সে তার প্রাপ্ত মাল থেকে এক পঞ্চমাংশ দেয়ারও প্রস্তাব দেয়, কিন্তু মুহাম্মদ তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন “যদি আমি এক পঞ্চমাংশ নিই, তাহলে তারা ভাববে যে আমি তাদের সাথে আমার চুক্তি ভঙ্গ করেছি”(২২)। যখন ভীত মুক্ত দাসটি আবু বাসিরকে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে কিছু করতে নারাজ হয়, তখন মুহাম্মদ আবু বাসিরকে ইয়াছরিব থেকে নির্বাসিত করে দেন। এখন সে একজন বিতাড়িত। আবু বাসির এরপর লোহিত সাগরের উপকূলে গিয়ে দ্রুত একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে এবং শীঘ্রই সুহায়েলের ছেলে আবু জান্দাল সহ আরও সত্তর জন তরুণ মক্কাবাসী এই দলত্যাগীদের সাথে যোগ দেয়। তারা আবু বাসিরকে তাদের নেতা হিসেবে নিযুক্ত করে, দিনে পাঁচবার একসাথে প্রার্থনা করে, মক্কাবাসীদের কাফেলা আক্রমণ করে এবং তাদের হাতের কাছেই যাদের পায় তাদের সবাইকে হত্যা করে। পরিস্থিতি এতটাই হয়ে ওঠে যে মক্কাবাসীরাই শেষপর্যন্ত মুহাম্মদের কাছে আহবান করে তাদের সবাইকে তার কাছেই ফিরিয়ে নিতে - চুক্তি যাই হোক না কেন। মুহাম্মদ তাদের ফিরিয়ে নিলেন (২৩)।

আরেকটি পরীক্ষা আসে যখন মক্কা থেকে ধর্মান্তরিত একজন নারী ইয়াছরিবে পালিয়ে আসে এবং আশ্রয় চায়। তিনি ছিলেন উকবাহ ইবনে আবু মুয়াইতের কন্যা, যে উকবা একসময় নামাজরত অবস্থায় মুহাম্মদের পিঠে উটের নাড়িভুঁড়ি ছুঁড়ে দিয়েছিল। বদর যুদ্ধের পর মুহাম্মদ উকবার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। মেয়েটির দুই ভাই দ্রুত সময়ের মধ্যে ইয়াছরিবের এসে তাদের বোনকে ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানান, কিন্তু মেয়েটি ভনিতা করে বলেন : “হে আল্লাহর রাসূল, আমি আমার ধর্ম নিয়ে আপনাদের কাছে পালিয়ে এসেছি, তাই আমাকে আপনি রাখেন এবং আমাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন না। তারা আমাকে ধর্মপালনে বাধা দেবে এবং আমাকে কষ্ট দেবে। ব্যথা নেয়ার মতো আমার আর ধৈর্য নেই। আমি একজন নারী এবং নারীরা দুর্বল, আপনি সেটা জানেন (২৪)।

একজন বিশ্বস্ত নারীকে পৌত্তলিকদের আস্তানায় ফিরিয়ে দেয়ার বিষয়টি নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর মুহাম্মদ একতরফাভাবে হুদাইবিয়া চুক্তির শর্তাবলী পরিবর্তন করলেন, যেখান থেকে নারীদের জোরপূর্বক প্রত্যাবাসন বাদ দেন। তিনি

তার সমর্থনে নতুন কোরআনের নতুন অধ্যায় বা সূরা নিয়ে আসেন যা পরবর্তীতে আল মুমতাহিনা বা 'The Woman to Be Examined' কোরআনে সংযুক্ত হয়। মুহাম্মদ সেখানে তার আল্লাহর কণ্ঠে বলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কাছে মু'মিন মহিলারা হিজরত করে আসলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখ। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে অধিক অবগত। অতঃপর যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন মহিলা, তাহলে তাদেরকে আর কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিও না।" (২৫)

মসজিদে তার নতুন আয়াত প্রকাশ করার পর মুহাম্মদ নারীর ভাইদের জানান যে তিনি দুঃখিত, কিন্তু তিনি আল্লাহর আইন মেনে চলতে বাধ্য এবং তার বোনকে ইয়াছরিবে রাখতে **বাধ্য। তবে একই অধ্যায়ের আরেকটি আয়াতে তিনি মক্কাবাসীদের ইয়াছরিব থেকে পালিয়ে যাওয়া বিবাহিত নারীদের তাদের কাছে রাখার অনুমতি দেন তবে যদি তারা এর জন্য বিবাহিত নারীদের পরিত্যক্ত বরদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন।** এই আয়াতটি উমরের দুইজন স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। অবশ্যই উমরের স্ত্রীরা উমরের উপর এবং একইসাথে মুহাম্মদের ধর্মের প্রতি বিরক্ত হয়ে মক্কায় পালিয়ে যায় এবং ইয়াছরিবে ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানায়। উমর তাদের তালাক দিয়ে দেন। পরবর্তীতে এ দুজনের মধ্যে একজন আবু সুফিয়ানের এক ছেলে মুয়াবিয়াকে বিয়ে করেন। ঐতিহ্য অনুযায়ী, উমরকে ক্ষতিপূরনের জন্য কখনোই দেনমোহরের অর্থ দেয়া হয়নি।

অধ্যায় - ২৭

মানব জাতির প্রতি ঈশ্বরের করুণা

“আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল দয়াস্বরূপ প্রেরণ করেছি।” — কোরআন, ২১:১০৭

হুদাইবিয়ায় মুহাম্মদ তার হতাশ অনুগামীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ‘অনেক গনিমতের মালের’ (যুদ্ধের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ) যেটা ছিল মূলত খাইবারের ইহুদিদের সম্পদ। যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে মুহাম্মদ মক্কাবাসীদের হুমকিকে ঠেকাতে পেরেছিলেন, ফলে খাইবারের ইহুদিদের উপর আক্রমণ করে তাদের সর্বস্ব লুটে নেয়া তার পক্ষে সহজ হয়েছিল এবং এমনটাই তিনি ইয়াছরিবের ইহুদিদের সাথেও করেছিলেন। বেশ কয়েক মাস ধরে মুহাম্মদ নিজের ভেতরেই তার এই ভাবনাটি রেখেছিলেন, তারপরে একদিন তার সাথে একত্রিত হওয়া লোকদের সাথে নিয়ে হুদায়বিয়ায় দিকে যাত্রা শুরু করেন। এইবারের লক্ষ্যবিন্দু খাইবার, এমন খবর চারপাশে ছড়িয়ে পড়লে অনেকেই যুদ্ধে নাম নিবন্ধন করতে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু মুহাম্মদ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ তারা সেই তীর্থযাত্রার অংশ ছিল না। তাঁর ধর্মে যোগ দেয়ার উদ্যেশ্যে নয়, কেবলমাত্র লুটের আকাঙ্ক্ষার জন্যই যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবী হতে চাওয়ায় মুহাম্মদ এই লোকদের অভিযুক্ত করেছিলেন। তিনি এদের জন্য শর্ত জুড়ে দিলেন যে, তোমরা যোগ দিতে পার তবে শুধুমাত্র উদ্দেশ্য (জিহাদের মাধ্যমে কাফেরদের আতঙ্কিত করা) হাসিলের জন্য; লুটের মালের ভাগ পাবে না। লুটের মাল দেওয়া থেকে বঞ্চিত করাটা ছিল তার অনুসারীদের জন্য একটা শিক্ষা, এবং এর ফলে যোদ্ধা পাওয়া গেল মাত্র পনেরোশো।

খাইবার মরুদ্যান পশ্চিম আরবের অন্যতম ধনী অঞ্চল ছিল। এটি ছিল একটি সরু, সর্পিলাকার উর্বর উপত্যকা যা প্রাচীন এক বালির মাঠের মাঝে গড়ে উঠেছিল। এটি হিজাজের (Hijaz) খেজুরের ভাণ্ডার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল এবং এর শাকসবজি, শস্য, রেশমী পোশাক, ধাতব সরঞ্জাম এবং যুদ্ধের সরঞ্জামগুলির জন্যও বিখ্যাত ছিল। রক্তের সম্পর্ক ও ধর্মের সম্পর্কের মাধ্যমে লোকেরা একে অন্যের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে, প্রায় অর্ধ ডজন গোত্র খাইবার দুর্গ এবং আশেপাশের গ্রামগুলিতে বাস করত। গ্রামগুলোর প্রতিটিতে তাদের নিজদের লাগানো বৃক্ষ এবং ক্ষেতখামার ছিল। কিছু বাগানের আকার ছিল শিল্পবাণিজ্যের এলাকার মতো - একটিতে চল্লিশ হাজার খেজুর গাছ, আর অন্যটি বারো হাজার খেজুর গাছ দিয়ে সমৃদ্ধ। বাইরের বিশ্বের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্কের কারণে তারা বেশ জাকজমক জীবনযাপন করত। বিলাসিতার বিভিন্ন উপাদান নিয়ে খাইবারের ইহুদিরা উন্নত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাই অনুন্নত অঞ্চলের লোকেরা তাদের ঈর্ষা করত।

বিশাল লুটের সম্ভাবনা বাদ দিলেও, এই আক্রমণ ছিল মুহাম্মদের মতাদর্শ থেকেই অনুপ্রাণিত। ইয়াছরিবের ইহুদিদের মতো খাইবারের ইহুদিরাও তার ধর্ম গ্রহণ করতে এবং তাকে তাদের আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল। এর বদলে তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল। একাধিকবার তিনি খাইবারের ইহুদিদের কাছ থেকে গোপন সূত্রে জানতে পেরেছিলেন যে, তার বিরুদ্ধে সহায়তা করার জন্য তারা গাতফানীদের তাদের উৎপাদিত খেজুরের একটি অংশ উপহার দিয়েছিল। এটিকে তার উপর হামলার ষড়যন্ত্রের প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করলেন মুহাম্মদ, তবে মনে হচ্ছিল যে, ইহুদিদের উদ্দেশ্য আক্রমণাত্মক নয় বরং রক্ষণাত্মক ছিল। মুহাম্মদের যুদ্ধের সরঞ্জামাদি এবং সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, আর এদিকে খাইবারবাসী আসন্ন হামলা থেকে তাদের মরূদ্যানকে রক্ষা করতে গাতফানীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। খাইবারবাসীর কাছে যখন মুহম্মদের আসন্ন হামলার খবর পৌঁছল তখন ইয়াছরিব থেকে বহিষ্কৃত বানু নাযীর নেতা কিনানা (Kinana) যিনি পরবর্তীতে খাইবারে বসতি গড়েছিলেন তিনি গাতফান নেতাদের কাছে সামরিক সহায়তা চাইতে দ্রুত ছুটে যান।

অতর্কিতে হামলার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ উত্তরে দিকে বজ্রগতিতে যাত্রা শুরু করেন। মাত্র তিনদিনের মধ্যেই ইয়াছরিব এবং খাইবারের মধ্যেকার দূরত্বটি তিনি অতিক্রম করলেন। এরপর মুহাম্মদ তার দূতদের আগাম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গুজব

ছড়াতে যে, মুহাম্মদের সেনাদল মরুভূমির মালভূমিতে অবস্থিত উন্মুক্ত গাতফান শিবিরগুলির দিকে যাচ্ছে। বিস্তৃত বালির পটভূমির যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই এই মালভূমির (গাতফানীদের এলাকা) শুরু। কৌশলটি বেশ কাজে দিয়েছে! ইসলামের ঐতিহাসিক গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, গাতফান সৈন্যবাহিনী ইতিমধ্যেই খাইবারে পৌঁছেছিল বা মাঝপথে ছিল, কিন্তু যখন তাদের নিজের লোকেদের বিপন্ন হওয়ার ভুয়া খবর তাদের কানে এলো তখন তারা তাদের নিজেদের অঞ্চলে আবার ফিরে গিয়েছিলেন। খাইবারের নিকটে পৌঁছার পরে মুহাম্মদ তার সেনাদল নিয়ে শিবির স্থাপন করেছিলেন। মুহাম্মদের সেনাদলের মধ্যে একশো থেকে দু'শো অশ্বারোহী ছিল। কৌশলগতভাবে তিনি এমন একটা জায়গা বেছে নিলেন যা ছিল একটি গিরিপথ। এখানে ঘাঁটি গাড়ার ফলে গাতফানীদেরকে মুহাম্মদী বাহিনীর দিকে আসার রাস্তা বন্ধ করে দিতে তারা সক্ষম হবে, এবং এভাবেই মুহাম্মদ তার বাহিনীকে পেছন দিকে থেকে আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে সুরক্ষিত করেছিলেন।

শিবিরটি খাইবার থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে ছিল এবং এটি ছিল আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ের ঘাঁটি। আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু হয় ভোরে। অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে, উপত্যকার পথ বালির মাঠের খাঁজগুলোর কিনারায় চলে গিয়েছিল মুহাম্মদের হানাদার বাহিনী। যুদ্ধনীতি অনুযায়ী, মুহাম্মদ আক্রমণ শুরু করার আগে সর্বদাই ফজরের আজানের জন্য অপেক্ষা করতেন। আক্রমণ শুরুর আগে এটি হয়তো তার কানে সংগীতের মূর্ছনার মতো কাজ করত। কারণ এটা ভাবা অবাস্তব হবে যে, তিনি কোনও ইহুদি সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তার প্রার্থনা আহ্বানের সাড়া আশা করছেন যারা তার প্রতি স্পষ্টভাবেই বৈরীভাবাপন্ন ছিল। সর্বোপরি, এটিই মুহাম্মদের রণনীতি ছিল। তিনি যা কিছু করেছিলেন তাই হচ্ছে তার সুন্নাহ - তার জীবনাচরণ, যা মূলত 'আল্লাহর সন্তুষ্টির' জন্যই তিনি করতেন। মুমিনদের জন্য শুধু কোরআনের নির্দেশাবলী অনুসরণ করাই বাধ্যতামূলক ছিল না, বরং এর পাশাপাশি মুহাম্মদের সুন্নাহও পালন করতে হবে। তাই তিনি তার নিয়মের ব্যাপারে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বেশ যত্নবান ছিলেন এবং ইহুদিদের প্রার্থনা আহ্বানের সাড়া দেয়ার অপেক্ষায় ছিলেন, যদিও তিনি জানতেন যে এটি কখনোই হবে না। কথিত আছে যে, তিনি নামাজের পাশাপাশি খাইবার উপত্যকার গনিমতের মাল ও বন্দিদের লাভ করতে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা কবুল করার ফরিয়াদ করেছিলেন। প্রার্থনার চূড়ান্ত বাক্যসমুহ তার মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের একটি পাঠ্যপুস্তকীয় নমুনাকেই যেন প্রকাশ করছে, যার উদাহরণ হচ্ছে তার এই প্রার্থনাটি : "এবং আমরা এর অনিষ্ট থেকে, এর লোকেদের অনিষ্ট থেকে এবং এতে যা আছে তার অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি!" (১)

সেখানে অসংখ্য ইহুদি দুর্গ ছিল। দুর্গগুলো তিনটি বড় গুচ্ছের আকারে পুরো উপত্যকা জুড়ে লম্বালম্বিভাবে ছড়িয়ে ছিল। সবুজ রঙের খেজুর গাছের মাঝখানে এর পাথরের কাঠামোগুলো স্থাপন করা হয়েছিল। গোত্রের প্রধান প্রধান বংশগুলোর দুর্গসমূহ হয় উপত্যকার বালির মাঠের চূড়ায় নির্মিত হয়েছিল, অথবা উপত্যকার মাঝেই উঁচু পাথরের উপরেই নির্মিত হয়েছিল। সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল একটি পাহাড়ের উপরে নির্মিত দুর্গ, যা গাছের চূড়া থেকেও একশো ফুটের বেশি উঁচুতে দাঁড়িয়ে ছিল। দুর্গটিতে একটি গোপন পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ছিল - একটি ঝর্ণার পানির স্রোতের গতিপথ পরিবর্তন করে পাথরের ভিতর দিয়ে একটি খাঁড়ি খোদাই করে পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যেখান থেকে উঁচুতে থাকা দুর্গের পানি সরবরাহ করা হতো। ইহুদিদের স্বাভাবিকভাবেই ভোরে ওঠার অভ্যাস ছিল। ভোরের আলো বাড়ার সাথে সাথে আক্রমণকারীরা দেখল ইহুদিরা তাদের বাড়িঘরের রক্ষা করার কাজে না নেমে বরং তাদের কোদাল, বেলচা এবং অন্যান্য কৃষিজাত সরঞ্জাম দিয়ে তাদের প্রতিদিনের কাজে লেগে পড়েছে। ইহুদিরা একটা আক্রমণের আভাস পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বুঝতে পারেনি যে এটি একেবারে তাদের দোরগোড়ায় চলেই এসেছে। "আল্লাহু আকবর! আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ! খাইবার ধ্বংসপ্রাপ্ত!" এটি চিৎকার করে বলেই মুহাম্মদ আক্রমণের সংকেত দিলেন। (২) এরপর ঘোড়ার পিঠে এবং দ্রুতগামী উটের পিঠে চড়ে তারা "হে বিজয়ীরা, হত্যা কর, হত্যা কর" বলতে বলতে চিৎকার করে খাইবার উপত্যকা জুড়ে তারা ছড়িয়ে পড়ল (৩)। ইহুদিরাও সর্বত্রই পাগলা ঘন্টা বাজিয়ে দিল : "মুহাম্মদ আসছে! মুহাম্মদ আসছে!!"

হানাদারদের বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা করার জন্য ইহুদিরা তাদের যোদ্ধাদের বৃহৎ সেনাদল নিয়ে আসার পরিবর্তে বরং তারা আক্রমণটিকে প্রলম্বিত করার আশায় নিজেদেরকে আলাদা আলাদা দূর্গে আবদ্ধ করে রাখার পথটি বেছে নিল। প্রতিটি কামরায় পর্যাপ্ত খাদ্য এবং অস্ত্র ভালোভাবে সরবরাহ করা হয়েছিল এবং জল সরবারহের ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু এই প্রতিরক্ষামূলক কৌশলটি শেষমেশ ভুল বলেই প্রমাণিত হয়েছে, যেহেতু মুহাম্মদ তাদের সর্বশেষ দুর্গটিকেও ঘিরে ফেলেছিলেন। অবরোধ শুরু হয়েছিল নাতা (Nata) নামক দুর্গটি দিয়ে। আর মূল দুর্গটি ছিল মারহাব (Marhab) নামে একজন ইহুদি যোদ্ধার মালিকাধীন। মারহাবের দুর্গের প্রধান ফটকটি অনেক পুরু হওয়ায় মুহাম্মদের সেনারা প্রায় এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চেষ্টা করছিল সেটি ভেঙে ফেলতে এবং এই পুরো সপ্তাহ জুড়ে মারহাবের দুর্গটি তারা অবরোধ করে রেখেছিল। প্রতি সন্ধ্যায় মুহাম্মদের যোদ্ধারা উপত্যকার মধ্য থেকে আক্রমণ হবার ভয়ে দূরবর্তী শিবিরের নিরাপত্তা বলয়ে ফিরে আসত। প্রথম কয়েকদিন মারাত্মক মাথাব্যথার কারণে মুহাম্মদ তার শিবিরের ভেতরে অচল হয়ে পড়ে ছিলেন। তিনি তার সৈন্যদের নিয়ে পরপর বেশ কয়েকটি আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তারা মারহাবের দুর্গে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয় এবং প্রতি রাতে আহত ও নিহত সৈন্যদের নিয়ে শিবিরে ফিরে আসতে থাকে। মুহাম্মদের অনুসারীদের মধ্যে প্রথমদিকের হতাহতের একজন হলেন মাসলামার ভাই মাহমুদ (Mahmud)। কেউ দুর্গের প্রাচীরের উপরের দিক থেকে তার উপর একটি ভারি পাথর ফেলে দিয়ে তার মাথা থেতলে দিয়েছিল। তাকে শিবিরে ফিরিয়ে আনা হয় এবং তিনদিন পর তার মৃত্যু হয়। অগ্রগতি না দেখে হতাশ হয়ে মুহাম্মদ ইহুদিদের মনোবল ভেঙে দিতে ভিন্ন উপায় হিসেবে দুর্গ থেকে দৃশ্যমান সকল খেজুর গাছ কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। কারণ তিনি জানতেন যে, প্রতিটি গাছই প্রথম জন্ম নেয়া থেকে তাদের কাছে পুত্রের মতো প্রিয় ছিল। আবু বকর তাকে অযথা বৃক্ষনিধন বন্ধ করার আবেদন করার আগপর্যন্ত চারশো গাছ ইতিমধ্যেই কাটা কাটা হয়ে গেছে। কারণ, লুণ্ঠনের মালামাল হিসেবে এই গাছগুলিও খুবই মূল্যবান।

প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে, ইহুদি যোদ্ধারা মুহাম্মদের লোকদের সাথে দ্বৈত যুদ্ধের জন্য চ্যালেঞ্জ জানাতে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। প্রথমে বেরিয়ে এসেছিল দুর্গের কর্তা, বিশালদেহী, শক্তিশালী এবং সাহসিকতার জন্য বিখ্যাত মারহাব যিনি ভারি অস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন। ইসলামের গ্রন্থে এই দ্বৈত লড়াইয়ের বিভিন্ন সংস্করণ পাওয়া যায়, যেগুলোর সবগুলোতে মারহাবের মৃত্যু হয়েছিল একথা উল্লেখ আছে। আলি চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করেছিলেন এবং মারহাবের হেলমেটের উপর হিংস্র এক আঘাত হেনে তাকে হত্যা করেছিলেন। অন্য সংস্করণে দেখা যায়, মাসলামা তার ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মুহাম্মদের কাছে মারহাবের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি চায়। মারহাবের সাথে অনেকক্ষণ তলোয়ার যুদ্ধের পর, মাসলামা মারহাবের একটি বা উভয় পা কেটে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রাখেন, কিন্তু আলী এসে তার মাথা কেটে ফেলেন এবং অস্ত্র এবং লৌহবর্ম ছিনিয়ে নেন। ফলে, লুটের মাল (মারহাবের সম্পদ) কে নেবে তা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। মুহাম্মদ সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন মুহাম্মদ বিন মাসলামার পক্ষে। কথিত আছে যে, মারহাবের ভাইয়েরা একের পর এক মুহাম্মদের লোকদের সাথে লড়াই করতে বেরিয়ে এসেছিল এবং তারাও নিহত হয়েছিল। আক্রমণকারীদের জন্য বড় একটা বিরতি মেলে যখন তারা একেকজন ইহুদিকে ধরে মুহাম্মদের দলে ভিড়তে বাধ্য করছে, নয় তাদের বন্দি করছে, নয়তো হত্যা করা শুরু করেছে। একজন ইহুদি তার নিজ গোত্রের সাথে বেইমানি করে, যখন তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় সে তখন মহাম্মদকে সহযোগিতা করার জন্য রাজি হয়। মুহাম্মদ তার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, ইহুদিরা আতঙ্কিত ছিল এবং তাদের স্ত্রী ও শিশুদের মারহাবের দুর্গ থেকে উপত্যকার আরও দূরে অন্য একটি দুর্গে নিয়ে গেছে। ইহুদিটা মুহাম্মদকে দুর্গের মধ্যে লুকিয়ে রাখা অস্ত্রশস্ত্র জব্দ করতে বলেছিল যেসব অস্ত্রের মধ্যে ছিল একটি পাথর ছুঁড়ে মারার কামান (মিনজানিক) এবং দুটি ছাদযুক্ত বিশেষ ধরনের ঢাল যেগুলো উপর থেকে ছুটে আসা তীর অথবা পাথরের আঘাত থেকে সুরক্ষা দেয়। কীভাবে গোপন পথে দুর্গের ভেতরে ঢুকতে পারবে সেটিও সে বলে দেয়ার প্রস্তাব দিল। তবে ইসলামিক গ্রন্থে একটা সম্ভাবনার কথা দাবি করা হয় যে, এই লোকটাকে দুর্গে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবং সে পরদিন ভেতর থেকে দুর্গের দরজা খুলে দিয়েছিল। এরপর বেশিরভাগ ইহুদি যোদ্ধা দেয়াল টপকে প্রতিবেশি দুর্গগুলিতে পালিয়ে যায়। আর যারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তাদেরকে

আরো জোরালো শক্তি দিয়ে হত্যা করেছিল মুহাম্মদের লোকেরা। কিছু লোক লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদেরকে খুঁজে পাওয়ার পরে জোর করে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং তাদের শিরোশ্ছেদ করা হয়েছিল।

মারহাবের দুর্গ দখলে নেয়া ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয়, কারণ এটি উপত্যকায় মুহাম্মদকে একটা ভিত্তি দিয়েছে। তিনি তার শিবিরটিকে উচ্চভূমি থেকে দুর্গে নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে তারা পাল্টা লড়াইয়ের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত একটা অবস্থানে চলে গেলেন। তার সৈন্যরা অবশ্য অভিযোগ করেছিল যে, তাদের সমস্ত রকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তার এতটা গনিমতের মাল পায়নি। তদুপরি, সেখানে খাবারের ঘাটতি ছিল। তারা ভালো থাকার উদ্দেশ্যেই কেবল ইয়াছরিব ছেড়ে খাইবার এসেছিল। তারা আশা করেছিল সেখানকার (খাইবারের) খাবার দিয়ে তারা চলতে পারবে। মারহাবের দুর্গে খাওয়ার জন্য খুব বেশি কিছু পাওয়া যায়নি, এবং এখন যা পেয়েছিল তাও শেষ হয়ে আসছে। যোদ্ধাদের অনেকেই শেষ খাবার খেয়েছিল দুর্গ জয় করার আগের দিন, এবং খাবারের অভাবের জন্য তাদেরই এক যোদ্ধা যে খুব বীরত্ব জাহির করেছিল সে-ই দায়ী ছিল। ইসলামী বইয়ে উল্লেখ আছে, কিছু ভেড়া ইহুদিদের প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তবে তারা দুর্গের প্রাচীরের কাছাকাছি এবং তীর দিয়ে শিকার করা সীমার মধ্যে ছিল। মুহাম্মদ এই ভেড়াগুলো ধরে আনতে একজন স্বেচ্ছাসেবক চেয়ে বললেন, “কে এই ভেড়াগুলোর মধ্যে থেকে আমাদের খাওয়াবে?” এক ব্যক্তি যে তার ছ্যাবলামির জন্য সুপরিচিত ছিল, জবাব দিল “আমি পারবো, হে রাসূল”। সে তার তীর-ধনুক দুই বগলের নিচে চেপে ভেড়া শিকার কররার জন্য বের হওয়ার সময়ে তার চোখ দুটো যেন আনন্দে বেরিয়ে আসছিল। মুহাম্মদ তার কাজকর্ম দেখে শিহরিত হয়ে তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানোর সমতুল্য সম্ভাষণ জানালেন, এবং তিনি আত্মহারা হয়ে বললেন “আল্লাহ সহায়, চলো আমরা সময় নিয়ে এটি উপভোগ করি!” (৪)। কিন্তু পনেরোশো লোকের মধ্যে শুধুমাত্র দুটি ভেড়া ভাগ করে দিলে কারো পেট ভরবে না। হতাশ হয়ে অবশেষে কিছু সৈন্য বেশ কয়েকটি গাধাকে জড়ো করে হত্যা করে। মুহাম্মদ যখন জানতে পারলেন ততক্ষণে হাঁড়ির ভেতরে মাংস সেদ্ধ হচ্ছিল এবং সৈন্যরা তা গোগ্রাসে গেলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তিনি সেই দৃশ্য দেখে ঘোষণা করলেন যে, গাধার মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। শূকরের মতো, গাধাও মলমূত্র খেত বলে প্রচলিত ছিল, তাই এগুলো নোংরা প্রাণী। তিনি সমস্ত রান্নার হাঁড়ি-পাতিলগুলো উল্টে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অনাহারে মরতে থাকা যোদ্ধারা দাঁতে দাঁত চেপে তা মেনে নিল।
মুহাম্মদ সেদিন নতুন নিয়ম নিয়ে আসার মুডে ছিলেন এবং তিনি নতুন আদেশের তালিকা নিয়ে এসেছিলেন। গাধার মাংসের উপর নিষেধাজ্ঞার চেয়েও খারাপ ছিল বন্দি নারীদের সাথে যৌন সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা, তবে তা বন্দি করার সময়ে কেবল। এটি একটি কঠিন আদেশ ছিল, কারণ লড়াই করে গণিমতের মাল প্রাপ্তি এবং বন্দিদের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করা ছিল মুহাম্মদের সৈনিকদের অন্যতম প্রেরণা। এটি নিয়ে এর আগে মুহাম্মদের কখনও সমস্যা হয়নি। বন্দি নারীদের সর্বদা ধর্ষণ করাই ছিল রেওয়াজ, কিন্তু তা আর বহাল রইল না। এটি আল্লাহর নিকট অসন্তোষের বিষয় হয়ে গেল। মারহাবের দুর্গের উঠোনে মোহাম্মদ তার সৈন্যদের মধ্যে দাঁড়িয়ে নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলি তালিকাভুক্ত করেছিলেন, যার শুরুটা ছিল বন্দি নারীদের সম্পর্কে : “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করে, তার পক্ষে অন্যের সাথে শুক্রাণু মিশ্রিত করা জায়েয নয়। ” (৫) তিনি এই নিষেধাজ্ঞা এত স্পষ্ট করে বললেন যাতে তার অনুসারীদের মাঝে সবচেয়ে মূর্খ লোকটিও তা বুঝতে পারে। এই নতুন হুকুমনামার অর্থ হচ্ছে, যুদ্ধবন্দি নারীরা তাদের বর কর্তৃক গর্ভবতী হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে যথেষ্ট সময় অপেক্ষা করতে হবে (ধর্ষণ করার জন্য)। তাদের মাসিক ঋতুস্রাব হতে হবে, এবং তারপরেই কেবল মুহাম্মদের সৈন্যরা তাদের যতবার ইচ্ছা পছন্দসই যৌনমিলন করতে পারবে। আর যদি দেখা যায় যে, বন্দি নারীটি গর্ভবতী তবে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তাকে স্পর্শ করা যাবে না। এখানে তিনি স্বল্পমেয়াদী (মুতা) বিবাহের রেওয়াজকেও বাতিল করেন — যেটাকে ‘আনন্দ-বিবাহ/মুতা বিবাহ” নামে ডাকা হতো, এবং এটা অনেকটা এক রাত্রিবাসের সমতুল্য। এই নতুন নিয়মে বিবাহ-বহির্ভূত সহবাসের বিরুদ্ধে তার পূর্বের রায়গুলি বিশ্বাসীদের মাঝে পরিবর্তন নিয়ে আসে, যেখানে অবিবাহিতদের যৌন সম্পর্কের জন্য চাবুক মারা এবং বিবাহিতরা ব্যভিচারে জড়িত থাকলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হতো।

অন্যান্য আদেশের মাঝে গনিমতের মালের বিষয় ছিল। লুটের মাল চুরি করা গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পূর্ববর্তী অভিযান এবং যুদ্ধে প্রাপ্ত গণিমতের মাল লুটেরাদের মাঝে ভাগ হওয়ার আগেই লোকেরা লুটের স্তপ থেকে জিনিস সরিয়ে ফেলত। মুমিনরা একটি ঘোড়া বা একটি উট ধরে নিয়ে আসত, ক্লান্ত হওয়া অবধি এটির উপর চড়ে বেড়াত, তারপরে তা ফিরিয়ে দিত। অথবা তারা পোশাক চুরি করে রেখে দিত এবং ব্যবহার করে ছিঁড়ে গেলেই তবেই তা ফেরত দিত। অথবা তারা জিনিস নিয়ে আর ফেরতই দিত না। মুহাম্মদ তাদের জানিয়েছিলেন যে, এই কাজ আল্লাহর কাছে চরম অসন্তোষজনক। এমনকি তিনিও যদি তাদের চুরি সম্পর্কে কখনো না জানতে পারেন, তবুও এই বিষয়গুলি আল্লাহর কাছ থেকে আড়াল করা অসম্ভব, কারণ আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কেই অবগত আছেন। এমনকি তারা আল্লাহর কাছ থেকে তাদের চিন্তাগুলিওকে পর্যন্ত আড়াল করতে পারেনা, লুটের মালামাল থেকে ছিঁচকে চুরি তো পরের কথা। চোরদের সতর্ক করা হয় - চুরি করা পোশাক আগুনের পোশাক হয়ে যাবে যা আল্লাহ চোরের শরীরে জড়িয়ে রাখবে; চুরি হওয়া স্যান্ডেল জ্বলন্ত পাদুকায় পরিণত হবে যা কুটিল পা গুলোকে চিরতরে ভাজতে থাকবে!

গাধার মাংসের হাঁড়িগুলি উল্টে দেয়াটা মুহাম্মদের এক অভিনব প্রেরণাদায়ক পদক্ষেপ ছিল। ক্ষুধার্ত যোদ্ধারা হিংস্র যোদ্ধা হয়ে পড়েছিল, বিশেষত কোন একবার যখন জানতে পারল যে, আক্রমণের তালিকায় থাকা পরবর্তী দুর্গটিতে অনেক খাবার মজুদ রয়েছে। বিশ্বাসঘাতক সেই ইহুদি মুহাম্মদকে জানালো যে, নাতার (Nata) দুর্গগুলির মধ্যে একটি দুর্গ আছে সাব (Sab) নামে এক ইহুদির এবং এটিতে উপত্যকার অন্যতম সেরা খানাপিনার ব্যবস্থা আছে। পরদিন মুহাম্মাদের লোকেরা মারহাবের দুর্গ থেকে বাজেয়াপ্ত একটি দেয়াল ভাঙার যন্ত্র দিয়ে দুর্গের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করল। মারহাবের দুর্গে যেমন ঘটেছিল, তেমনই এবারও বেশিরভাগ ইহুদি যোদ্ধারা দেয়াল টপকে পালিয়ে গেল এবং যারা পালাতে পারেনি তাদের হত্যা করা হলো। মুহাম্মদের সৈন্যবাহিনী ভেতরে পাওয়া খাবারের সম্ভার ভোজন করে। সেখানকার আয়োজনের মধ্যে আরো ছিল প্রচুর পরিমাণে মদের জার। মুহাম্মদ জারগুলি উল্টে ফেলে দেয়ার বা ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং মদ্যপান করার ব্যাপারে হুঁশিয়ার করলেন। কিন্তু মুমিনদের মধ্যে একজন - যাকে মাতাল আবদুল্লাহ নামে ডাকা হতো, সেই হুঁশিয়ারি মানতে পারেনি এবং নির্লজ্জভাবে মদপান করে মাতাল হয়ে যায়। মুহাম্মদ তাকে তার স্যান্ডেল খুলে মারধর করেন এবং আরও আঘাতের জন্য তাকে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরিয়ে দেন। তবে সে এতটাই মাতাল হয়ে গিয়েছিল যে, কোনও ব্যথাই অনুভব করেনি। খাবার পরিবেশন করা হলে সে-ও তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে সবার সামনে পা ভাঁজ করে বসে পড়ল, এবং লোকেরা খেতে খেতে তার ঢলাঢলি দেখছিল (6)।

প্রধান নাতা দুর্গগুলির শেষটিকে যুবায়ের (Zubayr) দুর্গ বলা হতো। এটি উঁচু পাথুরে পাহাড়ের উপরে নির্মিত আপাতদৃষ্টিতে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল, যা গাছগাছালির চূড়ার উঁচুতে ছিল। অন্যান্য দুর্গ জয় করে আসা অনেক যোদ্ধা যুবায়ের দূর্গে এসে পরাস্ত হতো। দুর্গের দরজা পর্যন্ত যেতেই একেবারে খাড়াভাবে উঠতে হতো, যেখানে অবরোধের যন্ত্রগুলো কোন কাজে আসত না। কথিত আছে যে, এটিতে একটি গোপন সুড়ঙ্গের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হতো যা পাহাড়ের অভ্যন্তরে একটা গুহার মতো জলাধারে পানি জমা করে ঝর্ণাকারে গড়িয়ে পড়ত। গজল (Ghazzal) নামের আরেক বিশ্বাসঘাতক ইহুদি মুহাম্মদকে সুড়ঙ্গের দিকে নিয়ে যায় এবং মুহাম্মদ তখন পানির ধারাটি সরিয়ে নিয়ে যান, পানির পথটি বন্ধ করে দেন। খাবারের ব্যবস্থা করা হলেও উঁচু দুর্গে বসবাসকারীরা পানি ছাড়া বেশিদিন বাঁচতে পারবে না। তিনদিনের অবরোধ শেষে বেশকিছু ইহুদি যোদ্ধা মুহাম্মদের সৈন্যদের সাথে যুদ্ধের জন্য নেমে আসে। ইহুদিদের দশজনকে হত্যা করা হয়। স্পষ্টতই এটি ছিল একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী কৌশল। লড়াই চলাকালীন সময়ে অবশিষ্ট ইহুদি যোদ্ধারা কাছের প্রধান গাছগাছালির অঞ্চলে পালিয়ে যায়, যেটি শিক্ক (Shiqq) নামে পরিচিত ছিল।

নাটা অঞ্চলটির কাজ গুছিয়ে মুহাম্মদ তার সেনাদল নিয়ে শিক্কের দিকে যাত্রা করলেন এবং সেখানের প্রধান দুর্গ অবরোধের কাজ শুরু করলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই প্রথম দুর্গতির পতন ঘটে, ইহুদি ও মুহাম্মদের সেরা সৈন্যদের মধ্যে তলোয়ার-

লড়াই শুরু হয়। ভারি ফটক ভেঙে মুহাম্মদের বাহিনী ভেতরে ঢুকলে এই দুর্গ অবরোধের পরিসমাপ্তি ঘটে। তারা ভেতরে প্রচুর খাবার এবং পশুপাল খুঁজে পেল। বেশিরভাগ ইহুদি যোদ্ধারা পুরো উপত্যকার মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম দুর্গ যা নিজার (Nizar) নামে পরিচিত ছিল, সেখান ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছিল। বাইরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই দুর্গটিকে সমস্ত দুর্গগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সর্বাধিক রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচিত হতো, তাই ইহুদিরা তাদের দুই হাজার নারী এবং শিশুদের সেখানে স্থানান্তরিত করেছিল। যারা পরাজিত দুর্গগুলি থেকে পালিয়ে এসেছিল তারা এই দুর্গের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করার জন্য পাহারায় ছিল। মুহাম্মদ নিজারের দেয়াল ভাঙ্গার জন্য মারহাবের দুর্গ থেকে জব্দ করা শক্তিশালী মিনজানিকের (catapult) ব্যবহার করেছিলেন। যদিও এটি একটা আনাড়ি যন্ত্র ছিল যার দ্বারা লক্ষ্য ঠিক করা কঠিন ছিল, তবে এটি দিয়ে ভারি পাথর নিক্ষেপ করা যেত। অবিরাম ধাক্কা দেয়ার পর শেষপর্যন্ত দেয়ালগুলির একটি ভেঙে যায়, এবং মুহাম্মদের বাহিনী দুর্গের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়।

যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে একজন ছিলেন বানু নাযীর সর্দার কিনানার (Kinana) সতেরো বছর বয়সী স্ত্রী এবং পনেরো মাস আগে বানু কুরাইযার ইহুদিদের সাথে শিরোশ্ছেদ করা বানু নাযীর গোত্রের রাব্বি (ইহুদি ধর্মযাজক) হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা সাফিয়া। কিনানা আবু রাফির ভাগ্নে ছিলেন। আবু রাফি ছিলেন ইহুদি নেতা এবং অল্প কয়েকমাস আগেই মুহাম্মদের ঘাতক দলের হাতে তিনি প্রাণ হারিয়েছিলেন। বানু নাযীর গোত্রের অন্যান্য নারী ও শিশুদের সাথে নিরাপদে থাকতে পারবে ভেবে কিনানা নিজের স্ত্রীকেও সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন।

শিক্কিতে প্রতিরোধের নানা ক্ষেত্র পরিষ্কার করার পরে, মুহাম্মদ খাইবারের সর্বশেষ জায়গা কাতিবায় (Katiba) পৌঁছেন যেখানে বানু নাযীরের প্রাসাদ সহ এবং আরও দুটি দুর্গ ছিল। এরমধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল কামুস (Qamus) দুর্গ। ইয়াছরিবের সহায়-সম্পত্তির পাশাপাশি, কিনানার পরিবার বংশপরম্পরায় সেই দুর্গে বসবাস করে আসছিল। আর তাদের ইয়াছরিবী সম্পত্তি মুহাম্মদ তিন বছর আগেই দখল করে নিয়েছিলেন। মুহাম্মদ কাতিবার দিকে যাত্রা করছেন জানার পর কিনানা ও তার যোদ্ধারা দুর্গের সামনে যুদ্ধের অভিপ্রায় নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু তারা যখন মুহাম্মদের সেনাদলের বিশাল বহর দেখল তখন পিছু হটে ভেতরে চলে গেল এবং সেখান থেকে আক্রমণকারীদের উপর বৃষ্টির মতো তীর ছুঁড়তে লাগল। মুহাম্মদ মিনজানিক দিয়ে দুর্গটিকে তীব্রতার সাথে আঘাত করলেন এবং তারপরই অবরোধের অবসান ঘটল। ইতিমধ্যে মুহাম্মদের সেনারা খাইবারের দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল দখল করে নিয়েছে। কিনানা বুঝতে পেরেছিল যে, প্রতিরোধ করে এখন আর কাজ হবে না। সুতরাং তিনি মুহাম্মদের সাথে শান্তি আলোচনা করতে চান এই বার্তা প্রেরণ করলেন। মুহাম্মদ তার সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়ার পরে কিনানা তার গোত্রের অন্যান্য নেতাদের সাথে উপস্থিত হয়ে তিন বছর আগে ইয়াছরিব থেকে বহিষ্কার হওয়ার সময় মুহাম্মদ বানু নাযীর গোত্রের লোকদের যেই চুক্তির শর্তে মুক্তি (প্রাণে না মারা) অনুরূপ কিছু তাদের সাথেও করা যায় কিনা তা নিয়ে কথা বলেন। মুহাম্মদ তাদেরকে অস্ত্র, দুর্গ এবং গাছগাছালির বিনিময়ে তাদের জীবন রক্ষা করতে রাজি হয়েছিলেন। তবে এবার তাদের স্বর্ণ, রৌপ্য এবং গহনার সম্পদ সহ অনেক কিছুই মুহাম্মদের কাছে সমর্পণ করতে হবে। তারা তাদের ব্যক্তিগত উটগুলিতে যতটা ব্যক্তিগত জিনিস বোঝাই করতে পারে ততটুকুই নিয়ে খাইবার ছেড়ে যেতে বলেন, কিন্তু এরচেয়ে বেশি কিছুই নেয়া যাবে না বলেও জানিয়ে দেন। কাতিবার বাকি দুটি দুর্গও একই শর্তে আত্মসমর্পণ করেছিল। শীঘ্রই, খাইবারের সমস্ত ইহুদিরা অনুরূপ কিছু তাদের জন্যও ধার্য করার জন্য তার কাছে অনুরোধ করল।

মুহাম্মদ সবার আগে ইহুদিদের বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার বাজেয়াপ্ত করলেন। কেবলমাত্র কিনানার দুর্গেই একশো লৌহবর্ম, চারশো তলোয়ার, এক হাজার বর্শা এবং পাঁচশো ধনুকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু মুহাম্মদের জানামতে অনেক পরিবারেরই আরও সোনা ও রৌপ্য থাকার কথা ছিল যা পাওয়া যায়নি। নির্বাসিত হলে নতুন কিছু শুরু করার আশায় কিনানা কামুস দুর্গের প্রাচীন অংশের ধ্বংসাবশেষের নিচে গোত্রবাসীর ধন-সম্পদ, সোনা ও রূপা লুকিয়ে রেখেছিল। এই সম্পদের মাঝে

ছিল স্বর্ণের হার এবং বাহুবন্ধনী এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত মধ্যাহ্নভোজের ছালাবাটি, যেমনঃ পানপাত্র এবং খাবার পরিবেশন করার বাসন, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মূল্যবান সবকিছু। শিক্কের অবরোধ অব্যাহত থাকাকালীনই কিনানা এই ধনসম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলেন, কারণ তারা জানতেন, মুহাম্মদ কাতিবার দখল নেয়ার পর এই দূর্গের পতন কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র ।

এই জিনিসগুলো লুকিয়ে রাখাই কিনানার জন্য ধ্বংস ডেকে এনেছিল, কারণ মুহাম্মদ এসবের অস্তিত্ব সম্পর্কে আগেই জানতেন। তিনি ইয়াছরিব থেকে যখন তাদের তাড়িয়ে দেন, সেই সময় বানু নাযীররা তাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং গহনাগুলির প্রদর্শন করেছিল, এবং তাদের যে এতসব আসবাব আছে তা মুহাম্মদের সেনারা জানতো। কারণ, বানু নাযীরের লোকেরা মাঝেমধ্যে বিবাহ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের সময় ধনী মক্কাবাসীদের কাছে এগুলো ধার দিত। মুহাম্মদ কিনানাকে সবকিছু তার কাছে দিয়ে দিতে বলেন, কিন্তু কিনানা অস্বীকার করে বলল, তার কাছে নেই ঐ জিনিসগুলো এখন আর নেই। তিনি মুহাম্মদকে বললেন যে, অস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে তাদের সমস্ত জিনিস বিক্রি করা হয়েছিল। তিনি বললেনঃ “আমরা সেগুলোকে আজকের এই দিনটির অপেক্ষায় সংরক্ষণ করেছিলাম। যুদ্ধ আর যোদ্ধাদের ভরণপোষণ করতে গিয়ে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই”। মুহাম্মদ তার কথা বিশ্বাস করেননি, বরং মিথ্যা বলার জন্য তাকে সতর্ক করে বললেন : “তুমি কি জান যে, আমরা যদি সেগুলো পাই তবে তোমাকে হত্যা করা হবে”? (৮)

কথিত আছে যে, কিনানার চাচাতো ভাই নিহত হওয়া আবু রাফির ছেলে ছালাবাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মুহাম্মদ কিনানার মূল্যবান সম্পদ কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তা জানতে পারেন। ছালাবা বলল যে, সে রাতে কামুস দুর্গের পাশের কিছু ধ্বংসাবশেষের চারপাশে কিনানাকে ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে দেখেছিল। মুহাম্মাদ তার চাচাত ভাই জুবায়েরকে ছালাবার সঙ্গে নিয়ে সেই ধ্বংসাবশেষের ওখানে পাঠালেন এবং তারা সেখানে ভারি চামড়ার থলে ভর্তি ব্রেসলেট, চুড়ি, গোড়ালি, গলার হার, সোনার দুল এবং অন্যান্য মূল্যবান অলংকার নিয়ে ফিরে এলো (৯)।

মুহাম্মদ আবার জানতে চাইলেন, সোনার ও রৌপ্যের আরও মূল্যবান পানপাত্র, থালা-বাসনগুলি কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কিনানা যখন কথা বলতে রাজি হননি, মুহাম্মদ তাকে নির্যাতনের জন্য জুবায়েরকে ডাকলেন। ইসলামিক গ্রন্থ অনুসারে, জুবায়ের উত্তপ্ত লাল লোহার ছাপ মেরে তার বুক বিদীর্ণ করে দেয়, বা সে কিনারার বুকে আগুন জ্বালিয়ে দেয় আর অর্ধ মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এভাবে তাকে আটকে রাখে (১০)। সোনার ও রৌপ্য নৈশভোজের থালাবাসনের প্রতি তার আগ্রহের কারণেই সম্ভবত মুহাম্মদ এই জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছিলেন। অত্যাচার সত্ত্বেও কিনানা অবশিষ্ট ধনসম্পদের কথা স্বীকার করেনি। মুহাম্মদ তাকে মাসলামার (মুহাম্মদ বিন মাসলামা) কাছে ফিরিয়ে দিলেন। মাসলামা তাকে খেজুর বাগানের কিনারায় নিয়ে যায় এবং পূর্বের নাটা যুদ্ধে তার ভাই মাহমুদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সে কিনানার মাথা কেটে ফেলে। কিনানার আরেক ভাইয়েরও একই পরিণতি হয়। তাকে নির্যাতন, জিজ্ঞাসাবাদ ও শিরোশ্ছেদ করা হয়। তাদের দেহাবশেষ এবং মাথাগুলো বানু নাযীরের খেজুর বাগানের মধ্য দিয়ে যাওয়া একটি সরু রাস্তার পাশে ফেলে রাখা হয়েছিল।

কিনানার শিরোশ্ছেদ করার পরে খাইবারের সমস্ত কয়েদিদের একত্রিত করা হয় এবং মেয়েদের বন্দি করে নিজেদের জন্য বাছাই করতে মুহাম্মদ তার অনুসারীদের নির্দেশ দেন। নিজার দুর্গ থেকে বন্দি করা নারীদের মধ্য থেকে প্রথমে বাছাইয়ের জন্য সুদর্শন মুমিন যাকে দেখতে ফেরেস্তা জিব্রাইলের চেহারার মতো বলা হতো সেই দিহইয়া কালবী মুহাম্মদের কাছে ছুটে গিয়েছিল। মুহাম্মদ তাকে প্রথম কোন এক মেয়েকে বেছে নিতে বললেন। সে কিনানার স্ত্রী সাফিয়াকে বেছে নিয়েছিল। পরবর্তীতে মুমিনদের মধ্যে থেকে একজন মুহাম্মদের কাছে গিয়ে জানাল যে, দিহইয়া যে যুবতী নারীকে বেছে নিয়েছে সে আসলে মুহাম্মদের জন্যই উপযুক্ত। মুহাম্মদ তাকে একনজর দেখতে চাইলেন এবং বললেন, “দিহইয়াকে ঐ মেয়ের সঙ্গে

ডেকে আনো"। মুহাম্মদ যুবতী নারীকে দেখার পরই দিহইয়াকে বললেন, "বন্দিদের থেকে অন্য কোন দাসীকে নিয়ে যাও "   (১১)।

ইসলামী গ্রন্থে কাহিনী পাওয়া যায় যে, বেলাল নামের যে মুক্ত দাস ছিলেন যিনি আজান দিতেন তিনি সাফিয়াকে শিক্ক দুর্গ থেকে মুহাম্মদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। আর বেলাল ইচ্ছাকৃতভাবে সাফিয়াকে সেই পথে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে কিনানা ও তার ভাইয়ের মৃতদেহ ফেলে রাখা হয়েছিল, যাতে সাফিয়া তাদের দেখতে পায়। সাফিয়ার সাথে ছিল তার ননদ। সাফিয়া মৃতদেহগুলি দেখতে পেয়ে স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল, তবে ননদটি চিৎকার করে মাতম করে তার মুখে আঁচড় দিতে থাকে ও মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে। মুহাম্মদের সামনে আনার সময়ও সে পাগলের মতো ছিল। মুহাম্মদ, যার মস্তিষ্ক উচ্চস্বরে শোকের কান্না সহ্য করতে পারেনি, চেঁচিয়ে বললেন, "এই শয়তানকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও" (১২)। তিনি বেলালের অসংবেদনশীল আচরণের জন্য তীব্র নিন্দা জানান, কারণ বেলাল মুহাম্মদের অনুসারীদের হাতে খুন হওয়া পরিবারের পুরুষদের লাশ ঐ দুজন নারীকে দেখিয়ে এনেছিলেন। মুহাম্মদ বললেন, "বেলাল, তোমার কি কোন দয়ামায়া নেই যে তুমি দু'জন স্ত্রীকে তাদের মৃত বরদের কাছ দিয়ে নিয়ে এসেছ?" (১৩) বেলাল জবাব দিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি ভাবিনি যে আপনি এটিকে ঘৃণা করবেন। আমি চাইছিলাম যে তারা তাদের লোকদের ধ্বংস দেখুক" (১৪)।

মুহাম্মদ সাফিয়ার সাথে সখ্যতা তৈরি করতে চেয়েছিলেন এবং ইয়াছরিবে ফিরে যাওয়ার সময় না হওয়া পর্যন্ত তাকে রক্ষীদের অধীনে রেখেছিলেন। কথিত আছে যে, খাইবার ছেড়ে যাওয়ার আগে তিনি তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন এই বলে - হয় সাফিয়া মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করবেন এবং তার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবেন অথবা, সাফিয়া চাইলে সে তার নিজ ধর্মে থাকতে পারবেন। এই দুটির যেকোন একটিকে পছন্দ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে নিজের ধর্মে থাকলে সে মুহাম্মদের দাসী বা উপপত্নী হয়ে যাবে। তবে যদি সে তাকে বিয়ে করে, তবে তিনি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাকে মুক্ত করে দেবেন এবং এই মুক্তিই তার যৌতুক (দেনমোহর বা মোহরানা) হবে। কথিত আছে যে, সাফিয়া মুহাম্মদের ধর্মে যোগ দিয়েছিল ।

সেনাদল খাইবার ছাড়ার আগে যোদ্ধারা সুন্দরী যুবতী নারীকে নিয়ে মুহাম্মদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অনুমান করেছিল। সবাই কানাঘুষা করছিল, মুহাম্মদ কি তাকে (সাফিয়াকে) বিয়ে করবেন? মুহাম্মদ সর্বদা নিজের কাছে নিজের পরিকল্পনা পুষে রাখতেন, তবে তিনি যদি তাকে বোরকা পরান তাহলে তারা মুহাম্মদের পরিকল্পনা পরিষ্কার বুঝতে পারবে। অর্থাৎ, এটি (বোরকা পরানো) বিবাহের দিকে ইঙ্গিত। সেনাদল যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং অনুসারীরা মনোযোগ সহকারে দেখল যে, মুহাম্মদ সাফিয়াকে তার প্রিয় উট আল-কাসওয়ায় উঠতে সাহায্য করছেন। তিনি বেশ ভদ্রভাবে এক হাঁটু গেড়ে বসলেন, যাতে সাফিয়া তার উরুর সাহায্যে মুহাম্মদের হাঁটুকে ব্যবহার করে উটের উপর উঠে বসতে পারেন। যখন সাফিয়া উটের পিঠে আরোহণ করলেন, মুহাম্মদ তার উপর একটি চাদর ছড়িয়ে দিলেন। এটি পতাকা তোলার মতো ছিল। আবরণটি যেন ছিল ঘোমটা! খবরটি সেনাপতিদের মাঝে আসন্ন বিয়ের বার্তার মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল, আর যোদ্ধারা একে অপরের দিকে কপাল কুঁচকে হাসিতে ফেটে পড়ল।

নিজের প্রণীত বিধিবিধান রক্ষার একনিষ্ঠ একজন হিসেবে মুহাম্মদকে তার নিজেরই আদেশ মেনে চলতে হয়েছিল, এবং তার বন্দিনীর সাথে শোয়ার আগে সে গর্ভবতী কিনা তা জানতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তবে তাকে আর বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়নি। তারা খাইবারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগেই সাফিয়ার ঋতুস্রাব শুরু হয় এবং রাস্তায় চলাকালীনই তা শেষ হয়। খাইবার ও ইয়াছরিবের মাঝামাঝি এক যাত্রাবিরতে বিয়ে সম্পন্ন হয়। খাইবার আক্রমণে যে নারীরা ছিলেন, তাদের মধ্যে মুহাম্মদের খালা সাফিয়াও ছিলেন এবং তারা বিয়ের জন্য কনেকে প্রস্তুত করেছিলেন। তারা তাকে স্নান করালো, গায়ে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দিল এবং খাইবার থেকে নিয়ে আসা একটি গাউন তাকে পরানো হলো। বিবাহের ভোজটি সাদামাটা

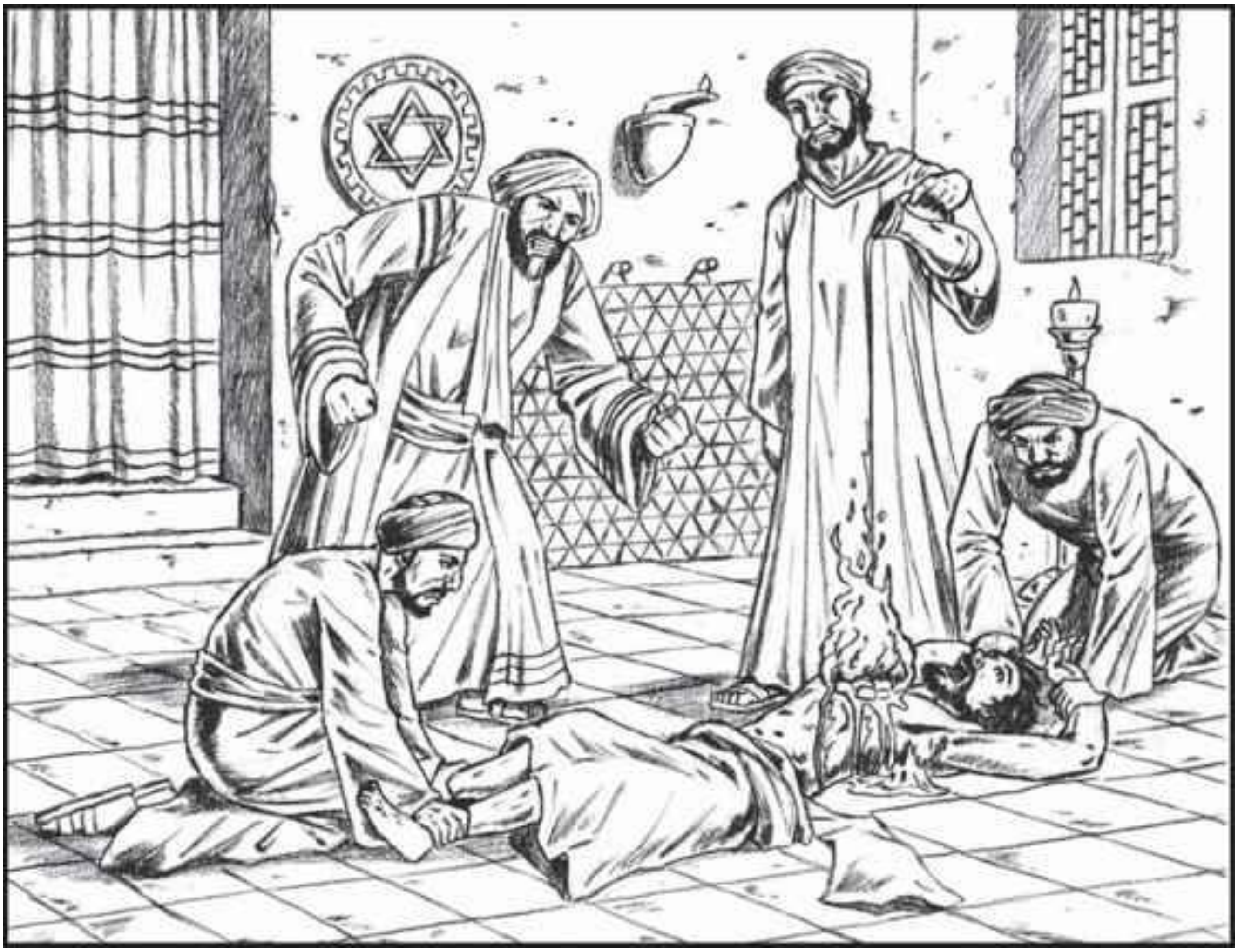
ছিল। খেজুর, মাংসের স্যুপ, মাখন এবং অন্যান্য খাবার সমূহ মাটিতে বিছানো চামড়ার খাবারের পাটিতে পরিবেশন করা হলো। প্রথম অতিথিরা ছিলেন মুহাম্মদের সাহাবিদের মাঝে অন্যতম অভিজাত লোকজন - আলী, আবু বকর, উমর এবং উসমান। এদের আপ্যায়ন সম্পন্ন করার পরে, অন্যদেরকে খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মুহাম্মদ সাফিয়ার সাথে তার নিজের তাঁবুতে রাত কাটালেন। আবু আইয়ুব যিনি মসজিদ নির্মাণকালীন সময়ে মুহাম্মদকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তিনিই রাতের বেলা তলোয়ার হাতে সজ্জিত হয়ে তাঁবুর বাইরে মুহাম্মদের স্ব-নিযুক্ত দেহরক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুহাম্মদ সকালে তাকে দেখতে পেয়ে কিছুটা বিরক্ত হয়ে তার অবস্থান সমন্ধে জানতে চান। আবু আইয়ুব সেই রাতে কেন সেখানে অবস্থান নেন তার ব্যাখ্যা করেন এভাবে : "আমি এই যুবতী নারীর সাথে আপনাকে দেখে ভয় পেয়েছিলাম। আপনি তার পিতা, বর এবং অনেক আত্মীয়কে হত্যা করেছিলেন এবং এই নারী কিছুদিন আগেও অবিশ্বাসী ছিলেন। আমি সত্যিই আপনার জন্য ভয় পেয়েছিলাম" (১৫)।

ইসলামিক গ্রন্থে সাফিয়াকে তার লোকদের নিষ্ঠুর ভাগ্যের প্রতি আপাতদৃষ্টিতে উদাসীন হিসেবেই চিত্রিত করা হয়েছে, কারণ মুহাম্মদ তাদের জবাই করে তাদের জমি ও সম্পদ চুরি করার পরেই সাফিয়া তার ধর্মে যোগ দেন। তবে মুহাম্মদীয় আকর গ্রন্থে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা নিয়ে তেমন ভবিতব্য কখনোই ছিল না। বাস্তব জগতে, সাফিয়া মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হবার কথা। সবকিছুর ভয়াবহতা থেকে নিজেকে বাঁচাতে তার বোধবুদ্ধি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার বর এবং তার পরিবারের অন্যদের প্রতি যা করা হয়েছিল তা দেখে তিনি হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি যখন তাদের খুনি, তারচেয়ে বয়সে চল্লিশ বছরের বড় মুহাম্মদ তাকে যৌনদাসী হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, তার যৌবন এবং সৌন্দর্যের কারণে তাকে তার অধিকারভুক্ত করতে চেয়েছিলেন তখনও তিনি শোক করতে শুরু করেননি। এই সেই ব্যক্তি, যিনি তিন বছর আগে ইয়াছরিব থেকে সাফিয়া এবং তার গোত্রকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং পরের বছর বানু কুরাইযার ইহুদিদের গণহত্যার সময় তার পিতা হুয়াই বিন আখতাবের শিরোশ্ছেদ করেছিলেন। নির্বাক ও নিষ্প্রভ হয়ে, সাফিয়া হয়তো তার ভয়ঙ্কর মালিক যা চাইত তাই দিয়ে দিতে বাধ্য হতেন।

মুহাম্মদ মারা যাওয়ার অনেক পরে সাফিয়া তার প্রকৃত অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। রেওয়াজ অনুসারে প্রথম দিকে জড়ো হওয়া লোকেদের তিনি বলেছিলেন : "আমি আমার পিতা ও বরকে হত্যার জন্য আল্লাহর রাসূলকে পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণা করতাম" (১৬)। সাফিয়া আরো বলতে থাকেন, মুহাম্মদ তার পরিবারের উপর করা আচরণকে জায়েজ করতেন। মুহাম্মদ বলতেন, তার বাবা আরবদের তার বিরুদ্ধে 'উস্কানি' দিয়েছিল এবং ইয়াছরিবের উপর জোট বাহিনীর হামলার জন্য দায়ী ছিল। তিনি যা প্রাপ্য সেটাই পেয়েছিলেন। সাফিয়া স্পষ্টভাবে মুহাম্মদকে বলেছিল, ইসলামী গ্রন্থসমূহে এমনটা উল্লেখ না থাকলেও, তবে সম্ভবত সে তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে তার বাবা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে লোকদের সমবেত করেছিলেন কারণ মুহাম্মদ ইয়াছরিবে তার এবং তার বানু নাযীর গোত্রবাসীর সমস্ত কিছু ছিনিয়ে নিয়েছিলেন — যেমন শস্যক্ষেত, বাগান, দুর্গ, অস্ত্র। এর জবাবে মুহাম্মদের উত্তর প্রস্তুত ছিল : বানু নাযীর তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল সে কথা কি তারা জানত না? তিনি রক্তের বদলার টাকার বিষয়ে কথা বলতে তাদের দুর্গে গিয়েছিলেন এবং দুর্গের গেটের কাছে দাঁড়ানোর সময় তারা তাকে মেরে ফেলার জন্য প্রাচীরের উপর থেকে একটি ভারি পাথর ফেলে দেয়ার পরিকল্পনা করেছিল। এবং সাফিয়ার বাবা এই চক্রান্তকারীদের প্রধান ছিলেন। মুহাম্মদ এটি সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে জানতেন, কারণ ফেরেস্তা জিব্রাইল তাকে তাদের মন্দ উদ্দেশ্য সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। এ কারণেই তিনি বানু নাযীর গোত্রটিকে ইয়াছরিব থেকে বিতাড়িত করেছিলেন এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। তাদের বিতাড়ণের পেছনের তাদের ষড়যন্ত্রের নীলনকশাই মূলত দায়ী ছিল – মুহাম্মদের ভাষ্য। তাছাড়া আল্লাহ তাকে যে নির্দেশনা দিয়েছেন তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল; তারা তাকে আল্লাহর প্রেরিত হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল; নবুওয়াতের ধারাটি ইহুদিদের কাছ থেকে আরবদের দিকে চলে যাওয়ায় তারা ঈর্ষান্বিত ছিল এবং তাই মুহাম্মদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেছিল। ইসলামিক গ্রন্থে দেখা যায়,

মুহাম্মদ সাফিয়াকে এসব বলতেই থাকতেন। সাফিয়া তারপর বলেন যে, "একটা সময়ে পর সবকিছু আমার মন থেকে মুছে গিয়েছিল" (১৭)।

খাইবারের লড়াইয়ে, দালিলিকভাবে তিরানব্বই জন ইহুদি এবং মুহাম্মদের পনেরো জন অনুসরণকারীর মৃত্যুর উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত আরও অনেক ভুক্তভোগী ছিল যারা গণনাতে আসেনি, যেমন আত্মসমর্পণের পরে যাদের দ্রুতই হত্যা করা হয় এবং কিনানার বর্ধিত পরিবারের পুরুষ সদস্যদের কথা যাদেরকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল (১৮)।



[খাইবারের বানু নাযীর ইহুদিদের নেতা কিনানাকে মুহাম্মদের জিজ্ঞাসাবাদ, অপরদিকে মুহাম্মদের একজন অনুসারী তার বুকে আগে থেকে জ্বলতে থাকা আগুনের উপরে প্রদীপের তেল ঢেলে দিয়েছিলেন। মুহাম্মদ তাকে অত্যাচার করলেন যাতে কিনানা অন্যত্র সরিয়ে রাখা গোত্রবাসীর ধনসম্পদের তথ্য প্রকাশ করেন, যার মধ্যে ছিল স্বর্ণ ও রূপার নৈশভোজের থালাবাসন, মূল্যবান পাথর এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র। নির্যাতন সত্ত্বেও কিনানা সেসবের অবস্থান প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং মুহাম্মদ তার মাথা কেটে ফেলেছিলেন।]

বিজয়ের অল্প সময়ের মধ্যেই মুহাম্মদ তার নিজের মৃত্যুর মুখোমুখি চলে আসেন। এক নৈশভোজে মাংসের সাথে বিষ মিশিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটে। বিজয়ী হিসেবে তার গর্বের ফলে তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে, কেউ তার ক্ষতি করার সাহস করবে এবং তাই তিনি এক ইহুদি নারীর কাছ থেকে খাবারের দাওয়াত গ্রহণ করলেন। একটা আস্ত খাসির ভুনা যেটাতে সেই নারী বিষ মিশিয়েছিলেন। নারীটি ছিলেন জয়নাব, নাটা অঞ্চলের রাজপুত্রের কন্যা এবং মারহাবের ভাগ্নী, যার দুর্গটি

সর্বপ্রথম মুহাম্মদের সৈন্যবাহিনীর হাতে পতন হয়েছিল। তার বর ছিলেন বানু নাযীর রাব্বীদের অন্যতম সাল্লাম মিশকাম (Sallam Mishkam), যিনি মুহাম্মদ ইয়াছরিবে আসার প্রথম বছরে তার সাথে ধর্মের তাত্ত্বিক প্রশ্নগুলি নিয়ে বিতর্ক করতেন, কিন্তু পরে প্রকাশ্যে তাকে বিদ্রূপ করেছিলেন। মারহাবের দুর্গ অবরোধের সময়ই সালামকে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি দূর্গের প্রতিরক্ষায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে গিয়ে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মুহাম্মদের বাহিনী দুর্গের ভেতরে ঢোকার পরই তাকে অসুস্থ, শয্যাশায়ী সাল্লামকে হত্যা করেন। জয়নাব সবাইকে হারিয়েছিলেন - বাবা, চাচা, ভাই এবং বর। আর তাই মুহাম্মদকে বিষপ্রয়োগ করে তার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। মশলাযুক্ত খাসির পা ও কাঁধের অংশ পরিবেশন করা হলে মুহাম্মদ এবং তার বেশ কয়েকজন অনুসারী মাংসের মধ্যে কামড় দিয়েছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদ তা না গিলেই ফেলে দিয়ে বলেন, "থামো! এটিতে বিষ দেয়া হয়েছে" (১৯)। একমাত্র বিশর আল-বারা (Bishr al-Bara) নামের এক মুমিন মাংসটা গিলেছিল, যে বিশর কিনানার ভাইকে নির্যাতন ও শিরোশ্ছেদ করেছিল বলা হয়ে থাকে। বিশর বিষক্রিয়ায় মারা গেল। সাল্লামের বিধবা স্ত্রীকে মুহাম্মদের সামনে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি মাংসে বিষ মাখানোর বিষয়টি স্বীকার করেন, কিন্তু এই নারী তাকে একটি চতুর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এই বলে : "আপনি একজন নবী কিনা আমি তা জানতে চেয়েছিলাম। কারণ যদি তাই হয় তবে ঈশ্বর আপনাকে এ সম্পর্কে সতর্ক করবেন। এবং আপনি যদি ভণ্ড হয়ে থাকেন তবে আমি আপনার অনুসারীদের থেকে আপনাকে মুক্তি দেব" (২০)। তার ভাগ্যে কী ঘটেছিল সেটি নিয়ে ইসলামিক গ্রন্থে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন তথ্য নেই। কিছু সূত্র বলছে যে, মুহাম্মদ তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। অন্যরা সূত্র বলছে, তিনি তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন এবং তাকে হয় শিরোশ্ছেদ করা হয়েছিল অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল।



[কিনানাকে অত্যাচার ও শিরোশ্ছেদ করার পরে মুহাম্মদ নিথর, নিস্তব্ধ, বিধবা, সতেরো বছর বয়সী এক নারী সাফিয়াকে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তাকে তার সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছিল এবং তার সামনে আনা হয়েছিল। সাফিয়ার বরের মাথাহীন দেহটি নিকটবর্তী একটি তালগাছের মধ্যে পড়ে থাকা অবস্থায়, তিনি তার কাছে প্রস্তাব করে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেন, তবে যদি সাফিয়া তাকে বিয়ে করে এবং তার ধর্ম গ্রহণ করে।]

খাইবারের লুণ্ঠন ছিল অবিশ্বাস্য, পূর্ববর্তী ছয় বছরের অভিযান এবং হামলার সমস্ত লুটের চেয়েও মূল্যবান। খাইবার বিজয় করার চেয়ে লুটপাট করার জন্য মুহাম্মদ আরও বেশি সময় ব্যয় করেছিলেন। জায়গাজমি ছাড়াও যে সমস্ত সম্পদ বিপুল পরিমাণে ভাগ করে দেয়া হয় তার মধ্যে ছিল খেজুর, খেজুরের পণ্য, তেল, মধু এবং বার্লি। ছিল প্রচুর পশু, যার মাঝে ভেড়া, ছাগল, উট এবং ঘোড়া অন্তর্ভুক্ত। এর সাথে গৃহসজ্জার সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে ছিল, হয় এসব স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বা আমদানি করা। এছাড়াও কামারের বিবিধ যন্ত্রপাতি, যেমন - হাতুড়ি, ধাতব পাত এবং বেলচা সহ বিভিন্ন ব্যবসায়ের সরঞ্জাম এবং ওদের আমদানিকৃত কাপড়ের ভান্ডারে ছিল মখমল, রেশম এবং সুতির থান কাপড়ের রোল এসবও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও সামরিক সরঞ্জামাদি তথা তলোয়ার, বর্শা, বর্ম, গদি, ঢাল, ধনুক, তীর ইত্যাদি এবং দুর্গের প্রাচীর-বিধ্বংসী যন্ত্রপাতি। এর বাইরেও ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার সম্ভার, জহরতের অলংকার এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের নৈশভোজের থালাবাসন। ধনসম্পত্তি গোপন করার জন্য কিনানা ও তার পরিবারকে তিনি কী করেছিলেন তা দেখার পরে, ইহুদিদের মধ্যে কেউই তাদের সম্পদ মুহাম্মাদের কাছ থেকে আড়াল করার সাহস পায়নি।

মুহাম্মদ লুটের মালামাল বিলিবন্টনের জটিলতা কমাতে বিভিন্ন নীতিমালা নিয়ে আসেন। নাটা ও শিক্কের কাছ থেকে নেওয়া সমস্ত কিছুই সেনাদলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে; আর কাতিবা অঞ্চল থেকে পাওয়া সমস্ত কিছুই তার নিজের (মুহাম্মদের) হয়েছে। তিনি নাটা ও শিক্কের লুটের মাল এক হাজার আটশো শেয়ারে ভাগ করেছিলেন - প্রতিটি পদাতিক সৈন্যের জন্য একভাগ এবং প্রতিটি ঘোড়সওয়ারের জন্য তিনভাগ। তিনি বিতরণ তদারকি করার জন্য একজন প্রশাসক নিয়োগ করেছিলেন। প্রশাসনিক কাজগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে বিপুল আসবাবের মতো জব্দ করা সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ করা যাতে সেই মূল্যে এটির নিলাম করা যায়। বড় জিনিসগুলিকে ভাগ করে দেয়ার চাইতে এর বিক্রয়মুল্য বিতরণ করা সহজ ছিল। খাইবারের পতনের সংবাদ পেয়ে বণিকরা নগদ অর্থ দিয়ে নিলামের মাল কেনার বিশাল এই সুযোগ কাজে লাগাতে মরূদ্যানে এসে জড়ো হয়েছিল। গ্রন্থে সাম্প্রতিক ধর্মান্তরিত হওয়া এক মক্কাবাসী ব্যবসায়ী হাজ্জাজ বিন ইলাতের (Hajjaj Ilat) কথা উল্লেখ আছে, যে মুনাফার জন্য এসব মাল নিলাম থেকে কিনতে আগ্রহী ছিল, কিন্তু তার সমস্ত অর্থ মক্কায় আটকে ছিল। পাওনা টাকা আনতে তিনি তাড়াতাড়ি মক্কায় যান। মক্কাবাসীরা খাইবার সম্পর্কে সংবাদ শুনতে আগ্রহী ছিল। তারা কেবল এতদূর পর্যন্ত জানত যে, মুহাম্মদ এটিকে ঘিরে রেখেছে এবং ইহুদিদের সবকিছু লুট করছে। পরিণতি কি হয় বা হতে পারে তার উপর অনেকেই বাজি ধরেছিল। হাজ্জাজ ছলচাতুরির আশ্রয় নিল যাতে তার পাওনা তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করে ফিরতে পারে। আর তাই মক্কায় পৌঁছে সে রুদ্ধশ্বাসে ঘোষণা দিল যে, মুহাম্মদকে পরাজিত করা হয়েছে; এবং তার অনেক লোক মারা গেছে। মুহাম্মদকে বন্দি করা হয়েছে, এবং ইহুদিরা তাকে মক্কাবাসীদের হাতে তুলে দেয়ার পরিকল্পনা করছে। হাজ্জাজ ব্যাখ্যা করল যে, তার দ্রুত টাকার দরকার যাতে সে খাইবারে ছুটে গিয়ে মুহাম্মদ ও তার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে ইহুদিরা যে জিনিসপত্র জব্দ করেছে তার দরদাম করতে পারে। মক্কাবাসীরা এতটাই আনন্দিত হয়েছিল যে, তারা প্রায় রাস্তায় নাচতে লাগল এবং মুহাম্মদকে হাতে পেলে তারা কী করবে সেটা নিয়ে কল্পনা করছিল। তার ছলচাতুরি কাজে এলো। মক্কাবাসীরা আসল সত্য জানার আগে হাজ্জাজকে তার অর্থ দিয়ে দিল এবং হাজ্জাজও মক্কা শহর থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলো।

বাস্তববাদী হিসেবে মুহাম্মদ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বেঁচে থাকা ইহুদিদের বর্গাচাষীদের মতো করে রাখা উচিত। প্রথমে তিনি ইয়াছরিবের বানু নাযীর ইহুদিদের মতো করে তাদের তাড়িয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু জব্দ করা বাগানের গাছগাছালির জন্য তাদের যেই অভিজ্ঞতার দরকার তা মুহাম্মদের সেনাদের নেই। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের মুক্ত করে দিলে ভুল হবে। নতুন মালিকদের অধীনে ইয়াছরিবের খেজুর বাগানের উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পেয়েছিল। তিনি এই সম্পত্তিগুলি তার মক্কাবাসী অনুসারীদের দিয়েছিলেন, যাদের উদ্যানচর্চা বা গাছগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় জটিল সেচ কৌশল সম্পর্কে কোনও জ্ঞান ছিল না। ইহুদিদের উপর উপর শুদ্ধি-অভিযানের ফলে দক্ষ শ্রমিকের ঘাটতি হয়েছিল এবং নতুন বাগানের মালিকরা পরিশ্রম না করে লুটের মাধ্যমেই জীবনধারণের অভ্যাস গড়ে তুলেছিল। এই বিবেচনায়,

মুহাম্মাদ খাইবার ইহুদিদের পূর্বের মালিকানাধীন বৃক্ষরোপণ এবং ক্ষেতগুলিতে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তবে তাদের বার্ষিক ফলনের অর্ধেকেরও বেশি অংশ তাকে দিতে হবে। তবে মুহাম্মদ যেকোনো সময় তাদের নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়ার অধিকারও বজায় রেখেছিলেন।

একমাত্র কাতিবা অঞ্চলেই ফসলের উল্লেখযোগ্য ফলন, ইহুদিদের অসাধারণ উৎপাদন ক্ষমতার সাক্ষী বহন করে। এই অঞ্চলটি প্রতিবছর খেজুরের আট হাজার ওয়াক্ক তথা উটের বোঝা উৎপাদন করত। প্রতিটি উটের বোঝা ছিল প্রায় চারশো পঁচিশ পাউন্ড ওজনের। এর ফলে এই বাগান থেকে প্রতি বছর সতেরো শত টন খেজুর পাওয়া যেত। অধিকন্তু, অঞ্চলটিতে বার্ষিক তিন হাজার উটের বোঝা বার্লি উৎপন্ন হতো। মুহাম্মদ তার নিকটবর্তী পরিবারের প্রত্যেককে এবং তার অনুগত মক্কার গোত্রের প্রত্যেক পুরুষ এবং নারীদের তাদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতিবছর উট বোঝাই করে খেজুর এবং বার্লি প্রদান করতেন, যা চাইলে তারা বিক্রি করতে পারতো বা তাদের ইচ্ছামতো অন্য কাউকে দিতে পারতো। তার স্ত্রীদের প্রত্যেককে আশি উট বোঝাই খেজুর এবং কুড়িটি উট বোঝাই যব দেয়া হত। আবু বকরের মতো অনুগতদের প্রত্যেককে ওয়াক্ক বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। মুহাম্মদের চির-বিশ্বস্ত খালা সাফিয়া চল্লিশ ওয়াক্ক খেজুর পেয়েছিলেন। অদ্ভুতভাবেই, ইসলামী সাহিত্যে মুহাম্মদ তার 'ত্যাজ্য পালকপুত্র' জায়েদের ছেলে ওসামাকে একশো পঞ্চাশ ওয়াক্ক খেজুর দিয়েছিলেন এমন কথার উল্লেখ রয়েছে, তবে ওসামার বাবার ব্যাপারে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। এরপর বাকি যা থাকত মুহাম্মদ তা নিজের কাছে রেখে দিয়ে কখনও তা নতুন ধর্মান্তরিতদের আর কখনও কম ভাগ্যবান সাহাবিদের খাওয়ানোর কাজে লাগাতেন (২১)। আর তারপরের অবশিষ্ট উৎপাদন যুদ্ধের অর্থ সংগ্রহের জন্য বিক্রি করা হতো।

ইহুদিদের মরূদ্যান ফাদাক নামের জায়গাটির দখল পেতে একটি তীরও ছুঁড়তে হয়নি, তবু তা মুহাম্মদের দখলে চলে আসে। তারপর থেকে তার সম্পদ বাড়তেই থাকে। এটি খাইবারের উত্তর-পূর্ব দিকে একদিনের যাত্রাপথের একটি ছোট মরূদ্যান ছিল। জায়গাটি খাইবারের মতোই ছিল, তবে বালির সমভূমির মাঝে দুটি অগভীর উপত্যকায় দুর্গ, খেজুর গাছের বাগান এবং ফসলের ক্ষেত সহ ছোট আকারের ছিল। খাইবারের ইহুদিদের পরাজিত হবার খবর এবং তাদের উপর উপর আরোপিত শর্তাবলী জানার পর ফাদাকের নেতারা মুহাম্মদকে তাদের উপর আক্রমণ না করার আহবান জানান। তারা মুহাম্মদকে আক্রমণ না করার জন্য একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন এই বলে যে, তারাও তাদের সম্পত্তি অংশীদারী ব্যবস্থার অধীনে তার কাছে বন্ধক রাখতে রাজি। মুহাম্মদ চুক্তিটি সম্পাদনের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন, এবং ফাদাককে তার হাতে তুলে দেয়া হলো। যেহেতু এটি যুদ্ধ না করেই তিনি লাভ করেছিলেন, তাই তিনি নিজের জন্য মরুদ্যানটি রেখেছিলেন এবং তখন থেকে ফাদাক থেকে এর অর্ধেক কৃষিজাত ফসল পেতেন। তিনি তার ক্রমবর্ধমান সেনাদলকে প্রসারিত করতে এবং তার প্রসার বাড়ানোর জন্য ঘোড়া ও অস্ত্র ক্রয়ের জন্য এই সম্পদের সরবারহ কাজে লাগান।

ইয়াছরিবে প্রত্যাবর্তন সফরের সময়, ওয়াদি আল-কুরার (Wadi al-Qura) ইহুদি উপত্যকার মরুদ্যানে আক্রমণ করার জন্য মুহাম্মদ উত্তর-পশ্চিমে একটা বিকল্প রাস্তা তৈরি করেছিলেন, যেখানে আগে ছোট ছোট আক্রমণ করা হয়েছে। মুহাম্মদ তার সেনাদলকে সেখানে পৌঁছানোর জন্য এক বার্তাবাহককে প্রেরণ করেছিলেন এই ফরমান দিয়ে যে, ইহুদিরা ধর্মান্তরিত হলে তিনি তাদের জীবন রক্ষা করবেন এবং তাদের উপত্যকায় বসবাস করার অনুমতি দেবেন। কিন্তু তারা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। উপত্যকায় এমন কয়েকটি গ্রাম ছিল যেখানে খাইবার ও ফাদাকের মতো প্রতিরোধমূলকদুর্গ ছিল না। মুহম্মদের পাকা যোদ্ধাদের পক্ষে এটি ছিল বেশ সহজ শিকার। এখানকার ইহুদিরা তাদের সাহসিকতা প্রদর্শন করেছিল। ইহুদি প্রায় এক ডজন চ্যাম্পিয়ন যোদ্ধা যুদ্ধের সারি থেকে সামনে এসে মুহাম্মদের যোদ্ধাদের সাথে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল, কিন্তু তারা সবাই মারা পড়েছিল। সেই দিনটি শেষ হবার আগেই ইহুদিরা আত্মসমর্পণ করেছিল, এবং তাদের সবকিছু কেড়ে নিতে মুহাম্মদের চারদিন লেগেছিল, যা তার পরিকল্পনায় ছিল না। খাইবার ও ফাদাকের বর্গাচাষের মতো তিনি এই ইহুদিদের তাদের জায়গায় রেখে গিয়েছিলেন।

বিজয়ের পরে খাইবারের ইহুদিরা বিষণ্নচিত্তে তাদেরই পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া বহু শতাব্দী ধরে তৈরি ক্ষেতগুলিতে আবাদ করে চলেছিল। তারা তাদের শ্রমের অর্ধেক ফল মুহাম্মদকে দিয়ে দিতেন, কিন্তু এখন তারা তাদের নিজের জমিতে অসন্তোষের সাথে বর্গাচাষ করে যাচ্ছে। দুর্গ, বৃক্ষরোপণ এবং শস্যক্ষেত্রগুলি এখন মুহম্মদের অভিজাত সাহাবাগণের অধীনে, এবং তারা মাঝেমাঝে স্বাচ্ছন্দ্যে বেড়াতে আসেন যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সমস্ত কিছু তাদের সন্তুষ্টি মতো চলেছে কিনা! তারা হাঁটাচলা করে এসব দখলী সম্পত্তির দেখভাল করতো। একবার দেখভাল করতে মুহাম্মদের এক অনুসারী একা বের হয়েছিল, কিন্তু তার মৃত্যু হয় এবং তার দেহটি একটি কূপে খুঁজে পাওয়া যায়। ইহুদিরা তাকে হত্যার কথা অস্বীকার করেছিল। মুহাম্মদ তার মৃত্যুর জন্য রক্তের অর্থ দিয়ে বিষয়টি মিটমাট করলেও, ইহুদিদের কাছ থেকেই তা পরিশোধের দাবি করেন। যখন তারা তা পরিশোধ করেনি, তিনি তাদের শাস্তি দেয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা করেন, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের আরও হত্যাকান্ড না ঘটে। তিনি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার নেতৃত্বে ত্রিশজন অনুসারী প্রেরণ করেন যে আবদুল্লাহ বার্ষিক ফসলের উৎপাদন ও সংগ্রহের তদারকি করে। আবদুল্লাহ যেন একজন বিশিষ্ট ইহুদিকে প্রলুব্ধ করে ইয়াছরিবে নিয়ে আসতে পারে এই বলে যে, তাকে খাইবারের ইহুদিদের উপরে আনুষ্ঠানিকভাবে নেতৃত্ব অর্জন করিয়ে দেয়া হবে। সেই একজন ছিলেন ইউসায়ের রাজিম (Yusayr Razim) যিনি খাইবারের পতনের আগে ইহুদিদের সামরিক সেনাপতিদের একজন নেতা ছিলেন। মুহাম্মদ রাওয়াহাকে (Rawaha) স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি চান না ইউসায়রকে ইয়াছরিবে নিয়ে আসা হোক। তার মানে, তাকে পথেই হত্যা করতে হবে (২৩)। রাওয়াহা ইউসায়েরকে মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য ইয়াছরিবে নিয়ে আসতে রাজি করিয়েছিলেন। মুহাম্মদকে বিশ্বাস না করার জন্য অন্যান্য ইহুদিদের সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও, ইউসায়ের অন্য আরো ত্রিশজন ইহুদি সহ উটের পিঠে চড়ে ইয়াছরিবের উদ্দেশ্যে রওনা হন। যেহেতু মুহাম্মদের বিজয়ের পড় ইহুদিরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে যাওয়ার পড়েছিল সুতরাং ইহুদিদের কেউই অস্ত্র বহন করেনি, কিন্তু রাওয়াহার লোকেরা তলোয়ার দিয়ে সজ্জিত ছিল। খাইবারের বাইরে যখন তারা মাত্র অর্ধদিনের যাত্রা শেষ করছিল, তখন ইউসায়ের বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি ফাঁদে পা দিয়েছেন। তিনি রাওয়াহার তলোয়ারটির দখল নিতে চেয়েছিলেন, তবে রাওয়াহার তলোয়ার তার দখলেই থাকে। এটি একটি গণহত্যায় পরিণত হয়েছিল। ইহুদিদের মধ্যে মাত্র একজনই পালাতে সক্ষম হয়েছিল (২৩)।

মুহাম্মদের মৃত্যুর কুড়ি বছর পরে উমর খাইবারের ইহুদিদের তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। ততদিনে ইহুদিদের (কৃষি-দক্ষতা) প্রতিস্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত দক্ষ মুহাম্মদী অনুসারী পাওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু উমরের জন্য তাদের বিতাড়িত করার জন্য একটি অজুহাতের দরকার ছিল। উমরের পুত্র আবদুল্লাহ, মুহাম্মদের চাচাত ভাই জুবায়ের এবং নতুন ধর্মের (ইসলামের) সম্ভ্রান্ত আরেকজন ব্যক্তি তাদের সম্পত্তি খতিয়ে দেখার জন্য খাইবারে গেলে এই সুযোগটি পাওয়া যায়। তারা যখন দূর্গে ঘুমিয়ে ছিলেন সেই সময় আব্দুল্লাহর উপর অত্যাচার করা হয়, তার হাতের একটা কব্জিতে আঘাত করা হয়। যদিও এটা তেমন মারাত্মক কোন আঘাত ছিল না, তবে এই খবর উমরের কানে যাওয়ার পর তিনি ইহুদিদের বিতাড়িত করার আদেশ দেন, যেহেতু তার মাত্র কিছুদিন আগেই মুজাহির রাফি (Muzahhir Rafi) নামে এক অবৈধ বাগান দখলদারকে হত্যা করা হয়েছিল। খাইবারে মুহাম্মদের দেয়া সম্পত্তিতে কাজ করতে তিনি সিরিয়া থেকে দশজন খ্রিস্টান দাসকে নিয়ে আসেন। ইসলামী গ্রন্থসমূহে বলা হয়েছে, খাইবার ইহুদিরা মুজাহিরকে হত্যা করতে সেই দাসদের উৎসাহিত করেছিল, তারপর তাদের সিরিয়ায় ফিরে যেতে সহায়তা করেছিল।

মুহাম্মদ প্রমাণ করেছিলেন যে জাহান্নাম আছে, কিন্তু সেটি ছিল পৃথিবীতে তার সৃষ্ট জাহান্নাম। ইয়াছরিবের কায়নুকা ও বানু নাযীর গোত্রের ইহুদিদের মতো খাইবারের ইহুদিরাও তাদের জিনিসপত্র উটের উপরে বোঝাই করে, গভীর দুঃখের সাথে তাদের পৈতৃক ভিটামাটি ছেড়ে চিরতরে চলে যায়, আর কখনও ফিরে আসে না।

অধ্যায় - ২৮

আব্রাহামের আস্তানা

হুদাইবিয়া চুক্তি মুহাম্মদকে খাইবার জয়ের সুযোগ করে দেয়। হুদাইবিয়ার কাজ সম্পন্ন হলে, তিনি চুক্তির অধীনে শর্তাবলী মেনে তীর্থযাত্রার জন্য মক্কার দিকে নজর দেন। যদিও এটি সংক্ষিপ্ত সফর ছিল, তবুও এই সফরটি আরবের বহুত্ববাদের কেন্দ্রে মুহাম্মদের জন্য একটি প্রতীকী বিজয়ের প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ এই স্বল্প সময়ের অবস্থানকালে মুহাম্মদ কিছু পৌত্তলিক রীতিনীতিকে তার ধর্মের চর্চার মধ্যে রূপান্তরিত করেছিলেন।

গত বছরের বাতিল হয়ে যাওয়া তীর্থযাত্রার একই মাসে এই তীর্থযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধবিরতির শর্ত অনুযায়ী, মুহাম্মদকে শুধুমাত্র তিনদিনের জন্য ছোট তীর্থযাত্রার অনুমতি দেয়া হয়। যুদ্ধবিরতির শর্ত অনুযায়ী, অসময়ে তীর্থযাত্রার জন্য তার আচার-অনুষ্ঠান শুধু মক্কার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল সেটি হলো, মুহাম্মদের যুদ্ধের সরঞ্জাম পেছনে রেখে আসতে হবে। শুধু ব্যাক্তিগত তলোয়ার বহন করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল, তবে সেটাও খাপবদ্ধ থাকতে হবে।

তিনি তার দুই হাজার লোক নিয়ে তীর্থযাত্রীর সাধারণ সাদা চাদর পরিহিত হয়ে ইয়াছরিব ছাড়েন, কিন্তু গুপ্ত হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার আশঙ্কায় তিনি মাসলামার নেতৃত্বে আরো একশোজন যোদ্ধার অশ্বারোহী বাহিনীকে সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে আগেই পাঠিয়ে দেন যাকে সুরক্ষিত এলাকার (হারাম) বাইরে অবস্থান করার আদেশ দেয়া হয়। মুহাম্মদ ও তার তীর্থযাত্রী বেশের যোদ্ধারা আগের অশ্বারোহী বাহিনীর পৌঁছানোর একদিন পর আসেন এবং তাদের সাথে করে নিয়ে আসেন আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করার পশু। যাত্রাবিরতির জায়গাটি পবিত্র স্থান থেকে এত কাছে ছিল যে, সেখান থেকে সীমান্ত নির্দেশক পাথরের মূর্তি দৃশ্যমান ছিল। মুহাম্মদ যখন সীমানায় পৌঁছলেন, তখন মক্কাবাসীরা জানতে পারল যে তার লোকেরা সশস্ত্র সাজে সজ্জিত। আগ্রাসনের ভয়ে তারা তার কাছে যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী স্মরণ করিয়ে দিতে একজন দূতকে পাঠালেন। উত্তরে মুহাম্মদ বলেন যে, তিনি যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী মেনেই এসেছেন। তিনি তাদের জানান, এই অস্ত্রধারীরা তার নিরাপত্তারক্ষী। যদি কোন কারণে চুক্তির শর্তাবলী ভেঙে যায়, তাই তাদের আনা হয়েছে (১)।

দূতরা নিশ্চয়তা পেয়ে মক্কায় ফিরে গেলে মুহাম্মদ সেই দুইশত লোকের সামরিক বাহিনীকে শিবিরে রেখে বাদবাকি অনুসারীদের সবাইকে সাদা পোশাক পরে মক্কার উপত্যকায় নিয়ে যান। তীর্থযাত্রীরা উত্তরের সেই পথ ধরে হাঁটতে লাগল যেখানে ছিল মুহাম্মদের প্রথম স্ত্রী খাদিজা, তার প্রথম পুত্র কাসিম এবং তার পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের সমাধি। জীবন নিয়ে মক্কা থেকে পালানোর সাত বছর পর এই প্রথম তিনি এখানে পা রাখলেন। এখান থেকে হেরা পর্বত দেখা যাচ্ছে যেখানে আজ থেকে কুড়ি বছর আগে তার মৃগীরোগে আক্রান্ত হওয়ার স্মৃতি রয়েছে। এই পথ ধরে একটু আগাতেই তিনি পরিষ্কার দেখতে পেলেন ঘনকাকৃতির মন্দিরটি, যেটি শুকনো নদীর তীরবর্তী শহরের মধ্যিখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে এবং দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন সাফা এবং মারওয়া পর্বতকে আলাদা করে দিয়েছে।

যেই তারা শহরে প্রবেশ করলেন, তার অনুসারীরা তার চারপাশে একটি আঁটসাঁট মানব ঢাল তৈরি করলেন, এবং যখন তারা মন্দিরের কাছাকাছি এলো তখন তারা একটি সারি গঠন করল। মুহাম্মদ তার উট আল-কাসওয়ায় চড়ে তার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করলেন। মুহাম্মদের উটের নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ রাওয়াহা (Abdullah Rawaha)। তিনি জোরে জোরে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন, যা থেকে বোঝা যায় তার উপর মুহাম্মদের প্রভাব ছিল। কবিতাটি এরূপ :

তার পথ থেকে সরে যাও,
তোমরা অবিশ্বাসী,
তার জন্য পথ তৈরি কর।
সব ভালো জিনিসই তাঁর রাসূলের জন্য,
হে প্রভু, আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করি,
তাকে মেনে নেয়া মানে ঈশ্বরকে মেনে নেয়া।
আমরা এর ব্যাখ্যা নিয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করব,
যেমন আমরা যুদ্ধ করেছি তোমাদের সাথে,
ঘাড় থেকে মাথা নামিয়েছি,
আর বন্ধুকে বন্ধু থেকে করেছি বিস্মৃত (2)।

কিছু সংস্করণে পাওয়া যায়, মুহাম্মদ উটের উপর বসেই মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। অন্য সংস্করণে পাওয়া যায়, তিনি পায়ে হেঁটে সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন এবং কালো পাথর ছুঁয়েছিলেন অথবা প্রতিবার ঘোরার সময় চুমো খেয়েছিলেন। তিনি যা করেছেন তার অনুসারীরাও তাই করেছে। এই রীতির সাথে তিনি তার দাবিকেও আরো একটু ঝালিয়ে নিয়েছিলেন যে, এটি আর সহিষ্ণু মক্কাবাসীদের মন্দির নেই, যার দরজা খোলা ছিল যেকোনো পৌত্তলিক দেবদেবীদের জন্য এমনকি খ্রিস্টান বা ইহুদিদের জন্যও, কিন্তু এটা এখন মুহাম্মদের আল্লাহর ঘর। এটা এখন নিরেট এক একেশ্বরবাদ যার উপরে মুহাম্মদ তার মনের ক্ষিপ্ত রাক্ষসদের কলম (graft) লাগিয়ে যাচ্ছেন। যখন তিনি মন্দিরের আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন তারপর সাফা ও মারওয়া পর্বতের মাঝামাঝি দৌড়ালেন। এটা দুটি পাথরের পর্বত ছিল যা মক্কাবাসীরা ইসাফ (Isaf) এবং নায়লা (Naila) নামক ব্যক্তিদ্বয়ের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তারা ছিলেন দুর্ভাগ্যবান প্রেমিক-প্রেমিকা যারা মন্দিরের নিচের দেয়ালের ভেতরে যৌনমিলন করার জন্য পাথরে পরিণত হয়েছিল। এখন পাহাড় দুটি আল্লাহর, এবং মুহাম্মদ তাদের মাঝ বরাবর দৌড়ানোর অনুমতি দিয়ে একটি নতুন অর্থ দাঁড় করিয়েছিলেন যে, এই দৌড়ানো হচ্ছে এখন থেকে হাগারের (Hagar) কাহিনীর প্রতীক। ইব্রাহিম হাগারকে এবং তার শিশুপুত্র ইসমাইলকে শুষ্ক উপত্যকায় ফেলে রেখে চলে যাওয়ার পর হাগার পানির খোঁজে দুই পাহাড়ের মাঝখানে উন্মত্তের মতো দৌড়াতে থাকেন। মন্দিরের একপ্রান্তে অর্ধবৃত্তাকার পাথরের পাটাতন ছিল, যেটা ছিল মক্কাবাসী অভিজাতদের সভাস্থল, কিন্তু এখন সেটা রূপান্তর হয়ে গেছে ইসমাইলের সমাধিস্থলে।

যখন এই পুনর্সংজ্ঞায়িত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো, মুহাম্মদ তীর্থযাত্রার সমাপ্তি চিহ্নিত করার জন্য তার মাথা মুণ্ডন করলেন এবং কোরবানির পশু জবাই শুরু করলেন। তাদের শুধুমাত্র আল্লাহর নামে হত্যা করতে হবে, এর অন্যথা হলে আল্লাহ তাআলা তাদের রক্ত উৎসর্গকে প্রত্যাখ্যান করবেন। শিবির এবং অস্ত্র পাহারা দেয়া তার অনুসারীদের অব্যাহতি দিতে মুহাম্মদ তাঁর তার সাথে থাকা বাকি দুইশত লোককে কোরবানির পর শিবিরে পাঠিয়ে দেন ওই সশস্ত্র দল এখন মক্কায় গিয়ে তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করতে পারে।

মুহাম্মদ মক্কাবাসী মন্দিরের প্রতীকী দখল চিহ্নিত রাখতে আরেকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মক্কাবাসীদের প্রতিবাদ সত্ত্যেও তিনি মন্দিরের ভেতরে তার প্রাক্তন দাস বেলালকে নিয়ে যান এবং নামাজের আহ্বান জানানোর জন্য ছাদে উঠতে আদেশ দেন। এতে মক্কাবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়, বিশেষ করে উমাইয়া ইবনে খালাফের প্রাক্তন দাস বেলালকে তাদের প্রিয় মন্দিরের উপর থেকে এভাবে জোরে চিৎকার করতে দেখে, কিন্তু তারা কিছুই করতে পারছে না (৩)। যদিও এটি চুক্তির মধ্যে ছিল না, কিন্তু মুহাম্মদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল এইসব। তিনি মন্দিরের বাইরে আসেন এবং তীর্থযাত্রীদের সারির সামনে অবস্থান নেন। বেলালের আহ্বানের সাথে তীর্থযাত্রীরা তার বাধ্যতামূলক নামাজের বিধি মোতাবেক মুহাম্মদকে অনুসরণ করতে থাকে এবং তার আবৃত্তি করা কোরআনের আয়াতও পুনরাবৃত্তি করতে থাকে।

সম্ভবত এই তীর্থযাত্রার সময় মুহাম্মদ উমরকে মাকামে ইব্রাহিম তথা ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর পাথরের দিকে ইঙ্গিত করলেন, কারণ এটা ছিল তার জন্য প্রথম সুযোগ। যেমনটা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, (৪) মুহাম্মদ ইহুদিদের সাথে তার বিচ্ছিন্নতা চিহ্নিত করতে আব্রাহামের গল্পটির স্থান পরিবর্তন করে তা মক্কায় নিয়ে যান এবং মক্কার দিকে প্রার্থনার দিক (কেবলা) পরিবর্তন করেন। মাকামে ইব্রাহিমের গল্প ছিল তার আব্রাহামিক কাহিনীর একটি কাল্পনিক সংযোজন। এই পাথরটি মন্দিরের প্রবেশদ্বারের কাছে অবস্থিত ছিল, যেটার উপর লোকজন বসত কিন্তু মুহাম্মদের কল্পনার কারণে এই পাথরটি একটি পবিত্র পাথর হয়ে যায় যার উপর দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম মন্দির নির্মাণের জন্য ইসমাইলের হাতে পাথর তুলে দিয়েছিলেন।

আমরা এখানেও হিংস্র উমরের কথা শুনতে পাচ্ছি, মুহাম্মদের সাথে কথা বলার সময় তিনি ভীতিকর কণ্ঠস্বর ব্যবহার করেছিলেন এবং জিজ্ঞেস করছিলেন, "এটাই কি আমাদের পিতার (ইব্রাহিমের) মাকাম?" আর মনের চোখে আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি মুহাম্মদ উমরকে মাথা নেড়ে হ্যাঁ সূচক জবাব দিচ্ছেন। আমরা আবারো উমরের ভীতিকর প্রশ্ন শুনতে পাচ্ছি, "আমরা কি এটাকে প্রার্থনার স্থান হিসেবে গ্রহণ করব?" (৫, ৬) চৌদ্দশত বছর পরেও আমরা উমরের ভীত কণ্ঠস্বর উপলব্ধি করতে পারি যে, এই প্রার্থনাগুলো এসেছিল কারণ আল্লাহ উমরের প্রশ্নগুলোকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, আর তাই আল্লাহ মুহাম্মদের কাছে প্রার্থনার আয়াতগুলোকে নাজিল করেছিলেন (৭,৮)।

মক্কায় এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে মুহাম্মদ আরেকটি স্ত্রী গ্রহণ করেন। যিনি ছিলেন মায়মুনা, খুজাইমার কন্যা ও জয়নাবের সৎ বোন। জয়নাব অনেক বছর আগে মুহাম্মদকে বিয়ে করার পরপরই মারা যান। মায়মুনা মুহাম্মদের স্ত্রীর চাচা আব্বাসের বোন ছিলেন, যিনি নিজে মক্কায় থাকার শেষের দিকে একটি বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। শুধুমাত্র স্ত্রী সংগ্রহের প্রতি তার আগ্রহ ছিল, এটি ছাড়া এই বিয়ের ব্যাপারে কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে সম্ভবত তিনি ধনী আব্বাসকে তার বৃত্তের মধ্যে নিয়ে আসতে এবং এটি তাকে একটি শক্ত অবস্থান দেবে, এজন্যই বিয়েটা করেছিলেন।

মুহাম্মদ গত ছয় মাসের মধ্যে দুটো বিয়ে করেন যেখানে মায়মুনা ছিলেন তার দ্বিতীয় স্ত্রী। অন্যজন ছিলেন আবু সুফিয়ানের মেয়ে রামলাহ, যিনি তার বরের সাথে আবিসিনিয়ায় চলে এসেছিলেন। তার বর আবিসিনিয়ায় মারা যান, এবং মুহাম্মদ একজন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। যেহেতু তিনি তার অন্যতম শত্রুর মেয়ে ছিলেন, সুতরাং এখানে রোমান্টিকতার চেয়েও রাজনৈতিক স্বার্থ বেশি জড়িত ছিল। কথিত আছে যে, আবিসিনীয় শাসক যিনি মুহাম্মদের বেশ কয়েকজন অনুসারীকে তার রাজ্যে হিজরত করার অনুমতি দিয়েছিলেন, তিনি বেশ কয়েকটি প্রক্সি বিয়ের আয়োজন করেন এবং তারপর স্ত্রীদের এবং অন্যান্য অভিবাসীদের ইয়াছরিবে মুহাম্মদের কাছে পাঠান। এর মধ্যে আলীর বড় ভাই জাফরও ছিলেন। তারা সেখানে উপস্থিত হন যখন মুহাম্মদ খাইবার অবরোধ করছিলেন। মায়মুনার সাথে বিয়ের কারণে মুহাম্মদ তার নির্ধারিত সময়সীমার চেয়ে বেশিদিন মক্কায় থাকেন। তিনি কয়েকজন খাজরাজ ও আউস নেতাদের সাথে মন্দিরের কাছাকাছি একটি খোলা জায়গায় একবার বসে ছিলেন, তখন বেশ কয়েকজন মক্কাবাসী তার কাছে এসে তার তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন যারা তাকে মক্কা ছেড়ে চলে যেতে বলেন। বলা হয় যে, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সুহায়েল যিনি এর আগের বছর তাঁর সাথে হুদাইবিয়া চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। মক্কাবাসীরা বিরক্তিকর মেজাজে ছিল এবং বলেছিল, "আপনার সময় শেষ, আপনি আমাদের এখান থেকে চলে যান।" উত্তরে মুহাম্মদ বললেন, "এটা কি খুব ক্ষতি হবে যদি তোমরা আমাকে থাকতে দাও এবং আমি তোমাদের জন্য একটি বিয়ের ভোজ আয়োজন করি? যদি আমরা খাবার প্রস্তুত করি এবং তোমাদেরও সেখানে নিমন্ত্রণ করি?" মক্কাবাসীরা বলল, "আমাদের তোমার খাবারের দরকার নেই, সুতরাং তুমি বের হও"(৯)। চুক্তি, চুক্তিই। মুহাম্মদ শান্তিপূর্ণভাবে মক্কা ত্যাগ করে ইয়াছরিবে ফিরে গেলেন।

অধ্যায় - ২৯

জিহাদ! জিহাদ! জিহাদ!

একবার কল্পনা করুন হামলার প্রাক্কালের দৃশ্যটি। মুহাম্মদ ধর্মপ্রচার মঞ্চের পাটাতনে (মিম্বার) বসে আছেন। তিনি রেগে আছেন এবং নামাজের জামায়াতে শরিক হওয়া লোকজন উঠোনে ভিড় জমিয়েছে। তিনি তার মুষ্টিবদ্ধ হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে কথা বলছেন। তিনি তাদের বললেন, তার ধর্মের প্রতি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ (জিহাদ) করার বাধ্যবাধকতা আছে, কিন্তু বিশ্বাসীদের অনেকেই যুদ্ধে না যেতে বিভিন্ন অজুহাত নিয়ে তার কাছে আসছে। তিনি তাদের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন কোরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করে: "তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়! এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না" (১)।

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে যুদ্ধ করে তাদের জন্য আছে অতি মূল্যবান পুরস্কার। মুহাম্মদ তাদেরকে খাইবারের কালো রাখালের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, যা ততদিনে বিখ্যাত গল্প হিসেবে প্রসার লাভ করেছিল, কারণ এই মেষপালকই একমাত্র ব্যক্তি ছিল যে একবারও প্রার্থনা না করেই জান্নাত লাভ করেছিল। সে একজন আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিল যে খাইবারের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির পশুপাল দেখাশোনা করত। মারহাবের প্রাসাদ অবরোধের সময় সে মুহাম্মদের কাছে গিয়ে জানতে চেয়েছিলেন তার ধর্মের অনুসারী হতে তার কি প্রয়োজন। "আমি তোমাদের সাক্ষ্য দেবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, আমি আল্লাহর রাসূল এবং তুমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত করবে না" – ব্যস এইটুকুই (২)। দাস জিজ্ঞাসা করল, "যদি আমি সাক্ষ্য দেই এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করি তাহলে আমি কি পাব?" উত্তরে মুহাম্মদ বললেন, "জান্নাত, যদি তুমি এটা বিশ্বাস করে মারা যাও।" শুধু এটুকুই লেগেছে ঐ দাসকে বিশ্বাসী বানাতে। রাখাল মুহাম্মদের হাত ধরে তার ধর্ম গ্রহণ করেই পাগলের মতো ছুটে গেল লড়াই করতে। এমনকি প্রার্থনা করার জন্য সে একমুহূর্তও পেল না, সেদিনই সে যুদ্ধে নিহত হলো। মুহাম্মদ সবাইকে আশ্বস্ত করেন যে, এই কালো রাখালকে সাথে সাথেই পুরস্কৃত করা হয়েছে, তাঁকে জান্নাতে দাখিল করা হয়েছে। কী ছিল সেই পুরস্কার! মুহাম্মদ একটি স্বপ্ন দেখে বলেন : "আমি তার দুই স্ত্রীকে দেখেছি তার শরীরের আলখাল্লা খুলে ফেলার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে; তারা তার চামড়া আর আলখাল্লার ভিতর প্রবেশ করছে" (৩)।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নতুন অভিযানে নেমে পড়া এখন মুহাম্মদের হাতে, এবং তাতে মানুষ যা করতে পছন্দ করে না তাই করতে হবে। মুহাম্মদ তাদের লোভ দেখাতেন তাদের জন্য আছে স্বর্গীয় যৌনতার সুযোগ, বা ঘুষ হিসেবে ভূখণ্ডের গনিমতের মাল! তবে অনুসারীদের জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ করত জাহান্নামের হুমকি। আল্লাহ তার জন্য যুদ্ধ করার সুযোগ দিয়েছেন যাতে তারা তাদের ঈমানী যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। এটা ছিল তাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা। যদি তারা যুদ্ধে না যাওয়ার অজুহাত খুঁজে বের করে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়, তাহলে তারা মোনাফেক বা ভুয়া বিশ্বাসী হবে। মোনাফেকদের জায়গা হবে জাহান্নামে, কারণ আল্লাহ মোনাফেকদের ঘৃণা করেন। বিশ্বাসীদের অবশ্যই তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে, তাদের বিশ্বাস প্রমাণ করতে হবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রমাণ করতে হবে, এমনকী কাজও তাদের এমন কাজ করতে হবে যা তারা করতে পছন্দ করে না এবং যা করলে মারা যাবার সম্ভাবনা থাকে। এটা তাদের ভালোর জন্যই, কারণ "আল্লাহ ভালো জানেন, যা আপনি জানেন না!"

ধর্মপ্রচারের মঞ্চ থেকে মুহাম্মদ তার সামনে জামায়াতের লোকদের মুখমন্ডল পর্যবেক্ষণ করতেন, একদল মুখ তার দিকে তাকিয়ে আছে খুবই মনোযোগ দিয়ে এবং তার কথা শুনছে। তিনি তাদের যেভাবে দেখাতে চান তারা সেভাবেই দেখছে, তাদেরকে তিনি আটকে ফেলেছেন জান্নাত আর জাহান্নামের কল্পনার ফাঁদে।

মুহাম্মদ তার সাহাবিদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলেন, "তোমরা কি জাহান্নামের আগুন কামনা করো?"
তারা কেঁদে উত্তর দিল "না!"।
"তাহলে তোমরা কি চাও?"
"জান্নাত, হে আল্লাহর রাসূল। জান্নাত! আমাদের জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ দান করুন!"
তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন "জান্নাত লাভের জন্য তোমাদের কি করা উচিত?"
তারা উত্তর দিল, "জিহাদ!"
তিনি বললেন, "আমি তোমাদের কথা শুনতে পাচ্ছি না!"
উত্তরে তারা আবার বলল, "জিহাদ!"
মুহাম্মদ বললেন, "আবার বল, যাতে আল্লাহ তোমাদের কথা শুনতে পায়!"
তারা সমস্বরে বলে উঠল, "জিহাদ, জিহাদ, জিহাদ!"

না, এতে হবে না, এদেরকে আরও উত্তেজিত করতে হবে। তাদের রক্তের গন্ধ নিতে হবে, রক্তের স্বাদ নিতে হবে, রক্তের কথা ভাবতে হবে। মুহাম্মদ এবার আকাশের হাত দিকে তুললেন এবং আল্লাহর কাছে হতভাগা আত্মাদের জন্য করুণা ভিক্ষা করলেন। তারপর চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন,
"যুদ্ধের কোন আর্তনাদ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়?"
তারা বলল : "খুন, খুন!"
"আমি তোমাদের কথা শুনতে পাচ্ছি না!" মুহাম্মদ বললেন।
তারা আবার বলল : "খুন, খুন!"
"আবার বল, যাতে আল্লাহ তোমাদের কথা শুনতে পান!"

তারা সমস্বরে বলে উঠল, "হত্যা, হত্যা, হত্যা, হত্যা!" তারা তাদের পায়ের তালুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে শূন্যে হাত তুলে চিৎকার করে কথাটা বলল। এবং এরপর তারা আরেকটি অভিযানে বেরিয়ে পড়ল। প্রথমে ত্রিশ অথবা তিনশত, এরপর শীঘ্রই তিন হাজার এবং অবশেষে ত্রিশ হাজার কিংবা পরিশেষে আরো বেশি সংখ্যক সেনা ভোরের দিকে আক্রমণ করলো। **হত্যা, লুণ্ঠন এবং বন্দি করে লোকেদের তারা দাস বানিয়ে ফেলল; কিন্তু দিনশেষে আসলে তারা নিজেরাই দাসত্বের শেকলে বন্দি হয়ে গেল** (৪)।

খাইবারের হামলার বছরেই মুহাম্মদ এক ডজনেরও বেশি আক্রমণকারী দলকে পাঠালেন বিভিন্ন অভিযানে (জিহাদে)। বরাবরের মতই, এই অভিযানের একাধিক উদ্দেশ্য ছিল, যেমনঃ শত্রুদের উপর সক্রিয় আক্রমণ পরিচালনা, সেটি হতে পারে বাস্তব কোন হুমকির প্রেক্ষিতে বা কল্পিত কোন হুমকির চিন্তায়; এবং জোরপূর্বক ধর্মান্তর, লুণ্ঠনের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা ও আতঙ্ক বা ত্রাসের সৃষ্টি করা। তার এই অভিযানগুলোর একটি নীতি ছিল। প্রথমে তিনি শান্তিপূর্ণভাবে মানুষকে তার ধর্মে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাতেন এবং লোকদেরকে মুহাম্মদকে নবী হিসেবে মেনে নেয়ার আহ্বান করতেন। যদি তারা অস্বীকার করত তবে তিনি তাদেরকে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার জন্য অপরাধী সাব্যস্ত করতেন। এই সময়ে (মুহাম্মদের জিহাদ পরিচালনার সময়ে) প্রতিপক্ষ চলে যায় আল্লাহর শাস্তির অধীনে, সুতরাং তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মানে দাঁড়াচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। সে বছর কিছু অভিযান ছিল প্রাথমিকভাবে এমন যে, 'যা-ই পাও তাই ভেঙ্গে দাও

এবং ধরো আর মারো’। এসব করার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল নারী এবং শিশুদের বন্দি করা এবং গবাদিপশু নিয়ে পালিয়ে যাওয়া। খাইবার থেকে ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যেই উমরকে তায়েফের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওয়াজিন (Hawazin) গোত্রের বিরুদ্ধে একটি মিশনে পাঠালেন মুহাম্মদ।

হাওয়াজিন গোত্রের লোকেরা ছিল মুহাম্মদের পালক মা হালিমার গোত্রভুক্ত আদিবাসী যাযাবরদের একটি সংঘ এবং একটি বৃহৎ এলাকা জুড়ে তাদের বিস্তৃতি ছিল। তারা মুহাম্মদের ধর্মে যোগদানের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। ফলে, তিনি যে আশা করেছিলেন তাদের উপর হামলা চালালে কিছু রাজস্ব আসবে তা ব্যর্থ হয়। উমর খালি হাতে ফিরে আসেন। হাওয়াজিন গোত্রের লোকেরা জানতে পারে যে, তাদের উপর আক্রমণ করা হবে তাই তারা তাদের নারী, সন্তান এবং গবাদিপশু নিয়ে আগেই নিকটবর্তী পাহাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লুকিয়ে ছিলেন (৫)। আবু বক্করের ভাগ্য ভালো ছিল - তিনি ইয়াছরিব থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে মরুভূমির মালভুমিতে বসবাসকারী গোত্র ফাজারাহ’র (Fazarah) উপর আক্রমণ করেন। আবু বকর ভোরের নামাজ আদায়ের পর ফাজারাহ’র বেদুইন শিবির থেকে কোনো প্রার্থনার আওয়াজ আসছে কিনা তা দেখতে সেখানে অপেক্ষা করতে থাকেন। যখন কোন শব্দ শুনতে পেলেন না তখনই আকস্মিক আক্রমণ শুরু করেন। তারা “হত্যা, হত্যা!” বলে চিৎকার করে এগিয়ে যেতে থাকেন, যে সকল পুরুষদের সামনে পান তাদেরই হত্যা করেন এবং নারী, শিশু এবং গবাদিপশুকে ঘিরে ফেলেন। এই হামলার স্মৃতিচারণ করেছিলেন সালামা আল আকওয়া, যে সালামা গর্ব করে বর্ণনা দিতেন কিভাবে তিনি সেই গাতফান যাযাবরদের সাথে লড়াই করেছিলেন যখন তারা মুহাম্মদের কিছু উট চুরি করেছিল। তার নামে একটি গল্প প্রচলিত ছিল এ রকম - সালামা সাতটি পরিবারের সকল পুরুষদের হত্যা করেছিলেন এবং পাহাড়ে পালিয়ে যাওয়ার আগে সকল নারী ও শিশুদের বন্দি করেছিলেন। এটি ছিল সালামার জন্য দারুণ গর্বের বিষয়! এই যুদ্ধে বন্দি নারীদের মধ্যে একজন তরুণী ছিল অসাধারণ সুন্দরী। আবু বকর এই তরুণীকে গনিমতের মালের ভাগিদার হিসেবে সালামাকে দিয়ে পুরস্কৃত করলেন, কিন্তু ইয়াছরিবে ফিরে আসার পর মুহাম্মদ এই নারীকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন। এর আগে, এই তরুণীর সাথে শোয়ার আগ্রহ নিয়ে যখন সালামা তার উপগত হলেন এবং নিশ্চিত হলেন যে, সে গর্ভবতী না ঠিক তখনই সালামা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তরুণীকে মুহাম্মদের হাতে তুলে দেন। মুহাম্মদ সাম্প্রতিক সময়ে মক্কায় বন্দি হয়ে থাকা ধর্মান্তরিতদের বিনিময়ে এই তরুণীকে দান করেন (৬)।

আরেকটি হামলাকে ‘যৌতুক অভিযান’ বা দেনমোহর অভিযান বলা যেতে পারে। হাদরাদ (Hadrad) নামের একজন ইয়াছরিবী মুমিন যিনি নাজ্জার গোত্রের এক নারীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন এবং তাকে দুইশত রৌপ্যমুদ্রা যৌতুকের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সমস্যা হল, বিয়ের ভোজের জন্যই তার কাছে কোন টাকা ছিল না, যৌতুক তো পরের কথা! তিনি মুহাম্মদের কাছে ঋণ চাইলেন, কিন্তু মুহাম্মদ এত টাকা যৌতুক দিয়ে এই নারীকে বিয়ে করবে শুনে তা নিয়ে রসিকতা করলেন। তার হাতে এই ধরনের নগদ টাকা ছিল না। মুহাম্মদ এই পাগল প্রেমিককে টাকাও দিতে পারলেন না, কিন্তু তাকে অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিলেন এভাবে : মুহাম্মদের কাছে একটি খবর এলো যে, রিফা কায়েস নামের এক বেদুইন তার উট চুরির ষড়যন্ত্র করছে। গুজব ছিল যে, এই দুর্বৃত্ত তার দলবল নিয়ে গাবাহ (Ghabah) উপত্যকার কাছে ঘাঁটি গেড়েছে যেখানে মুহাম্মদ তার গনিমতের উটগুলো চড়াচ্ছিলেন। সেই এলাকাটি ইতোমধ্যেই কয়েকটি লুটের অভিযানের লক্ষ্যবস্তু ছিল। মুহাম্মদ হাদরাদ ও আরও কয়েকজনকে এই আক্রমণ মোকাবেলার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। ইসলামিক গ্রন্থে এই অভিযানের খুব ভালো বিবরণ দেয়া হয় না। তবে এটুকু জানা যায় যে, হাদরাদ তার বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা পেয়েছিল। তিনি পরে একটি আকস্মিক আক্রমণে রিফাকে হত্যা করা নিয়ে গর্ব করে বলেন : “আমি তার উপর লাফিয়ে পড়লাম এবং আল্লাহু আকবর বলে তার মাথাটা কেটে ফেললাম! আমার সঙ্গীরাও একই কাজ করেছে। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তারা দিগ্বিদিক পালিয়ে গেছে, আর সাথে করে নিয়ে গেছে তাদের নারী, শিশু এবং তাদের সম্পত্তি। আমরা তাদের উট ও বিশাল সংখ্যক গবাদিপশু নিয়ে ইয়াছরিবে ফিরে যাই, এবং সাথে করে আমি রিফার কাটা মাথা নিয়ে আল্লাহর

রাসূলের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে তেরোটা মালপত্র বোঝাই উট দিয়েছিলেন যা থেকে আমি যৌতুক প্রদান করি। এই গনিমতের মাল দিয়েই আমি আমার বিয়ের কাজ শেষ করি" (৭)।

মুহাম্মদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাড়তে থাকায় মুহাম্মদের সকল অভিযান সবসময় অনুকূলভাবে শেষ হয়নি। খাইবার পতনের পরপরই তিনি মক্কার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বেদুইনদের বিরুদ্ধে আউজা নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে পঞ্চাশজন অশ্বারোহীকে পাঠান, যাদের সাথে হাওয়াজিনদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। মুহাম্মদ আউজাকে নেতা হিসেবে বেছে নেন, কারণ তিনি সেই গোত্র থেকে এসেছেন তাই তিনি তাদেরকে মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে ভালোভাবে প্ররোচিত করতে পারবেন। প্রথমে স্বগোত্রীয় লোকদের মুহাম্মদের ধর্মে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানাতে তাকে নির্দেশ দেন, যদি তারা অস্বীকার করে তাহলেই যেন তাদের উপর আক্রমণ করা হয় বলে দিলেন মুহাম্মদ।

আউজা তার গোত্রের একজনকে তারই গোত্রের নজরদারির দায়িত্ব দিয়েছিলেন যেটি ছিল ভুল তার সিদ্ধান্ত। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, এই লোকটিও একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মুসলিম, কিন্তু লোকটি আসলে তার গোত্রের প্রতিই বিশ্বস্ত ছিল। ফলে আসন্ন হামলা সম্পর্কে তাদেরকে তিনি আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আর তাই আউজার নেতৃত্বে থাকা হামলাকারীরাই ফাঁদে পড়ে যায়। যখন আউজা বেদুইন অঞ্চলে পৌঁছলেন তখন মুহাম্মদের নির্দেশনা মোতাবেক গোত্রবাসীকে শুরুতে মুহাম্মদের ধর্মে যোগদানের আহবান করে বললেন, এর অন্যথা হলে ভয়ঙ্কর পরিণামের মুখোমুখি হতে হবে! তখন গোত্র নেতা প্রত্যুত্তরে বললেন, "আপনারা যে প্রস্তাব দিচ্ছেন তা আমাদের দরকার নেই"(৮)। তারপরই আউজা ও তার যোদ্ধারা আক্রমণ শুরু করে দেয়, কিন্তু সংলগ্ন পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা বেদুইন যোদ্ধারা তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করতে থাকলে আউজার জোট ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এরপর অশ্বারোহী বাহিনী এসে আউজার সেনাদের প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে। মাত্র কয়েকজন হামলাকারীই শেষপর্যন্ত জীবন নিয়ে ইয়াছরিবে ফিরে যেতে পেরেছিল।

আরেকটি বিপর্যয় ঘটে যখন মুহাম্মদ ফাদাকের কাছের আরেকটি বেদুইন গোত্রকে তার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে তাদের ত্রিশজন যোদ্ধার একটি দলের একজনকে ছাড়া বাকি সবাইকে হত্যা করে ফেলেন। হামলাকারী মুহাম্মদ-সেনারা যখন ফাদাকের বেদুইনদের গবাদিপশু ছিনিয়ে নিয়ে ইয়াছরিবের দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন পথিমধ্যে বেদুইনদের একটা বিশাল বাহিনী তাদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সেনাপতি বশিরই একমাত্র পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। ঘটনার প্রতিশোধ নিতে মুহাম্মদ গালিব নামের একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধার নেতৃত্বে দুইশত লোক পাঠান। এই বাহিনীতে ছিল জায়েদের ছেলে ওসামা, যিনি তখন বয়সে তরুণ। গালিব ভোরের দিকে আকস্মিক আক্রমণ চালান, চিৎকার করে বলতে থাকেন "মেরে ফেলো, মেরে ফেলো!"(৯) হামলাকারীরা বেদুইনদের শিবিরে ঢুকে তাদের হাতের কাছে যাকেই পেল তাকেই হত্যা করলো। অতঃপর তারা বন্দী, উট ও ছাগল নিয়ে ইয়াছরিব ফিরে আসে। এই প্রতিশোধ অভিযানের সময়ে কাফেরদের হত্যা করার জন্য ওসামার যেন হাত চুলকাচ্ছিল। সে ক্ষমার অযোগ্য এক পাপ করে বসলো, ওসামা এমন একজনকে হত্যা করল যে কিছুক্ষণ আগেই নিজেকে মুমিন হিসেবে ঘোষণা করেছিল!

জান্নাতের সুন্দরী হুরের আশায় ওসামা লোকটিকে পেছনে ধাওয়া করতে থাকে। লোকটি একটু আগে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও কিন্তু ওসামা তাকে হত্যা করে ফেলেন। যোদ্ধাদের উৎসাহ দিতে স্বর্গের অপ্সরাদের বর্ণনা করা যেমন ছিল এই ধরনের লড়ায়ের সময়ের একটি সাধারণ ঘোষণা, তেমনি এটি হতাশারও কারণ ছিল। বেদুইনরা মুখে মুখে মুহাম্মদের ধর্মের আরো কিছু অদ্ভুত ধারণা জেনেছিল এবং তাঁবুর পাশে আগুন জ্বালিয়ে আড্ডা দিতে বসে এগুলো নিয়ে আলোচনা করত। এগুলো নিয়ে মজা করার চেয়ে, তারা বিশেষ করে মুহাম্মদের জন্য মারা যাওয়া পুরুষদের মৃত্যুর জন্য হতাশা প্রকাশ করতেন। তাছাড়াও, খুন হয়ে যাবার হাত থেকে বেঁচে থাকতে তারা জাদুকরি শব্দ উচ্চারণ করার কৌশলটিও শিখেছিল - শাহাদার ঢাল। তাদের যা করতে হতো তা হচ্ছে শুধু "আল্লাহ ছাড়া আর একজন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ

তাঁর একমাত্র রাসূল" এই বাক্য বলা। এটি বললেই তারা বেঁচে যেত। কিন্তু এর খারাপ দিকটি হচ্ছে, এটি বলার সাথে সাথে তারা আজীবন মুহাম্মদের ধর্মের সাথে আটকে যেতেন। কারণ, এরপরে যদি তারা মুহাম্মদের ধর্ম আবার ত্যাগ করে তবে তাদের মৃত্যুদণ্ডের সম্মুখীন হতে হবে। ওই বেদুইনটি মুহাম্মদের এই জাদুকরী ফর্মুলা সম্পর্কে সচেতন ছিল, কারণ যখন ওসামা তাকে ধরে হত্যা করতে যাচ্ছিল তখন সে চিৎকার করে বলল, "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তার মনোনীত রাসূল!" তবুও উত্তেজিত হয়ে ওসামা তাকে হত্যা করেন। মুহাম্মদ যখন এই কথা জানতে পারলেন তিনি প্রচন্ড রেগে গেলেন। ওসামা প্রতিবাদ করে উত্তর দিয়ে বললেন : "কিন্তু হে আল্লাহর রাসূল, সে শুধু শাহাদাহ উচ্চারণ করেছে যাতে আমি তাকে হত্যা না করি (10)।

মুহাম্মদ ওসামাকে বিদ্রুপ করে তাকে সন্ত্রাসের তত্ত্ব এবং তার প্রয়োগের ব্যাখ্যা করে বললেন : হামলা, আক্রমণ, হত্যাকাণ্ড, এগুলো সবই মানুষকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল যাতে হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করে অথবা জিজিয়া কর প্রদান করে। তুমি তখনই বিজয়ী হবে যে মুহূর্তে তুমি লোকজনকে ইসলাম ধর্মে আত্মসমর্পণ করাতে পারবে। এটা ছিল আত্মসমর্পণের ব্যাপার, যদি সেই আত্মসমর্পণ শুধু হত্যার ভয়েও করে থাকে। যদি তারা তাদের বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়, তার মানে তারা আত্মসমর্পণ করেছে এবং শাহাদাকে গ্রহণ করেছে সুতরাং তাদের হত্যা করা যাবে না। মুহাম্মদের ক্ষোভ যখন কমে গেল তখন ওসামা নম্র ভাষায় প্রতিজ্ঞা করল যে, সে আর কাউকে হত্যা করবে না। মুহাম্মদের দুঃসাহসিক সম্প্রসারণবাদ দেখেই খাইবার-বিজয়ের আগের সাথে খাইবার-বিজয়ের পরবর্তী সময়কালের মুহাম্মদের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

খাইবারের সম্পদ, উশর (উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ) থেকে প্রাপ্ত অর্থ এবং জিজিয়া কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব এখন মুহাম্মদকে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র এবং ঘোড়া কেনার সুযোগ এনে দিয়েছে। **স্বর্গীয় পুরষ্কারের লোভ দেখানো এবং নারকীয় শাস্তির হুমকি দেয়া, মুহাম্মদের এই দুটি পলিসি মুহাম্মদকে তার সন্ত্রাস-নীতি বাস্তবায়নের জন্য সৈন্য সংখ্যা বাড়াতে বেশ সাহায্য করেছে।** বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকেরা তার কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করতে ছুটে আসছিল। কিছু গোত্র তার ধর্মে যোগ দিতে অথবা ধর্মান্তরের পরিবর্তে জিজিয়া কর দিতে সম্মত হয়েছিল। ক্রমাগত জনশক্তির প্রবাহের কারণে, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি প্রতিস্থাপন করা তার পক্ষে সহজ হয়ে উঠছিল।

মুহাম্মদ এছাড়াও মক্কা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দলত্যাগী অনুসারীদের জন্য বেশ উল্লসিত ছিলেন। এরা দুইজন ছিলেন বিশিষ্ট সামরিক নেতা ওয়ালিদের পুত্র খালিদ (খালিদ বিন ওয়ালিদ) (১১) যিনি উহুদে মুহাম্মদের সৈন্যদের বিরুদ্ধে অশ্বারোহী বাহিনীর সফল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং আরেকজন হচ্ছে আমর ইবনুল আস (১২), যিনি মক্কার একজন উদীয়মান সামরিক নেতা ছিলেন, যিনি গোপনে ইয়াছরিবের দিকে যাত্রা করেন এবং মুহাম্মদের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। খাইবার পতনের কিছুদিন পরেই তাদের দলত্যাগের ঘটনা ঘটে। ইসলামিক আদি গ্রন্থে এই দলত্যাগকে নিষ্ঠাপূর্ণ ধর্মান্তরের ঘটনা হিসেবেই দেখিয়ে বলা হয়েছে : 'আল্লাহ মুহাম্মদের ধর্মের আলো (নূর) তাদের হৃদয়ে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন, যার ফলে তারা এই ধর্মে যোগ দেন'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছিল তা ছিল ঠান্ডা মাথার হিসেবনিকেশ। তারা দেখেছে যে মক্কার অবস্থা খাইবারের মতো হওয়া ছিল কেবল সময়ের ব্যাপার, তাই হয়তো তারা এই পক্ষ-পরিবর্তনের সিদ্ধান্তটা নিয়ে নেয়।

এমন সাফল্য (দুজন দক্ষ সমরবিদকে দলে পাওয়া) দেখে উজ্জীবিত হয়ে যাওয়া মুহাম্মদ এখন তার ধর্ম আরবের বাইরেও ছড়িয়ে দেয়ার কল্পনা করেন। এক আশ্চর্য মহিমায় উদ্ভাসিত মুহাম্মদ এবার ঘোষণা করলেন যে, ঈশ্বর তার ধর্মকে সমগ্র বিশ্বের জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি একটি দাবির পুনরাবৃত্তি করলেন : "প্রত্যেক নবীকে একচেটিয়াভাবে তার নিজস্ব জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে, কিন্তু আমাকে পাঠানো হয়েছে সকল মানবজাতির জন্য (১৩)। নিজের উপর এই বিশ্বাসের সাথে আস্থা রেখে তিনি বাইজেন্টাইন, পারস্য, মিশর, আবিসিনিয়া এবং গাসসানিদের (Ghassanids) শাসকদের কাছে তার ধর্মে যোগ দেয়ার জন্য সেই অঞ্চলের সকল ক্ষমতাশীলদের কাছে দূত পাঠান। পারস্য ব্যতিরেকে বাদবাকি সবই ছিল খ্রিস্টান শাসনের

অধীনে। তিনি তার দূতদের হাতে লেখা চিঠিগুলো হস্তান্তর করে বললেন, "আমাকে দয়াস্বরূপ পাঠানো হয়েছে আর তা সকলের জন্য। অতএব আমার কাছ থেকে এই বার্তা তাদের পৌঁছে দাও, এবং আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন" (১৪)।

যেহেতু তিনি অর্ধশিক্ষিত ছিলেন, তবুও মুহাম্মদ তার অফিশিয়াল চিঠিতে কী কী লিখতে হবে তার জন্য লেখকদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতেন। তিনি পারস্যের সম্রাটের কাছে লিখেছেন : "পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে, আল্লাহর বার্তাবাহক মুহাম্মদের পক্ষ থেকে পারস্যের শাসক কিসরার প্রতি। যে ব্যক্তি হেদায়েতের (সুপথ) অনুসরণ করে, আল্লাহ ও তাঁর নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, যিনি এক এবং তার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ তার দাস ও রাসূল। আল্লাহ আমাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন এবং আমাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য পাঠিয়েছেন, যাতে আমি প্রত্যেক জীবিত মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয় জাগিয়ে তুলতে পারি। ইসলাম গ্রহণ করুণ এবং নিরাপদে থাকুন। যদি আপনি অস্বীকার করেন, তাহলে সকল জরথুস্ত্রীয়দের পাপের জন্য আপনি দায়ী থাকবেন। ইতি, আল্লাহর নবী মুহাম্মদ" (১৫)। এই চিঠিগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে মুহাম্মদ "আল্লাহর রাসূল" লেখা সীলমোহরযুক্ত একটা আংটি বানিয়েছিলেন। মুহাম্মদের চিঠিগুলোকে মোমের ছাপ দিয়ে সীল মেরে দেয়া হতো।

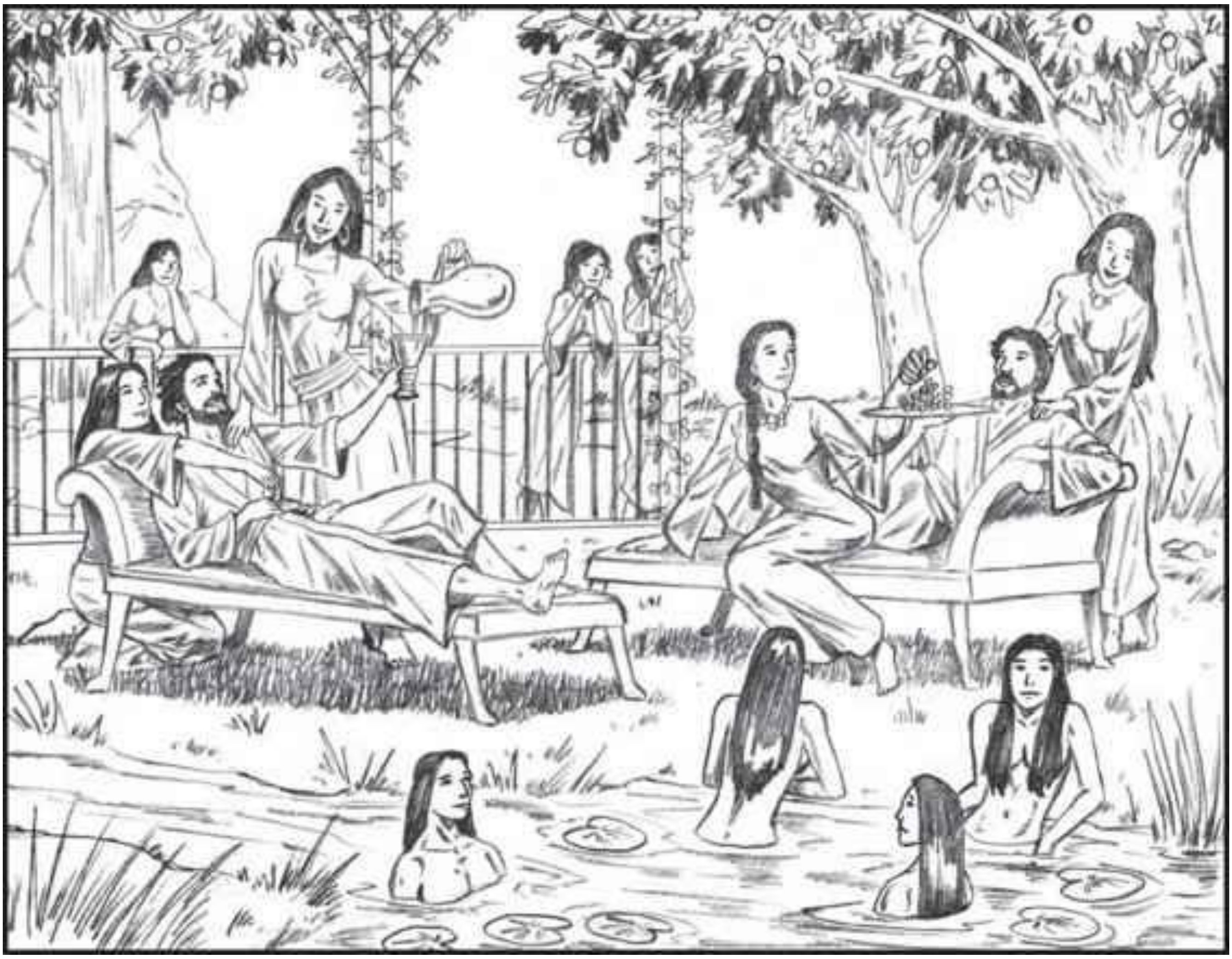
তখনকার অধিকাংশ শাসকই কখনো মুহাম্মদের নামই শোনেননি এবং তারা চিঠি পেয়ে এইভাবে উপসংহার টেনেছেন যে, এই বার্তাগুলো বিভ্রান্তিকর। কিন্তু কে এই বার্তার প্রেরক তা জানতে তারা আগ্রহবোধ করলেন। চিঠি পেয়ে পারস্য সম্রাট এতটাই ক্ষুব্ধ হলেন যে, তিনি চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন এবং পারস্যের অঙ্গরাজ্য ইয়েমেনের গভর্নরের কাছে একটি ফরমান পাঠালেন যে, মুহাম্মদকে যেন গ্রেফতার করে তার সামনে নিয়ে আসা হয়, কিন্তু সম্রাটের এই আদেশ সম্পাদনের আগেই সম্রাট একটি অভ্যুত্থানে নিহত হন। যখন বাইজেন্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস যিনি কনস্টান্টিনোপল শাসন করতেন, চিঠিটি পড়েন তখন মুহাম্মদকে অপমান করার জন্য এটি তার কুঁচকিতে ভরে রাখেন এবং হিজাজী আরবদের বন্দি করে মুহাম্মদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে তার প্রহরীদের পাঠান।

তারা ত্রিশজনকে আটক করে যাদের মধ্যে ছিলেন আবু সুফিয়ানও, যিনি দুর্ভাগ্যক্রমে কাফেলা ব্যবসা উপলক্ষ্যে গাজায় অবস্থান করছিলেন। মুহাম্মদ সম্পর্কে যা জানতেন মক্কাবাসীদের নেতা আবু সুফিয়ান তাই হেরাক্লিয়াসকে বললেন, কিন্তু তিনি সতর্ক করে দিলেন তাদের কথোকথনের খবর যেন মুহাম্মদের কানে না পৌঁছে। **তিনি হুদাইবিয়া যুদ্ধবিরতির শর্তানুযায়ী কাফেলা ভ্রমণ করেছিলেন, সুতরাং উত্তরের সাথে যে মক্কাবাসীদের নতুন বাণিজ্য রুট চালু হয়েছে মুহাম্মদকে রাগিয়ে দিয়ে তা তিনি বিপন্ন করতে চাননি।** মুহাম্মদের সাথে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে থাকা আবিসিনিয়ার রাজা ছাড়াও আর একমাত্র শাসক যিনি মুহাম্মদের বার্তাকে ইতিবাচক হিসেবে নিয়েছেন তিনি হলেন হেরাক্লিয়াসের নিয়োগকৃত মিশরের গভর্নর।

তিনি তার আলেকজান্দ্রিয়া অঞ্চল থেকে ধন্যবাদ বার্তা হিসেবে মারিয়া এবং শিরিন নামের দুই কপ্টিক খ্রিস্টান তরুণীকে দাসী হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, এবং সাথে পাঠিয়েছিলেন মাবুর নামের এক নপুংসক কৃষ্ণাঙ্গ দাসকে (১৬) আর দিয়েছিলেন একটি সাদা ফিমেল খচ্চর। **গভর্নরের এই বন্ধুভাবাপন্ন ব্যবহার সম্ভবত আবিসিনীয়দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, যারা মুহাম্মদের ধর্মকে একটি নির্যাতিত খ্রিস্টান উপধারা বলে বিশ্বাস করতেন।** মুহাম্মদ মারিয়াকে একজন যৌনসঙ্গী হিসেবে রাখেন এবং শিরিনকে তার কবি-মুখপাত্র হাসসান বিন ছাবিতকে দেন। তবে গাসসানিদের শাসক শিমারের পুত্র আল হারিছ যার আদালত ছিল দামেস্কে, তিনি মুহাম্মদের এই চিঠিকে প্রকাশ্য অবমাননা মনে করে এর জবাব দেন।

গাসসানিরা ছিল মূলত প্রধান 'খ্রিস্টান আরব' গোত্র, যারা আজকের জর্ডানের বড় একটি অংশ দখল করে ছিল। বাইজেন্টাইনদের জন্য এটি ছিল সামন্ত অঞ্চল, এই অঞ্চলটি বেদুইন অভিযানের বিরুদ্ধে একটি বাফার জোন হিসেবে কাজ

করত এবং বাইজেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে যে অনন্ত যুদ্ধ লেগে ছিল তারা তার জন্য জনশক্তি সরবরাহ করত। সম্ভবত হেরাক্লিয়াসের কাছে পৌঁছানো চিঠিটি পরোক্ষভাবে সেই 'খ্রিস্টান আরবদের রাজার' মাধ্যমেই তার কাছে পৌঁছেছিল, যিনি আল হারিছ নামে পরিচিত ছিল। আল হারিছ এই চিঠিটি হয় দিহইয়া কালবীর হাত থেকে পেয়েছেন যাকে ফেরেস্তা জিব্রাইলের মতো দেখতে এমনটা দাবি করা হতো, নয়তো সুজা নামের একজন যোদ্ধার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। বলা হয় যে, চিঠিটি পড়ার পর হেরাক্লিয়াস এটা ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন : "যে আমার দেশ নিয়ে আমার সাথে বিতর্ক করবে আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই করব, যদিও সে ইয়েমেনে আছে এবং তাকে আমার কাছে আনার জন্য লোক পাঠাবো"। এরপর তিনি বার্তাবাহককে বিদায় করে দেয়ার সময়ে বললেন, "তুমি যা দেখলে তা তোমার মনিবের কাছে পৌঁছে দিও" (১৭)।



[কালো চোখের জান্নাতের হুর। মুহাম্মদ মানুষকে তার কাজের জন্য মরতে উৎসাহিত করতেন এবং তাদের পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিতেন শাশ্বত যৌনতা ও জান্নাতে মদের অনন্ত বিনোদনের কথা বলে। কোরআনের বর্ণনা - "নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সফলতা। উদ্যানসমূহ, আঙ্গুরসমূহ আর সমবয়স্কা উদ্‌ভিন্ন যৌবনা তরুণী, আর পরিপূর্ণ পানপাত্র তারা সেখানে কোন অসার ও মিথ্যা কথা শুনবে না।" (১৮)।]

মুহাম্মদ সিরিয়ায় দ্বিতীয়বারের মতো দূত পাঠিয়েছেন। তবে এর বিবরণ ভাসা ভাসা পাওয়া যায়, কিন্তু সম্ভবত তিনি এটি করেছিলেন কারণ তিনি বাইজেন্টাইন সম্রাটের কাছ থেকে কোন সাড়া পাননি, যিনি মুহাম্মদ সম্পর্কে তার কাযর্ক্রম শুধু

গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। এটা ঘটেছিল সেই সময়ে যখন হেরাক্লিয়াস পারস্যের বিরুদ্ধে বাইজেন্টাইনদের সাম্প্রতিক সময়ে বিজয় এনে দিয়েছিলেন। এই বিজয়ের ফলশ্রুতিতে বাইজেন্টাইনরা লেভান্তের (Levant) নিয়ন্ত্রণও নিতে পেরেছিল। এই বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে তিনি জেরুজালেমে তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন। পারস্যের কাছ থেকে সত্যিকার ক্রসকে পুনরুদ্ধার করে জেরুজালেমে প্রতিস্থাপনের করা ছিল এই তীর্থযাত্রার কারণ (১৯)। মুহাম্মদ আশা করেছিলেন যে, তার দূতেরা এই বার্তা পথিমধ্যেই সম্রাটের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন। কিন্তু বার্তাবাহক তা আর করতে পারেনি। মৃত সাগরের (Dead sea) পূর্ব দিকে মুতা নামের একটি জায়গায় দূতকে আটক করা হয় এবং এই অঞ্চলের গাসসানিদ গভর্নর শুরাহবিল (Shurahbil) তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন (২০)। মুহাম্মদ এই হত্যাকাণ্ডের বদলা নিতে এ যাবৎকালের সবচাইতে বড় বাহিনী - তিন হাজার সৈন্যের দল গঠন করলেন শুরাহবিলকে আক্রমণের জন্য। তিনি তার প্রাক্তন পালকপুত্র জায়েদকে এই বাহিনীর নেতৃত্বে রাখেন এবং আলীর বড় ভাই জাফরকে রাখেন দ্বিতীয় কমান্ডে। সবসময়ের নির্ভরযোগ্য আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে তৃতীয় কমান্ডের জন্য নির্ধারণ করেন। এই বাহিনীতে শুধু মক্কাবাসী দেশপ্রেমিক ছিল তাইই না, ছিল ইয়াছরিবী ধর্মান্তরিতরা এবং ছিল বেদুইন ধর্মান্তরিতরাও। তারা ইয়াছরিবের উত্তরের একটি মাঠে জড়ো হয়, যেখানে মুহাম্মদ শেষ মুহূর্তের নির্দেশনা এবং তাদের উৎসাহ দিয়ে যুদ্ধে পাঠাতে বেহেস্তের বর্ণনা দিয়ে উৎফুল্য করেছিলেন। এটা অস্বীকার করা যায় না যে, বাইজেন্টাইনরা ইচ্ছাকৃতভাবে মুহাম্মদকে প্রলুব্ধ করার আশায় দূতকে হত্যা করেছিল যার মাধ্যমে মুহাম্মদ এখন বাইজেন্টাইনদের স্বঘোষিত শত্রু, যিনি প্রতিশোধ নিতে ইয়াছরিব থেকে বের হয়ে আসতে পারেন, এবং এটি করলে তবেই তাকে নির্মূল করা যাবে। গভর্নর হিসেবে শুরাহবিল (Shurahbil) গাসসানিদ রাজা ছাবিতের সাথে পরামর্শ না করে দূতকে হত্যা করেননি, যে ছাবিত আবার তার উপরের প্রভু হেরাক্লিয়াসের কাছ থেকেও অনুমতি চেয়ে থাকবেন নিশ্চয়ই। এই ধারণাটিকে সমর্থন করে এই তথ্যটি যে, হেরাক্লিয়াসের ভাই থিওডোরের (Theodore) নেতৃত্বে একটি বৃহৎ সৈন্যদল মুতার (Mutah) কাছে অপেক্ষা করছিল।

এই সংবাদটি জায়েদের জন্য একটা ধাক্কা ছিল। যখন তার বাহিনী মুতা থেকে একদিনের দুরত্বে ছিল, তখন তাদের অগ্রবর্তী দল বাইজেন্টাইনদের বৃহৎ এক সেনাদলের খবর জানালো এবং এই গুজবের কোথাও শোনালো যে, হেরাক্লিয়াস নিজেই এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন! জায়েদ তার অধস্তনদের সাথে বিতর্ক জড়িয়ে পড়লেন এই বিষয়ে যে, তাদের মুহাম্মদের কাছ থেকে শক্তিশালী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করা উচিত কিনা। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে রাওয়াহা শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন এবং এগিয়ে যেতে চাইলেন। রাওয়াহা যিনি তার কবিতার জন্য প্রখ্যাত ছিলেন, ইয়াছরিব ছাড়ার আগে কিছু পংক্তি রচনা করেছিলেন যাতে তিনি শহীদি মৃত্যুর ইচ্ছা প্রকাশ করেন (২১), (২২)। তিনি তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে একটি জোরালো শহীদি ভাষণ দেন যা মুহাম্মদের মতবাদেরই প্রতিধ্বনি করে। **রাওয়াহা বলেন : "আপনি যা অপছন্দ করছেন অথচ তার খোঁজেই আপনি বের হয়েছেন – শাহাদাতের তামান্নায় (শহীদ হওয়ার আশায়)। আমরা সংখ্যা, শক্তি দিয়ে শত্রুর সাথে লড়াই করছি না, কিন্তু আমরা তাদের মুখোমুখি হচ্ছি এমন এক ধর্ম নিয়ে যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের সম্মানিত করেছেন। তাহলে চলুন! উভয় সম্ভাবনাই আমাদের জন্য সঠিক আছে - হয়তো বিজয়, নয়তো শাহাদাত (শহীদ হওয়া)"** (২৩)।

সুতরাং এক বিশাল শত্রুদলের মোকাবেলা করার জন্য তারা উত্তরদিকে এগিয়ে গেল। আগের যুদ্ধের তুলনায়, মুতা যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ আশ্চর্যজনকভাবে কম পাওয়া যায়। সম্ভবত এর কারণ, মুহাম্মদের সেনাদলের জন্য এই যুদ্ধটি ছিল বিপর্যয়ের। মুতায় বাইজেন্টাইনদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জায়েদ, জাফর ও রাওয়াহা তিনজনই নিহত হন। ইসলামিক গ্রন্থে জাফর যিনি যুদ্ধের পতাকা হাতে মারা যান তার রক্তাক্ত বিবরণ পাওয়া যায় এভাবে : প্রথমে তার একটি কনুই হতে হাতের কব্জি পর্যন্ত কেটে ফেলা হয়, তারপর অন্য হাত কেটে ফেলা হয়, এরপর মৃত্যুর কোলে ঢলে না পড়া পর্যন্ত তিনি বুকের মধ্যে পতাকা (ইসলামের পতাকা) জড়িয়ে ধরে ছিলেন। রাওয়াহার মৃত্যুর বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি আহত হন এবং যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যান, কিন্তু তারপর নিজের মৃত্যুর জন্য কবিতা আবৃত্তি করেন। কারণ মারা গেলে জান্নাতে তার জন্য

আছে নিশ্চিত টিকেট। এটিই ছিল যোদ্ধাদের জন্য মুহাম্মদের প্রতিশ্রুত পুরস্কার। ইসলামিক গ্রন্থে আরো পাওয়া যায় যে, কেউ একজন তাকে এক টুকরো মাংস এনে দেন যাতে সেটা খেয়ে শক্তি ফিরে পান, কিন্তু তিনি তা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের প্রতি ভর্ৎসনা করে নিজেকেই বলেন: "আর তুমি এখনো বেঁচে আছো?" (২৪)

তারপর তিনি বাইজেন্টাইনদের কাছে নিজেকে সঁপে দিলেন, যারা তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলল। মুহাম্মদের সেনাদলকে একেবারে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন যিনি তিনি হচ্ছেন মক্কার সাম্প্রতিক ধর্মান্তরিত এবং সামরিক নেতা খালিদ, তিনি দ্রুত চিন্তা করে অবস্থা কিছুটা অনুকূলে আনেন। দ্রুতই তিনি কমান্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং পশ্চাদপসারণের আয়োজন করলেন। তবে বিস্তারিত কিছু পাওয়া না গেলেও, যে কেউ কল্পনা করতে পারে যে প্রধান শক্তিপক্ষ (মুসলিম বাহিনী) একটি সংকীর্ণ পাহাড়ের সরু পথ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে তাদের ত্যাগীরা পেছনের প্রহরী থার্মোপাইলের (Thermopylae) নির্ভীক সৈন্যদের মতো এক বিশাল শত্রুকে আটকে রেখেছে।

ইসলামিক আদিগ্রন্থে এই পরাজয়ের গ্লানিকে যথাসাধ্য কমিয়ে দিতে বাইজেন্টাইনদের সেনাদলতে দুই লাখ যোদ্ধা ছিল বলে দাবি করা হয়। যাতে সাদা চামড়ার বাইজেন্টাইন সেনাদল এবং আঞ্চলিক গোত্র থেকে কৃষ্ণাঙ্গ খ্রিস্টান আরবদের মিশ্রণ ছিল বলে বলা হয়। মুহাম্মদের অনুসারীদের মধ্যে মাত্র আটজনকে আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কিছু কিছু পন্ডিতরা বলেন যে, বাইজেন্টাইন সেনাদলের আকার মুহাম্মদের চেয়ে মাত্র দুই থেকে তিনগুণ বড় ছিল, এবং তারা ভালোভাবে যুদ্ধে সরঞ্জামে সজ্জিত ছিল। তাদের সৈন্যরা বছরের পর বছর ধরে পারস্যদের সাথে যুদ্ধ করার কারণে কঠোর যোদ্ধাও ছিল (২৫)। **সম্ভবত মুহাম্মদের দলের ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা ছিল শত শত যাদের বেশিরভাগই নতুন ধর্মান্তরিত বা বেদুইন সুযোগসন্ধানী ছিল; সেহেতু তাদের নাম ইসলামী গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।** মুহাম্মদ নিহতদের জন্য চোখের পানি ফেললেন, বিশেষ করে তার চাচাতো ভাই জাফরের জন্য। নিহতদের সকলকেই জান্নাতের পুরস্কার প্রদান করা হবে বলে তিনি রায় দেন। তারা সবাই জান্নাতবাসী ছিলেন, কিন্তু জাফরের অবস্থানগত মর্যাদার সাথে অন্যদের পার্থক্য ছিল। ধর্মপ্রচারের সিংহাসন থেকে তিনি ঘোষণা করেন : "আমি জাফরকে একজন ফেরেস্তা হিসেবে দেখেছি, জান্নাতে উড়তে দেখেছি, তার দুই ডানা রক্তে মাখা। আর আমি জায়েদকে তার নিচে দেখলাম এবং আমি বললাম, আমি মনে করি না যে জায়েদ জাফরের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ।" তখন ফেরেস্তা জিব্রাইল তার কাছে এসে বললেন, "জায়েদ জাফরের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু আমরা ফেরেস্তারা জাফরকে অধিক পছন্দ করার কারণ হচ্ছে আপনার সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক" (২৬)। বিশ্বাসীরা গল্পটি আত্মস্থ করে ফেলে এবং তারপর থেকে জাফরকে 'উড়ন্ত' (جعفر الطيار বা উড়ন্ত জাফর) বলে অভিহিত করে (২৭)।

মৃত্যুকামনাকারী রাওয়াহা সম্পর্কে মুহাম্মদ প্রথমে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। তিনি ঘোষণা করেন যে, রাওয়াহাকে প্রাথমিক ফটকের পরিবর্তে একটি পার্শ্ব-প্রবেশদ্বার দিয়ে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এই কথা শুনে তার সহকর্মী খাজরাজীরা বিচলিত হয়ে পড়লেন। তারা মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করেন তিনি কি তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে মারা যাননি? মুহাম্মদ তার ব্যাখ্যা করেন যে, যখন রাওয়াহা আহত হন তখন তিনি মৃত্যুবরণ করতে দ্বিধাবোধ করেন, পালিয়ে যান এবং এই কারণে তাকে জান্নাতের পার্শ্ব-প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়, অবশ্য তা সত্ত্বেও তিনি সত্যিই জান্নাতী হয়েছেন। মুহাম্মদ ব্যাখ্যা করলেন : "যখন সে আহত হলো, সে ফিরে এসেছিল। সে নিজের সমালোচনা করে, বুকে সাহস সঞ্চার করে তবেই আবার ফিয়ে গিয়ে শহীদ হয় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে"।

ইবনে কাছিরে পাওয়া যায় যে, শেষমেষ রাওয়াহার সহযোগী গোত্রবাসী তার বেহেস্তে যাবার কথা শুনে 'ভীষণ স্বস্তি' পেয়েছিলেন (২৮)।

অধ্যায় - ৩০
আত্মসমর্পণ

হুদাইবিয়ার চুক্তির অধীনে যে তীর্থযাত্রার অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল তা মুহাম্মদকে মক্কার প্রতীকী বিজয়ের সুযোগ করে দিয়েছিল, কিন্তু এই তীর্থযাত্রার কয়েকমাস পরে তাকে নিয়ে বিদ্রুপ করার অভিযোগে রক্তক্ষয়ী লড়াই শুরু হয় যা তাকে চুক্তি বাতিল করতে এবং সামরিকভাবে মক্কা দখল করে নেয়ার পক্ষে বাহানা তৈরি করে দেয়। হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে গড়ে ওঠা নতুন আন্তঃগোত্রীয় জোটের গভীরেই এ রক্তপাতের বীজ নিহিত ছিল, যা মুহাম্মদকে যেকোন গোত্রের সাথে তার পছন্দমত জোট বাঁধতে সহযোগিতা করে। এমনকি এই চুক্তির মাধ্যমে মক্কার ঐতিহ্যবাহী প্রভাবশালী গোত্রের সাথেও জোট করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। এর আগে বেশিরভাগ বেদুইন যারা মূলত মক্কাবাসীদের সমর্থন করেছিল তারা তাদের জোট-শিবিরেই রয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যাদের ভেতর (জোটের বিরুদ্ধে) অভিযোগ ছিল তারা মুহাম্মদের অনুগত হয়ে গেল। তাদের মধ্যে কিছুলোক ধর্মান্তরিতও হয়েছিল। কিন্তু হুদাইবিয়ার চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার দেড় বছরের মাথায় ঝামেলা শুরু হয় যখন মক্কাবাসীদের সাথে জোটবদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্য হতে এক বেদুইন যুবক একজন নওমুসলিমের সামনে মুহাম্মদকে নিয়ে অসম্মানসজন মন্তব্য করেছিল। কটুক্তি করার কারণে লোকটিকে বেধড়ক মারধর করে সেই নওমুসলিম। এ ঘটনাটি একের পর এক সহিংসতার জন্ম দিতে থাকে। সহিংসতার এই সময়ে কিছু মক্কাবাসী তাদের যাযাবর বন্ধুদের অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া এমনকি কিছু যোদ্ধা দিয়েও সাহায্য করে। শেষপর্যন্ত বেশ কয়েকজন লোক মারা গিয়েছিল, এবং তারা সকলেই এমন বেদুইন গোত্রের ছিল যাদের সঙ্গে আবার মুহাম্মদের জোট ছিল (১)।

বেদুইনদের সাথে জোট করাটা যে মক্কার নেতাদের ভুল সিদ্ধান্ত ছিল সেটি তারা সীমিত আকারে হলেও বুঝতে পেরেছিল। কারণ, তারা জেনেছিল যে হেরে যাওয়া গোত্রনেতারা মুহাম্মদের কাছে খুন হওয়া বেদুইনদের ব্যাপারে মক্কাবাসীদের জড়িত থাকার অভিযোগ নিয়ে ইয়াছরিবে মুহাম্মদের কাছে গিয়েছিল। মক্কাবাসী বুঝতে পেরেছিল, উদ্বিগ্ন মুহাম্মদ এই ঘটনাটি মক্কাবাসীদের উপর আক্রমণ করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করতে পারে! মক্কাবাসী জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করার জন্য এবং যুদ্ধবিরতি অব্যাহত রাখতে সন্ধিচুক্তির শর্তাবলী নিয়ে কথা বলতে আবু সুফিয়ানকে তখন ইয়াছরিবে প্রেরণ করে। মুহাম্মদ তার কথা শুনলেন, কিন্তু তখন তিনি যুদ্ধবিরতি অব্যাহত রাখার কোন নিশ্চয়তা দিতে পারেননি। আবু সুফিয়ান মুহাম্মদের দলের মধ্যে তার বন্ধুপ্রতিম লোকদের খুঁজে বের করলেন, যাতে যুদ্ধবিরতির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে এসব লোকের প্রভাব কাজে লাগিয়ে মুহাম্মদকে রাজি করাতে পারেন। আবু সুফিয়ান তার কন্যা রামলাকে (তার অন্য নাম উম্মে হাবিবা) দিয়ে শুরু করেন, যে রামলাহ খাইবার বিজয়ের পর থেকে মসজিদের অন্য স্ত্রীদের সাথে একই মুহাম্মদের সাথে একই দালানে বসবাস করছিলেন। রামলাহ তার বাবাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি তাকে সাহায্য করবেন না। তাকে দেখে বরং রামলাহ বিরক্ত হলেন। আবু সুফিয়ান বিছানার মতো পাতা একটি মাদুরের উপর যখন বসতে যাচ্ছিলেন তখন তার মেয়ে এবং মুহাম্মদের একজন স্ত্রী রামলাহ উচ্চস্বরে তার বাবাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, "আপনি একজন নোংরা মুশরিক!" (২) মেয়ে, বাবার ধর্ম নিয়ে ঠাট্টাতামাশা শুরু করল এবং তার বাবাকে জানালো যে, বাবার সাথে আর কোনও ধরনের সম্পর্ক রাখার বিষয়টা ভবিষতে তাঁর ধর্ম পরিবর্তন করার উপর নির্ভর করছে। বাবা মেয়ের কাছে মিনতি করলেন, কিন্তু তাতে কোনও লাভ হলো না। সাহায্য পাওয়ার আশায় তিনি আবু বকর, উমর, উসমান, আলী এবং আলীর স্ত্রী ও মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমার মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিসহ অন্যান্যদের সাথেও দেখা করেন, তবে সেখানেও কোনও ফল হয়নি। আর উমর তো ছিলেন প্রকাশ্যে শত্রুভাবাপন্ন, সুতরাং তিনি বললেন : "আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে তোমার জন্য সুপারিশ করব?" উমর আবার বললেন, "আমি শপথ করছি, তোমার সাথে লড়াই করার জন্য আমার সাথে যদি পিঁপড়া থাকত তবে আমি তাই দিয়েই তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করতাম!" (৩)

মক্কাবাসীরা আবু সুফিয়ানকে খালি হাতে বাড়ি ফিরে আসার জন্য সাদামাটাভাবে অভ্যর্থনা জানালো। তারা তার নেতৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করল। আর তাকে নিয়ে সন্দেহও দানা বাধে যে, তিনি হয়তো গোপনে ধর্মান্তরিত হয়েছেন, সুতরাং এখন তাকেই এখন এসব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। এই গুজব শুরু হয়েছিল, কারণ তাকে যতদূর কাজ নিয়ে পাঠানো হয়েছে তিনি তারচেয়ে আরো বেশি দূরে চলে গিয়েছিলেন! লোকের মনে প্রশ্ন জাগে, মুহাম্মদ কি তবে আবু সুফিয়ানকে কারারুদ্ধ করেছিল এবং ধর্মান্তরিত না হলে কি তাঁকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল? মক্কাবাসীর মনে প্রশ্ন জাগতেই থাকে - তবে কি আবু সুফিয়ান মুহাম্মদের সাথে গোপনে তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিলেন? এমনকি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দও ব্যাপারটা নিয়ে তার উপর বিরক্ত ছিলেন। ফিরে আসার পর আবু সুফিয়ান তার স্ত্রীর সাথে বিছানায় শুয়ে ইয়াছরিবে কী ঘটেছিল তা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হিন্দ লাফিয়ে উঠে তাঁর বুকে উপর পা দিয়ে চেপে ধরেন। আবু সুফিয়ান কেবল তখনই মক্কাবাসীর আস্থা ফিরে পান যখন তিনি তার মাথা মুন্ডন করেন, ইসাফ এবং নায়লার বেদীর সামনে পশু জবাই করেন এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, তিনি তার পূর্বপুরুষদের ধর্মেই মারা যাবেন।

ইতিমধ্যেই মুহাম্মদ মক্কা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফেললেন। বেদুইনদের মধ্যকার ঘটনা তাকে শান্তিচুক্তি ভঙ্গের করার একটি উছিলা এনে দিল। অবস্থানগত দিক থেকে মুহাম্মদ বেশ শক্তিশালী ছিলেন। তার বিজয়-মিছিলে মক্কার নাম যোগ করার ক্ষেত্রে তিনি আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে রাজি নন। তাছাড়া প্রতীকী অর্থে এবং কৌশলগত দিক থেকেও মক্কা তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি মানুষের প্রকৃতি বুঝতে পারতেন, এবং তিনি আরবদেরও বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আরবের মানুষ এখন ক্ষমতার দিকে আকৃষ্ট। একবার মক্কা দখল করে নিতে পারলে লোকেরা মুহাম্মদের কাছে ভিড় করবে এবং তার ধর্মকেই সংঘটিত করার ঘোষণা দেবে।

মক্কাবাসীদের প্রতিরক্ষা-প্রস্তুতির সুযোগ না দেয়ার জন্যই মুহাম্মদ আক্রমণের প্রস্তুতি চালিয়েছিলেন অতি সংগোপনে। এই পরিকল্পনার কথা কেবল কয়েকজন লোককেই জানানো হয়েছিল, এবং তারাও গোপনীয়তার শপথ করেছিল। আরো অধিকতর সুরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে, ইয়াছরিব থেকে বেরিয়ে আসা যেকোনও ব্যক্তিকে শহরের বাইরে যেতে বাধা দেয়ার নির্দেশনা দিয়ে তিনি প্রহরী নিয়োগ করেছিলেন। এই সতর্কতার ব্যবস্থাপনা কাজেও লেগেছে - আক্রমণের পরিকল্পনা সম্পর্কে মক্কাবাসীদের সতর্ক করতে ইয়াছরিবের এক লোকের লিখে পাঠানো একটি গোপন চিঠি নিয়ে একজন নারী ধরা পড়ে যায়। গোপনীয়তার পর্দার আড়ালে মুহাম্মদ দশ হাজার লোককে একত্রিত করে ফেলেন। এর মধ্যে সাতশোজন ছিল মক্কার প্রবাসী (এখন ইয়াছরিবী) এবং চার হাজার মানুষ ছিল ইয়াছরিবী ধর্মান্তরিত বা সাম্প্রতিক বসতি স্থাপনকারী। তাদের সাথে আটশো ঘোড়া ছিল। আর বাকিরা ছিল ধর্মান্তরিত বেদুইন, যাদের তিনি ছলচাতুরির মাধ্যমে ইয়াছরিবে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি তাদের বাধ্যতামূলক মাসব্যাপী রমজানের রোজা রাখার জন্য ইয়াছরিব উপত্যকায় আসার নির্দেশ দিলেন। একমাত্র ইয়াছরিবে পৌঁছার পরেই তারা জানতে পারল যে, তারা একটি বড় অভিযানের অংশ হতে যাচ্ছে। তবে তাদের উদ্দেশ্য বা অভীষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়নি। মক্কায় আক্রমণের প্রস্তুতির পাশাপাশি, অনুসারীদের মনোযোগ অন্যদিকে সরাতে তিনি ইয়াছরিবের উত্তরে একটা গোত্রকে আক্রমণ করার জন্য একটা বাহিনী প্রেরণ করেন যাতে মক্কাবাসীরা অন্য গোত্রের উপর আক্রমণ দেখে তার সামরিক প্রস্তুতির গুজবে সাড়া না দেয়। এতে করে তারা বুঝবে যে, মক্কাবাসীরা আসলে তার আক্রমণের লক্ষ্য না।

সেনাদল ইয়াছরিব ত্যাগ করার সময়টা ছিল রমজান মাস, কিন্তু মুহাম্মদ সৈন্যদের রোজা রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেনাদলের মক্কায় পৌঁছানোর আগেই এই সংবাদটি দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ল এবং মুহাম্মদ মক্কা থেকে একদিনের দূরত্বে থাকাকালীনই মক্কাবাসী, তায়েফের লোকেরা এবং যাযাবর হাওয়াজিন গোত্রের লোকেরা সতর্ক অবস্থান নিল।

কৌশলী মুহাম্মদ তার সেনাদলকে এমন একটি পথে চালিত করেছিলেন যা তাদেরকে মক্কার পূর্বের দিকে নিয়ে যায়। তিনি হাওয়াজিনদের, তায়েফে থাকা হাওয়াজিন দোসরদের অথবা মক্কার সৈন্যদের উপরে আক্রমণ চালানোর ইচ্ছে পোষণ

করেছিলেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। হাওয়াজিনদের প্রেরিত একজন গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করে মুহাম্মদের সামনে আনা হল। তার জীবন রক্ষা পাওয়ার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে গুপ্তচর মুহাম্মদকে বলল যে, হাওয়াজিন গোত্র এবং ছাকিফ গোত্রের লোকেরা একটি বৃহৎ যৌথবাহিনী একত্রিত করছে। তবে তাদের উদ্দেশ্য রক্ষণাত্মক নাকি আক্রমণাত্মক সে বিষয়ে সে স্পষ্ট কিছু বলতে পারল না। মক্কা সম্পর্কেও মুহাম্মদের কাছে গোয়েন্দা সংবাদ ছিল। তিনি একদিন আগেই জেনে নিয়েছেন যে, মক্কাবাসীরা তাদের নেতা আবু সুফিয়ানকে নিয়ে হতাশ। কারণ, আবু সুফিয়ান ‘ভীতু এবং আতঙ্কিত’। এটি মুহাম্মদের জন্য দারুণ সুখবর ছিল; এবং এর অর্থ হচ্ছে মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে তাকে প্রতিরোধ করার ইচ্ছা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

সেই রাতেই মুহাম্মদ তার লোকদের প্রত্যেককে একটি করে আগুন জ্বালানোর (ক্যাম্পফায়ার) নির্দেশ দিলেন, যাতে আগুনের সম্মিলিত আভাটি অনেক দূর থেকে দেখা যায়। তার সাথে প্রকৃতপক্ষে যত সেনা আছে তিনি মক্কাবাসীদেরকে তারচেয়েও অনেক বেশি সেনাদল সাথে নিয়েছেন এমন ধারণা দিতে চেয়েছেন। মুহাম্মদ তার চাচা আব্বাসকে পাঠিয়েছেন মুহাম্মদের সেনাদল সহ উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতে এবং তার উদ্দেশ্যগুলি জানাতে। সাথে বলে দিয়েছিলেন যে, আত্মসমর্পণ করাই হবে তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক এবং সর্বোত্তম কাজ। আব্বাস যাওয়ার আগে পথিমধ্যে আবু সুফিয়ান এবং খাদিজার ভাগ্নে হাকিম ইবনে হিজামের সঙ্গে দেখা করলেন। তারা দুজন মূলত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদের শিবিরের দিকে বেরিয়েছিল, কিন্তু আব্বাস হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন যে, তোমরা যদি এটি (গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা) চালিয়ে যাও তবে তোমাদের হত্যা করা হবে। এরপর আব্বাস তাদেরকে সুরক্ষার গ্যারান্টি দিয়ে মুহাম্মদের তাঁবুতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, তারা তাঁবুতে পৌঁছার আগেই উমর আবু সুফিয়ানকে চিনতে পেরে তার পিছু পিছু তাঁবুতে ছুটে যান। উমর মুহাম্মদকে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, এ হচ্ছে আবু সুফিয়ান, আল্লাহর শত্রু!” এবং উমর আবু সুফিয়ানের মাথা কেটে ফেলার প্রস্তাব দিলেন! তবে আব্বাস হস্তক্ষেপ করে বলেন যে, দেখো উমর, মক্কার নেতা কিন্তু আমার সুরক্ষার অধীনে রয়েছে।

মুহাম্মদ আবু সুফিয়ানকে বললেন, “আপনার কি এখনো জানতে বাকি আছে যে, আমিই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল?” (৪) মুহাম্মদ আব্বাসকে আদেশ করলেন আবু সুফিয়ানকে সারারাত তার সাথে রাখতে এবং সকালে তাকে তার কাছে আনতে। আব্বাস রাতভর মক্কাবাসী নেতাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, তাদের প্রতিরোধ নিরর্থক হবে। যদি মুহাম্মদ মক্কায় আক্রমণ করেন তবে তিনি সবাইকে হত্যা করবেন। প্রতিরোধকারী, নারী ও শিশুদের তিনি দাসদাসীতে পরিণত করবেন। মৃতদের গণকবরে ফেলে দেয়া হবে এবং নারী ও শিশুদের দাসের বাজারে নিলামে তোলা হবে। আবু সুফিয়ান এবং সমস্ত মক্কাবাসীদের ধর্মান্তরিত হয়ে যাওয়াই হচ্ছে এখন একমাত্র বিকল্প - বোঝালেন আব্বাস। পরদিন সকালে আব্বাস তাকে মুহাম্মদের তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। মুহাম্মদ তার আগের রাত মতই তার প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করেছিলেন : “আচ্ছা আবু সুফিয়ান, আমি যে আল্লাহর রাসূল এটা জানার কী আপনার এখনো সময় হয়নি?” আবু সুফিয়ান বললেন, “আমি এখনও এতে কিছুটা সমস্যা দেখছি”। তার প্রতিক্রিয়ায় আব্বাস রেগে গেলেন : “আফসোস তোমার জন্য, ইসলাম গ্রহণ কর! মাথা কেটে ফেলার আগেই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ হলেন আল্লাহর রাসূল!” (৫)

আবু সুফিয়ান ইতস্তত করলেন। তিনি যে মুহাম্মদকে যে কারো চাইতেই বেশি ঘৃণা করতেন তাতে কারোর সামান্য সন্দেহও ছিল না। মুহাম্মদ মক্কাকে ছিন্নভিন্ন করেছেন; তিনি ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে, ছেলের বিরুদ্ধে বাবাকে, চাচাতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে চাচাতো ভাইকে লেলিয়ে দিয়েছেন। মক্কাবাসীরা মুহাম্মদকে সহ্য করে ভুল করেছিল। তারা কেবল হাশিমীদের সাথে গৃহযুদ্ধ এড়াতেই মুহাম্মদকে সহ্য করেছিল। তবে সুযোগমতো একবার যদি মুহাম্মদকে হত্যা করা যেত তবে পরবর্তী একের পর এক ঘটনা ঘটত না - বদর, উহুদ, পরিখা এবং এখন এই যে বিশাল সেনাদল ঠিক মক্কার বাইরে অবস্থান করছে মক্কা আক্রমণ করতে এতকিছু ঘটত না। তার প্রথম পুত্র হানজালা এখনো বেঁচে থাকত; তার শ্যালক উতবা ও শায়বা রাবিয়া এখনো তাদের সাথে থাকত। পাশাপাশি তার বন্ধু ও ব্যবসায়িক অংশীদার উমাইয়া ইবনে খালাফ, উকবা ইবনে আবু মুয়াইত,

আবুল হাকাম এবং আরও অনেক লোক এখন তার সাথে থাকত। মক্কাবাসী এবং হিজাজের সমস্ত লোকই নির্ভয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম পালন করত। মুহাম্মদ নিজের সম্পর্কে যা বিশ্বাস করতেন সেটার কারণে তিনি বিজয়ী হননি, বরং এখন আবু সুফিয়ানকে ঠিক যেভাবে ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন কেবল এই হিংস্রতার উপর ভিত্তি করেই তিনি একের পর এক যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন। তার হিংস্রতার বাণী এখন ধ্বনিত হচ্ছে এভাবে, "আপনার মাথা কেটে ফেলার আগে সাক্ষ্য দিন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ হলেন আল্লাহর রাসূল!"

আবু সুফিয়ান মুহাম্মদের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন যে, সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য খুব বেশি সময় তার হাতে নেই। তিনি এমন একজন ব্যক্তির মুখ দেখছেন যিনি ইহুদিদের পুরো গোত্রের শিরোশ্ছেদ করার সভাপতিত্ব করেছিলেন। আবু সুফিয়ান শুনেছিলেন যে, মুহাম্মদ কীভাবে সেখানে বসেছিলেন এবং আলী ও জুবায়ের যুবক ও বৃদ্ধ সকলের শিরোশ্ছেদ করে লাশগুলোকে গর্তে ফেলে দিয়েছিলেন। এখন আবু সুফিয়ানকে হত্যা করা কেবল মুহাম্মদের কাছ থেকে একটা ইশারার ব্যাপার, এবং তাকেও বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হবে। উমর তাকে জোর করে হাঁটু গেড়ে বসাতে পারলে এবং তার মাথাটা কেটে ফেলতে পারলে খুবই খুশি হবে। এটি বদর যুদ্ধের পরে ইহুদিদের উপর চালিত হত্যাকাণ্ড বা উকবা ইবনে আবু মুয়াইত ও নাদের ইবনে হারিছের শিরোশ্ছেদ করার মতই। মৃত্যুর ভয় আবু সুফিয়ানকে আঁকড়ে ধরল। অবশেষে আবু সুফিয়ান কাছে গিয়ে মুহাম্মদের হাত ধরলেন এবং বললেন, "আমি স্বীকার করে নিচ্ছি যে, ঈশ্বর একজনই এবং আপনি হচ্ছেন তাঁর রাসূল"।

মুহাম্মদ হাসিতে ফেটে পড়লেন। তিনি জানতেন যে আবু সুফিয়ান আসলে তাঁর অনুগত নন, তবে তাতে কিছু যায় আসে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানের ঘোষণা ছিল একটি অলঙ্ঘনীয় চুক্তি; এটি লঙ্ঘন করা মানেই মৃত্যু। মক্কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বশ্যতা অর্জন করার পরেই মক্কাভিমুখী উপত্যকার শেষ গিরিপথের দিকে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আব্বাসকে মুহাম্মদ নির্দেশ দিলেন। মুহাম্মদ তার সেনাদলকে নিয়ে প্যারেড করার সময় তাদের সেখানে দাঁড়াতে হয়েছিল। তিনি তার শক্তি দেখিয়ে আবু সুফিয়ানকে মুগ্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং তারপরেই তাকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন, যাতে মুহাম্মদের সেনাদল মক্কায় পৌঁছার আগেই আবু সুফিয়ান মক্কায় ফিরে আসেন এবং মক্কাবাসীকে আত্মসমর্পণে রাজি করার চেষ্টা করেন।

বিভিন্ন গোত্রদের দিয়ে সাজানো সেনা ইউনিটগুলি প্রথমে মুহাম্মদের সামনে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে আসে, তারপরে তার নেতৃত্বে পর্বতমালার দিকে এগিয়ে যায়। উট এবং ঘোড়ায় চড়ে, যোদ্ধারা অস্ত্র নিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে কালো ও সাদা যুদ্ধের ব্যানার বহন করে আবু সুফিয়ান এবং আব্বাস যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকে এগিয়ে গেল। খালিদের নেতৃত্বে এক হাজার সুলাইম (Sulaym) যোদ্ধা তাদের সামনে প্রথমে অতিক্রম করে যায়। আবু সুফিয়ান প্রথমে খালিদকে চিনতে পারেনি, কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিল এটি ওয়ালিদের পুত্র। তারপরে মুহাম্মদের প্রথম চাচাত ভাই জুবায়ের এগিয়ে এলো পাঁচ শতাধিক মক্কার প্রবাসী এবং বেদুইনদের মিশ্রণ যোদ্ধাদল নিয়ে। তাকে অনুসরণ করে বিভিন্ন গোত্র ছিল, যাদের প্রত্যেকের অধীনে তিনশো, চারশো বা আটশো যোদ্ধা ছিল। প্রতিটি দল আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে কুচকাওয়াজ করে যাওয়ার সময় তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলে চিৎকার করল। এর পেছনে প্রায় চার হাজার যোদ্ধার বৃহত্তম দল ছিল, তাদের বেশিরভাগ ইয়াছরিবের আউস এবং খাজরাজ গোত্রের লোক, আর অবশিষ্টরা ছিল মক্কাবাসী ধর্মান্তরিত। এই দলটির নেতৃত্বে মুহাম্মদ ছিলেন, যিনি আবু সুফিয়ানের সামনে এসে থামলেন এবং তাকে বললেন যে মক্কার সাথে যা ঘটতে যাচ্ছে তা ঘটবে, কারণ তিনি যখন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সবকিছু করছিলেন তখন তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। মুহাম্মদ বললেন, "আপনি এবং আপনার লোকেরা এই কাজ করেছেন। যখন এই লোকেরা আমাকে বিশ্বাস করেছিল তখন আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিলেন। আপনি আমাকে নির্বাসিত করার পর তারা আমাকে সহায়তা করেছিল" (৬)।

তিনি যখন ক্ষমতার কুচকাওয়াজ দেখছিলেন, আবু সুফিয়ান বুঝতে পেরেছিলেন যে সহিংসতা ছাড়াও মুহাম্মদের সাফল্যের পেছনে আরও অনেক কারণ আছে। তিনি দেখলেন, আগের দিন এবং তার পরদিন সকালে নামাজের আগে মুহাম্মদের ওযুর ফেলে যাওয়া অবশিষ্ট পানি পাওয়ার জন্য সবাই কেমন হুড়মুড় করছিল। সেই পানি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরা তাদের শরীরে মাখছিল বা পান করছিল, যা দেখতে বেশ বাজে লাগলেও তাদের এই আচরণ সেই মানুষটা সম্পর্কে অনেক কিছুই বলে দেয়। আবু সুফিয়ান নিজেও একবার দশ হাজার যোদ্ধার বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে, তার পরিষ্কারের কাজে ব্যবহৃত পানির অবশিষ্টাংশ পান করতে কাউকেই পাওয়া যায়নি। মুহাম্মদ সম্পর্কে উল্লেখ করার মতো সত্যিই কিছু ছিল। **আবু সুফিয়ান এটি নিয়ে যত বেশি চিন্তাভাবনা করছিলেন, তিনি তত বেশি বুঝতে পেরেছিলেন যে মুহাম্মদ সত্য নিয়ে আসেননি, বরং লোকদের সত্যটি বোঝানোর 'ক্ষমতা' নিয়ে এসেছিলেন।** এটি ছিল তার সাবলীলতার, তার বক্তৃতার ফলাফল। এমনকি, মুহাম্মদের সাথে ফেরেস্তারা কথা বলতেন এমন দাবি করার বহু আগেই, যখন তিনি আবু সুফিয়ানের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশি ছিলেন, অসুস্থতায় ভুগছিলেন তখনও তাঁর যাদুকরী জিহ্বা ছিল। সম্ভবত কুসাই ছাড়া অন্য কোন মক্কাবাসীই মুহাম্মদের মতো এতটা সাবলীলভাবে কথা বলতে পারতেন না। যেন কুসাইয়ের বংশপরম্পরাই মুহাম্মদের হাতে এই গুণটি তুলে দিয়েছিল। তিনি যেভাবে চাইতেন সেভাবেই সেই কাজটি মানুষকে দিয়ে করিয়ে নেওয়ার যাদুকরী কৌশল জানতেন। তার সেই জড়তাবিহীন জিহ্বার সাহায্যে সবাইকে বিশ্বাস করাতে পেরেছিলেন যে, ঈশ্বর তার সাথে কথা বলেন এবং ঈশ্বর উদ্দেশ্যে একটি বইও প্রকাশ করেন। তিনি মানুষকে মৃত্যু-পরবর্তী স্বর্গ ও নরকের যে 'খ্রিস্টীয় ধারণা' তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাতে পেরেছিলেন। তিনি তাদের মনকে জাহান্নামের আগুনে পোড়ানোর ভয় দিয়ে ভরিয়ে দিতে পেরেছিলেন। অতঃপর যারা তার জন্য যুদ্ধ করে মারা গিয়েছে তাদের জন্য জান্নাতে যৌন সহবাসের সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; আর বেঁচে যাওয়াদের জন্য ছিল লুটের মাল, দাস-দাসীর ব্যবস্থা। এই যাদুকরী মিশ্রণই তাকে ইয়াছরিব এবং তারপরে খাইবার বিজয় এবং ইহুদিদের বিরাট সম্পদ অধিগ্রহণের ক্ষমতা দিয়েছিল। তার জাদুকরী জিহ্বা এক অপ্রতিরোধ্য অন্ধকার শক্তি প্রকাশ করেছিল, যাকে থামানো যায়নি।

আবু সুফিয়ান মক্কায় ছুটে আসেন। মুহাম্মদের সেনাদল মক্কায় পৌঁছার কয়েক ঘন্টা আগে তিনি সেখানে পৌঁছেন। মুহাম্মদ তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যারা তাদের বাড়িতে নিজেদের আটকে রেখেছিলেন তাদের সকলকে বাঁচিয়ে দেবেন। আবু সুফিয়ান সবাইকে সতর্ক করতে শহরের ভিতর দিয়ে ছুটতে থাকেন, তারা নিরাপদে থাকতে চাইলে যেন ঘরেই থাকে। আবু সুফিয়ানের কথা শোনার জন্য মন্দিরে বহু লোকের ভিড় জমে যায়, এবং যখন তিনি লোকেদের সতর্ক করেছিলেন এই বলে যে, মুহাম্মদের সেনাদল অপ্রতিরোধ্য, তখন সবাই কথাটা শুনে রাগান্বিত হলো। মক্কাবাসীরা তাকে বিদ্রূপ করল। এরই মধ্যে মুহাম্মদের সেনাদলের এমন প্রস্তুতির ব্যাপারে তারা কেন কিছুই জানতে পারল না এই প্রশ্ন তারা আবু সুফিয়ানের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিল। তাহলে কী ইয়াছরিব সফরের পর থেকেই কি তিনি মুহাম্মদের পক্ষে যোগসাজশে ছিলেন? তারা তাকে কাপুরুষ এবং বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করেছিল। এমনকি তার স্ত্রীও তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন। তিনি তার গোঁফ ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই চর্বির ভারি বস্তাটাকে মেরে ফেল। সে আমাদের লোকদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য একেবারেই অসম্মানজনক!" (৭) কিন্তু আবু সুফিয়ান তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে হুঁশিয়ারি দিলেন যে, মুহাম্মদকে যে-ই প্রতিহত করতে চাইবে মুহাম্মদ তাকেই হত্যা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। তার সেনাদল সংখ্যায় বিরাট। এর আগে এর চেয়ে বেশি কোনো ঘোড়া, অস্ত্র এবং বর্ম আবু সুফিয়ান দেখেননি। এজন্যই আবু সুফিয়ান বললেন "আমি যা দেখেছি তোমরা তা দেখনি! আমি তার সৈন্যদের, তাদের চলাফেরা এবং তাদের অস্ত্রগুলোও দেখেছি" (৮)।

বেশিরভাগ লোক আবু সুফিয়ানের পরামর্শ মেনে নিয়েছিল এবং নিজেদের বাড়িতে থেকে গিয়েছিল, তবে কেউ কেউ লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকল। সাফওয়ান, ইকরিমা এবং সুহাইল যুদ্ধের ডামাডোলে শামিল হলো। তারা একদল লোককে জড়ো করে শত্রুদের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিল। আবু সুফিয়ান সতর্কবার্তাটি শোনানোর খুব অল্প সময় পরেই মুহাম্মদ শহরে প্রবেশ শুরু করেন এবং শহরের রাস্তাগুলি প্রায়শূন্য দেখে খুশি হন। সেনাদল উত্তর দিক থেকে প্রবেশ করে, তবে

উপত্যকার বিভিন্ন বিভাগ দখল করার জন্য পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক হাজার বেদুইনদের নেতৃত্ব দিয়ে খালিদ উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে নেমে আবার উত্তর দিকে ফিরে গেলেন যেখানে তার সৈন্যরা মক্কার প্রতিরোধকারীদের সাথে লড়াই করছিল, কিন্তু প্রতিরোধকারীরা সংখ্যায় কম থাকার কারণে খুব সহজেই পরাজিত হয়। কিছু কিছু সূত্র বলছে যে, এক ডজন প্রতিরোধযোদ্ধা মারা গিয়েছিল। আরেকটা দলিলে পাওয়া যায়, সংখ্যাটা ত্রিশের কাছাকাছি হবে। খালিদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন সহযোদ্ধা ইকরিমা প্রতিরোধ বাহিনীর অন্য সবার মতোই জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়ে গেলেন।

খাদিজার কবর থেকে অনতিদূরে উপত্যকার উত্তর প্রান্তে মুহাম্মদের দাসগণ তার লাল কমান্ড তাঁবুটি স্থাপন করেছিল। উপত্যকায় প্রবেশের আগে তিনি তার সেনাপতিদের আদেশ দিয়েছিলেন কেবল প্রতিরোধকারীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য, তবে তিনি দশজন ব্যক্তির নামও বলেছিলেন যাদের তিনি মেরে ফেলতে চাইতেন। তার বিরুদ্ধে এই লোকেদের করা অপরাধের জন্য তিনি তাদের ঘৃণা করতেন। তাদেরকে যেন দেখামাত্রই হত্যা করা করা হয়, এবং যে-ই তাদের হত্যা করবে সে পূর্বের করা সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। উহুদে মুহাম্মদের চাচা হামজাকে হত্যা করা এবং তার শরীর টুকরো টুকরো করার অপরাধে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ সহ ছয়জন পুরুষ এবং চারজন নারী এই তালিকায় ছিলেন। মুহাম্মদের শত্রুদের দ্রুতই খোঁজা শুরু হয়। প্রথমে যাকে হত্যা করা হয় তিনি হলেন মিকিয়াস (Miqyas), যিনি দুর্ঘটনাক্রমে তার ভাইকে যে হত্যা করেছিল তাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য যিনি মুসতালিক অভিযানের পরে মক্কা থেকে এসেছিলেন। তার অপরাধটি হল তিনি সেই হত্যাকারীর (যে তার ভাইকে দুর্ঘটনাক্রমে মেরে ফেলেছে) সান্নিধ্য পেতে ধর্মান্তরিত হওয়ার ভান করেছিলেন এবং সুযোগ বুঝে তাকে হত্যা করে তিনি মক্কায় পালিয়ে যান। কথিত আছে যে, মিকিয়াস জানতেন যে তার নাম (হত্যাকাণ্ডের তালিকায়) ঘোষণা করা হয়েছে, এমনকি নাম ঘোষণার আগেই তিনি এমনটা অনুমান করেছিলেন। সুতরাং তিনি মদ্যপান করে মাতাল হয়ে মৃত্যুর জন্য প্রহর গুনতে থাকলেন। মায়ের বাড়িতে হাঁটার সময় বা সাফা পাহাড়ের কাছে জলাধারের পাড়ে হাঁটার সময় তাকে হত্যা করা হয়েছিল। নিহত আরেকজন হলেন আবদুল্লাহ বিন খাতাল। তিনিও ধর্মান্তরিত হওয়ার ভান করে অপরাধ করেছিলেন। এরপর তিনি একজন মুমিনকে (বিশ্বাসী) হত্যা করে পৌত্তলিক ধর্মে ফিরে আসেন। তিনি একজন পেশাদার কৌতুকাভিনেতা ছিলেন এবং তার দুই মেয়ে মুহাম্মদকে উপহাস করে ছড়াগান গাইতেন। মুহাম্মদ যখন জানতে পারলেন যে খাতাল মক্কার মন্দিরের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে আছেন তখন তিনি বলেছিলেন, "তাকে হত্যা করে ফেল!" (৯) গান গাওয়া সেই মেয়েরাও (আবদুল্লাহ বিন খাতালের দুই মেয়ে) মুহাম্মদের খুনের তালিকায় ছিলেন। তাদের মধ্যে একজনকে ধরা হলো এবং শিরোশ্ছেদ করা হলো, অন্যজন পরিস্থিতি ঠান্ডা না হওয়া অবধি লুকিয়ে ছিলেন এবং নিজেকে বিশ্বাসী হিসেবে ঘোষণা করেন এবং এর ফলে তিনি শাহাদার সুরক্ষা লাভ করে। তালিকার দু'জন ব্যক্তি হাব্বার আসওয়াদ (Habbar Aswad) ও হুয়াইরিছ নুকায়েদকে (Huwayrith Nuqaydh) মুহাম্মদের কন্যা জয়নাবের গর্ভপাত ঘটানোর জন্য দায়ী করা হয়েছিল। বদরের যুদ্ধের পরে তারা জয়নাবকে ইয়াছরিবে যেতে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল যার ফলে সে তার উট থেকে পড়ে যায়। সে সময় জয়নাব গর্ভবতী ছিল এবং উটের পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে তার গর্ভপাত ঘটে। মুহাম্মদ বারবার তাদেরকে হত্যা করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, প্রথমে তো তার লোকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন ওদের পেলে যেন জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলা হয়! আলি হুয়াইরিছকে তার বাড়ির বাইরে পেয়ে যায় এবং তার মাথাটা কেটে ফেলে। হাব্বার বেশ কয়েকদিন মুহাম্মদের যোদ্ধাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে থাকতে সক্ষম হয় এবং পরে মুহাম্মদের সামনে ঘোষণা করে যে, সে মুহাম্মদের নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে। যেহেতু সে আনুগত্যের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে সুতরাং সে শাহাদার রক্ষাকবচের তলায় চলে এসেছে।

আরও কয়েকজন ধর্মান্তরিত হয়ে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পেরেছিল। সারা (Sara) নামের এক নারী মুহাম্মদকে অপমান করার জন্য হত্যা-তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিল। ইসলামী গ্রন্থে এই অপমানের প্রকৃতি নিয়ে বিশদ কিছু লেখা নেই; কেবল বলা হয়েছে মক্কায় থাকাকালীন তিনি মুহাম্মদকে অসন্তুষ্ট করেছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি খুনিদের দল থেকে পালিয়ে

গিয়ে পরে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, কিন্তু পরে তিনি খুন হয়ে যান যখন কেউ একজন তাকে ঘোড়ার নিচে পদদলিত করেছিল। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ তাঁর বরের সুরক্ষায় তার নিজের বাড়িতে তালাবদ্ধ হয়ে বেঁচে ছিলেন এবং ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেই কেবল তিনি বাঁচার রক্ষাকবচ পেয়েছিলেন । ইকরিমাও (আবুল হাকামের ছেলে) সেই তালিকায় ছিলেন। খালিদের সাথে সংঘাতের পরে তিনি মক্কা থেকে পালিয়ে যান এবং লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে অবিসিনিয়ায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই সময়ে তিনি এই প্রস্তাব পেলেন যে, যদি তিনি ধর্মান্তরিত হন তবে মুহাম্মদ তাকে ক্ষমা করতে রাজি আছেন।

হত্যার তালিকায় থাকা আরো একজন যিনি বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি হলেন মুহাম্মদের একজন পূর্বসূরী শ্রুতিলেখক আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবুস সারহ। মৃত্যুর জন্য তালিকাভুক্ত সমস্ত লোকের মধ্যে তিনি সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ করেছিলেন, কেননা তিনি মুহাম্মদের ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণার দাবিটিকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রারম্ভিক মক্কাবাসী যিনি মুহাম্মদের সাথে ইয়াছরিবে চলে গিয়েছিলেন। তিনি লিখতে জানতেন, তাই কোরআনের আয়াত লেখার জন্য তার যোগ্যতাকেই মুহাম্মদ কাজে লাগাতেন। কিন্তু তিনি মুহাম্মদের ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণার দাবিকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন যখন তিনি বিভিন্ন আয়াতগুলিতে ছোটখাটো কিছু পরিবর্তন করার প্রস্তাব করেছিলেন এবং মুহাম্মদ তাতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন, ফলে সেগুলিও কোরআনের আয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এরপর তিনি মক্কায় পালিয়ে এসে মুহাম্মদকে প্রতারক হিসেবে প্রচার করেছিলেন। মক্কায় আক্রমণের দিন, কেউ তাকে সতর্ক করেছিল যে, মুহাম্মদ তার মৃত্যু-পরোয়ানা জারি করেছেন। তিনি পালিয়ে উসমান ইবনে আফফানের কাছে গিয়েছিলেন এবং তার পালক ভাই (দুধভাই) হিসেবে তার জন্য সুরক্ষা প্রার্থনা করেছিলেন। উসমানের তাগিদে মুহাম্মদ তাকে ক্ষমা করেছিলেন এবং তিনি পুনরায় বিশ্বাসে (ইসলামে) ফিরেও আসেন; কিন্তু মুহাম্মদ তাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করেছিলেন। গল্পে বলা হয়েছে যে, তিনি আবদুল্লাহর প্রার্থনায় সায় দিতে তিনবার অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন জনগণকে এটা বোঝাতে যে, তিনি সত্যিকার অর্থেই তাকে ফিরিয়ে নিতে চান না এবং পারলে মাথাটা কেটে ফেলবেন। আবদুল্লাহ চলে যাওয়ার পরে মুহাম্মদ বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন জ্ঞানী লোক নেই যে উঠে তাকে মেরে ফেলতে পারত যখন দেখল আমি চুপ করে ছিলাম?" তারা জবাব দিল, "কিন্তু আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আমাদের কিছু একটা সংকেত দিতে পারতেন না?" তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "নবীগণ সংকেত দিয়ে হত্যা করেন না" (১০)

খুঁজে খুঁজে হত্যার এই কর্মকাণ্ড চলার মাঝেখানেই মুহাম্মদ স্নান করে বিশ্রাম নিতে তার তাঁবুতে ঢুকলেন। তিনি ছোট ব্রোঞ্জের বাথটাবে নিজেকে পরিষ্কার করছিলেন, আর তাকে আড়াল করতে তার মেয়ে ফাতিমা তার পোশাকটিকে পর্দার মতো ধরেছিল। গোসল শেষ করার আগে তাঁর চাচাতো বোন উম্মে হানি সেখানে আসে। দশ বছর আগে, যখন মুহাম্মদ তার বাড়িতে রাতে অবস্থান করেছিলেন সেই সময় তিনি দাবি করেছিলেন যে তাকে ডানাযুক্ত খচ্চর বুরাকে চড়িয়ে জেরুজালেমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তাকে আল্লাহর সিংহাসনের সামনে দাঁড় করানোর জন্য জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু হানি সত্যই জানতেন যে, মুহাম্মদ কখনও তার বিছানা ছেড়ে যাননি এবং উম্মে হানি মিনতি করেছিল যাতে এই ভ্রমের কথা মুহাম্মদ কাউকে না বলে। **মুহাম্মদকে ভালো করে চেনার কারণেই হানি কখনও ধর্মান্তরিত হননি।** তবুও, মুহাম্মদ তাকে দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তবে তিনি তার পোষাক পরে আট রাকাত নামাজ আদায় না করা পর্যন্ত হানিকে অপেক্ষায় রেখেছিলেন। তারপরেই তিনি হানির কাছে উপস্থিত হলেন এবং জানতে পারলেন যে, হানি তার দুই দেবরের/ভাসুরের সুরক্ষা চান। এ দুজন হত্যার তালিকায় না থাকলেও তারা খালিদের সাথে লড়াই করেছিল এবং তারপরেই পালিয়ে হানির বাড়িতে চলে যায়। হানির ভাই আলী চোখ বাদে সবকিছু ঢেকে রাখা একটি শিরস্ত্রাণ পরে তাদের হত্যা করতে তার বাড়িতে প্রবেশ করে, কিন্তু হানি তার পথ আগলে দাঁড়ায় এবং বাধা দিয়ে বলে যে, তাদের হত্যা করার আগে প্রথমে তাকেই হত্যা করতে হবে। মুহাম্মদ তার অনুরোধ মঞ্জুর করেছিলেন এই বলে : "তুমি যাদের সুরক্ষা দেবে আমিও তাদের সুরক্ষা দেই এবং তুমি যা চাইবে তাই হবে। আমরা তাদের হত্যা করব না" (১১)।

মক্কা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে চলে আসার পর মুহাম্মদ তার উটটিকে তাঁবুর সামনে আনার হুকুম দিলেন। শিরস্ত্রাণ পরে, তলােয়ার সাথে নিয়ে উটের পিঠে আরোহণ করলেন। এরপর আবু বকর এবং অন্যান্য অভিজাত অনুসারীদের সাথে নিয়ে তিনি একটি শোভাযাত্রা সহযোগে মন্দিরের দিকে যাত্রা করলেন। এটি ছিল তার বিজয়ের দিন, যেদিন মন্দিরে থাকা মূর্তিগুলিকে ধ্বংস করা হয়েছিল এবং মন্দিরটি একচেটিয়াভাবে (মুহাম্মদের ঈশ্বর) আল্লাহর হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল। এটিই ছিল মুহাম্মদের চির আকাঙ্ক্ষিত দিন, যার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ঠিক সেদিন থেকেই যেদিন তিনি মক্কাবাসীদের দ্বারা তার বিশ্বাসের জন্য নিন্দামন্দের শিকার হয়েছিলেন। মন্দিরের পথে যেতে যেতে তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ে রচিত পুরো বিজয় অধ্যায়টি (সূরা আল ফাতহ) আবৃত্তি করেছিলেন 'প্রাণবন্ত, চঞ্চল সুরে' (১২)। উটের উপরে চড়া অবস্থায়ই মুহাম্মদ মন্দিরটি প্রদক্ষিণ (আরবিতে বলা হয় তাওয়াফ) করেছিলেন এবং প্রতিটি দফায় তার অনুসারীদের সাথে কালো পাথরটি স্পর্শ করেছিলেন। **ইসলামিক গ্রন্থ অনুসারে, মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের আল্লাহু আকবরের প্রচন্ড ধ্বনিতে চারপাশ প্রকম্পিত হচ্ছিল এবং সমগ্র উপত্যকা জুড়েই এর আওয়াজ ছড়িয়ে পড়েছিল। আর তা চলতেই থাকে যতক্ষণ না মুহাম্মদ আওয়াজ থামানোর জন্য ইশারায় সংকেত দিলেন।**

মন্দিরের অঞ্চলটিতে ভাঙা প্রতিমার ধ্বংসাবশেষ পড়ে ছিল। কাবা ঘিরে ছিল তিনটি দেবীর মূর্তি, এবং ইসাফ ও নায়লার বেদিও সেখানে ছিল। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন গোত্র, বংশ এবং পরিবারগুলিরও ছোট ছোট মূর্তিসমূহ। মন্দিরের ভেতরে স্ফটিকের তৈরি চাঁদের দেবতা হুবালের বিশাল এক স্বচ্ছ মূর্তি ছিল, যে হুবালের হাতে ধরা ছিল ঐশ্বরিক তীর। মন্দিরের ভেতরে হুবাল দেবতার একাধিপত্য ছিল। আর অন্য একটি হুবাল দেবতার প্রতিমা স্থাপিত ছিল মন্দিরের প্রবেশমুখের বাইরে, যেটি আবার মন্দিরের প্রবেশমুখের দিকে মুখ করা অবস্থায় ছিল। ছাদেও আরেকটি চন্দ্রদেবতার মূর্তি ছিল।

মুহাম্মদ প্রথমে মন্দিরের বাইরের প্রতিমাগুলিকে ধ্বংস করেন। পাথরের মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলা হয়; কাঠের মূর্তিগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। ঘটনাটির পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে দেখা যায়, মুহাম্মদের এমন ক্ষমতা ছিল যে, তিনি তার হাতের লাঠি দিয়ে কোন প্রতিমার দিকে ইশারা করে কোরআনের আয়াত পাঠ করা মাত্রই সেই প্রতিমাটি ভেঙেচুরে মাটিতে ছিটকে পড়ে গেছে। মন্দিরের বাইরের কর্ম সমাধা করে, তিনি ভেতরে গিয়ে মন্দিরের দেয়ালের একটিতে আব্রাহামের আদলে একটি চিত্রকর্ম দেখতে পেয়ে ক্ষুব্ধ হন। চিত্রে আব্রাহামকে দেখানো হয়েছে এমনভাবে যে, তিনি স্বর্গের তীর ছুঁড়ে মারছেন। এবং সম্ভবত মুহাম্মদ আসার আগে তাকে নিয়ে তামাশা করার জন্যই চিত্রটি তড়িঘড়ি করে আঁকা হয়েছিল। মুহাম্মদ চিৎকার করে এহেন কাজ করা পাপীদের অভিশাপ দিয়ে বললেন, "আল্লাহ তাদের হত্যা করুন!" ইসলামিক গ্রন্থে বলা হয়েছে, কেউ একজন এটি মুছে দেয়ার জন্য একটি ভেজা ন্যাকড়া নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেছিল (১৩, ১৪)। মূর্তিসমূহের ধ্বংসযজ্ঞের পর মোহাম্মদ মন্দিরের ভেতরে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়লেন। অতপর তিনি মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে এক নতুন দিনের আগমনের ঘোষণা দিলেন। এরপর তিনি মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে অসংলগ্নভাবে একটি ভাষণ দিলেন যেখানে তিনি বললেন : আল্লাহর স্থানে আল্লাহ ব্যাতিরেকে অন্য কাউকে কিংবা অন্য কিছুর উপাসনা করার যুগ সমাপ্ত হয়েছে। এখন থেকে কাবাঘর পরিপূর্ণভাবেই আল্লাহর ঘর। মক্কা ছিল আল্লাহরই নিজস্ব জায়গা, এবং এটি এভাবেই থাকবে বিচার দিনের (কেয়ামত) আগ পর্যন্ত। স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার মুহূর্ত থেকেই ঈশ্বর মক্কাকে সন্দেহাতীতভাবেই পবিত্রস্থান হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এবং এই পবিত্রস্থানের মধ্যে কখনও হত্যার অনুমতি দেয়া হয়নি, তবে খাতাল, মিকিয়াস এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে যারা অসন্তুষ্ট করেছিল তাদের খুঁজে বের করে হত্যা করার জন্য নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আল্লাহ কেবল তাঁকে এক ঘন্টার মতন সময় দিয়েছিলেন। তারপরেই, আল্লাহর আইন লঙ্ঘনের জন্য পবিত্র জায়গায় শুধুমাত্র অনুমোদিত হত্যাকাণ্ডগুলিই সংঘটিত হয়। মুহাম্মদ ঘোষণা করেন যে, মক্কাবাসীরা এখন আল্লাহর আইনের অধীনে, যার অর্থ হচ্ছে, তিনি যেসমস্ত বিধিবিধান কোরআনে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং সেগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার যেসব উদাহরণসমূহ রয়েছে এখন থেকে মক্কাবাসীদের উপরেও সেসব কিছু লাগু হবে। সেসব বিধিবিধানের অনেক কিছুরই বর্ণনা দিলেন তখন মুহাম্মদ। এগুলি ছিল রাসূলের মাধ্যমে প্রেরিত ঈশ্বরের আইন এবং এগুলো অবশ্য-পালনীয়। তিনি ঘোষণা করলেন যে, যেহেতু মক্কাবাসীরা যুদ্ধের

পরিবর্তে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তাই সমস্ত মক্কা এবং এর লোকেরা এখন তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি; তারা ছিল তার আইনগত দাস এবং তাদের সম্পত্তি হচ্ছে মুহাম্মদের গনিমতের মাল। **তবে তিনি মক্কাবাসীদের সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন এরূপ যে, তিনি তাদের মুক্তি দেবেন যদি তারা ধর্মান্তরিত হয়। আর যদি তা না হয় তবে তিনি তাদের জীবন ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবেন।** তিনি মক্কার কয়েকজন নেতাকে এক-দু'মাস এ সম্পর্কে ভাবতে বলেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের কাছে সমর্পণকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি নতুন গোত্রতে তাদের সদস্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। নতুন গোত্রের সদস্যরা কতটা মূল্যবান তারও ব্যাখ্যা করেন এই বলে : "একজন আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) আরেকজন আত্মসমর্পণকারীর ভাই। আত্মসমর্পণকারীরা সবাই একে অপরের ভাই, আর যারা তাদের বিরোধিতা করবে তাদের বিরুদ্ধে এরা সম্মিলিতভাবে এক হয়ে লড়াই করবে। তাদের সবার রক্ত সমান। আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যের শক্তিশালীরা অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের সুরক্ষা দেবে এবং সক্ষমরা অক্ষমদের সহায়তা করবে" (১৫)।

বক্তব্যের পরেই মুহাম্মদ সাফা পর্বতে আরোহণ করলেন। সেখান থেকে তার মন্দিরটি স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তার একক ঈশ্বর ধারণার উপর বিশ্বাস করে মক্কাবাসী, ইয়াছরিবীয় এবং বেদুইন সহ হাজার হাজার মানুষ ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে মন্দিরের চারপাশে প্রদিক্ষণ করছিল। সাফা পাহাড়ের পাদদেশে ইতিমধ্যে মন্দিরের প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করে আসা তাঁর শতশত ইয়াছরিবী অনুসারী অপেক্ষা করছিলেন, তিনি পরবর্তী সময়ে কী করবেন তা দেখার জন্য। তারা দেখতে পেল, তিনি তার দু'হাত প্রসারিত করে আকাশের দিকে তুলে ধরলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করে কিছু বললেন। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই তার মৃগীরোগীর খিঁচুনি আরম্ভ হলো। দীর্ঘ কুড়ি বছরের সংগ্রাম শেষে বিজয় লাভের আনন্দে মাতোয়ারা এই মুহুর্ত তার মস্তিষ্ক সামলাতে পারেনি, আর সেটারই টেম্পোরাল লোবে বৈদ্যুতিক ঝড় বয়ে যায়। যেন পুরো মহাবিশ্ব মুহাম্মদের সাথে তখন রসিকতা করছিল। মুহাম্মদের বিজয়ের সঠিক মুহুর্তেই তার মস্তিষ্ক তাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল, তবে এই অনুপ্রেরণা ঊর্ধ্বজগতের স্বর্গ থেকে আসেনি, এটি বরং এসেছিল নিচ থেকে। তাঁর বিকৃত মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক বিস্ফোরণ থেকেই এসেছিল। মহাবিশ্বের হাসির সাথে সাথেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, তার মুখটি লালচে রঙের হয়ে ফুলে উঠছিল এবং তার কপালে মুক্তার দানার মতো ঘাম দেখা দিচ্ছিল। মহাজাগতিক রসিকতাও যেন মুমিনদের কাছে এসে এখন তার পথ হারিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন তারা তাদের নিজেদের চোখের থেকেই দূরে সরে গেছে! তাদের জন্য মুহাম্মদ সেই মুহুর্তে আকাশ থেকে একটি ওহী পাচ্ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলার এমন সময়ে তারা নিজেদেরকে তাদের মালিকের (ঈশ্বর) দিকে তাকাবার যোগ্য বলেও মনে করেনি (১৬)।

ইসলামিক গ্রন্থ আমাদের জানায় না এই খিঁচুনিটা কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল, কিন্তু যখন এটি শেষ হলো তখন চারপাশের লোকেরা মুহাম্মদকে ভীষণ ক্রুদ্ধ দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। তারা জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনাকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে কোন বিষয়টি?" তিনি তাদের মাঝে আসলেন। মক্কা আক্রমণের ঠিক আগে তিনি শুনেছিলেন যে, ইয়াছরিবীদের কেউ কেউ ধারণা করছে তিনি এখন থেকে তার কুরাইশ গোত্রের সাথেই মক্কায় থেকে যাচ্ছেন। যার অর্থ দাঁড়ায়, তাকে যারা বিশ্বাস করেছিল, আশ্রয় দিয়েছিল তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। এটি প্রকারান্তরে ছিল বিশ্বাসঘাতক বলারই সমতুল্য। খিঁচুনি শুরু হওয়ার আগে তিনি যা শুনেছিলেন, তার প্রতিটি শব্দ তিনি উচ্চারণ করে শোনালেন। এরপর তিনি তাদের ধমক দিয়ে বললেন : "আমি আল্লাহর দাস এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল। আমি আল্লাহ এবং তোমাদের কাছে হিজরত করেছি। তোমাদের সাথেই আমি বেঁচে থাকব এবং তোমাদের সাথেই আমি মরব" (১৭)। তাঁরা তাকে অপমান করে ফেলেছে ভেবে বিব্রতবোধ করলো। চোখে অশ্রু নিয়ে তারা বলল, "আমরা যা বলেছিলাম তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আমাদের আবেগের কারণেই বলেছি"। মুহাম্মদ শেষপর্যন্ত নরম হয়ে বললেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমাদের বিশ্বাস করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমাও করেছেন" (১৮)।

মুহাম্মদের প্রথম কাজটি ছিল তার আইনের প্রয়োগ করা। লোকেরা তার তাঁবুতে বিচারের জন্য, প্রধানতঃ পারিবারিক হেফাজতের বিষয়ে ফায়সালা চাইতে আসে। এসবের মধ্যে একটি ছিল মুহাম্মদের স্ত্রী সাওদার এক আত্মীয়ের সাথে জড়িত

একটি অমীমাংসিত ঘটনা। এক্ষেত্রে তিনি সাধারণ জ্ঞাননির্ভর রায় দিয়েছেন। আরও গুরুতর বিষয়ে তাঁর শাস্তি হতো দ্রুত এবং জটিল। গল্পটিতে বলা হয়েছে যে, বিজয়ের দিনে সাফা পর্বতে মৃগীরোগের খিঁচুনির খুব বেশি পরে নয়, তিনি খালিদের তাঁবুর দিকে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তখন একজন অপ্রকৃতিস্থ লোককে তাঁর সামনে আনা হয়েছিল। লোকটি মদপান করেছিল, এবং যে লোকেরা তাকে মুহাম্মদের কাছে টেনে এনেছিল তারা জিজ্ঞাসা করেছিল তার সাথে কি করা উচিত। মুহাম্মদ বললেন, "তাকে মার!" লোকটিকে ঘিরে ধরে জনতা তাকে ঘুষি, থাপ্পড় মারতে শুরু করল এবং তাকে স্যান্ডেল, লাঠি এবং চাবুক দিয়ে আঘাত করল এবং মুহাম্মদ একমুঠো মাটি নিয়ে তার মুখে ছুঁড়ে মারলেন (১৯)।

আরেকটি গুরুতর বিচার ছিল এক নারীর ব্যাপারে, যার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা হয়েছিল। মুহাম্মদের সামনে সেই নারীকে আনার আগে নারীটির এক আত্মীয় ওসামার (মোহাম্মদের পালকপুত্র জায়েদের ছেলে) কাছে যান এজন্য যে, ওসামা যেন তার ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য মুহাম্মদের কাছে সুপারিশ করেন। ওসামা যখন তার পক্ষে সুপারিশ করলেন, তখন মুহাম্মদ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন এবং বললেন : "তুমি কি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত আইনী দন্ডের সাথে জড়িত কোন বিষয়ে আমার কাছে সুপারিশ করছ?"

নারীটির অপরাধ নির্ধারণ করার পরে তিনি বাইরে গেলেন যেখানে লোকেরা সমবেত হয়েছিল, এবং তাদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিলেন এই বলে, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, কারণ তাদের মধ্যে যদি কোন অভিজাত লোক চুরি করত তারা তাকে শাস্তি দিত না এবং যদি তাদের মধ্যে কোন দরিদ্র লোক চুরি করত তবে তারা তাকে আইনগত শাস্তি দিত। আল্লাহর কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, যদি আমি মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত তবুও আমি তার হাত কেটে ফেলতাম"। তারপর তিনি চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কেটে ফেলার বিধান দিলেন। ঐ নারীটিকে নিয়ে যাওয়া হলো, এবং তার একটি হাত কব্জির উপর থেকে কেটে ফেলা হলো।

বিজয়ের পর বেশ কয়েকদিন ধরে মক্কাবাসীরা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণের জন্য সারিবদ্ধভাবে শামিল হতো। এই প্রতিশ্রুতির জন্য মুহাম্মদ সাফা পাহাড়ের চূড়ার নিকটে একটি পাথরের উপর বসেছিলেন। একে একে লোকেরা হাঁটু গেড়ে বসে অদম্য সেই শপথটি উচ্চারণ করে বলত : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে একজন আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর দাস ও রাসূল" (২০)। অতীতে মুহাম্মদ প্রত্যেক ধর্মান্তরিতের হাত ধরতেন, তবে এবার এত বিপুল সংখ্যক মানুষের কথা চিন্তা করে তিনি সেই কর্তৃত্বটি উমরকে দিয়েছিলেন। উমর মুহাম্মদের চেয়ে নিচুতে পাতা একটি শিলার উপর বসেছিলেন। আর মুহাম্মদ তার নিজের তাঁবুতে বায়াত (হাতে হাত রেখে আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে, আবু সুফিয়ান, ইকরিমা এবং সাফওয়ানের স্ত্রী সহ দশজন উচ্চপদস্থ নারী বায়াত গ্রহণ করার জন্য মুহাম্মদের তাঁবুতে গিয়েছিলেন। বরেদের (Husband) সাথে তাঁর প্রধান শত্রুদের কয়েকজন নারীও ছিল। বিশেষতঃ হিন্দ যিনি বদরে তার পুত্র, পিতা, ভাই এবং চাচাকে হারিয়েছিলেন। আনুষ্ঠানিক সমর্পণের জন্য, তারা পুরো পোশাক এবং মুখ ঢাকার ওড়না (veil) পরে এসেছিল। মুহাম্মদের হত্যার তালিকায় থাকা হিন্দ, নিজের মুখটি আঁটসাঁট করে ঢেকে রেখেছিলেন। তিনি কয়েকদিন ধরে ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে দিনানিপাত করছিলেন যে, মুহাম্মদের লোকেরা তার বাড়িতে ঢুকে পড়বে এবং তার মাথা কেটে ফেলবে। পর্দার আড়ালে থেকে তিনি চটকদার ভাষায় বললেন : "হে আল্লাহর রাসূল, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর ধর্মকে মহিমান্বিত করেছেন, অনুগ্রহ করে আপনার দয়ার স্পর্শ আমাকে করুন। আল্লাহর সামনে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি প্রকৃতই একজন বিশ্বাসী নারী" (২১)। তার এই কথায় শাহাদার সুরক্ষা মিলবে এই আশায় হিন্দ তার মুখের কাপড় সরিয়ে তার পরিচয় দিলেন। মুহাম্মদ চমকে উঠলেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই স্বস্তি পেয়েছেন দেখে যে, হিন্দও এখন তার ধর্মে যোগ দিচ্ছেন। মোহাম্মদের এখন আর এই আশঙ্কা নেই যে, তার চাচা হামজার দেহের ক্ষুদ্রাংশ যা হিন্দ কর্তৃক কলিজা চিবানোর কারণে এখন তা হিন্দের দেহের অংশ হয়ে গেছে তা আর এখন জাহান্নামের আগুনে পুড়বে না। এখন যদি হিন্দ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নতুন আইনের (ধর্ম) উপরে অটল থাকেন তবে তিনি জাহান্নামের আগুনের লেলিহান থেকে শিখা থেকে বাঁচতে পারবেন।

মুহাম্মদ তিনি নারীদের উদ্দেশ্যে বললেন যে, এখন থেকে নারীদের জন্য ব্যভিচার করা, কুৎসা রটানো বা তাদের সন্তানদের হত্যা করা নিষিদ্ধ। "এবং তোমরা অবশ্যই আমার কথার অবাধ্য হবে না" বললেন মুহাম্মদ। **হিন্দ মুহাম্মদের এমন কথায় স্তব্ধ না হয়ে পারলেন না, তাই তিনি বলেই ফেললেন, "আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যে আমাদের ছেলেমেয়েদের হত্যা করছিলেন"** (২২)। মুহাম্মদ তাদের (নারীদের) কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাদের হাত স্পর্শ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এটি নিষিদ্ধও ছিল; কারণ কোনও নারীর শরীরের সাথে শরীরের সংস্পর্শ হলে তা মনের মধ্যে লালসা জাগাতে পারে। স্পর্শের পরিবর্তে, তিনি একটি বাটির পানিতে তার হাত ডুবিয়ে দিলেন। নারীরা তাদের হাত সেই বাটিতে ডুবিয়ে এই শপথনামায় সীলমোহর এঁটে দিলেন (২৩)।

খালিদের সাথে সংঘর্ষের পরে পালিয়ে যাওয়া মক্কাবাসীদের কয়েকজন ফিরে এলো যখন তাদের খবর দেয়া হয়েছিল যে, ধর্মান্তরিত হলে মুহাম্মদ তাদের ক্ষমা করে দেবেন। তাদের একজন ছিলেন জিবারা (Zibara) নামের একজন কবি, যিনি মুহাম্মাদকে নিয়ে অসংখ্য বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করেছিলেন। তিনি আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে এসে মুহাম্মদের সামনে ঝুঁকে বললেন : "আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আপনিই তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি আমাকে তার আনুগত্যের পথে পরিচালিত করেছেন"। মুহাম্মদ সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আপনাকে তাঁর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে আনুগত্যের ধর্মটি পূর্বেকার সবকিছুকে বাতিল করে দেয়" (২৪)!

উমাইয়া ইবনে খালাফের পুত্র এবং মক্কার বণিকদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সাফওয়ান যিনি মুহাম্মদের বিরোধিতা করতেন, তিনি সমুদ্র উপকূলের দিকে আত্মগোপনে চলে গিয়েছিলেন এবং জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, মুহম্মদের হাতে পড়ার চেয়ে তিনি নিজেকে হত্যা করতেই বেশি পছন্দ করবেন। মক্কার এক নওমুসলিম ব্যবসায়ীর সাথে সাফওয়ানের ব্যবসায়িক লেনদেন ছিল। সেই ব্যবসায়ী সাফওয়ানকে ধরে ফেলেন এবং তাকে বলেন যে মুহাম্মদের ধর্মটি গ্রহণ করলে মুহাম্মদ তার সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেবেন, সুতরাং তার পক্ষে ফিরে আসাটাই নিরাপদ ও উত্তম হবে। সাফওয়ান তার কথার প্রমাণ চান। লোকটি মুহাম্মদের একটি পাগড়ি এবং একটি ব্যক্তিগত বার্তা নিয়ে ফিরে এসেছিল, যেখানে মুহাম্মদ তাকে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়ে মনস্থির করার জন্য দুই মাসের সময় দিয়েছিলেন। মক্কায় ফিরে তার বণিক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সাফওয়ান মুহাম্মদের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, দুই মাসের সময়সীমা সত্য কিনা। পূর্বতন শত্রুর সমর্থন পেতে আগ্রহী চতুর মুহাম্মদ বললেন যে, কেবল এটিই সত্য নয়, তিনি বরং এখন এর সময়সীমা বাড়িয়ে চারমাস করেছেন (২৫)। অনাক্রম্যতার অনুরূপ প্রতিশ্রুতি সহ মুহাম্মদ আবুল হাকামের পুত্র ইকরিমা, সাওদার প্রাক্তন ভগ্নিপতি সুহাইল এবং অন্যান্য প্রভাবশালী মক্কাবাসীদেরও ধর্মান্তরিত হতে উৎসাহিত করেছিলেন, যারা মৃত না হয়ে বরঞ্চ জীবিত থাকলে মুহাম্মদের জন্য আরো বেশি উপকারে আসবেন।

মুহাম্মদ প্রায় তিন সপ্তাহ মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। এই সময়ে তিনি নতুন নির্দেশনা দিয়েছিলেন। প্রশাসনিক বিষয়ে তার সংকীর্ণ ধারণা ছিল। সুতরাং তিনি যেসব বিধিবিধান ঘোষণা করেছিলেন তার দাবি অনুযায়ী সে সবই ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে। এসব বিধিবিধানের মধ্যে ছিল ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করা এবং নিয়মমাফিক আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করা।

ততদিনে তিনি হিজাজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন নিয়মকানুন তৈরি করেছিলেন, যা জীবনের প্রায় প্রতিটি বিষয়কে অনর্ভুক্ত করেছে। তিনি মক্কাবাসীদেরকে প্রার্থনা শিখিয়ে দিতে এবং এর বিধিমালা সম্পর্কে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রচারকদের নিয়োগ করেছিলেন। তিনি বিচারকও নিয়োগ করেছিলেন যাদের ভূমিকা ছিল তার দেখানো পথ থেকে সরে যাওয়া (ইসলামত্যাগী) যেকোনও ব্যক্তির উপর শাস্তি প্রয়োগ করা।

পর্ব – ৩

অন্ধকার দুপুর

অধ্যায় - ৩১

দেবতাদের মৃত্যু

মক্কার উচ্চভূমিতে লাল তাঁবুতে বসে বসে মুহাম্মদ ভাবতে থাকেন মক্কার উপর কিভাবে তার ধর্মের শাসন আরোপ করা যায়। এসব কিছু ভাবতে ভাবতেই বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করেন তিনি। তিনি পৌত্তলিকদের অভয়ারণ্য ধ্বংস করার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বেদুইন গোত্রদের উপর তার নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য করার জন্য তার অনুসারীদের একটি সেনাদলকে প্রেরণ করেন।

একসময় মুহাম্মদ ও খাদিজা যেই মূর্তিকে উপাসনা করতেন, সেই প্রথম পৌত্তলিক মূর্তি আল-উজ্জা দেবীকে এখন সবার আগে ধ্বংস করতে হবে। মুহাম্মদ আল-উজ্জার অভয়ারণ্য ধ্বংস করতে খালিদকে ত্রিশজন লোক দিয়ে মক্কা থেকে একদিনের দুরত্বে পূর্ব দিকের নাখলায় পাঠান। প্রাচীন বাবলা গাছের তলায় পাহাড়ের পাশে থাকা এই মন্দিরটি খালিদের কাছে অচেনা ছিল না। তার পিতা ওয়ালিদ সেখানে তীর্থ করতে যেতেন, আল-উজ্জার বেদীতে উট ও ছাগল উৎসর্গ করতেন এবং খালিদ ও তার ভাই-বোনেরা প্রায়ই পিতার সাথে অংশগ্রহণ করতেন। খালিদ যখন তার আক্রমণকারীদের নিয়ে সেখানে পৌঁছলেন, তখন মন্দিরে থাকা সবার মধ্যে থেকে শুধু একজন পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেল। **একজন আবিসিনিয়ান নারী যিনি সম্ভবত দেবতার ভক্ত অথবা পুরোহিত, খালিদের উদেশ্যে চিৎকার করে দৌড়ে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। খালিদ তলোয়ার নিয়ে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাকে তরবারির আঘাতে 'দ্বিখন্ডিত' করে ফেললেন।** এরপর খালিদ ও তাঁর লোকেরা মন্দিরটি ধ্বংস করে গাছগুলোকেও কেটে ফেললেন, যা কিছু পেলেন তার সব নিয়ে মক্কায় ফিরে গেলেন। মুহাম্মদ যখন সেই নারীর কথা জানতে পারলেন তখন তিনি বলে উঠলেন, **"ওটাই ছিল আল-উজ্জা"** (১)।

খালিদ যখন নাখলার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন মক্কার সাবেক সামরিক কমান্ডার আমর আল আসকে পাঠানো হয়েছিল মানাত দেবতার অভয়রাণ্য ভেঙ্গে ফেলার জন্য, যা লোহিত সাগরের ইয়ানবু নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। মানাতের উপাসনা করত আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা। মুহাম্মদ মক্কার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চারিপাশে আরও অন্যান্য গোত্রের দেবতাদের অভয়ারণ্য ধ্বংস করার জন্য বাহিনী পাঠাতে থাকেন। মক্কায় তিনি ঘোষকদের দলকে পাঠান রাস্তা ও অলিগলিতে এই বলে ঘোষণা দিতে যে, তারা যেন তাদের সংগ্রহে/অধীনে থাকা সকল মূর্তিগুলো তাদের ঘর থেকে বের করে ধ্বংস করে ফেলে। তারা চিৎকার করে বলতে থাকে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের বাড়িতে কোন মূর্তি যেন তারা না রাখে। বরং তা ভেঙ্গে ফেলতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে" (২)। তাদের এই ঘোষণা প্রতিটি পাড়ায়-মহল্লায় শোনা যেতে লাগল। যখনই আলী জানতে পারতেন যে, কেউ কেউ তাদের বাড়িতে মূর্তি লুকিয়ে রাখছে তখনই তিনি জোর করে সে সমস্ত বাড়িতে ঢুকে নিজেই মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করতেন।

মুহাম্মদ এছাড়াও তার শত শত যোদ্ধাদের ব্যস্ত রাখেন বাইরের গোত্রদের উপর আক্রমণ করতে, যারা তখনো ধর্মান্তরিত হয়নি। ইসলামিক আদিগ্রন্থে এমন তিনটি অভিযানের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা : দুইশত লোককে পাঠানো হয় দক্ষিণ-পশ্চিমের ইয়ালামলামের দিকের মরুভূমিতে থাকা আরবদের আক্রমণ করতে। আর তিনশো যোদ্ধাকে পাঠালেন মক্কা থেকে একদিনের দুরত্বে থাকা উত্তর দিকের উরানার বেদুইনদের বিরুদ্ধে। এই দুই অভিযানের ফলাফল বা পরিণাম কী হয়েছিল তা গ্রন্থে পাওয়া যায় না, কিন্তু তৃতীয়টির সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। খালিদ নাখলার অভিযান থেকে ফিরে এসে লোহিত সাগরের কাছে জাদিমা (Jadhima) গোত্রের বিরুদ্ধে তিনশো পঞ্চাশজন লোককে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যান এবং তাদের ধর্মে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানান। অনেক বছর আগে তার চাচাকে জাদিমা গোত্রবাসীদের একজন হত্যা করেছিল, তাই এই অভিযান একটি নিষ্ঠুর গণহত্যায় পরিণত হয়। খালিদ তার চাচার হত্যার প্রতিশোধ নিতে তার ক্ষমতাকে এই সময় ব্যবহার করেন। সব দলিলেই পাওয়া যায় যে, খালিদ প্রায় ত্রিশজন লোকের শিরোশ্ছেদ করেছিলেন, যদিও তারা তার কাছে

তাদের অস্ত্র সমর্পণ করেছিল। তাদের শিরোচ্ছেদ করার আগে তারা দাবি করে যে তারা সম্প্রতি ধর্মান্তরিত হয়েছে এবং বিশ্বাস করে যে, তাদের উপর শাহাদার সুরক্ষা আছে। তবুও খালিদ তাদের হত্যা করেন। মুহাম্মদ যখন এই গণহত্যার কথা জানতে পারেন, তিনি ক্ষুব্ধ হন এবং তাকে সকল ভালো কাজের থেকে অব্যাহতি দেন (৩)। তিনি যেমন ওসামাকে (Osama) বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়ার পরেও একজনকে হত্যা করার জন্য গালমন্দ করেছিলেন, ঠিক একইভাবে খালিদকেও তীব্র ভাষায় তিরস্কার করলেন এবং শাহাদার অবাধ্যতা সম্পর্কে মনে করিয়ে দিলেন। এরপর তিনি আলীকে তাদের ক্ষতির জন্য গোত্রের নিহতদের রক্তের মূল্য দিয়ে পাঠালেন।



[মুহাম্মদ মক্কার মন্দিরের ভেতরের ও আশেপাশের মূর্তিগুলো ধ্বংস করে দেন। বলা হয় যে, মন্দিরের মধ্যে ও মন্দির প্রাঙ্গণে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিল যা হুবাল ও আল-উজ্জার মতো প্রধান দেবতাদের প্রতিনিধিত্ব করতো, এবং ক্ষুদ্র গোত্র ও পারিবারিকভাবেও অনেকের মূর্তিই সেখানে অন্তর্ভুক্ত ছিল। মক্কা বিজয়ের পর মুহাম্মদ পাথরের মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলতে বলেন এবং কাঠের মূর্তিগুলোকে পুড়িয়ে ফেলার আদেশ করেন। তিনি শুধু কালো পাথরটিকেই অস্পৃশ্য (নষ্ট করা যাবে না) রাখেন।]

ঠিক এই সময়ে এমন একটি নতুন যুদ্ধে তাদের জড়িয়ে পড়তে হয়েছে যা যোদ্ধাদের সংখ্যার আধিক্যে পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধের যোদ্ধা সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে। মুহাম্মদ মক্কায় যাওয়ার সময় যে গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সেই গুপ্তচরই তাকে সতর্ক করেছিল যে হাওয়াজিন ও ছাকিফরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে জোট গঠন করছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে মুহাম্মদের তাঁবুর সদর দপ্তরে আরেকটি গোয়েন্দা সংবাদ এসেছে, যেখানে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে, উল্লেখিত গোত্র দুটি এক বিশাল সৈন্যদল জড়ো

করেছে এবং তার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে। এই খবর শোনার পর মক্কায় মুহাম্মদ তার দখল মজবুত করার সাথে সাথে হাওয়াজিন জোটদের মোকাবেলা করারও প্রস্তুতি শুরু করেন। সম্ভবতঃ প্রথমে তিনি বাইরের বিভিন্ন গোত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণের আদেশ দিয়েছিলেন এজন্য যাতে তারা হাওয়াজিন গোত্রদের সাথে যোগ দিয়ে হাওয়াজিনদের সংখ্যা বৃদ্ধি না করতে পারে। সুতরাং এটা ছিল তাদেরকে দুর্বল করারই কৌশল।

হাওয়াজিন অঞ্চলটি ইরাক ও পারস্য উপসাগরের দিকে বিস্তৃত ছিল এবং আয়তনে কৃষি শহর তায়েফকে পর্যন্ত এটি ছাড়িয়ে গেছে। তায়াফের জনগণের মতোই হাওয়াজিন গোত্রের লোকেরা তাদের পৌত্তলিক বিশ্বাসের প্রতি এতই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল যে, মুহাম্মদের মক্কা দখলের সংবাদে তারাও কেঁপে উঠেছিল। যখন তারা জানতে পারল মুহাম্মদের পৌত্তলিক অভয়ারণ্য ধ্বংস করছে, তারা ভয় পায় এই ভেবে যে শীঘ্রই মুহাম্মদ তাদেরকেও নিশানা করবে। তাই তাদের উপর আক্রমণ করার আগেই তারাই তাকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা হাওয়াজিন গোত্রের অন্যতম প্রধান মালিক আউফের নেতৃত্বে একত্রিত হয়। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেও তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত যোদ্ধা, এবং একজন সুবক্তাও বটে। তিনি মুহাম্মদকে আক্রমণ করার জন্য তায়েফের দুই প্রধান তার সাথে যোগ দিতে গোত্রকে রাজি করান।

বয়স্ক শেখদের পরামর্শের উপেক্ষা করে মালিক সমগ্র গোত্রের ভাগ্য যুদ্ধের জন্য সামনে নিয়ে আসেন। তাদের সকল নারী, শিশু এবং উট ও ছাগলের বিশাল পশুপালক সহ সকল গোত্রীয় সম্পত্তিকে এক জায়গায় জড়ো করেন। মালিকের উদ্দেশ্য ছিল তিনি নারী, শিশু এবং পশুপালকদের তার সেনাদলের পেছনে রাখবেন যাতে যোদ্ধারা প্রয়োজনীয় উৎসাহ পেতে পারে। এমনকি তাদের রক্ষা করতে তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকবে। তারা শুধু তাদের ঘৃণ্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে তাইই না, তারা তাদের পেছনে প্রিয়জনদের রক্ষা করার জন্যও লড়াই করবে।

এদিকে মুহাম্মদও একটি সেনাদল একত্রিত করলেন যার মধ্যে দশ হাজার লোক ছিল। এই বাহিনীতে ছিল যারা তার সাথে মক্কায় গিয়েছিল তারা এবং দুই হাজার মক্কাবাসী যারা মক্কা বিজয়ের পর তার ধর্মে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি নিশ্চিত করেছিলেন যে, তার সেনাদলের কাছে সবচেয়ে ভালো যুদ্ধসরঞ্জাম আছে। তিনি তার প্রাক্তন শত্রু সাফওয়ানের কাছ থেকেও অস্ত্রশস্ত্র এবং মারণাস্ত্র ধার করেন। সাফওয়ান, সুহায়েল এবং অন্যান্য মক্কাবাসীরাও তার বাহিনীতে যোগ দিল যাদেরকে একসময় মুহাম্মদ তার ধর্মে যোগ দিতে আহ্বান করেছিল। তিনি আবু সুফিয়ানকে মক্কাবাসী বাহিনীর নেতৃত্বের জন্য নিযুক্ত করলেন।

মক্কায় শত্রুর আক্রমণের জন্য অপেক্ষা না করেই মুহাম্মদ প্রথমে তাদের উপর আক্রমণ করতে গেলেন। হুনাইন (Hunayn) নামের একটি জনবসতিহীন উপত্যকার প্রবেশদ্বারেই দুই বাহিনীর সংঘর্ষ শুরু হয়। যদিও উপত্যকার কোথায় সংঘর্ষটি সংঘটিত হয়েছিল তার সঠিক অবস্থানটি আজও অজানা, কিন্তু এটি সম্ভবত তায়েফের চেয়ে মক্কারই বেশি কাছাকাছি হবে। দুই পক্ষই দুত পাঠিয়েছে তাদের শত্রুদের অগ্রগতির খবর জানতে। মালিক যখন মুহাম্মদের সৈন্যদের খবর জানতে পেলেন তিনি তখন একটি কৌশলগত ফাঁদ তৈরি করলেন। টোপ হিসেবে তিনি নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং তার গোত্রের বিশাল পশুপালকদের সামনের সারিতে রাখলেন এবং উপত্যকার নিচের দিকে তাদের পেছনে যোদ্ধাদের রাখলেন। আবার পুরুষদের সারির পেছনে উটের উপরেও নারীদের আরোহণ করানো হলো যাতে দেখে মনে হয়, একটি বৃহত্তর শক্তির আবির্ভাব হতে যাচ্ছে । তাদের পেছনে রয়েছে বিশাল পশুপাল। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে একটি শক্তিশালী বাহিনী। মুহাম্মদের বাহিনীর একমাত্র উপায় ছিল একটি বিস্তৃত নদীতটে এগিয়ে যাওয়া, যেটা পাহাড়ের এবং উপত্যকার মাঝখানে নেমে আসছে এবং তার পাশে অসংখ্য খাঁড়ি ছিল, যার গভীরতা নদীর পাড় থেকে দৃশ্যমান ছিল না। মালিক শত শত অশ্বারোহী ও তীরন্দাজকে নদীর তীরে অবস্থান নিতে বললেন। তারা আশা করেছিল যে, মুহাম্মদের সৈন্যরা তার আনুষ্ঠানিক যুদ্ধের সারির দিকে নদীর তীরে আসতে থাকবে যা তাদেরকে আকস্মিক আক্রমণের মুখে ফেলে দেবে।

মুহাম্মদ গুপ্তচরের মাধ্যমে মালিকের যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে আগেই জানতেন, যার ফলে এটি মুহাম্মদের জন্য হঠাৎ আক্রমণের একটা সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল। কোরআনের পরবর্তী একটি আয়াত থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তিনি তার সেনাদলের আকারের কারণে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন এবং তিনি হাওয়াজিনদের বিরুদ্ধে খুব সহজেই জয়লাভ করেছিলেন (৪)। যখন সেনাদল হাওয়াজিনদের অবস্থানের দিকে আসে মুহাম্মদ তখন যুদ্ধের পোশাক পরে মিশরের শাসকের দেয়া সাদা খচ্চরের উপর চড়ে বিভিন্ন সারির সামনে দিয়ে বারবার যাওয়াস-আসা করতে থাকেন এবং যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দিতে থাকেন এই বলে : "বাঁচলে গণিমতের মাল আর মরলে জান্নাত!" মালিক আকস্মিক আক্রমণের সংকেত দেয়ামাত্রই মুহাম্মদ সেনাদলের পেছনের সারিতে ফিরে আসেন এবং প্রথমদিকের ধর্মান্তরিত এবং ঘনিষ্ঠ পরিবারের সদস্যদের একটি দলে যুক্ত হোন। হঠাৎ শত শত মুখোশ পরা যোদ্ধা দৃষ্টির আড়াল থেকে মুহাম্মদের নেতৃস্থানীয় সৈন্যদের উপর ক্রমাগত তীর ছুঁড়তে লাগল, এবং এর সাথে সাথেই খাঁড়ি থেকে অশ্বারোহেরাও বেরিয়ে এলো। এই হামলা এত দ্রুত এবং আক্রমণাত্মক ছিল যে, আতঙ্কে মুহাম্মদের সেনাদলের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে এবং তারা নদীর তীরের দিকে পিছিয়ে যায়। এটা এমন এক অন্ধ ভীতিতে সবাইকে আতঙ্কিত করে তোলে যে, সেনাদল মুহাম্মদ ও তার সাথে থাকা ছোট দলটি পাহাড়ের পেছনে চলে যায়। ততক্ষণে হাওয়াজিন ও ছাকিফের পদাতিক সৈন্যরা নারী ও শিশুদের পেছনে ফেলে সামনের সারিতে যুদ্ধ করতে চলে আসে।

এটাই ছিল একমাত্র যুদ্ধ যেখানে মুহাম্মদকে একজন সাহসী যোদ্ধা হিসেবে প্রমাণ করতে হয়েছিল। এর আগে তিনি সারির পেছনে থাকতেন এবং একটি নিরাপত্তা বলয় দ্বারা পরিবেষ্টিত থেকে নিরাপদ দূরত্ব থেকে যুদ্ধের নির্দেশ দিতেন। উহুদের যুদ্ধে একজন আক্রমণকারীর একটি বর্ষা তার গলায় আঘাত করার পর তিনি পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তার অনুসারীরা মৃত্যুর সাথে লড়াই করে তাকে পালানোর সুযোগ করে দিয়েছিল। এখন যদি তিনি তার সাহসিকতার উদাহরণ না রাখেন তাহলে তার সব হারিয়ে যাবে, তাই তিনি তলোয়ার টেনে সাদা গাধাটিকে উত্তেজিত করে শত্রুর অভিমুখে এগিয়ে গেলেন। তিনি সেনাদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায়, তার সাথে থাকা মাত্র শ'খানেক লোক নিয়েই শত্রুর দিকে এগিয়ে গেলেন। এখানে তার চাচা আব্বাসও ছিলেন। আব্বাস একজন বিশালদেহী মানুষ ছিলেন যিনি তার জোরালো কণ্ঠস্বরের জন্যেও পরিচিত ছিলেন। তিনি জোরে জোরে চিৎকার করে তাদের সেনাদলের গোত্র এবং তাদের নেতাদের নাম ধরে ধরে ডাকতে থাকলেন। বিভিন্ন সেনাপতি সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত তিনি এভাবেই চিৎকার বজায় রাখেন। অবশেষে খালিদ সহ সবাই আবার যুদ্ধের সারিতে ফিরে আসে। একবার পুনরায় একত্রিত হওয়ার পর তারা একটি পাল্টা হিংস্র আক্রমণ শুরু করলেন। মুহাম্মদ সবাইকে দেখে উল্লসিত হয়ে বললেন, "যুদ্ধের আগুন এখন সত্যিই গরম!" (৫)

মুহাম্মদের সৈন্যদল শীঘ্রই বহুশ্বরবাদী সেনাদলকে পরাজিত করল। যদিও এ ব্যাপারে খুব সামান্য বিবরণই পাওয়া যায়, কিন্তু ধারণা করা হয় যে তারা পুনর্গঠিত হবার পর মুহাম্মদের লোকেরা হাওয়াজিন এবং তাদের তায়েফ মিত্রদের বিরুদ্ধে একটি শক্তশালী বাহিনী হয়ে যুদ্ধ করেছিল। মুহাম্মদ যখন মক্কায় ছিলেন, তখন মালিক কুড়ি হাজার 'তলোয়ার' পাঠাচ্ছেন এই রকম একটি গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সম্ভবত তিনি এক তৃতীয়াংশ, অথবা মুহাম্মদের সৈন্য সংখ্যার অর্ধেক সৈন্য শক্তি পাঠিয়েছিলেন। মুহাম্মদের বাহিনীর তীব্র আক্রমণে হতভম্ভ হয়ে মালিকের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়, আর পেছনে সুরক্ষা ছাড়াই রেখে যায় নারী, শিশু এবং গবাদি পশুগুলোকে। মুহাম্মদের সেনাদল ছয় হাজার নারী ও শিশুকে বন্দি করে। হাওয়াজিনদের বিশাল সংখ্যক গবাদিপশুও তারা সংগ্রহ করেছিল, যার মধ্যে ছিল চব্বিশ হাজার উট এবং চল্লিশ হাজার ছাগল (৬)।

সকল পুরুষ যাদেরকে ধরা হয়েছিল বা আত্মসমর্পণ করেছিল তাদের সবাইকে মুহাম্মদের আদেশে হত্যা করা হয় (৭)। মুহাম্মদের আদেশে ধরা বা আত্মসমর্পণ করা সকল নারী শিশু এবং পশুদের মক্কা থেকে দশ মাইল দূরে জিরানা (Jirana) নামক একটি উপত্যকায় নিয়ে যাওয়া হয়। যতক্ষণ না তিনি তাদের কী করা হবে তার সিদ্ধান্ত নেন ততক্ষণ তারা সেখানেই অবস্থান করে। মুহাম্মদ খালিদকে পাঠিয়েছিলেন মালিককে ধরার জন্য, কিন্তু একটি হাতাহাতির লড়াইয়ের পর মালিক এবং

ছাকিফরা দেয়াল ঘেরা শহরের নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যায়। আর হাওয়াজিন গোত্রের লোকেরা পাহাড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল। মুহাম্মদ এ সময় তায়েফের দিকে যান এবং তায়েফ শহরে হামলা চালাতে চাইলেন। তিনি তার সৈন্যদেরকে তায়েফের চারপাশের পাহাড়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলেন, যা তিন হাজার ফুট উচ্চতায় ছিল। পথে যেতে যেতে কয়েকটি শক্তিশালী দূর্গাকৃতির বাড়ি ধ্বংস করে দিলেন। মোহাম্মদের দ্রুতগতির পথচলা তায়েফের দেয়ালের সামনে এসে থেমে যায়। শহরটি ইয়েমেনিদের প্রাচীন কাফেলা রাজ্যের একটি উপনিবেশ হিসেবে শুরু হয়েছিল, যারা পাথরের দুর্গ নির্মাণে ওস্তাদ ছিল। দেয়ালের পুরুত্ব, উচ্চতা এবং রাজমিস্ত্রির নিখুঁত হাতের কারিশমার জন্যেও ওদের নামযশ ছিল।

মুহাম্মদ প্রায় একমাস তায়েফকে অবরুদ্ধ রাখেন, কিন্তু অবশেষে হাল ছেড়ে দেন যখন তিনি বুঝতে পারেন শহরটি তার বিশাল শক্তির কাছেও অপ্রতিরোধ্য। ছাকিফরা দক্ষ 'ধনুকবিদ' ছিল এবং উঁচু জায়গা থেকেই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছিল। মুহাম্মদ তাদের ছোঁড়া তীরের আঘাতে তার নিজের দলের বেশকিছু লোককে হারিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে বিবৃত হয়েছে যে, মুহাম্মদ অবরোধ করার যন্ত্রপাতি, প্রাথমিকভাবে মিনজানিক, দেয়াল ভাঙার যন্ত্র ইত্যাদি বাদ দিয়ে একটি আঘাতকারী যন্ত্র (Battering ram) পাঠিয়ে দেন প্রধান ফটকের বিশাল দরজা ভাঙতে। তিনি নিশ্চয়ই এই দরজা ভাঙাভাঙি দেখে খুবই খুশি হয়েছিলেন, কারণ তার স্মৃতির দৃশ্যপটে তখন নিশ্চয়ই ভেসে উঠেছিল যে, তাঁকে এই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে তায়েফ থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল আরো এক দশক আগে। কিন্তু এখন ভাঙার সেই যন্ত্রটিও অকেজো প্রমাণিত হচ্ছে। যখন তার সৈন্যরা যন্ত্রের প্রতিরক্ষামূলক আবরণের নিচে তীর থেকে নিজেদের লুকিয়ে রেখে দরজা ভাঙার জন্য ক্রমাগত ঘা মারতে থাকে তখন দুর্গের রক্ষাকর্তারা ছাদের উপর থেকে তাদের উপর লাল গরম লোহার শস্যমঁজরী (উত্তপ্ত, গলিত লোহা) ছুঁড়ে ফেলছিল। মোহাম্মদের সেনারা যখন আগুন থেকে পালিয়ে যত্রতত্র ছোটাছুটি করতে থাকল তখন উপর থেকে তীরন্দাজরা তাদেরকে তাদের তীরের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নেয়। **পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে মুহাম্মদ ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের আংগুরের ক্ষেতগুলোকে ধ্বংসের আদেশ দেন। যোদ্ধাদের মধ্য থেকে কেউ একজন তাঁকে মনে করিয়ে দেয় যে, তিনি যা ধ্বংস করছেন তা তারই হবে যদি তিনি তায়েফ জয় করতে পারেন।** মুহাম্মদের এক ঘোষক শহরের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে যে, মুহাম্মদ পালিয়ে যাওয়া যেকোন দাসকেই মুক্ত করে দেবেন এবং ঠিক তখনই সাফল্য আসে। যখন তার সৈন্যদল চলে গেল, ততক্ষণে কুড়িজনেরও বেশিলোক দেয়াল টপকে ভেতর থেকে বেরিয়ে চলে এসেছে।

নারীদের ক্রীতদাসী হিসেবে গ্রহণ করতে পারছেন তা তো বলাই বাহুল্য, কিন্তু শহরের সম্পদের উপরে হাত বসাতে না পেরে অসন্তুষ্ট হয়ে মুহাম্মদের লোকেরা অবরোধ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলো। মুহাম্মদের অনুগামী বেদুইনদের এক প্রধান বলেছিলেন, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন কিভাবে তিনি একজন ছাকিফ নারীকে তার সন্তান জন্মদানের জন্য রাখতে চেয়েছিলেন; কারণ ছাকিফদের নারীদের বুদ্ধিমান নারী হিসেবে সুখ্যাতি ছিল এবং তারা বুদ্ধিমান শিশু জন্ম দিত। এ ধরনের চাপের মুখে মুহাম্মদ তার সেনাদলকে আরেকবার দরজা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করতে বললেন, কিন্তু এর ফলে আরো হতাহতের ঘটনা ঘটল। বলা হয় যে, তিনি তাদের (অতি উৎসুক) নিয়ে উপহাস করেন যখন তারা একমত হন যে, তাদের গুটিয়ে চলে যাওয়ার সময় হয়েছে। অবশ্য তাদের উৎসাহিত করার জন্য মুহাম্মদ তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, ইতোমধ্যে জিরানা উপত্যকায় তাদের জন্য প্রচুর গনিমতের মাল অপেক্ষা করছে, যেখানে হাওয়াজিন নারী ও শিশু এবং বিশাল পশুপালকদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

মুহাম্মদ যখন জিরানায় পৌঁছালেন, ততদিনে প্রায় এক মাসেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে এবং ছয় হাজার বন্দী খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছিল। সেটা দেখতে অনেকটা শরণার্থী শিবিরের মতো ছিল। সেই সময় তাদের অপহরণকারীরা তাদের খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছিল, কারণ রোগা ক্রীতদাস কারো কোন কাজে আসত না। লুট করা গবাদিপশু থেকে কমপক্ষে প্রতিদিন অন্তত ষাটটি ছাগল ও উট জবাই করতে হতো, যার ফলে পশুপালের সংখ্যাও কমতে থাকে। মুহাম্মদ বন্দিদের ছেড়া জীর্ণশীর্ণ কাপড়ে পেলেন এবং তাদের দুর্দশার প্রতিকার করতে হাওয়াজিনদের কাছ থেকে লুট করা সম্পদের মধ্য থেকে কিছু রুপার মুদ্রা দিয়ে তাদের জন্য কাপড় কিনতে মক্কায় লোক পাঠালেন।

যখন গনিমতের মালের বিতরণের সময় এলো, মুহাম্মদ তাকে সবসময় ঘিরে রাখা মক্কাবাসীদের অগ্রাধিকার দিলেন যাতে করে তিনি তাদের আরো শক্তভাবে পাশে রাখতে পারেন। **কাউকে জোর করে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করা ছিল এক বিষয়, আর তাদেরকে সর্বদাই উৎসাহের মধ্যে রাখাটা ছিল আরেক বিষয়**। মুহাম্মদের তাদের উৎসাহ দরকার। বিশেষ করে আবু সুফিয়ান, সাফওয়ান, সুহায়েল, হাকিম ইবনে হিজাম, জুবায়ের ইবনে মুতিম এবং আরও ডজন খানেক উল্লেখযোগ্য মক্কাবাসীদের উৎসাহ তার দরকার ছিল। তাই তারাই প্রথম তার বৃহৎ উদারতা থেকে উপকৃত হয়। তিনি আবু সুফিয়ানকে একশোটি উট, তাঁর পুত্র ইয়াজিদকে আরো একশো উট (৯) ও মুয়াবিয়াকে আরো একশো উট উপহার দেন (১০)। সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিরা একশো করে উট পেলেন, এবং সেখানে হারিছের ভাইও ছিল যাকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করা হয়। লুট করা রূপা থেকে আবু সুফিয়ান ও তার ছেলেদেরও অনেক বড় একটি অংশ দেয়া হলো। সাফওয়ানের ব্যাপারে দেখা যায়, মুহাম্মদ তাকে বিশাল হাওয়াজিন পশুপালকদের পরিদর্শন করতে উপত্যকা ভ্রমণে নিয়ে গিয়েছিলেন, যেগুলো খাঁড়িতে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তারা যখন একটা খাঁড়িতে থামল তখন মুহাম্মদ সাফওয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, সেখানে বেঁধে রাখা প্রাণীদের সম্পর্কে তিনি কি ভাবছেন। যখন তার প্রাক্তন শত্রু মাথা নাড়ালেন তখন মুহাম্মদ বললেন, "এখানে যা কিছু আছে তা সব তোমার" (১১)।

সাফওয়ানের পিতা উমাইয়া ইবনে খালাফ এবং তার ভাই আবদুল্লাহকে সাত বছর আগে বদরের যুদ্ধে বিলালের প্ররোচনায় হত্যা করা হয়েছিল, তিনি মুহাম্মদের উদারতায় আনন্দিত হলেন এবং ঘটনাস্থলেই তার এবং তার ধর্মের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করলেন। মুহাম্মদ মক্কাবাসী নেতা সাফওয়ান এবং তার ঘনিষ্ঠদের হাওয়াজিনের সুন্দরী নারীসহ ছয়জন যৌনদাসীও হস্তান্তর করেন। আলী, উসমান, উমর, আব্দুর রহমান, তালহা, জুবায়ের, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং অন্যান্য বিশিষ্ট বিশ্বাসীরা প্রত্যেকেই একটি করে ক্রীতদাসী পেয়েছিলেন। উমর তার নিজেরটা তার পুত্র আবদুল্লাহকে দিয়েছিলেন, যিনি তাকে আবার তার এক চাচার কাছে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন, যতক্ষণ নিশ্চিত হন যে তিনি গর্ভবতী নন। ইসলামিক গ্রন্থে আমাদের জানাচ্ছে যে, "তিনি ছিলেন একজন ক্রীতদাসী, বিশুদ্ধ এবং প্রশংসনীয়" (১২)।

এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি নিষ্পত্তি করা সময়সাপেক্ষ ছিল। দশ হাজার লোক এই কাজের জন্য মুহাম্মদের কাছ থেকে তার হয়ে ক্ষতিপূরণ দাবি করে তার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করার জন্য। মক্কাবাসী ও তার সেনাপতিদের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব তাদের বিরক্ত করেছিল, এবং বেদুইনদের মধ্যে কেউ কেউ দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে করতে রুক্ষ হয়ে গিয়েছিল। বলা হয় যে, একদল বেদুইন তাদের অংশের গনিমতের মালের জন্য চিৎকার করছিল। তারা মুহাম্মদকে ঠেলতে ঠেলতে কাঁটা গাছের উপরে নিয়ে ফেলে। তারা এতটাই আক্রমণাত্মক ছিল যে, তার গায়ের পোশাক পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলে, অথবা তা খুলে ফেলে! আরেকজন বেদুইন সাহসের সাথে তার তাঁবুতে ঢুকে বলে, মুহাম্মদ যে সবাইকে 'আনন্দ' করতে বলেন, এইটা শুনতে শুনতে সে অসুস্থ এবং ক্লান্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু তারা কী নিয়ে আনন্দ করবে যখন তাদের যা পাওনা ছিল তাই তাদের দেয়া হয়নি? মুহাম্মদ তাৎক্ষণিক প্রতিশোধ নিতে একটি বাটিতে ওযু করলেন, লোকটির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে তার মুখ ও হাত ধুয়ে পানিতে থুথু ফেললেন। তিনি বেলাল ও আরেকজনকে পান করার জন্য বাটিটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, "নাও, নিজেকে খুশি করো"। বহেরাগতদের কাছ থেকে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে মুহাম্মদের স্ত্রী উম্মে সালামা এই দৃশ্যটি দেখছিলেন। তিনিও এই বিদ্রুপের সাথে যোগ দিয়ে বললেন, "হেই, আমার জন্য কিছু রেখো!" (১৩) এইভাবে বেদুইনকে উপেক্ষা করা হয়, এবং সে শেষপর্যন্ত অপমানিত হয়ে তাঁবু ছেড়ে চলে যায়।

যখন আরেকজন বেদুইন মুহাম্মদকে বলেন যে তিনি তাদের সাথে অন্যায় করছেন, মুহাম্মদ তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলেন : "তুমি বিভ্রান্ত আছো, আমি না তাহলে কে হবে সেই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি?" এ ঘটনায় উমর এমন ক্ষুব্ধ হলেন যে, তিনি তার তলোয়ার বের করেন এবং জিজ্ঞেস করেন, "আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আমাকে তার শিরোচ্ছেদ করার অনুমতি দেবেন?" মুহাম্মদ বেদুইনকে মোনাফেক বলে অভিহিত করেন এবং তাকে ছেড়ে দেন (১৪)। অবশেষে যখন মরুভূমির

আরবদের প্রাপ্য সময় আসে, তখন মুহাম্মদ মাথা গণনার আদেশ দেন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে প্রত্যেকে চারটি উট বা চল্লিশটি ভেড়া বেছে নিতে পারবে এবং অশ্বারোহীদের বারোটি উট বা একশো কুড়িটি ভেড়া দেয়া হবে।

সবচেয়ে জটিল বিষয় ছিল ব্যক্তিগত লুণ্ঠনকে ভাগ করা। যুদ্ধের আগে মুহাম্মদের সাধারণ আইন ছিল যে, কেউ শত্রুকে হত্যা করলে সেই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তার হত্যাকারী রাখতে পারবে। সাধারণত নিহতের অস্ত্র, বর্ম, এবং নিহত ব্যক্তি অশ্বারোহী হলে তাহলে সেই ঘোড়া ও ঘোড়ার উপর বসার আসনটিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতো। কখনও কখনও এই বিষয়টি নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্কের সৃষ্টি হতো, যখন দুইজন ব্যক্তি একই ব্যক্তিকে হত্যা করেছে বলে দাবি করত। দীর্ঘ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতো মুহাম্মদের এই বিষয়গুলির নিষ্পত্তি করতে। এর সমাধানে তিনি সাক্ষীদের সাক্ষ্য দাবি করতেন। যদি বিষয়টি প্রমাণিত না হতো (নিষ্পত্তি না হতো) তবে গনিমতের মাল সাধারণ লুণ্ঠনে অন্তর্ভুক্ত করা হতো।

যেন এই জটিলতাই যথেষ্ট নয়, মুহাম্মদ শেষপর্যন্ত পুরো গনিমতের পরিস্থিতিকেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে দেন যখন তিনি সকল বন্দিকে মুক্ত করে দেন। অথচ মুক্তিকৃত এসব বন্দিদের তিনি ইতিপূর্বেই দাসী হিসেবে বিতরণ করে দিয়েছেন কিছু প্রভাবশালী পরিবার, তার বন্ধুবান্ধব এবং যাদেরকে তিনি সন্তুষ্ট করেছেন তাদের হাতে।

আকস্মিক এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তনটি ঘটে যখন তাঁর পালক মা হালিমার আত্মীয়রা তার সাথে দেখা করতে আসেন, আর তার (হালিমা) বংশধররা এই হাওয়াজিন গোত্রেরই ছিল। প্রথমে আবু সুরাদ (Abu Surad) নামের এক ব্যক্তির নেতৃত্বে একদল আসেন, যিনি দাবি করেন তিনি মুহাম্মদের পালক চাচা ছিলেন। মুহাম্মদের পালক চাচা একটি প্রশংসাসূচক বক্তৃতা দেন যেখানে তিনি মুহাম্মদকে তার গোত্রের সাথে তার পালক সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, এবং সাথে সাথে সমগ্র হাওয়াজিন জাতির সাথে তার সম্পর্কও। লোকটি বলল, “আমি তোমাকে স্তন্যপান করাতে দেখেছি এবং আমি তোমার চেয়ে ভালো কাউকে দেখিনি; আমি তোমাকে দুধপান ছাড়াতে দেখেছি, আর আমি দুধপান ছাড়ার বয়সী কোনো শিশুকে তোমার চেয়ে ভালো দেখিনি। যখন আমি তোমাকে তরুণ দেখেছিলাম, আমি তোমার চেয়ে ভালো কোনো তরুণ দেখিনি। তোমার মধ্যে কল্যাণের সকল ভালো বৈশিষ্ট্য ছিল (১৫, ১৬)। আগন্তুক লোকটি বন্দিদের মধ্য হতে তার গোত্রের নারীদের তিনি চিহ্নিত করেছেন যাদের সাথে তার পালক মাতার সূত্রে মুহাম্মদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তারা হালিমার বংশধর, আর হালিমা অনেক আগেই মারা গেছেন। তিনি মুহাম্মদের কাছে অনুরোধ করেন এই সম্পর্ককে বিবেচনায় আনতে এবং তাদের মুক্তি দিয়ে তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে। তারা তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা ধর্মান্তরিত হবে। মুহাম্মদ এই চুক্তিতে রাজিও হয়েছিলেন, আর এর কারণটি ছিল তাঁর পালক বোন (দুধবোন) শায়মি (Shaymi)। শায়মি ছিলেন হালিমার আপন কন্যা। তিনি বন্দিদের মধ্যে ছিলেন। তাকে মুহাম্মদের সামনে আনা হয় এবং তার সাথে মুহাম্মদের বিশেষ সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। তার বয়স এখন সত্তর বছর, মুহাম্মদের চেয়ে দশ বছরের বড় এবং তাকে চেনাও যাচ্ছে না। কিন্তু শায়মি মুহাম্মদকে তার উপরের বাহুতে থাকা স্থায়ী একটা দাগ দেখালেন। শিশুকালে মুহাম্মদকে কোমরে (কোলে) বহন করার সময় মুহাম্মদ তার বাহুতে জোরে কামড় বসিয়েছিলেন, যার দাগ এখনো আছে।

মুহাম্মদ অবিলম্বে হালিমার গোত্র থেকে বন্দিদের মুক্ত করে দিলেন, কিন্তু যেহেতু তাদের ইতোমধ্যে বেদুইনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে তাই তিনি তার গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে তাদের ক্ষতিপূরণ দিলেন। **তিনি সকল হাওয়াজিন নারী ও শিশুদের মুক্ত করে গনিমতের বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুললেন। কারণ, ইতোমধ্যেই বিভিন্ন গোত্র তাঁর হয়ে যে যুদ্ধ করেছে সেজন্য তাদের সেবার জন্য বা তাদের ক্ষতিপূরণের অংশ হিসেবে এই বন্দিদেরকে তিনি দাসী হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন।** পরাজিত হাওয়াজিনদের প্রতিনিধিরা গণহারে (সবাই) ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রস্তাবে রাজি হলে তবেই মুহাম্মদ এতে সম্মত হন, এবং শুধুমাত্র তারপরই তাদের নারী ও সন্তানদের ফিরিয়ে দেয়া হবে বলে জানান। হাওয়াজিন গোত্রের লোকেরা চুক্তির শর্তাবলী মেনে নিয়ে একটি দলিলে স্বাক্ষর করল। তারপর মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের সকল গোত্র ও গোত্রনেতাদের একটি সভায় তার সাথে দেখা করতে আদেশ দেন এবং সেখানে তিনি তাদের অধীনে থাকা

নারী ও শিশুদের ফিরিয়ে দিতে আহ্বান জানান। দাস-দাসীদের উপর তাদের অধিকার ছিল, যেহেতু তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল। কিন্তু মুহাম্মদ আল্লাহর নামে বিশেষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি হাওয়াজিনদের কাছে তাদের ফিরিয়ে দেবেন। অনেক রাখডাক, গুড়গুড়ের পর, নারী এবং শিশুদের ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তারা পরিবারের সাথে পুনরায় একত্রিত হয়। এমনকি যাদেরকে মক্কাবাসী এবং মুহাম্মদের পরিবার ও বন্ধুদের দেয়া হয়েছিল, তাদেরকেও ফিরিয়ে দেয়া হয়। তাদের মধ্যে অনেকেই তখন গর্ভবতী ছিলেন।

তবে হাওয়াজিন লুণ্ঠনের জটিলতা এখানেই শেষ হয়নি। যখন অসংখ্য ইয়াছরিবী দলকে সন্তুষ্ট করার সময় এলো ততক্ষণে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। ইয়াছরিবের চার হাজার লোক ছিল এবং তারা রেগে গিয়েছিল, বিশেষ করে তরুণরা বেশি ক্রুদ্ধ ছিল। তবে তাদের যে বিষয়টি বেশি বিরক্ত করেছিল সেটি হলো মক্কার নেতাদের প্রতি মুহাম্মদের উদারতা। তারা কোন লড়াই করেনি, অথচ "যেখানে আমাদের তলোয়ার থেকে এখনও রক্ত ঝরছে!" (১৭)। খাজরাজ প্রধানদের একজন সাদ বিন উবাদা তার অসন্তোষের কথা জানাতে মুহাম্মদের কাছে আসেন। কূটনৈতিক ভাষায় তিনি কথা বলেন যাতে উমর তার তলোয়ারটিকে হাত তুলে না নেয়। তিনি বলেন যে, তিনি তাদের (হযরত গোত্রের লোকদের) এই দাবির সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন না। তারা মুহাম্মদকে বিশ্বস্ত ভেবে মক্কায় অনুসরণ করেছিল এবং হাওয়াজিন ও ছাকিফদের বিরুদ্ধে তার সাথে যোগ দিতেও দ্বিধা করেনি। সুতরাং তাদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্যই ছিল।

মুহাম্মদ বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি সকল আনসারদের তথা ইয়াছরিবী ধর্মান্তরিতদের তার সামনে জড়ো করলেন। মিটিংটা চলছিল বদ্ধ একটি ঘরে, এবং শুধুমাত্র ধর্মান্তরিত ইয়াছরিবী এবং মূল মক্কাবাসী ধার্মিক অভিবাসীদের সেখানে ঢুকতে দেয়া হলো। যখন তারা সবাই একত্রিত হল, মুহাম্মদ বিরক্তির স্বরে বলা শুরু করলেন। আনসারদের (ইয়াছরিবী ধর্মান্তরিত তথা সাহায্যকারী) স্বার্থপরতা ছিল এ সভার মূল আলোচনার বিষয়। মুহাম্মদ মনে করিয়ে দিলেন যে, তিনি তাদের জন্য কি না করেছেন! তিনি কি ইয়াছরিবে তাদের কাছে আসেননি যখন তারা আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতায় নিমজ্জিত ছিল? তিনি কি তাদের আল্লাহর দিকে পরিচালিত করেননি? তারা কি ভুলে গেছে যে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত, এবং তিনি তাদের একত্রিত করেছেন? তিনি কী আগের লুণ্ঠনের মাধ্যমে তাদের সমৃদ্ধি এনে দেননি? মক্কাবাসীদের প্রতি তাঁর উদারতার ব্যাপারে তাঁরা মুহাম্মদের উপর ক্ষুব্ধ হয়েছে সেটা ভাবতেই তিনি অবাক হয়ে মাথা নাড়ালেন। তারা কি রাসূলের হুকুমে প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি? **তিনি মক্কাবাসীদের প্রতি উদার ছিলেন, কারণ তাদের বিশ্বাস সদ্য অর্জিত হয়েছে। তারা কিছুদিন হলো ধর্মান্ধরিত হয়েছে, অর্থাৎ তাদের ঈমান এখনো দুর্বল। অন্যদিকে সাহায্যকারী আনসারদের বিশ্বাসের শিকড় এখন অনেক গভীরে প্রোথিত হয়েছে। মক্কাবাসীদের এই ধরনের প্রলোভন প্রয়োজন ছিল যতক্ষণ না তারা তাদের বিশ্বাসে আরো নিবেদিতপ্রাণ হয়ে ওঠে (১৮)।**

যখন মুহাম্মদ তাদের ভিতর অপরাধবোধ জাগানিয়া বক্তব্য শেষ করলেন, তখন তিনি প্রতিশ্রুতি এবং প্রশংসার বাক্যের দিকে মনোনিবেশ করলেন। তিনি তাদের জন্য বাহরাইন জয় করবেন, এবং এটি শুধুমাত্র তাদের জন্য (ইয়াছরিবী) থাকবে, মক্কাবাসীরা তা থেকে কিছুই পাবে না। যদি তাদের এই প্রস্তাবটি পছন্দ হয়, তাহলে তিনি তাদের সাথে এই ব্যাপারে একটা লিখিত চুক্তি করতে পারেন, যাতে তারা তাকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে পারে। তিনি তাদের অন্য যে কারোর চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন, এই মধুর স্তুতি তিনি তাদের বলেছিলেন। তিনি কিভাবে তাদের ভালো না বেসে থাকবেন? যখন মক্কাবাসীরা তাকে অবিশ্বাস করেছে, তখন ইয়াছরিবের লোকেরা তাঁকে বিশ্বাস করেছে। যখন তিনি একা ছিলেন, তাঁরা তাকে সাহায্য করেছে। যখন তিনি বিতাড়িত হয়েছেন তখন তারা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে; যখন তিনি বিপদে পড়তেন তখন তারা তাঁকে সান্ত্বনা দিত। আল্লাহর কসম, তারা ছাড়া তার আর কেউ ছিল না! মক্কাবাসীরা যদিও কিছু লুণ্ঠন পেয়েছে কিন্তু আল্লাহর ফেরেস্তা তার প্রিয় লোককে ইয়াছরিবের লোকদের কাছেই ফিরিয়ে এনেছে!

তারপর তিনি শুরু করলেন মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের কথা দিয়ে যেখানে সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, কিন্তু চূড়ান্ত বিচারের আগে, সাহায্যকারীরা মহান পুকুরের (হাউজে কাওসার) সামনে তার সাথে দেখা করবে যে হাউজের পানি পানি এত বিস্তৃত থাকবে যা সানা এবং ওমানের মধ্যকার দূরত্বের সমান হবে। তারা তাঁর সঙ্গীদের মধ্য থেকে প্রথম ও অগ্রগামী থাকবে। শেষ বিচারের দিনে তারা আল্লাহর সামনে সবার আগে যাবে এবং মুহাম্মদ তাদের পক্ষ হয়ে সুপারিশ করবেন। সাহায্যকারী আনসার, তাদের সন্তান, সন্তানের সন্তানরা সবাইকে আল্লাহ সদয় চোখে দেখবেন। তার বর্ণনা এত হৃদয়স্পর্শী ছিল যে, সেখানে থাকা সবাই কাঁদতে লাগল, কেঁদে কেঁদে তাদের দাড়ি ভিজিয়ে ফেলল (১৯)।

মুহাম্মদ ছিলেন বিজয়ী। সবাই তার কাছে মাথা নুইয়েছে। দু'মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি মক্কা জয় করেন এবং মক্কা আর তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা পাল্টে দেন। এভাবে পুরো হাওয়াজিন জাতিকেও তিনি ধর্মান্তরিত করে তার অধীনস্ত করেন। তিনি সেই অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা থেকে মুর্তিপূজার নাম-নিশানা মুছে দেন। ভয়ে যারা অন্যত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তারাও ধীরে ধীরে মুহাম্মদের কাছে আসতে লাগল, পূর্বের শত্রুতার জন্য তার কাছে ক্ষমা চেয়ে ধর্মান্তরিত হতে লাগল। তিনি এমনই প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন যে, তার কাছে যারাই আসত তাদের প্রতিই তিনি বেশ উদারতা দেখাতেন। তারা যদি কিছু চাইত, মুহাম্মদ তার এক-পঞ্চমাংশ ভাগ থেকে তাদের তা দিতেন। ইসলামিক ইতিহাস গ্রন্থে একজন বয়স্ক নারীর উদাহরণ পাওয়া যায় যিনি তাঁর কাছে এসে বলেন যে তিনি হালিমার বরের বোন, এবং তিনি তাকে এমন ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেন যার দ্বারা প্রমাণ করে যে তিনি সত্যি বলছেন। তিনি তার জন্য এক বাক্স পনির নিয়ে আসেন, তিনি হালিমার শেষ দিনগুলোর হৃদয়গ্রাহী কাহিনী বর্ণনা করেন এবং ধর্মান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি সরাসরি তার প্রতি বিশ্বাসের অঙ্গীকার করলেন। কিন্তু মুহাম্মদ নারীদের কাছ থেকে যেভাবে ধর্মের অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন - প্রথমে একটি বাটিতে তিনি হাত ডুবিয়ে দিতেন, তারপর তা নারীকে দেয়া হতো তাদের হাত ডুবিয়ে দিতে - সেভাবে এই নারীটিকেও তিনি ধর্মান্ধরিত করলেন। **চলে যাওয়ার আগে তিনি তাঁকে একটি বেদনাদায়ক গল্প বললেন যে, তার পরিবার কঠিন সময় মধ্যে দিন পার করছে এবং তার সাহায্যের প্রয়োজন।** এই নারী মুহাম্মদের মতোই গল্প বলায় এমন পটু ছিলেন যে, তার গল্প শুনে মুহাম্মদের চোখের পানি ঝরল। মুহাম্মদ শেষপর্যন্ত তাকে কাপড়ের একটি গোছা, একটি পালকি সহ উট এবং দুইশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন। চলে যাওয়ার সময় ঐ নারী বললেন, "তুমি শিশু হিসেবে সেরা পালিত শিশু ছিলে, এবং তুমি একজন প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে পুরুষদের মধ্যে সেরা, তুমি আমাদের সকলের জন্য আশীর্বাদ" (২০)।

মুহাম্মদ তায়েফে লুকিয়ে থাকা হাওয়াজিন নেতা মালিকের (Malik) কাছে কূটনীতিকভাবে বার্তা পাঠান যে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং ধর্মান্তরিত হলে তিনি তার পরিবারকে তার কাছে ফিরিয়ে দেবেন। এমনকি তিনি তাকে একশোটি উটও দান করবেন। মালিক এই প্রস্তাব গ্রহণ করে নিলেন, এবং এর বিনিময়ে মুহাম্মদ তাকে হাওয়াজিনদের নেতা বানিয়ে ছাকিফে গবাদিপশু লুণ্ঠন করতে পাঠান। হাওয়াজিন গণিমতের মালের অংশ বিতরণ করা শেষ হবার পর তিনি অনেক মানুষকে ক্ষমা করে দেন, এবং নেতৃত্বের পদ-পদবিগুলো ঠিক করার পর মুহাম্মদ ইয়াছরিব ফিরে আসার আগে মক্কায় একটি ছোট তীর্থযাত্রা করেন। তবে তীর্থযাত্রায় যাওয়ার আগে তিনি আরেকবার মৃগীরোগে আক্রান্ত হন। সম্ভবত আক্রান্ত হয়েছিলেন প্রকাশ্যেই, কারণ উমর এবং অন্যরা তার উপর তখন একটি কম্বল ধরে ছিলেন, যাতে তাকে সূর্যের আলো থেকে রক্ষা করা যায় (২১)। খিঁচুনি থেকে ভালো হবার পর তিনি তীর্থযাত্রায় সমগ্র সেনাদলকে নেতৃত্ব দেন। তীর্থযাত্রা সম্পন্ন হলে বেদুইনরা তাদের উপজাতীয় অঞ্চলে ফিরে গেল। শুধু তিনি, আউস এবং খাজরাজরা ইয়াছরিবে ফিরে এলেন, আর মক্কার দায়িত্ব তিনি ধর্মপ্রচারক ও প্রশাসকদের হাতে ছেড়ে গেলেন।

হাওয়াজিন দখলের এক বছরের মধ্যে পার্বত্য শহর তায়েফ মুহাম্মদের ধর্মের ক্রমবর্ধমান সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো হয়ে গিয়েছিল। তাদের প্রাক্তন হাওয়াজিন বন্ধু এবং মিত্রদের দ্বারা ক্রমাগত আক্রমণের কারণে তাদের আর মুহাম্মদের ধর্মগ্রহণ না করে বেঁচে থাকার আর কোন উপায় থাকল না। দশ বছর আগে মুহাম্মদকে শহর থেকে বের করে দেয়া তায়েফ শেখের ছেলে উরওয়া ইবনে মাসুদ এখন তায়েফের একজন প্রভাবশালী নেতা। তিনি ছিলেন

মক্কাবাসীদের পক্ষে হুদাইবিয়াতে মুহাম্মদের সাথে কথা বলার জন্য পাঠানো ব্যক্তিদের মধ্যে একজন যাকে মক্কাবাসীরা বিশ্বাস করতেন, কারণ তার মা মক্কার ছিলেন এবং তিনি আবু সুফিয়ানের আত্মীয় ছিলেন। তিনিই তায়েফে প্রথম স্বীকার করেন যে, মুহাম্মদের আধিপত্য অনিবার্য এবং অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছে। তিনি বিশ্বাসের ঘোষণা দিতে ইয়াছরিবে যান, তারপর তায়েফে ফিরে আসেন, কিন্তু তিনি তার ধর্মান্তরের কথা প্রকাশ্যে বলার আগেই একজন ক্ষুব্ধ শহরবাসী তার বুকে তীর ছুঁড়ে তাকে হত্যা করে। তার মৃত্যুর ফলে তায়েফের পরিস্থিতি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং এ নিয়ে শহরব্যাপী বিতর্কের সৃষ্টি হয়; এবং শেষপর্যন্ত তাদের বিকল্প অনুসন্ধানের জন্য মুহাম্মদের কাছে তারা একটি প্রতিনিধি দল পাঠায়। তারা বিভিন্ন বিকল্প অপশন জানতে চান। প্রতিনিধিরা মুহাম্মদের কাছে জানতে চান যে, যদি তারা ধর্মান্তরিত হন তাহলে তাদের প্রিয় আল-লাতকে তিন বছরের জন্য রাখার অনুমতি দেয়া হবে কী না, কিন্তু মুহাম্মদ তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, আল-লাতের অভয়ারণ্য, তার মন্দির এবং ছাকিফদের সকল ব্যক্তিগত মূর্তি ধ্বংস করতে হবে। নিরুপায় হয়ে প্রতিনিধিরা তায়েফে ফিরে আসেন এবং শহরবাসীদের ধর্মান্তরের জন্য আহবান জানান। যদি তারা তা না করে, তাহলে মুহাম্মদ অবশ্যই ফিরে এসে হাওয়াজিনদের আরো অনেক শহরের মতোই তায়েফবাসীকেও তার অধীনে নিয়ে নিবেন। পরিশেষে, জনগণ ভীত হলেন ভবিষ্যৎ ভেবে এবং মুহাম্মদকে স্বীকার করে ধর্মান্তরিত হতে সম্মত হলেন। গ্রন্থে পাওয়া যায় তারা ধর্মকে **"ভয়ের বদলে নিরাপত্তা হিসেবেই বেছে নিয়েছে"** (২২)।

ইয়াছরিব ছাড়ার আগে প্রতিনিধি দল মুহাম্মদকে পরামর্শ দেন যে, তায়েফের জনগণ তাদের নিজেদের হাতে আল-লাতের মন্দির ধ্বংস করবে না। আর তাই মুহাম্মদ উরওয়া ইবনে মাসুদের ভাগ্নে মুগিরা ইবনে শুবাকে পাঠালেন মূর্তি ধ্বংস করার জন্য। সম্ভবত মুহাম্মদ মুগিরাকে বেছে নিয়েছেন এজন্য যে, তায়েফবাসী তাকে দশ বছর আগে এই শহর থেকে বিতাড়িত করেছিলেন, সুতরাং এটিই ছিল তাদের প্রতি তার ঘৃণা দেখানোর উপযুক্ত সময়। মুগিরা তার তেরোজন গোত্রীয় সদস্যকে হত্যা করা এবং তাদের পণ্য চুরির অভিযোগে তায়েফের জনগণের চোখে পলাতক এবং দুর্বৃত্ত বলে পরিচিত ছিলেন। তারা যুগের পর যুগ যে লাতকে এত মমতা দিয়ে লালন পালন করে আসছে, তা ধ্বংস করার জন্য এরচেয়ে যোগ্য লোক আর কে হতে পারে? আবু সুফিয়ানের সাথে তায়েফের পারিবারিক সম্পর্কের কারণে তাকেও তায়েফে পাঠানো হয়, কিন্তু তার জীবনের ভয় আছে ভেবে মুগিরার সাথে তিনি তায়েফে রওনা দেন ঠিকই, কিন্তু আবু সুফিয়ান শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছলেই তিনি মুগিরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান।

মুগিরা দশজন ভারি সশস্ত্র লোক নিয়ে প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকে মন্দির দখল করে নেন। কেউ তাকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস দেখায়নি। সাদা পাথরে খোদাই করা আল-লাতের মূর্তিটি মন্দিরের ভেতরে পর্দার পেছনে ছিল (২৩)। কুঠার ও হাতুড়ি ব্যবহার করে মুগিরা ও তার লোকেরা মূর্তিটি টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলে, তারপর মন্দিরটি সমতল করে ফেলে। তারা সব সোনা, রূপা, সুগন্ধি, কাপড়চোপড় সহ যা মূল্যবান মনে করেছে তাই দখলে নিয়ে নেয়। শহরবাসীরা মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উর্বরতার দেবী তাদের পাহাড়ি শহরে রাজত্ব করে আসছে, আজ তাদের চোখের সামনে 'তায়েফের নারী' বলে পরিচিত এই দেবী ধ্বংসস্তুপে পরিণত হচ্ছে! অবশেষে ধ্বংসাবশেষের উপর একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয় (২৪)।

অধ্যায় - ৩২

Ménage à Quatorze

(চৌদ্দ সতীনের ঘর)

আনুষ্ঠানিকভাবে, মুহাম্মদের তেরোজন স্ত্রী এবং একজন যৌনসঙ্গী ছিলেন। তার পঁচিশ বছর বয়সী ধনী স্ত্রী খাদিজা থেকে শুরু করেন। মক্কা থেকে মুহাম্মদের পালিয়ে যাওয়ার তিন বছর আগে খাদিজা মারা যান। খাদিজার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে তার সন্তানদের তত্ত্বাবধান করার জন্য বিয়ে করেন সাওদাকে। ইয়াছরিবে আসার পরপরই আবু বকরের নয় বছর বয়সী মেয়ে আয়েশাকে বিয়ে করেন। উমরের বিধবা মেয়ে হাফসাকে বিয়ে করেন তারপরেই যখন তিনি কুড়ি বছর বয়সী তরুণী। তারপর বিয়ে করেন জয়নাব বিনতে খুজাইমাকে, যিনি বিয়ের আট মাস পরেই মারা যান। তারপর বিয়ে করেন উম্মে সালামাকে, যিনি একজন প্রথমদিকের ধর্মান্তরিত ছিলেন এবং মুহাম্মদের প্রথম চাচাতো ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী ছিলেন। তারপর জাহাশের কন্যা জয়নাবকে, যিনি মুহাম্মদের মামাতো বোন ছিলেন, যিনি মুহাম্মদের দত্তক পুত্র জায়েদের স্ত্রী ছিলেন। মুস্তালিক গোত্র জয় করার পর বেদুইন রাজকুমারী জুয়াইরিয়াকে গনিমতের মাল হিসেবে পান এবং তাকেও স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। এরপর বিয়ে করেন মুহাম্মদের প্রথম সারির মক্কাবাসী শত্রু আবু সুফিয়ানের কন্যা রামলাহকে। বানু কুরাইযার ইহুদিদের গণহত্যার পর এক ইহুদি নারী রায়হানাকে আটক করা হয়, তাকেও তিনি বিয়ে করেন। খাইবার বিজয়ের সময় সতেরো বছর বয়সী ইহুদি মেয়ে সাফিয়াকে গণিমতের মাল হিসেবে গ্রহণ করা হয় (সাফিয়াকেও বিয়ে করেন বলে কথিত আছে)। মারিয়া কিবতিয়া যাকে মিশরের শাসক ক্রীতদাসী হিসেবে পাঠান, সাথে পাঠান তার বোন, একটি খচ্চর এবং একজন খোজা দাসকে। মুহাম্মদ তারপর বিয়ে করেন জয়নাব বিনতে খুজায়ামার সৎ বোন ছত্রিশ বয়সী বছরের মায়মুনাকে।

প্রাথমিক ইতিহাস এবং জীবনীতে মুহাম্মদের এই সকল প্রতিষ্ঠিত স্ত্রীর সাথে মুহাম্মদের সম্পৃক্ততার বা সম্পর্কের দিকে ব্যাপকভাবে মনোযোগ দেয়া হয়েছে। যাইহোক, সেই সকল গ্রন্থসমূহ একটু গভীর অনুসন্ধান করলে আরো বেশকিছু নারীর অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। মুহাম্মদ ইয়াছরিবে থাকাকালীন সময়ে আরও অনেক নারী গ্রহণ করেন বা গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন, বিশেষ করে তার মৃত্যুর কয়েক বছর আগে - অন্তত আরও কুড়িজন, বা তারও বেশি হবে সংখ্যাটি। তিনি যৌতুক হিসেবে সোনার প্রস্তাব দিতেন, অথবা ছিল প্রলোভন যে মানুষটি আল্লাহর সাথে কথা বলে এমন একজন মানুষের সাথে বিয়ে বসলে তারা খ্যাতি পাবেন, তা তিনি মনে করিয়ে দিতেন এবং তাকে বিয়ে করার ফলে তাদের নিশ্চিত জান্নাতে একটি স্থান বরাদ্দ থাকবে। কিন্তু তা সত্ত্বে অনেক সম্পর্কের বেলায় এই লোভ-লালসার কোনটিই কাজ করেনি। কিছু সংক্ষিপ্ত বিবাহ ছিল যা দ্বন্দ্ব বা অসন্তোষের কারণে বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়। কিছু বিয়ে তার নামে অন্য কারোর দ্বারা দূর থেকে সংঘটিত হয়, সেগুলোও বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে শেষ হয় যখন শেষপর্যন্ত নববধূকে মুহাম্মদ দেখেন বা মুহাম্মদকে তারা (বধূরা) দেখেন। প্রায় সময়ই, প্রতিষ্ঠিত স্ত্রীরা নবাগতা বা উদীয়মান স্ত্রীদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতেন এবং সম্পর্ক ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্র করতেন। বেশ কয়েকজন নারী তার জন্য অস্বস্তিকর ছিল, কারণ তিনি তাদেরকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তারা স্পষ্টভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তার একের পর এক নারীর প্রতি টানকে বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে যদি না আপনি তার এই আচরণকে আরেকটি বাধ্যবাধকতা বা ঐশ্বরিক বলে মনে না করেন। ঠিক যেভাবে তিনি দিনরাত ক্লান্তিকর প্রার্থনায়/নামাজে ডুবে থাকতেন, ঠিক একইভাবে তার প্রতিটি গভীর মানসিক সমস্যার জন্য একটি বহমান সমাধান খুঁজে পেতে চাইতেন। আমরা আরো কিছু সম্পর্কের কথা পাই, যেমন : সুরিয়ার কন্যা ফাতিমা, আসমার কন্যা সাবা এবং ফেরেস্তা জিব্রাইলের মতো দেখতে দিহইয়ার বোন শারাফ এবং কিলাব গোত্রের জায়েদের কন্যা আমরা, যিনি ইতিপূর্বে আব্বাসের পুত্র মুহাম্মদের চাচাত ভাই ফাদলকে (বা ফজল) বিয়ে করেছিলেন। আমরা জানতে পারি আরো দুটো প্রক্সি বিয়ের কথা, যেই নারীদ্বয় তার কাছে ইয়াছরিবে যোগ দিতে আসার পথেই মারা যায়। সিরিয়ার একজন বিখ্যাত গোত্রপ্রধান হুদায়েলের মেয়ে খাওলা, এবং সানা (Sana) যিনি ইয়েমেনি নারী ছিলেন এবং তিনি নাশাত (Nashat) নামেও পরিচিত ছিলেন। এই নারী এবং আরও অনেকেই শুধুমাত্র নামই

ছিল না, ছিল তার আরো অনেক কিছু। ইয়াজিদের কন্যা আমরা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে, যা এমন : যখন আমরাকে মুহাম্মদের কাছে আনা হয় এবং তিনি যখন তার কাপড় খোলেন তখন দেখেন যে তার কুষ্ঠরোগ রয়েছে, সুতরাং তাকে তার গোত্রের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়। আরো জানা যায় আমরের মেয়ে দুবা সম্পর্কে, যিনি সৌন্দর্য আর 'রুপালি' চুলের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। মুহাম্মদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য তারা আগ্রহী ছিল এবং তাঁর গোত্র এই রমণীর সৌন্দর্য দিয়ে তাকে বাগদানে প্রলুব্ধও করে। কিন্তু মুহাম্মদ যখন জানতে পারেন যে সে আসলে বুড়ি, তার চেহারাও ফিকে হয়ে গেছে, তখন তিনি আর তাকে বিয়ে করেননি। আরো কিছু সম্ভাবনাময় নারীর সঙ্গী হবার সম্ভাবনা বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত স্ত্রীরা নস্যাৎ করে দেয়; যেমনটা তারা কিন্দাহ গোত্রের এক নেতৃস্থানীয় শেখের কন্যা আসমার সাথে করেছে। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর সেই শেখ মুহাম্মদের সাথে তার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেন, তাকে আরব বিধবাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী রমণী বলে অভিহিত করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে তার বর সম্প্রতি মারা গেছেন এবং এখন তার হৃদয় মুহাম্মদের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। মুহাম্মদ আসমার বাবাকে আসমাকে বিয়ে করার যৌতুক বা দেনমোহর হিসেবে বারোটি স্বর্ণমুদ্রা দেয়ার প্রস্তাব করলেন, কিন্তু লোকটি আরো চাইতে থাকলেন। মসজিদে পৌঁছানোর আগেই এই নারীর সৌন্দর্যের খবর মুহাম্মদের অন্য স্ত্রীদের কাছে পৌঁছায়। তাকে (বিয়ে করে) মুহাম্মদের স্ত্রীদের বাসগৃহে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে আয়েশা ও হাফসা থাকতেন। আয়েশা ও হাফসা তাদের অন্তরে অশান্তি রেখেও তারা মুহাম্মদের জন্য বিছানা প্রস্তুত করেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন আসমাকে বললেন, "নবী মেয়েদের কাছ থেকে এই কথাটি পছন্দ করেন যে, আমি আপনার কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইছি" - এভাবেই তারা তাকে শিখিয়ে দিলেন। যখন মুহাম্মদ আসমার ঘরে ঢুকলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিয়ে পর্দা নামিয়ে তাঁর কাছে গেলেন, তখন তার নতুন স্ত্রী তাকে সেই শেখানো কথাটগুলো বললেন : "আমি আপনার নিকট হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইছি"। মনে অনেক আশা নিয়ে তার কাছে আসা মুহাম্মদ তার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে পিছু হটলেন। এটা একটা ফর্মুলা ছিল যা তিনি নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন, এবং এর মানে হচ্ছে সে চাইছে না যে মুহাম্মদ তাকে স্পর্শ করুক। মুহাম্মদ এ কথা শুনে গভীরভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এই অসহায় নারীকে তালাক দিলেন এবং তাকে তার গোত্রের কাছে ফেরত পাঠালেন, যদিও আসমা আসলে তার অন্য স্ত্রীদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন (১)।

একই ধরনের ছলনার মাধ্যমে আয়েশা মুলায়কা নামের এক তরুণীকে তার সংসারের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সরিয়ে দেন। তিনি একজন বেদুইন নেতার কন্যা ছিলেন। যেদিন মুহাম্মদ মক্কা জয় করেন সেদিন খালিদ বাহিনীর সাথে যুদ্ধে সেই নেতা নিহত হন। মুহাম্মদ মুলায়কার যৌবন ও সৌন্দর্যের বিবরণ জেনে উত্তেজিত হন এবং দূর থেকে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। **এই নারীও মসজিদের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যেত, কিন্তু সে যখন ইয়াছরিবে পৌঁছে, তখন আয়েশা তাকে বলেন, "তোমার কি কোন লজ্জা নেই, যে তোমার বাবাকে খুন করেছে তুমি তাকে বিয়ে করছো?"** এই তিরস্কারে বিধ্বস্ত মুলায়কা শেষপর্যন্ত আসমার মতো মুহাম্মদের সামনে একই কথা উচ্চারণ করে বলেন : "আমি আল্লাহর নিকট আপনার কাছ থেকে আশ্রয় চেয়েছি।" তাকেও তল্পিতল্পা সহকারে তার গোত্রে পাঠিয়ে দেয়া হয় (২)।

তার স্ত্রীরা আরও কয়েকজন নারীর সাথে একই কাজ করেছে। গিফারি (Ghifari) গোত্রের শানবা (Shanba) নামের এক নারীকে মুহাম্মদের সাথে শুতে যাবার আগে তিনি যে গর্ভবতী না তা প্রমাণ করতে মাসিক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এই অপেক্ষার সময়ে মারিয়া কিবতিয়া যে সন্তানের জন্ম দেন সে মারা যায়। খাদিজার সাথে তার সন্তানদের পর, এটিই ছিল মুহাম্মদের একমাত্র সন্তান। শানবাকে বলতে শোনা যায়, **"তিনি যদি নবী হতেন, তাহলে তাঁর ছেলে মারা যেত না।"** মুহাম্মদের আরেক প্রতিষ্ঠিত স্ত্রী এই কথা শুনে মুহাম্মদের কাছে তা বলে দেয় এবং মুহাম্মদ ক্ষুব্ধ হয়ে তাকেও তালাক দেন (৩)। আরেক স্ত্রীর দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারার অভ্যাস ছিল, যেখান থেকে মসজিদে ঢুকতে বা বের হওয়ার সময় যুবকদের দেখা যেত। এটা অজানা যে, তিনি এবং মুহাম্মদ কতদিন বিবাহিত ছিলেন, তবে তার নিজের একটি কক্ষ যেহেতু ছিল তাই বলা যায় বেশ অনেকদিন হবে হয়তো। যখন মুহাম্মদ তার এই আচরণ সম্পর্কে জানতে পারলেন, তিনি তার উপর গুপ্তচরবৃত্তি করতে একজনকে নিযুক্ত করলেন এবং তাকে যখন এই কাজে হাতেনাতে ধরা হলো, তখনই তাকে তালাক

দেয়া হলো (৪)। মুহাম্মদের নিজের নারী-লোলুপতার খ্যাতিও আরেকজন নারীকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আমরা লায়লার (Layla) কথা জানতে পারি, যিনি একজন খাজরাজী নারী ছিলেন। একদিন মসজিদের পেছনে এসে তিনি মুহাম্মদকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে চমকে দেন। যখন মুহাম্মদ ঘুরে দাঁড়ালেন তখন লায়লা বললেন, "আমি আল খাতিমের (Al Khatim) কন্যা লায়লা, যে পাখিদের খাওয়ায় এবং এখানে বাতাস দেয়। আমি আপনার কাছে এসেছি নিজেকে উপস্থাপন করতে। আপনি কি আমাকে বিয়ে করবেন?" মুহাম্মদ যা দেখেছেন তা পছন্দ করলেন এবং বললেন, "মনে কর এই প্রস্তাব কবুল হয়ে গেছে!" লায়লা যখন তার লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে বিয়ের কথা ঘোষণা করলেন তখন তার আত্মীয়রা বলল, "তুমি খুবই খারাপ কাজ করেছ! তুমি একজন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন নারী, কিন্তু তিনি একজন নারী-লোভী। তার সাথে এই প্রস্তাব বাতিল করার চেষ্টা কর"। তিনি মুহাম্মদের কাছে ফিরে গেলেন, এই প্রস্তাব বাতিলের অনুরোধ জানালেন, এবং মুহাম্মদ তা মেনে নিলেন (৫, ৬)।

মুহাম্মদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণেও বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে। জীবনের শেষ কয়েক বছরে তিনি অনেক বেশি মোটা হয়ে গিয়েছিলেন। তার মুখ মাংসল হয়ে যায়; তিনি হাঁটার সময় অস্বাভাবিকভাবে চওড়া পায়ের ছাপ রেখে যেতেন; যখন পা ভেঙে বসতেন তখন মনে হতো যে তিনি আর কখনো কারো সাহায্য ছাড়া উঠতে পারবেন না। তিনি তার দাড়িতে মেহেদি প্রয়োগ করতেন যাতে দাড়ি সাদাকালো রং থেকে গাঢ় কমলা রং ধারণ করত। যারা তাকে প্রথম দেখেছে তারা মাঝেমাঝেই মন্তব্য করত, "ইনিই কি তোমাদের নবী?" (৭) তার বিষয়ে শুধুমাত্র একটি জিনিস প্রযোজ্য ছিল যে, তিনি যা চাইতেন তা যেভাবেই হোক পেতেন এবং তার দাবি যে তিনি আল্লাহর সাথে তিনি কথা বলেন, তা সত্ত্বেও কিছু নারীকে তা মুগ্ধ করেনি। যখন একটি শক্তিশালী ইয়েমেনি গোত্রপ্রধান আনুগত্যের শপথ নিতে তার কাছে আসেন, তখন তিনি তার মেয়ে উমাইয়াকে তার সাথে বিয়ে দিতে নিয়ে আসেন। মুহাম্মদের বাগানে তার সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিভিন্ন সংস্করণে এই ঘটনাটি পাওয়া যায়, কিন্তু সব মিলিয়ে একই কথা দেখতে পাওয়া যায় যে, নারীটি তাকে ঘৃণ্য মনে করেছে। তিনি বলেন - "একজন রাজকুমারী কি একজন সাধারণ মানুষকে বিয়ে করতে পারে?" যখন মুহাম্মদ তাকে স্পর্শ করতে হাত বাড়িয়ে দিলেন তখন সেই নারী তার হাত দূরে রাখতে বললেন এবং তার বিরুদ্ধে আল্লাহর সুরক্ষার জন্য আবেদন করলেন। মুহাম্মদ রেগে গেলেন এবং শুধু তখনই মুহাম্মদ শান্ত হলেন যখন ঐ নারীর বাবার এক ভাগ্নে তাকে বললেন যে, **"আপনি এই ব্যাপারটি নিয়ে বিরক্ত হবেন না। আপনি আল্লাহর রাসূল। আপনার জন্য আমার কাছে আরও সুন্দরী রমণী আছে"। তিনি মুহাম্মদকে তার বোন কাতিলাকে (Qatila) বিয়ে করার ব্যবস্থা করেছিলেন।** তিনি হয়তো শেষ সম্ভাব্য স্ত্রীই হয়েছিলেন, যখন তিনি ইয়াছরিবের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে ছিলেন, পৌঁছুনোর আগেই মুহাম্মদ মারা যান (৮)

মুহাম্মদ সম্ভবত যে প্রত্যাখ্যানে সবচাইতে বেশি গভীরভাবে আঘাত পান তা হলো তার প্রথম প্রেম আবু তালিবের একটি কন্যা উম্মে হানির প্রেম-প্রত্যাখ্যান থেকেই। তারা দুজন আবু তালিবের বাড়িতে একই ছাদের নিচে একসাথে বেড়ে উঠেছিলেন। মুহাম্মদ একদিন তার চাচার কাছে তারই মেয়ে উম্মে হানির পাণি প্রার্থনা করলেন, কিন্তু চাচা মুহাম্মদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার পরিবর্তে হুবায়রা (Hubayra) নামের মক্কার একজন অভিজাত ব্যক্তির কাছে উম্মে হানীকে বিয়ে দেন। উম্মে হানি বা হুবায়রা কেউই মুহাম্মদ তার নিজের সম্পর্কে যা বলতেন সেই দাবিকে বিশ্বাস করতেন না, বিশেষ করে উম্মে হানি যিনি মুহাম্মদকে প্রথম জীবন থেকেই জানতেন। উম্মে হানি মুহাম্মদকে অন্যদের চেয়েও ভালো জানতেন বা চিনতেন, কারণ কোন একটি রাতে উম্মে হানির বাড়ি থেকেই মুহাম্মদকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার (ইসরা বা মেরাজ) যে বিভ্রম সেটি যে মুহাম্মদের অসুস্থতারই ফল সেটি হয়তো তিনি জানতেন। উম্মে হানি তাকে এই বিষয়ে (ইসরা বা মেরাজ) কথা বলা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদ তা শোনেননি। উম্মে হানির বর ছিলেন একজন কবি, এবং মক্কা বিজয়ের দিন পর্যন্ত তিনি মুহাম্মদের রচিত আয়াত নিয়ে ঠাট্টা করা বন্ধ করেননি। মক্কা বিজয়ের পর উম্মে হানি নিজের মৃত্যুদণ্ড এড়াতে বাকি মক্কাবাসীদের সাথে মুহাম্মদের ধর্মে যোগ দেন, অন্যদিকে হুবায়রা তার জীবন নিয়ে নাজরানে পালিয়ে যান যেখানে তিনি একজন অবিশ্বাসী হয়েই মারা যান। মুহাম্মদের নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ধর্মান্তরিত হলে (ইসলাম গ্রহণ

করলে) পূর্ববর্তী বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে যদি আগের বর অবিশ্বাসীই থেকে যায়। **উম্মে হানির ধর্মান্তরিত হওয়া মুহাম্মদের জন্য এবার একটি সুযোগ তৈরি করে দেয়। মুহাম্মদ তাকে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়ে দিলেন!** কিন্তু উম্মে হানি তাকে খোঁড়া অজুহাত দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যেমন : তিনি বললেন যে, তার ছোট ছোট বাচ্চা আছে, সুতরাং তিনি চাইছেন না তারা মুহাম্মদক বিরক্ত করুক। বেশ কয়েক বছর আগে জায়েদের প্রাক্তন স্ত্রীর সাথে মুহাম্মদের বিয়ের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য মুহাম্মদের রচিত একটি আয়াতের কথা উম্মে হানি মুহাম্মদকে মনে করিয়ে দিলেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, একমাত্র মক্কার সেই সব নারীকেই বিয়ে করার অনুমতি মুহাম্মদকে দেয়া হয়েছে যারা তার সাথে হিজরত করেছিল (৯)। **"সুতরাং আমি তাঁর সাথে হিজরত করিনি বলে তাঁর (বিয়ের) জন্য অবৈধ হয়ে গেলাম। আমি তাদের একজন ছিলাম যারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইসলাম গ্রহণ করেছিল" উম্মে হানি পরবর্তীকালে একথা একজনকে বলেছিলেন** (১০)।

শেষমেশ মুহাম্মদের হারেমে মাত্র তেরোজন নারী ছিলেন! তাদের মধ্যে তিনজন তার আগেই মারা গেছে - খাদিজা, জয়নাব বিনতে খুজাইমা এবং রায়হানা। ফলে, মুহাম্মদ তার পরবর্তী বছরগুলোতে মাত্র দশজন নারীর সাথে সহবাস করতেন! তিনি তাদের কাছে পালা করে যেতেন, শহরে থাকাকালীন সময় প্রত্যেকের সাথে একেক রাত কাটাতেন আর যুদ্ধের সফরে থাকাকালীন তাদের মধ্যে থেকে একজন বা দু'জন নারীকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। যদিও মুহাম্মদের একটু প্রতিষ্ঠিত স্ত্রীদের মধ্যে মনোমালিন্য হতো এবং মাঝে মাঝে তীব্র উত্তেজনাও তৈরি হতো। তবে তার বেশিরভাগ স্ত্রী এই বাস্তবতা নিয়ে খুব বেশি ঝামেলা করেনি, কেবলমাত্র একজন ছাড়া। এই কারণ হয়তো এই যে, তারা মুহাম্মদের স্ত্রীর 'মর্যাদা' থেকে উপকৃত হতেন এবং তাদের ডাকা হতো "বিশ্বাসীদের মা" এবং "পবিত্রতার প্রতীক"। এই উপাধিগুলো তাঁরা বেশ উপভোগ করতেন। যদিও তারা মাঝে মাঝে তাকে কৃপণতার অভিযোগে মুহাম্মদকে অভিযুক্ত করতেন, তবে মুহাম্মদ ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য সরবরাহকারী। তিনি সবসময় নিশ্চিত করতেন যে, তার স্ত্রীদের যা প্রয়োজন তা যেন তাদের থাকে, যেমন : খাদ্য, পোশাক, ব্যয়ের জন্য অর্থ। আর এ সবই যুদ্ধের গনিমতের মালের অংশ থেকে তাদের প্রদান করা হতো।

খাইবার ও ফাদাক বিজয়ের পর এবং ইহুদি খেজুর বাগান ও ফসলের ক্ষেত দখলের পর মুহাম্মদ তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্ত্রীদের প্রত্যেককে আশি উট করে খেজুর ও কুড়িটি যব বোঝাই উট প্রদান করেন। তাঁর দুজন ইহুদি স্ত্রী যারা তাদের প্রিয়জনদের গণ-হত্যাকাণ্ডে মর্মাহত হয়েছিলেন, তারা বাদেও মুহাম্মদের একমাত্র স্ত্রী যিনি মুহাম্মদের কাছ থেকে গভীর মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন বলে মনে হয়েছে তিনি ছিলেন আয়েশা, যাকে তিনি শিশু বয়সে বিয়ে করেছিলেন। আয়েশা তাঁর বিবাহিত জীবন জুড়েই মুহাম্মদের সামনে আসা নতুন কোন নারীর সাথে তার স্নেহের ভাগ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নিয়ে তীব্র ঈর্ষায় লিপ্ত হতেন, যা মুহাম্মদকে মসজিদে অবস্থানকালে ক্ষুব্ধ এবং অস্থির করে তুলত। ইসলামী গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, মুহাম্মদ যখন তার রুমে থাকতেন মাঝে মাঝে ঘরের ভিতর থেকে খাবারের থালাবাসন ভাঙ্গার শব্দ আসতো, এবং তিনি অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে ঝগড়া এবং জোরে জোরে তর্ক-বিতর্কও করতেন (১১)।

মুহাম্মদের সাথে আয়েশার সম্পর্ক মানসিকভাবে জটিল ছিল। বয়সে খুব ছোট হিসেবে তার ভালোবাসার প্রয়োজন ছিল। **আয়েশা আবেগপ্রবণ ছিলেন, তবুও মুহাম্মদের কাছে তিনি তার অন্যান্য স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন মূলত তার বয়সের কারণেই। তিনি নয় বছর বয়সে প্রথমবারের মতো তার সাথে যৌনমিলন করেন। আয়েশা পরে বলেছিলেন যে, প্রথমবার যখন মুহাম্মদ তার সাথে সঙ্গম করেন তখন তিনি বুঝতে পারেননি তার সাথে কী ঘটছে!** সে সময় যখন তাকে ঘরে তোলা হয়, তখন তার ঘরে আরেক স্ত্রী ছিলেন সাওদা। তবে তিনি আয়েশার কাছে মুহাম্মদের ভালোবাসার প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়েও তার কাছে তিনি ছিলেন মায়ের মতো। আয়েশাকে বিয়ে করার দুই বছর পর মুহাম্মদ উমরের মেয়ে হাফসাকে বিয়ে করেন, এবং এরপরই শুরু হয় মুহাম্মদের আরো স্ত্রী সংগ্রহের কাজ। মুহাম্মদের সাথে বিয়ের সময় হাফসার বয়স ছিল কুড়ি বছর। আয়েশাকে ঈর্ষার প্রথম ছুরি আঘাত করতে থাকে যখন তার চেয়ে হাফসার দিকে মুহাম্মদ বেশি নজর দিতে থাকেন। এই অনুভূতি এতই গুরুতর হয়ে ওঠে যে, একবার শোনা যায় তিনি তার মৃত্যু কামনা করছেন। ঘটনাটি ঘটে যখন মুহাম্মদ তাদের দুজনকেই একটি অভিযানে নিয়ে যান। পথিমধ্যে হাফসা তার উটকে মুহাম্মদের পাশে নিয়ে গেলেন এবং তারা গল্পে

এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, আয়েশা পেছনে পরে রইলেন। এই উপেক্ষা আয়েশাকে এতই যন্ত্রণা দিয়েছিল যে, যখন তারা বিশ্রাম করার জন্য থামলেন তখন আয়েশা খালি পায়ে ঘাসের উপর হেঁটে বেড়ালেন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন তাকে যেন সাপ বা বিচ্ছু কিছু একটা কামড়ে দেয়, যাতে তার দুর্দশার অবসান হয় (১২)।

জেনেশুনে বা অজ্ঞাতসারে, মুহাম্মদ প্রায়ই তার প্রথম স্ত্রীর প্রশংসা করতেন যার ফলে আয়েশা ঈর্ষান্বিত হতেন। যখনই তিনি কোন পশু জবাই করতেন তখন খাদিজার স্মৃতির প্রশংসা করতেন এবং তার বোন হালা (Hala) এবং তার ঘনিষ্ঠ অন্যান্য নারীদের পছন্দের মাংস কেটে পাঠাতেন। খাদিজা ছিলেন তার জীবনের সেরা স্ত্রী, মুহাম্মদ প্রায়ই এই কথা আয়েশাকে বলতেন। খাদিজা তাকে বিশ্বাস করতেন যখন অন্য কেউ তাকে বিশ্বাস করেনি এবং তিনিই প্রথম তার ধর্মকে আলিঙ্গন করেন। তিনি এত ভালো স্ত্রী ছিলেন যে আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি মারা যাওয়ার আগে তাকে জানিয়ে দিতে যে, তার জন্য মূল্যবান পাথর ও মুক্তো দিয়ে তৈরি জান্নাতের প্রাসাদ বরাদ্দ আছে। আয়েশা পাল্টা জবাবে বলতেন যে, খাদিজা ছিল বাচাল, বৃদ্ধা যার দাঁতের বদলে ফোলা মাড়ি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। নিজের কথা উল্লেখ করে তিনি মুহাম্মদকে বলেন, "আল্লাহ আপনাকে তারচেয়ে ভালো কাউকে দিয়েছেন" (১৩)।

যা আয়েশার বেদনাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে তা হচ্ছে, মুহাম্মদ তার অনুভূতির প্রতি এতটা উদাসীন হয়েছেন যতটা আগে ছিলেন না। তিনি ক্রমাগত আয়েশার হৃদয় ভেঙে দিচ্ছেন যখন তার সাথে বিছানায় শুয়ে থেকে আনন্দের সাথে তাকে জানান যে, আল্লাহ এখন তাঁকে তাঁর প্রাক্তন পুত্রবধূ জয়নাবকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি ক্রমাগত আয়েশার হৃদয় ভেঙে দিচ্ছেন যখন তিনি আয়েশার উপস্থিতিতে হাস্যরস সহযোগে জুয়াইরিয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে আয়েশার কিছু করার উপায় ছিল না, কারণ একের পর এক নারীর আগমন তার উপর কী প্রভাব ফেলছে তা দেখতে মুহাম্মদ প্রায় অক্ষম ছিলেন। বারবার মুহাম্মদ তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন যে, তার এই ঈর্ষার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই; এটা (ঈর্ষা) বরং তার (আয়েশার) উপর ভর করা শয়তানের কাছ থেকেই এসেছে। তাই যদি না হতো তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ দয়া করে তার নবীকে যে কাজের (অনেক বিয়ে) অনুমতি দিয়েছেন তা আয়েশা আনন্দের সাথে মেনে নিলেই পারতো! মুহাম্মদের যুক্তিবুদ্ধি আসলে কোন কাজে আসেনি। উপরন্তু, শয়তানের প্রভাবেই আয়েশা মুহাম্মদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করছিলেন। যখন মুহাম্মদ তার নতুন স্ত্রীর সাথে ছিলেন তখন আয়েশা দরজার ফাটল দিয়ে উঁকি দিচ্ছিলেন। মুহাম্মদকে অনুসরণ করার জন্য একবার মুহাম্মদ আয়েশাকে মারধর পর্যন্ত করেন। মুহাম্মদ এক রাতে তার ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। আয়েশা সন্দেহ করছিলেন যে, সে হয়তো তার কোন স্ত্রীর কাছে প্রণয়ের জন্য যাচ্ছে, সুতরাং তিনি তার পিছু পিছু গেলেন। দেখা গেল মুহাম্মদ কাছাকাছি একটি কবরস্থানে গিয়েছিলেন তার নিয়মমাফিক প্রার্থনা করতে। মুহাম্মদ তার ঘরে ফিরে আসার পর বুঝতে পারলেন যে, আয়েশা তার পিছু নিয়েছিল। কারণ, দৌড়ে তার আগে আগে ঘরে পৌঁছানোর কারণে তার ঊর্ধ্বশ্বাস উঠে গেছে। যখন আয়েশা তাকে অনুসরণ করার কথা স্বীকার করেন, তখন মুহাম্মদ তাকে আঘাত করে বসেন। ঘটনার একটি বর্ণনায় বলা হয়, তিনি তাকে জোরে চড় মারেন। আরেকটিতে পাওয়া যায়, তিনি তার বুকে ঘুষি মেরেছিলেন (১৪)।

শয়তানকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার বদলে আয়েশার উপর মুহাম্মদের এই শাস্তি ছোট আয়েশাকে আরো বেশি আক্রমণাত্মক করে তুলেছিল। তিনি প্রায় মুহাম্মদের নতুন প্রেমের আগ্রহকে নষ্ট করে দিতেন যেমনটা তিনি মুলায়কা, আসমা এবং অন্যান্যদের সাথে করেছিলেন। আয়েশা খুব দ্রুতই মুহাম্মদের অন্য স্ত্রীদের উপর রেগে যেতেন। একবার তিনি সামান্য কারণে সাওদাকে ঘুষি এবং লাথি মারেন। বানু কুরাইযার ইহুদিদের গণ-শিরোশ্ছেদ প্রত্যক্ষ করার পর আয়েশা ইহুদিদের প্রতি মুহাম্মদের ঘৃণা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সাফিয়াকে নতুন বউ হিসেবে খাইবার থেকে ঘরে আনার পর সাফিয়ার নিষ্ঠুর সমালোচক তিনি ছিলেন। **তিনি কখনো কখনো কৌতুকাভিনেতাও হয়ে ওঠেন, যেমন একবার তিনি এবং হাফসা মিলে ধীরগতির সাওদাকে ভয় দেখান যে, ভয়ঙ্কর দাজ্জাল, ইয়াজুজ এবং মাজুজ বাঁধন ছিড়ে ইয়াছরিবের দিকে ধেয়ে আসছে।**

সাওদা এই কথা শুনে এতটাই ভীত হয়ে পড়েন যে, তিনি একটি ঘরের ভিতর লুকিয়ে থাকেন এবং মুহাম্মদ এই নিষ্ঠুর কৌতুকের কথা জানার পরই বেরিয়ে আসেন এবং তাকে লুকিয়ে রাখা থেকে বের করে আনেন। তিনি মুহাম্মদকে ঘিরে কিছু কৌতুক বলতেন। একবার তাকে বোঝানো হয় যে, তিনি যখনই আয়েশা ঈর্ষা করতেন এমন কোন এক স্ত্রীর দেয়া মধু খেতেন তখনই মুহাম্মদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হতো। এই কৌতুকে যোগ দিতে আয়েশা সাওদাকে পর্যন্ত রাজি করিয়েছিলেন একই কথা বলতে যে, যখন তিনি কোন এক স্ত্রীর ঘরে গিয়ে মধু খেয়েছিলেন তখন থেকেই তাঁর শরীর থেকে গন্ধ বের হচ্ছে। শরীরের গন্ধের ব্যাপারে মুহাম্মদের এতটাই শুচিবায়ু ছিল যে, তিনি ক্রমাগত হাত ধুতেন এবং দাঁত মাজতেন। এমনকি তিনি রসুন এবং পেঁয়াজ খেয়ে নামাজের জামায়াতে আসা নিষিদ্ধ করেছিলেন। যারা তাকে দেখার জন্য আগে থেকেই সময় নিয়ে আসত তারাও যেন রসুন ও পেঁয়াজ খেয়ে দেখা করতে না আসে এমন নির্দেশনা দিলেন। দুই স্ত্রীর কাছ থেকে একই অভিযোগ শোনার পর মুহাম্মদ আর তাঁর ঐ স্ত্রীর হাতে মধু খেতে চাইতেন না।

আয়েশার আচরণ আরো নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে যখন তিনি মুহাম্মদের সন্তান ইব্রাহিমের পিতৃত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে, শিশুটি মারিয়ার গর্ভে জন্ম নিয়েছিল। মারিয়া ছিল কোঁকড়ানো চুলের একজন ফর্সা মিশরীয় নারী। সবাই তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করত, বিশেষ করে মুহাম্মদ। মুহাম্মদ তার সাথে বেশি সময় কাটাতে শুরু করেন। কয়েক বছর আগে বানু নাযীর গোত্রের যে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন মুহাম্মদ সেখানে মারিয়াকে নিয়ে রাখেন, যাতে তাকে বাকি স্ত্রীদের থেকে আলাদা রাখা যায়। এসব কারণেই, মারিয়া গর্ভবতী হওয়ার পর তাকে সরিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। **তিনি যখনই ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি গর্ভবতী, তখন মুহাম্মদের অন্য সব স্ত্রীরা তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।** দুর্ভাগ্যবশত, আয়েশা তার সম্পর্কে সবকিছু জানতেন, এমনকি মুহাম্মদের মনেও এই গর্ভাবস্থা সম্পর্কে সংশয় ছিল। তার স্ত্রীদের অধিকাংশই সন্তান প্রসবের বয়সেই ছিলেন; কেউ কখনো গর্ভবতী হয়নি, কিন্তু এখন মিশরীয় ক্রীতদাস মেয়েটির পেট ফুলে উঠছে। ক্রীতদাস মাবুরকে (Mabur) তার গৃহে যেতে দেখা যেত, আর তা থেকেই মুহাম্মদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এই দাস প্রাণে বেঁচে গেছে যখন এটা পরিষ্কার হয় যে, সে একজন নপুংসক ছিল। মারিয়া গর্ভবতী হয়ে পড়ার পর মারিয়ার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে মুহাম্মদের সন্দেহ আবার জেগে ওঠে। ইসলামিক গ্রন্থে পাওয়া যায়, ফেরেস্তা জিব্রাইলের একটি সফর লেগেছিল তাকে আশ্বস্ত করতে যে, তিনি সত্যিই এই সন্তানের পিতা (১৫)। শিশুটির জন্মের পর মুহাম্মদ প্রতিদিন পাঁচ মাইল ঘুরে মারিয়া এবং শিশুটির সাথে দেখা করতে যেতেন। জন্মের কিছুদিন পর তিনি ইব্রাহিমকে নিয়ে মসজিদে ফিরে আসেন সবাইকে দেখানোর জন্য। **আয়েশা বাচ্চাটিকে দেখে কুটনামি করে বলেন যে, "আমি বা অন্যরা কেউই এই বাচ্চার সাথে আপনার কোন মিল দেখতে পাচ্ছি না (১৬)**।

এবার উমরের মেয়ে হাফসাও মুহাম্মদের উপর বিরূপ মনোভাবাপন্ন হতে শুরু করলেন। এই দায় আর কারো নয়, মুহাম্মদের নিজেরই। হাফসা একদিন তার আত্মীয়দের সাথে দেখা করে তার ঘরে ফিরে এসে দেখেন যে, মুহাম্মদ এই খ্রিস্টান ক্রীতদাসীর গায়ের উপর শুয়ে আছেন। হাফসা উন্মত্তভাবে চিৎকার করে উঠলেন : "আমার রুমে, আমার জন্য বরাদ্দ দিনে, আর নিজের বিছানায়!" (১৭) অন্য যেকোন বরের মতই, এ ধরনের কাজে ধরা পড়লে যা হয় মুহাম্মদেরও তাই হয়েছিল। তার চেহারা লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল এবং বিষয়টা তিনি চেপে যেতে চেষ্টা করেন। এটা আসলে ব্যভিচার ছিল না (মুহাম্মদের আইন অনুযায়ী), কিন্তু এটি স্ত্রীদের জন্য বরাদ্দ সময়সূচির মধ্যে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। সব স্ত্রীদের শান্ত রাখতে তিনি যে জীবনযাপন প্রণালীর অনুসরণ করতেন - একেক রাতে একেকজনের সাথে শোবেন, মূলত মারিয়ার সাথে সেদিন বিছানায় শোয়ার ফলে সেই সময়সূচির ব্যাঘাত ঘটেছে। মুহাম্মদ শপথ করে বলেন যে, মারিয়ার সাথে তার আর কোন সম্পর্ক থাকবে না এবং হাফসাকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন কাউকে কিছু না বলেন। কিন্তু হাফসা আয়েশাকে এটি বলে দিলেন এবং শীঘ্রই ঘটনাটি সবাই জানতে পারলেন।

হাফসার কাছে মুহাম্মদের ক্ষমা প্রার্থনাকে যথেষ্ট মনে হয়নি। তাই তিনিও আয়েশার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তারপর থেকে মুহাম্মদের কথার উপর কথা বলতে শুরু করেন এবং আয়েশার সাথে যোগ দেন, যাতে করে মুহাম্মদকে বিচলিত করতে

পারেন। হাফসার বাবা উমর এই ঘটনাটি জানতে পারেন তার নিজের স্ত্রীর সাথে একদিন ঝগড়ার মুহূর্তে। উমর তার স্ত্রীকে তিরস্কার করে বললেন যে, কোন পুরুষের সাথে তর্ক করার অধিকার তাদের স্ত্রীদের নেই। উমরের স্ত্রী জবাবে বললেন যে, হাফসা মুহাম্মদের সাথে সবসময় তর্ক করে যে কারণে মুহাম্মদ সারাদিন মন খারাপ করে থাকেন। যদি হাফসা মুহাম্মদের সাথে তর্ক করতে পারে তাহলে তিনিও উমরের সাথে তর্ক করতে পারবেন। উমর এই কথা শুনে কেঁপে উঠলেন। এটা অবশ্যই ইয়াছরিবের নারীদের প্রভাব ছিল। মক্কায় পুরুষেরা তাদের নারীদের উপর আধিপত্য বিস্তার করত, কিন্তু ইয়াছরিবের নারীরা তাদের পুরুষদেরই দৌড়ের উপর রাখে। আয়েশা ইয়াছরিবী নারীদের 'বদঅভ্যাস' গ্রহণ করেছিলেন, আর এখন তিনি (আয়েশা) উমরের মেয়েকেও প্রভাবিত করছেন। উমর রেগেমেগে মসজিদে হাফসার ঘরে ঢুকলেন। তাকে তিরস্কার করলেন এবং সতর্ক করে দিলেন এই বলে যে, 'আল্লাহর রাসূলকে' বিরক্ত করার জন্য হাফসা তার নিজের ধ্বংস ডেকে আনছে! যদি সে একই আচরণ অব্যাহত রাখে, মুহাম্মদ সম্ভবত তাকে তালাক দিয়ে দেবেন। তিনি আয়েশাকে দোষারোপ করলেন এবং হাফসার উপর তার প্রভাব সম্পর্কে নিজ মেয়েকে সতর্ক করলেন। তারপর তিনি আয়েশা ও উম্মে সালামার খোঁজে বের হলেন এবং তাদেরকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করলেন। তিনি তাদেরকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, তারা সবাই ধ্বংসের পথের পথিক। যদি তারা মুহাম্মদকে রাগান্বিত করে, তাহলে তারা আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করবে এবং যদি তারা আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করে, তাহলে তারা জাহান্নামের আগুনে ধ্বংস হয়ে যাবে। আয়েশা উমরকে তার নিজের চরকায় তেল দিতে বললেন; উম্মে সালামাও তাই বললেন।

এমনকি আয়েশা ও হাফসার তর্কাতর্কি ছাড়াও মুহাম্মদ অন্যান্য কারণেও স্ত্রীদের উপর তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। সবকিছু নিয়ে তাদের ঝগড়া মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। শুধু একজন স্ত্রী নয়, নয়জন এখন তাকে ক্রমাগত আঘাত করছে। কিছু সময়ের জন্য এটা ছিল মারিয়ার বিষয় নিয়ে। সম্প্রতি, অন্য স্ত্রীরা তার কাছে অভিযোগ করছিল আয়েশা সম্পর্কে। আয়েশা তার প্রিয় ছিলেন, এবং এই কারণে যখনই কেউ মুহাম্মদের জন্য উপহার নিয়ে আসত তারা সবসময় আয়েশার কাছে তা রেখে যেত। এটা ঠিক না। যারা উপহার নিয়ে আসে তাদেরও তো সৌজন্যবোধ থাকা উচিত যে, প্রত্যেক নারীর জন্যই রাত বরাদ্দ আছে। অন্তত তারা তাদের কারোর কাছে উপহার রেখে যেতে পারে, কিন্তু তারা তা করেনি। তারপর ছিল জয়নাবকে নিয়ে সমস্যা। জয়নাব নাক সিটকানো রাজকুমারীর মতো আচরণ করতেন। তিনি নিজেকে অন্য স্ত্রীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন, কারণ তাদের মধ্যে একমাত্র তার সাথেই আল্লাহ নিজে মুহাম্মদকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছিলেন। আয়েশার সাথে বিছানায় থাকার সময় মুহাম্মদ যে সকল আয়াত নিয়ে এসেছিলেন তা জয়নাব জানতেন। আয়েশা আনন্দের সাথে সেসব আয়াত যে কারোর সামনে আবৃত্তি করতেন, যাতে তিনি তাদেরকে তার অবস্থান সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। এ ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করা মুহাম্মদের জন্য বেশ জটিল ছিল, কেননা মুহাম্মদ আয়েশার সাথে বিছানায় থাকাকালীন সময়ে যা বলেছিলেন তা আল্লাহই তাকে বলেছিলেন, এবং আল্লাহ যা বলেছেন তা পরিবর্তন করার কোন উপায় ছিল না। সুতরাং মুহাম্মদ তাঁর স্ত্রীদের এসব বিষয় নিয়ে পরস্পরকে লড়াই করতে ছেড়ে দিলেন।

মক্কা বিজয় এবং হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধের পর আয়েশা ও হাফসা একত্রিত হয়ে মুহাম্মদকে আরও বেশি মাসিক ভাতার জন্য চাপ দিতে অন্য স্ত্রীদের সংগঠিত করেন, এবার তারা মুহাম্মদের আরেকটি মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠলেন। তারা মুহাম্মদকে তাদের দাবি নিয়ে আলোচনা করার জন্য বসালেন, কিন্তু তা শেষমেশ আর তাদের জন্য অনুকূলে রইল না। সম্ভবত এই বৈঠকের আগেই উমর ও আবু বকর সেখানে মুহাম্মদের পেশিশক্তি হিসেবে হাজির হন। উমর কিছুক্ষণের জন্য মুহাম্মদের স্ত্রীদের অভিযোগ শুনলেন, তারপর ওঠে দাঁড়িয়ে একটা গল্প বলতে লাগলেন যেখানে তার এক ইয়াছরিবী 'ভ্রাতার' এর কন্যা যিনি উমরের স্ত্রী ছিলেন। সে উমরের সাথে কি করেছিল তার উদাহরণ টেনে তিনি বললেন যে, সেই স্ত্রী টাকার জন্য তাকে ক্রমাগত বিরক্ত করেছিল। এরপর উমর মুহাম্মদকে বললেন, **"যদি আপনি তা দেখতেন যখন আমি উঠে তাকে চড় মেরেছিলাম!"** মুহাম্মদ হেসে বললেন, "ওটা ছিল একজন মাত্র স্ত্রী, কিন্তু এখন তুমি চারদিকে তাকাও, ওরা সবাই আমার কাছ থেকে আরো টাকা চায়"। এ সময় উমর ও আবু বকর তাদের মেয়েদের চুল ধরে মারধর করলেন যা সকল স্ত্রীদের

জন্য একটি শিক্ষা ছিল। "তোমরা আল্লাহর রাসূলের কাছে যা নেই তাই চাও" বলেই তারা দুজন তাদের মেয়েদের চড় মেরে চিৎকার করে উঠলেন, কিন্তু আয়েশা ও হাফসা দৃঢ়ভাবে তাদের দাবিতে অনড় ছিলেন। আয়েশা এবং হাফসা বললেন **"আল্লাহর কসম, আমরা আল্লাহর রাসূলের কাছে এমন কিছু চাইনি যা তার কাছে নেই"** (১৮)।

মুহাম্মদ এই ঘটনায় বিস্ফোরিত হয়ে ওঠেন। বলা হয় যে, তিনি এতটাই মন খারাপ করেন যে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং তার স্ত্রীদের কাছ থেকে ধর্মঘট ঘোষণা করেন। যা হবার যথেষ্ট হয়েছে! তিনি তাদের ঝগড়া এবং আরো টাকার দাবিতে ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি একটু বেশিই রাগান্বিত ছিলেন হাফসার উপর, কারণ নিষেধ সত্ত্বেও সে আয়েশাকে মারিয়ার কথা বলে দিয়েছিল যে, মুহাম্মদ তার কক্ষে মারিয়ার সাথে যৌনমিলন করেছেন। এর ফলে মুহাম্মদের অস্বস্তির যেন কোন কুলকিনারা থাকল না। তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি তাদের কাছ থেকে পুরো একমাসের জন্য দূরে থাকতে চান। তিনি তার আবাসস্থলের পেছনে উঁচুতে একটি বাড়ির ছাদে মাচার ঘরে থাকার জন্য একটি সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়েন এবং মানুষকে দূরে রাখার জন্য সেই কক্ষের নিচে একজন পেশিবহুল আবিসিনিয়ান ক্রীতদাসকে নিযুক্ত করেন। উনত্রিশ দিন ধরে তিনি একটিবারের জন্যও নিচে নামেননি। তার জন্য তার ক্রীতদাস উপরে খাবার নিয়ে দিয়ে আসত।

কিন্তু এই দূরে থাকার সময়টি তার জন্য সঠিক ছিল না। সবার থেকে দূরে গিয়ে যখন তিনি সেই কক্ষে অবস্থান করছেন, সেই সময় ইয়াছরিবে খবর আসে সিরিয়ার গাসসানিদরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা খ্রিস্টান আরব ছিল যারা দক্ষিণ সিরিয়া এবং জর্ডানেরই একটি বৃহৎ অংশ নিয়ন্ত্রণ করত এবং পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বাইজেন্টাইনদের সাহায্য করে সাম্প্রতিক বিজয় এনে দিয়েছিল। তারা সুসজ্জিত বাহিনী ছিল, কঠিন এবং ভয়ঙ্কর যোদ্ধাও ছিল। সিরিয়ায় মুহাম্মদের সাম্প্রতিক আগ্রাসন এবং এরপর হেরাক্লিয়াসের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে গাসসানিদরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে, এই ধরনের খবর ইয়াছরিবে পৌঁছলো। মুমিনরা ভয়ে ছিলেন। তারা এমন বিপদের সময়ে নেতাহীন আছেন। এমনকি মুহাম্মদ তাদের নামাজেও নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন না, এমনকি তিনি জামাতেও শরিক হয়ে আল্লাহর তরফ থেকে নির্দেশনা পর্যন্ত দিচ্ছেন না। **মুহাম্মদ নিশ্চয়ই ভূ-রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে জানতেন, কিন্তু তিনি সম্ভবত তার স্ত্রীদের দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সবার থেকে আলাদা হয়ে নির্জনে তার মাথার মধ্যে আয়াত রচনা করছিলেন।**

স্ত্রীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের ধর্মঘটের শেষের দিকে উপত্যকায় একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মুহাম্মদ তাদের সবাইকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উমর ইয়াছরিবের এক বন্ধুর কাছ থেকে এটা জানতে পারেন। তার এই বন্ধু তাকে কি ঘটছে না ঘটছে সেসবের খবরাখবর জানাতেন। লোকটি একদিন সকালে তার দরজায় ধাক্কা মেরে চিৎকার করে বলেন "খোলো, খোলো!" উমর ভয় পেয়ে দরজা খুলতে ছুটে গেলেন এবং এরপরই জিজ্ঞেস করলেন "গাসসানিদরা কি আসছে?" "না" - লোকটি বলল। "এটা তারচেয়েও বড় এবং ভয়াবহ খবর। আল্লাহর রাসূল তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন! (১৯)

আসলে এমন কোন ঘটনাই ঘটেনি, কিন্তু মুহাম্মদ একটি আয়াতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের ধারণাটি তৈরি করেছিলেন : "সে যদি তোমাদেরকে তালাক দেয়, তবে আশা করা যায় তার রব তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী তাকে দিবেন", এবং এই আয়াতে একজন আদর্শ স্ত্রীর বৈশিষ্ট্যও নির্ধারণ করা হয়েছে এভাবে : "যারা মুসলিম, মুমিনা, অনুগত, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, রোজাদার, অকুমারী ও কুমারী"। (২০)

মুহাম্মদ এই নতুন আয়াতগুলো কারো সামনে আবৃত্তি করেছিলেন, খুব সম্ভবত আবিসিনীয় দাসের সামনে, যা তিনি মসজিদে পুনারাবৃত্তি (পাঠ) করতে বলেছিলেন। একবার এগুলো যখন প্রচারিত হলো, বিবাহ-বিচ্ছেদের গুজবের জন্ম হলো। এই ভয়াবহ সংবাদ জানার পর উমর দৌড়ে হাফসাকে খুঁজতে গেলেন। সে তার কক্ষে কাঁদছিল। উমর বললেন, "আমি কি তোমাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করিনি? নবী কি তোমাদের সবাইকে তালাক দিলেন?" তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল, তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আমি জানি না" (২১)। তিনি তাকে দুর্ভাগা বলে অভিহিত করেন এবং মুহাম্মদের কাছে যেতে চাইলেন, কিন্তু মুহাম্মদের ক্রীতদাস তাঁকে বাধা দিল। দাস জোরে জোরে মুহাম্মদের কাছে তিনবার উমরের উপস্থিতির

উল্লেখ করল, কিন্তু মুহাম্মদ উত্তর দিলেন না। হতাশ হয়ে উমর জোরে জোরে বললেন, যাতে মুহাম্মদ তা শুনতে পান যে, তিনি হাফসাকে সাহায্য করতে তার কাছে আসেননি। বরং তিনি বললেন : "আল্লাহর কসম, যদি আল্লাহর রাসূল আমাকে তার (হাফসা) গলা কাটার আদেশ দিতেন, তাহলে আমি অবশ্যই তা করতাম" (২২)। এই কৌশলটি কাজ করেছে। মুহাম্মদ তাকে উপরে উঠতে দিলেন। উমর তাকে একটি খেজুর পাতার মাদুরের উপর শুয়ে থাকতে দেখলেন। মুহাম্মদ তাঁর মাথাটি একটি হাতের উপরে দিয়ে শুয়ে আছেন। হাতের তালু থেকে চামড়া ওঠে এসেছে। এই করুণ দৃশ্য দেখে উমর কাঁদতে লাগলেন, তার প্রিয়নবী হতদরিদ্রের মতো জীবনযাপন করছেন! সাধারণ বিছানা ছাড়া তেমন কিছুই সেখানে ছিল না, আর ছিল শুধু একটা ঝুলন্ত পানির থলে, খেজুরের সামান্য মজুদ, একটি 'মূত্রদানি'। উমর তার আবেগ সংবরণের পর মুহাম্মদকে গাসসানিদের হুমকি সম্পর্কে অবহিত করলেন। উমর অবশেষে তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেই ফেললেন যে, তিনি তার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন কিনা। মুহাম্মদ যখন মাথা নাড়লেন, তখন তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। উমর যখন প্রথমে উঁচুতে ওঠে আসেন মুহাম্মদ তখন পুরোপুরি বিরক্তিকর মেজাজে ছিলেন, কিন্তু উমরের কাছ থেকে তার স্ত্রীর সাথে তার তর্কের গল্প শোনার পর এবং মক্কা ও ইয়াছরিবের নারীদের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে উমরের চিন্তাভাবনা শোনার পর তিনি নরম হলেন; এমনকি তার সাথে হাসলেনও। উমর তাকে তার স্ত্রীদের ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ দিলেন। দীর্ঘ আড্ডার পর তারা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসলেন এবং মুহাম্মদ তাঁর স্ত্রীদের গৃহে গেলেন। মুহাম্মদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের ধর্মঘট উনত্রিশ দিন স্থায়ী ছিল, এবং তিনি এই ধর্মঘটের মাধ্যমে সমগ্র আত্মসমর্পণকারী সম্প্রদায়কে (মুমিনদের) নাড়িয়ে দিয়েছেন, বিশেষ করে তার স্ত্রীদের। তারা এখন একপ্রকার দোষে-জর্জর ধ্বংসাবশেষ, ফলে যখনই মুহাম্মদ তাদেরকে সম্পদের জন্য ঝগড়ার কারণে বিবাহবিচ্ছেদ কিংবা মুহাম্মদের সকল বিধিনিষেধ মেনে তার সাথে বিনয়ী হয়ে থাকার বিকল্প অপশন দিয়েছিলেন তখন তারা আনন্দের সাথে তার সাথে থাকার সিদ্ধান্তটাকেই মেনে নিয়েছিলেন। তার স্ত্রীদের সাথে আলাদা থাকার পর্ব শেষ হবার পরই মুহাম্মদ গাসসানিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলেন।

অধ্যায় - ৩৩
সন্ত্রাসই আমাকে বিজয়ী করেছে

মুহাম্মদ যখন তার স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকতে ছাদের মাচাঘরে দিন পার করছিলেন, সেই সময় নাবাতিয়ান ব্যবসায়ীরা গুজব রটিয়েছিল যে, বাইজান্টাইনরা পেত্রা (Petra) অঞ্চল থেকে ইয়াছরিব আক্রমণ করার জন্য সেনাদলকে সজ্জিত করছে। এটি কেবলই একটি গুজব ছিল, তবে এটি তাদের মধ্যে ভয় ছড়িয়ে দিয়েছিল। বাইজান্টাইনস এবং তাদের খ্রিস্টান আরব মিত্ররা সেই যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন করেছিল। হেরাক্লিয়াস সম্প্রতি পারস্য সম্রাটকে পরাস্ত করেছিলেন এবং এখন এই উদীয়মান নবীকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, বা ইয়াছরিবের চারপাশে এরকমই কথার সূত্রপাত হয়েছিল। গুজব এমনভাবে ছড়ালো তা লাগামহীন হয়ে গেল। যেমন, শোনা গেল হেরাক্লিয়াস অভিযানের জন্য তার সৈন্যদের এক বছরের আগাম বেতন দিয়েছিলেন। সবচেয়ে খারাপ বিষয় হচ্ছে গাসসানীয়, জুডাহামিস (Judhamis), লাখমিদস (Lakhmids) এবং অন্যান্য খ্রিস্টান আরবরা 'রোমান ঈগলদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এবং তাদের অগ্রবর্তী সেনাদল ইতিমধ্যেই বালকায় ছিল' যেটা ছিল মুতার (Mutah) নিকটে যেখানে এক বছর আগে জাবির, রাওয়াহা এবং জায়েদের শেষ পরিণতি হয়েছিল (১)।

মাচা থেকে নেমে আসার পরই একদম সময় নষ্ট না করে মুহাম্মদ তার পক্ষে যুদ্ধ করতে বৃহৎ এক বাহিনীকে একত্রিত করেন। ইয়াছরিবে তাদের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা না করে তিনিই আগ বাড়িয়ে বাইজেন্টাইনদের সাথে যুদ্ধ করতে চাইলেন। তিনি অস্ত্র ও সেনার জন্য সাধারণ আহবান (আরবিতে আন নাফিরুল আম) জানিয়েছিলেন, এমনকি সম্প্রতি জয় করা মক্কাবাসীদেরও তাদের সেনা পাঠানোর আদেশ দিয়েছিলেন। মুহাম্মদ ঘোষণা করেন যে, এটি আল্লাহরই হুকুম যে, সমস্ত 'সক্ষমদেহী' পুরুষদের অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে; নয়তো তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। মুহাম্মদ তার হুমকিগুলিকে সমর্থন করার জন্য নতুন আরো জিহাদের আয়াত নাজিল করেন (২)। তিনি তার শীর্ষ লোকদের ডাকেন এবং তাদের সকলের অংশগ্রহণ দাবি করেন। উসমান এক হাজার সোনার কয়েন সহ কয়েকশ উটের বহর সরবরাহ করেন। আবু বকর রৌপ্য মুদ্রার বস্তা হস্তান্তর করেন। নারীরা সোনার ব্রেসলেট এবং নুপুর দান করেন। অন্যরা প্রচুর পরিমাণে শস্য ও খেজুর নিয়ে এসেছিল। বাধ্যতামূলক 'দাতব্য কর' (জাকাত) এখন 'যুদ্ধ করে' পরিণত হয়েছে এবং মুহাম্মদের অধীনস্থ প্রতিটি গোত্রের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করা হয়েছে।

ঐশ্বরিক শাস্তির হুমকি সত্ত্বেও, মুহাম্মদ লোকজনের কাছ থেকে সাধারণ প্রতিরোধের মুখোমুখি হন। ইয়াছরিবের অনেকেই যুদ্ধে যেতে চায়নি। তাদের আপত্তিগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, গ্রীষ্মের মাঝামাঝির এই সময়কালে শরীরে ফোস্কা পড়ার মতো গরমই পড়েছে (এত গরমে যুদ্ধ করাটা নিঃসন্দেহে কষ্টের)। তবুও যুদ্ধে অনড় মুহাম্মদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি সিরিয়ার জ্বলন্ত বালুকণা পাড়ি দিয়ে চারশো মাইল উত্তরে যাত্রা করবেন। **একদিন মিম্বার থেকে মুহাম্মদ রাগান্বিত হয়ে বললেন যে, এই ধরনের প্রতিরোধকারীরা (জিহাদে যেতে অনাগ্রহী) 'ভন্ড' তথা মোনাফেক। এরপর এই ভন্ড মুমিন বা মোনাফেকদের জন্য আরেক দফা আয়াত নাজিল করলেন যারা তার আদেশ অমান্য করার মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের মুখোশ উন্মোচন করেছে** (৩)।

একপর্যায়ে মুহাম্মদ মৌখিক হুমকি দেয়ার গণ্ডি ছাড়িয়ে গেলেন। ফজর ও এশার নামাজে তার সাহাবিদের অংশ নেয়া নিশ্চিত করতে তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করলেন, যেসব ঘরের লোকেরা নামাজে আসেনি সেই সেই ঘরগুলোতে আলো ফেলে দেখতেন (তারা গেল কোথায়) (৪)। এভাবে তিনি যখন জানতে পারলেন যে, একদল অমান্যকারীরা একজন ইহুদি ধর্মান্তরিতের (নওমুসলিম) ঘরে জড়ো হয়ে অভিযানে না যাওয়ার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলছিল তখন তিনি একদল লুটেরাদের সেখানে পাঠিয়ে সেই ঘরটি জ্বালিয়ে দিলেন।

বলা হয় যে, কেবলমাত্র সেই ইহুদি থেকে মুসলিম হওয়া লোকটিই আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিল আর অন্যরা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে তাদের হাত-পা ভেঙেছিল (৫)। এতসব শক্তিশালী কৌশল খাটানো সত্ত্বেও লোকেরা তার কাছে অসুস্থতা, দারিদ্র্য, পারিবারিক জটিলতা এবং অন্যান্য বিভিন্ন অজুহাতে অব্যাহতি (জিহাদে যাওয়া থেকে) চাইতে আসতে থাকে। সবচেয়ে মজার অজুহাত নিয়ে এসেছিল একজন, যে বলেছিল বাইজেন্টাইন নারীদের দেখে সে পাপের প্রলোভনে পড়বে (নিজেকে সামলাতে পারবে না)। বাইজেন্টাইন রমণীরা মুহাম্মদের উপপত্নী মারিয়ার মতো সুন্দর ছিলেন। দৈহিক সৌন্দর্য এবং দৃষ্টিনন্দন চোখের জন্য তাঁরা বিখ্যাত ছিলেন। যারা তার কাছে অজুহাত নিয়ে এসেছিল মুহাম্মদ তাদের ছাড় দেন ঠিকই, কিন্তু তিনি তাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য মনে মনে একটি তালিকা তৈরি করেন।

সময় এবং বাইজেন্টাইনদের সন্দেহাতীত সামরিক শক্তির কারণে 'হলুদ চামড়ার' বিরুদ্ধে যুদ্ধ (সৌন্দর্যের কারণে তাদের হলুদ চামড়া বলে ডাকা হতো) বলে খ্যাত বাইজেন্টাইন-বিরোধী এই অভিযানটিকে কেবলমাত্র মুহাম্মদের হতাশার একটা পদক্ষেপ বলেই মনে করা যেতে পারে। মুহাম্মদ তার হাত থেকে ইয়াছরিবের নিয়ন্ত্রণ ফস্কে যাওয়ার আশঙ্কা করছিলেন (৬)। তাঁর শাসনের বিষয়ে তাঁর নিজেরই অনাস্থা বেড়ে চলছিল। এটি মক্কা এবং হুনাইনের বিজয়ের পরে ইয়াছরিবের ধর্মান্তরিতদের অনেকের মধ্যেই শেকড় গেড়ে বসেছে। তারাও (ইয়াছরিবের ধর্মান্তরিতরা) যুদ্ধ করেছিল, তবু মুহাম্মদ মক্কাবাসীদেরকেই গনিমতের লুটের সেরা অংশ দিয়েছিলেন এবং বাকী অংশের কিছুটা হাওয়াজিনদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে তাদের সমর্থন নিশ্চিত করার করা যায়। ইয়াছরিবী ধর্মান্তরিতদের জন্য একেবারে শেষের অংশ রেখে দেন। তিনি তাদের জন্য বাহরাইনকে বিজয়ী করার এবং সেখান থেকে তাদেরকে লুণ্ঠনের একচেটিয়া অধিকার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা ইয়াছরিবে ফিরে আসার পরে এ বিষয়ে তারা আর কোনও কথা শোনেনি। অধিকন্তু, মুহাম্মদের সাফল্য ইয়াছরিবের বিভিন্ন গোত্রে ধর্মান্তরের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল, কিন্তু এতে করে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল। পূর্বে যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি উপত্যকার সর্বাধিক কর্মক্ষম লোক, যেমন - ইহুদিদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বা জবাই করেছিলেন এবং তাদের ক্ষেত ও গাছপালা তার পিতৃভূমির লোক মক্কাবাসীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন যাদের কৃষিক্ষেত্রে পূর্ব কোন অভিজ্ঞতা ছিল না এবং যারা শারীরিক শ্রমের প্রতিও বীতশ্রদ্ধ ছিল। ফলস্বরূপ, ক্ষেত থেকে কম ফসল মিলল। এর উপরে আবার শাহাদার সুরক্ষা ঢালের আড়ালে থাকা 'মোনাফেকদের' নিয়েও মুহাম্মদের সার্বক্ষণিক সমস্যা লেগেই ছিল। খাজরাজ সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের নেতৃত্বে মোনাফেকরা শক্তি অর্জন করার সুযোগ পেয়েছিল, এবং তারা মুহাম্মদের যে কোনও ভুল পদক্ষেপের সুযোগ নিতে আগ্রহী ছিল। বাইজান্টাইনদের আক্রমণ করে মুহাম্মদ একটি বড় বিজয় অর্জনের প্রত্যাশা করেছিলেন যা তার অনুসারীদের মনোবলকে বাড়িয়ে তুলবে এবং তার লোকদের খুশি রাখতে যথেষ্ট লুটের মাল বয়ে আনবে।

ইয়াছরিবের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার বিষয়ে মুহাম্মদের আশঙ্কা ক্রমেই তীব্র হয়েছিল যখন তাঁর সেনারা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। মুহাম্মদের বাহিনী বিদায়ী গিরিপথ (Farewell Pass) নামে পরিচিত একটি অঞ্চল যেটি ছিল ইয়াছরিবের ঠিক উত্তরের দিকের একটি পর্বতমালায়, সেখানে যাত্রা থামায় এবং সমবেত হয়। অভিযানের প্রস্তুতির জন্য আবদুল্লাহ বিন উবাইও তাঁর লোকদের নিয়ে সেখানে শিবির গেড়েছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদ সেনাদলের প্রধানের কাছে চলে যাওয়ার দিন আবদুল্লাহ বিন উবাই উহুদ যুদ্ধে যা করেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করলেন : তিনি ইয়াছরিবে ফিরে গেলেন এবং সঙ্গে করে তার অনুগতদের নিয়ে গেলেন। মুহাম্মদ তার অনুপস্থিতিতে প্রথমে ইয়াছরিবকে পরিচালনার জন্য (প্রশাসক হিসেবে) ঘাতক মাসলামাকে নিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু এবার তিনি আলীকে ইয়াছরিবে ফেরত পাঠালেন উদ্ভূত বিষয়গুলিতে নজর রাখার জন্য। বিখ্যাত সামরিক ইতিহাসবিদ গ্যাব্রিয়েলের মতে, "(আবদুল্লাহ বিন উবাইর) উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে সাবধানতার অংশ হিসেবে এবং যে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল তা দমন করার জন্য" তিনি আলীকে পাঠিয়েছিলেন (৭)।

ইসলামিক গ্রন্থে দাবি করা হয়েছে যে, মুহাম্মদের ত্রিশ হাজার সৈন্য এই অভিযানে অংশ নিয়েছিল এবং পেছনের অংশটি অগ্রবর্তী সেনাদল থেকে দু'দিনের মতো পেছনে ছিল। এতেই বোঝা যায়, তাদের বাহিনীর সেনাসংখ্যা কতটা বড় ছিল! দেরিতে যোগ দেওয়া লোকজন তো আরো পেছনে পড়ে গিয়েছিল। তীব্র উত্তাপের কারণে সেনাদল রাতে যাত্রা করেছিল এবং দিনের বেলা সূর্য থেকে বাঁচতে নিজেদের তৈরি ছাউনিতে আশ্রয় নিয়েছিল। সিরিয়া চারশো মাইলেরও বেশি দূরত্বে ছিল, তবে মুহাম্মদ ইয়াছরিব থেকে প্রায় তিনশো ত্রিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত তাবুক (Tabuk) নামের একটি ছোটখাট মরূদ্যান পর্যন্তই গেলেন। ইসলামিক ইতিহাস গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ দশদিনের জন্য তাবুকে অবস্থান করেছিলেন। এ সময় বেশ কয়েকটি আক্রমণকারী দলকে তিনি আশপাশে খোঁজখবর নেয়ার জন্য পাঠালেন। তারপর তারা কোনও হলুদ চামড়ার বাইজেন্টাইনীর মুখোমুখি না হয়েই ইয়াছরিবে ফিরে আসেন। তারা একটি দিনারও লুণ্ঠন করে জোগাড় করতে পারেননি, আর একজন নারীকেও বন্দি করতে পারেননি। অভিযানটি কেন বাতিল হয়েছিল তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি, তবে এ সময় মুহাম্মদকে ঘিরে যে বিপুল পরিমাণ পানি এবং খাদ্যের অলৌকিক (মুজিযা) গল্পের কথা পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা যায় যে, সেনাদল তীব্রভাবেই পানীয় এবং খাদ্যের সংকটে পড়ছিল (৮)। সিরিয়ায় অগ্রসর হওয়ার পথে পানিশূন্যতা ও দল থেকে পালিয়ে যাওয়ার কারণে সৈন্যসংখ্যা বেশ কমে গিয়েছিল। তিনি সম্ভবত গোয়েন্দা তথ্যও পেয়েছিলেন যে, বাইজেন্টাইন সেনাদল বালকায় ছিল না যা তিনি প্রথমে বিশ্বাস করেছিলেন, বরং আরো উত্তরে ছিল এবং তারা যুদ্ধের পথেও ছিল না।

ঘটনার এই পালাবদল মুহাম্মদকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিল, এবং তার অসন্তুষ্ট সেনাদলের মাঝে তিনি এখন নতুন এবং সম্ভাব্য আরও গুরুতর শত্রুর মুখোমুখি হলেন। **এটি বিচিত্র নয় যে, মুহাম্মদ নিজের সম্পর্কে যা যা দাবি করতেন তা অনুসারীদের প্রতি দশজনের মধ্যে একজনেরও বেশি লোক হয়তো বিশ্বাস করতো না, এমনকি এই সংখ্যা আরো বেশিও হতে পারে। যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলে হুমকি তো ছিলই, সেটি ছাড়াও তাদের বেশিরভাগের জন্য যা অনুপ্রেরণা (যুদ্ধে যাওয়ার) হিসেবে কাজ করেছে তা হচ্ছে লুটের মাল লাভের সম্ভাবনা।** বেশিরভাগ লোকেরা নিজেদেরকে অস্ত্রে সজ্জিত করার জন্য তাদের নিজস্ব অর্থ এবং সংস্থান ব্যয় করেছিল। তারা গলে যাওয়া তাপমাত্রা, ভ্রমণের নানান অসুবিধা এবং খাবার ও পানির সংকট পর্যন্ত সহ্য করেছিল। তবুও তাদের কাছে এই অভিযান থেকে প্রদর্শনের মতো কিছুই ছিল না, যেমন ছিল না মক্কা, হুনায়ন এবং তায়েফের বেলায়ও। এখানে বরং মুমিনদের ঈমানের পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল আবশ্যিকভাবেই (মুমিনদের বিপদে ফেলে বা পরাজয়ের গ্লানি সইয়ে আল্লাহ তাদের ঈমানের পরীক্ষা করেছেন!) মুহাম্মদ খুতবা (ধর্মীয় বক্তৃতা) দিয়ে অসন্তুষ্টিকে কিছুটা লঘু করতে চেষ্টা করেছিলেন এই বলে যে, তার ইব্রাহিমের ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, তার ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার উদাহরণ (সুন্নাহ) হচ্ছে সর্বোত্তম জীবনযাপন আর আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হিসেবে রয়েছে কোরআন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মারা যাওয়াই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ মৃত্যু (৯)।

খুব বিচক্ষণতার সাথে, তাবুকের কাছে শিবির স্থাপন করার পর মুহাম্মদ আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে অভিযান চালাতে তাঁর লুটেরাদের পাঠান, যাতে তারা তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে; এবং তিনি যাতে গণিমতের মালও অর্জন করতে পারেন। তিনি খ্রিস্টান ও ইহুদিদেরকে ধর্মান্তরিত হওয়া অথবা জিজিয়া কর প্রদান করার অপশন দিলেন। এর দুটোর একটিও অমান্য করলে তাদের ভাগ্যে ছিল যুদ্ধ (১০)। তবে পৌত্তলিকদের জন্য এ জাতীয় কোন সুযোগ দেয়া হয়নি। **তাদেরকে হয় মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করতে হবে এবং মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করতে হবে, নয়তো মরতে হবে!**

প্রয়োজনীয় লুটের মালের বিবেচনায় মুহাম্মদের এই ছোট ছোট অভিযানগুলি ব্যর্থই হয়েছিল। খ্রিস্টান, ইহুদি এবং মুশরিকরা মুহাম্মদের অপ্রতিরোধ্য শক্তির কাছে নিজেরাই আত্মসমর্পণ করেছিল। তাবুকের উত্তরে এবং লোহিত সাগর ও আকাবার উপসাগরের পশ্চিমের বেশিরভাগ অঞ্চলই খ্রিস্টানদের ছিল। আত্মঘাতী প্রতিরোধের পরিবর্তে বিভিন্ন শহরের রাজা এবং বিশপরা মুহাম্মদকে জিযিয়া (অমুসলিমদের জন্য মুহাম্মদের প্রণীত অপমানজনক ট্যাক্স) দেয়ার চুক্তি করতে তাদের দূতদের পাঠিয়েছিলেন, যাতে করে তাদেরকে তাদের ধর্মেই ছেড়ে দেয়া হয়। প্রতি বছর, চন্দ্রবর্ষ পরিক্রমার প্রথম মাসে প্রত্যেক

প্রাপ্তবয়স্কের জন্য একটি স্বর্ণের মুদ্রা ধার্য করা হয়। বিভিন্ন শহরগুলো তাদের কৃষিজাত উৎপাদন বা তাদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ, যেমনঃ জারবা (Jarba) ও আদরুহ (Adruh) গোত্রের বস্ত্র এবং সুগন্ধি দ্রব্যের একটা অংশও মুহাম্মদের হাতে তুলে দিতে থাকে।

এই সকল আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মুহাম্মদ সফলতা অর্জন করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার সৈন্যরা বিনা বেতনেই রয়ে গেল। তবে সৈন্যদের মধ্যে অসন্তুষ্টি অবশ্যই বেড়ে চলছিল, কারণ মুহাম্মদ তার নিজের জীবন নিয়ে ভয় পাচ্ছিলেন। তিনি ক্রমেই মানসিক বিকারগ্রস্ত হতে থাকেন যে, তার বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত হচ্ছে এবং তিনি সন্দেহ করছিলেন, এতে (ষড়যন্ত্রে) তার নিকটতম কিছু লোকেরাই হয়তো জড়িত! তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়ে মুহাম্মদকে হয়তো বাস্তবেই, কিংবা মুহাম্মদের কল্পনা মতে, হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল। যখন তিনি একটি পাহাড়ের পাশের সরু, খাড়া পথের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এটি ঘটেছিল। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন যে তার আস্থাভাজন দু'জন ব্যতীত আর কেউ তার সাথে থাকবে না। এ দুজনের একজন তাঁর উটকে দড়ি বেঁধে চালাচ্ছিল, আর অন্যজন পেছনে পেছনে চলছিল; আর সেনাদলের বাকী অংশ একটি বিকল্প পথে যাবেন এমনটিই আদেশ দিয়েছিলেন মুহাম্মদ। এই আদেশ থাকা সত্ত্বেও, উটের পিঠে চড়ে এক ডজন লোক সেই যাত্রার মুখে উপস্থিত হলো। তাদের মুখ পাগড়ির কাপড়ের বাকি অংশ দিয়ে মোড়ানো ছিল, কেবল তাদের চোখ দেখা যাচ্ছিল। মুহাম্মদের দিকে এমন ভঙ্গিতে তারা তাকিয়ে রইল, যেন তাদের মধ্যে কেউ ফাঁদ পাতছে। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তারা তাকে সহ উটটিকে খাদের কিনারায় নিয়ে নিচে ফেলে দিতে চাচ্ছিল, অথবা তারা নিচে নেমে এসে ঘিরে তাকে ফেলে পথ থেকে ঠেলে অতল এক গহ্বরে ফেলে দিতে চাচ্ছিল। মুহাম্মদ চিৎকার করে তাদের অভিশাপ দিলেন এবং তার দু’জন আস্থাভাজন প্রারম্ভিক মক্কাবাসী ধর্মান্তরিতকে ওদের আক্রমণ করার জন্য পাঠালেন, তবে তারা কাছাকাছি পৌঁছনোর আগেই ওরা দূরে সরে যায়। তারা কে ছিল সে সম্পর্কে মুহাম্মদের সন্দেহ বা ধারণা ছিল। সে সময় মুহাম্মদের সাথে থাকা দু'জনের মধ্যে একজনের নাম ছিল হুযায়ফা। হুযায়ফা তাদেরকে (সন্দেহজনক, সম্ভাব্য সেই হামলাকারীদের) হত্যা করার প্রস্তাব দিল, কিন্তু মুহাম্মদ তাতে না সূচক মাথা নেড়েছিলেন। তিনি সেই নবী হিসেবে পরিচিত হতে চাননি যিনি তার সাহাবিদের হত্যা করেছেন। যারা মুহাম্মদকে হত্যা করতে চেয়েছে আল্লাহ তাদেরকে আগুনের স্তম্ভ দিয়ে আঘাত করে তাদের জন্য প্রতীক্ষারত জাহান্নামের চিরস্থায়ী আগুনের স্বাদ গ্রহণ করাবেন। এটি নিশ্চিত না যে, মুহাম্মদ যাদের নাম বলেছিলেন সেই সরওয়ারীগুলো তারাই ছিল কিনা। **মুহাম্মদ হুযায়ফাকে গোপনে শপথ করিয়েছিলেন (নামগুলো গোপন রাখতে), যদিও ‘জীবনবীমার কৌশল’ হিসেবে তার উপর পরবর্তীতে প্রাণনাশের প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে তিনি নিশ্চিত করেছিলেন যে, হুযায়ফা ঐসব লোকদের নামগুলো জানে (১১)**।

মুহম্মদের এই ভৌতিক ঘটনাটি শাহাদার আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিশ্বাসঘাতক লোকদের সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়। তিনি আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মতো অনেকের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন, তবে অন্যদেরটাও প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন ছিল। ইয়াছরিবে ফিরে আসার আগে তিনি জেনে নিয়েছিলেন যে, উঁচুভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কুবার (Quba) কাছে সম্প্রতি নির্মিত একটি মসজিদ এখন ভ্রান্তবিশ্বাসী ও ষড়যন্ত্রকারীদের ডেরা হয়ে উঠেছে। মুহাম্মদের সেনারা বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ইয়াছরিব ত্যাগ করার ঠিক আগে এটির নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল, এবং নির্মাতারা মুহাম্মদকে সেই মসজিদে নামাজ পড়তে এবং তার আশীর্বাদ নিতে তার কাছে এসেছিলেন। তারা তাঁকে বলেছিল যে, এটা কেবল প্রার্থনার স্থান নয়, দুঃখকষ্টে দরিদ্র ও অসুস্থদের আশ্রয়স্থলও। ইয়াছরিব পৌঁছানোর আগে মুহাম্মদের একটি ‘ওহী’ প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে তাকে জানানো হয়েছিল যে, মসজিদ নির্মাণের পেছনে নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। এর প্রমাণ তাকে বজ্রপাতের মতো আঘাত করেছিল। এটি যারা নির্মাণ করে সেই কয়েক ডজন পুরুষ আউস গোত্রের ছিলেন এবং তাদের কেউই সেনাদল নিয়ে তার সাথে উত্তরে যায়নি। এটি তাদেরকে অবধারিতভাবেই ভন্ড হিসেবে চিহ্নিত করেছে, অধিকন্তু তদন্তের পরে তিনি জানতে পারলেন যে, মসজিদটি খ্রিস্টান ধর্মান্তরিত এবং মুহাম্মদের একনিষ্ঠ শত্রু আবু আমিরের (Abu Amir) বাড়ির সম্প্রসারণ হিসেবে

নির্মিত হয়েছিল। মুহাম্মদের জন্য এটি সহজ সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। মুহাম্মদ ইয়াছরিব আসার পূর্বে আবু আমির খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন এবং একটি তপস্বী জীবনধারা গ্রহণ করেছিলেন যা তাকে 'সন্ন্যাসী' ডাকনাম দিয়েছিল। বদরের যুদ্ধের পরে এই সন্ন্যাসী তাঁর এক ডজন সমর্থকের সাথে মক্কায় পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং তারা উহুদে মক্কাবাসীদের সাথে মিলে (মুহাম্মদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধও করেছিলেন (১২)। আবু আমির পরে সিরিয়া পালিয়ে যান এবং সেখানে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে হেরাক্লিয়াসকে যুদ্ধে যেতে তিনি প্ররোচিত করেন বলেও শোনা যায়। সুতরাং এই মসজিদটি ইয়াছরিবে বাইজেন্টাইনদের একটি ঘাঁটি ছাড়া আর কি হতে পারে? মতবিরোধকারী এবং বিপ্লবীদের একত্রিত করার স্থান, মোনাফেক এবং সবার একত্রিত হবার স্থান ছাড়া কি হতে পারে? **মুহাম্মদ এটিকে 'মতবিরোধের মসজিদ' বলে চিহ্নিত করেছিলেন।** ইয়াছরিবে ফিরে আসা সেনাদলের নেতৃত্ব দেয়ার সময়, তিনি এই মসজিদে অগ্নিসংযোগ করার জন্য এক লুটেরাদের দল পাঠিয়েছিলেন। "এই মসজিদে যাও, যার লোকেরা মন্দ, এবং এটি ভেঙে পুড়িয়ে ফেল" – এই বলে মুহাম্মদ নির্দেশনা দিয়েছিলেন (১৩)! একজন অগ্নিসংযোগকারী পরবর্তীতে ঘটনার স্মরণ করেছিলেন এভাবে – "কমপক্ষে একজনকে ভেতরে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, এমনকি তার অণ্ডকোষটিও পুড়ে গেছে!" (১৪)

উপত্যকায় ফিরে আসার কয়েকদিন আগে থেকেই ইয়াছরবের মানুষদের সতর্ক করা হয়েছিল যে, মুহাম্মদ রেগে আছেন। সেনাদের অগ্রবর্তী দলটি ইয়াছরিব পৌঁছে সংবাদ ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, 'ভন্ডরা' তাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল এবং ফিরে আসার সাথে সাথেই তিনি 'ভন্ড' বিশ্বাসীদের দেখে নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। খবরটি আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এমনকি 'মতবিরোধীদের মসজিদ' আগুনে পুড়ে যাওয়ার আগেও, সেনাদলের সাথে যুদ্ধে না যাওয়া সাতজন পুরুষ মুহাম্মদের মসজিদের ভেতরের খুঁটির সাথে নিজেদের বেঁধে রেখেছিল এবং ঘোষণা দিয়েছিল যে, তারা আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করতে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তাদের ক্ষমা না করা পর্যন্ত নিজেরাই এইভাবে আবদ্ধ হয়ে থাকবেন। তারা অলসতার কথা স্বীকার করেছে। তারা বিলম্বকারী ছিল, তারা পাপী ছিল, তবে তাদের অন্তরে ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রকৃত এবং আন্তরিক ভালোবাসা। যাত্রার ধুলায় আবৃত মুহাম্মদ যখন মসজিদের উঠোনে প্রবেশ করলেন এবং আবদ্ধ লোকদের সারিটি দেখলেন তখন তিনি বলেছিলেন, "আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তাদের ছেড়ে দেব না, তাদের ক্ষমাও করব না যদি না সর্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত আল্লাহ তাদের মুক্তি দেন!" (১৫)

তিনি এই বন্দিদের কয়েকদিন দুশ্চিন্তায় ফেলে রাখলেন এবং তারপরে এমন একটি আয়াত নিয়ে উপস্থিত হলেন যার মাধ্যমে পাপের কথা স্বীকার করে নেয়ার জন্য তাদের একটি ভালো কাজের প্রশংসা করা হয়েছিল। "তারা এমন একটি কাজকে মিশ্রিত করেছে, যা একদিকে অন্যায় আর অন্যদিকে নৈতিক ছিল। সম্ভবত আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (১৬)। এইভাবে তারাও নিজেদের সৃষ্ট বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেল।

আনুগত্যের পরীক্ষার মুহাম্মদীয় সংস্করণে, 'কারণ' এর পক্ষে মুমিনদের যুদ্ধে নামার দরকার ছিল। লড়াইয়ে যুক্ত হওয়া, হত্যা করা বা নিহত হওয়াই ছিল আনুগত্যের প্রমাণ; আর না যাওয়া ছিল অবিশ্বস্ততার প্রমাণ। মুহাম্মদের বেশিরভাগ অনুগামী তাবুক অভিযানে অংশ নিয়ে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। যারা অংশে নেয়নি তাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগপর্যন্ত লজ্জাজনক ও একঘরে আচরণের মতো একধরনের কঠিন পুনঃপ্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হতো; তারা মাথানত করে অনুতপ্ত হয়ে উপত্যকায় ফিরে আসতো। মসজিদে সাতজন আবদ্ধ থাকার এই সময়টায়, কেন সেনাদলে যোগ দেয়ার মুহাম্মদী আদেশ অমান্য করেছিল সেসবের কারণগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য প্রায় আশিজনের মতো একটি দল মুহাম্মদের কাছে এসেছিল।

তিনি ক্রুদ্ধ হাসি দিয়ে তাদের একবার শুভেচ্ছা জানালেন এবং অভিযানে তাদের অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য তাদেরকে সামনে বসালেন। "কী তোমাদের বিরত রেখেছিল?" – প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন। কয়েকজন ছাড়া সবাই বিস্তারিতভাবে অজুহাত দেখাতে লাগল। মুহাম্মদ তাদেরকে এই রকম একটা সতর্কবার্তা দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, তারা সত্য বলছে কিনা তা আল্লাহ অবশ্যই জানতে পারবেন। তিনি তাদের দাবিগুলো তদন্তের জন্য তার অনুসারীদের প্রেরণ

করলেন। তারা ফেরত এসে জানালো যে, তাদের মধ্যে ছত্রিশ জন মিথ্যা কথা বলেছে। জমজমাট মাহফিলের (জনসমাগম) মধ্যে একদিন মুহাম্মদ কর্কশ গলায় মিম্বার থেকে ঘোষণা করলেন, "তোমাদের মধ্যে মোনাফেক রয়েছে!" তিনি ছত্রিশ জনের নাম ধরে ডাকলেন এবং তাদেরকে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে প্রত্যেকে তাদের দেখতে পায় (১৭)। তাদের নাম ডাকার সাথে সাথে লোকগুলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল, কেউ কেউ তাদের মুখ ঢেকে রাখল। মুহাম্মদ জনতার সামনে তাদের অবাধ্যতার পাপকে নিন্দা করলেন এবং গুরুগম্ভীর স্বরে তাদের আদেশ দিলেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য । প্রকাশ্যে মোনাফেক হিসেবে উপস্থাপিত হওয়ার মূল বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসায় তারা তাদের পাপ স্বীকার করে নিল; কেউ কেউ কান্নাকাটি করল এবং মুহাম্মদের দিকে দু'বাহু প্রসারিত করে ক্ষমা প্রার্থনা করল।

যে তিনজন কোন অজুহাত ছাড়াই তার সাথে যেতে চায়নি, তাদেরকে দেয়া শাস্তির তুলনায় এই ছত্রিশ জনকে সবার সামনে তিরস্কার করা তুলনামূলকভাবে হালকা শাস্তি ছিল। সেই তিন ব্যক্তিকে যখন ডেকে আনা হয়েছিল, তারা স্বীকার করেছে যে তাদের কোনও অজুহাত নেই। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতার জন্য দোষী ছিল। যদিও তিনজনই অবিচল বিশ্বাসী ছিল, এবং পূর্ববর্তী অভিযানে অংশ নিয়েছিল, কিন্তু মুহাম্মদ তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন যে, আল্লাহ তাদেরকে সবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া/একঘরে করে রাখার আদেশ দিয়েছেন যার স্থায়িত্ব প্রায় দুই মাস। তাদের মধ্যে দুজন বেশিরভাগ সময় তাদের বাড়ির ভিতর কান্নাকাটি করত। কাব বিন মালিক নামের আরেকজন ধর্মান্তরিত ইয়াছরিব বাজারে যেতেন, নামাজ পড়তে মসজিদেও যেতেন, তবে তার আত্মীয়স্বজন সহ সকলেই তাকে এড়িয়ে চলত। তারা তার সাথে কথা বলতে, বা এমনকি তার দিকে ফিরেও তাকাতে চাইত না। তিনি যখন তাদের সাথে কথা বলতেন, তখন তারা অন্যদিকে তাকিয়ে থাকত। মনে হচ্ছিল যেন তার আর কোন অস্তিত্ব নেই। তিনি ভিড়ের মধ্যে থেকেও যেন ভূতের মতো সবার অলক্ষ্যে হেঁটে যেতেন। মসজিদে তিনি মুহাম্মদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সচেষ্ট থাকতেন, কিন্তু মুহাম্মদ এমনকি যদি তার দিকে তাকিয়েও থাকেন তবুও মনে হতো যেন তিনি অন্য দিকে তাকিয়ে আছেন। যন্ত্রণাকাতর প্রত্যাখ্যানের চল্লিশ দিন পরে, একজন দূত আরও শাস্তির সংবাদ নিয়ে তার (কাব বিন মালিকের) সামনের দরজায় কড়া নাড়ল। দূত বলল : মুহাম্মদ তাকে তার স্ত্রীর সাথে যৌনসম্পর্ক করতে নিষেধ করেছেন, সুতরাং তাদের আলাদা থাকতে হবে। এরকম পরিস্থিতি পঞ্চাশতম দিন অবধি অব্যাহত ছিল। তারপর কাব দূর থেকে শুনতে পেলেন, কেউ একজন চিৎকার করে বলছে : "আনন্দ কর, কাব!" যখন কাব এটি শুনলেন তিনি তখন বাড়ির ছাদে নামাজ পড়ছিলেন, এবং কি করতে হবে তা বুঝতেও পারছিলেন না। মসজিদের নিকটে একটি ছোট্ট পর্বত মাউন্ট সল (Mount Sal) এর চূড়া থেকে এই কণ্ঠস্বরটি ভেসে আসছিল। এই জায়গাটি খন্দকের যুদ্ধের সময় নজরদারির চৌকি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। খুব শীঘ্রই, কেউ তার সুসংবাদ প্রচারের জন্য তার সদর দরজায় উপস্থিত হল এবং বলল : সর্বশক্তিমান আল্লাহ মুহাম্মদকে জানিয়েছেন যে, কাব এবং অন্য দুজনকে ক্ষমা করা হয়েছে। কাব মসজিদে ছুটে গেলেন, যেখানে মুহাম্মদ তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অনুসারীদের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে নামাজের জায়গায় দু'পা ভাঁজ করে বসেছিলেন। তাদের অনেকে কাবের সাথে করমর্দন করে অভিনন্দন জানানোর জন্য লাফিয়ে উঠলেন। মুহাম্মদ তাকে বললেন, "তোমার মা তোমাকে জন্ম দেয়ার পর থেকে আজকের দিনটিকে জীবনের সেরা দিন গণ্য করে আনন্দ কর!" কাব এতটাই কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন যে, তিনি তার নিজের সমস্ত কিছু দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অর্পণ করলেন, যা তিনি খাইবার সহ অন্নান্য অভিযান ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মূলত গণিমতের মালের অংশ হিসেবে লাভ করেছিলেন। মুহাম্মদ প্রথমে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু তারপরে মালের কিছু অংশ গ্রহণ করলেন। "নিজের জন্য কিছু রাখো, এটি তোমার জন্য ভালো হবে" – মুহাম্মদ বললেন। কাব জবাব দিলেন, "আমি খাইবারের গনিমতের মালের অংশটি রাখব" (১৮)।

অভিযানে অংশ নেয়া বাতিল করা সত্ত্বেও মুহাম্মদ যথারীতি আবদুল্লাহ বিন উবাইকে একা রেখেছিলেন বা তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এটি সম্ভবত করা হয়েছিল মূলত তার সুপ্ত শক্তির ভয়ে। তাবুক থেকে মুহাম্মদের ফিরে আসার প্রায়

একমাস পরে, দৃশ্যত প্রাকৃতিক কারণে আবদুল্লাহর মারা যাবার পর এই সমস্যাটি এমনিতেই ঠিক হয়ে যায়। জানাজায় মুহাম্মদ তার জন্য দোয়া করলেন ঠিকই, কিন্তু শাহাদাতের ঢালকে দক্ষতার সাথে কাজে লাগিয়ে ইয়াছরিবে বেঁচে থাকা এই ঘোর ভন্ড বিশ্বাসীকে এভাবে সম্মানিত করার জন্য নিজেকে নিজেই লাথি মারলেন যেন মুহাম্মদ। মুহাম্মদ হয়তো গোপনে আবদুল্লাহর জন্য প্রার্থনার চালটি খেলেছেন, তবে কিছু প্রকৃত মুমিন অনুসারী আবদুল্লাহর মৃত্যুতে মুহাম্মদের এই দোয়া করা নিয়ে মুহাম্মদকে প্রশ্ন করেছিল (১৯)। **ফলস্বরূপ, মুহাম্মদ নিজের সমালোচনা করে কোরআনে একটি শ্লোক রচনা করলেন এবং আর এ জাতীয় ভুল না করতে নিজেকে প্রবোধ দেন : "আর তাদের মধ্যে যে মারা গিয়েছে, তার উপর তুমি জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের উপর দাঁড়াবে না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তারা ফাসিক (পাপাচারী) অবস্থায় মারা গিয়েছে"** (২০)।

মুহাম্মদ বাইজেন্টাইনদের তার সাথে যুদ্ধে জড়িত করার মূল লক্ষ্যটিতে ব্যর্থ হলেও তাবুক অভিযান মুহাম্মদকে উত্তর আরব জয় করতে সক্ষম করে। তিন বছর আগে যখন তিনি আবদুর রহমানকে খ্রিস্টানদের কাফেলা শহর ডুমাকে পরাধীন করতে প্রেরণ করেছিলেন তখন থেকেই এর শুরু হয়েছিল। মুহাম্মদের শাসন একেবারে মেনে না নেওয়া অব্দি ডুমার দক্ষিণ-পূর্বের গুরুত্বপূর্ণ গোত্র বানু তামিম (Tamims) এবং তাইয়িসের (Tayyis) উপর আক্রমণ চলতে থাকে। সবশেষে, কৃতিত্বের সাথে মুহাম্মদ এখন লোহিত সাগর এবং আকাবা উপসাগর থেকে শুরু করে উত্তর-মধ্য আরবের তামিম ও তায়ী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর অঞ্চলটি নিয়ন্ত্রণ করেন। **মুহাম্মদের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে চলে আসে প্রশাসক, কোরআনের শিক্ষক এবং কর আদায়কারীরা।**

তাবুকে সামরিক শক্তির প্রদর্শন গোটা আরবকে তার কাছে পদানত করতে ত্বরান্বিত করেছিল। তিরিশ হাজার লোক নিয়ে ইয়াছরিব থেকে যাত্রা করার আগে, গোত্র ও গোত্রের ক্ষুদ্র এক প্রতিনিধিদের দল কেবল তাকে শ্রদ্ধা জানাতে এবং ধর্মে যোগ দিতে বা জিজিয়া কর প্রদানে সম্মত হওয়ার জন্য ইয়াছরিবে এসেছিল। গ্রন্থে উল্লেখিত, এই 'প্রতিনিধিগণ' এমন একটি স্থির স্রোতে পরিণত হয়েছিল, যারা এখন মুহাম্মদের অভিযানের লক্ষ্যবস্তু যাতে না হয় তার জন্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। গল্পগুলিতে বলা হয় যে, পুরুষরা মসজিদের আঙ্গিনায় তাদের উট থেকে নেমে মুহাম্মদের হাত ধরে চুম্বন করতে ছুটে এসেছিল। যদিও তার সাথে যারা সম্মানের সাথে দেখা করতে চাইত তাদের তিনি অগ্রাধিকার দিতেন। তাছাড়া মুহাম্মাদ এই ধরনের অতি ভক্তিমূলক আচরণকে নিরুৎসাহিত করার মতো লোক ছিলেন না এবং জবুথবু টাইপের গোত্র-প্রতিনিধিদের কাউকে তিনি খালি হাতে ফেরাতেন না। অন্তত কিছু রৌপ্যমুদ্রা বা রুপার তৈরি অন্য কোন উপহার দিয়েই বিদায় দিতেন।

মুহাম্মদ চাটুকারিতার জন্য সদা উন্মুখ থাকতেন, এমনকি তার পূর্ব-শত্রুরাও জানত যে, তারা যদি মুহাম্মদের প্রশংসা করে তবে তারা তাঁর থেকে লাভবান হবে। মক্কার কবি কাব বিন জুহায়েরও তাকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ছড়া লিখে উপহাস করত। মক্কা বিজয়ের সময় মুহাম্মদ তাকে দেখামাত্র হত্যা করার নির্দেশ দেন। জুহায়ের দক্ষিণ-আরবে পালিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু যখন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে মুহম্মদের নাগালের বাইরে কখনও দীর্ঘসময় ধরে থাকা যাবে না, তখন তিনি অতীতের শত্রুতার জন্য ক্ষমা চাওয়ার জন্য ইয়াছরিবে দর্শনার্থীদের স্রোতে নিজেও যোগ দিলেন। মসজিদের আঙ্গিনায় জনতার এক মাহফিলে তিনি নিজেকে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করলেন এবং আবেগে বিগলিত এক গীতিকাব্য আবৃত্তি করে শোনালেন। সেই কবিতায় মুহাম্মদকে "সূক্ষ্ম ভারতীয় ইস্পাতের তৈরি, এক উজ্জ্বল আলোকদীপ্ত, ঈশ্বরের নিরাবরণ তলোয়ার" বলে বর্ণনা করেছিলেন (২১)। জুহায়ের শাহাদার ঢালে সুরক্ষা পেয়েছিলেন। চাটুকারি কবিতা দিয়ে তিনি মুহাম্মদের হৃদয়ে নিজের স্থান করে নেন।

আরব উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চল, যা ততক্ষণে মুহাম্মদের আগ্রাসন থেকে বহুলাংশে রক্ষা পেয়েছিল এখন এটিও তার ধর্ম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। **অতীতেও যেমনটা করেছিলেন মুহাম্মদ তেমনিভাবেই প্রতিরোধের ইচ্ছাশক্তি ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে তিনি শোক ও সন্ত্রাসের ভয় ছড়িয়ে দেয়ার কৌশলটি ব্যবহার করেছিলেন – 'জায়গায়ই জবাই করে হত্যা করা' -**

এটিই ছিল তার কৌশল। এই পর্বটি তাবুক অভিযানের তিনমাস আগে শুরু হয়েছিল যখন তিনি পার্বত্য অঞ্চলে একটি গোত্রের বিরুদ্ধে ঝটিকা আক্রমণের জন্য একটি লুটেরা দল পাঠিয়েছিলেন যেটি আজকের সৌদি আরবের আসির (Asir) প্রদেশ নাম পরিচিত। তারা ভোরের দিকে আক্রমণ করেছিল। মুহাম্মদের সেনারা যত সম্ভব মানুষকে হত্যা করল এবং একশো পঞ্চাশটি উট, তিন হাজার ছাগল এবং কিছু নারী বন্দি করে নিয়ে এলো। এরপরে আলী ইয়েমেনের একেবারে গভীরে সানার নিকটে একটি অভিযান চালাতে গিয়েছিলেন। তার অশ্বারোহী বাহিনী স্থানীয় গোত্রের সাথে সংঘর্ষে জড়ায় এবং কুড়িজন গোত্র লোককে হত্যা করে বিজয়ী হন।

কয়েক মাস পরে মুহাম্মদ আবারও জুরাশ (Jurash) নামে একটি প্রাচীন কাফেলা শহর এবং আসির অঞ্চলের বাণিজ্যিক কেন্দ্রে আক্রমণ করেন। এই হামলাটি মূলত মুহাম্মদের হয়ে সুরদ (Surad) নামের এক স্থানীয় গোত্রপতির হামলা ছিল, যিনি মুহাম্মদের আনুগত্যের জন্য ইয়াছরিবে গিয়েছিলেন। মুহাম্মদের পক্ষ হয়ে তার মুশরিক প্রতিবেশিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশনা নিয়ে তাকে ইয়েমেনে ফেরত পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তাকে বলা হয়েছিল যে, মুহাম্মদের জন্য তার গণিমতের মালের এক পঞ্চমাংশ রাখতে হবে। ইয়েমেনে ফিরে এসে সুরদ সেনাদল গড়ে তোলেন এবং পুরো একমাস জুরাশকে অবরোধ করে রাখেন। দেয়াল ভেঙে দিতে বা রক্ষকদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে না পেরে তিনি তার বাহিনীকে দৃশ্যত প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন বলে ভান করেছিলেন, কিন্তু মূলত তারা পাহাড়ে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তাদের চলে যাওয়া দেখে যখন নগরবাসী বেরিয়ে এলো তারপরেই আক্রমণ করে তাদের হত্যা করেছিলেন। মুহাম্মদ তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর আদেশ দিয়েছেন এই কথা জানার আগেই জুরাশ শহরের লোকেরা মুহাম্মদের কাছে একদল প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। এই প্রতিনিধি দলটি অবশ্যই সুরদের সাথেই পথ অতিক্রম করেছিল, যে সুরদ ততক্ষণে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে ইয়াছরিব থেকে ইয়েমেনে ফিরছিলেন। জুরাশের প্রতিনিধিরা যখন মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাত করছিল, সুরদ সেই মুহূর্তে তাদের লোকদের জবাই করছিল। মুহাম্মদ যখন তাদেরকে খবর (জুরাশের হামলা) দিলেন তখনই তারা তাদের শহরে ছুটে এসে দেখেন যে, তাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন ও গোত্র-প্রতিবেশিদের জবাই করা হয়েছে। তারপর দিশা না পেয়ে ইয়াছরিবে ফিরে এসে তারা মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করে (২২)।

প্রায় একই সময়ে মুহাম্মদ 'দক্ষিণাঞ্চলীয় কাবা' নামে খ্যাত যু খালসার (Dhu Khalasa) মন্দিরটি ধ্বংস করার জন্য আরেকজন ইয়েমেনি ধর্মান্তরিত অনুসারীকে পাঠিয়েছিলেন। যু খালসা আল-লাত দেবীর পুরুষ সমতুল্য ছিলেন এবং এই পবিত্র স্থানটি দক্ষিণ আরবদের অনেকের জন্য বার্ষিক তীর্থযাত্রার গন্তব্য ছিল। ইয়েমেনীয় সেই ধর্মান্তরিত অনুসারী বাজিলা (Bajila) গোত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ শেখ ছিলেন। এই গোত্রবাসী তাদের মন্দিরটির রক্ষণাবেক্ষণ করত। কেবলমাত্র তিন শতাধিক লোককে হত্যা করার পরেই বাজিলা উক্ত মন্দিরটি ধ্বংস করতে সফল হন। এই তিন শতাধিক লোক তাদের প্রিয় মন্দিরটির প্রতিরক্ষায় ছুটে এসেছিল।

এই সমস্ত পদক্ষেপের দ্বারা মুহাম্মদ সম্পূর্ণ ইয়েমেন অঞ্চলের ধর্মীয় এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিকে তার অধীনে নিয়ে আসেন, এবং ইয়েমেনের বাকী অংশগুলিও তাঁর শক্তিকে আমলে নিয়েছিল। এরপরে আলি বা খালিদকে কেবল অশ্বারোহী বাহিনীর সামনে শক্তি প্রদর্শন করতে হতো, আর তাতেই কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠী আত্মসমর্পণ করত; যেমনটা হয়েছিল খালিদের বেলায়। তিনি খ্রিস্টান অধ্যুষিত নাজরান শহরের দ্বারে পৌঁছে চিৎকার করে বললেন, "হে মানুষ, ইসলাম গ্রহণ করো, তোমরা নিরাপদ থাকবে" (২৩)।

খ্রিস্টান থাকার জন্য জিজিয়া কর প্রদানের মাধ্যমেই নাজরানের সমস্যার অবসান ঘটে, যদিও তাদেরকে মুহাম্মদের ধর্মপ্রচারক, মুহাম্মদের বিচারক এবং মুহাম্মদের কর আদায়কারীদের অনুপ্রবেশের প্রস্তাবকেও মেনে নিতে হয়েছিল। তখন থেকে ইয়াছরিব পরিদর্শন করতে আসা প্রতিনিধিদের কথাবার্তায় আলাদা আলাদা দক্ষিণ এবং পূর্ব অঞ্চলের দিকের উচ্চারণ মিশ্রিত হচ্ছিল। হিমিয়ার (Himyar), হাদারামাউট (Hadramaut), ওমান (Oman) ও বাহরাইনের (Bahrayn) শাসকরা

হাঁটু ভাঁজ করে মুহাম্মদের কাছে আসেন। যারা ধর্মান্তরিত হতেন তাদের তিনি দায়িত্ব দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর জন্য পাঠাতেন এবং তারা যখন যুদ্ধ করতেন, মুহাম্মদ তাদেরকে কাফের হত্যার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি পাঠাতেন। যেখানে লুটরাজই মুহাম্মদের ধর্মের সম্প্রসারণের মূল চালিকাশক্তি ছিল সেখানে সাফল্যের সাথে লুণ্ঠনের সুযোগ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল; কিন্তু বিজয়ের সাথে সাথে আসা করসমূহ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব এনে দিচ্ছিল। ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকার করা খ্রিস্টান এবং ইহুদিরা স্বর্ণ, রৌপ্য, কৃষিজাত পণ্য বা পণ্যদ্রব্যগুলির উপর প্রধানত শুল্ক প্রদান করত। ধর্মান্তরিতরা মুহাম্মদকে দাতব্য (charity) কর প্রদান করত, যদিও বাস্তবে এটি সাধারণ তহবিলে জমা হতো এবং এর বেশিরভাগই যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করতে খরচ হয়ে যেত। সময়ের সাথে সাথে, তার রাজস্বের ভারসাম্য লুণ্ঠন থেকে করের দিকে চলে যায়।

ইয়েমেনে আরও হামলা চালানো হয়েছিল, তবে এগুলি মূলত বিদ্রোহীদের পরিষ্কার করতেই পরিচালনা করা হয়েছিল। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মৃত্যুর এক বছর আগে মুহাম্মদ আরব উপদ্বীপের কার্যত শাসক ছিলেন এবং তার একেশ্বরবাদ ধরণটি সরকারি ধর্মে পরিণত হয়। ছনের তৈরি ছাদ এবং বিশাল প্রাচীর ঘেরা আঙ্গিনা সহ মুহাম্মদের কাঁচা মসজিদ এবং আবাসস্থল তাঁর রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।

মুহাম্মদ প্রায়শই তার সাফল্য নিয়ে গর্ব করতেন। বহু রীতিতে লিপিবদ্ধ আছে তিনি বলতেন : “আমাকে (শত্রুর অন্তরে) সন্ত্রাস দিয়ে বিজয়ী করা হয়েছে এবং আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম, তখন বিশ্বের ধন-সম্পদের চাবিগুলি আমার কাছে এনে রাখা হয়েছিল, আমার হাতে” (২৪)।

অধ্যায় - ৩৪

মধ্যস্থতা

সকল বিষয়ে মহাধ্যক্ষ সেনাপতি, বুক ভর্তি পদক আর ফিতা ঝুলিয়ে মুহাম্মদ তার কর্মজীবনে নিজেকে চমৎকার সব খেতাব প্রদান করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি নিজেকে দয়ালু, সত্যবাদী, লোকপ্রিয়, নির্বাচিত, সুসংবাদদাতা, আলোকিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রকাশ করেন যার কাজ হচ্ছে প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দুরীভূত করা। **এই উপাধিগুলো তিনি কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে নিজেকেই দিয়েছিলেন। কোরআনে এমন কোন সূরা পাওয়া প্রায় অসম্ভব যেখানে মুহাম্মদের নিজের সম্পর্কে এমন প্রশংসাসূচক দু'চার লাইন নেই। আর কর্মজীবনের মাঝামাঝি সময়ে মুহাম্মদ তাঁর আত্ম-প্রশংসার ব্যাপারে নিজেই একজন সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন। এমনকি তিনি তার সমালোচকদেরও হত্যা করছিলেন।** তিনি ইহুদিদের গণহত্যা করেছিলেন, তাদের ক্ষেত এবং বাগান তার বন্ধুদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং তার বিছানায় নারীদের তুলেছিলেন যাদের বরদের তিনি একটু আগেই হত্যা করেছেন। কিন্তু তবুও তিনি একজন নিখুঁত মানুষ, মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, এক সুমহান আদর্শ, মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের দয়া এবং আরো বহুবিধ বিশেষণের অধিকারী যেসব বিশেষণে তিনি নিজেই নিজেকে ভূষিত করেছেন। তার কর্মজীবনের শেষের দিকে, নিজের সম্পর্কে তার এই বিশাল ধারণা গ্রহের সীমানাও ছাড়িয়ে যায় যখন তিনি বলেন যে, কিয়ামতের দিন প্রথম তিনিই পুনরুত্থিত হবেন এবং ঈশ্বরের সামনে মানবজাতির অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিচারে নেতৃত্ব দেবেন। আর সেই দুর্ভাগ্যজনক দিনে তিনিই হবেন সুপারিশকারী যার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে (১,২)। এটা জানা যায় না ঠিক কবে থেকে তিনি নিজেকে একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ঘোষণা করতে শুরু করেন। কিন্তু ইসলামিক গ্রন্থ থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তিনি এর জন্য পরিকল্পনা করছিলেন এবং সেই লক্ষ্যেই কাজ করছিলেন যাতে যখন তিনি এই নতুন উপাধিটি (সুপারিশকারী বা মধ্যস্থতাকারী) ঘোষণা করতে পারেন। আর তখন যাতে এটি লোকদের মধ্যে বিস্ময়ের জন্মও না দেয়। এই প্রক্রিয়া শুরু হয় যখন তিনি ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ সবসময় তার নবী ও রাসূলগণদের নিজ নিজ অনুসারীদের জন্য একটি বিশেষ শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছেন। পূর্ববর্তী রাসূলগণ অস্থায়ী উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সেই ক্ষমতা বা ঈশ্বরের বার্তা ব্যবহার করেছিলেন, যেমন : নূহ নবী তার লোকদেরকে ধ্বংস করতে আল্লাহর কাছে আহবান করেছিলেন, যারা তাকে বিশ্বাস করেনি, যার ফলে মহাপ্রলয় ঘটেছিল। তবে মুহাম্মদ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তার অনুসারীরা সবচাইতে বেশি উপকৃত হবে যদি আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিনে সুপারিশকারীর ভূমিকা পালন করতে অনুমতি দেন। এর ফলে মুহাম্মদ তাদের পাপমোচনের জন্য আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারবেন। তিনি হবেন আল্লাহর আদালতে একজন ব্যারিস্টার, সুতরাং পাপীদের পক্ষ থেকে তিনি আবেদন করবেন (৩)।

এটা এমন একটি মর্যাদা ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা কেবলমাত্র একজন নবীকেই এটি দান করবেন যার শ্রেষ্ঠত্ব অন্যদের উপর ছিল। তিনি তার মিম্বার থেকে ঘোষণা করলেন যে, তিনি এমন একজন হতে চান যাকে আল্লাহ এমন সম্মানে ভূষিত করবেন। তিনি শেষ বিচারের দিনে তাদের জন্য (অনুসারীদের) সেবক হিসেবে থাকবেন। কিন্তু সেই কাজের জন্য তার দরকার সাহাবি বা অনুসারীদের সাহায্যের। এই কাজের জন্য বিশ্বাসীদের নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সন্তুষ্টির অর্জনের চেষ্টা করতে হবে (৪)। তিনি তার অনুসারীদের মোনাজাতের (প্রার্থনা) মধ্যে বলতে বললেন : "(হে আল্লাহ) দয়া করে মুহাম্মদকে জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তাকে প্রশংসা ও সম্মানের আসনে উন্নীত করুন (৫)।

তারপর একদিন তিনি ঘোষণা করলেন যে, ঈশ্বর তার ইচ্ছাকে সম্মান করেছেন। তিনি মুমিনদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছেন। এই ঘটনার মুহূর্ত সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থে অস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। সম্ভবত প্রথম ঘোষণাটি আসে যখন তিনি মূর্ছা থেকে বেরিয়ে আসেন, হয়তোবা তখন তার একজন স্ত্রী অথবা তার কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিল। ঠিক যেমন উত্তেজিত মাথা নাড়তে নাড়তে আয়েশার বিছানায় শুয়েই তিনি আয়েশাকে জানিয়েছিলেন যে, জয়নাবকে আল্লাহ বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন; তেমনিভাবে এবারও তিনি বললেন, "আনন্দ কর! আল্লাহ আমাকে কিয়ামতের দিনে সুপারিশের অধিকার দিয়েছেন!

বাইরে গিয়ে আমার লোকদের এই সুসংবাদটি দাও"। একটি সংস্করণে পাওয়া যায়, ঘোষণাটি আসে যখন তিনি মক্কা থেকে ইয়াছরিব ফিরছিলেন তখনই। সম্ভবত তিনি একটি ছোট তীর্থযাত্রার (উমরাহ) জন্য প্রায় এক হাজার বা তারও বেশি সঙ্গীদের সাথে নিয়ে ফিরছিলেন। মক্কা ও ইয়াছরিবের মাঝখানে জুহফা (Juhfah) পর্বতমালার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় মুহাম্মদ হঠাৎ তার উট থেকে নেমে গেলেন। তার অনুসারীরা বিস্মিত হয়ে তাকিয়েছিল, তখন তিনি আকাশের দিকে হাত তুলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন। তারপর তিনি নামাজ পড়লেন, দীর্ঘ সময় ধরে গভীরভাবে সেজদায় কপাল মাটিতে স্পর্শ করলেন। তার অনুসারীরা দর্শকের মতো দেখছিল। তিনি তিনবার এরকম করলেন । অবশেষে যখন তার অনুসারীরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তখন তাদের বললেন, "আমি আমার প্রভুর কাছে ভিক্ষা চেয়েছি, আমার লোকদের জন্য সুপারিশ করেছি এবং তিনি আমাকে আমার এক তৃতীয়াংশ লোকদের সুপারিশের অনুমতি দিয়েছেন, তাই আমি আমার প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। তারপর আমি মাথা উঁচু করে আমার লোকদের জন্য আমার প্রভুর কাছে আবার প্রার্থনা করলাম এবং তিনি আমাকে আমার লোকদের আরো এক তৃতীয়াংশ দিলেন, তাই আমি আমার প্রভুর প্রতি পুনরায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। তারপর আমি আবার মাথা উঁচু করে আমার লোকদের জন্য আমার প্রভুর কাছে ভিক্ষা চাইলাম এবং তিনি আমাকে অবশিষ্ট তৃতীয়াংশটিও দিলেন, আর তাই আমি আমার প্রভুর প্রতি পুনরায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম (৬)

শেষদিনে তার ভূমিকার দৃশ্য নির্মাণে মুহাম্মদের কল্পনাই কাজ করতে থাকে। ছোট ছোট দলভিত্তিক আলোচনায় তার ঘনিষ্ঠদের সাথে, নৈশভোজের সময়ে, যারা ইয়াছরিবে এসেছিলেন ধর্মগ্রহণ করতে তাদের সামনে অথবা রাস্তায় কথা বলার সময় কেয়ামতই ছিল তার কথা বলার বিষয়বস্তু। তিনি শেষদিনের কথা বলতেন এবং বিশ্বাসীদের কী কী লক্ষণ কেয়ামতের দিন ঘটবে তার বর্ণনা দিতেন :

মুহাম্মদ বলেন, এটা শুরু হবে যখন ফেরেস্তা ইসরাফিল একটি শিংগা বাজিয়ে ঘোষণা করবে যে, পুনরুত্থানের সময় এসেছে। এর শাব্দিক বিস্ফোরণ এত শক্তিশালী হবে যে পুরো সৃষ্টি জুড়ে তা শোনা যাবে। ততদিনে পৃথিবী এক নির্জন ধ্বংসাবশেষ হয়ে যাবে যেখানে প্রাণের এবং অন্য কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু আবভল্লাহর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সকল মৃতকে তাদের নিজ শরীরে পুনরুত্থান করা হবে এবং তাদের জন্মের সময় যেমন নগ্ন ছিল ঠিক সেই অবস্থায় তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। তাদের চেহারা মৃত্যর সময় যেমন ছিল ঠিক সেই সাদৃশ্যেই থাকবে। তাদের মৃতদেহ বিশাল এক সমভূমিতে পুনরায় একত্রিত করা হবে, যে সমভূমির দৈর্ঘ্য গল্পে বর্ণিত মাআরিবের বিখ্যাত হ্রদের চেয়েও হাজার হাজার গুণ বড় হবে। সমাবেশের স্থানটির একটি নাম আছে - হাশরের ময়দান। মুহাম্মদ সকলকে সেখানে 'জড়ো' করবেন। তিনিই প্রথম পুনরুত্থিত হবেন। তিনি উজ্জ্বল সবুজ রঙের পোশাক পরে আসবেন এবং তার মাথায় সবুজ পাগড়ি পরা থাকবে। **সারাজীবন তিনি যে শালীনতা প্রদর্শন করেছেন তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ, পুনরুজ্জীবিতদের মধ্যে একমাত্র তাকেই পোশাক পরিধানের অনুমতি দেয়া হবে।** তিনি আরাফাতের মতো একটি উঁচু পাহাড়ের উপরে দাঁড়াবেন, অথবা গর্বের সাথে প্রশংসা ও গৌরবের পতাকা বহন করে ঘোড়ায় চড়ে প্রবেশ করবেন, এটি তাকে ঈশ্বর প্রদত্ত জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার নিদর্শনস্বরূপ, এটিই আল্লাহর সিংহাসনের একমাত্র ধাপ।

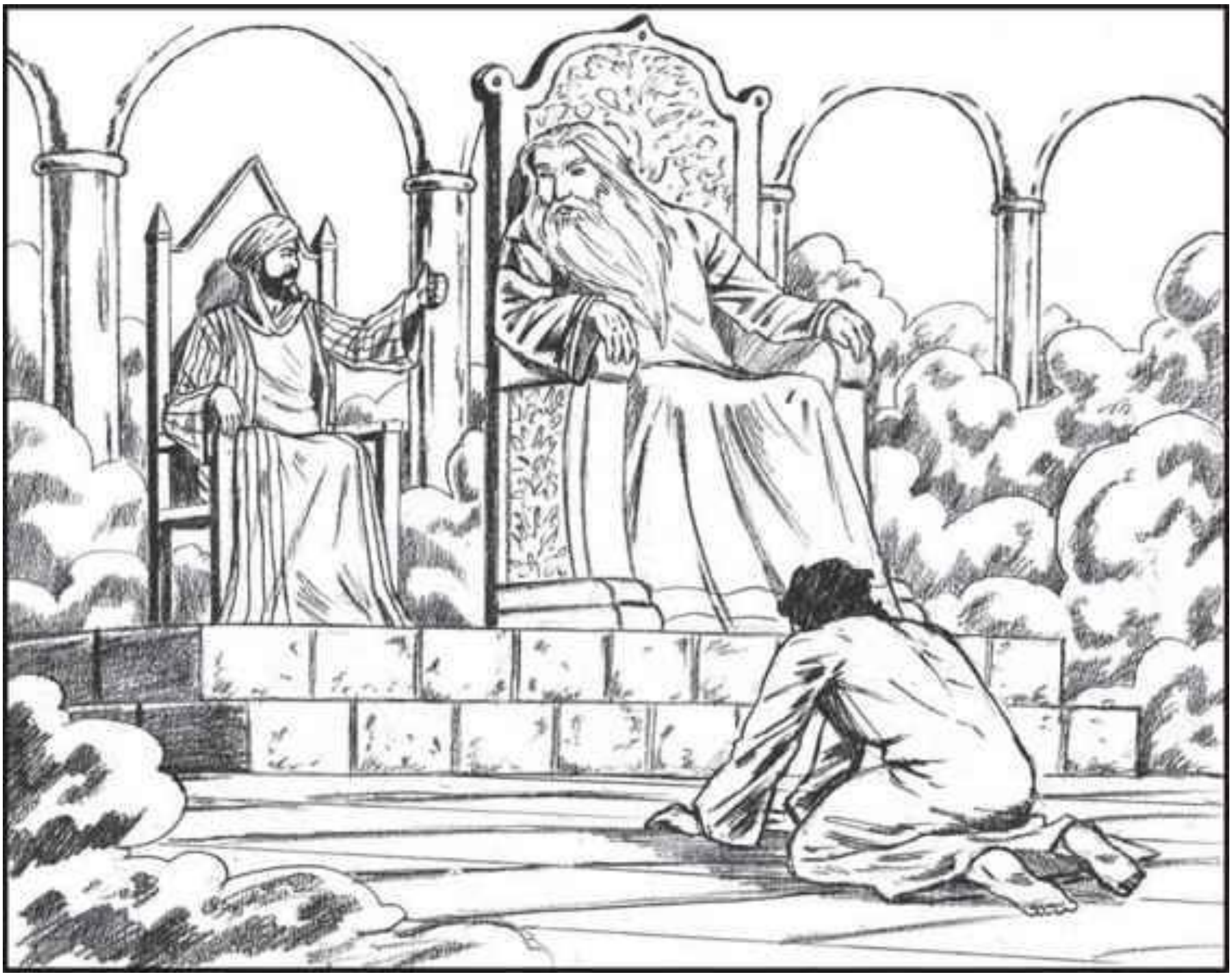
মুহাম্মদ এই ধরনের বিস্তারিত বর্ণনায় তার কল্পনার দৃশ্যপটে ভেসে ওঠা বর্ণনা যোগ করতে কখনোই বিলম্ব করেননি। এক ভোজসভায় তিনি একবার অন্যান্য নবীদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি তুলে ধরলেন এবং আদম থেকে যীশু পর্যন্ত সকল নবীর তালিকা তিনি একে একে প্রাকাশ্যে উচ্চারণ করলেন। এটি ছিল সাধারণ ভোজের পরিবেশন। একটি বিশাল চামড়ার চাদর মেঝেতে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল এবং অতিথিরা এর চারপাশে পা ভেঙে বসেছিল। তাদের সামনে মাংস, রুটি এবং স্যুপ পরিবেশন করা হয়। যখন মুহাম্মদের সামনে তার প্রিয় খাবার ছাগলের পায়ের রোস্ট পরিবেশন করা হলো। তিনি তা হাত দিয়ে ধরে দাঁত দিয়ে মাংস ছিঁড়ে চিবিয়ে খাচ্ছিলেন আর কথা বলছিলেন। আবার শেষ বিচারের বিষয়টি উঠে এলে এবং অতিথিরাও আগ্রহের সাথে তাঁকে অন্যান্য নবীদের বেলায়ও কি তাদেরকে সুপারিশের অধিকার দেয়া হবে কীনা

সেই প্রশ্ন করতে লাগল। তাদের কী সুপারিশ করার অধিকার থাকবে না? মাংস চিবিয়ে খাওয়ার সময় একটু থেমে মুহাম্মদ মাথা নেড়ে বললেন, "কিয়ামতের দিন আমি সকল মানবজাতির নেতা হবো।" চারপাশে তাকিয়ে অতিথিদের উদ্দেশ্যে তারপর বললেন, "কেন হবো তোমরা কি তা জানো?" যখন বিভ্রান্ত অতিথিরা কিছুই বলল না, মুহাম্মদ তাদের শিষ্টাচারের অভাবে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধির সাথে কথা বলার একটা শিষ্টাচার আছে তো! বিরক্ত হয়ে মুহাম্মদ বললেন, "তোমরা কেন জিজ্ঞেস করছ না যে, সেটা কিভাবে হে আল্লাহর রাসূল?" তখন তাঁর অনুগত অতিথিরা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, সেটা কিভাবে হবে?"(৭) এইবার মাংসে আরেকটি কামড় দেয়ার পর তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, অন্যান্য নবীরা অধীর আগ্রহে তাঁর কাছে তাদের নিজেদের উম্মতদের জন্যেও সুপারিশ করবে, কারণ আল্লাহ তাকে তাদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এর মানে দাঁড়াচ্ছে তিনি আদমের সকল সন্তানদের পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন, শুধুমাত্র তার অনুসারীদের জন্যই নয়। আসলে, আদম সন্তানের অর্থ হচ্ছে সকল মানবজাতি, যেহেতু প্রতিটি মানবই এক আদম থেকেই এসেছে। তবে বিনয়ের সাথে তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনিই একমাত্র সুপারিশকারী হবেন না; তিনি কেবল প্রথম হবেন এবং তাকে সর্বোচ্চ সংখ্যক সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। তারপরে অন্যান্য নবীদের সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে, যেমন : ফেরেস্তা, এবং এমনকি সাধারণ মানুষকেও এই ক্ষমতা দেয়া হবে যারা তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য সুপারিশের অধিকার অর্জন করবে, যারা আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে আহত হয়েছে অথবা যুদ্ধের সময় নিহত হয়েছে।

তিনি তার শ্রেষ্ঠত্ব কিভাবে দেয়া হবে তার একটি বর্ণনা দেন এভাবে : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার শেষ বিচার বিলম্বিত করবেন এবং আল্লাহ এটি করবেন সবার মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আদি পিতা আদমের সন্তনের সময় পর্যন্ত সকলেই তাদের ভাগ্য জানার জন্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকবে। আল্লাহ সূর্যকে কাছাকাছি নিয়ে আসবেন, যার ফলে লোকেরা এমনভাবে ঘামবে যে এ রকম আগে কখনো ঘামেননি। তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে এই ভেবে যে, এই বিলম্বের মানে হচ্ছে আল্লাহ তাদের উপর রেগে আছেন। এর ফলে তারা আদম থেকে শুরু করে অন্যান্য নবীদের কাছে তাদের হয়ে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার দরখাস্ত করবে।

মুহাম্মদ গল্পের এই অংশটি বলতে ভালোবাসতেন যে, মানুষ ভয়ে তটস্থ হয়ে আদমের কাছে গিয়ে বলবে "হে আদম, আপনি মানবজাতির পিতা। আল্লাহ আপনাকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন, নিঃশ্বাসের মাধ্যমে আপনার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেস্তাদেরকে আপনার উদ্দেশ্যে সেজদা করার আদেশ দিয়েছেন। আপনার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, আমরা কি বিপদে আছি?" কিন্তু আদম তাদেরকে ফিরিয়ে দেবেন। আল্লাহর কথা অবাধ্য হয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার জন্য তার নিজের ভেতরে সমস্যা আছে, তাই তিনি লোকদের নূহের কাছে যেতে বলবেন। কিন্তু নূহও পিছিয়ে যাবে, একে একে তারা আব্রাহাম ও মুসার কাছেও দয়া ভিক্ষা চাইবে। মুসা দাবি করবেন যে তার নিজেরই কিছু সমস্যা আছে, কারণ তিনি একবার দুর্ঘটনাবশত এমন একজনকে হত্যা করেছিলেন যাকে ঈশ্বর হত্যা করার আদেশ দেননি। তিনি জনগণকে যীশুর কাছে যেতে বলবেন, কিন্তু যীশু তাদের 'অন্য কারো' কাছে যেতে বলবেন। তিনি শেষে বলবেন : "মুহাম্মদের কাছে গেলে ভালো হবে"(৮)।

মুহাম্মদ আরো বলেন : একবার যখন অন্য নবীরা তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেবে তিনি তখন সবুজ পোশাক এবং সবুজ পাগড়ি পরে হাতে আল্লাহর প্রশংসা ও গৌরবের ব্যানার বহন করে প্রবেশ করবেন। এই সময় তিনি হয় ঘোড়ায় চড়ে আসবেন, নয়তো আরাফাতের পাহাড়ের মতো কোন পাহাড়ের উপরে হাজির হবেন। তিনি আদমের সকল সন্তানদের উপর নেতৃত্ব দেবেন (৯,১০,১১)।



[আপনি কি বলেছেন, মুহাম্মদ? মুহাম্মদ প্রচার করেন যে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাকে সকল মানুষের জন্য সুপারিশ করার অধিকার দিয়েছেন, যখন মানুষকে তাদের জীবন যাপনের জন্য হিসাব দিতে হবে এবং বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। মুহাম্মদই প্রথম পুনরুত্থিত হবেন। কিছু সংস্করণে পাওয়া যায়, জান্নাতের সংকল্প নির্ধারণে তিনি সাহায্য করার জন্য আল্লাহর ডান পাশে বসবেন। শেষ এবং সর্বশেষ নবী হিসেবে জাহান্নামের শাস্তি থেকে পাপীদের মুক্তি পাওয়ার জন্য তার ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হবে]।

একটা পুল আছে যেটাকে বলা হয় পুলসিরাত। এখানে সব খারাপ মানুষ থেকে ভালো মানুষদের আলাদা করা হবে। মুহাম্মদ বিদুৎ গতিতে সেই সেতু অতিক্রম করবেন যেখানে তার জন্য জান্নাত ধার্য করা হয়েছে, কিন্তু এই সেতু বিশ্বাসঘাতক ও পাপীদের জন্য ফাঁদে পরিণত হবে - এই কথা তিনি তার শ্রোতাদের বললেন। পাপীদের জন্য পুলসিরাত হবে ধারালো চাকুর মতো যা মানুষকে কেটে ফেলবে এবং নিচে থাকা আগুনের গর্তে ফেলে দেবে। মানুষ যাতে নিচে পড়ে না যায় তাই দুই হাত, পা দিয়ে ধরে ধরে পার হতে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না; তাদেরকে ধরে ধরে ফেলে দেয়া হবে আগুনে।

যারা মূর্তিপূজা করেছে তাদেরকে বিশেষভাবে কেটে জাহান্নামের আগুনে ফেলা হবে যেখানে তাদেরকে অনন্তকালের জন্য পুড়িয়ে ভুনা করা হবে, কিন্তু মুহাম্মদের সুপারিশের মাধ্যমে অন্যদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে (১২)।

যদিও তাদের শাস্তি পাওনা থাকবে তবুও মুহাম্মদ আল্লাহর কাছে তাদেরকে ছেড়ে দিতে প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ তার প্রার্থনা গ্রহণ করবেন, তবে তাও কেবলমাত্র প্রথম সত্তর হাজার লোকের জন্য। আর তিনি বিশেষ করে তাদের জন্য নির্মিত দরজা দিয়ে তাদের বেহেশতে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। সেই সত্তর হাজার লোক হবে সেই সকল মুমিন যারা পুলসিরাত পার হতে পারবে। তাদের পার হতে অনুমতি দেওয়া হবে, কারণ আল্লাহ আগে থেকেই জানতেন যে মুহাম্মদের আর্জির ভিত্তিতে তাদের ক্ষমা করা উচিত। কাজেই, সেই সত্তর হাজার মুমিনকে তাদের কাজের কোন প্রকার জবাবদিহিতা ছাড়াই সেই দরজা দিয়ে বেহেশতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। এরপর আসবে আসল ঘটনা। মুহাম্মদ পুলসিরাত পার হবার সময় ছিটকে যাওয়া আরো অনেক পাপীকেই বাঁচাবেন।

এরা হলো সেই সকল মানুষ যাদের আল্লাহ আর তার রাসূলের উপর এক শস্যদানা কিংবা অনু পরিমাণ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু অনন্তকালের দুর্ভোগ না হলেও এই জীবনে যাদের কাজ শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল। তাদের দোযখের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, এবং এটি স্বল্প সময়ের জন্যও নয়। পরকালের একটি দিন এই দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। কাজেই, তারা দোযখে শুধুমাত্র একদিনের সাজা ভোগ করলেও তা সময়ের বিচারে এই দুনিয়াতে প্রাপ্য সাজার সহস্রগুণ হবে। তাদের শরীর ভুনা করে কয়লা বানানো হবে, আর পুনরায় কয়লা বানাতে তাদের আবারো সৃষ্টি করা হবে। শরীরের প্রতিটি অংশ আগুনে ভস্মীভূত হবে, একমাত্র নামাজের সময় সেজদা দেয়ার সময় কপালের কালো চিহ্নটি ছাড়া। শুধুমাত্র নামাজে সেজদা দেয়া কপালসমূহ এই আগুন থেকে ছাড় পাবে। তবে পুরো কপাল নয়, কেবলমাত্র গোলাকার মুদ্রার সমান যেই অংশটি মাটিতে স্পর্শ করেছে সেই জায়গাটি। কপালে নামাজের সেই চিহ্নসমূহ তাদের ক্ষমার যোগ্য পাপী হিসেবে পরবর্তীতে চিহ্নিত করবে (১৩)

মুহাম্মদ তার শ্রোতাদের বলতেন যে যখন সুপারিশের সময় আসবে, তখন তিনি আল্লাহর সিংহাসনের সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়বেন এবং পাপীদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করবেন। তার অবস্থা দেখে আল্লাহ বলবেন, "মাথা তুলুন, কথা বলুন এবং আপনার কথা শোনা হবে, সুপারিশ করুন এবং আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে"। (১৪) কিছু সংস্করণে মুহাম্মদ আল্লাহর পাশে সিংহাসনে বসে থাকবেন বলা হয়েছে - যেটি প্রশংসা ও গৌরবের আসন (১৫)।

মুহাম্মদকে সুপারিশ করার সম্মান দেওয়া হলেও, তা মুক্তির নিশ্চয়তা দেবে না। আল্লাহ যার উপর তার সন্তুষ্ট হবেন তাকেই দয়া দেখাবেন, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে আল্লাহরই নির্দেশে দোযখ হতে কাউকে কাউকে তুলে আনা হবে। সেই মুহূর্তে ঐ দোজখবাসীর শরীর পুড়ে কংকাল বা কয়লা যাই হোক না কেন, ফেরেস্তারা তাদের জীবনদায়ী নদীর কাছে নিয়ে যাবে। সেখানকার পানি নিয়ে তাদেরকে মানুষের রূপে পুনর্জীবন দেয়া হবে। সেখান থেকে তাদের বেহেশতে যেতে দেয়া হবে, তবে তাদেরকে সবচেয়ে নিচের দরজা দিয়ে সেখানে প্রবেশ করতে হবে আর বেহেশতের একেবারে নিচু স্তরে তাদের রাখা হবে।

গল্পের একেবারে শেষটি বলার সময় সর্বদাই মুহাম্মদ সরে আসতেন। এই অংশটি ছিল দোজখ থেকে সর্বশেষ বেরিয়ে আসা মানুষের গল্প, দোযখের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়া শেষ মানুষটির গল্প। সে দোজখের গর্ত থেকে বেরিয়ে আসবে, এবং কেবল তার দেহ ফিরে পেয়ে সন্তুষ্ট হবে কি না এবং আরও কোনও শাস্তি থেকে রেহাই পেতে চায় কিনা এমন প্রশ্ন করে আল্লাহ তার সাথে কিছুটা মজা করবেন। যখন সে উত্তর দেবে "হ্যাঁ" তখন আল্লাহ বলবেন, "এই অনুগ্রহ যদি মঞ্জুর হয় তবে কী তুমি আরও কিছু চাইবে?" লোকটি আরও কিছু চাই না বলে জানাবে আর বলবে "আর কোন নির্মম যন্ত্রণা পেতে চাই না, এবং এটিই যথেষ্ট; আপনাকে ধন্যবাদ।" জীবন নদীতে তার দেহ পুনরুদ্ধার (অর্থাৎ, দোজখের আগুনে পোড়া দেহ স্বাভাবিক হওয়া) হওয়ার পরে আল্লাহ তাকে জান্নাতের দরজার দিকে যেতে অনুমতি দেবেন, কিন্তু তাকে প্রবেশ করাবেন না। এটি লোকটির হৃদয়কে ব্যথিত করবে, কারণ দাঁড়িয়ে থেকেই মুক্তোর মতো দরজার ও প্রান্ত থেকে "জীবন, সুখ এবং

জান্নাতের আনন্দ" এর এক ঝলক সে দেখতে পাবে। তাকে সেখানে প্রবেশ করতে না দেয়ার কারণে সে এতটাই বিক্ষত হয়ে যাবে যে সে চিৎকার করে বলবে, "হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান"। আল্লাহ বলবেন, "হে আদম সন্তান! তুমি কত বড় বিশ্বাসঘাতক! তুমি কি চুক্তি করোনি এবং প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে তারচেয়ে বেশি কিছু চাইবে না?" জাহান্নাম থেকে উঠে আসা এই শেষ মানুষটি এবং তার ঈশ্বর আল্লাহ তখন দরকষাকষি করতে থাকবে। লোকটি আরও কিছু চাইতে থাকবে। এসবের পর, লোকটিকে অবশেষে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে এবং আল্লাহ তাকে বলবেন যে, সবচেয়ে নিচুস্তরের প্রাণীটির প্রতি আল্লাহর রহমতের নিদর্শন স্বরূপ সে যা চেয়েছে তার চাইতে দশগুণ বেশি সে পেতে পারে। এই নিচু প্রাণীর স্পষ্টতই জায়গা জমির একটি বড় ক্ষুধা রয়েছে, কারণ সে আল্লাহকে বলবে যে, পৃথিবীর মতো তার নিজের জন্য অনেক জায়গা সে চায় এবং আল্লাহও তখন প্রফুল্লচিত্তে তাকে পৃথিবীর আকারের দশগুণ সমান জায়গার জান্নাত দান করবেন! এটি গল্পের চুম্বক অংশ ছিল, এবং মুহাম্মদ এ পর্যায়ে একটি দিলখোলা অট্টহাসি দিয়ে তার মাথাটি পেছনে ঝোঁকোলেন। তারপর গল্পটি সবাই বুঝতে পেরেছে কিনা তা দেখার জন্য চারপাশে তাকালেন। একেবারে নিচু স্তরের নিচু ব্যক্তিকে সবচেয়ে নিচু মানের স্বর্গে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। এবং সবচেয়ে নিম্নতম জান্নাতটিও দোজখ থেকে উঠে আসা শেষ মানুষটার কাছে বিশাল হবে - পুরো দুনিয়ার তুলনায় তা দশগুণ বড় হবে! (১৬) কথাটা বলেই মুহাম্মদ আবার মাথা পেছনে হেলিয়ে দিলেন এবং অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন।

আদমের সন্তানদের অনেকেই অনন্তকালের আগুনে জ্বলবে, এবং তাদের রক্ষা করতে মুহাম্মদ কোন হস্তক্ষেপ করবেন না। এরা হচ্ছে বহুশ্বরবাদী, মোনাফেক, বিদ্বেষী। মুহাম্মদ জাহান্নাম থেকে কোন বহুশ্বরবাদীকে রক্ষা করবেন না, এমনকি তার মা বা দয়ালু আবু তালিবের (মুহাম্মদের চাচা) জন্যও সুপারিশ করেবন না। এই সেই আবু তালিব যিনি তাকে পুত্রের স্নেহে দেখাশোনা করেছেন যখন তার কেউ ছিল না, এবং তাকে ছেলের মতো লালন-পালন করেছিলেন। তিনি জানিয়ে দিলেন যে, তবে তিনি আবু তালিবকে জাহান্নামের গভীরতা থেকে উঁচু স্থানে উন্নীত করার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন যেখানে তার গোড়ালি পর্যন্ত পুড়ে যাবে। এর ফলে তার মাথার ঘিলু পর্যন্ত গলে যাবে, কিন্তু তবুও অন্যদের চেয়ে তার জন্য নির্ধারিত এই শাস্তিটা অনেক কম বেদনাদায়ক (১৭)। মুহাম্মদের মায়ের ক্ষেত্রে কোন আশা (মুক্তির) নেই, কারণ তিনি পৌত্তলিক হয়েই বেঁচেছিলেন এবং সে অবস্থায়ই মারা গিয়েছিলেন (১৮)।

খ্রিস্টান ও ইহুদিদের জন্য জাহান্নাম বরাদ্দ ছিল, যদিও সম্ভবত যীশু ও মুসার সুপারিশে তারা উপকৃত হবে। মুহাম্মদের হিসেব অনুযায়ী, যীশু ও মুসা দ্বিতীয় অবস্থানে থাকবেন। তারাও বিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে ঈশ্বরের কাছে সুপারিশ করার অধিকার পাবেন, কিন্তু তাও মুহাম্মদের সুপারিশ শেষ করার পরই। অন্যদের মতো, ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের জাহান্নামের উপরের জ্বলন্ত সেতু পার হওয়ার সময় জ্বলন্ত গর্তে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে না, কিন্তু তৃষ্ণা মেটানোর আশায় জলের মরীচিকার দিকে ছুটে যাওয়ার সময় এরা ইঁদুরের মতো (lemmings) খাড়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে পড়তে থাকবে। মুহাম্মদ মরীচিকার চিত্রটি রচনা করেছিলেন, কেননা তিনি মনে করতেন খ্রিস্টান এবং ইহুদিরা মিথ্যা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে না জেনে মরীচিকার পেছনে দৌঁড়েছে। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস, যীশু ঈশ্বরের পুত্র যা এক ধরনের মূর্তিপূজারই নামান্তর। মুহাম্মদ খ্রিস্টান বিশ্বাসের এই অযৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে কখনোই ক্লান্ত হননি। তিনি বলেন : যেখানে ঈশ্বরই একজন একক সত্তা সেখানে কিভাবে তার পুত্র বা স্ত্রী থাকতে পারে? (১৯) তিনি ইহুদিদেরকে তাদের একজন নবী উজাইরকেও (Uzayr) আল্লাহর পুত্র হিসেবে পূজা করার জন্য অভিযুক্ত করেন। এর জন্য তাদেরও শাস্তি দেয়া হবে (২০)।

মুহাম্মদ তার কাহিনীটি শেষ করেন এভাবে : যখন শেষ বিচারকার্যটাও শেষ হবে, যখন সকলে জান্নাতে তাদের স্থান দখল করে নেবে, যখন শেষ ব্যক্তিটিকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করা হবে, যখন জাহান্নামে আর কাউকে পাঠানো হবে না তখন

মুহাম্মদ জান্নাতে তার নিজের স্থানটি গ্রহণ করবেন। তার কক্ষটি হবে সপ্তম স্বর্গের শীর্ষস্থানে, অন্যান্য নবীদের (স্বর্গের) উপরে এবং আল্লাহর সিংহাসনের কাছাকাছি।

সেখানে তিনি অনন্তকাল থাকবেন।

অধ্যায় ৩৫
বিদায় হজ্ব

মুহাম্মদ এখন আধিপত্য বিস্তার করছেন আরব উপদ্বীপের বেশিরভাগ অঞ্চলেই। এর মানে হচ্ছে, তিনি তীর্থযাত্রাকেও নিয়ন্ত্রণ করছেন, তবে তিনি এখনও সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। তিনি তখনও মুশরিকদের বাকী অংশকে তার একেশ্বরবাদের চর্চায় রূপান্তর করার ক্ষেত্রে নানান বাধার মুখোমুখি ছিলেন।

মুহাম্মদের এই পুনরাবিষ্কার বহু বছর আগেই শুরু হয়েছিল যখন তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, মক্কার মন্দিরটি আল্লাহর ঘর হিসেবে ইব্রাহিম এবং ইসমাইল নির্মাণ করেছিলেন, এবং এই নতুন ধারণা চলতে থাকে যখন তিনি সাফা এবং মারওয়ায় কৃত ধর্মীয় রীতিনীতিতে সংস্কার আনেন। তবে তাতে আরও ঘষামাজার দরকার ছিল। চান্দ্রবর্ষ পরিক্রমার শেষ মাসে অনুষ্ঠিত বার্ষিক তীর্থযাত্রা (হজ্ব) এখন মক্কা থেকে আরাফাত পর্বতের উপত্যকা ছাড়িয়ে বারো মাইল পূর্বে মুজদালিফা ও মিনার পাহাড় এবং সমভূমি সহ মক্কার নিকটবর্তী তীর্থস্থানগুলি পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। সূর্য উপাসনার নিয়মকানুন - সূর্য ওঠা ও অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে তীর্থযাত্রীদের স্থান ত্যাগ করা, কোরবানির পশুদের জবাই করা এবং স্তম্ভে প্রস্তর নিক্ষেপ করা - এ সবই এখন আব্রাহামিক (মুহাম্মদ যেটাকে আব্রাহামের ধর্ম বলে দাবি করেছেন) ধর্মের মিশে গিয়ে নতুনভাবে পালিত হতে লাগল।

পরের বছরের শুরুতে বিভিন্ন গোত্র হতে আগত বিশ্বাসীদের নিয়ে গড়ে ওঠা মুহাম্মদের কথিত শ্রেষ্ঠ ধর্মের সেরা অনুসারীরাই কেবল তীর্থযাত্রায় অংশ নিতে পারবে - মুহাম্মদের নয়া ফরমান। মুশরিকরা (ঈশ্বরের সাথে অংশীদার স্থাপনকারী বা মূর্তিপূজারী) অশুচি এবং জাহান্নাম তাদের জন্য নির্ধারিত, সুতরাং জান্নাতের জন্য প্রচেষ্টারত খাঁটি মুমিনদের (মুহাম্মদের অনুসারী) জন্য তাদের সাথে মেশা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আলী প্রত্যেক পাহাড়ে তীর্থযাত্রীদের অবস্থান শিবির থেকে তীর্থযাত্রা বিষয়ক নতুন নিয়ম ঘোষণা করলেন যেখানে মুশরিকদের কেবল সেই বছর তীর্থযাত্রা শেষ করার জন্য চার মাসের অনাক্রম্যতা (যুদ্ধবিরতি) মঞ্জুর করা হবে। কিন্তু অনুগ্রহকালীন সেই সময়ের পরে, এমনকি পবিত্র মাসেও, পুরো আরবে তাদের আর কোন নিরাপত্তা থাকবে না যদি না তারা ধর্মান্তরিত হয়। এই হুমকিকে আল্লাহর কর্তৃত্বের স্মারক হিসেবে তুলে ধরার জন্য আলী নতুন নীতিমালা ঘোষণার মাধ্যমে মুহাম্মদ রচিত একটি কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করেন : "অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে (ওত পেতে) বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"। মুহাম্মদের রচিত অনেকগুলো আয়াতের মতোই এই আয়াতটিও সেই চিরাচরিত স্তুতি দিয়েই শেষ হয়েছে - "আল্লাহ সততই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (১)।

মুহাম্মদের নতুন তীর্থযাত্রা নীতি ঘোষণার এক বছর পরে, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে চূড়ান্ত পরিবর্তনটি আনা হলো। এখন যেহেতু তীর্থযাত্রা 'মুশরিক-মুক্ত' হয়ে গেছে সুতরাং মুহাম্মদ ঘোষণা করলেন যে, হজ্বযাত্রার (তীর্থযাত্রা) জন্য ইহরাম বাঁধতে তিনি প্রস্তুত। সে বছরেরই মার্চ মাসে মুহাম্মদ মদিনা থেকে দক্ষিণ দিকে (যেহেতু মদিনা থেকে মক্কা দক্ষিণ দিকে) দীর্ঘ যাত্রা করলেন এবং সঙ্গে নিলেন হাজার হাজার তীর্থযাত্রীদের (যারা সবাই তাঁর সাহাবি)। এই সফরে পর্দাবৃত হাওদায় তার সকল স্ত্রীরা সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন, আর সাথে ছিল অসংখ্য আত্মীয়স্বজন এবং তার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সহচর ও তাদের পরিবারবর্গ। পুরো অঞ্চল থেকেই তীর্থযাত্রীরা ইয়াছরিবের দক্ষিণের একটি উপত্যকায় 'পবিত্র' হতে তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল, যেখানে তারা দু'প্রস্ত সাদা পোশাক তথা ইহরাম পরিধান করল - একটিকে কোমরের চারপাশে মুড়িয়ে, অন্যটি শরীরের উপরের অংশের চারপাশে আলতোভাবে জড়িয়ে। যেহেতু তীর্থযাত্রার সময় পাগড়ি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তাই উকুন

এবং ধুলা থেকে দূরে রাখতে মুহাম্মদ তাঁর স্ত্রীদের চুলে বেণী করালেন এবং তার নিজের চুলে সুগন্ধি মাখালেন। মুহাম্মদ কোরবানির জন্য একশো উট নিয়ে আসেন, যার মধ্যে একটি ছিল তার ব্যক্তিগত পশু, আর অবশিষ্টগুলো ছিল অন্যান্য লোকের জন্য। কোরবানির পশুর রক্ত সর্বদা পৌত্তলিক আচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল, কিন্তু মুশরিকদের দেবদেবীদের নামে পশু জবাই করার পরিবর্তে এখন সেই পশুর রক্ত একমাত্র আল্লাহর নামে উৎসর্গ করা হলো। আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনস্বরূপ আব্রাহামের প্রিয় ছেলের রক্ত উৎসর্গের ইচ্ছা প্রকাশের স্মরণে এটি (কোরবানি) এখন করা হলো। মুহাম্মদ তার কোরবানির প্রস্তুতির অংশ হিসেবে উটের রক্ত বের না হওয়া পর্যন্ত কুঁচকির একদিকের লোমগুলো তুলে ফেললেন, গলায় চটিজুতো এবং অন্যান্য অলঙ্কার বেঁধে তার কুরবাণীর পশুকে চিহ্নিত করলেন (২)। মুহাম্মদ যখন তার মঞ্চ থেকে রওনা হলেন সেই সময় তার চারপাশে দাঁড়িয়ে অথবা উটের পিঠে চড়ে অনেক লোক চিৎকার করে মুশরিকদের তীর্থযাত্রার শ্লোগানটাই দিচ্ছিল কান্নাজড়িত কণ্ঠে : "আমি এখানে আপনার সেবায় আছি, ও প্রভু, আমি এখানে আপনার সেবায় আছি"।

মুহাম্মদ যখন মক্কায় পৌঁছলেন ইতোমধ্যেই তখন মক্কা মরুভূমির মাঝে এক ব্যস্ত নগরে পরিণত হয়ে গেছে। ইসলামিক গ্রন্থ অনুসারে, সেই বছর সমগ্র আরব অঞ্চল থেকে চল্লিশ হাজার লোক জড়ো হয়েছিল। যেহেতু এই তীর্থযাত্রা এখন নতুন অর্থ বহন করছে এবং নতুন পদ্ধতি এখন সম্মিলিতভাবে একটি নতুন যুগের সূচনা করছে, তাই তীর্থযাত্রীরা মুহাম্মদের নেতৃত্ব অনুসরণ করছিল এবং তার প্রতিটি নির্দেশ অনুকরণ করে মেনে চলছিল। ঈমানদার মুমিনরা তার সুন্নাহকে বিশ্বাস করত - তিনি যা কিছু করতেন তা ছিল প্রভুর দেখানো পথ এবং সকলের জন্য অনুকরণীয়। মক্কায় পৌঁছে মুহাম্মদের প্রথম কাজটি ছিল মন্দিরের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করা - পার্থিব কোন কিছুকে অনুসরণে করে নয়, বরং অদৃশ্য ঈশ্বরের উপাসনায়। কিছু বিবরণীতে পাওয়া যায়, তিনি তার উটের উপর চড়ে প্রদক্ষিণ করেছেন, তবে বেশিরভাগ সংস্করণে পাওয়া যায়, এই কাজ তিনি পায়ে হেঁটেই করেছেন। এটি ছিল দেখার মতো এক দৃশ্য : খুব বেশি মোটা না হলেও, ভারি শরীরের একজন, চুলগুলো তাঁর বাধা, মুখে কমলা রঙের দাঁড়ি, গায়ে তীর্থের উদ্দেশ্যে আলতো করে পেঁচানো সাদা রঙের ইহরাম। তিনি পুরোনো ঐতিহ্য মেনেই তার বগলের নিচে পোশাকটি টান দিয়ে এনে তার ডান কাঁধটি উন্মুক্ত করে রাখতেন, তবে প্রদক্ষিণের নিয়মে একটু পরিবর্তন আনলেন। তিনি মন্দিরের চারপাশে তিনবার দৌড় দিয়ে এবং বাকীটা হাঁটার মাধ্যমে শেষ করলেন। পূর্বে, তীর্থযাত্রীরা ছোট কদমে বা ধীরেগতিতে হেঁটে এই প্রদক্ষিণের কাজটি শেষ করত। হাঁটার গতি নির্ধারিত ছিল না। প্রতিবার যখন তিনি কালো পাথরটার পাশ দিয়ে যেতেন, তখন তিনি তা স্পর্শ করতেন বা চুম্বন করতেন। পাথর কেটে বানানো সেই জায়গাটি যাকে তিনি এখন 'আব্রাহামের আস্তানা' (আব্রাহামের নামাজের স্থান যাকে মুহাম্মদ 'মাকামে ইব্রাহিম' বলতেন) হিসেবে অভিহিত করেন। সেখানে দুইবার সিজদা ও কোরআন তিলাওয়াত করে প্রদক্ষিণের আচারটি শেষ করলেন। লম্বা, বলিষ্ঠ এবং মাথায় টাকযুক্ত উমরও অন্যান্য উপাসকদের মতোই মুহাম্মদের পদচিহ্ন অনুসরণ করছিলেন। সেখান থেকে তিনি সাফা ও মারওয়ার পাথরে ঘেরা পথের দিকে যান এবং এ দুটোর মাঝ বরাবর সাত হাজার কদমের মতো হাঁটেন, কিন্তু শুকনো কুয়োর পাড় দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিতেন। এইভাবে দুই পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়াদৌড়ি মুশরিকদের রীতি ছিল, প্রকৃতির প্রতি সবিশেষ সম্মান থেকেই এমন একটি অনুশীলন শুরু হয়েছিল। উপত্যকাটি মাঝেমধ্যে কুয়োর তলদেশ বেয়ে নেমে আসা বন্যার শিকার হতো, সেই বন্যায় পথে যা কিছু পেত, সব ভাসিয়ে নিয়ে যেত। আবহাওয়া পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, কুয়োর তলদেশ অতিক্রম করে এই দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় সাতবার আসা-যাওয়াটা পৌত্তলিক রীতি হয়ে উঠেছিল। পাহাড়ের পাদদেশে তৈরি করা ইসাফ এবং নায়লা নামের দুই নারীপুরুষের মূর্তির পূজার এমন রীতি ছিল। কিন্তু এখন মুহাম্মদের ধর্মের রীতি অনুযায়ী, এই সাতবার দৌড়ানোর রীতি পালন করা হচ্ছে আব্রাহামের স্ত্রী হাগারের তার ছেলের জন্য পানির সন্ধানে ছোটাছুটি করার অনুকরণে। এইভাবে মুহাম্মদ কুয়োর পার্শ্বদেশ অতিক্রম করার সময় হাগারের গতিতে ছুটতেন এবং এটিকে তার অনুসারীদের জন্য নিয়ম হিসেবে ঘোষণা দেন। আচারটিতে পরিপূর্ণতা দিতে, তিনি প্রতিটি পাহাড়ে (সাফা ও মারওয়া পাহাড়) উঠে মন্দিরের দিকে ফিরে প্রার্থনা করেছিলেন, যেই পাহাড়গুলোর উচ্চতা কাবার ছাদের উচ্চতার সমান ছিল।

তীর্থযাত্রা শুরুর আগে, মুহাম্মদ পূর্বের মন্দিরের আচ্ছাদনগুলি প্রতিস্থাপনের জন্য নতুন আচ্ছাদন অর্পণ করেছিলেন, যা কাঠামোর আগেকার সরলতা পরিধান করে এটিকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে (৩)। ইয়েমেনি কাপড়ের তৈরি নতুন আচ্ছাদনগুলো তিনি পৌঁছার সময় প্রস্তুত করা ছিল। একবার এটি লাগিয়ে নেওয়ার পরে, মুহাম্মদ মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেন, তার পাদুকাগুলো খুলে ফেললেন এবং তার সাথে বেলাল, ওসামা এবং অন্য আরেকজন ব্যক্তি সহ ভেতরে প্রবেশ করলেন। মন্দিরের ছাদকে ধরে রাখা ছয়টি কলাম ব্যতীত ভেতরটা খালি ছিল, যা এখন কেবল মুহাম্মদের একেশ্বরবাদী ধারণা দিয়ে পূর্ণ হলো। মুহাম্মদ এই ধারণার পূর্ণ রূপ দিতে দু'রাকাত নামাজ আদায় করেন, কিন্তু এটি শেষ হলে তিনি বেলাল ও ওসামাকে বললেন যে, ভবনটিতে প্রবেশের করে তিনি ভুল করেছেন। কারণ, এখন এটি (ভেতরে নামাজ আদায়) সুন্নাহ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এবং প্রত্যেকেই প্রার্থনার জন্য ভেতরে যেতে চাইবে (৪)। তাই তিনি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন যে, ভেতরে ঢুকে প্রার্থনা করা ঈশ্বরের নীতি নয়, বরং ভবনের বাইরে থেকে এই নামাজ পড়তে হবে।

তীর্থযাত্রার এই দিনগুলিতে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মানুষ চলাচল করতো । বিপুলসংখ্যক বিশ্বাসীদের অংশগ্রহণে, একই সাথে মাটিতে সেজদা দেয়ার মাধ্যমে গণ-নামাজ আদায় করা হচ্ছিল। যে যেখানেই থাকুক না কেন, প্রথমে ভোরে ফজরের আজান, দুপুরে জোহরের, এরপর বিকেলে আসরের আজান, সূর্যাস্তের আগে মাগরিবের আজান এবং অবশেষে অন্ধকারের পরে আকাশে তারা ফুটলে, এশার নামাজের জন্য যখন আজানের গভীর আওয়াজ ভেসে আসত মুমিনরা তখন তাদের পবিত্র ধর্মীয় প্রার্থনার নিয়ম মেনে চলত এবং সুশৃঙ্খল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যেত। মুহাম্মদ সেই চক্রাকারে জমায়েতের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতেন, কখনও কখনও তাকে ঘিরে ভীড়ের মাঝে হট্টগোল বেঁধে যেত। তার উজ্জ্বল কমলা বর্ণের দাড়ি দেখে তাকে সবার মাঝে খুঁজে পেয়ে লোকজন চিৎকার করে বলত, “এই যে মুহাম্মদ, এটাই মুহাম্মদ” (৫)। পুরুষ এবং নারী, যুবক এবং বৃদ্ধ সবাই ঘিরে ফেলত, তাকে এক নজর দেখতে; আল্লাহর রাসূলের উপস্থিতিতে তাদের মুখমণ্ডল আনন্দের আভায় উদ্ভাসিত হতো, তারা তাকে একটু ছুঁয়ে দিতে তাদের হাত বাড়িয়ে দিত। যারা তাকে স্পর্শ করতে পারত না, তারা তার উটের ছোঁয়া নিয়েই সন্তুষ্ট হতো। মাঝেমাঝে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে তার উটটিকে চাবুক মেরে সরিয়ে দিতেন; অন্য সময়ে তিনি এক জায়গায় থাকতেন। তার কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করা লোকদের মধ্যে হুড়াহুড়ি লেগে যেত । তিনি নিজের সম্পর্কে আকর্ষণীয় পৌরাণিক কাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন, যা তাকে জীবন্ত কিংবদন্তী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। হেরা পর্বতের গুহায় যে নবীর কাছে এক শক্তিশালী ফেরেস্তা উপস্থিত হয়েছিল; সেই মনোনীত ব্যক্তি যাকে স্বর্গের সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে যাকে নেয়া হয়েছিল; মানব জাতির প্রতি করুণাবশত যিনি কেয়ামতের দিনে সবার পক্ষ থেকে সুপারিশ করবেন। তিনিই ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু এবং তার নিকটবর্তী হতে পারলে ঈশ্বরের সাথে সংযোগের আশায় লোকেরা কেউ তার হাত ধরতো, কেউবা মুখ দিয়ে তার মুখ ঘষে নিত (৬)। তিনি এটির অনুমতি দিয়েছেন, ঠিক যেমনটি তিনি দিয়েছিলেন তার অযু করা পানি পান করার ক্ষেত্রে এবং তার থুতু তাদের শরীরে ঘষে নিতে।

আরাফাত পর্বত ছিল তীর্থযাত্রার পরবর্তী ধাপ, যেখানে দু'শ ফুট পাথুরে পর্বতে তীর্থযাত্রীরা সূর্যের উপাসনায় আসত। সেখানে যেতে বেলাল হাঁটা শুরু করে এবং মাঝেমাঝে মুহাম্মদের উটের পাশে লম্বা খুঁটিতে একটি ছাতা বহন করত, যেন মুহাম্মদকে তীব্র রোদ থেকে ছায়া দিতে পারে। আরাফাত ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থানের ধাপ। মুহাম্মদ মক্কায় যাত্রা শুরু করার নিয়মিত ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত, আরাফাত পর্বতের ঢালু ও আশেপাশের সমতলে সূর্য তীর্থযাত্রা শুরু হতো এবং তারপরে পশ্চিমে মক্কার দিকে অগ্রসর হয়ে মিনায় শেষ হতো। এর কারণ হচ্ছে, তীর্থযাত্রীরা আগে থেকেই পূর্ব থেকে পশ্চিমে সূর্যের বক্রাকার গতিপথ অনুসরণ করে আসছিল, এবং মন্দিরে আসা মক্কার হজ্বযাত্রীরা চাঁদ এবং নক্ষত্রের গতির রহস্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেই এই আচরটি করতেন। সুতরাং এটি মন্দির প্রদক্ষিণ আর দুটি পাহাড়ের মাঝখানে আসা-যাওয়াতেই সীমাবদ্ধ

ছিল। এখন এই হজ্বের প্রথম ধাপটি হলো মক্কা, আর পরেরটি আরাফাত। আরাফাতকে মুশরিকদের জন্য 'দাঁড়ানোর ধাপ' বলে অভিহিত করা হতো, কারণ তারা মধ্যাহ্ন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সূর্যের উপাসনা করার জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে থাকত। মুহাম্মদ ঘোষণা করেছিলেন যে, ফেরেস্তা জিব্রাইল ইব্রাহিমকে আরাফাতের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন এটি দেখাতে যে, মানুষের পুনরুত্থানের সময় এটিই (আরাফাতের ময়দান) প্রতীকী জমায়েতের স্থান হবে। কেয়ামতের সময় ইস্রাফিলের প্রলয়-শিংগা বাজলে কী ঘটবে, তারই যেন একপ্রকার মহড়া ছিল এই আরাফাতে দাঁড়িয়ে থাকা।

মুহাম্মদ যখন সাদা ইহরাম পরা তীর্থযাত্রীদের জমায়েত দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পর্বতের একেবারে শীর্ষে এসে দাঁড়ান, তা অবশ্যই মুহাম্মদের জন্য সবচেয়ে সন্তোষজনক মুহূর্ত ছিল। হেরা পর্বতের গুহার বিভ্রান্তিকর অভিজ্ঞতার পর থেকে প্রায় তেইশ বছর কেটে গিয়েছিল, সব ধরনের বিরোধিতা সত্ত্বেও, আরবের উপর তার একেশ্বরবাদের সংস্করণ আরোপ করার সংগ্রামের তেইশটি বছর। তিনি সমস্ত প্রতিকূলতাকে পরাজিত করেছিলেন এবং সমস্ত বিরোধীদের তিনি পিষ্ট করেছিলেন, আর এখন চল্লিশ হাজার লোক তার পায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, মুহাম্মদের নিজের সৃষ্ট বিভ্রান্ত বিশ্বাসকে তারা বৈধতা দিয়েছে। জনতার দিকে তাকিয়ে তিনি একটি দীর্ঘ, দ্যুতিময় সম্ভাষণ দিলেন। এই ভাষণের কয়েক মাস পরেই তিনি মারা যান, আর তাই এটিকে 'বিদায়ী খুতবা' নামে ডাকা হয়েছিল। এটি ছিল পর্বতের উপর তার উপদেশ, হুকুম, সতর্কতা এবং নতুনভাবে বুনন করা কোরআনের আয়াতের মিশ্রণ। অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, তিনি এমন ঘোষণাপত্র জারি করলেন যেখানে গ্রহিত ঋণের পুরোটা পরিশোধ করার সময় ঋণের উপর সুদকে অবৈধ বলে গণ্য করা হলো, বহুশ্বরবাদের যুগে হত্যাকান্ডের পর রক্তের মূল্য নেওয়ার নিয়মকে বাতিল করলেন, এবং সৌর পঞ্জিকার সাথে চন্দ্র বর্ষপরিক্রমার সামঞ্জস্য আনতে প্রতি তিন বছরে অতিরিক্ত একটি মাস যোগ করা নিষিদ্ধ করলেন (৭)। আর পরিশেষে তিনি নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করলেন। পুরুষদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "স্ত্রীলোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করুণ, কারণ তারা আপনার গৃহপালিত পশুদের মতো এবং নিজের জন্য কিছুই রাখে না। আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে তাদেরকে কেবলমাত্র আস্থা রূপেই গ্রহণ করেছেন" (৮)। তিনি এই উপদেশ দিয়ে বলেন, "হে লোকেরা, আমার কথা শোন ও বুঝার চেষ্টা করো; আমি তোমাদের কাছে বাণী পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে এমন কিছু রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা এটিকে ভালো করে আঁকড়ে ধরে রাখ, তবে কখনোই তোমরা বিপথগামী হবে না : এটি হলো ঈশ্বরের কিতাব এবং তার নবীর সুন্নাহ" (৯, ১০)। মুশরিকদের সূর্য উপাসনার পরে, মুহাম্মদ আরাফাত ও মিনার মধ্যবর্তী ধাপ মুজদালিফার আগুনের পর্বতে তীর্থযাত্রীদের ঐতিহ্যবাহী সফর শেষ না হওয়া পর্যন্ত সূর্যাস্তের পর পর্বতের পেছনে নেমে অপেক্ষা করেছিলেন। মুশরিকদের জন্য, এই ছোটাছুটি করাটা এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক ছিল, এমন : পশ্চিমে মুজদালিফার দিকে সূর্য ডুবে যেত; মুক্তিপ্রাপ্ত তীর্থযাত্রীরা সূর্যের সন্ধানে সেই দিকেই তড়িঘড়ি করে ছুটত, তবে কেন তারা এইভাবে ছুটত তা সম্ভবত তারাও জানত না। সম্ভবত এটি ছিল পরকালের পথে নিরাপদে যাত্রার জন্য সূর্যকে ধন্যবাদ জানানো, ঠিক যেমন যখন কোন প্রিয়জন কাফেলা নিয়ে রাতের বেলা শুরু যাত্রা করে, আর তাকে শুভকামনা জানাতে আত্মীয়রা তার পিছে রাস্তায় ছুটে আসে। মুজদালিফার পাথুরে পর্বতের উপরে আগুন জ্বালানো ছিল কুসাইয়ের আমল থেকেই ঐতিহ্যবাহী একটি রীতি। এই জঞ্জাল পোড়ানোর আলোয়, মুশরিকরা রাতের অন্ধকার জুড়ে শ্রদ্ধাবোধ থেকেই জাগ্রত থাকত এবং ভোরের আলোয় সূর্যের প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালেই তাদের উদযাপন শুরু হতো।

মুজদালিফার উদ্দেশ্যে আরাফাত ত্যাগকারী প্রথম ব্যক্তি ছিলেন মুহাম্মদ। পশ্চিমে আলো বিবর্ণ হওয়ার সাথে সাথে তিনি তার উটে আরোহণ করলেন এবং উটের পিঠে বা পায়ে হেঁটে চলা তীর্থযাত্রীদের স্রোতের মাঝে মূল ব্যক্তিটি হচ্ছেন মুহাম্মদ। প্রায় উনিশ বছর বয়সী ওসামা তার সাথে চড়েছিল। সূর্যের পিছু ছুটে যাওয়ার রীতিটা ভাঙা কঠিন ছিল। অত্যধিক আগ্রহী আরোহী তীর্থযাত্রীরা মুহাম্মদের পেছনে এসে ভিড় করল এবং তাদের তিনি এই বলে প্ররোচিত করলেন যে, "সকলেই এটাকে সহজভাবে নাও! ধার্মিকতা তাড়াহুড়ো দিয়ে পরিমাপ করা হয় না" (১১)! কিন্তু তিনি নিজেই যখন ভিড়হীন খোলা জায়গায় পৌঁছলেন, তখনি দ্রুত যাওয়ার উদ্দেশ্যে তার উটটিকে চাবুক মারলেন। অবশেষে মুজদালিফার ছোট্ট পাহাড়ে

পৌঁছলে, রাতের অন্ধকারে মুহাম্মদ সন্ধ্যা ও রাতের নামাজের নিয়মসমূহ একত্র করে নামাজ আদায় করেন। সেখানে আগুন জ্বালানো হয়েছিল। ইসলামিক গ্রন্থে যদিও উল্লেখ নেই, তবে এটি নিশ্চিত যে, তিনি আরও খুতবা দিয়েছেন, আরও বিধি জারি করেছেন এবং একেবারে নতুন কিছু কোরআনের আয়াত রচনা করে শুনিয়েছেন। তিনি হজ্বযাত্রীদের ভিড়ের মাঝে রাত্রিযাপন করেন, এবং ভোরের আলো ফুটতেই তিনি সবার সাথে ফজরের নামাজ পরিচালনা করেন।

মুজদালিফা মুহাম্মদের জন্য আর সূর্যের পুনঃজাগরণের উদযাপন কেন্দ্র রইল না, বরং সেটা এখন ইব্রাহিম ও তার একেশ্বরবাদী আরাধনার পবিত্র স্থান। মুহাম্মদ এমন এক ব্যক্তির গল্প দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, যিনি তার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাসের পরীক্ষা হিসেবে নিজের পুত্রকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। মুহাম্মদের তিন পুত্র ছিল; সর্বশেষজন ছিল কপটিক খ্রিস্টান ক্রীতদাসী মারিয়ার গর্ভে - ইব্রাহিম। তারা (মুহাম্মদের পুত্ররা) সকলেই দু'বছর বয়সের আগে মারা যায়, যার ফলে তিনি এই ধরনের মৃত্যু-যাতনার অনুভূতি কী হতে পারে তা বুঝতে পারতেন। মুহাম্মদ বাইবেলের গল্পের পরিণতির দ্বারাও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ঈশ্বরের এক ফেরেস্তা শেষ মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, আব্রাহাম তার প্রিয় ছেলের গলা কেটে দেয়ার ঠিক আগে আগে। মুহাম্মদ এখন এই গল্পকে মুজদালিফার সাথে জুড়ে দিলেন। এটি মুজদালিফার নিকটে একটি পর্বতের উপরে হয়েছিল, যেখানে ফেরেস্তা আব্রাহামের উপর হাত রেখেছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদের সংস্করণে সেটি ইসহাক ছিলেন না যাকে তার বাবা উৎসর্গ করতে নিয়েছিলেন।

মুজদালিফা থেকে মুহাম্মদ হাজীদের মিনা নামক প্রার্থনার স্থানে নিয়ে যান, যেখানে ঐতিহ্যবাহী তিনটি স্তম্ভে পাথর ছুঁড়ে মারা হতো। মুহাম্মদ এই ধাপেও একটি আব্রাহামিক গল্প তৈরি করলেন। মুশরিকদের কাছে স্তম্ভগুলি মরুভূমি এবং আকাশে বসবাস করা অদৃশ্য জিনকে প্রকাশ করত। তাদের মধ্যে কিছু দুষ্টু ছিল এবং অন্যরা শয়তান ছিল। তাদের তাড়িয়ে দিতে স্তম্ভগুলোতে পাথর নিক্ষেপ করা হতো।

মুহাম্মদ ইহুদিদের কিংবদন্তির সাথে মিল রেখে তার নিজের মতো করে গল্পে পরিবর্তন করেছিলেন, যেখানে শয়তান ইব্রাহিম, ইসহাক এবং সারাকে এই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কোরবানি দেয়ার মধ্য দিয়ে না যেতে প্ররোচিত করেছিল। ইহুদি কিংবদন্তি ছিল মূলত একটি কল্পিত গল্প যেটাকে বাইবেলে বর্ণিত আব্রাহামের ত্যাগের গল্পটাকে বাড়িয়ে বলা হয়েছে। এতে শয়তানকে তার হস্তক্ষেপের জন্য তিরস্কার করা হয়েছে ও তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে (১২)। মুহাম্মদ ইসহাক (Isaac) থেকে ইসমাইল (Ishmael) এবং সারা (Sarah) থেকে হাগারে (Hagar) এদের চরিত্রগুলিকে বদলে দিয়েছিলেন, কিন্তু গল্পে তিনি শয়তানকে ধমক দেয়ার পরিবর্তে তিনি তাকে পাথর দিয়ে তাড়িয়ে দেন। এইভাবে মুহাম্মদ মিনায় তিনটি স্তম্ভকে পাথর ছোঁড়ার ঐতিহ্যটি ইব্রাহিমের গল্পের রূপে গ্রহণ করে নেন। মুহাম্মদের গল্পে এখন আর জিনকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়নি, বরং ইব্রাহিম, ইসমাইল এবং হাগারকে প্রভুর অবাধ্য হতে প্ররোচিত করার জন্য ধূর্ত শয়তানকে পাথর ছুঁড়ে মারা হয়।

মুজদালিফা ত্যাগ করার আগে মুহাম্মদ হজ্বযাত্রীদের মিনার আরও তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত স্তম্ভগুলিতে নিক্ষেপ করার জন্য ছোট ছোট পাথর সংগ্রহ করার নির্দেশ দেন। এই স্তম্ভগুলি শিলার তৈরি কলামের আকারে রাখা ছিল, তবে খুব বেশি উঁচু ছিল না। প্রত্যেক স্তম্ভ সেখানে শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করছে যেখানে ইব্রাহিম বা ইসমাইল কিংবা হাজেরাকে প্ররোচিত করেছে শয়তান, তাই তাদের প্রত্যেককে সাতবার পাথর ছুঁড়ে মারতে হবে, যেমনটি মুশরিকরা করত। প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের পরে মুহাম্মদ চিৎকার করে বললেন, "আল্লাহু আকবার! আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ!" এক স্তম্ভের কাজ সম্পন্ন করার পরে তিনি আকাশের দিকে হাত উঠাতেন এবং পরের স্তম্ভ দিকে যাওয়ার আগে প্রার্থনা করেন। তীর্থযাত্রীরা তাকেই অনুকরণ করেছিল।

তারপর শুরু হয়েছিল কোরবানি (পশুবলি)। এটি সর্বদা তিনদিনব্যাপী উৎসবের অংশ ছিল, প্রায়শই একে 'কোরবানির উৎসব' বা 'মাংস শুকানোর দিন' হিসেবে অভিহিত করা হতো এবং মুশরিকদের জন্য এটি সূর্য-তীর্থযাত্রার শেষ পর্যায় ছিল। তাদের সংস্করণে পাওয়া যায়, মুশরিকরা তাদের দেবদেবীদের সন্তুষ্ট করতে এবং অনুগ্রহ লাভের আশায় বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে রক্ত উৎসর্গ হিসেবে পশু জবাই করত। সেই জবাইয়ের রেওয়াজটাই মুহাম্মদের সাথে এখন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আব্রাহামের পুত্রকে কোরবানির ইচ্ছার উৎসবে পরিণত হয়। পশুরা ছিল ইব্রাহিমের সন্তানের বিকল্প কোরবানি, আব্রাহামের মেষের গল্পের মতো।

জবাইয়ের জন্য পশুগুলোকে মালা পরিয়ে আনা হতো। তীর্থযাত্রীরা যখন আরাফাত ও মুজদালিফায় আসা যাওয়া করছিল, তখন রাখালরা পশুদের চারণভূমিতে নিয়ে যেত ঘাস খাওয়াতে। স্তম্ভগুলিতে পাথর ছোঁড়ার পরে তারা জবাইয়ের জন্য সংরক্ষিত অঞ্চলে পশুদের নিয়ে যায়। মুহাম্মদ একশো উট নিয়ে এসেছিলেন, প্রত্যেককে মালা দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছিল এবং অন্যান্য পশুকে কোরবানির উট থেকে আলাদা করার জন্য সেগুলোতে তার নির্দিষ্ট চিহ্ন দেয়া হয়েছিল এবং তাদেরকে একটি সারিতে হাঁটু গেড়ে বসানো হয়েছিল। তাদের সামনের পা-গুলো দড়ি বেঁধে আটকে রাখা হয়েছিল যাতে হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার সাথে সাথে তারা ছুটে যেতে না পারে। একের পর এক তাদেরকে উৎসর্গ করা হয়। কথিত আছে যে, মুহাম্মদ আলীর সাহায্য নিয়ে একটি ধারালো ছুরির মতো বর্শার সহায়তায় তেষট্টিটি উট জবাই করেছিলেন (১৩)। বর্শার মাথার ঠিক নিচে হাতলটি ধরে মোহাম্মদ উটের গলায় বর্শা রাখতেন, তারপরে বর্শার শেষপ্রান্তটি ধরে আলী এমন জোরে এতে চাপ দিতেন যে, উটের ঘাড় কেটে যায়। এরপরে মুহাম্মদ বর্শার মাথাটি কসাইয়ের ছুরির মতো ব্যবহার করে গলাটি নিচের দিকে টুকরো করে ফেলতেন এবং এতে রক্ত ঝরে দ্রুত পশুটির মৃত্যু হতো। প্রতিটি হত্যার সময় কী মুহাম্মদ প্রার্থনা করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে গ্রন্থে ইঙ্গিত দেয়া হয়নি। সম্ভবত তেমন কিছুই করা হয়নি, কেননা এই জবাইয়ের কাজ বেশ জটিল, বিশালাকার এবং অত্যন্ত রক্তাক্ত ছিল। প্রতিটি হত্যার পরে কসাইদের একটি দল পশুটির শরীর থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নিতো, নাড়িভুঁড়ি আলাদা করত, মাংসগুলো টুকরো টুকরো করত। মুহাম্মদ প্রতিটি প্রাণী থেকে মাংসের টুকরো এনে একটি রান্নার পাত্রে ফেলতে বললেন। পরে, তিনি এবং আলি সেই মাংসের রান্না থেকে স্যুপ এবং ঝোল খেয়েছিল। হজ্বযাত্রীদের মধ্যে কেউই ক্ষুধার্ত থাকেনি, কারণ বেশিরভাগ লোক জবাইয়ের পশু নিয়ে এসেছিল এবং খাওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে মাংস ছিল। উদ্বৃত্ত মাংসগুলো পাতলা করে কেটে কেটে রোদে শুকানো হয়েছিল, পরে খাওয়ার জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছিল এবং চামড়াগুলো পরবর্তীতে প্রক্রিয়াজাত করার জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। খাওয়ার অনুপযোগী অবশিষ্ট যা ছিল তা শকুনের জন্য রেখে দেয়া হয়েছিল।

পশুর জবাইয়ের পরে মাথা ন্যাড়া করার অনুষ্ঠান হয়। মুশরিকদের জন্য, সূর্য-তীর্থযাত্রাটি সেই সময়ে শেষ হতো এবং উৎসব শুরু হতো। তাদের জন্য, মাথা ন্যাড়া করা নম্রতা এবং দেবতাদের প্রতি বশ্যতা হিসেবে দেখা হতো, কিন্তু প্রতীকী কাজটি শেষ হয়ে গেলে তীর্থযাত্রীরা এখন কিছুটা মজা করার জন্য বাইরে বের হতো। আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতার সেই ইহরামের সাদা পোশাক তারা খুলে ফেলে দিয়ে তাদের সাধারণ পোশাক পরতেন। একেবারে শেষের তিনদিন জুড়ে এই উদযাপন চলত, তারা খাবার, মদ, যৌনতা এবং আনন্দফূর্তি করে পার করত। তারা সংগীত পছন্দ করত এবং প্রতিভাধররা সমস্ত ধরনের বাদ্যযন্ত্র তথা টাম্বুরাইন, ঢোল এবং বাঁশি বের করে আনত। এটি ছিল তিনদিনের জন্য পার্কিং লটে পার্টির মতো। তবে এখন সেই পুরানো রীতি আর নেই। রক্ষণশীলতা ও শালীনতার বাহক মুহাম্মদ এই ধরনের যৌনতা, মদ এবং সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ করে এই আয়োজনের ছন্দপতন ঘটান। যা কিছুটা আনন্দ করা বাকি ছিল, তা নিয়মমাফিক নামাজ ও কোরআন তেলাওয়াতের ফাঁকে ফাঁকে চলতো।

তবে মুহাম্মদ তীর্থযাত্রার জন্য মাথা ন্যাড়া করাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরে রেখেছিলেন এবং নাপিতকে ডেকে এটিকে সুন্নাহ হিসেবে একপ্রকার সীলমোহর করেছিলেন। মুহাম্মদের ঝরে পড়তে থাকা চুলগুলো সংগ্রহ করতে তার চারপাশে লোকদের ভিড় বেড়ে যাচ্ছিল, এমনকি একটি চুলের দখলের জন্য তারা লড়াই করেছিল। কথিত আছে যে, তিনি তার মাথার একপাশের

চুল উহুদে তলোয়ারের আঘাতে আঙ্গুল হারানো তালাহার হাতে দেন, যদিও আলেমরা নিশ্চিত না যে মুহাম্মদ কি তার ডানদিকের চুল নাকি বাম দিকের চুল কেটেছিলেন। তালহা পরে সকল পুণ্যার্থীদের মাঝে এই চুল বিলি করে দেন (১৪)। একসময়ের প্রবল শত্রু আর এখন মুহাম্মদের ধর্মের অন্যতম নিবেদিতপ্রাণ সেনাপতি খালিদ তার কাছে পুরো একগোছা চুলের আকুতি জানান। সেটি পাওয়ার পর তিনি তার চোখে ও মুখে তা চেপে ধরেন (১৫)।

দেশে (ইয়াছরিবে) ফিরে আসার আগে মুহাম্মদ হজ্বযাত্রীদের মন্দিরের চারপাশে শেষ আরেকবার প্রদক্ষিণ করার আদেশ দেন এবং বিদায়ী অভিব্যক্তি হিসেবে সাফা- মারওয়ার মধ্যে আরও একবার দৌড়াদৌড়ি করতে বলেন (এটাকে বিদায়ী তাওয়াফ বলা হয়)। এগুলি সম্পন্ন হওয়ার পরে, তীর্থযাত্রীদের উৎসব কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়া কিংবা বা বাড়িতে ফিরে যাওয়া, এই দুটি বিকল্প ছিল। মুহাম্মদ এই বিদায়ী রীতিটার প্রশাসনিক রূপ দিতে শেষবারের মতো মন্দিরের চারপাশের পথ প্রদক্ষিণ করেন, অতঃপর শয়তানের তম্ভে আরও পাথর নিক্ষেপের জন্য উৎসবস্থানে ফিরে আসেন। এই কাজগুলির দ্বারা তিনি পুরো তীর্থযাত্রার পুনর্নির্মাণের শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেন।

মুহাম্মদ ছিলেন একজন সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী মানুষ। তার মনের প্রকরণটি এমন ছিল যে, তা নিয়ে লিখতে গেলে 'যুদ্ধ এবং শান্তির' (ওয়ার এন্ড পিস) মতো একটি মহাগ্রন্থ রচিত হয়ে যাবে, কিংবা চূর্ণ হয়ে যাওয়া রাজা এবং রানীদের স্মরণে রচিত অপেরার দর্শকদের উপযোগী একটি অপেরা রচনা হয়ে যাবে। **মানুষ ও ঈশ্বরের মাঝের যোগসূত্রের ভূমিকা নিয়ে মুহাম্মদ নিজেকে তার মহাকাব্যের নায়কে পরিণত করেন। তাঁর সৃজনশীলতা কোরআনের অদ্ভুত প্রতিভার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং আরবদের আচার-অনুষ্ঠান পুনর্নির্মাণে এটিকে একটি নতুন রূপকথার কাঠামোর আকারে প্রসারিত করেছিলেন, যা তিনি ইহুদিদের কাছ থেকে লুণ্ঠনের মালের মতো গ্রহণ করেছিলেন এবং একহাজার মাইল দক্ষিণে একটি উপত্যকায় প্রতিস্থাপন করেছিলেন যেখানে অখ্যাত সাদামাটা মন্দিরটি ছাড়া তেমন কিছুই ছিল না।** তিনি চাঁদের সম্মানে মক্কার গৌণ তীর্থযাত্রা এবং সূর্য উপাসনার প্রধান তীর্থযাত্রাকে একক প্রার্থনার রীতি হিসেবে একেশ্বরবাদী উপাসনার মাঝে মিশ্রিত করেছিলেন যা মক্কায় তার ঈশ্বরের ঘর থেকে শুরু হয়, আর এখানেই তার সমাপ্তি ঘটে।

সৃজনশীল কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর মুহাম্মদ ইয়াছরিবে ফিরে আসেন, এখন কেবল আরব উপদ্বীপের সর্বাধিনায়ক হিসেবে নয়, বরং এর রূপকথারও রচয়িতা হিসেবে।

অধ্যায় - ৩৬
মুহাম্মদের মৃত্যু

মুহাম্মদ, ইয়াছরিবে ফিরে আসার তিনমাস পর মারা যান। ইসলামিক ইতিহাস গ্রন্থে জানা যায়, তিনি হয়তো তার মৃত্যুর একটি পূর্বাভাস পেয়েছিলেন এবং তীর্থযাত্রার সময় সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, এটাই হয়তো তার শেষ যাত্রা হতে পারে। তিনি ইয়াছরিবে ফিরে এসে যথারীতি তার কাজে ফিরে গেলেন। তার প্রথম কাজ ছিল ইয়েমেনে আন্দোলন থেকে পালিয়ে যাওয়া এক নেতাকে হত্যার পরিকল্পনা করা। আগের মতই, তিনি বিভিন্ন গোত্র কাছ থেকে আসা প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকেন, যারা তার প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করতে ইয়াছরিবে এসেছিলেন, এবং তিনি তাদের ভিতর থেকেই গভর্নর, প্রচারক এবং কর সংগ্রাহককে নিযুক্ত করলেন।

অসুস্থতার কারণে শারীরিকভাবে কাবু হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তার এই কার্যক্রম চলতে থাকে। তার এই রোগের সূত্রপাত হয় আড়াই বছর আগে, বাইজেন্টাইনদের হাতে মুহাম্মদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে সিরিয়ায় অভিযান চালানোর যখন জন্য তিনি যখন সৈন্য তৈরি করছিযেন ঠিক সেই সময়। প্রায় আড়াই বছর আগে বাইজেন্টাইনদের হাতে তার পালক পুত্র জায়েদ, আলীর ভাই জাফর এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা নিহত হয়। এক রাতে মুহাম্মদ তাঁর এক মুক্ত দাসকে নিয়ে কবরস্থানে প্রার্থনা করার প্রাক্কালে অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাতে অতিরিক্ত নামাজ আদায়ের জন্য তার এক স্ত্রীর ঘরে বন্দি থাকার পরিবর্তে মুহাম্মদ মাঝে মাঝে কবরস্থানে প্রার্থনা করতে যেতেন। কবরস্থানটি গারকাদের (Gharqad) বাগান নামে পরিচিত ছিল। সেখানে মুহাম্মদের পতিত সঙ্গীদের অনেককে এবং তার তিন কন্যা জয়নাব, রুকায়া এবং উম্মে কুলসুমকে সমাহিত করা হয়েছে, আরো সমাহিত করা হয়েছে মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে তার সন্তান ইব্রাহিমকেও। সেই রাতে তার প্রার্থনার দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, তিনি ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে গেছেন, সকলের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ যে অনন্ত সংঘাতের সৃষ্টি করেছে তা হয়তো তাকে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত করে তুলেছিল। তিনি কবরে সমাহিতদের সাথে জোরে জোরে কথা বলেন যে, মৃতরা আসলেই ভাগ্যবান; তারা বিশ্বের এই ক্রমাগত সংকট থেকে মুক্ত ছিল যা একের পর এক অনন্ত ধারাবাহিকভাবে তার কাছে এসেছিল। অবস্থাদৃষ্টে মুহাম্মদের মনে হচ্ছিল যে, আগের লোকেদের চেয়ে পরের লোকেরা বড় বেশি ভাগ্যহীন বা হতভাগা (১)।

কবরস্থান থেকে তিনি মসজিদ প্রাঙ্গণে ফিরে আসার পর প্রচণ্ড মাথাব্যথা অনুভব করলেন। সেই রাতে তিনি আঠারো বছর বয়সী আয়েশার সাথে ঘুমাচ্ছিলেন। দেখা গেল যে আয়েশারও মাথাব্যথা ছিল, সম্ভবত চাপা ঈর্ষাই আয়েশার মাথার ব্যথার কারণ হবে। কারণ মুহাম্মদ আবার আগের মতই মাঝরাতে তার কাছ থেকে বের হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মুহাম্মদের কাছ থেকে আগেরবার মার খাওয়ার ভয়ে হয়তো তাকে অনুসরণ করতে পারছিলেন না আয়েশা। তবে তার চেহারায় ছিল বেদনার ছাপ। যখন সে জিজ্ঞেস করল তার কি হয়েছে, তখন সে কোঁকড়ায়ে বলে উঠলেন, "ওহ আমার মাথা ধরছে।" মুহাম্মদ উত্তরে বললেন, "আমিই মাথাব্যথা কারণ!" বিদ্রুপাত্মক সুরে মুহাম্মদ বলেন যে, যদি আয়েশা তার আগেই মাথাব্যথার কারণে মারা যান, তাহলে তিনি তাকে তার চাদর দিয়ে আবৃত করে রাখতে পারবেন, তাকে কবর দিতে পারেন এবং তার জন্য প্রার্থনা করতে পারবেন। এই কথা শোনার পর ঈর্ষার প্রতিক্রিয়া যেন রক্তপাতের মত বহিত হলো আয়েশার প্রত্যুত্তরে বলে উঠল: "আমি কল্পনা করি আপনি তা (মাটি দেয়ার পর) করার পর আমার কক্ষে ফিরে আসবেন আর আপনার এক স্ত্রীর সাথে একটা বিয়ের রাত উদযাপন করবেন" (২)!

মুহাম্মদের মাথাব্যথা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তিনি ভাবতেন এই বুঝি তার মাথা বিস্ফোরিত হবে, এবং তিনি ব্যথা কমানোর জন্য মাথা এমন ভাবে বেঁধেছিলেন, দেখে মনে হয়েছে যে যুদ্ধে আহত হয়ে ব্যান্ডেজ করেছেন। তিনি প্রথম মাথাব্যথার অভিযোগ করার মাত্র কয়েকদিন পরেই জ্বরে আক্রান্ত হন, আর আকস্মিকভাবে পরে যান। যখন এই ঘটনা ঘটে তখন তিনি তার এক স্ত্রীর সাথে ছিলেন- কেউ বলে মায়মুনা, কেউ বলে জয়নাবের সামনে।আয়েশার ঘরে থাকার জন্য তিনি তার স্ত্রীদের কাছে অনুমতি চান এবং তাকে পা ধরে আয়েশার ঘরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। তার অসুস্থতা ভালো হবার নয়

বুঝতে পেরে তিনি মানুষের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন যারা তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন যারা তার ক্ষতি করতে চেয়েছেন। তিনি একটি সাধারণ সমাবেশের আহ্বান জানালেন, এবং একজন ঘোষক বাইরে গিয়ে সবাইকে মসজিদের ভিতর সমবেত হবার আদেশ দিলেন। মুহাম্মদ তখন প্রচণ্ড জ্বরে ভুগছিলেন।

সমাবেশে যাওয়ার আগে তিনি হাফসা'র একটি তামার তৈরী স্নানপাত্রে বসে ছিলেন। হয় কাপড় পরিধিত ছিলেন অথবা পর্দার আড়ালে বসেছিলেন এবং তার স্ত্রীরা তার গায়ে ঠান্ডা পানি ঢেলে দিচ্ছিল। অবশেষে যখন তিনি দাঁড়াতে পারলেন, তিনি পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন, যে পর্দাটা আয়েশার ঘরকে প্রচারক পাটাতন থেকে আলাদা করে রাখতো। তার ব্যথার কমানোর জন্য তার মাথা তখন ব্যান্ডেজ দিয়ে শক্ত করে বাধা ছিল এবং তিনি মিম্বরে এসে বসলেন। উঠান বিশ্বাসীদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। মুহাম্মদ বলতে শুরু করলেন, "হে জনগণ, তোমাদের অধিকার আমার কাছে প্রিয়, তাই যাকে আমি পিঠে চাবুক মেরেছি, এই নাও এখানে আমার পিঠ-- তোমরা প্রতিশোধ নাও" (৩)।

তার মন সদিচ্ছায় পরিপূর্ণ ছিল: তিনি উহুদে তাকে অমান্য করা তীরন্দাজদের ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। তিনি আবু বকরকে একজন নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হিসেবে প্রশংসা করলেন। তিনি প্রার্থনা নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পাটাতন থেকে নেমে আসলেন, তারপর তিনি আসনে গিয়ে বসলেন এবং ঘোষণা করলেন যে যারা তার কাছে টাকা পাওনা আছে তাদের এখনই কথা বলা উচিত। "তোমাদের মধ্যে যাদের আমি সবচেয়ে পছন্দ করি তারা হয় তাদের প্রাপ্য নেবে যদি আমি তোমাদের কাছে ঋনী থাকি, অথবা এখন আমাকে ঋন মুক্তির জন্য মাফ করে দিবে, যাতে আমি কারো প্রতি কোন অবিচার করা ছাড়াই সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি" (৪)।

এ সময় এক লোক লাফিয়ে উঠল এবং মুহাম্মদকে আগের বছর সে যে তিন দিরহাম ঋণ দিয়েছিল, সেটির দাবি করল। মুহাম্মদ তার স্মৃতিকে ভালোভাবে স্মরণ করতে বলেছিলেন, কারণ লোকটি যা বলছেন সে সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না। লোকটি মুহাম্মদকে বলল, "আপনার কী মনে নেই, একবার একজন ভিখারী আপনার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন আর আপনি আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন তাকে কিছু দিতে, তাই আমি তাকে তিন দিরহাম দিয়েছিলাম?" মুহাম্মদ তার এক চাচাতো ভাইকে তার টাকাটা দিয়ে দিতে বললেন, তারপর তাকে বসতে বললেন (৫)।

আরেকজন স্বীকার করেছিল, সে তিন দিরহাম চুরি করেছিল, তবে সেটি হাত কর্তনের জন্য ধার্য করা পরিমাণের চেয়ে কম ছিল তাই শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছিলো। মুহাম্মদ তাকে তার পকেটে হাত দিতে বলেছিলেন এবং টাকা ফেরত দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। তার শ্রোতারা তাদের নিজেদের পাপকর্ম স্মরণ করে পাগল হয়ে গিয়েছিল এবং অনেকে বুক চাপড়িয়ে স্বীকারোক্তি দিয়ে তার পায়ে লাফিয়ে পড়েছিল। সাধারণত, মুহাম্মদ এই ধরণের সভায় আনন্দিত হতেন এবং সভা চালিয়ে যেতেন দীর্ঘ সময় ধরে, কিন্তু তার জ্বর আবার ফিরে আসলো। যারা তাদের কাজের জন্য অনুতপ্ত ছিলেন তাদের জন্য তিনি প্রার্থনা করলেন এবং আবার কষ্ট করে আয়েশার ঘরে ফিরে গেলেন। তার স্ত্রীরা তাকে ওষুধ নিতে বাধ্য করেছিল। এটা ধারণা করা হয়েছিল যে, তিনি হয়তো প্লুরিসি (pleurisy) তথা ফুসফুসের প্রদাহে ভুগছিলেন, এবং অ্যাবিসিনিয়ানরা এই রোগের প্রতিকারের জন্য বিখ্যাত ছিল, ভেষজ এবং তেলের সংমিশ্রণে অখাদ্য বটিকা তারা তৈরী করতো ।

তিনি এতোই দুর্বল ছিলেন যে তাদের সাথে লড়াই করতে পারলেন না, তারা তার মুখ জোড় করে খুলে বটিকা ঢেলে দিলো। কিছুদিন পরে, তার অবস্থার উন্নতি হয়, হয়তো ঔষধের কারণে, অথবা স্বতঃস্ফূর্ত অবকাশে থাকার কারণে, কিন্তু তাকে জোর করে ঔষধ খাওয়ানোর প্রতিশোধ নিতে বাড়ির সবাইকে তিনি এই সাপের তেল গিলতে বাধ্য করেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে, তার অসুস্থতার জন্য দায়ী ছিল খায়বারে তাকে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল, সেই কারণে, সেই মহিলার ইহুদি নারীর স্বামী ও আত্মীয়স্বজনকে তিনি হত্যা করেছিলেন। তিনি আয়েশাকে বলেন, "আমি যে খাবার খাইবারে খেয়েছিলাম, আমি এখনও তার ব্যথা পাচ্ছি। সেই সময় আমি অনুভব করেছি যে আমার এওর্টা (aorta) তথা মহাধমনী ঐ বিষের মাধ্যমে ছিড়ে যাচ্ছে"(৬)।

তার অসুস্থতা প্রায় দুই সপ্তাহ স্থায়ী ছিল। যতক্ষণ না তার শক্তি কমে গেল, ততক্ষণ তিনি দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নেতৃত্ব দিতে লাগলেন। শেষের দিকে তিনি তার বিশ্বস্ত আবু বকরকে নামাযের নেতৃত্ব দেবার জন্য আদেশ দিলেন, অনেকে মনে করেছেন যে, এটি হয়তো কোন ইঙ্গিত দিচ্ছে, তিনি তার স্থলাভিষিক্ত করার জন্য আবু বকরকে মনোনীত করছেন। মানসিক চাপের কারণে, আয়েশা মনে করেননি যে তার বাবা প্রার্থনার নেতৃত্ব দেয়ার মত কোন অবস্থায় ছিলেন। যেহেতু আবু বক্কর মুহাম্মদের স্বাস্থ্যের অবনতি দেখে ক্রমাগত কাঁদছিলেন এবং তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়া ছাড়া কোরআনের একটি লাইনও আবৃত্তি করতে পারেননি। তা সত্ত্বেও, তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং তার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে সফল হন।

একটি ওয়াজ মাহফিলে মুহাম্মদকে দেখে মনে হচ্ছিলো তার কিছুটা উন্নতি হয়েছে, দুই আত্মীয়ের উপর ভর করে প্রার্থনার পাটাতনে গিয়ে আবু বকরের পিছনে বসেছিলেন। আবু বকর তার মনিবের কাছে নামাজের নেতৃত্ব ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদ তাকে চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন। যদিও তিনি এতই দুর্বল ছিলেন যে প্রার্থনার জন্য দাঁড়ানো, হাঁটু গেড়ে রুকু এবং সেজদা করতে পারছিলেন না, কিন্তু আবু বকর যা আবৃত্তি করেছিলেন তা তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন। সোমবার দুপুরে তিনি মারা যান। যদিও দিনটি শুরু হয়েছিল অনেকটা ভালো প্রতিশ্রুতি দিয়ে, কারণ মুহাম্মদকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন শক্তি ফিরে পেয়েছেন।

তিনি তিন দিন ধরে শয্যাশায়ী ছিলেন, কিন্তু সোমবার সকালে উঠে দাঁড়িয়ে পর্দা ঠেলে দিলেন, আয়েশার ঘর থেকে তিনি দেখলেন আবু বকরের পিছনে তার অনুসারীরা নামায আদায় করছে এবং কোরআন তেলাওয়াত করছে। মুহাম্মদ এই দৃশ্য দেখে হাসলেন এবং এক পর্যায়ে আনন্দে আত্মতৃপ্ত হয়ে আরো জোরে হাসলেন। এর ফলে বিশ্বাসীরা তাদের প্রার্থনা রেখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। আবু বক্কর ভেবেছিলেন, তিনি হয়তো প্রাথনার নেতৃত্ব নিতে আসছেন, কিন্তু মুহাম্মদ দূর থেকে তাকে চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন। তিনি পর্দা নামিয়ে আয়েশার সাথে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

তাকে এত আনন্দিত দেখে আবু বক্কর ভেবেছিলেন যে তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। তিনি মুহাম্মদের শারীরিক অবস্থা দেখে এতো আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন যে, তার প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর উচ্চভূমিতে তার প্রিয় স্ত্রী, খারিজার মেয়ের কাছে যেতে দেখা করতে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। সেদিন আবুবক্করের পালা ছিল এবং তিনি তার স্ত্রীর সাথে সময় কাটাতে চেয়েছিলেন। মুহাম্মদ তাতে সম্মতি দিলেন এবং আবু বকর ঘোড়ায় চড়ে উচ্চভূমিতে চলে গেলেন। কিন্তু সকাল হবার সাথে সাথে মুহাম্মদের শরীর যন্ত্রণায় কাতর হয়ে গেল। কখনও তিনি সুসংহত ছিলেন, কখনও কখনও তিনি বিড়বিড় করলেন। তিনি গদির উপর শুয়ে ছিলেন, মাথাটি আয়েশার বুকের উপর ছিল। অন্যরা ঘরে আসছে কিন্তু দ্রুত সাক্ষাৎ করে চলে যাচ্ছিলেন, লোকজন ঘরে তার শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করার জন্য আসছিল। মুহাম্মদের শীর্ষ ব্যক্তিরা ছাড়াও, শুধুমাত্র তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, যেমন তার মেয়ে ফাতিমা, তার চাচা আব্বাস, আব্বাসের ছেলে ফাডল (Fadl) এবং কুথাম (Qutham), আয়েশার সৎ ভাই আবদুল্লাহ, অন্যান্য স্ত্রী এবং কিছু দীর্ঘদিনের বেশ কয়েকজন দাস ও সহযোগীকে ছোট ঘরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

সকালে তিনি সুসংহতভাবে কথা বলছিলেন। যখন তিনি আয়েশার সাথে বিশ্রাম নিলেন, তখন তিনি তার সমানে থাকে মানুষদের কেয়ামতের দিন সুপারিশকারী হিসেবে তার ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তার জন্য দোয়া করতে বললেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর, বিশেষ করে প্রতি শুক্রবার, বাধ্যতামূলক নামাযের দিনে দোয়া করতে বললেন, কারণ এই ধরনের প্রার্থনা কিয়ামতের দিন তাদের পক্ষ থেকে তাকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে। "শুক্রবার আপনাদের জন্য অন্যতম সেরা দিন। ঐদিনই আদম কে সৃষ্টি করা হয় এবং এই শুক্রবারেই তিনি মারা যান। যার জীবন শুরু হয়েছিল একটি নিঃশ্বাস দিয়ে, এবং তার শেষ হয়েছিল বজ্রপাত দিয়ে। সেদিন আমার জন্য প্রার্থনা করুন, কারণ আপনাদের প্রার্থনা আমার কাছে পৌঁছানো হবে''। যখন তাকে জিজ্ঞাস করা হয় এটা কি করে সম্ভব কারণ তার শরীরতো ক্ষয় হয়ে যাবে, তিনি উত্তর দিলেন, "আল্লাহ পৃথিবীকে(মাটিকে) নবীদের মৃতদেহ খেতে নিষেধ করেছেন", অর্থাৎ তার শরীর সাধারণ মানুষের মত ক্ষয়ের অপমান থেকে রক্ষা পাবে (৭)।

তিনি তার শরীর ধোয়ার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন, কিন্তু শুধু তার ঘনিষ্ঠ পুরুষ আত্মীয়রা ধুতে পারবে "অনেক ফেরেশতা থাকবেন যারা আপনাদের দেখতে পাবেন, কিন্তু আপনারা তাদের দেখতে পাবেন না" এবং তার আবরণের জন্য সাধারণ কাপড় "অথবা ইয়েমেনি কাপড় অথবা মিশরের সাদা কাপড়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ফেরেশতাদের জন্য তার একটি বিশেষ অনুরোধ ছিল: "যখন তোমারা আমাকে ধুয়ে ফেলবে, আমাকে কাপড়ে মুড়িয়ে দেবে, এবং আমাকে আমার কবরের কিনারায় রেখে কিছুক্ষনের জন্য আমার কাছ থেকে চলে যাবে, প্রথম যে ফেরেস্তা আমার দেহের উপর প্রার্থনা করবে তিনি হচ্ছেন জিব্রাইল, মিখাইল, তারপর ইস্রাফিল, তারপর রূহ কবজকরি এবং আরো অনেক ফেরেস্তারা আমার আত্মার শান্তির জন্য দোয়া করবে" (৮)।

সকাল গড়াতে গড়াতে তার জ্বর আরো বাড়তে লাগলো এবং নানান অসলগ্ন কথা যা মনে আসছিলো তাই বলে যাচ্ছিলেন, এবং ক্ষনে ক্ষনে তিনি মূর্ছা যাচ্ছিলেন। পুরো সময়টিতে তিনি আয়েশার বুকেই মাথা দিয়ে ছিলেন। একবার তিনি চোখ খুলে বললেন, “নবীরাই সবচেয়ে যন্ত্রণা কষ্ট ভোগ করেন", আবার আরেকবার বললেন, “একজন মানুষ তার বিশ্বাসের গভীরতা অনুযায়ী যন্ত্রণা ভোগ করেন; বিশ্বাসের প্রতি অটল থাকলে তার যন্ত্রণা তত তীব্র হবে"। আগেই তিনি বলেছেন যে তিনি আলঙ্কারিক কবর চান না, কারণ সেটা হয়তো মানুষ পূজার স্থান বানিয়ে ফেলবেন, যেটা হবে মূর্তি পূজার নামান্তর। যখন তিনি বিলীন হয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর মাথায় এই চিন্তা ঢুকে পড়ল যে, খ্রীষ্টান ও ইহুদিরা তাদের নবীদের কবরকে উপাসনাস্থলে পরিণত করেছে। এই ভেবেই এক পর্যায়ে তিনি রেগে গেলেন এবং বিশেষ কারো দিকে না তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন, "আল্লাহ ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের ধ্বংস করুক! তারা তাদের নবীদের কবরকে প্রার্থনার স্থান হিসেবে গ্রহণ করেছে" (৯)।

এই ধরনের মানসিক বিস্ফোরণ তাকে ক্লান্ত করে দিয়েছিল। আয়েশার বুক থেকে তার মাথা পরে গেল, কিন্তু ইহুদী, খ্রীষ্টান, বহুশ্বরবাদী এবং যারা তার বিরোধিতা করেছিল এবং তার ধর্মের বিরোধিতা করেছিল তাদের প্রতি তার ঘৃণা আবার যেন জেগে উঠেছিল। চূড়ান্ত বিস্ফোরণে তিনি বললেন, "আরব দেশে দুটি ধর্ম পাশাপাশি থাকবে না'' (১০)। সময়টি ছিল গ্রীষ্মের শুরু দিকে, এবং দুপুরের রোদ্রের উত্তাপ ঘরের ভিতর শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার পরিণত করেছিল। কেউ একজন এক বাটি পানি নিয়ে তার পাশে রাখলেন। বাটিতে আঙ্গুল ডুবিয়ে মুখ মুছতে মুছতে তিনি চিৎকার করে বললেন, "হে আল্লাহ, আমাকে মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি দিন"। ঠিক তখনই আয়েশার ভাই আবদুল্লাহ ঘরে ঢুকলেন। তার সাথে একটা মেস্যাওয়াক (toothpick) তথা খড়কে ছিল, যেটা হয় খেজুরের ডাল থেকে অথবা সিওয়াক (siwak) গাছের ডাল দিয়ে বানানো হতো। মুহাম্মদ সবসময় দাঁত পরিষ্কার করার জন্য এই ধরনের গাছের ডাল ব্যবহার করতেন। এটা তাকে খুশি করবে ভেবে আয়েশা মেসওয়াকটি হাতে নিয়ে শেষের দিকটা চিবিয়ে ব্রাশের মোট নরম করে মুহাম্মদকে দিলেন। তিনি জ্বর নিয়েই দাঁত ঘষতে লাগলেন।

এরপর তিনি হাত তুলে বললেন, "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই"। তারপর তিনি বললেন, "মৃত্যুর নিজস্ব যন্ত্রনা আছে!" কিছুক্ষণ পর তার চোখ যেন কোন দূরবর্তী বস্তুর উপর স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলো। তিনি বাম হাতের তর্জনী তুলে বললেন, "সর্বোচ্চ সঙ্গীর সাথে! সর্বোচ্চ সঙ্গীর সাথে!" সম্ভবত তিনি আল্লাহর কথাই উল্লেখ করেছিলেন। যখন তিনি আবার পানির জন্য হাত বাড়ালেন মৃত্যু তার দিকে ধেয়ে এলো। পানি স্পর্শ করার সময় তার হাত কাঁপছিলো, আর মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, তার কমলা দাড়ি বুকে এসে লাগলো। মৃত্যুর মুহূর্তেও তিনি আয়েশার দিকে ঝুঁকে ছিলেন। আয়েশা উঠে তার মাথার নিচে একটি চামড়ার বালিশ গুঁজে দিলেন, এবং তিনি এবং অন্যান্য মহিলারা তাদের বুক চাপড়াতে শুরু করলেন এবং শোকে তাদের মুখে চড় মারতে লাগলেন, কিন্তু তারা চিৎকার বা মাটিতে গড়াগড়ি করা থেকে বিরত রইলেন, কারণ ঐভাবে শোক প্রদর্শন মুহাম্মদ নিষিদ্ধ করেছিলেন (১১)।

তার মৃত্যুর সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো, কিন্তু অনেকেই তা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করলেন। আয়েশা আবু বকরকে খবর দিতে আবদুল্লাহকে পাঠালেন এবং ফাতিমা গেলেন আলীকে খবর দিতে। আবু বকর যখন মসজিদে পৌঁছালেন তখন তিনি

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ছুটে সোজা আয়েশার ঘরের দিকে গেলেন। মৃতদেহ দেখে তিনি বললেন '' আমাদের মালিকই আল্লাহ আর তাঁর কাছে আমরা ফিরে যাই! আল্লাহর রাসূল মারা গেছেন!",(১২) তিনি মুহাম্মদের কপালে চুমু খেয়ে পাটাতনে গেলেন। উমর এতোই বিমর্ষিত ছিলেন যে, তিনি বিশ্বাস করতে চাইলেন না যে মুহাম্মদ মারা গেছেন এবং মঞ্চ থেকে জনতার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছিলেন আর বলছিলেন: এটা মিথ্যা কথা যে মুহাম্মদ মারা গেছেন! মুনাফিকরা এই গুজব ছড়িয়েছে, তারা একই রকম মিথ্যা ছড়িয়েছিলো যখন মুসা চল্লিশ দিন পর্যন্ত নিখোঁজ ছিলেন। তিনি চল্লিশ দিন পর ঠিকই ফিরে এসেছিলেন! "আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূলও ফিরে আসবেন এবং যারা মৃত বলে গুজব ছড়াচ্ছে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলবে" (১৩)।

উমর এই ধরনের গুজব ছড়ানোর জন্য দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে মেরে ফেলার হুমকি পর্যন্ত দিলেন। আবু বকর তাকে চুপ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু তার বিদ্রুপ চলতেই লাগল, একপর্যায়ে তখন আবু বক্কর তাকে থামিয়ে দিয়ে পরিস্তিতি নিজের আয়ত্বে নিলেন। তিনি নিশ্চিত করেন যে মুহাম্মদ সত্যিই মারা গেছেন, এবং তিনি একটি আয়াত পাঠ করেন যেখানে বলা হয়েছে যে মুহাম্মদ কেবল আল্লাহর রসূল এবং রাসূলগণ আগেও এসেছিলেন এবং চলেও গেছেন এবং একমাত্র আল্লাহই অমর ছিলেন।

শোকের প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার হস্তান্তরের আলোড়ন সৃষ্টি করলো। তবে ক্ষমতার দ্বন্দ শুরু হয়েছিল এক সপ্তাহ আগে, যখন মুহাম্মদের শীর্ষ ব্যক্তিরা সিরিয়ায় যাওয়ার ব্যাপারে ওসামাকে অনুসরণ করার আদেশকে অমান্য করে, যার ফলে ইয়াত্রীব প্রস্থান বিলম্বিত হয়েছিল। সম্ভবত এই দোদুল্যমনটা কারণ তারা উনিশ বছর বয়সী প্রাক্তন ক্রীতদাসের ছেলের অধীনে সিরিয়া আক্রমনে আপত্তি করেছিল। মুহাম্মদ এই কথা শোনার পরে মসজিদে সমাবেশের সময় তাদের এই গড়িমসির সমালোচনা করলেন, ওসামার প্রশংসা করলেন এবং তার নিয়োগই বহাল থাকবে বলে জানিয়ে দেন। তবে ওসামার সেনাবাহিনী কখনোই ইয়াছরিবের উত্তরে মঞ্চ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করতে পারেনি। সবাই জানত যে মুহাম্মদ মারা গেলে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হবে, এবং উমর এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মক্কাবাসী যাদের মুহাম্মদ ওসামার সাথে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন তারা এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দূরে থাকতে চাননি, সুতরাং তারা সেই এলাকায় আসতে ব্যর্থ হওয়াই, ওসামা সিরিয়ার পথে যাত্রা স্থগিত করে দেয়।

মুহাম্মদের মৃত্যুর সময়, তিনটি প্রধান দল গঠিত হয়েছিল। মক্কানরা দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়, একটি শিবির একজন যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে আলীকে সমর্থন করে, যেহেতু তিনি একজন রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় ছিলেন এবং মুহাম্মদের রক্ত আলীর দুইপুত্র সন্তান হাসান ও হুসাইনের মাধ্যমে অব্যাহত ছিল। জুবায়ের আলীর পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন, অন্যান্য অনেক হিজরতকারী বিশ্বাস করতেন যে এই উত্তরাধিকার আসলে মুহাম্মদের বংশ হাশিমি গোত্রের জন্য সংরক্ষিত হওয়া উচিত। মুহাম্মদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তি এবং তার ধর্মের বিস্তারের অন্নতম ব্যাক্তিবর্গ, আবু বকর ও উমরকে ঘিরে আরেকটি দল গঠিত হলো। আয়েশা তার পিতার একজন কড়া সমর্থক ছিলেন, আংশিকভাবে তার প্রতি ভক্তি থেকে, কিন্তু একই সাথে আলীর প্রতি ঘৃণা থেকেও। কারণ, মুস্তালিক অভিযানের সময় তার সতীত্বের প্রতি যেই অভিযোগ আনা হয়েছিল, আলী তখন সেই গুজবে বিশ্বাস করেছিলেন এবং কিছুটা হাওয়া বাতাসও দিয়েছিলেন। তৃতীয় একটা পক্ষ আবির্ভুত হয় তারা ছিলেন প্রথম দিকের ইয়াথ্রিব ধর্মান্তরিতরা, তারাও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অধিকার দাবি করে।

ইয়াত্রীবিয়ানদের দাবীর পিছনে আংশিক ইন্ধন জুগিয়েছে মক্কানদের প্রতি তাদের মনোভাব, মক্কানরা দশ বছর আগে তাদের উপত্যকায় এসেছিল এবং তাদেরই সকল কিছু দখল নিয়েছিল। ইয়াছরিব ধর্মান্তরিতরাই প্রথম উত্তরাধিকারী বেছে নেওয়ার জন্য সাদ উবাদা গোত্র প্রাঙ্গণে আউস এবং খাজরাজ নেতাদের সাথে একটি সভা করলেন, এই সভাই মুহাম্মদের মৃত্যু পরবর্তী ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রথম ক্ষেত্র। উমর ও আবু বকর যখন বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন তারা তাড়াহুড়া করে মুহাম্মদের মৃতদেহ আয়েশার ঘরে আটকে রেখে আবু উবাইদা ইবনে আল-জারার (Abu Ubayda ibn al-Jarra) সাথে সাক্ষাতের জন্য করে চলে গেলেন। এই সেই আবু উবাইদা যিনি বদরের যুদ্ধে নিজ হাতে পিতাকে হত্যা করেছিলেন, যিনি

উহুদের যুদ্ধে মুহাম্মদের মুখ থেকে রক্ত চেটে গিলেছিলেন। এটা একটা অত্যন্ত জটিল সভা ছিল। শুধু মুহাম্মদের ধর্মের নেতৃত্বই ঝুঁকিতে ছিল না, বরং সমস্ত আরব উপদ্বীপের উপর নিয়ন্ত্রণও ছিল ঝুঁকির মুখে। একের পর এক লোক এসে মেঝেতে বসে আনসারদের উৎসাহিত করছিল -প্রথম দিকের আউস এবং খাজরাজ সাহায্যকারী এবং মুহাম্মদের সমর্থকদের মধ্যে এই আনসাররাই একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারী হবেন। মক্কানরা হয়তো "নবীর মানুষ" ছিল, কিন্তু আনসাররা ছিল "আল্লাহর দলের অংশ" এবং তাদের অধিকার আছে ক্ষমতা পাওয়ার। দরকার হলে তারা মক্কানদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে রাজি ছিল, তারা প্রস্তাব দিলেন "আমাদের মধ্যে একজন নেতা এবং আপনারদের মধ্যে থেকে একজন নেতা"-- এটিই তাদের স্লোগান হয়ে ওঠলো (১৪)।

আবু বকর উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলেন। তিনি আনসারদের সাথে একমত যে তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আরবরা সাধারণভাবে মুহাম্মদের গোত্র কুরাইশদের কর্তৃত্ব স্বীকার করবে। তার যুক্তি দেওয়ার পর তিনি উমর ও আবু উবাইদার হাত তুলে ধরলেন এবং তাদের দুইজনের মধ্যে থেকে নেতৃত্ব বেছে নেওয়ার জন্য সমাবেশকে আহবান করেন। কিন্তু আনসাররা দুই জন নেতা, একজন মক্কা থেকে এবং একজন ইয়াছরিব থেকে নিতে হবে বলে জোর দিতে থাকে। এটা নিশ্চিত নয় যে, আলোচনা কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছে, কিন্তু এটা পরিষ্কার যে সকল অংশগ্রহণকারী বুঝতে পেরেছে যে যদি একজন উত্তরাধিকারীকে সেই মুহূর্তে বেছে না নেওয়া হয় তাহলে প্রতিটি পক্ষ একজন নেতা নিয়োগ করতে পারে এবং এর ফলে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতে পারে। অবশেষে, উমর সবাইকে রাজি করান আবু বকরকে বেছে নিতে।

তিনি যুক্তি দেখান যে, আল্লাহ তা'আলা আবু বকরকে নির্বাচন করেছেন একজন বিশেষ সঙ্গী হিসেবে, কারণ তিনিই মুহাম্মদকে মক্কা থেকে পালানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি যোগ্য প্রার্থী ছিলেন, কারণ কুরআন ও মুহাম্মদের সুন্নাত সম্পর্কে তার নিখুঁত জ্ঞান ছিল। যদিও মোহাম্মদ কাউকে নির্বাচন করে যাননি, কিন্তু তাকে নামাজের নেতৃত্বের জন্য নির্বাচন করেছিলেন, এটি অনেক বড় একটি সম্মান ছিল। উপরন্তু, যদিও মুহাম্মদ সুনির্দিষ্টভাবে কোন উত্তরাধিকারীর নাম উল্লেখ করেননি, তিনি আবু বকরকে দৈনন্দিন প্রার্থনার নেতৃত্ব দেবার জন্য নিয়োগ দিয়ে তার অগ্রাধিকারের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। অবশেষে যখন একটি ভোটাভোটির সময় আসলো, আবু বকরকে বেছে নেওয়া হলো । তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন আনসার ও মক্কানরা তাঁর কাছে এসে একের পর এক শপথ নিলেন, পরের দিন বৃহৎ সমাবেশে মুহাম্মদের উত্তরসূরি হিসেবে আবু বক্করকে উপস্থাপন করা হয়।

মুহাম্মদের মৃতদেহ নামাজের পাটাতনের পিছনের ঘরে একটি কম্বলের নিচে পড়ে থাকা অবস্থায় আবু বকর মসজিদের মিম্বারে বসলেন। উমর মিম্বারে কিনারায় দাঁড়িয়ে লোকজনের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি আগের দিনের বিদ্রুপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, তিনি বলেন যে তার বক্তব্য মুহাম্মদের উপর "পথ নির্দেশক" হিসেবে নাজিল হওয়া "ঈশ্বরের বই" দ্বারা যৌক্তিক প্রমান করতে পারবেন না, কিংবা মুহাম্মদের সুন্না দ্বারাও নয়। তাঁর বক্তব্য হৃদয়ের গভীর থেকে এসেছিল, তিনি আশা করেছিলেন যে, মুহাম্মদও বেঁচে থাকলেও তাতে সায় দিতেন। মুহাম্মদ মারা গেলেও, কোরআন জীবিত আছেন। তিনি আবু বকরের দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং বলেন, "আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোককে আপনাদের কাজের জন্য ঈশ্বর নির্বাচন করেছেন", তিনি আনসারদের সাথে আগের দিনের যুক্তিই আবার পুনরাবৃত্তি করে বললেন "উঠুন এবং তার প্রতি আনুগত্যের শপথ করুন" (১৫)।

অনিচ্ছাকৃত হলেও আবু বকর বিভিন্ন দলকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং রক্তপাত প্রতিরোধের আশায় নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। গণ অঙ্গীকার শেষ করে তিনি একটি সমঝোতামূলক ভাষণ দেন এবং সব বিষয়ে কোরআন ও মুহাম্মদের উদাহরণ অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতি দেন: "আমি তোমাদের উপর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছি, যদিও আমি তোমাদের মধ্যে সেরা নই, যদি আমি ভালো করি, তাহলে আমাকে সাহায্য করো। যদি আমি ভুল করি, তাহলে আমাকে শুধরে দিবে" (১৬)। জিহাদকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা দিয়ে তিনি তার দীর্ঘ ভাষনের উপসংহার টেনেছিলেন। "তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ যেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা

থেকে বিরত না থাকে, কারণ যদি কোন মানুষ তা(জিহাদ) পরিত্যাগ করে, তাহলে ঈশ্বর তাদের অপমান করবেন" (১৭)। আলী ও তার দল এই বৈঠকে স্পষ্টভাবে অনুপস্থিত ছিল। আগের দিন জুবায়ের প্রকাশ্যে তার তলোয়ার খুলে ঘোষণা করেন যে, আলী মুহাম্মদের উত্তরসূরি হিসেবে স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তার তলোয়ার কোষে ঢুকাবেন না। আবু বকরের ভাষণের পর উমর, আলীকে ও তার সমর্থকদের মসজিদে দাওয়াত দেন এসে বায়াত গ্রহন করতে, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাই আবু বকর ও উমর একদল সশস্ত্র লোক নিয়ে আলীর বাড়িতে গেলেন সবাইকে বের করে দিতে। উমর চিৎকার করে বললেন, "হয় তুমি বের হয়ে আবু বকরের আনুগত্যের শপথ নিবে, নয়তো আমি ঘরে আগুন ধরিয়ে দেব" (১৮)।

জুবায়ের তার তলোয়ার নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু কেউ একজন তার দিকে পাথর ছুড়ে মারে এবং তিনি পাথরের আঘাতে পরে যায়। তাকে দ্রুত দমন করা হয় এবং নিরস্ত্র করা হয়। বাকি যারা লুকিয়েছিলেন অবশেষে তারাও অনুগত্য গ্রহণ করে। সেদিন অথবা পরের দিনের রাতে মুহাম্মদের দাফন অনুষ্ঠিত হয়। দাফন কার্য শুরু হয় তার শরীর ধৌত করার মাধ্যমে। যদিও এটা সাধারণত করা হতো না, শুধুমাত্র পুরুষ আত্মীয়দেরকেই মুহাম্মদের দেহ ধোয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, এবং তাও তার কাপড় পরিহিত অবস্থায়, যা সাধারণত করা হতো না। ইসলামিক ঐতিহাসিক গ্রন্থে দাবি করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র পুরুষ আত্মীয়রা তাকে গোসল দেয়ার কারণ ছিল তার ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে, কিন্তু তাকে তার পরিহিত অবস্থায় ধৌত করার পিছনে হয়তো একটি বিব্রতকর পরিস্থিতি কারনে হতে পারে। সেটি হলো, মৃত্যুর পরপর তার শরীরের অন্যান্য স্থান থেকে রক্তের প্রবাহ পুরুষাঙ্গে এসে আটকে গিয়ে তা শক্ত ও উত্থিত দন্ডপ্রায় হয়ে গিয়েছিল, যা আসলে death erection তথা মৃত্যুজনিত লিঙ্গউত্থান বলে থাকে; যাকে সচরাচর বাজে অর্থে ("angel lust") "কামুক ফেরেস্তা" বলে অভিহিত করা হতো। এটিকে লুকানো সম্ভব ছিল না। এমনটাই উল্লেখ করেছেন ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন (Edward Gibbon), যিনি চতুর্দশ শতাব্দীর একজন প্রভাবশালী ইতিহাসবিদ আবু আল-ফিদা'র (Abu alFida) বই থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আবু আলফিদা লিখেছেন যে, যখন আলী মুহাম্মদের মৃত শরীরের অবস্থা দেখেন, তখন তিনি প্রশংসার সাথে বলেন, "হে আল্লাহর নবী, কোন সন্দেহ নেই যে আপনার লিঙ্গ পর্যন্ত জান্নাতে পৌঁছেছে!" (১৯)

এই বিবরণ বরাবরের সব পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় না এবং হয়ত সম্পাদনা করা হয়েছে, অথবা বাদ দেওয়া হয়েছে (২০)। তবে এটি সর্বজন স্বীকৃত গ্রন্থে অদ্ভুত শব্দের প্রয়োগ অথবা উল্লেখ বুঝে নেওয়া যায় যে তার মৃত দেহটি সাধারণ ছিল না একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, আলী মুহাম্মদের শরীর দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, "জীবিত এবং মৃত্যুর পরও আপনি কত চমৎকার! - মুহাম্মদের বিখ্যাত যৌন দক্ষতার ইঙ্গিত। তাবারি উল্লেখ করেছেন যে, তার শরীর "একটি সাধারণ মৃতদেহ যেমন দেখা যায় তেমন ছিল না" (২১)। যদিও প্রশংসায়, আলী এবং অন্যান্য পুরুষরা কিভাবে গোসল দিতে হবে তা নিয়ে অদ্ভুত আচরণ করছিল, কারণ কেউ মৃতদেহের কাপড় খুলতে চায়নি, কিন্তু আবরণ খুলে ধোয়া ছিল গৃহীত পদ্ধতি। ইসলামিক ইতিহাস গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, তারা কিভাবে কি করবেন এ নিয়ে আলোচনা করতে করতেই সবাই হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে, এবং হটাৎ কোথাও থেকে একটি কণ্ঠস্বরের ভেসে আসা আদেশ শুনে জেগে ওঠে, যেখানে বলা হয়, "নবীকে তার কাপড় আবৃত অবস্থাই ধৌত করুন!"(২২)

অতঃপর মুহাম্মদের দেহ সেই মোতাবেকই ধৌত করা হয়েছিল তার মৃত্যুর পোশাক পরিধিত অবস্থায়। তার গায়ে পানি ঢেলে দেওয়া হল এবং আলী ভেজা কাপড় দিয়ে তার চামড়া ঘষতে লাগলেন। আয়েশা পরে অভিযোগ করেন, "পরে যা শুনেছি তা যদি আমি প্রথমে জানতাম, তাহলে কেবল তার স্ত্রীরাই আল্লাহর রাসূলকে ধৌত করতেন"(২৩)।

মুহাম্মদের মৃতদেহ কাফনে আবৃত হয়ে গেলে কিন্তু লোকেরা তাকে কোথায় কবর দিতে হবে তা নিয়ে আবার বিতর্ক শুরু করলেন। কেউ কেউ ভেবেছিল সবচেয়ে ভালো জায়গা হবে মসজিদের উঠান; অন্যরা বলছে যে এমন জায়গা কবরস্থ করতে হবে যেখানে তিনি বিশ্বাসীদের প্রার্থনার নেতৃত্ব দিতেন, যা ছিল মূলত ধর্ম প্রচারক পাটাতনের সামনের জায়গাটি। অন্যরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, তাকে ঘরকাদ (Gharqad) বাগানে সমাহিত করা উচিত যেখানে তার অনেক সঙ্গীদের মাটি দেয়া

হয়েছে। আবু বকর অবশ্য মুহাম্মদের একটি কথা স্মরণ করে বলেন তিনি একবার বলতে শুনেছিলেন যে, নবীদের সবসময় সেই জায়গায়ই কবর দেওয়া হয় যেখানে তারা মারা যায়। তখন তারা তাকে আয়েশার ঘরে সমাধিত করতে রাজী হলেন। একজন কবর খননকারীকে আনা হয়েছিলো। খননের পুরো সময়টা মুহাম্মদের মৃতদেহ মাদুরের উপর পড়ে ছিল, যা একটি দেয়ালের কাছে ঠেলে রাখা হয়েছিল। যখন খনন কাজ সম্পন্ন হল, তখন সবাই এক ঘণ্টার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে গেল যাতে ফেরেস্তারা তার জন্য প্রার্থনা করতে পারে" (২৪)।

যখন ঘন্টা শেষ হল, তখন লোকজন ঘরের ভিতরেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলেন আবু বকর ও উমর মুহাম্মদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তার স্ত্রী এবং তার আত্মীয়-স্বজন ও স্ত্রীদের সন্তানদের ধীর গতির এই শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দিলেন। যখন তাদের দেখা শেষ হয় তখন বিশ্বাসীদের ছোট ছোট দলকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হলো।

বাতির আলোতে মুহাম্মদকে মধ্যরাতে সমাহিত করা হয়। আব্বাসের পুত্রসহ চারজন কবরে দাঁড়িয়ে ছিল এবং তাদের কাছে মৃতদেহ নামিয়ে দেওয়া হল। কবরটি মাটি দিয়ে ভর্তি করা হয় এবং চিহ্ন হিসেবে টিলার উপর কিছু ইট স্থাপন করা হয়। পরের দিন ঘরটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাইফের পলাতক গণহত্যাকারী মুঘিরা ইবনে শুবা (Mughira ibn Shuba), যিনি মুহাম্মদের দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করতেন এবং যাকে আল-লাতের মন্দির ধ্বংস করতে পাঠিয়েছিলেন, তিনি গর্ব করে বলতেন যে তিনিই শেষ ব্যক্তি যার সাথে মুহাম্মদের শারীরিক স্পর্শ লেগেছিলো। প্রথম মাটি তার শরীরের উপর নিক্ষেপ করার আগে, মুগিরা তার একটি আংটি কবরে ছুঁড়ে মারেন যাতে তা মুহাম্মদের উপর গিয়ে পরে। তিনি বলতেন, "আমি এটা ইচ্ছাকৃতভাবে সেখানে ফেলে দিয়েছি যাতে আমি রাসূলকে স্পর্শ করতে পারি, যাতে আমি আল্লাহর রাসূলকে স্পর্শ করা শেষ ব্যক্তি হতে পারি" (২৫)।

যত তাড়াতাড়ি মুহাম্মদ তার কবরে সমাহিত হয়ে গেলেন, তত দ্রুতই যেনো সারা আরব জুড়ে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লো। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে, বেদুইন উপজাতি যারা তার প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছিল তারা প্রতিশোধ নিতে দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। ইয়েমেনের হাদ্রামাউত (Hadramaut region) অঞ্চলে মুহাম্মদের মৃত্যুর কয়েক মাস আগেই এই অসন্তোষের প্রথম লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। সেই সময় আনস (Ans) গোত্রের আসওয়াদ নামে একব্যাক্তি নিজেকে বাজিকর ও জাদুকর হিসেবে নিজেকে নবী ঘোষণা করেছিলেন। তিনি একটি সৈন্য দল গড়ে তুলেছিলেন এবং মুহাম্মদ সেই অঞ্চল পরিচালনার জন্য যেই যেই ব্যাক্তিদের নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি তাদের হয় তাড়িয়ে দেন বা হত্যা করেছিলেন। কিন্তু তিনি আবার মুহাম্মদের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত একজন আততায়ী হাতে নিহত হয়েছিলেন, তার খুনের ঘটনাটি ঘটে মুহাম্মদের মৃত্যুর একদিন আগে। মুহাম্মদের মৃত্যুর পর বিদ্রোহেরা ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং বিশেষ করে যেসকল উপজাতিদের মুহাম্মদ তার সামরিক বাহিনী দ্বারা গুঁড়িয়ে বা আয়ত্তে নিয়েছিলেন, যেমন হাওয়াজিনদের। এমনকি মক্কাও বিদ্রোহে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মুহাম্মদের মৃত্যুর খবর পেয়ে মক্কাবাসীরা মুহাম্মদের নিযুক্ত গভর্নরকে শহরের বাইরে ধাওয়া করে নিয়ে যায়, কিন্তু তাদের বিদ্রোহ বেশিদিন টিকেনি সুহায়েলের কারণে, এই সেই সুহায়েল যাকে বদর যুদ্ধে আটক করা হয়েছিল তাকে ইয়াছরিব মসজিদে সাওদার কক্ষে বন্দী রাখা হয় , তিনি এখন একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মুমিন, বিদ্রোহী সবাইকে শিরোচ্ছেদ করার হুমকি দিলেন।

যে কোন সুখী বা বেদনাদায়ক মুহূর্তে সদা কাঁদতে প্রস্তুত থাকা আবেগপ্রবণ আবু বকরকে এমন একটি সংকটাপন্ন সময়ে একজন নেতার মতো মনে হচ্ছিল না,তবে তিনি মুহাম্মদের মতো একজন নিষ্ঠুর এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শাসক হয়ে উঠেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, হাদরামুতের (Hadramau) কিছু নারী হাতে মেহেদি লাগিয়ে নাচ গান করে মুহাম্মদের মৃত্যুকে উদযাপন করেছে, তখন তিনি ওই নারীদের সায়েস্তা করার জন্য একটি বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। তার আদেশে তাদের হাত কেটে ফেলা হয় এবং এরপর তাদেরকে "হাদ্রামুটের পতিতা (harlots of Hadramaut) ট্যাগ লাগিয়ে দেয়া হয়, যদিও তারা সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য ছিলেন। তিনি সামরিক বিষয়াদি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিতে একটুও সময় নষ্ট করেননি। মুহাম্মদের

দাফনের পরের দিন, তিনি ওসামাকে তিন হাজার বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে বিলম্বিত প্রতিশোধ অভিযানে সিরিয়ায়পাঠান, যদিও তিনি জানতেন বিভিন্ন বিদ্রোহী উপজাতির দ্বারা ইয়াছরিব আক্রমনের সম্ভাবনা রয়েছে। ওসামা সিরিয়া যাওয়ার পথে এবং ফেরার সময় ছোটখাটো বিদ্রোহগুলো গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। সিরিয়ায় তার সেনাবাহিনী পশ্চিম সিরিয়ার উচ্চভূমির খ্রিস্টান আরবদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়, এই অঞ্চলটি বাইবেলে মোয়াব (Moab) নামে পরিচিত। বলা হয় যে, তিনি সেখানে তার তিন বছর আগের তার বাবার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করেছিলেন, মাথা কেটে ফেলেছিল।

মুহাম্মদের মৃত্যুর পর আরবের রাজনৈতিক পরিবর্তন ছিল বিস্ময়কর। মৃত্যুর আগে তিনি মূলত সমগ্র আরবকে নিয়ন্ত্রণ করতেন, তার মৃত্যুর পর অধিকাংশ আরব তার আরোপিত সকল কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, বিরুদ্ধচারণ করেন এবং শুধুমাত্র আবু বকরের ভাগ্য ও হিংস্রতাই মুহাম্মদের উত্তরাধিকারকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। প্রায় রাতারাতি এই ঘটনা ঘটেছে। ওসামা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হবার দুই সপ্তাহ পরেই, হাইজিন এবং ঘাটাফানরা একটি জোট তৈরি করে। মনে হচ্ছিল তাদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হাত চুলকাচ্ছিল, মুহাম্মদ তাদের উপর যে অন্যায় অত্যাচার করেছে, তা ফিরিয়ে দেয়ার যেন এখনই সময়,তারা সেই লক্ষ্যে ইয়াছরিবের কাছাকছি পর্যন্ত চলে আসেন।

আবু বকর তাড়াতাড়ি আরেকটি সৈন্যদল একত্রিত করে আলী, জুবায়ের ও তালহাকে সেনাপতি হিসেবে ঘোষণা করেন। ওসামা সিরিয়ার দুর্গ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত এরা তাদের শত্রু উপজাতিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়। এরপর আবু বকর একটি বৃহত্তর সৈন্যদল একত্রিত করেন এবং খালিদকে সেনাপতি হিসেবে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে গণহত্যার খ্যাতির কারণে "আল্লাহর তলোয়ার" বলে অভিহিত করা খালিদ বিন ওয়ালিদ , পূর্ব-মধ্য আরবের অন্যতম প্রধান প্রাচীরঘেরা বিদ্রোহী দুর্গ ইয়ামামা (Yamama) শহরে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত সম্ভাব্য বিপদজনক উপজাতিদের সাথে যুদ্ধ করে পরাজিত করেন। এক সপ্তাহব্যাপী অবরোধের পর ইয়ামামার পতন ঘটে। একই সময়ে, আবু বকর ইয়েমেন এবং আরবের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা বিদ্রোহ গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য ছোট ছোট বাহিনী পাঠান। যদিও বিদ্রোহেরা প্রাথমিকভাবে আরবের অধিকাংশ নিয়ন্ত্রণ করে, তবে তারা একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করতে সক্ষম ছিলেন না, এবং অবশেষে শাসক আবু বকর তার প্রথম শাসন বছরের শেষে বিদ্রোহের এই আগুন নিভিয়ে দিতে সক্ষম হন। তিনি তারপর মাত্র এক বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে মধ্যে মুহাম্মদ যা সৃষ্টি করেছিলেন তিনি আরবের সীমানা ছাড়িয়ে আরবের বাইরের সম্প্রসারণ শুরু করেন।

এখন ইয়ামামায় ঘাঁটি গেড়ে খালিদ পশ্চিম ইরাকে ছয় মাস ধরে হামলা চালিয়েছে, অসংখ্য সংঘর্ষে পারস্য এবং তাদের খ্রিস্টান আরব মিত্রদের পরাজিত করেছে। এগুলো ছিল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। যদিও ইসলামিক গ্রন্থে বলা হয়, ত্রিশ হাজার পারস্য এবং খ্রিস্টান আরব সৈন্য সেই যুদ্ধে নিহত হয়, অন্য যুদ্ধে সত্তর হাজার। পরবর্তীতে, হাজার হাজার বন্দী সৈন্যকে একটি নদীর কিনারায় আনা হয় যেখানে তাদের শিরোচ্ছেদ করা হয়। তাদের মৃতদেহ নদীতে ফেলে দেওয়া হয়, যার ফলে তিন দিন ধরে নদীর পানি লাল হয়ে প্রবাহিত হয় (২৬)। ইরাক থেকে খালিদ সিরিয়ার দিকে তার হিংস্র তলোয়ার ঘুরিয়ে ইরাক সীমান্ত থেকে দামেস্ক পর্যন্ত মৃত্যুর চিহ্ন রেখে যায়। প্রতিটি অঞ্চল তিনি লুণ্ঠন করেন এবং আবু বকরের জন্য বিপুল সম্পদ ইয়াছরিবে নিয়ে আসেন, যাকে এখন বলা হয় মদিনা, রাসুলের শহর, যা তখন একটি নতুন সাম্রাজ্যের আসন।

আবু বকর ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে মারা যান, খালিদ তখন দামেস্কের দোরগোড়ায় ছিলেন। উমর তার স্থলাভিষিক্ত হন, যাকে ৬৪৪ সালের নভেম্বর মাসে হত্যা করা হয়। তিনি উসমান দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হন, যাকে আবার ৬৫৬ সালের জুন মাসে হত্যা করা হয়। তিনি আবার আলী দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হন, যাকে ৬৬১ সালের জানুয়ারি মাসে হত্যা করা হয়। এই সাতাশ বছরে তারা সিরিয়া, মিশর ও পারস্য জয় করে এবং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের বাসিন্দাদের হয় ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করে অথবা জিজিয়া কর পরিশোধ করতে বাধ্য করে। পূর্ব দিকে তাদের সৈন্যরা এখনকার পাকিস্তান অব্দি চলে আসে আর কৃষ্ণ সাগরের তীরে পৌঁছে। পশ্চিমে তারা তাদের পথ কেটে এখনকার তিউনিশিয়ায় পর্যন্ত পৌঁছে যায় । বিপুল পরিমান সম্পদ বিজয়ী দেশগুলো থেকে আরব দেশে প্রবাহিত হয়। মুহাম্মদের সৃষ্ট সৈন্যবাহিনী সফল হয়েছিল, কারণ তারা সেই জাদুময়

উদ্দীপনামূলক সূত্র প্রয়োগ করেছিল যা মৃত্যুর পর বিশ্বাসীদের জন্য জান্নাতে অসীম যৌন মিলনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আর যদি তারা বেঁচে থাকে তাহলে দুনিয়াতে ছিল পার্থিব ভোগ বিলাসে পরিপূর্ণ। জুবায়ের, তালহা, আব্দুল রহমান এবং অন্যান্যরা মৃত্যুর আগে কোটিপতি'র সমতুল্য ছিলেন (২৭)।

বাহ্যিক হিংস্রতার মতোই, নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে অন্তর্কলহ ছিল তুঙ্গে। উত্তরাধিকার এবং মতবাদের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গৃহযুদ্ধ এক পর্যায়ে সুন্নি এবং শিয়া শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে, যার ফলে আজও দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা চলছেই। মুহাম্মদ ছিলেন একজন অসুস্থ প্রতিভাবান, একজন মৃগী রোগী যার ছিল চতুর জিহ্বা, যিনি বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর তার সাথে কথা বলেছেন, একটি বিষাক্ত মিশ্রণ সময়ের সাথে সাথে তাকে গণহত্যাকারী এবং একজন স্বৈরশাসকে রূপান্তরিত করে, তার নিজের সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর বিশ্বাসকে ছড়িয়ে দেয়। যা তাকে উত্তেজিত করেছে তা হল তার মৃগীরোগের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত দৃঢ় বিশ্বাসের শক্তি যা তাকে বিশ্বাস করিয়েছিলো যে তাকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এই দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিল। তিনি শুধু সকল সুন্দরের প্রতি অসহিষ্ণু ছিলেন তাই না বরং যারা তার বিরোধিতা করেছিল, তিনি তাদের বিরুদ্ধে অসমাপ্ত যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। তিনি যাকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সমর্পনের ধর্ম বলে অভিহিত করেছিলেন, তা কার্যত তাঁর ইচ্ছার কাছে সময় মানব জাতির সমর্পণ করাকে বুঝিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন সেই আত্মসমর্পণের দাবী করা ঈশ্বর ধারণার স্রষ্টা। তিনি পৃথিবীকে ভাগ করেছিলেন দুটি ভাগে ১. বিজয়ী অংশ আর ২. বিজয়ের অপেক্ষায় থাকা বাকি অংশ; বিজয়ী অংশ তার বিভ্রান্তির উপর আত্মসমর্পণ করেছিল, বাকি অংশ এখনো অপেক্ষমান তার কাছে আত্মসমর্পনের আশায়। তিনি সেই অংশের জন্য রেখে গেছেন তাঁর উত্তরসূরিদের, যারা তিনি যেখানে শেষ করেছেন, সেখান থেকে শুরু করছে। মক্কায় সাদ ওয়াক্কাসের উটের চোয়ালের হাড় দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে সামান্য রক্তের ফিলকি দিয়ে যার শুরু হয়েছিল, তা প্রায় চৌদ্দ শতাব্দী ধরে প্রবাহিত রক্তের লাল নদীতে পরিণত হয়েছে।

মুহাম্মদের সেই অসুস্থ উত্তরাধিকার আজও অব্যাহত আছে, এবং তা আজকের পৃথিবীকে ক্রমাগত গ্রাস করার হুমকি দিচ্ছে!

উপসংহার
ভবিষ্যতের জন্য একটি নির্দেশিকা

মুহাম্মদ যা তৈরি করেছেন তার প্রতিষেধক হল তাঁর সম্পর্কে সত্যের আক্রমনাত্মক, নিরলস এবং অপ্রীতিকর প্রকাশ। তিনি যা তৈরি করেছেন তা হল একটি বিকৃতি, সহিংসতার একটি ধর্ম যা তাঁর বিভ্রান্তিকর বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে যে, ঈশ্বর তাঁর সাথে কথা বলেছেন। নিজে থেকে, তিনি নিজের সম্পর্কে যা দাবি করেছিলেন তার উপর ভিত্তি করে তার ধর্ম বেশিদিন টিকে থাকার কথা নয়। তবে মুহাম্মদের ধর্ম সফল হয়েছিল (বিস্তৃত হয়েছিল), কারণ তিনি তার বিরোধিতাকারী লোকদের বিরুদ্ধে এবং তিনি যা তৈরি করেছিলেন তার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস প্রকাশ করেছিলেন। তারপরে এটি সন্ত্রাসের কারণেই সফল হতে থাকে, তবে মুহাম্মদ নিজের সম্পর্কে যে পৌরাণিক কাহিনীগুলি তৈরি করেছিলেন সেগুলো বইয়ে প্রবেশ করানো হয়েছিল। পৌরাণিক কাহিনীগুলি মিথ্যাচারের মতোই - যা প্রায়শই পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং সেগুলিকে সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া হয়।

পৌরাণিক কাহিনীগুলি টিকে আছে, যদিও মুহাম্মদ নিজের সম্পর্কে যা দাবি করেছিলেন তা শ্বাসরুদ্ধকর বাজে কথা। একজন দেবদূত তাঁর কাছে সমস্ত মানবজাতির জন্য চিরন্তন সত্য নিয়ে এসেছিলেন; একটি ডানাওয়ালা খচ্চর তাঁকে জেরুজালেমে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং তাঁকে ঈশ্বরের সাথে আলোচনা করার জন্য স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে প্রতিদিন কতবার লোকেদের উপাসনায় সেজদা করতে হবে তার নির্দেশ দেয়া হয়েছে; তাছাড়া ডানাওয়ালা খচ্চরটি তাঁকে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে মূসা, ঈসা এবং অন্যান্য নবীরা তার পিছনে সারিবদ্ধভাবে প্রার্থনা করেছে। এমন সব আজেবাজে কথা তাঁর ও দাবি এগিয়ে যেতে থাকে যে, তিনিই কিয়ামতের আগের শেষ নবী যিনি প্রথমেই (মৃত্যুর পর) পুনরুত্থিত হবেন এবং সবুজ পোশাকে, পাগড়ি পরে জাহান্নামের সেতুর উপর দিয়ে নগ্ন জনগণকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য উপস্থিত হবেন। তিনিই ঈশ্বরের সামনে বিশ্বাসীদের জন্য সুপারিশকারী হবেন এবং তাদের জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করবেন, অথচ তারাই (বিশ্বাসীরা) নাকি মুহাম্মদকে সুপারিশের সম্মান দেয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্রমাগত প্রার্থনা করে! এবং যখন সব বলা (সুপারিশ) সম্পন্ন হয়ে যাবে তখন তিনি চিরকালের জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে ঈশ্বরের সিংহাসনের কাছাকাছি বসবাস করবেন। এ ধরনের আজগুবি গল্পের আরও অনেক মাথামুণ্ডু আছে, কিন্তু এ কয়টি বিষয়ই হচ্ছে গল্পের প্রধান উপাদান। আর কিছু না হোক, মুহাম্মদ 'মহিমান্বিত' শব্দটিকে একটি নতুন স্তরের অর্থ দিয়েছিলেন।

প্রতিটি ধর্মেই পৌরাণিক এবং কল্পিত উপাদানগুলির একটি ভাগ রয়েছে যা অন্যদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে, তবে এটি (ইসলাম) শুধুমাত্র মুহাম্মদেরই এমন এক সৃষ্টি যা নিজেকে ছড়িয়ে দেয় এবং নির্মমতা ও সহিংসতার হুমকি দেয়ার মাধ্যমে তার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। মিথের পাশাপাশি, মুহাম্মদের কৃত সহিংসতা সমূহও তাঁর সম্পর্কে বিরক্তিকর সত্যের একটি প্রধান অংশ যা প্রকাশের দাবি রাখে। মানবতার বিরুদ্ধে মুহাম্মদের অপরাধ ছিল জঘন্য এবং আজ তাকে মৃত্যুদণ্ড

দেয়া হবে যেসব কারণে তা হচ্ছে : তাঁর ইহুদিদের উপর চালানো গণহত্যা, তিনি যেসব হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করেছিলেন, বিরোধিতাকারী গোত্রগুলির উপর তাঁর অবিরাম আক্রমণ, অন্য মানুষের সম্পত্তি নিরলসভাবে লুটপাট করা এবং তাঁর নারী ও শিশুদের দাসদাসী বানিয়ে ফেলা এমনকি শিশুরাও যারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের প্রতি তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর এবং হৃদয়হীন একজন সাইকোপ্যাথ যে তার অপরাধকে ধর্মের মোড়কে আড়াল করেছিল।

আরেকটি উপাদান যা প্রকাশের দাবি করে তা হচ্ছে, অন্য লোকেদের ধর্ম চুরি করা এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে তাঁর বিভ্রান্তিকর ধারণার সাথে তাঁর মানানসই বক্তব্য তৈরি করার ব্যাপারটা। প্রমাণ এত আছে যে, যারা অনুসন্ধিৎসু তাদের জন্য এই বই কিছু প্রমাণপত্র উপস্থাপন করেছে।

গল্পের অযৌক্তিকতা সত্ত্বেও পৌরাণিক কাহিনীগুলি বিকশিত হয়েছিল, কিন্তু এখন থেকে একশ বছর আগে মুহাম্মদের অন্ধকার শক্তির বিরুদ্ধে তেরোশত বছরের যুদ্ধের পরে বিশ্ব আশা করতে শুরু করেছিল যে, এই অন্ধকার স্থায়ীভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফ্রাঙ্করা এটিকে ফ্রান্স থেকে ঠেলে দেয়, স্প্যানিয়ার্ডরা এটিকে আইবেরিয়া থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং পূর্ব ইউরোপ ভিয়েনার গেটে তার অগ্রযাত্রা রুদ্ধ করে দেয়। রাশিয়া ককেশাসে লাইন এঁকেছে এবং শতাব্দী ধরে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে। হিন্দুরা তাদের ধর্ম এবং তাদের অনেক অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেছে। খিলাফত - মুহাম্মদের উত্তরসূরিদের দীর্ঘ লাইন - অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের সাথেই শেষ হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে মুহাম্মদ যা তৈরি করেছিলেন তা হ্রাস পেয়েছিল, কিন্তু এটি আরও বড় ধরনের দাবানল ছড়িয়ে দেয়ার জন্য কন্টেনমেন্ট লাইনের মধ্য দিয়ে বনের আগুনের মতো আবার ফিরে এসেছে। এটি এসেছে অসাধারণ তেলসম্পদের কারণে যা মুহাম্মদের তৈরি করা দেশগুলির অধীনে বসবাসকারী দেশগুলিকে তাদের জনসংখ্যা অল্প সময়ের মধ্যে চারগুণ করার সুযোগ দিয়েছে। তেলের পরেই, মগজ ধোলাইকৃত জনগণ হচ্ছে তাদের বৃহত্তম রপ্তানি। বিশ্বাসীদের (মুমিন) উপনিবেশের বাসিন্দা যারা এখন তাদের অবিশ্বাসী স্বাগতিক দেশগুলিও দখল করতে আকাঙ্খা পোষণ করে, সমগ্র ইউরোপ জুড়ে তাদের মধ্যে অনেক অঞ্চলই এখন 'নো-গো জোন' হয়ে গেছে যেখানে পুলিশও পা মাড়াতে করতে ভয় পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সমগ্র পশ্চিম গোলার্ধে শত শত উপনিবেশ গঠনমূলক পর্যায়ে রয়েছে। তাদের কেন্দ্রে রয়েছে বড় এবং ছোট মসজিদগুলি যা তুর্কি শাসকের বিখ্যাত স্লোগানের চেতনায় উজ্জীবিত হচ্ছে, যে স্লোগান এমন : "মসজিদগুলি আমাদের ব্যারাক, গম্বুজগুলি আমাদের হেলমেট, মিনারগুলি আমাদের বেয়নেট এবং মুমিনরা আমাদের সৈন্য"। একই সময়ে প্রোপাগান্ডার ধুম্রপুঞ্জ এবং কৌশলী উপস্থাপনা যা মুহাম্মদ তৈরি করেছিলেন সেসবও তাঁর ধর্মের অগ্রগতিকে পরিষ্কার করছে, এটিকে অন্য একটি ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করছে। এটি যেন এখন আর কোন জঙ্গিবাদী সর্বগ্রাসী ব্যবস্থা নয় যা বিশ্বটাকে দখল করতে চায়!

এখন তবে আমাদের কী করা যেতে উচিত? মুহাম্মাদ যা সৃষ্টি করেছেন তার দখলের বিরুদ্ধে কে আপনাকে রক্ষা করবে এবং সেই বাস্তব হুমকির বিরুদ্ধেও কে আপনাকে রক্ষা করতে পারে যে হুমকি শেষপর্যন্ত আপনার লালন করা সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করতে পারে? এটি এখন ভিয়েনার গেট পেরিয়ে, ককেশাস ছাড়িয়ে জিব্রাল্টার ছাড়িয়ে গেছে। মার্সেইলে এখন ত্রিশ

শতাংশ 'মুহাম্মাডান'। মস্কো এবং ব্রাসেলসে সহজেই তারা এখন পনেরো শতাংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ সর্বত্রই সংখ্যাটা বাড়ছে। আপনি সাহায্যের জন্য কার কাছে যান? আপনি কি বারাক হোসেন ওবামার মতো কারো কাছে যান? তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি বলেছেন, "আমার জানা সবচেয়ে মধুর আওয়াজটি হল প্রার্থনার জন্য মুসলমানদের ডাক" এবং, "ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমিও জানি ইসলামের প্রতি সভ্যতার ঋণ" এবং, "ভবিষ্যত অবশ্যই হবে না তাদের যারা ইসলামের নবীকে অপবাদ দেয়"।

আপনার একমাত্র প্রতিরক্ষা এখন আত্মরক্ষা, এবং মুহাম্মদের ধর্মেরই মূলপাঠ যা মুহাম্মদের বিরুদ্ধেই এক নিখুঁত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার হতে পারে তাই সম্পর্কে জ্ঞান রাখা। জ্ঞান আমাদেরকে নিরবতা ভেঙ্গে সত্যের সাথে রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করবে সেসবের বিরুদ্ধে যা সৃষ্টি করেছেন মুহাম্মদ। আজও, ৯/১১ ঘটে যাওয়ার পরেও এবং সারা বিশ্বে দিনদিন সন্ত্রাসবাদ বাড়তে থাকা সত্ত্বেও, মুহাম্মদের সম্পর্কে সত্য কথা যেন বিশ্বের সেরা গোপনীয়তার মধ্যে একটি রয়ে গেছে। মুমিনরাই প্রথমে এসব কিছু গোপন রাখে। তারা মুহাম্মদের অপরাধ অস্বীকার করে, তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বলে, তাঁর কর্মকে জাস্টিফাই করে বা তাঁর সম্পর্কে কথা বলতে অস্বীকার করে। তারা বিশেষ করে এই বিষয়টা মানতে কোনভাবেই রাজি হয়না যে, শৈশব থেকেই তাদেরকে যা কিছু বিশ্বাস করিয়ে বড় করা হয়েছে তার পুরোটাই বৈশ্বিক প্রতারণা। আপনি তাদের কাছ থেকে কেবল পুরনো রূপকথাই শুনতে পাবেন। এমনকি আপনার রাজনীতিবিদরাও সন্ত্রাসের পেছনের প্রকৃত অপরাধী সম্পর্কে সত্য কথাটা বলবে না। সম্ভবত তারা তাদেরকে ভোট দিয়ে অফিসে বসানো লোকেদের মতোই অজ্ঞ।

মূলধারার মিডিয়া কোন সাহায্য করে না। মানুষের আসলে কী জানা দরকার সে সম্পর্কে তাদের সংস্কৃতি হচ্ছে নিরবতার। আপনার কি প্রমাণ দরকার? একবার চিন্তা করুন যখন পোপ বেনেডিক্ট ২০০৬ সালে জার্মানির রেজেনসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় ১৪ শতকের বাইজেন্টাইন সম্রাটকে উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, "মুহাম্মদ যা এনেছিলেন তা আমাকে নতুন করে দেখান এবং সেখানে আপনি কেবল খারাপ এবং অমানবিক জিনিসগুলিই পাবেন যা তরবারির দ্বারা প্রচারিত বিশ্বাসের প্রচারের জন্য তাঁর আদেশ নির্দেশনা।" এরপরই মুসলিম বিশ্ব হিংস্রতা এবং সহিংসতার হুমকিতে নিজেরাই পাগল হয়ে গেছিল। মুহাম্মদ সম্পর্কে সম্রাটের মূল্যায়নের কোনো সত্যতা আছে কিনা তা মূলধারার মিডিয়া কখনোই অনুসন্ধান করেনি, কিন্তু পোপ সংবেদনশীলতা এবং দুর্বল বিচারের জন্য দোষী কিনা তা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই তারা সীমাবদ্ধ ছিল। পোপ তখন এক সমস্যায় পরিণত হয়েছিলেন। অতি সম্প্রতি মুহাম্মদ সম্পর্কে একটি অপেশাদার জানা ভিডিও যাতে মিশরে সহিংসতা ছড়িয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল এবং বেনগাজির ট্র্যাজেডির জন্য বলির পাঁঠা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল সেই সময় মিডিয়ার না দেখার ভানকে উন্মোচিত করেছে । মিডিয়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, কিন্তু ভিডিওর বিষয়বস্তু পরীক্ষা করা হয়নি। মূলধারার মিডিয়া মূল বিষয়টি চিহ্নিত করার কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এ বিষয়টি অনুসন্ধানের শীর্ষে থাকা উচিত কেন মুহাম্মদ তার ভূমিকার জন্য যা সৃষ্টি করেছেন মুমিনরা ঠিক ঠিক তাই তাই করে ।

মিডিয়ার এই উপেক্ষা কেবল আপনার চোখ ফাঁকি দিয়ে যায় ঠিকই, তবে আপনার কাছে দুটি জিনিস রয়েছে যা আপনাকে অজ্ঞতা থেকে বাঁচাতে পারে – ১) সত্য যা বলার প্রয়োজন, এবং ২) সত্যকে সরবরাহ করার উপায়। এখন নতুন মিডিয়ার যুগ, বিশ্বব্যাপী এবং সহজেই সবকিছুতে আমরা এখন অ্যাক্সেসযোগ্য। মুহাম্মদ সম্পর্কে সত্যকে যতটা সম্ভব সৃজনশীল উপায়ে প্রকাশ করুন, যত বেশি গ্রাফিক তত ভাল, এবং নতুন ডেলিভারি সিস্টেমের মাধ্যমে তা ছড়িয়ে দিন। কেননা, কেবল সত্যকেই এখানে অস্ত্র করা হয়েছে। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা মূলত তাসের ঘরের উপরেই নির্ভরশীল, যেমন তাঁর দাবি যে, ঈশ্বর তাঁর সাথে কথা বলেছেন। এবং তার দাবি যে, একমাত্র ঈশ্বর আছে, আর মুহাম্মদ তাঁর রাসূল। বলুন তো মুহাম্মদ কে ছিলেন? ছিলেন একজন মৃগীরোগজনিত সাইকোপ্যাথ, একজন গণহত্যাকারী যিনি ঠগ সাদ্দাম হোসেনের থেকে একটু আলাদা, এবং তাঁর কবিতা ভালো ছিল।

তাঁর সম্পর্কে সত্যকে সার্বজনীন জ্ঞানে পরিণত করা উচিত। এটি তাঁর অকথ্য নিষ্ঠুরতার চিত্র কোটি কোটি মানুষের মনে দাগ কাটবে এবং যা তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা হ্রাস করবে ও অবশেষে এটিকে শেষ করে দেবে। এই বইটি সেই পদ্ধতিরই একটি উদাহরণ। বইটি তার গবেষণায় দৃঢ়, মূল উৎসগুলিতে প্রচুর পরিমাণে নথিভুক্ত এবং এটি চিত্রের সাথে সম্পূরক। সৃজনশীল ব্যক্তিদের একটি দল যারা মুহাম্মদের জীবন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং তার জীবনের ঘটনা এবং তার কোরআনের মধ্যে সংযোগ বুঝতে পেরেছে যা একটি ডায়েরি বা ব্লগের মতো, তারা সহজেই ডকুমেন্টারি, স্কিট এবং চলচ্চিত্রের জন্য কয়েক ডজন ধারণা নিয়ে আসতে পারবেন। পারবেন একটি একক ব্রেনস্টর্মিং সেশনে নিয়ে আসতে। জ্ঞান, প্রতিভা, এবং অর্থ কি এটা লাগে তাও জানার দরকার। এটি বিরল যে, এই সমস্ত কিছুই এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হয়, তবে এই উপাদানগুলিকে আলাদাভাবে ধারণ করা লোকেরা সর্বদা একটি ভাগ করা লক্ষ্যের চারপাশে একত্রিত হয়।

ফিল্ম স্কুলে যে ধরনের শর্টফিল্ম তৈরি করা হয় বা নির্মাণ করা হয় তার উপর ভিত্তি করে মুহাম্মদের জীবনের উপর কিছু নির্মাণ করার উপাদান দেয়া হলো, বলতে গেলে বিনামূল্যেই :

একজন প্রাক্তন আস্তিক, তাকে রশিদ বলে ডাকা হয় সে একটি কফিশপে বই পড়ছে। কয়েক বছর আগে, সে একটি ছাত্র সংগঠনের সদস্য ছিল যেটি মুহাম্মদের ধর্মের সমালোচকদের আক্রমণ করেছিল, কিন্তু সে সম্প্রতি তার বিশ্বাস হারিয়েছে। ছাত্রাবস্থায় তাকে চিনতেন এমন একজন নারী কফিশপে আসেন। ধরা যাক নারীটির নাম আমান্ডা, একজন সাধারণ আমেরিকান যার কাছে মুহাম্মদ সম্পর্কে ভাসা ভাসা জ্ঞান আছে। রশিদ তাকে চিনতে পেরে তার দিকে এগিয়ে যায়। আমান্ডা রশিদের ধর্মত্যাগ সম্পর্কে জানতে পেরে অবাক হয় এবং এ নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাও করে। রশিদ বলল যে, সে যে ধর্মের সাথে বেড়ে উঠেছে তা সে কখনওই বুঝতে পারেনি যতক্ষণ না তিনি কোরআন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়েছে এবং প্রাথমিক নথিগুলি অধ্যয়ন করেছে। সহিংসতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার কারণেই সে এখন ইসলামের সমালোচক হতে বাধ্য হয়েছে, কারণ সে তার সহ-ধর্মবাদীদের সারাবিশ্বে অপরাধ করতে দেখেছে। সে মুহাম্মদ সম্পর্কে যা আবিষ্কার করেছে তাতে কেঁপে উঠেছিল। তার বিশ্বাস ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে এবং অনেক আগেই সে তার পূর্বের বিশ্বাসের ধ্বংসাবশেষ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসে। এরপর তিনি বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে গবেষণা শুরু করে। যখন আমান্ডা তাকে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করে যে, মুহাম্মদ সম্পর্কে এমন কি ছিল যা তাকে বিরক্ত করেছিল, তখন সে তাকে নৃশংসতার কথা বলে। আমান্ডা খুব বিশ্লেষণধর্মী

মানুষ। তিনি শব্দের ছবি আঁকেন এবং তাকে দৃশ্যের মধ্যে রাখেন। আমরা তাঁর মুখ দেখি যখন তিনি তার শোনা গল্পগুলিতে প্রতিক্রিয়া জানান। যখন মুহাম্মদ কুরাইজা ইহুদিদের বধ করতে যায়, তখন আমান্ডা তা দেখেন। তিনি সেখানে আছেন যখন এটি ঘটছে, সেই কর্মের কেন্দ্রে। তিনি তার ভিজ্যুয়ালাইজেশনে যা দেখেন তা যেন দর্শকরাও দেখেন : মুহম্মদ বাজারের একটি পরিখার কাছে তার মিম্বর বা সিংহাসনে বসে আছেন। পিঠের পিছনে হাত বেঁধে আধাডজন ভীত লোককে তার সামনে আনা হচ্ছে, মুহাম্মদের হাতের ইঙ্গিতে তাদের পরিখার কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তাদের হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করা হয়। মুহাম্মদের চাচাতো ভাই আলী এবং জুবায়ের তাদের শিরচ্ছেদ করছে এবং তাদের মৃতদেহ পরিখায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে। আমান্ডা আতঙ্কিত এবং দিশেহারা। এটি একটি দুঃস্বপ্নের মতো যা থেকে সে পালাতে পারেন না। তিনি যা দেখেন তা ভয়ানক - নারী ও শিশুরা তাদের প্রিয়জনকে হত্যা করা দেখে হাহাকার করছে; কিন্তু এদিকে মুহাম্মদের মুখে তৃপ্তির ছাপ। যদিও আতঙ্কিত তবুও যেন আমান্ডা মুহাম্মদের তার কাছে যান এবং চিৎকার করে বলেন, "এটা থামান, থামান! আপনি কিভাবে এই কাজ করতে পারেন? আপনি একজন পবিত্র মানুষ হওয়ার কথা। এর মধ্যে পবিত্রতার কিছু আছে কি?" কিন্তু মুহাম্মদ তাঁকে উপেক্ষা করে। যেন সে সেখানে নেই। ততক্ষণে, আরও পুরুষদের বের করে আনা হয়েছে এবং পরিখার ধারে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে। আমান্ডা আলির কাছে ছুটে আসেন এবং তাকে থামতে অনুরোধ করেন। "দয়া করে এটা করবেন না। এটা সঠিক না!" কিন্তু আলী তার তলোয়ার নামিয়ে দেন একজনের ওপর। মাথা পড়ে যাওয়া এবং ধড় একপাশে পড়ে যাওয়া দেখে আমান্ডার মুখ ভয়ে জমে গেছে। দৃশ্যটি ক্যাফেতে ফিরে যায়, এবং আমরা তাকে কাঁদতে দেখি, তার কাঁপতে থাকা হাত তার মুখ ঢেকে রাখে। রশিদ তার হাত ধরে সান্ত্বনা দেয়। সে বলে, "অতীত বদলানো সম্ভব নয়, আমান্ডা। আপনি কেবল ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলতে পারেন"। বেশ কয়েক মাস পরে, তারা আবার ক্যাফেতে দেখা করে। আমান্ডা প্রফুল্ল এবং তিনি রশিদকে বলেন যে, তিনি তাকে মুহাম্মদ সম্পর্কে অধ্যয়ন করার জন্য একটি দল গঠন করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি তাকে তাদের সাথে কথা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানান যা তাকে তার ধর্মত্যাগ করতে এনেছে, ক্ষমা চেয়েছে যে সে তাকে শুধুমাত্র বারোজন লোকের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, সর্বাধিক পনেরোজন। রশিদ হাসে এবং বলে "আমি খুশি হব"।

এটি একটি ধারণা, কয়েক ডজনের মধ্যে একটি যা একটি একক ব্রেনস্টর্মিং সেশনে চিন্তা করা যেতে পারে। এই জাতীয় চলচ্চিত্রগুলি অ্যানিমেশনে সবচেয়ে ভালো কাজ করবে, কারণ অ্যানিমেশন মুহাম্মদের বর্বরতাকে পুনরায় তৈরি করতে আরও নমনীয়তা দেবে। এমন ভিডিও ভাইরাল হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের দেখবে এবং এমন কিছু জানবে যা তারা আগে জানত না। এই জ্ঞান দিয়ে মেরুদন্ড শক্ত হয়ে উঠবে মুহম্মদ যা সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে কিছু করার সংকল্প নিয়ে। অনেকেই যারা প্রথমবারের মতো এটির মুখোমুখি হয়েছেন তারা এতটাই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবেন যে, লোকেরা এমন বাজে কথার দ্বারা প্রতারিত হতে পারে যে তারা A থেকে Z পর্যন্ত বিষয় শিখবে এবং তাদের নিজস্ব সৃজনশীলতার দ্বারা আকৃতির নতুন উপাদানের সাথে যোগদান করবে।

মুহাম্মদ যা সৃষ্টি করেছেন তা কখনোই পুড়ে যাবে না। এটিকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে, এবং এটি নিউ মিডিয়ার সর্বজনীনতার কারণে আজকে তা করা সম্ভব। এটি এমন একটি বিতরণ ব্যবস্থা যা আপনি শীঘ্রই মুহাম্মাদের বর্বরতার চিত্রগুলির একটি নিরলস ব্যারেজ হয়ে উঠবেন। সত্য থেকে কেউ রেহাই পাবে না। যারা মিথ্যার মধ্যে বড় হয়েছে তারা মিথ্যা দেখতে পাবে। তাদের লুকানোর জায়গা থাকবে না। বিশ্বাসী, নরনারী, যুবক ও বৃদ্ধ, গ্রাফিক বোমা থেকে পালানোর চেষ্টায় যুদ্ধের এই নতুন ময়দানে এদিক-ওদিক দৌড়াবে, কিন্তু যত তাড়াতাড়ি তারা একদিকে ঘুরবে, অন্য একটি বিস্ফোরণ ঘটবে, এবং আরেকটি, এবং অন্যটি, এবং অবশেষে তারা বেরিয়ে আসবে। অর্ধ বিলিয়ন বিশ্বাসী কুঁচকে যাবে। প্রাণহীনদের যা অবশিষ্ট আছে তা শেষ হয়ে যাবে, এবং বিশ্ব স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।

এবং এখন ভবিষ্যদ্বাণী:

মুহাম্মাদ যা সৃষ্টি করেছেন তার সমাপ্তি সামনে। কেয়ামতের প্রকৃত দিন ঘনিয়ে আসছে। এটি শেষ ঘোষণা করার জন্য ইস্রাফিলের শিঙার বিস্ফোরণ নয়, বরং আদালতের কক্ষে একটি ধাক্কাধাক্কি হবে। মুহম্মদ চলচ্চিত্রে পুনরুত্থিত হবেন, নগ্ন জনগণকে জাহান্নামের সেতু পেরিয়ে আল্লাহর সিংহাসনের সামনে বিচারের মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্য নয়, মানবজাতির আদালতে বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য। তিনি আলী, উমর, উসমান, আবু বকর, জুবায়ের, জায়েদ এবং অন্যান্যদের সাথে অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় থাকবেন, যাদের বিরুদ্ধে হত্যা, গণহত্যা, গণহত্যা, লুণ্ঠন, নির্যাতন, দাসত্ব এবং আরও অনেক কিছু মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পুনরুত্থান ঘটবে। শিকারের পর শিকার তাদের কবর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে সাক্ষ্য দেবে যে সে তাদের সাথে কী করেছে মুহাম্মদ - আবু আফাক, আসমা, কাব আশরাফ এবং উম্মে কিরফা এবং কিনানাও। এবং কুরাইজা ইহুদিরা, তাদের একটি দীর্ঘ লাইন তাদের উপর এখনও পরিখার ময়লা, এবং লুণ্ঠন আক্রমণ ও অভিযানের অবিরাম শিকার। সবাই তাদের গল্প নিয়ে আসবে।

ডিফেন্স এর সুযোগ থাকবে। এবং আমরা সমাপনী আর্গুমেন্ট শুনব, এবং তারপর বিচারকদের বাইরে যাওয়ার সময় আসবে। এবং যখন তারা বাইরে যাবে তখন আমরা ধীরে ধীরে টোকা বাজতে শুনতে পাব। জুরি বারো বা বিশজনের একটি প্যানেল নয়। আমরা মুখ দেখি, একের পর এক, নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণী, সব জাতির। এটি একটি অবিরাম স্রোত। দ্রুতগতির ড্রামগুলিতে আরও মুখ দেখা যায়, দ্রুত এবং দ্রুত। এটির গতি বাড়ে এবং এত বেশি ফ্ল্যাশিং হয় যে এটি একটি অস্পষ্ট হয়ে যায়। ড্রামগুলি অবিরত থাকার জন্য প্রচণ্ডভাবে টোকা দেয়, এবং অবশেষে আমরা একটি ড্রামের শক্তিশালী আওয়াজ শুনতে পাই এবং সকল চক্কর থমকে যায়।

বড় ঢোলের আওয়াজ ঘোষণা করে যে, কেয়ামত এসে গেছে।
এবং শেষ পর্যন্ত মানবতা তার রায় প্রদান করবে।

রেফারেন্স

CHAPTER 1 – Sanctuary

1. Hitti, Philip, History of the Arabs, p. 103. Hitti believes the name was derived from the Sabaean word "makuraba," meaning "sanctuary." The Sabaeans dominated Yemen in the millennium before Christ, and Sabaean emigrants ended up populating much of Arabia, influencing its language and culture.

2. Tabari, Abu Jafar Muhammad Ibn Jarir, The History of al-Tabari, vol. 1: From Creation to the Flood, p. 293, and Muhammad ibn Sad, Kitab al-Tabaqat al-Kabir (The Book of the Major Classes), vol. 1, p. 26. Muhammad made extensive use of Jewish prophet legends, modifying them according to his needs. This modification began with his story that Adam founded Mecca. From Tabari: "When God cast Adam down from Heaven, Adam's feet were upon earth, while his head was in Heaven and he heard the speech and prayers of the inhabitants of Heaven. He became (too) familiar with them, and the angels were in awe of him so much that they eventually complained to God in their various prayers. God, therefore, lowered Adam down to earth (meaning, shrunk him down in size). Adam missed what he used to hear from the angels and felt lonely so much that he eventually complained about it to God in his various prayers. He was therefore sent to Mecca. [On the way, every] place where he set foot became a village, and [the interval between his steps] became a desert, until he reached Mecca. God sent down a jewel of Paradise where the House is located today. (Adam) continued to circumambulate it until God sent down the Flood. That jewel was lifted up, until God sent his friend Abraham to (re)build the House (in its later form)."—Tabari, vol. 1, p. 293. From Ibn Sad: "Allah revealed to Adam: 'There is a sanctuary opposite My throne, so go and erect a house for me and circumambulate round it as you have seen the angels doing around My throne, and there I shall accept thy prayer and of thy sons who obey Me.' Thereupon Adam said, 'O Lord! How can I? I have no power and I have no guidance. Then Allah sent an angel who led Adam to Mecca. . . . And on the way wherever he halted, it became a populated place, and from where he passed on, it became a wilderness and desolate. Then the House of Allah was built with material obtained from five mountains—Sina, Zaytun, Lubnan, and Judi. Its plinth was made from Hira. When he had completed the work, the angel led him to Arafat and instructed him in all the rituals which people perform even today. He then returned to Mecca and circumambulated round the Kabah for a week. After that he returned to India and died on the mountains of Nawhd."—Ibn Sad, vol. 1, p. 26. For comparison with the Jewish story of Adam, see Genesis and Ginzberg, Louis, The Legends of the Jews, vol. 1: From the Creation to Jacob, pp. 49-102.

3. No trace of Mecca can be found in any of the records of the Romans, Byzantines, Greeks, and Persians. There is also an absence of archeological evidence, including telltale rock graffiti, dating before the fourth century A.D. None of the records of the millennial caravan commerce through western Arabia nor any of the tens of thousands of inscriptions that have been discovered on the monuments and ruins of ancient Arabia make any mention of Mecca.

4. Tabari, History, vol. 6: Muhammad at Mecca, pp. 28-9.

5. Shahid, Irfan, Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, pp. 389-90.

6. Ibn Sad, vol. 1, p. 64.

7. Ibid., vol. 1, p. 67.

CHAPTER 2 – Ancestors

1. Tabari, vol. 6, p. 16.

2. Ibn Sad, vol. 1, pp. 78-9.

3. Ibid., vol. 1, p. 78.

4. Ibn Ishaq, Muhammad, The Life of Muhammad, p. 59.

5. Tabari, vol. 6, pp. 11-2.

6. Ibn Ishaq, p. 20.

7. Ibid., p. 23.

8. Ibid., pp. 26-7.

9. Koran, 105:1-5.

10. Tabari describes the use of divination arrows at the Meccan temple: "Beside Hubal there were seven arrows, on each of which there was writing. On one was written, 'the blood money'; when a dispute arose as to which of them was responsible for paying blood money, they cast lots with the seven arrows to settle the matter. On another arrow was written 'yes'; when they were

considering some course of action, they cast lots, and if the 'yes' arrow came out they acted on it. Another arrow had 'no,' and if that came out they did not proceed with their course of action. On the other arrows was written 'of you,' 'attached,' 'not of you,' and 'Water.' When they wanted to dig for water they cast lots with the arrows, including this last one, and wherever it fell they started digging. Whenever they wanted to circumcise a boy, arrange a marriage, or bury someone who had died, or when they were in doubt as to the descent of one of them, they took him to Hubal together with a hundred dirhams and a slaughtering-camel which they would give to the custodian who used to cast lots with the arrows. Then they would bring forward the person about whom they wished to consult the oracle and would say, 'O god of ours, this is so-and-so the son of so-and-so, about whom we wish to know such-and-such; so reveal the truth concerning him.' Then they would say to the custodian of the arrows, 'Cast!' The latter would cast them, and if 'of you' fell to the person in question, that meant that he was a fellow tribesman; if it was 'not of you,' he was a confederate; and if it was 'attached,' he remained as he was, linked to them neither by descent nor alliance. In matters other than these, when 'yes' came out they acted accordingly, and when 'no' came out they deferred the matter until the following year, when they brought it up again. This recourse to the way the arrows fell was their ultimate method of deciding their affairs."—Tabari, vol. 6, p. 3. These consultations were expensive. A dirham was a Byzantine silver coin, and one hundred of them contained about 25 ounces of silver. The oracle-priest was either a member of the clan having the hereditary gatekeeper role, or was soothsayer appointed by the clan.

11. Tabari, vol. 6, pp. 2-4.

12. Ibid., vol. 6, pp. 6-7.

CHAPTER 3 – Fits

1. Tabari, History, vol. 5: The Sasanids, the Byzantines, the Lakmids, and Yemen, p. 271. The translator of vol. 5 of Tabari's History, C. E. Bosworth, suggests that stories of supernatural events surrounding the birth of Muhammad were influenced by legends regarding the births of earlier religious leaders such as Zoroaster, Buddha, and Krishna.—Tabari, vol. 5, p. 270, n. 645.

2. Ibn Sad, vol. 1, p. 112.

3. Korkut, Dede, M.D., Life Alert, The Medical Case of Muhammad, p. 41. A neurologist and psychiatrist, Korkut believes that the bright visual experiences of Amina preceding Muhammad's birth and during his birth suggest she suffered from epilepsy. He believes the evidence is overwhelming that Muhammad was afflicted with the disease, and that it is likely he inherited it from her as modern studies have shown that about thirty percent of epileptic children have a close relative who is also afflicted.

4. Halima was from the Banu Sad b. Bakr, a tribe of the Hawazin confederation which included the Thaqif, the people of Taif. Halima's link to Taif is clearly established after the Battle of Hunayn, which took place near Taif in A.D. 630. Some of the captives were of Halima's tribe, and to gain favorable treatment from Muhammad, they reminded him of their connection to his foster mother.

5. Ibn Ishaq, p. 71.

6. Two of the primary sources, Ibn Ishaq, pp. 71-2, and Tabari, vol. 5, pp. 274-5, both relate the same story almost verbatim, quoting Halima that Muhammad's hallucinatory event took place several months after she returned to her camp from the visit to Amina. This would put Muhammad's age at the time at about 2 ½ years. In the Ibn Sad account, vol. 1, pp. 123-4, Muhammad was four years old and was tending sheep or goats with other children when the incident occurred. Muhammad was returned to his mother not long after, but she sent him back to the countryside with Halima where he remained for another year. Aloys Sprenger, Life of Muhammad, from Original Sources, p. 78, n. 3, believes Muhammad spent at least five years with Halima's tribe. Sprenger argues that throughout his life Muhammad spoke with their distinctive accent, which he would not have retained if had returned to Mecca while still learning to speak.

7. Tabari gives the official version of the incident. The seed of this story may have been Muhammad's dim recollection of an epileptic experience as a four- or five-year old boy, and the story grew with the telling until it solidified into its final form. The latter part of this excerpt suggests the self-aggrandizing of a man suffering from low self esteem: "One day, I was away from the rest of my people in the bottom of a wadi (gully), with a group of children of my own age and we were playing at throwing between us pieces of camels' dung. Suddenly, a group of three men approached us, bearing a gold pitcher filled with snow. They took me out of the group of my friends, and the latter fled until they reached the edge of the wadi. Then they came back to the group of the three and they said, 'What do you intend to do with this lad? He is not one of us but is the son of the lord of the Quraysh, and he is an orphan, for whom a wet nurse was sought among us; he has no father. What good will killing him bring you, and what will you gain from that? But if you are determined ineluctably on killing him, then choose one of us, whichever you like; let him come to you in

his stead, and then kill him; but leave this lad alone; he is an orphan.' However, when the children saw the group of three men returning no answer to them, they fled at top speed back to the tribe, telling them what had happened and imploring help against the men. One of the three men came up to me and laid me gently on the ground, and then split open my body from the division of my rib cage to the end of the pubic hair, while I was watching all this but not feeling any touch at all. He then took out the viscera from my abdomen and washed them with that snow. He washed them carefully and replaced them. Then the second man stood up and said to his companion, 'Stand aside,' and he drew him away from me. He then put his hand into my insides and brought forth my heart, with me watching all the time. He split it asunder, extracted a black drop and threw the drop aside. He went on to say: In his hand, at his right side, there was as if he were holding something, and lo and behold, just by me was a seal ring in his hand, emitting light that dazzled anyone that looked at it, and by means of which he sealed my heart so that it became filled with this light of prophethood and wisdom. Then he returned it to his place. I felt the coolness of that seal ring in my heart for a long time afterward. The third man now said to his companion, 'Stand aside from me,' and he passed his hand over my body from the division of my rib cage to the end of the pubic hair, and that slit was henceforth healed together, by God's permission. He now took my hand and gently made me get up from my resting place, and said to the first man, who had slit open my body, 'Weigh him against ten of his community!' They weighed me against them, and I outweighed them. Next he said, 'Weigh him against a hundred of his community.' Then he weighed me against them and I outweighed them. Finally he said, 'Weigh him against a thousand of his community.' He then said, 'Let him be, even if you were to weigh him against the whole of his community, he would outweigh them all!'"—Tabari, vol. 5, pp. 277-8.

8. Ibn Ishaq, p. 72.

9. Korkut, p. 42.

10. Tabari, vol. 5, p. 279.

11. Ibn Sad, vol. 1, p. 124.

12. Ibid., vol. 1, p. 141.

13. Tabari, History of al-Tabari, vol. 6: Muhammad at Mecca, p. 47.

14. Ibn Ishaq, p. 81.

15. Korkut, pp. 55-6. Muhammad had an aversion to sharp, penetrating sounds, very likely because such sounds provoked seizures. It is possible the first of these two episodes was triggered by the sound of festive music, as he reported hearing tambourines and pipes prior to blacking out. Korkut cites the case of a 62-year-old British civil servant who suffered seizures only when he was exposed to the sound of church bells, "heard either in the open or over the radio." Such sounds can drill into the brain of a person suffering from temporal lobe epilepsy and set off neural explosions resulting in a seizure. Possibly because of this negative effect on him, Muhammad acquired such a repugnance for music that he banned all music. He also loathed the sound of women shrieking at funerals, particularly by hired mourners, to the point that he later prohibited wailing—real or faked—at funerals. Ibn Sad quotes Muhammad: "I prohibited from wailing and the two high pitched sounds of fools and libertines, i.e., voices raised in joyful parties with Satanic instruments and another raised in distress by scratching the face, tearing the collars, and shouting like Satan."—Ibn Sad, vol. 1, p. 156. Muhammad loathed dogs as well, very likely due to the neural disturbances the sound of barking caused him. This led him eventually to threaten his followers with loss of the value of their good works if they kept dogs. In a Bukhari tradition, Muhammad said, "Whoever keeps a dog, one qirat (of the reward) of his good deeds is deducted daily, unless the dog is used for guarding a farm or cattle."—Bukhari, Sahih Al-Bukhari (Darussalam), trad. 2322. A qirat is a large unit of weight.

16. Tabari, vol. 6, pp. 45-6. The Bahira story is also told by Ibn Sad, vol. 1, p. 134, and Ibn Ishaq, pp. 79-81.

17. Muir, William, The Life of Mohammad, p. 11.

18. Ibid., p. 14, n. 1.

19. Hoyland, Robert, Arabia and the Arabs, pp. 225-6, quoting Ali ibn Husayn al-Isfahani, a ninth century Muhammadan scholar.

20. Ibn Sad, vol. 1, p. 143.

CHAPTER 4 – Protectress

1. Ibn Sad, vol. 1, p. 145.

2. In his biography of Muhammad, R. V. C. Bodley describes Khadija's business practices: "Khadija's business methods were modern. She loaned money to reliable Koreishite merchants, in return for which she became a partner in the transactions which she had backed. She also invested the money of her smaller depositors in caravans. When the caravans returned from their trading expeditions, the profits were shared in proportion to the investments. Khadija also had her employees, in the town office and on

the road, financially interested in her various business enterprises. They thus found themselves, at the same time, her employees, her creditors, and her shareholders. The success, therefore, of everything the firm undertook was to the interest of all, from the president and managers to the accountants and the lowliest cameleers."—Bodley, The Messenger, p. 41.

3. Muir, pp 25-6. See also Shamaa-il Tirmidhi, (Outer Form, by Tirmidhi). The Shamaa-il is a compendium of traditions about Muhammad describing his physical appearance, habits, and mannerisms. To this day devout believers strive to model their gestures and daily habits on Muhammad's practices as described in such traditions. Osama bin Laden was known to be obsessive about such emulation.

4. Ibid., p. 22, n. 2.

5. Ibn Sad, vol. 1, p. 147.

6. Ibid, p. 178.

7. Ibid, p. 148.

8. Tabari, vol. 6, p. 49.

9. Ibn Sad, vol. 1, p. 149.

10. It is not unanimously accepted that Muhammad had four daughters with Khadija. The Sunnis make it an article of faith, but the Shiites believe Muhammad was the biological father of Fatima only. The other daughters were either children from a previous marriage of Khadija, or were children of a deceased sister that Khadija took under her care.

11. Ibn Sad, vol. 1, pp. 125-6.

12. Ibn Ishaq, p. 114.

13. Fidai and Shaikh, The Companions of the Holy Prophet, pp. 5-16.

14. Ibid, pp. 319-20.

15. Ibn Ishaq, p. 84, and ibn Sad, vol. 1, pp. 164-5. Sources differ as to the motive for the temple reconstruction. Ibn Sad stated it was due to flood damage while Ibn Ishaq alleges it came about as a result of the theft of the treasures of the temple that had been facilitated by the fact the building had low walls and was roofless. Flood damage was the more plausible motive, but Ibn Ishaq's version is significant because it describes the temple up until that time as a modest affair consisting of low walls of stacked rocks without a roof. Ibn Ishaq writes, "They (the Quraysh) were planning to roof it and feared to demolish it, for it was made of loose stones above a man's height, and they wanted to raise it and roof it because men had stolen part of the treasure . . . which used to be in a well in the middle of it."

16. Tabari, vol. 6, p. 57.

17. The original temple walls were too far apart to allow a roof even with the lumber from the salvaged ship. To accommodate a roof, the Meccans built the temple with a narrower width and depth. This is affirmed in a tradition attributed to Muhammad's wife Aisha in which he tells her that he wanted to rebuild the reconstructed temple on its original foundations, though in this account he attributes the original foundation to Abraham—Sahih al-Bukhari, trad. 1585.

18. Ibid., trads. 1584 and 7243.

19. That Muhammad fell unconscious is noted in a tradition attributed to Jabir ibn Abdullah, a companion of Muhammad and the source of numerous traditions. Abdullah is quoted saying that when the temple was being rebuilt, "the Prophet and Abbas went to carry stones. Abbas said to the Prophet, '(Take off and) put your waist sheet over your neck so that the stones may not hurt you.' (But as soon as he took off his waist sheet) he fell unconscious on the ground with both eyes towards the sky. When he came to his senses, he said, 'My waist sheet! My waist sheet!'"—Sahih al-Bukhari, trad. 3829. The Bukhari tradition does not mention that Muhammad heard a voice, but in a similar tradition recorded by Ibn Sad, a voice said to Muhammad, "Beware of your nakedness." Ibn Sad added that it was the first time Muhammad heard a voice that no one else heard.—Ibn Sad, vol. 1, p. 165. Auditory hallucinations are often a part of the epileptic experience. See Korkut, Dede, Life Alert, the Medical Case of Muhammad, ch. 2.

20. Ibn Sad, vol. 1, p. 179. This claim is attributed to Aisha, to whom Muhammad became betrothed following the death of Khadija. She was nine years old when the marriage took place, and she was eighteen years old when he died.

21. Ibn Ishaq, p. 105; Tabari, vol. 6, pp. 63-4; Ibn Sad, vol. 1, p. 179.

22. Ibn Sad, vol. 1, p. 195.

CHAPTER 5 – Cave Dwellers

1. Numani, Allama Shibli, Sirat-un-Nabi (Biography of the Prophet), vol. 1, p. 129. Numani, a Sufi scholar of the late 19th•and early 20th centuries, gives grudging acceptance that Muhammad's first-born son was likely named al-Uzza. He writes: "Accordingly they

say the first-born child of the Prophet was named Abd al-Uzza (Uzza being the name of an idol). Even if true, it is no argument against the Prophet and does not establish his responsibility. Khadija had been an idol-worshipper before coming into the fold of Islam. She might have given her son this name, and the Prophet, not yet entrusted with his mission, might have passed over it in silence." Numani gives the source of such claims: Tarikh Saghir (Short History) of Bukhari, which is not available in English translation.

2. Ibn Sad, vol. 1, p. 185.

3. Sozomen, Ecclesiastical History, pp. 318-19. See also Cook, Michael, Muhammad, pp. 80-1.

4. Ibn Sad, p. 185.

5. Sozomen, pp. 318-19.

6. Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, p. 100.

7. Koran, 17:31 and 81:8-9.

8. Sahih al-Bukhari, trad. 3826.

9. Ibid., trad. 3828.

10. Siddiqi, Muhammad Iqbal, Asharah Mubash-Sharah: The Ten Companions of the Holy Prophet who were Promised for Paradise, p. 55.

11. Ibn Ishaq, p. 101.

12. "A Bag of Meat": A Study of an Early Tradition. This monograph is included in a collection of articles by M. J. Kister in Studies in Jahiliyya and Early Islam (Variorum Reprints, London, 1980).

13. The primary goddesses of the Meccans—al-Uzza, al-Lat, and al-Manat—are usually referred to as the "three daughters" of Allah. The literature, however, is not consistent, and this verse in Zayd's poem may reflect the idea of al-Uzza as spouse of Allah. It was the pattern in Middle Eastern pagan religions to pair the male supreme deity with a supreme consort. As such, al-Uzza was not the sister but the mother of al-Lat, an Aphrodite equivalent, and al-Manat, who represents fate, destiny.

14. Various translations of Zayd's poem can be found. The version included here is from the Guillaume translation of Ibn Ishaq, p. 100. Tisdall finds the following ideas expressed in Zayd's poem that Muhammad later expanded upon in the Koran: "Among these may be instanced: (1) the prohibition of killing infant daughters by burying them alive, according to the cruel custom of the Arabs of the time; (2) the acknowledgment of the Unity of God; (3) the rejection of idolatry and the worship of Al-Lat, Al-Uzza and the other deities of the people; (4) the promise of future happiness in Paradise or the "Garden", (5) the warning of the punishment reserved in Hell for the wicked; (6) the denunciation of God's wrath upon the Unbelievers, and (7) the application of the titles Ar Rahman (the Merciful), Ar Rabb (the Lord), and Al Ghafur (the Forgiving) to God."—Tisdall, W. St. Clair, The Original Sources of the Qur'an, p. 271.

15. LaPlante, Eve, Seized: Temporal Lobe Epilepsy as a Medical, Historical, and Artistic Phenomenon, pp. 213-4. See also Korkut, Life Alert, The Medical Case of Muhammad, pp. 34-5.

16. Details of Muhammad's cave experience can be found throughout the literature. See Ibn Sad, Kitab al-Tabaqat al-Kabir, vol. 1, pp. 223-30; The History of al-Tabari, vol. 6, pp. 66-76; Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, pp. 104-7; Sahih Muslim, traditions 301-307.

17. Ibn Kathir, Ishmael, Tafsir ibn Kathir, vol. 9, pp. 309-10. A 14th century Muhammadan historian, Ibn Kathir recorded this telling evidence of an epileptic fit, but he does not venture an opinion about why saliva was found on Muhammad's cheeks.

18. Tempkin, Owsei, The Falling Sickness, A History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern Neurology, p. 153. Temp-kin quotes the Chronographia of Theophanes that Muhammad "had the disease of epilepsy. And when his wife noticed it, she was very much grieved that she, being of noble descent, was tied to such a man, who was not only poor but epileptic as well. Now he attempts to soothe her with the following words: 'I see a vision of an angel called Gabriel and not being able to bear the sight of him, I become weak and fall down.' But she had a certain monk for her friend who had been exiled because of his false faith and who was living there, so she reported everything to him, including the name of the angel. And this man, wanting to reassure her, said to her, 'He has spoken the truth, for this angel is sent forth to all prophets.' And she, having received the word of the pseudo-prophet, believed him and announced to the other women of the tribe that he was a prophet."

19. Freeman, Frank R., A Differential Diagnosis of the Inspirational Spells of Muhammad the Prophet of Islam, published in the journal Epilepsia, vol. 17:423-7 (Raven Press, New York, 1976).

20. Korkut, Life Alert, pp. 41-2.

21. Ibid., p. 94.

CHAPTER 6 – The Amalgamated Monotheism of Mecca

1. Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, p. 112.

2. Mohamed, Dr. Mamdouh N., Salaat: The Islamic Prayer from A to Z, pp. 33-46.

3. See the Wikipedia entry: “Obsessive-Compulsive Disorder.”

4. Typical of such prayers, Muhammad would say: “I pray to You as does one who is fearful and in distress, as one who submits his neck to You, and sheds his tears before You, bending low his body before You, humiliating himself before You. O God, do not render me, O God, wretched in my prayer to You; be compassionate and merciful with me, O Best of all who receive requests, and Best of all who give.” Ibn Kathir, Life of Muhammad, vol. 4, p. 252

5. In the standard Koran, this is the lead chapter. It contains only seven verses and is considered the preface to the work. Koran translator J. M. Rodwell, however, placed it as Chapter 8 based on the chronology of its composition.

6. In the standard versions of the Koran, the chapters are arranged in descending order, from the longest at the beginning and the shortest at the end, an artificial ordering that obscures the chronology of Muhammad’s work. This makes it difficult to connect the events of Muhammad’s life to the entries in the Koran, which often read like a diary or a blog in that they frequently recap and comment on events. Rodwell corrected the problem by organizing his version chronologically, at least to the extent that scholars have been able to establish the chronology. Though not entirely accurate due to the fact that later material was sometimes fused together with earlier material, either by Muhammad or by his followers after his death, Rodwell’s arrangement is reasonably accurate and is invaluable for helping the reader understand the connection between the events of Muhammad’s life and his Koran compositions. A word of caution about the Rodwell editions: An authentic edition of Rodwell’s work, which was first published in 1909, is the Dover edition published in 2005 as a reprint of the original. (Dover Publications, Inc., Mineola, New York, 2005). Not so with the Bantam Books version. Its 2004 publication retained Rodwell’s translation, but rearranged the chapters according to the standard order—from longest to shortest. Bantam also eliminated the scholarly introduction by G. Margoliouth and Rodwell’s extensive footnotes. As a chronological and scholarly guide it is completely useless.

7. The Chapter 55 title varies with the translation. In the Thomas Cleary translation, it is “The Benevolent One.” In the Abdullah Yusuf Ali version, it is “Most Gracious.” Rodwell translates it as “The Merciful.”

8. This is an amusing irony since “We” and “Us” are plural, yet Muhammad was the champion of the concept of the “Unity of God,” which holds there is but one God who has no “associates” and that placing other gods with the Creator is idolatry—the greatest sin. Muhammad was in fact trapped by grammar. The use of first person singular pronouns when speaking in his God voice would have been confusing to listeners, who would think that Muhammad, as the reciter of verses allegedly coming from God, was speaking in his own voice. Hence the need for the God voice of his Koran to use plural pronouns. Muhammad occasionally slips, and the God voice occurs in the first person singular.

9. Muir, p. 38.

10. Ibn Ishaq, p. 114.

11. Sprenger, Aloys, The Life of Muhammad from Original Sources, p. 171.

12. Ibn Kathir, Life of Muhammad, vol. 1, p. 318.

13. Khalid, Khalid Muhammad, The Men around the Messenger, p. 172.

14. Hasan, Masudul, Hadrat Othman Ghani, p. 6.

15. Sprenger, p. 44.

16. Koran, 73:14.

17. Ibid., 73:11-13.

18. Ibid., 96:15-16.

19. Ibid., 74:27-29.

20. LaPlante, Eve, Seized, p. 116.

21. Ibid., p. 37.

22. Ibn Kathir, Life of Muhammad, vol. 1, p. 300.

23. Koran, 93:3-5.

CHAPTER 7 – Fire and Brimstone

1. Ibn Sad, vol. 1, p. 180.

2. Ibn Ishaq, p. 117.

3. Ibid., p. 118.

4. Ibn Kathir, Life of Muhammad, vol. 1 p. 331.

5. Ibid., vol. 1, p. 331.

6. Bodley, R. V. C., The Messenger, the Life of Mohammed, p. 68.

7. Koran, 111:1-5.

8. Tafsir Ibn Kathir, vol. 10, p 626.

9. Given that they lived next door to each other, Abu Sufyan's children were likely playmates of Muhammad's children and the children in his care such as Ali. Abu Sufyan's children included Muawiya, who was two years younger than Ali. Decades later, Ali would lead an army against Muawiya in a civil war for control over Muhammad's religion. Following Ali's assassination in A.D. 661, Muawiya would become the first caliph of the Umayyad dynasty.

10. Ibn Sad, vol. 1, p. 232.

11. "When the apostle openly displayed Islam as God ordered him, his people did not withdraw or turn against him, so far as I have heard, until he spoke disparagingly of their gods. When he did that they took great offense and resolved unanimously to treat him as an enemy."—Ibn Ishaq, p. 118.

12. Ibn Kathir, vol. 1, p. 334.

13. Koran, 78:21-25.

14. Ibid., 78:41-43.

15. Ibn Ishaq, p. 119.

16. Ibid., p. 119.

17. Ibid., p. 119.

18. Ibid., pp. 119-20.

19. Koran, 74:11-15.

20. Ibid., 74:18-25.

21. Ibid., 81:22-25.

22. Ibid., 83:29-32.

23. Ibn Kathir, vol. 1, p. 323.

24. Asin, Miguel, Islam and the Divine Comedy (Goodword Books, 2002).

25. Hamid, Abdul Walid, Companions of the Prophet, vol. 1, pp. 1-6.

26. Ibn Ishaq, p. 118.

CHAPTER 8 – I will Bring You Slaughter

1. Koran, 88:21.

2. Tafsir Ibn Kathir, vol. 7, pp. 701-2.

3. Muhammad clearly states his belief in his role as messenger of Allah in a later verse, composed about four years after he fled Mecca for Yathrib: "Muhammad is not the father of any of your men, but he is the Apostle of Allah and the Last of the prophets; and Allah is cognizant of all things."—Koran, 33:40. "Muhammad is not the father of any of your men" means that he did not have any surviving male offspring.

4. Khalid, Men Around the Messenger, pp. 173-4.

5. Abu Bakr and Talha were from the same Taym clan, but neither had gotten support from their kinsmen after they came out as followers of Muhammad. Their clan, which descended from Murra, a paternal grandfather of Qusay, was an important branch of the Quraysh tribe and had close family and commercial ties with Abu Sufyan's Umayyad clan, which was among the leading Meccan families that opposed Muhammad.

6. Nawfal Khuwaylid was a half-brother of Khadija. He is noted for having rescued his nephew Zubayr from his abusive mother Safiya, who used to beat him. Nawfal, however, also beat Zubayr after he found out he had become a follower of Muhammad. Not much is recorded about Nawfal, but it can be concluded that he knew a great deal about Muhammad, including his maladies, as he was clearly unimpressed when Muhammad declared that God talked to him. A man of great physical strength, Nawfal was later slain by Muhammad's cousin Ali at the battle of Badr after he had been taken prisoner and was disarmed. Badr was the first major battle

between Muhammad and the Meccans. When Muhammad learned Ali had killed Nawfal, he said, "Praise be to God who answered my prayer concerning him."—Waqidi, The Life of Muhammad, p. 47.

7. Hamid, Companions of the Prophet, vol. 2, pp. 230-1.

8. Ibn Ishaq, p. 145.

9. Ibn Kathir, vol. 1 p. 339.

10. Ibid., vol. 1, p. 340. Muhammad's curse against the Meccan leaders has alternately been translated as "kill" or "punish" or "take away." Based on subsequent events, it is clear that he prayed for their demise. About six years later, all the men present that day would end up slain at the battle of Badr and their bodies dumped down a well.

11. Ibid., vol. 1, pp. 342-3.

12. Ibn Ishaq, p. 131.

13. Ibid., pp. 131-2. The literature is inconsistent about the age of Muhammad's uncle Hamza, an important figure in the early years of Muhammad's religion. Some sources claim he was four years older, while others say he was two years older. Yet the literature also states that Abdul Muttalib, Hamza's father and Muhammad's paternal grandfather, had married a woman from the Zurah tribe at the same time Muhammad's father Abdullah married Amina, another woman of the Zurah tribe, in a double ceremony. Since Muhammad was born within a year of Abdullah's marriage to Amina, Hamza would have been the same age as he or even slightly younger. If so, then Hamza and Muhammad were in their mid-forties at the time of this incident. If Hamza was in fact older than Muhammad, then his father would have married earlier than Abdullah.

14. Ibid., pp. 132-3.

15. Koran, 41:2-4.

16. Ibid., 41:6.

17. Ibid., 41:37.

18. Ibn Ishaq, p. 133.

19. Sprenger, Life of Muhammad, p. 139, n. 3. This comment is also attributed to Muhammad's uncle Abu Lahab and is echoed in a later Koran verse: "We know indeed the grief which their words do cause you (Muhammad): It is not you they reject: it is the Signs of Allah, which the wicked disdain."—Koran, 6:33.

20. Ibn Ishaq, p. 134. Muhammad repeated these requests in the Koran: "They say: 'We shall not believe in thee until thou cause a spring to gush forth for us from the earth, Or (until) thou have a garden of date trees and vines, and cause rivers to gush forth in their midst, carrying abundant water; Or thou cause the sky to fall in pieces, as thou sayest (will happen), against us; or thou bring Allah and the angels before (us) face to face: Or thou have a house adorned with gold, or thou mount a ladder right into the skies. No, we shall not even believe in thy mounting until thou send down to us a book that we could read.' Say: 'Glory to my Lord! Am I aught but a man, a messenger?'"—Koran, 17:90-93.

21. Ibn Ishaq, p. 134.

22. Ibid., p. 135.

23. Ibid., pp. 136-7.

24. Koran, chap. 18.

25. Ibid., 17:85.

26. "Any one who, after accepting faith in Allah, utters Unbelief,-except under compulsion, his heart remaining firm in Faith - but such as open their breast to Unbelief, on them is Wrath from Allah, and theirs will be a dreadful Penalty."—Koran, 16:106.

27. Sahih al-Bukhari, trad. 3852.

CHAPTER 9 – Obey Me!

1. Koran, 20:9.

2. Ibid., 21:58-61.

3. Ibid., 37:97.

4. Tisdall, The Original Sources of the Qur'an, p. 92.

5. Koran, 25:5-6.

6. Ibid., 21:98.

7. Ibid., 44:45-46. The "dregs of oil" of the Rodwell translation is rendered as "molten copper" in the Yusuf Ali version and "like molten brass" in the Thomas Cleary translation.

8. Ibn Kathir, vol. 2, p. 36.

9. Ibid., vol. 2, p. 35.

10. "Christ the son of Mary was no more than a Messenger; many were the Messengers who passed away before him. His mother was a woman of truth. They had both to eat their (daily) food."—Koran, 5:75.

11. "They do blaspheme who say: 'God is Christ the son of Mary.' But Christ said: 'O Children of Israel! Worship God, my Lord and your Lord.' Whoever joins other gods with Allah, Allah will forbid him the Garden, and the Fire will be his abode. There will for the wrongdoers be no one to help. They do blaspheme who say: God is one of three in a trinity: for there is no god except one God (Allah). If they do not desist from their word (of blasphemy) verily a grievous penalty will befall the blasphemers among them."—Koran, 5:72-73.

12. Ibn Ishaq, p. 165.

13. Ibn Ishaq, pp. 165-166. The "Satanic Verses" that Muhammad recited to the Meccans were part of Chapter 53, entitled "The Star," beginning with verse 19: "Do you see Al-Lat, and Al-Uzza and Manat the third idol besides? They are the Sublime Birds and their intercession is desirable indeed!" "Sublime Birds" has been rendered as high-flying cranes or swans, suggesting they are flying upwards to God.

14. Ibn Sad, vol. 1, p. 237.

15. Muhammad revised the verses simply by cutting out "They are the Sublime Birds and there intercession is desirable indeed!" A few verses down he then attacks the goddesses as "mere names" that had no reality for God.

16. Ibn Kathir, vol. 2, p. 40.

17. Ibid., vol. 2, p. 41.

18. Ibid., vol. 2, p. 42.

19. Ibid., vol. 2, p. 43.

20. Ibn Ishaq, p. 151.

21. Ibn Kathir, vol. 2, p. 5.

22. Chapter 19 of the Koran is entitled "Mary." In it Muhammad reveals his belief that Jesus was born of a virgin, though for him this was a sign of divine favor rather than of divine nature.

CHAPTER 10 – Obey You? YOU?

1. Ibn Ishaq, p. 157.

2. Ibn Kathir, vol. 2, p. 24. A Sabian is one who abandons his religion.

3. Ibid., vol. 2, p. 29.

4. Ibid., vol. 2, p, 82. Ibn Ishaq words it similarly: "You know the trouble that exists between us and your nephew, so call him and let us make an agreement that he will leave us alone and we will leave him alone; let him have his religion and we will have ours."—Ibn Ishaq, p. 191.

5. Ibid., p. 192.

6. One of the traditions quotes Abu Talib's son Ali that Muhammad did not attend the funeral: "I heard Ali say, 'When my father died, I went to the Messenger of God and told him, 'Your uncle has died.' He replied, 'Go and bury him.' I said, 'He died a polytheist.' So he replied, 'Go and bury him and do not cause (a scene), then return to me.' I did so, returned to him and he told me to wash."—Ibn Kathir, vol. 2, p. 86.

7. Sahih Al-Bukhari, trad. 7497.

8. Ibn Kathir, vol. 2, p. 98.

9. Ibid., vol. 2, p. 99.

10. Some of the versions state that Muhammad was accompanied by his adopted son Zayd, but most sources indicate he went alone.

11. Ibn Ishaq, p. 192.

12. In a tradition quoted by Ibn Kathir, Muhammad was bloodied from the stoning: "The people of Taif positioned themselves in two lines along his path and as he passed by every time he raised and put down a foot they threw stones at it until his feet began to bleed. His feet streaming with blood, he withdrew and made his way beneath the shade of a palm tree, completely overcome. In that garden were Utba and Shayba, the two sons of Rabia."—Ibn Kathir, vol. 2, p. 101. It is unlikely Muhammad suffered anything more than a few lumps and a bruised ego.

13. Ibn Ishaq, p. 193.
14. Koran, 72:23.
15. Ibn Sad, vol. 1, p. 245.
16. Sahih Al-Bukhari, trad. 3895.
17. Swarup, Ram, Understanding the Hadiths, p. 68n.

CHAPTER 11 – Winging it

1. Though diverging in many of the details, traditions about the "Night Journey" abound in the literature. This chapter is a synthesis of material found in Ibn Ishaq, pp. 181-187; Sahih Al-Bukhari, traditions 3887 and 7517; Ibn Sad, vol. 1, pp. 245-9; Ibn Kathir, vol. 2, pp. 61-75; and in Tafsir Ibn Kathir, vol. 5, pp. 550-574.
2. Ibn Kathir, vol. 2, p. 69.
3. Ibn Sad, vol. 1, p. 247.
4. The year of his fanciful journey to Jerusalem, a Christian church occupied the Temple Mount. It had been built over the ruins of a Roman temple that had been built over the ruins of the Second Jewish Temple. During his reign as caliph, Umar replaced the Christian church with a small mosque, later replaced by the domed al-Asqa mosque that still stands today.
5. Ibn Ishaq believes the journey to Jerusalem and the visit to Heaven occurred on different days though close together. Most sources, however, combine them as a single event.
6. Tafsir Ibn Kathir, vol. 5, p. 553.
7. Ibn Ishaq, p. 185.
8. Ibn Kathir, vol. 2, p. 67.

CHAPTER 12 – War on the World

1. Ibn Kathir, vol. 2, p. 68.
2. Ibn Ishaq, p. 194.
3. Ibn Kathir, vol. 2, p. 106.
4. Ibid., vol. 2, p. 106.
5. Ibid., vol. 2, p. 104.
6. Ibid., vol. 2, p. 107.
7. Ibid., vol. 2, p. 131.
8. Ibid., vol. 2, pp. 107-108.
9. Ibn Ishaq, pp. 197-8.
10. Koran, 22:39. This is considered to be the first jihad verse of the Koran. See Tafsir Ibn Kathir, vol. 6, pp. 582-583. Within two years, Muhammad would join the idea of fighting for his cause with a promise of Paradise for those killed fighting for him. "So, when you meet those who disbelieve, strike necks till when you have killed and wounded many of them, then bind a bond firmly. Thereafter either for generosity, or ransom, until war lays down its burden. Thus, but if it had been Allah's will, He Himself would have certainly punished them. But (he lets you fight) in order to test some of you with others. But those who are killed in the way of Allah, He will never let the deeds be lost. He will guide them and set right their state. And admit them to Paradise which He has made known to them."—Koran, 47:4-6.
11. Ibn Ishaq, p. 203.
12. Ibid., pp. 203-4.
13. Ibid., p. 204. This key passage of Ibn Ishaq's The Life of Muhammad is widely quoted in other primary sources, but the wording of the translations vary. Whereas Guillaume translates it as "all and sundry," the version found in al-Tabari's History, vol. 6, p. 134, translated by W. Montgomery Watt and M. V. McDonald, reads: "In swearing allegiance to him, you are pledging yourselves to wage war against all mankind." Ibn Kathir's The Life of the Prophet Muhammad quotes the same passage in vol. 2, p. 136, but it is translated by Trevor L. Gassick as: "You are pledging to go to war with all kinds of people."
14. Ibn Sad, vol. 1, p. 258.
15. Ibid., vol. 1, p. 259.
16. Ibn Kathir, vol. 2, p. 143.

17. Hamid, Abdul Wahid, The Companions of the Prophet, vol. 1, p. 36.
18. Ibn Ishaq, p. 217.
19. Ibid., pp. 221-2.
20. Koran, 8:30.
21. Ibn Sad, vol. 1, p. 260.
22. Ibn Kathir, vol. 2, p. 59.

CHAPTER 13 – Al-Qaeda

1. See Wensinck, A. J., Muhammad and the Jews of Medina, for a general description of Yathrib, and Lecker, Muslims, Jews, and Pagans, Chapter One: The Aliya: Orchards and Fortresses.
2. Ibn Kathir, vol. 2, p. 165. Ibn Sad, vol. 1, p. 271, also quote the Jew: “O Banu Qayla, here is your master! He has arrived.”
3. Ibn Kathir, vol. 2, pp. 178-9. Traditions about the length of Muhammad’s stay in Quba vary considerably. Though biographies generally give three to four days, some sources say he remained in Quba as long as three weeks.
4. Ibid., vol. 2, p. 180.
5. Wensinck estimates the Jewish population at ten thousand. He notes that the German Orientalist Aloys Sprenger estimated the Jewish population was between seven and eight thousand and the Arab population nine thousand.
6. Ibn Ishaq, pp. 207-8.
7. Ibn Kathir, vol. 2, p. 181.
8. Ibid., vol. 2, p. 217.
9. Wensinck, pp. 51-61.
10. Ibn Kathir, vol. 2, p. 96.
11. Ibid., vol. 2, p. 224. See also Waqidi, Muhammad b. Umar, Kitab al-Maghazi (The Book of Campaigns), pp. 6-7.
12. Ibid., pp. 8-11.
13. “They ask you concerning the sacred month about fighting in it. Say: Fighting in it is a grave matter, and hindering (men) from Allah’s way and denying Him, and (hindering men from) the Sacred Mosque and turning its people out of it, are still graver with Allah, and persecution is graver than slaughter; and they will not cease fighting with you until they turn you back from your religion, if they can; and whoever of you turns back from his religion, then he dies while an unbeliever—these it is whose works shall go for nothing in this world and the hereafter, and they are the inmates of the fire; therein they shall abide.”—Koran, 2:217.

CHAPTER 14 – The Jewish Question

1. These alleged Bible foretellings are discussed in “Muhammad the Paraclete (The Holy Spirit),” an article by Ibn Kammuna at http://www.faithfreedom.org/op-ed/mu-hammad-the-paraclete/
2. For comparisons of Jewish fables and Muhammad’s Koran prophet stories, see The Origins of the Qu’ran, Chapter III, by W. St. Clair-Tisdall. Further comparisons were undertaken by Abraham Geiger in an essay “What did Muhammad borrow from Judaism?” which is included in The Origins of the Koran, pp. 165-226, and by Abraham Katsh in his book, Judaism in Islam: Biblical and Talmudic Backgrounds of the Koran and its Commentaries.
3. Ibn Ishaq, p. 257.
4. Koran, 2:92.
5. Ibid., 3:184.
6. Ibid., 4:153.
7. Ibn Ishaq, p. 258.
8. Ibid., p. 258.
9. “And because of their saying, ‘We killed Al-Masih Isa (Jesus the Messiah), son of Maryam, the Messenger of Allah,’ but they killed him not, nor crucified him, but it appeared as that to them, and those who differ therein are full of doubts. They have no (certain) knowledge, they follow nothing but conjecture. For surely, they killed him not. But Allah raised him up unto Himself. And Allah is Ever All-Powerful, All-Wise.”—Koran, 4:157-8.
10. Tafsir Ibn Kathir, vol. 3, pp. 26-7, gives a complete account of Muhammad’s version of the ascension: “They surrounded Isa (Jesus) in the house, and when he felt that they would soon enter the house or that he would sooner or later have to leave it, he said

to his companions, ‘Who volunteers to be made to look like me, for which he will be my companion in Paradise?’ A young man volunteered, but Isa thought that he was too young. He asked the question a second and third time, each time the young man volunteering, prompting Isa to say, ‘Well then, you will be that man.’ Allah made the young man look exactly like Isa, while a hole opened in the roof of the house, and Isa was made to sleep and ascended to Heaven while asleep. When Isa ascended, those who were in the house came out. When those surrounding the house saw the man who looked like Isa they thought that he was Isa. So they took him at night, crucified him and placed a crown of thorns on his head. The Jews then boasted that they killed Isa and some Christians accepted their false claim, due to their ignorance and lack of reason. As for those who were in the house with Isa, they witnessed his ascension to Heaven, while the rest thought that the Jews killed Isa by crucifixion. They even said that Maryam (Mary) sat under the corpse of the crucified man and cried, and they say that the dead man spoke to her. All this was a test from Allah for His servants out of His wisdom.”

11. Musnad Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, trad. 23464, cited at http://www.answer-ing-islam.org/Muhammad/Jews/BQurayza/had.html.

12. Koran, 2:65.

13. Ibn Ishaq, p. 247.

14. Koran verses in which Muhammad relocates Abraham to Mecca are 3:96-7, part of a lengthy chapter called “The Family of Imran” that Muhammad composed in Yathrib. They read in part: “Lo! the first Sanctuary appointed for mankind was that at Becca, a blessed place, a guidance to the peoples; Wherein are plain memorials (of Allah’s guidance); the place where Abraham stood up to pray; and whosoever entereth it is safe.” See also Koran, 2:125-127.

15. The only verse linking Abraham and Mecca that can be found in a chapter that Muhammad was known to have composed in Mecca is Koran 14:37. Here Muhammad gives Abraham the floor: “O our Lord! I have made some of my offspring to dwell in a valley without cultivation, by Your Sacred House; in order, O our Lord, that they may establish regular prayer.” This verse is one of seven sequential verses (35 to 41) that appear to be insertions as they break the flow of ideas of the preceding lines. These ideas abruptly resume with verse 42. Given that the seven lines are thematically inconsistent with the chapter, they are most likely verses Muhammad composed in Yathrib after his falling out with the Jews. It can be suspected that Chapter 14 was retrofitted to give Muhammad’s Abraham story the appearance of an earlier birth.

16. Tafsir Ibn Kathir, vol. 1, p. 373.

17. Koran, 2:125.

CHAPTER 15 – I Bring You Slaughter

1. Waqidi, The Life of Muhammad, p. 12.

2. Ibid., p. 21.

3. Ibn Ishaq, p. 294.

4. Earlier that day, at a watering hole called al-Rawla near Badr, his men had questioned a Bedouin who was riding a pregnant camel about the Meccan army and Abu Sufyan’s caravan, but he denied knowledge of them. When one of the Muhammad’s warriors invited him to pay his respects to the “Messenger of God,” the Bedouin perked up. “The Messenger of God is with you?” When he was pointed out, the Bedouin said, “Are you the Messenger of God?” Muhammad said, “Yes.” The Bedouin said, “If what you say is true, tell me what is in the belly of my camel.” Salama, one of the Meccan believers, interrupted and said, “You had sexual intercourse with it, and it has been impregnated by you!” It is not known what happened to the impertinent Bedouin, but Muhammad was scandalized by Salama’s obscene talk and turned away from him in anger. The story goes that Muhammad did not scold him about it till later, not until after the slaughter at Badr was finished and some of the prisoners were beheaded and they were returning to Yathrib with booty and captives. Muhammad kept giving Salama the silent treatment, leading Salama to wonder what he had done to offend him. He finally said to Muhammad: “I seek refuge from God against His anger and the anger of His Prophet. Surely, you, O Prophet of God, keep turning away from me since we were in al-Rawla.” Muhammad broke his silence and scolded him. It was all about his obscene language. “As for what you said to the Bedouin—‘You fell upon your camel and it is impregnated by you’—you are shameless and you speak of what you do not know.” A sheepish Salama apologized profusely, promising to follow the light of Allah scrupulously from then on, and thus he regained the good graces of Muhammad.—Waqidi, pp. 24-5 and p. 58.

5. Ibn Kathir, vol. 2. p. 264.

6. Ibid., vol. 2, p. 272.

7. Ibid., vol. 2, p. 279.

8. It is worth quoting source material here at length: “Umar ibn Uqba related to me from Shuba, the mawla (emancipated slave) of Ibn Abbas saying: ‘I heard Ibn Abbas say: When the people stood up, the Prophet fell down in a faint for an hour. Then he was lifted from it and he proclaimed to the believers that Gabriel was with an army of angels to the right of the people, Mikael was with an army on the left of the Messenger of God, and Israfil was with another army of a thousand.’” —Waqidi, p. 36. Adding to this, Ibn Kathir reports: “The Messenger of God said, ‘Rejoice, Abu Bakr! I saw Gabriel wearing a yellow turban, holding the reins of his horse, up there between Heaven and earth! When he came down to earth, I lost sight of him for a while, but then he appeared again; he was dusty all over and he was saying, ‘God’s aid did come to you when you prayed to Him!’”—Ibn Kathir, vol. 2, p. 284. Ibn Kathir continues: “The Messenger of God then left the shelter, dressed in chain-mail, and began urging on the men to battle. He told them of Heaven and gave them encouragement in news of the coming of the angels. The men were meanwhile still in their battle ranks, not yet having advanced against their enemy. The result was that they felt tranquility and confidence.”—Ibn Kathir, vol. 2, p. 286.

9. Ibn Kathir, vol. 2, p. 281; Waqidi, pp. 34-5.

10. Ibn Kathir, vol. 2, p. 276.

11. Waqidi, p. 47.

12. Ibn Kathir, vol. 2, p. 272.

13. Ibid., vol. 2, p. 279.

14. Accounts differ as to who dealt Abul Hakam (Abu Jahl) the mortal wound, but all versions agree that Muhammad’s servant Abdullah Masud found him alive and cut off his head. In most accounts, Masud brought the head to Muhammad. In one version, however, Masud led Muhammad to the place where the body lay so that he could see it for himself. All versions report Muhammad’s joy that his enemy had been slain.

15. Ibn Kathir, vol. 2, p. 292.

16. Waqidi, p. 56. Waqidi earlier relates a tradition that Hudhayfa stepped out to challenge his father when Utba Rabia called for a duel, but Muhammad called him back. Other stories report he assisted in the killing of his father, but this is not supported by the majority of sources, which claim that Hamza alone killed him. See Waqidi, p 36.

17. Muhammad believed people would be physically resurrected and would suffer torment in the flesh if their destination was Hell. During the time between their death in this world and their resurrection in the afterlife, those whose deeds destined them for hellfire would suffer the “torments of the grave” for their sins in this world, this presumably being the torment of knowing they were going to burn in Hell forever.

18. Ibn Ishaq, p. 306. Abu Jahl, roughly meaning Spawner of Madness, was the nickname Muhammad had given to Abul Hakam.

19. Waqidi, p. 40.

20. Among the numerous examples in the literature of this fantasy life was Muhammad’s claim he was visited by angels after the battle of Badr to seek his permission to leave: “The Prophet prayed Asr (afternoon prayers) in al- Uthayl, and when he prayed a bowing he smiled. When he said the greeting he was asked about the smile. He explained that the Angel Mikail had appeared to him riding a female horse with knotted forelock and dust on its front teeth, saying, ‘O Muhammad, my Lord sent me to you and He commanded me not to leave you until you are satisfied. Are you satisfied?’ The Messenger of God replied, ‘Yes’.”—Waqidi, p. 57.

21. Koran, 10:88.

22. Ibid., 8:39.

23. Ibid., 8:60.

24. Ibid., 8:69.

CHAPTER 16 – Murder, Inc.

1. Ibn Kathir, vol. 2, p. 316.

2. Ibid., vol. 2, p. 317.

3. Ibid., vol. 2, p. 320.

4. Ibid., vol. 2, p. 309. An awqiyya (also transliterated as uqiyah) was a unit of weight equivalent to the weight of forty silver dirhams, each dirham containing about 3.13 grams of pure silver. One awqiyya, therefore, is equivalent to 125 grams, which is equal to 4.38 troy ounces. If Abbas paid forty awqiyyas of gold, then he gave Muhammad a total of 175 troy ounces to secure his freedom. According to Ibn Ishaq, Abbas was made to pay one-hundred awqiyyas.

5. Ibn Ishaq, p. 316.

6. Waqidi, p. 62.

7. Ibn Ishaq, p. 675.

8. The literature notes that Asma's poem contained vulgar language, but the standard translations omit it. The first words of the poem are usually translated as: "I despise."

9. Ibn Ishaq, p. 676.

10. Ibid., p. 676.

11. Waqidi, p. 86.

12. Ibn Ishaq, p. 363.

13. The literature claims a treaty or agreement between Muhammad and all the tribes and clans of Medina was reached after he arrived in Yathrib. It has been tagged the "Constitution of Medina," but no signatories are named. This suggests the pact was either a verbal agreement or was simply a unilateral pronouncement on the part of Muhammad that he expected everyone to adhere to. To his mind, the articles of the "Constitution of Medina" came from Allah and since it came from Allah it was binding on everyone whether they liked it or not.

14. Ibn Ishaq, p. 363.

15. Koran, 8:58.

16. Tabari, vol. 7, p. 86. The word "banu" means tribe or clan. It is possible Muhammad composed Koran verse 8:58 immediately following the Qaynuqa prank, and it became part of the chapter called "Booty." The verses of this chapter were composed over a period of several weeks.

17. The literature casts this as a dialogue between Muhammad and the Angel Gabriel: "Muhammad [b. Abdullah] related to me from al-Zuhri from Urwa, saying: 'Surely when the Prophet returned from Badr, they (the Jews) were envious and displayed deceit. Jibril (Angel Gabriel) revealed this verse to him: 'If you fear treachery from any group, throw back (their covenant) to them (so as to be) on equal terms, for God loves not the treacherous.' He said: 'When Jibril had finished, the Messenger of God said to him, 'I fear them.' The Prophet marched to them on the basis of this verse until they yielded to his judgment.' The Prophet got their possessions, and they kept their children and their women."—Waqidi, p. 89.

18. Koran, 8:67.

19. Tabari, vol. 7, p. 86.

20. Ibn Ishaq, p. 364.

21. Ibn Kathir, vol. 3, p. 5.

22. Waqidi, p. 94.

23. Ibid., p. 95.

24. Tabari, vol. 7, p. 97.

25. Ibid., pp. 97-8.

26. Waqidi, p. 96. Waqidi quotes Muhammad: "He (Kab Ashraf) hurt us (Allah and his messenger) and insulted us with poetry, and one does not do this among you (Jews and polytheists) but he shall be put to the sword." Muhammadanism is all about the precedents (Sunna) set by Muhammad. Because of his example of killing his critics, even today the followers of his cult continue to murder people for "blaspheming" him or his cult.

27. Ibn Ishaq, p. 676.

CHAPTER 17 – Reversal of Fortune

1. This event took place in the days preceding Muhammad's siege of the Qaynuqa Jews and their expulsion from Yathrib.

2. Sahih Al-Bukhari, trad. 4003.

3. Some of the sources indicate silver and gold coins were part of the cargo, whereas Ibn Ishaq, p. 364, merely states the caravan was carrying "a great deal of silver, which formed the larger part of their merchandise." This likely means bars of crudely smelted silver since the Meccans had no reason to transport money to Syria. Typically, they transported merchandise for sale at various markets and used some of the profits to buy goods for resale back in Mecca. They repatriated the balance of the profits in the form of Byzantine dirhams and dinars—the currency of the region. There were silver mines in the vicinity of Mecca, but due to the scarcity of firewood it was not possible to fully extract the metal from the ore, hence their commerce with Syria would have been in the form of crudely smelted silver.

4. Ibn Kathir, vol. 3, p. 13. Abu Dasma, meaning "The Dark One," was a nickname for Wahshi.

5. Ibn Ishaq, p. 372.

6. Ibn Sad, Kitab al- Tabaqat al-Kabir, vol. 2, p. 46.

7. Waqidi, p. 128.

8. The sword was the two-pointed scimitar named Zulfiqar that was part of Muhammad's Badr booty. This fearsome sword eventually became the symbol of Muhammad's religion.

9. Ibn Kathir, vol. 3, p. 27.

10. Like many people, Wahshi eventually joined Muhammad's religion to avoid being killed. At the time of his declaration of faith, Muhammad questioned him about the death of Hamza. Now that he was a believer, he could not be killed for it, but Muhammad told him he never wanted to see his face again. Wahshi participated in later battles, but he was shunned for being the killer of Muhammad's uncle. It is said that he took to drinking and died an alcoholic.

11. Ibn Sad, Muhammad, The Women of Medina, p. 29.

12. Waqidi, p. 119.

13. Ibn Kathir, vol. 3, p. 48.

14. Ibid., vol. 3, p. 35.

15. Ibid., vol. 3, p. 31.

16. Ibid., vol. 3, p. 40.

17. Ibid., vol. 3, p. 32.

18. Ibid., vol. 3, p. 33.

19. Ibid., vol. 3, p. 34.

20. Waqidi, p. 144.

21. Ibn Kathir, vol. 3, p. 33.

22. Ibid., vol. 3, p. 53.

23. Quoting a tradition reported by Sunni scholar Ahmad ibn Hanbal, Ibn Kathir relates: "When they searched, they found Hamza. His liver had been cut out and chewed by Hind, but she had been unable to swallow it. The Messenger of God, asked, 'Did she eat any of it?' 'No,' they told him. He commented, 'God would never have allowed any part of Hamza to enter hell-fire!'—Ibn Kathir, vol. 3, p. 56.

24. Waqidi, p. 129.

25. Ibid., p. 153.

26. Ibn Kathir, vol. 3, p. 65.

27. Ibid., vol. 3, p. 67.

28. Ibid., vol. 3, p. 67.

29. Ibid., vol. 3, p. 64.

30. Waqidi, p. 162.

31. Koran, 3:121-200. As with much of the Koran, these verses come across as diary or blog entries wherein the author recaps events and comments on them. The Koran can be seen as a collection of such writing done over a period of twenty-three years..

32. Waqidi, pp. 147-148. Ten years earlier, a man named Mujadhdhar of the Khazraj tribe murdered Harith's father, who belonged to the Aws tribe. The killing was in cold blood and was one of the causes of a war between the two tribes that eventually led to the battle of Buath, a major battle on a plain on the outskirts of Yathrib that pitted the Aws and the Khazraj against each other. Each had Jewish allies who were obligated through treaties to join in. Thus Jews ended up fighting Jews. Harith later joined Muhammad's religion as did Mujadhdhar. Harith was unable to suppress his desire to avenge his father. During the thick of the Uhud battle, he came up behind Mujadhdhar and struck off his head.

CHAPTER 18 – What's Yours Is Mine Too

1. Ibn Sad, vol. 1, p. 202.

2. Ibn Kathir, vol. 3, p. 72.

3. Waqidi, p. 154.

4. Ibid., p. 154.

5. Koran, 63:5-6. These verses are part of a chapter called "Hypocrites" that Muhammad composed on the return trip from the Mustaliq raid. See Chapter 21: Terms of Endearment.

6. Umm means mother of and is the counterpart of Abu, which means father of. Umm Salama's formal name was Hind bt. Abi Umayya (Hind, the daughter of the father of Umayya) of the Makhzum clan of Mecca. Abu Salama's given name was Abdullah ibn Abd al-Asad. His mother Barra was one of the six daughters of Abdul Muttalib, the grandfather of Muhammad. Muhammad had numerous first cousins, and some of them such as Abu Salama joined his religion and took part in raids and battles. Others cousins fought against him.

7. Muhammad recruited Abdullah Unays, one of the hitmen who murdered the Jewish poet Kab Ashraf, to carry out the assassination of Khalid Sufyan. The literature quotes the account Unays gave of the murder: "The Messenger of God called for me and said, 'I have been informed that Khalid b. Sufyan b. Nubayi al-Hudhali is gathering a force of men to attack me. He is at Urana. Go to him and kill him.'"—Ibn Kathir, vol. 3, p. 190. The story continues: "I took him by surprise, killed him, and took his head. Then I turned, leaving his women crying over him. . . . I traveled by night, and concealed myself by day until I came to Medina and found the Prophet in the mosque. He said, 'May you prosper!' and I said, 'May you prosper, O Messenger of God.' I placed Sufyan's head before him and informed him of my news."—Waqidi, p. 262. The only reward Unays got from Muhammad for his effort was a stick. At first he was disappointed, but then Muhammad informed him it was a special stick. "It is a sign between yourself and me for Judgment Day. There will be very few that day with something to lean upon." Unays attached it to his sword, and it was always with him "until, upon his death, it was included in his winding sheet and he and it were buried together."—Ibn Kathir, vol. 3, p. 191.

8. Ibn Ishaq, p. 428.

9. As many men were killed in this incident as were killed in the battle of Uhud, but these represented more a more serious loss to Muhammad, as all of them had undergone rigorous training as preachers. They had memorized what existed of the Koran up until then; they had mastered the dogmas of the religion; they knew how to perform the ablution and prayer routines to perfection. Says Waqidi of their preparation: "When it was evening they would gather on a side of Medina, studying together and praying, until it was dawn. They would gather fresh water and firewood and bring it to the rooms of the Messenger of God. Their families thought that they were in the mosque, while the people in the mosque thought that they were with their families."—Waqidi, p. 169.

10. For a month, Muhammad "invoked curses" during dawn prayers against the tribes involved in the massacre. These were prayers of hatred that were repeated in unison by the faithful.—Sahih Muslim, trad. 1433.

11. "And if thou fearest treachery from any folk, then throw back to them (their treaty) fairly. Lo! Allah loveth not the treacherous."—Koran, 8:58.

12. A man named Amr Umayya was the only survivor of the Mauna's Well massacre. While vultures descended on the bodies of the slain preachers, Umayya made his way back to Yathrib on foot. During the return trip he murdered two men he encountered in vengeance for the deaths of his comrades. He had determined they were polytheists, meaning it was permissible to kill them, but he was unaware that they had just returned from Yathrib after arranging protection from Muhammad for their tribe and were supposed to be untouchable. The literature does not explain why the Nadir Jews would have an obligation to pay blood money to the tribe of the murdered men.

13. It is likely Muhammad believed his own paranoid fantasy, for by then he was certain that anything that came into his head came from Allah via the Angel Gabriel. He was gifted with a vivid imagination, and as he waited in front of the gate the image would have suddenly come to him of a millstone being dropped on his head from the battlement. This paranoid fantasy frightened him so that he left abruptly, abandoning his companions without explanation.

14. Waqidi, p. 180.

15. "Whether ye cut down (O ye Muslim!) the tender palm-trees, or ye left them standing on their roots, it was by leave of Allah, and in order that He might cover with shame the rebellious transgressers."—Koran, 59:5.

16. Muhammad later boasted to Safiya, the daughter of Huyayy Akhtab, about whipping the caravan along. "You should have seen me lash the saddle of your uncle Bahri b. Amr and drive him away from here!"—Waqidi, p. 183. Most of the Nadir Jews, including Safiya's family, settled in Khaybar, which Muhammad attacked several years later. She was taken captive and was forced to marry Muhammad after he tortured and beheaded her husband. She was brought back to Yathrib where she became part of his harem. See Chapter 26: God's Mercy to Man.

17. In his Koran commentary Ibn Kathir had this to say about these verses: "The wealth of the Banu An-Nadir was of the Fai type (booty obtained without fighting) that Allah awarded His Messenger and for which the Muslims did not have to use cavalry or camelry. Therefore, it was for the Messenger of Allah, and he used it for the needs of his family for a year at a time, and the rest was used to buy armor and weapons used in the cause of Allah, the Exalted and Most Honored."—Tafsir Ibn Kathir, vol. 9, p. 555.

18. Koran, 59:7.

19. Waqidi, p. 183.

20. Koran, 59:2-4. As with may of the Koran verses, the real meaning can be extracted by substituting Muhammad for God or Allah.

21. Koran, 59:11.

22. Muir says of Muhammad's Koran compositions of this period: "… the tendency of the Coran now [was] to become the vehicle of military commands. In the Coran, victories are announced, success promised, actions recounted; failure is explained, bravery applauded, cowardice or disobedience chided; military or political movements are directed;—and all this as an immediate communication from the Deity."—Muir, Life of Muhammad, p. 298.

CHAPTER 19 – Fear and Loathing in Prophet City

1. Sahih Muslim, trad. 7051.

2. Ibid., trad. 6913.

3. Sahih Al-Bukhari, trad. 7294.

4. Muhammad scandalized even his followers by adding the wife of his adopted son Zayd to his harem. See Chapter 20: Father and Son.

5. Sahih Muslim, trads. 6881-6884.

6. Tafsir Ibn Kathir, vol. 10, p. 511.

7. Ibid., vol. 10, pp. 511-2.

8. Details about Muhammad's End Time predictions can be found throughout the literature. This chapter, however, is based primarily on the traditions of the Persian Sunni scholar Muslim ibn al-Hajjaj in his Book Pertaining to the Turmoil and Portents of the Last Hour, which is one of the numerous thematic sections of Sahih Muslim. See traditions 6881 to 7057.

9. The mention of Abu Sufyan and his descendants shows that details were added to Muhammad's End Time stories after his death. Abu Sufyan joined the religion at the time of the conquest of Mecca, which took place three years before Muhammad died. Three decades later his son Muawiya would become the first caliph of the Umayyad dynasty. He or one of his descendants is likely the "Sufyani" alluded to in the End Time story.

10. Koran, 75:10-12. Muhammad composed Chapter 75 of the Koran in Mecca. It is called Al-Qiyama, which is usually translated as "The Resurrection" or "The Rising of the Dead."

11. Sahih Muslim, trad. 7015.

12. According to The Encyclopedia of Islam, (Brill Academic Publishers, Leiden, The Netherlands) Tamim Dari, a well-traveled wine merchant before his conversion, may have been the major if not exclusive source for Muhammad's ideas for the Antichrist. The traditions cited herein, however, suggest Dari confirmed what Muhammad previously preached on the subject, but outdid him in imaginative enhancements.

13. Sahih Muslim, trads. 7028-7030.

14. Ibid., trad. 7028.

15. Ibid., trads. 6990-7004.

16. Koran, 44:10.

17. Sahih Muslim, trad. 7000.

18. Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, trad. 4316.

19. Sahih Muslim, trad. 7004.

CHAPTER 20 – Father and Son

1. Ibn Sad, Muhammad, The Women of Medina, pp. 72-81; Tafsir Ibn Kathir, vol. 7, pp. 695-9.

2. Seven of Abdul Muttalib's children—twelve male and six female—have been mentioned in this biography thus far: Abdullah (Muhammad's father), Abu Talib, Abu Lahab, Hamza, Abbas, Safiya and Umayma (Zaynab's mother). The literature records that Abdul Muttalib's daughters had among them twenty-four children. The number of children of the male offspring is not as well documented, but it is known that Abu Talib had at least nine children: Talib, Aqil, Jafar, Ali, Tulayq, Jumana, Tayta, Fakhita, and Hind (also known as Umm Hani from whose house Muhammad claimed he went up into Heaven). Because of the high birthrate, it is likely that the number of Muhammad's paternal first cousins totaled more than one hundred. There were also numerous maternal first

cousins, such as Sad Waqqas. Some of his first cousins joined his religion, others became bitter opponents. First cousins from both factions died in the battles and skirmishes between Muhammad and the Meccans.

3. Tafsir Ibn Kathir, vol. 7, p. 696. "For her dowry he (Muhammad) gave her ten dinars, sixty dirhams, a veil, a cloak and a shirt, fifty mudds of food and ten mudds of dates." A mudd is equal to a bushel.

4. "Those whom thy right hand possesses" refers to slaves, but here meaning female slaves.

5. Koran, 33:50.

6. In Koran Chapter 33, Muhammad composed a verse mentioning Zayd by name that recaps the essentials of the episode. Here is the latter half of this lengthy verse: "Then when Zayd had dissolved (his marriage) with her, with the necessary (formality), We joined her in marriage to you: in order that (in future) there may be no difficulty to the Believers in (the matter of) marriage with the wives of their adopted sons, when the latter have dissolved with the necessary (formality) (their marriage) with them. And Allah's command must be fulfilled."—Koran, 33:37, from the Yusuf Ali translation which includes the words in parenthesis. What this verse means in plain language is that Muhammad used his fictive Allah to command himself to marry the wife of his adopted son—subject to penalties for disobedience if he did not obey himself.

7. Tafsir Ibn Kathir, vol. 7, p. 722.

8. Ibid., vol. 7, p. 697.

9. Koran, 33:53.

10. Ibid., 33: 60-61.

11. Ibid., 33:5.

12. Chapter 33 of the Koran is important in that it represents a concentration of evidence of Muhammad's disturbed mind. In the seventy-three verses that make up the chapter, Muhammad has God address him as "The Prophet," recaps the battle of the Trench, and excoriates men who were afraid to fight and die. He gloats about the extermination of the Qurayza Jews, the theft of their property, and the enslavement of their women and children. In this chapter, he authorizes himself to take as many wives as he likes, permits himself to marry the wife of his adopted son, forbids himself from taking any more wives after he has taken as many as he likes, but allows himself sex slaves. He imposes full body and face cover for women when outside the home, threatens people with humiliating punishment in the afterlife for annoying him, threatens to murder his critics, prohibits the practice of adoption, and dishes up images of sadistic torture in Hell awaiting people who disobey him. He also praises himself as a "lamp spreading light" and holds up his behavior as a "beautiful pattern" for people to follow if they want to score well with Allah. Among the verses is a celestial advisory that Muhammad must be obeyed: "It is not fitting for a Believer, man or woman, when a matter has been decided by Allah and His Messenger to have any option about their decision: if any one disobeys Allah and His Messenger, he is indeed on a clearly wrong Path."—Koran, 33:36.

13. The belief that God dictated the Koran to Muhammad has survived fourteen centuries and finds its way today even into Wikipedia. In the Zaynab bt. Jahsh entry, we find: "The marriage was used by Munafiqs (Hypocrites) of Medina in an attempt to discredit Muhammad on two fronts, one of double standards as she was his fifth wife, while everyone else was restricted to four, and marrying his adopted son's wife. This was exactly what Muhammad feared and was initially hesitant in marrying her. The Qur'an, however, confirmed that this marriage was valid. Thus Muhammad, confident of his faith in the Qur'an, proceeded to reject the existing Arabic norms. When Zaynab's waiting period from her divorce was complete, Muhammad married her." (Italics added for emphasis) Wikipedia entries about Muhammad's religion are largely written by believers, as the article about Zaynab shows. The author of the Wikipedia entry seems oblivious to the idea that the Koran "confirmed that the marriage was valid" because Muhammad was the author of the Koran.

CHAPTER 21 – Terms of Endearment

1. In Waqidi, p. 199, it reads, "O Mansur, kill, kill!" Mansur means conqueror.

2. It is useful to note how the phraseology of the literature obscures Muhammad's responsibility for his actions by attributing them to God. Regarding the Mustaliq raid, it is written: "The people advanced toward each other and fought fiercely. God put the Banu al-Mustaliq to flight and killed some of them. He gave their children, women, and property to the Messenger of God as booty—God gave them to him as spoil."—The History of al-Tabari, vol. 8, p. 51. Substituting Muhammad for God gives the clear picture.

3. This was implicit in a verse that Muhammad composed around the time of the Nadir expulsion: "Also (prohibited are) women already married, except those whom your hands possess."—Koran, 4:24.

4. Ibn Kathir, vol. 3, p. 216.

5. The traditions show that Muhammad's men were concerned about impregnating captive women, not about raping them. Typical of these anecdotes: "Narrated Ibn Muhairiz: 'I entered the Mosque and saw Abu Said Al-Khudri and sat beside him and asked him about Al-Azl (i.e. coitus interruptus). Abu Said said, "We went out with Allah's Apostle for the ghazwa (raid) of Banu Al-Mustaliq and we received captives from among the Arab captives and we desired women and celibacy became hard on us and we loved to do coitus interruptus. So when we intended to do coitus interruptus, we said, 'How can we do coitus interruptus before asking Allah's Apostle who is present among us?' We asked (him) about it and he said, 'It is better for you not to do so, for if any soul (till the Day of Resurrection) is predestined to exist, it will exist.'"—Sahih Al-Bukhari, trad. 4138.

6. Ibn Kathir, vol. 3, p. 216.

7. Tabari, vol. 8, p. 57.

8. Muhammad never forgot the incident. Miqyas was included on a hit list Muhammad drew up before he conquered Mecca three years later. It is said that Miqyas awaited his death while getting drunk on wine at his mother's house. See Chapter 30: Capitulation.

9. Tabari, vol. 8, p. 52.

10. Waqidi, p. 205.

11. Koran Chapter 63: The chapter begins with the usual self-affirmation of his role: "When the hypocrites come to you, they say: We bear witness that you are most surely Allah's Apostle; and Allah knows that you are most surely His Apostle, and Allah bears witness that the hypocrites are surely liars."—Koran, 63:1. Alluding to Abdullah Ubayy, Muhammad continues: "When thou lookest at them, their exteriors please thee; and when they speak, thou listenest to their words. They are as (worthless as hollow) pieces of timber propped up, (unable to stand on their own). They think that every cry is against them. They are the enemies; so beware of them. The curse of Allah be on them! How are they deluded (away from the Truth)!"—Koran, 63:4. The chapter concludes that true believers should spend "something (in charity) out of the substance which We have bestowed on you."—Koran, 63:10, meaning they should give in charity some of the stolen property that Muhammad gave them—the booty awarded to them after they attacked and killed people who were at odds with him. Seemingly lost on Muhammad were his own final words: "And Allah is well acquainted with (all) that ye do."—Koran, 63:11.

12. Tabari, vol. 8, p 52.

13. Ibn Ishaq, p. 492.

14. Ibn Kathir, vol. 3, p. 215.

15. Sahih Muslim, trad. 6673.

16. Ibn Ishaq, p. 496.

17. Aisha learned of Ali's remarks and never forgot. His lack of support for her was a factor in the split decades later of Muhammad's religion into Sunni and Shia factions.

18. Ibn Kathir, vol. 3, p. 220.

19. Sahih Muslim, trad. 6673.

20. Waqidi, p. 211.

21. Tabari, vol. 8, p. 61.

22. Ibid., p. 62.

23. Several versions of the story can be found in the literature. Muhammad's involvement as judge in the matter can only be explained if the accused were Jewish converts from a clan or subclan of the Aws or Khazraj. The Qaynuqa and Nadir Jews did not accept Muhammad's authority and would not have turned their own people over to him, but would have decided the matter among themselves. The presence of Jewish rabbis would therefore have been as advocates to argue for the punishment they deemed appropriate for the offense, but Muhammad decided on death. Abdullah, the son of Umar, was one of the people who took part in the stoning. He said, "I saw him (the Jew) protecting her (the Jewess) with his body."—Sahih Muslim, trad. 4211.

24. Tabari, vol. 8, pp. 62-3.

25. Ibid., p. 63.

26. Koran, 24:12.

27. Ibn Ishaq, p. 498.

28. Waqidi, p. 214.

29. Ibn Kathir, vol. 3, p. 222.

30. Ibid., p. 222.

CHAPTER 22 – Trench Warfare

1. Waqidi, pp. 194-5.

2. Ibid., pp. 197-8.

3. Ibn Kathir, vol. 3, p. 128.

4. Presumably through his uncle Abbas, Muhammad learned of the conversation between the Nadir rabbis and Abu Sufyan, for he came out with a Koran verse that alluded to it: "Have you not seen those to whom a portion of the Book has been given? They believe in idols and false deities and say of those who disbelieve: These are better guided in the path than those who believe. Those are they whom Allah has cursed, and whomever Allah curses you shall not find any helper for him."—Koran, 4:51-2. As with many of the Koran verses, the meaning comes through more clearly by substituting Muhammad for God.

5. In most versions of this story, Muhammad awarded credit for the kill to Abdullah Unays after the assassins argued over who landed the mortal blow. In the Tabari version, vol. 7, p. 103, Muhammad settled the matter when he examined their swords and found bone nicks on Abdullah's sword. In the Waqidi, however, Abdullah Unays is quoted as saying that it was a trace of food on his sword that proved he killed him: "We arrived before the Prophet, and he was at the pulpit. When he saw us he said, 'May your faces prosper!' We replied, 'And may your face prosper, Oh Messenger of God.' He said, 'Did you kill him?' We said, 'All of us claim to have killed him.' He said, 'Hurry and show me your swords.' So we brought our swords. Then he said, 'This killed him. This is the trace of food on the sword of Abdullah b. Unays.'"—Waqidi, p. 193.

6. This is a paraphrase. In Waqidi, Amr says: "I detest that I kill the likes of you. Your father was my friend. So return! You are a young lad. Rather I would like an older Quraysh, Abu Bakr or Umar." Ali replies: "Indeed I invite you to the duel, for I desire to kill you."—Waqidi, p. 230.

7. Ibn Kathir, vol. 3, p. 146.

8. Waqidi, p. 223.

9. Ibn Kathir, vol. 3, p. 141.

10. Waqidi, p. 236.

11. Ibid., p. 240.

12. Koran, 33:9-11.

CHAPTER 23 – The Final Solution

1. Sahih Al-Bukhari, trad. 4980.

2. Ibn Kathir, vol. 3, p. 158.

3. Waqidi, p. 245.

4. Ibn Kathir, vol. 3, p. 160.

5. A man named Haritha al-Numan was present when Muhammad told them that the man on the donkey they took to be Dihya was actually the Angel Gabriel. For the remainder of his life Haritha boasted about having seen the angel: "I saw Gabriel twice in my lifetime: on the day of al-Sawrayn (the Najjar village), and on the day of the site of the funeral when we returned from Hunayn (a later battle)."—Waqidi, p. 245. This anecdote, reported by numerous sources, reveals the gullibility of Muhammad's followers.

6. Waqidi, pp. 244-5.

7. An early Meccan convert who was famed for having once been roped together with Abu Bakr and dragged through the streets of Mecca, Talha lost several fingers when he, Muhammad, and others were trapped on the side of Mount Uhud during the battle of Uhud. According to one account, he lost the fingers in a sword fight with Meccan soldiers who were attempting to get at Muhammad. In another account, his fingers were severed by an arrow that had been aimed at Muhammad, but was deflected by his hand.

8. Waqidi, p. 245.

9. Ibid., p. 245.

10. Ibn Kathir, vol. 3, p. 163.

11. Abu Lubaba's behavior could be taken as humorous if it did not reveal the extraordinary terror of punishment Muhammad had inculcated in his followers—punishment by Muhammad in this life and punishment in the fires of Hell in the next. Abu Lubaba remained tied to the palm trunk for twenty days. He would allow his daughter or his wife to untie him so he could perform the scheduled prayers and eat a few dates, then he had them tie him back up. "I will not leave this place until God forgives me for what I have done," he declared. Seeing a benefit in allowing him to make such a spectacle of guilt and repentance, Muhammad allowed

him to remain tied up until he became delirious and there was a real chance he could die. The story goes that Muhammad was with Umm Salama in her room when a smile came over his face. When she asked him about it, he said a revelation had just come to him that Allah had forgiven Abu Lubaba! He sent someone to tell him, but Abu Lubaba refused to allow anyone to release him until he heard it directly from the mouth of Muhammad himself. Muhammad then went out from Umm Salama's room to the prayer area and personally informed him of "Allah's mercy."—Ibn Ishaq, p. 462. Inside the so-called Mosque of the Prophet in Medina is a pillar called the Pillar of Abu Lubaba, which commemorates Abu Lubaba as a hero of the faith.

12. Waqidi, p. 251.

13. Ibn Ishaq, p. 463.

14. Ibn Kathir, vol. 3, pp. 165-6.

15. Waqidi, p. 251.

16. Ibid., p. 252.

17. Ibid., p. 252. Waqidi alone identifies the men who beheaded the Jews as Muhammad's first cousins Ali and Zubayr. Ibn Ishaq writes that the beheadings were carried out by the Khazraj, who enjoyed the slaughter because the Qurayza Jews had sided with their enemies during the intertribal wars.—Ibn Ishaq, p. 752, n. 580.

18. Ibn Ishaq, p. 464.

19. Waqidi, p. 253.

20. Ibid., p. 252.

21. Muhammad's wife Aisha, then thirteen years old, later told an interviewer about the woman's death: "Only one of their women was killed. By Allah! She was actually with me and was talking with me and laughing immoderately as the apostle was killing her men in the market when suddenly an unseen voice called her name. 'Good heavens,' I cried. 'What is the matter?' 'I am to be killed,' she replied. 'What for?' I asked. 'Because of something I did,' she answered. She was taken away and beheaded." Aisha, who evidently had a front-row seat of the slaughter, had become so numbed and desensitized by the brutality she was witnessing that she mistook the woman's hysterical and delirious reaction of fear for cheerfulness. The story continues: "I shall never forget my wonder at her good spirits and her loud laughter when all the time she knew she would be killed."—Ibn Ishaq, pp. 464-5.

22. Ibn Ishaq is the primary source for the number of Qurayza Jews executed that day. He wrote: "There were six hundred or seven hundred in all, though some put the figure as high as eight hundred or nine hundred."—Ibn Ishaq, p. 464. However, Ibn Hisham, in his revision of Ibn Ishaq's biography, includes a lengthy note based on information provided by Abu Ubayda—the man who killed his own father at Badr and who later gained fame by breaking a front tooth while extracting metal links from Muhammad's cheek and licking the blood off his face—claimed that the death count of the Qurayza massacre was four hundred. (see Ibn Ishaq, p. 752, n. 580.) The upper range is the most likely as the executions began in the early afternoot after the trench digging was completed and continued until well after dark. The one-per-minute rate is given here as a way of conceptualizing the magnitude of the undertaking, but the beheadings could have been accomplished at a more rapid clip. The number that were beheaded can be roughly calculated based on the assumption of a one-to-one ratio of males to females. It is reported there were a thousand women and children taken captive. Assuming that the prepubescent boys Muhammad spared numbered a hundred and fifty, that leaves eight hundred and fifty captive females of all ages. If the one-to-one ratio holds, then it can be assumed there was a total of eight hundred and fifty males in the tribe. Subtracting the one hundred and fifty prepubescent boys from this number leaves seven hundred Qurayza males who were sent to the trench for slaughter.

23. Ibn Ishaq, p. 752, n. 580.

24. Waqidi, pp. 258-60. Both Waqidi and Ibn Kathir give lengthy, maudlin accounts of Sad's death and funeral.

25. Ibn Ishaq, p. 466.

CHAPTER 24 – All Rise!

1. Wensinck, A. J., Muhammad and the Jews of Medina, p. 15. Wensinck cites Ahmad b. Yahya al-Baladhuri, a ninth century Persian historian.

2. These precedents were recorded in the numerous traditions about Muhammad, which were compiled by "traditionists"—scholars who collected Muhammad traditions such as Bukhari, Muslim, Abu Dawud, and many others. Along with the Koran, the traditions form the basis for the various schools of Sharia law—the jurisprudence of Muhammad's religion.

3. Tafsir Ibn Kathir, vol. 1, p. 641.

4. Muhammad composed a verse about it: “And if he has divorced her (the third time), then she is not lawful unto him thereafter until she has married another husband. Then, if the other husband divorces her, it is no sin on both of them that they reunite, provided they feel that they can keep the limits ordained by Allah. These are the limits of Allah, which He makes plain for the people who have knowledge.”—Koran, 2:230.

5. Tafsir Ibn Kathir, vol. 9, p. 510. “Zihar” refers to the words polytheists used to pronounce divorce. “You are like my mother’s back,” which is taken to mean, “You are unlawful for me to approach.”

6. Muhammad has Allah comment about Khuwayla’s predicament: “Allah indeed knows the plea of her who pleads with you about her husband and complains to Allah, and Allah knows the contentions of both of you; surely Allah is Hearing, Seeing. (As for) those of you who put away their wives by likening their backs to the backs of their mothers, they are not their mothers; their mothers are no others than those who gave them birth; and most surely they utter a hateful word and a falsehood and most surely Allah is Pardoning, Forgiving. And (as for) those who put away their wives by likening their backs to the backs of their mothers then would recall what they said, they should free a captive before they touch each other; to that you are admonished (to conform); and Allah is Aware of what you do. But whoever has not the means, let him fast for two months successively before they touch each other; then as for him who is not able, let him feed sixty needy ones; that is in order that you may have faith in Allah and His Apostle, and these are Allah’s limits, and the unbelievers shall have a painful punishment.”—Koran, 58:1-4.

7. Tafsir Ibn Kathir, vol. 2, p. 506.

8. Koran, 2:219.

9. Tafsir Ibn Kathir, vol. 1, p. 604.

10. Koran, 4:43.

11. Ibid., 5:90-1.

12. Sahih Al-Bukhari, trads. 6774-6777.

13. Sunan Abu Dawud, trad. 4469.

14. “And (as for) the man who steals and the woman who steals, cut off their hands as a punishment for what they have earned, an exemplary punishment from Allah; and Allah is Mighty, Wise.”—Koran, 5:38.

15. Tafsir Ibn Kathir, vol. 7, pp. 67-9.

16. Koran, 33:59.

17. Tafsir Ibn Kathir, vol. 7, p. 30.

18. “And for those who launch a charge against their spouses, and have (in support) no evidence but their own, their solitary evidence (can be received) if they bear witness four times (with an oath) by Allah that they are solemnly telling the truth; And the fifth (oath) (should be) that they solemnly invoke the curse of Allah on themselves if they tell a lie. But it would avert the punishment from the wife, if she bears witness four times (with an oath) By Allah, that (her husband) is telling a lie; And the fifth (oath) should be that she solemnly invokes the wrath of Allah on herself if (her accuser) is telling the truth.”—Koran, 24:6-9.

19. Sunan Abu Dawud, trad. 2248.

20. Sahih Muslim, trad. 4206.

21. Sahih Al-Bukhari, trad. 6816. The tradition continues that Muhammad “spoke well of him and offered his funeral prayer.”

22. Sahih Muslim, trad. 4206.

23. Ibid., trads. 4145-4149.

24. Ibn Kathir, vol. 3, p. 306.

25. Sunan Abu Dawud, trad. 4348. A footnote to this tradition (vol. 3, p. 1215, n. 3799) contains a discussion about whether nonbelievers can be killed for insulting Muhammad: “It is unanimously agreed that if a Muslim abuses or insults the Prophet (may peace be upon him) he should be killed. There is a difference of opinion about the killing of a non-Muslim. According to a1-Shaffii, he should be killed. Abu Hanifah is of opinion that he should not be killed. The sin of being a polytheist is far greater than it. Malik maintains that he should be killed except that he embraces Islam.”

26. The murdered woman may have been one of the Qurayza women enslaved after the mass beheading of their men. Women were part of the booty, and many ended up as concubines—sex slaves. This would explain why she berated Muhammad.

27. Koran, 5:89.

28. Waqidi, p. 421.

CHAPTER 25 – The Way the Truth and the Life

1. Muir, p. 354.

2. Waqidi, p. 262. This attack became known as the al-Qurta or al-Qurata raid and took place fifty-five months after Muhammad arrived in Yathrib, according to Waqidi.

3. Ibid., p. 272.

4. Ibid., p. 276. Waqidi titles the raid “The Expedition of Ali b. Abi Talib to the Banu Sa’d in Fadak.” It took place around the time Muhammad’s ex-adopted son Zayd killed an old woman of the nearby Fazara tribe by ripping her apart between two camels.

5. Ibn Ishaq, p. 672.

6. Ibn Kathir, vol. 3, p. 110.

7. Ibid., vol. 3, p. 204.

8. Ibid., vol. 3, p. 207.

9. Ibid., vol. 3, p. 210.

10. Ibid, vol. 3 pp. 243-4.

11. Koran, 5:38.

12. Ibid., 5:33.

CHAPTER 26 – Peace in Our Time

1. Waqidi, p. 283.

2. The verse reads, “And complete the hajj or umra in the service of Allah. But if ye are prevented (from completing it), send an offering for sacrifice, such as ye may find, and do not shave your heads until the offering reaches the place of sacrifice. And if any of you is ill, or has an ailment in his scalp, (necessitating shaving), (he should) in compensation either fast, or feed the poor, or offer sacrifice; and when ye are in peaceful conditions (again), if any one wishes to continue the umra on to the hajj, he must make an offering, such as he can afford, but if he cannot afford it, he should fast three days during the hajj and seven days on his return, making ten days in all. This is for those whose household is not in (the precincts of) the Sacred Mosque. And fear Allah, and know that Allah is strict in punishment”—Koran, 2:196. The words in parenthesis were inserted by the translator, Abdullah Yusuf Ali. The umra is the minor pilgrimage to Mecca only whereas the hajj is the major pilgrimage that begins in Mecca and follows the ancient sun worship stations beginning at Arafat. The hajj terminates with orbits of the temple of Mecca.

3. Waqidi, p. 284.

4. Ibn Kathir, vol. 3, p. 226.

5. Ibn Ishaq, p. 501.

6. Ibn Kathir, vol. 3, p. 226.

7. Ibid., vol. 3, p. 226.

8. Ibid., vol. 3, p. 227.

9. Ibid., vol. 3, p. 227.

10. Waqidi, p. 297.

11. Ibn Ishaq, pp. 504-505.

12. Sahih Al-Bukhari, traditions 2731, 2732. At more than three thousand words, this is one of the longest of the Bukhari traditions, and later scholars such as Ibn Ishaq and Waqidi borrowed from it for their accounts.

13. Muhammad complained to his wife Umm Salama, the only wife who had accompanied him on the pilgrimage, that no one was listening to his order. She urged him to take the lead and everyone would follow. She is quoted saying, “The Messenger of God put on his robe leaving his right shoulder exposed, and then set out taking a spear with him to urge on the sacrificial beast. . . . Then, as I watched, he pounced with his spear on the animal, crying out, ‘In the name of God most great.” She added, “As soon as the people saw him slaughter, they too pounced on the animals.”—Waqi-di, p. 302.

14. Animal sacrifice was an ancient practice of the pagans to obtain favor from the gods. Muhammad sacrificed the animals “in the name of Allah” whereas the polytheists sacrificed theirs in the name of whatever deity they believed in. The same with prayers: Muhammad prayed to Allah for favor, whereas the pagans prayed to gods and goddesses, generally with the idea their prayers would get relayed to the supreme deity through the intermediary. Muhammad deemed their blood sacrifices and prayers invalid because they were misdirected, and that praying and sacrificing to other than Allah merited eternal punishment in Hell.

15. Waqidi, p. 304.
16. Ibid., p. 304.
17. Koran, 48:1.
18. Ibid., 48:25.
19. Ibid., 48:10.
20. Ibid., 48:19.
21. Ibid., 48:20.
22. Waqidi, p. 308.
23. Ibid., p. 309.
24. Ibid., pp 310-311.
25. Koran, 60:10.

CHAPTER 27 – God's Mercy to Mankind

1. Ibn Kathir, vol. 3, p. 248.
2. Ibid., vol. 3, p. 249.
3. Waqidi, p. 317.
4. Ibn Kathir, vol. 3, p. 264.
5. Ibid., vol. 3, p. 261.
6. Waqidi, p. 327.
7. Ibid., p. 330.
8. Ibn Ishaq, p. 515.
9. Waqidi, p. 331.
10. Ibn Ishaq quotes Muhammad giving the order to Zubayr: "Torture him until you extract what he has."—Ibn Ishaq, p. 515.
11. Sunan Abu Dawud, trad. 2992.
12. Ibn Ishaq, p. 515.
13. Ibid., p. 515.
14. Waqidi, p. 331.
15. Ibn Ishaq, p. 517.
16. Ibn Kathir, vol. 3, p. 271.
17. Ibid., vol. 3, p. 271.
18. Waqidi quotes one of the participants that all the elite of the Khaybar Jews were slaughtered: "As for the nobility of the Jews, and the people of affluence among them—the sons of Abu l-Huqayq, Sallam b. Mishkam, and Ibn al-Ashraf—had been killed. The remaining people had no wealth and indeed were laborers."—Waqidi, p. 351. This begs the question as to the true number of slain. In the official count, ninety-three Jews were killed, but the number must have been much higher.
19. Ibn Kathir, vol. 3, p. 284.
20. Ibid., vol. 3, p. 284.
21. Waqidi, pp. 341-4.
22. Waqidi reports that Muhammad authorized the murder: "Kharija b. al-Harith related to me from Atiyya b. Abdullah b. Unays from his father, who said: I was mending my bow. He said: 'When I arrived I found my companions were going to (fetch) Usayr b. Zarim (a variant of Yusayr Rizam).' The Prophet said, 'I will not see Usayr b. Zarim,' meaning, kill him."—Waqidi, p. 279.
23. The murder of Yusayr Rizam and his thirty Jewish companions is generally placed before the attack on Khaybar, but this chronology does not stand up to scrutiny. According to the literature, Yusayr and the other Jews left Khaybar unarmed, but this would not have occurred prior to the conquest of their valley as they would never have left Khaybar without the ability to defend themselves, certainly not while traveling with Muhammad's people. After the conquest of Khaybar, however, the Jews were stripped of their weapons and would not have had any choice but to travel unarmed. Also, the lure that was used to draw them out of Khaybar was for Yusayr to meet with Muhammad about giving him leadership over Khaybar. Prior to the attack, Muhammad did not have any power over Khaybar so that the offer of a leadership role to Yusayr could only have occurred after the conquest. This mass murder only makes sense as a punitive action in retaliation for the murder of one of Muhammad's men. It was intended as a warning against rebellion.

CHAPTER 28 – The Station of Abraham

1. Waqidi, p. 361-2.

2. Ibn Ishaq, p. 531.

3. Waqidi, p. 363.

4. See Chapter 13, The Jewish Question, pp. 182-3.

5. Umar's first question to Muhammad was: "Is this the Maqam (station) of our father (Abraham)?" The question is devastating to the Muhammadan mythology about Abraham, for it is a smoking gun that reveals Muhammad's Abraham-Kabah stories were post-hijra (flight from Mecca) inventions. As noted in Chapter 14, Umar, a native of Mecca, would not have had to ask Muhammad about the stone if it had been part of the history or lore of Mecca. In his voluminous Koran commentary, Ibn Kathir attributed Umar's question to a tradition by Jabir ibn Abdullah, who was present at the pilgrimage and was a Muhammad "companion" credited with numerous reports about him. Ibn Kathir obtained his version of the Jabir narration through the work of Ibn Abi Hatim al-Razi, a 9th•century Sunni scholar who specialized in hadith (tradition) criticism. Jabir's tradition is repeated almost verbatim in Sahih Muslim, one of the two major Sunni collections of Muhammad traditions, but Umar's questions are not included.—Tafsir Ibn Kathir, vol. 1, p. 373.

6. Jabir's lengthy tradition appears to refer to the full pilgrimage, which was traditionally undertaken during Dhu al-Hijja (Pilgrimage Month)—the twelfth month of the lunar year, rather than the minor pilgrimage that Muhammad undertook during Dhu al-Qidah (Truce Month)—the eleventh month of the lunar calendar. Muhammad only made one full pilgrimage, the so-called Farewell Pilgrimage, a year before his death. The placement of the Station of Abraham incident in this chapter is based on the assumption Muhammad invented this particular story at the time of his break with the Yathrib Jews, which was the period when he conceived the Abraham- Kabah narrative. The minor pilgrimage to Mecca in fulfillment of the Treaty of Hudaybiyya would therefore have been the first opportunity for Umar to ask Muhammad about the stone. If Umar posed his questions at the later full pilgrimage, it would mean that Muhammad invented the Maqam Ibrahim story at a later date.

7. "Remember We made the House a place of assembly for men and a place of safety; and take ye the station of Abraham as a place of prayer."—Koran, 2:125.

8. Umar used to boast that this was one of three occasions when Allah transmitted a verse to Muhammad via the Angel Gabriel that was inspired by something he had said to Muhammad. It apparently never occurred to him that Muhammad was merely rephrasing his words in God-speak.

9. Ibn Ishaq, p. 531.

CHAPTER 29 – Jihad! Jihad! Jihad!

1. Koran, 2:216.

2. Ibn Kathir, vol. 3, p. 258.

3. Ibid., vol. 3, p. 259.

4. This scene is a construction based on details from multiple sources that suggest Muhammad's sermons were often angry and manipulative, intended to get people to fight and die for him.

5. Ibn Sad, vol. 2, p. 146.

6. Sahih Muslim, trad. 4345.

7. Ibn Kathir, vol. 3, p. 304.

8. Ibid., vol. 3, p. 319.

9. Waqidi, p. 356.

10. Ibn Kathir, vol. 3, p. 301.

11. Khalid, whose full name was Khalid b. al-Walid b. al-Mughira, would become known as "The Sword of Allah" for his ruthless crushing of a rebellion following Muhammad's death in A.D. 632 and for his later defeat of the Persians in Iraq and the Byzantines in Syria. He conquered Jerusalem in A.D. 637. He was addicted to killing and preferred to annihilate his enemies. He died in A.D. 642. As noted in earlier chapters, his father Walid, who led the reconstruction of Mecca's temple in A.D. 605, was one of the chief opponents of Muhammad in Mecca.

12. Like Khalid, Amr b. al-As emerged as an important military leader after the death of Muhammad. He took part in the conquest of Jerusalem and led an army that conquered Egypt in A.D. 640, twice serving as its governor. He died in A.D. 664. Until he switched

sides after the fall of Khaybar, he had been a bitter opponent of Muhammad and was one of the envoys the Meccans sent to the king of Abyssinia seeking the repatriation of the Meccan emigrées. He fought against Muhammad at Badr, Uhud, and the battle of the Ditch.

13. Sahih Al-Bukhari, trad. 335. In this tradition Muhammad also states that he was the only prophet to whom Allah had ever given the right to take booty.

14. Tabari, vol. 8, p. 99.

15. Qureshi, Sultan Ahmed, Letters of the Holy Prophet, p. 70.

16. Ibn Kathir tells the amusing story that no one realized Mabur was a eunuch until he was spotted visiting Mariya at one of the confiscated Nadir properties where Muhammad had lodged her. Upon hearing Mabur had gone to her there, Muhammad "ordered Ali b. Abu Talib to kill him, but Ali let him go when he found him to be a eunuch." Mabur had climbed a palm tree to get away from Ali. He either pulled up his garment to show Ali he was a castrate, or Ali was able to observe this from the ground.—Ibn Kathir, vol. 3, p. 370.

17. Ibn Sad, vol. 1, p. 308.

18. Koran, 78:31-36.

19. The Persians took the cross and other relics of the crucifixion as plunder after conquering Jerusalem in A.D. 614. The Byzantines recovered the relics after defeating the Persians in A.D. 628, and amid great fanfare Heraclius restored it to its place in Jerusalem the following year. It is said that Heraclius carried the cross on his back along the Via Dolorosa to its place in the Church of the Holy Sepulchre.—Norwich, John Julius, A Short History of Byzantium, p. 95.

20. The envoy was named al-Harith b. Umayr al-Azdi. His tomb is near Tafilah, Jordan, a historic town south of Mutah that dates from era of the Edomites.

21. A death wish poem attributed to Rawaha goes as follows: "But I ask the All-Merciful for forgiveness/and a large wound that bleeds profusely/Or a spear from a warrior armed with one that goes through/my intestines and my liver./So that it will be said when people pass by my grave,/God gave him guidance as a warrior, and he behaved well."—Ibn Kathir, vol. 3, p. 327.

22. Abdullah Rawaha was an early prototype of the fanaticized believer. He was one of the first of the Khazraj to join Muhammad's religion, converting when he was in his late teens or early twenties. He was one of the seventy-five people at Aqaba who pledged to give their lives for Muhammad's cause. He was an eager combatant at Badr two years later. He became of note when he proposed burning all the Badr captives alive in a forest fire. He fought at Uhud, the battle of the Ditch, and Khaybar. Muhammad thought enough of his leadership ability to place him in charge of Yathrib when he went to Badr for a rematch with the Meccans the year after the Uhud defeat. After the conquest of Khaybar, Rawaha was put in charge of the distribution of Khaybar's date produce. It was Raw-aha who lured Yusayr Rizam and thirty other Jews out of Khaybar and mass-murdered them. By the time of Mutah, he had become infatuated with the idea of dying in combat, thereby winning a place in Muhammad's Paradise.

23. Ibn Ishaq, p. 533.

24. Ibid., p. 535.

25. Glubb, The Life and Times of Muhammad, p. 290.

26. Waqidi, p. 375.

27. Ibn Kathir, vol. 3, p. 347.

28. Ibid., vol. 3, p. 334.

CHAPTER 30 – Capitulation

1. Waqidi, p. 385.

2. Ibn Kathir, vol. 3, p. 379.

3. Ibid., vol. 3, p. 379.

4. Ibid., vol. 3, p. 392.

5. Ibid., vol. 3, p. 392.

6. Ibid., vol. 3, p. 393.

7. Ibid., vol. 3, p. 393.

8. Waqidi, p. 405.

9. Sahih Al-Bukhari, trad. 4286.

10. Ibn Kathir, vol. 3, p. 402.

11. Ibid., vol. 3, p. 406.

12. Sahih Al-Bukhari, trad. 4281.

13. Ibn Kathir writes, "When the Messenger of God entered the Kabah the day of the conquest, he saw inside it representations of angels and others. He saw Abraham pictured holding divining arrows in his hand. He said, 'May God kill them. They have depicted our elder using divining arrows. What would Abraham have to do with divining arrows?"—Ibn Kathir, vol. 3, p. 408.

14. Some sources attribute the drawing of Abraham to a Coptic sea captain named Baqum or Pachomios who helped the Meccans rebuilt the temple in A.D. 605 with lumber recovered from his wrecked ship. Historian F. E. Peters quotes Abu al-Walid Muhammad al-Azraqi, a 9th century historian of Mecca, that Baqum "built the roof and inside made pictures of the Prophets, including Abraham and Mary and the child Jesus."—Peters, The Hajj, p. 48. The conquest of Mecca, however, took place twenty-five years after the temple reconstruction. Muhammad had been part of the reconstruction crew and would have had access to the interior of the temple thereafter. Had the Abraham image with the divining arrows been in existence at that time, he would have known about it and would not have expressed the surprise and outrage attributed to him in the Ibn Kathir account noted above. The fact it only took a wet rag to erase the drawing suggests it was more recent graffiti, perhaps hastily drawn in mockery of Muhammad.

15. Waqidi, p. 412. The word "Muslim" of the Waqidi quote is replaced here with the word "Submitter" in order to emphasize the meaning of the word "Muslim."

16. Ibn Kathir, vol. 3, p. 417.

17. Ibid., vol. 3, p. 417.

18. Ibid., vol. 3, p. 417.

19. Sunan Abu Dawud, trad. 4474.

20. Ibn Ishaq reports the ceremony in these words: "Then the populace gathered together in Mecca to do homage to the apostle in Islam. As I have heard, he sat (waiting) for them on al-Safa while Umar remained below him, imposing conditions on the people who paid homage to the apostle promising to hear and obey God and His apostle to the best of their ability."—Ibn Ishaq, p. 553.

21. Waqidi, p. 418.

22. Ibn Ishaq quotes her as saying: "I brought them up when they were children and you killed them on the day of Badr when they were grown up, so you are the one to know about them," meaning, about the killing of children.—Ibn Ishaq, p. 553.

23. Ibid., p. 554.

24. Waqidi, p. 417. The word "Islam" of the Waqidi quote is replaced here with the words "Submission" or "Submission to Allah" in order to emphasize the meaning of the word "Islam."

25. Ibn Kathir, vol. 3, p. 418.

CHAPTER 31 – Death to the Gods

1. Ibn Kathir, vol. 3, p. 428.

2. Waqidi, p. 428.

3. Waqidi, pp. 430-5; Ibn Kathir, vol. 3, pp. 423-7.

4. "Assuredly Allah did help you in many battlefields and on the day of Hunayn: Behold! your great numbers elated you, but they availed you naught: the land, for all that it is wide, did constrain you, and ye turned back in retreat."—Koran, 9:25.

5. Ibn Kathir, vol. 3, p. 448.

6. Ibn Sad, vol. 2, p. 188.

7. Waqidi, p. 441.

8. Muhammad had the use of a number of siege machines at Taif. Their origin is unclear. They could have been taken from one of the haciendas Muhammad destroyed prior to besieging Taif, or they could have been brought disassembled from Khaybar and reassembled for the Taif attack. It is also possible they were built on the spot from local materials as some of his followers had learned by reverse-engineering the Khaybar machines how they were constructed. Salman, the Persian convert credited with the idea of digging defensive trenches around Yathrib, was said to have knowledge of their construction.

9. Yazid became a military leader during the caliphate of Abu Bakr and took part in the conquest of Syria. He was appointed governor of Damascus in A.D. 634, then later governor of Syria. He died in A.D. 640 of the plague.

10. Like his brother Yazid, Muawiya also had a military role in various conquests. He succeeded Yazid as governor of Syria in A.D. 640 and was at the center of a later civil war against Ali, the fourth Caliph. He succeeded Ali as "Commander of the Faithful," as the caliphs were known, following Ali's assassination in A.D. 661, becoming the first caliph of the Umayyad dynasty.

11. Waqidi, p. 420.

12. Ibid., p. 462.

13. Sahih Muslim, trad. 6091; Ibn Kathir, vol. 3, p. 489. In the Sahih Muslim account, Muhammad's wife says, "Spare some water in your vessel for your mother also." Ibn Kathir renders it as, "Keep some for your mother!"—"mother" being part of the title "Mother of the Faithful" that Muhammad gave to his wives.

14. Ibn Kathir, vol. 3, p. 493.

15. Waqidi, p. 465.

16. The Arabs gave great importance to foster relationships due to a belief in shared atoms. A foster mother was a nursemaid, though in the case of Halima she ended up as Muhammad's substitute mother for the first four or five years of his life. Arabs considered that anyone who suckled at the breast of the same woman shared the same elements they absorbed from her. These elements became a permanent part of their bodies, and therefore they were related to anyone else who had these elements within them. As a result, foster children were also related to the biological offspring of the woman. The foster mother relationship was considered so close that Muhammad prohibited marriage between a man and a woman who had had the same wet nurse. This idea of shared atoms may explain why believers were so keen on drinking water Muhammad spat into or rinsed his mouth with or cleansed his nostrils. He had transmitted his elements to the water, and by drinking it they absorbed his elements. They may have done so as a hedge against Hell, believing Allah would not incinerate a body that contained elements of Muhammad.

17. Sahih Muslim, trad. 2303.

18. Waqidi, p. 469.

19. Ibid., p. 469.

20. Ibid., p. 428.

21. The official story about the fit holds that a Bedouin approached Muhammad to ask if it was permissible to wear perfume during a pilgrimage. Muhammad fell into a swoon, communicated with Allah about the matter, and when he came out of it he informed the man that perfume was prohibited. In several of the Bukhari traditions, Umar invited the Bedouin to get a look at Muhammad while he was in a state of communion with Allah. Umar had covered Muhammad's face with a cloth. "Come!" Umar said, "Will you be pleased to look at the Prophet while Allah is inspiring him?" When the Bedouin nodded, Umar lifted one corner of the cloth so that the man could see Muhammad. He appeared to be asleep and was snoring like a camel.—Sahih Al-Bukhari, trad. 1789.

22. Waqidi, p. 475.

23. Tafsir Ibn Kathir, vol. 9, p. 319.

24. Ibn Kathir describes Mughira ibn Shuba, one of the important companions of Muhammad, as a "much-married man." "He (Mughira) used to say, 'A man with one wife suffers menstruation along with her, and when she gets sick, so does he. And a man with (only) two wives is right between two blazing fires!' He would marry four women at once, and divorce them all together!"—Ibn Kathir, vol. 4, p. 478.

CHAPTER 32 – Ménage à Quatorze

1. Tabari, vol. 39, p. 190.

2. Ibid., p. 165.

3. Ibn Kathir, vol. 4, p. 416.

4. Tabari, vol. 39, p. 187.

5. Ibn Kathir, vol. 4, p. 428.

6. Another instance of such a marriage proposal occurred when a woman stood up during a mosque assembly and brazenly asked Muhammad to marry her, but she got less than she had hoped for her boldness. When Muhammad did not give an answer, a man stood up and said, "Messenger of Allah, marry her to me if you have no need of her." Muhammad grilled him about what he had to offer her as a dowry. He was a pauper and possessed nothing more than the clothes he wore, but he boasted that he had memorized a number of Koran chapters. Muhammad announced that his knowledge of the Koran was her dowry, and he pronounced them man and wife on the spot.—Malik's Muwatta, trad. 1069.

7. In his work, Understanding Muhammad, a Psychobiography, Ali Sina compiled evidence that Muhammad suffered from acromegaly, a disorder that in the last years of his life caused an abnormal enlargement of his head, fingers, hands, legs, and feet. He became barrel-chested as a result of it and walked with a lurch.

8. Ibn Kathir, vol. 4, pp. 423-4.

9. Koran, 33:50: “O Prophet! surely We have made lawful to you your wives whom you have given their dowries, and those whom your right hand possesses out of those whom Allah has given to you as prisoners of war, and the daughters of your paternal uncles and the daughters of your paternal aunts, and the daughters of your maternal uncles and the daughters of your maternal aunts who fled with you; and a believing woman if she gave herself to the Prophet, if the Prophet desired to marry her—specially for you, not for the (rest of) believers; We know what We have ordained for them concerning their wives and those whom their right hands possess in order that no blame may attach to you; and Allah is Forgiving, Merciful.”

10. Tabari, vol. 39, p. 197.

11. “The Role of Aisha in the History of Islam,” http://www.alhassanain.com/english/book/book/history_library/various_booksthe_role_of_Aisha_ in_the_ history_of_Islam_volume_1/005.html. The article contains traditions by the Sunni theologian Ahmad Ibn Hanbal whose work is unavailable in English except where included in translated works such as those of Ibn Kathir. He recorded numerous ancedotes about Aisha’s jealous behavior, most of them citing her as the source.

12. Sahih Muslim, trad. 5991.

13. Sahih Al-Bukhari, trad. 3821.

14. “He struck me on the chest which caused me pain.”—Sahih Muslim, trad. 2127. Another tradition found in Sahih Muslim about the incident does not mention the physical violence but records Muhammad’s explanation for her jealousy: “Aisha, the wife of Allah’s Apostle (may peace be upon him), reported that one day Allah’s Messenger (may peace be upon him) came out of her (apartment) during the night and she felt jealous. Then he came and he saw me (in what agitated state of mind) I was. He said: ‘Aisha, what has happened to you? Do you feel jealous?’ Thereupon she said, ‘How can it be (that a woman like me) should not feel jealous in regard to a husband like you?’ Thereupon Allah’s Messenger (may peace be upon him) said: ‘It was your devil who had come to you,’ and she said: ‘Allah’s Messenger, is there along with me a devil?’ He said: ‘Yes.’ I said: ‘Is devil attached to everyone?’ He said:. ‘Yes.’ I (Aisha) again said: ‘Allah’s Messenger, is it with you also?’ He said ‘Yes, but my Lord has helped me against him and as such I am absolutely safe from his mis-chief.’”—Sahih Muslim, trad. 6759.

15. Ibn Kathir related the tradition about the Angel Gabriel’s intervention in the matter: “When Mariya gave birth to Ibrahim, the Messenger of God seemed almost to begin having suspicions about him. Then Gabriel came down to him and said, ‘Peace be upon you, father of Ibrahim!’”—Ibn Kathir, vol. 4, p. 432.

16. Ibn Kathir, vol. 4, p. 433.

17. Swarup, Ram, Understanding the Hadith, p. 79.

18. Sahih Muslim, trad. 3506.

19. Sahih Al-Bukhari, trad. 5191.

20. The complete verse reads: “Maybe, his Lord, if he divorce you, will give him in your place wives better than you, submissive, faithful, obedient, penitent, adorers, fasters, widows, and virgins.”—Koran, 66:5.

21. Sahih Al-Bukhari, trad. 5191.

22. Sahih Muslim, trad. 3507.

CHAPTER 33 – Terror has made me victorious

1. Muir, Life of Muhammad, p. 454.

2. “O ye who believe! what is the matter with you, that, when ye are asked to go forth in the cause of Allah, ye cling heavily to the earth? Do ye prefer the life of this world to the Hereafter? But little is the comfort of this life, as compared with the Hereafter. Unless ye go forth, He will punish you with a grievous penalty, and put others in your place; but Him ye would not harm in the least. For Allah hath power over all things.”—Koran, 9:38-39.

3. Most of Chapter 9 of the Koran was composed around this time, and much of it is an argument for people to go to war for Muhammad’s cause. In the verses cited above, he threatens divine punishment. In another verse he threatens to expose resisters in the Koran: “The hypocrites fear lest a chapter should be sent down to them telling them plainly of what is in their hearts. SAY: Go on mocking, surely Allah will bring forth what you fear.”—Koran, 9:64.

4. A Bukhari tradition quotes Muhammad that he “planned” or “intended” or was “about to” torch the homes (Sahih Al-Bukhari, trad. 644), but the same tradition in the online version (www.search-truth.com) leaves no doubt that he carried it out: “Certainly I decided to order the Muadhdhin (the one who makes the prayer calls) to pronounce Iqama (the call to begin ritual prayers) and

order a man to lead the prayer and then take a fire flame to burn all those who had not left their houses so far for the prayer along with their houses."

5. Ibn Kathir, vol. 4, p. 3.

6. Gabriel, Richard, Muhammad, Islam's First Great General, pp. 191-7.

7. Ibid., p. 194.

8. The most amusing of the water miracles describes Muhammad's fingers turning into spigots: "The Messenger of God called for a pot and emptied what was in the vessel of water into it. Then he placed his fingers on it and the water gushed out from between his fingers. The people approached and quenched their thirst. The water overflowed until they quenched their thirst and the horses and the riders quenched their thirst; indeed there were twelve thousand camels in the camp, and some say fifteen thousand camels. The people numbered thirty thousand, and the horses ten thousand."—Waqidi, p. 510.

9. Ibn Kathir, vol. 4, p. 16.

10. A letter Muhammad sent to the rulers of the coastal town of Aqaba reveals the bluntness of his threats to crush them if they did not submit. "In the name of the Compassionate, the Merciful, from Muhammad, Prophet of Allah, to the People of Aqaba: May peace be upon you. I praise Allah who is one and except whom there is nobody else to be worshipped." Then he goes on to notify them that he is honoring them with a forewarning before attacking them, that he is giving them the option of accepting his religion or paying a submission tax and consenting "to remain obedient to Allah, His Prophet and his messengers." He instructs them to treat his envoys well because whatever pleases them "pleases me," and he implies that the converse is also true. If they reject his offer, he will have to "wage war (to establish peace and security). Its result would be that the big ones shall be killed and the commoners shall be taken prisoners." The letter continues with Muhammad's assurance that he is indeed "a true Prophet of Allah." It concludes with the words: "If you accept obedience, may peace be upon you."—Qureshi, Sultan Ahmed, Letters of the Holy Prophet, pp. 106-7. The parenthetical note was added by Qureshi.

11. To his dying day nearly three decades later, Hudhayfa kept his mouth shut about the names, but many people worried they were on the list. After he became caliph, a distraught Umar, fearful that Muhammad might have considered one of his most faithful followers a traitor, begged Hudhayfa to tell him if he was among those named and was relieved to learn he was not.—Ibn Kathir, vol. 4, p. 24.

12. Abu Amir's son Hanzala had joined Muhammad's religion and was killed during the battle of Uhud. His end came just after he knocked Abu Sufyan from his horse. He was about to kill the Meccan leader when other Meccans came to the rescue and slew him.

13. Waqidi, pp. 512-3.

14. Ibid., p. 513.

15. Ibn Kathir, vol. 4, p. 34.

16. Koran, 9:102.

17. Ibn Kathir, vol. 4, p. 35.

18. Ibid., vol. 4, p. 33.

19. The true believers have always reviled Abdullah Ubayy as a "hypocrite." The title of the section of Ibn Kathir's write up about Ab-dullah's death is revealing: "An account of the death of Abd Allah b. Ubayy, may God find him repul-sive!"—Ibn Kathir, vol. 4, p. 45.

20. Koran, 9:84.

21. Ibn Kathir, vol. 3, p. 505.

22. Ibn Kathir, vol. 4, pp. 100-1.

23. Tabari, vol. 9, p. 83.

24. Sahih Al-Bukhari, trad. 2977.

CHAPTER 34 – Intercession

1. The 99 Names of Prophet Muhammad (Islamic Book Service, New Delhi, 2004.)

2. Evidence of Muhammad's pathological drive to aggrandize his importance—grandiosity is the word for it in psychiatry—can be found throughout the literature, as in the array of titles he gave himself, but nowhere is it more clearly shown than in a tradition attributed to Abdullah, the son of Muhammad's uncle Abbas. Abdullah reported, "I posed the following question to the Messenger of God, 'Where were you, may my parents be your ransom, when Adam was still in Paradise?' He replied, smiling so broadly all his teeth could be seen, 'I was in his loins. Then the vessel carried me into the loins of my father Noah, who cast me out into the loins of

my father Abraham. My parents never once engaged in fornication. God went on transporting me from respectable loins to chaste wombs, pure and unsullied, and whenever a line split I was always in the better half. God has covenanted prophethood in me and made Islam my pact. He made mention of me in the Torah and in the Bible. All the prophets made clear my qualities; the earth brightens with my light and the dark clouds with my face. He taught me His Book and gave me honor in His Heaven. He cut off for me one of His own names; the Enthroned One is Mahmud, while I am Muhammad and Ahmad. He promised me that He would reward me with a garden and with al-Kawthar, the river of Paradise, that He would make me the first intercessor and the first for whom there was intercession. He drew me forth, moreover, out of the best marriage for my people, and they are those who give much praise, enjoin good deeds and prohibit sin.'"—Ibn Kathir, vol. 1, p. 140. Despite the absurdity of these claims, his own unshakeable belief in these grandiose ideas about himself convinced many people that they were the truth.

3. A tradition in Sahih Muslim attributed to Abu Huraira states: "The Prophet of Allah (may peace be upon him) said: 'There is for every apostle a prayer which is granted, but every prophet showed haste in his prayer. I have, however, reserved my prayer for the intercession of my Ummah on the Day of Resurrection, and it would be granted, if Allah so willed, in case of everyone amongst my Ummah provided he dies without associating anything with Allah.'"—Sahih Muslim, trad. 389. Ummah, also spelled umma, is the collective word Muhammad used for his followers and can be roughly translated as his "people" or as his "nation" of believers—the transtribal supertribe of his followers.

4. In Muhammad's own words: "Then ask Allah to grant me Al-Wasilah, which is a status in Paradise to which only one of the servants of Allah will be entitled, and I hope that I will be the one. Whoever asks Allah for Al-Wasilah for me, it will be permitted for me to intercede for him."—Tafsir Ibn Kathir, vol. 8, pp. 38-39. Al- Wasilah refers to Muhammad's idea of the highest station of Paradise, the Station of Glory and Honor.

5. Sahih Al-Bukhari, trad. 614. Muhammad later demanded that people say a prayer every time they heard his name or his title "Messenger of God." "May he be humiliated, the man in whose presence I am mentioned and he does not send Salah (prayer) upon me."—Tafsir Ibn Kathir, vol. 8, p. 38. This is why his followers say "May peace be upon him" at every mention of his name. This is done to build up a relationship with him to enhance the chances he will intercede for them on the Day of Judgment. "Then intercession for me will be permitted for him on the Day of Resurrection."—Sahih Al-Bukhari, trad. 614

6. Sunan Abu Dawud, trad. 2769.

7. Sahih Muslim, trad. 379.

8. Ibid., trad. 378.

9. In many of the accounts, Muhammad is not on a horse, but is standing on a hill that allows him to observe the multitudes. In this case he presumably leads mankind across the bridge over Hell on foot.

10. Zoroastrianism, a religion that preceded Muhammad by more than a thousand years, warned of the Chinvat Bridge—"the bridge of judgment"—in the afterlife that crosses over Hell and is the place where evil people are toppled into eternal damnation. Muhammad's Hell bridge was evidently inspired by this teaching. It is likely he learned of the Zoroastrian belief from one of his closest followers, Salman the Persian, a Zoroastrian turned Christian turned believer of Muhammad's religion, who often spent hours with Muhammad discussing religion.

11. Muhammad's imagination knew no bounds as this tradition about the depth of Hell reveals: "Abi Huraira reported: We were in the company of Allah's Messenger (may peace be upon him) that we heard a terrible sound. Thereupon Allah's Apostle (may peace be upon him) said: 'Do you know what (sound) is this?' We said: 'Allah and His Messenger know best.' Thereupon he said, 'That is a stone which was thrown seventy years before in Hell and it has been constantly slipping down and now it has reached its base.'"—Sahih Muslim, trad. 6813.

12. Sahih Muslim, trad. 349.

13. Ibid., trad. 349.

14. Tafsir Ibn Kathir, vol. 2, p. 27.

15. Muhammad is the "Enthroned One"—one of the titles he gave himself.

16. A version of the story can be found in Sahih Muslim: "Abdullah b. Masud reported that the Messenger of Allah (may peace he upon him) said: I know the last of the inhabitants of Fire to be taken out therefrom, and the last of the inhabitants of Paradise to enter it. A man will come out of the Fire crawling. Then Allah, the Blessed and Exalted, will say to him: Go and enter Paradise. So he would come to it and it would appear to him as if it were full. He would go back and say: O my Lord! I found it full. Allah, the Blessed and Exalted, would say to him: Go and enter Paradise. He would come and perceive as if it were full. He would return and say: O my Lord! I found it full. Allah would say to him: Go and enter Paradise, for there is for you the like of the world and ten times like it, or for you is ten times the like of this world. He (the narrator) said: He (that man) would say: Art Thou making a fun of me? or Art Thou

laughing at me, though Thou art the King? He (the narrator) said : I saw the Messenger of Allah laugh till his front teeth were visible. And it was said: That would be the lowest rank among the inhabitants of Paradise."—Sahih Muslim, trad. 359.

17. Sahih Al-Bukhari, trad. 3885.

18. Ibn Kathir, Life of Muhammad, vol. 1, p. 169.

19. Muhammad never admitted that he had erred in his understanding of the Christian concept of the Trinity. In his mind, Christians believed Mary the mother of Jesus was one of the persons of the Trinity. His idea about Mary as God's spouse was shaped by logic. How could God have a son without having a wife?

20. Muhammad also had a misconception about Jewish beliefs. He erroneously believed the Jews took their prophet Ezra, whom he called Uzayr, as a son of God.

CHAPTER 35 – The Farewell Pilgrimage

1. Koran, 9:5.

2. Ibn Kathir, vol. 4, p. 161.

3. Waqidi, p. 538.

4. Ibid., p. 538.

5. Ibn Kathir, vol. 4, p. 233.

6. Ibid., vol. 4, p. 242.

7. The Arabs had always counted their days in terms of lunar months consisting of twenty-eight days, but the Arabic names of the months showed that they abided by the solar cycle. Rabi I and Rabi II, the third and fourth months of the lunar calendar, mean "the first spring" and "the second spring," and Jumada I and Jumada II, the fifth and sixth months of the calendar, mean "the first month of parched land" and "the second period of parched land," clearly referring to the hot summer. A strict lunar calendar consists of only 354 days, so that an unadjusted calendar would cause a rotation of the lunar months backwards though the solar cycle so that summer and winter would become inverted every eighteen years. Jumada would occur during the freezing of winter. To avoid this rotation the Meccans reconciled the lunar cycle with the solar by adding a month every three years or so to bring them back into harmony. They would announce the intercalation during the pilgrimage. For reasons that have never been adequately explained, Muhammad prohibited intercalation.

8. Tabari, vol. 9, p. 113.

9. Ibid., vol. 9, p. 113.

10. The meaning of the word sunna is of great importance. Sunna is the word in Arabic for example, but Muhammad gave it a broader meaning by calling his behavior and his teachings his Sunna, his "legal ways" since they were in furtherance of "Allah's" cause. This is where the Sunnis get their name. They are the followers of the example of Muhammad, his "legal ways," which include his use of terror and violence against people who refused to accept him as the messenger of Allah and bow to his authority. This explains the plague of violence and terror caused by his followers today, not to mention the plagues of violence and terror of their predecessors for the last fourteen centuries. The Sunnis form the majority of believers today, but all the minor cults of Muhammad historically have done the same and continue to do so today and for the same reason.

11. Ibn Kathir, vol. 4, p. 255.

12. Ginzberg, Louis, The Legends of the Jews, vol. 1, pp. 276-8.

13. Ibn Kathir, vol. 4, p. 271.

14. Ibid., vol. 4, p. 272.

15. Waqidi, p. 542.

CHAPTER 36 – The Death of Muhammad

1. Ibn Kathir, vol. 4, p. 322.

2. Ibid., vol. 4, p. 323.

3. Tabari, vol. 9, p. 170.

4. Ibn Kathir, vol. 4, p. 332.

5. Ibid., vol. 4, p. 332.

6. Ibid., vol. 4, p. 325.

7. Ibid., vol. 4, p. 393.

8. Ibid., vol. 4, p. 363.

9. Ibid., vol. 4, p. 341. The idea of the graves of prophets being turned into places of worship had preoccupied Muhammad for months and found expression in one of the verses of Koran Chapter 9 entitled "Repentance," the last chapter he composed before his death: "They have taken as lords beside Allah their rabbis and their monks and the Messiah son of Mary, when they were bidden to worship only One Allah. There is no Allah save Him. Be He Glorified from all that they ascribe as partner (unto Him)!"—Koran, 9:31.

10. His dying words, now demanding the elimination of all Jews and Christians from the Arabian Peninsula, echoed the virulent sentiments that he had only recently expressed in Koran Chapter 9. "Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued."—Koran, 9:29. The entire chapter oozes with Muhammad's hatred of people who rejected him. It is also highly defamatory of Jews and Christians, as seen in this verse: "O ye who believe! Lo! many of the (Jewish) rabbis and the (Christian) monks devour the wealth of mankind wantonly and debar (men) from the way of Allah. They who hoard up gold and silver and spend it not in the way of Allah, unto them give tidings (O Muhammad) of a painful doom."—Koran, 9:34.

11. Tabari, vol. 9, p. 183.

12. Ibn Kathir, vol. 4, p. 346.

13. Tabari, vol. 9, p. 184.

14. Ibn Kathir, vol. 4. p. 353.

15. Ibid., vol. 4, p. 355.

16. Ibid., vol. 4, p. 355.

17. Tabari, vol. 9, p. 201.

18. Ibid., vol. 9, pp. 186-7.

19. In a footnote, Edward Gibbons quotes a Latin translation of a work by Abu al-Fida, an influential 14th century Muhammadan historian, in which Ali exclaims: "O propheta, certa penis tuus coelum erectus est!"—Gibbons, The Decline and Fall of the Roman Empire, vol. 4, p. 308.

20. The original version of Ibn Ishaq's biography of Muhammad no longer exists, but was replaced with an extensive revision—"recension" is the word used by academics—by Abdu'l Malik b. Hisham a century after Ibn Ishaq's death. In his version, Hisham famously stated that he had left out things which were "disgraceful to discuss; matters which would distress certain people." This admission is found on the first page of his notes regarding the revision. See Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, p. 691. Such omissions could be justified in terms of Muhammad's Sunna. The biographers, historians, collectors of traditions, and Koran commentators were obligated by their belief to faithfully record all that was Muhammad's Sunna, the example of his behavior in the furtherance of "Allah's" cause. This is the reason two-thirds of Ibn Ishaq's Life and all of Waqidi's biography—two important sources for this book—give detailed accounts of the violence Muhammad perpetrated against people who rejected him. It was considered part of his Sunna. Hisham could justifiably leave out mention of the priapus event, however, as it was an involuntary, post-mortem occurrence and would not be considered Sunna.

21. Tabari, vol. 9, p. 203.

22. Ibid., vol. 9, p. 203.

23. Ibn Kathir, vol. 4, p. 372.

24. Muhammad's great grandson Ali b. al-Husayn later repeated the mythology that evolved about these angels: "When the Messenger of God became ill, Gabriel came to him and said, 'Muhammad, God has dispatched me to you to express special honor and respect for you, to ask you about what He knows better than yourself: How are you?' 'Gabriel, I am much afflicted. Gabriel, I am in agony.' Gabriel returned to him the second day, asked him the same and the Prophet responded to him as he had on the first day. Gabriel then came to him a third day, asking as he had on the first, and the response was the same. Then he came to him accompanied by an angel named Ismail, who had charge of 100,000 angels, each angel in charge of another 100,000 angels. He asked to introduce him, and he (the Prophet) asked about him. Gabriel told him, 'This is the angel of death who asks permission to visit you, having never asked such permission of any human being before yourself, and never will of any person after you.' The Prophet responded, 'Allow him in,' and Gabriel did so. He (Ismail) entered and said, 'Muhammad, God has sent me to you. If you order me to take your soul, I will do so. If you order me to leave you alone, I will do so.' 'Would you really do that, angel of death?' he asked. 'Yes,' he replied. 'That was what I was ordered, and I was ordered to obey you.' The Prophet looked over at Gabriel and Gabriel said to him,

'Muhammad, God is longing to meet you.' The Messenger of God then said to the angel of death, 'Proceed as you were ordered.' And he took away his soul."—Ibn Kathir, vol. 4, pp. 394-5.

25. Ibn Kathir, vol. 4, p. 386.

26. Tabari, vol. 11, pp. 24-5.

27. Zubayr, Muhammad's maternal first cousin and one of the beheaders of the Qurayza Jews, was stabbed to death in A.D. 658 when he was sixty-seven years old. At the time of his death, he owned a thousand slaves and, according to Ibn Kathir, his estate was estimated to be worth 59,800,000 gold dinars—Ibn Kathir, vol. 4, p. 488. This is equivalent to approximately 2.1 million ounces of 24K gold. If Zubayr were alive today, his net worth would be more than $3 billion, assuming a gold value of $1,500 per ounce. Abdul Rahman, Talha, Sad Waqqas, and other early Meccan converts also ended up wealthy.